আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব

আবদুল মহামেদ হাবিবুল্লাহ

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ আলবেরুনীর
১০৩১ খ্রীস্টাব্দে লিখিত
كتاب في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة
গ্রন্থের অনুবাদ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
কর্তৃক মূল আরবী থেকে অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১
[জুন, ১৯৭৪]

দ্বিতীয় প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৮৯
[অক্টোবর, ১৯৮২]

বাএ : ১২৭৪
মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০

পাণ্ডুলিপি
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

প্রকাশক
আল-কামাল আব্দুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা—২

মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

মুদ্রাকর
মোঃ আবু আব্বাছ
লতিফ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৪৮, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা—১

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : পঁচাশি টাকা মাত্র

ALBERUNIR BHARAT TATTA: *Alberuni's Kitab-fi-Tahkike Malil Hende Min Makalatun Mokbulatun fil-Akleao Marzulatun*, translated by Abu Mahamed Habibullah. Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. Second Edition; october 1982. Price Tk. 85.00 only. U. S. Dollar 8·50.

উৎসর্গ

আমার পিতা
মরহুম মৌলভী আবদুল লতিফের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্রথম প্রকাশের প্রসঙ্গ-কথা

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব গ্রন্থটি নানা দিক থেকে বিশ্বে একটি তথ্য-সমৃদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। ভারতবর্ষকে সেকালে একজন বিদেশী পণ্ডিত কিভাবে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে তার মহৎ নিদর্শন বিদ্যমান। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-পরিব্রাজক আলবেরুনী বলেছেন যে, "এ রচনাটি তর্ক বা বাদানুবাদের পুস্তক নয়। প্রতিপক্ষের যুক্তি ও প্রমাণাদির ভ্রান্তি দেখানোর উদ্দেশ্যে আমি সে সবের উল্লেখ করিনি। আমার এ রচনাটি নিতান্ত বর্ণনামূলক।" লেখক তাঁর এই প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন করেছেন। তিনি তাঁর সন্ধানী ও সংবেদনশীল দৃষ্টিকে প্রসারিত রেখে ভারতবর্ষের মানুষ, তার অতীত ও বর্তমান, মানব-সমাজের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ, ইত্যাদি যেমন দেখেছেন তার একটি নিখুঁত অথচ নিরপেক্ষ বর্ণনা উপস্থিত করেছেন। কিন্তু শুধু এখানেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি—তিনি আরো এগিয়ে গেছেন। ভারতবর্ষকে দেখবার সময় তিনি বিশ্বকে ভুলে যাননি—বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সমাজ, জীবন-ব্যবস্থা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সাথে একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষকে জানতে ও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি বর্ণনায় ও আলোচনায় যে পরিপক্ক জ্ঞানের এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যি বিস্ময়কর। আলবেরুনীর কালে তাঁর ন্যায় এমন সুবিস্তীর্ণ জ্ঞানের ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি বিশ্বে খুব কমই ছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের যে পরিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছেন—একথা আমরা জানি। ভবিষ্যতেও আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নিশ্চিতভাবে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এমন একটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে পাঠকের হাতে তুলে দিতে সমর্থ হয়ে আমি গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করছি।

আমাদের প্রবীণ ও স্বনামধন্য ঐতিহাসিক প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি যে প্রচুর শ্রম স্বীকার করে এই গ্রন্থ বাংলাভাষাভাষী মানুষের নিকট তুলে ধরতে সাহায্য করেছেন এজন্য পাঠকের পক্ষ থেকে তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মযহারুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রথম প্রকাশের অনুবাদকের ভূমিকা

(১)

"ভারত-তত্ত্ব" লেখকের আসল নাম আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ, জনসমাজে খ্যাত আল-বেরুনী নামে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের মধ্যবর্তী সীমানা দিয়ে আমুদরিয়া (Oxus) নদী প্রবাহিত হয়ে আরাল সাগরে পড়ার আগে যে বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চল বা ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে তারই উর্বর দক্ষিণ প্রান্তে ছিল প্রাচীন খোরেজম্ (ফার্সী খওয়ারিজম্) রাজ্যের রাজধানী উরগেঞ্জ, (বর্তমান নাম Konya-urgendge, ফার্সী 'কুহনা'—পুরাতন উরগেঞ্জ)। মধ্যযুগের অন্যান্য শহরের মত উরগেঞ্জও ছিল প্রাচীরবেষ্টিত। শহরের বাইরের লোকজন যারা শহরে আসা-যাওয়া করত, তাদেরকে শহরের অধিবাসীরা স্থানীয় খোরেজমী ভাষায় বলত 'আবিজাক্,' ফার্সীতে 'বেরুনী', অর্থাৎ বহিরাগত। 'কাস' নামের এমনই এক শহরতলী গ্রামে (বর্তমানে তার নাম Kyat, ১৯৭৩ সনে আল-বেরুনীর এক সহস্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার নতুন নাম রাখা হয়েছে 'বিরুনী') এক ইরানী পরিবারে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে আবু রায়হানের জন্ম হয়। খোরেজম তখন একটি খণ্ড রাজ্য, তার মামুনী রাজবংশ বোখারার সামানি সাম্রাজ্যের অধীন।

আল-বেরুনীর পারিবারিক বা বাল্যজীবনের কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি নিজের রচিত গ্রন্থে তাঁর দুইজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছেন, আবু নসর মনসুর বিন্ আলী বিন্ ইরাক জিলানী, আর একজন বাগদাদ সরখ্সী। আর এক শিক্ষকের নাম করেছেন ইয়াকুত রুমী নামক একশত বৎসর পরবর্তী এক সাহিত্যিক জীবনীকার। তাঁর নাম আব্দুস সামাদ; প্রচলিত ইসলামের বিরোধী মতবাদ পোষণের অভিযোগে গজনীর সুলতান মাহমুদের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। আবু নসর মনসুর ছিলেন গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক আল-বেরুনীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ স্নেহ সম্পর্ক ছিল; তিনি তাঁর শিষ্যের নামে প্রায় বারোটি বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। বিদ্যোৎসাহী নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতার দরুন সে সময়ে বোখারা ও খোরেজমে বহু পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের সমাবেশ হয়েছিল। আল-বেরুনীর সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন বোখারার প্রখ্যাত দার্শনিক শেখ বুআলী ইবনে সীনা। তিনি

আল-বেরুনীর চেয়ে সাত বৎসরের ছোট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমস্যাদি নিয়ে পত্রালাপ হোত। আল-বেরুনী একবার বোখারায় সামানি সম্রাট মনসুরের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন; খুব সম্ভব তার আগে থেকেই ইবনে সীনার সাথে তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল। ১০০০ খৃীস্টাব্দে লিখিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আসারুল বাকিয়া'তে আল-বেরুনী ইবনে সীনার সাথে তাঁর পত্রালাপের কথা উল্লেখ করে তাঁকে তরুণ পণ্ডিত বলে অভিহিত করেছেন। তখন আল-বেরুনীর বয়স ২৭ বৎসর। অন্য যে সব পণ্ডিতদের সাথে আল-বেরুনীর ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন চিকিৎসাবিদ, আবুল খায়ের আল-হুসেন বিন খাম্মার আল বাগদাদী, আর আবু সহল ঈসা বিন ইয়াহিয়া আল-মসিহী। এ'রা খৃীস্টান ছিলেন। আবু সহলও কয়েকটি পুস্তিকা আল-বেরুনীর নামে রচনা করেছিলেন। এ সংবাদ আল-বেরুনী নিজেই দিয়েছেন।

খোরেজমে থাকা কালেই তিনি কয়েকটি পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচনা করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি খোরেজম ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে বের হন। এ সময়ে খোরেজম এক দারুন রাষ্ট্র বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। বেশ কয়েক বৎসর ধরে খোরেজমের শাসনাধিকার নিয়ে বোখারায় সামানি সম্রাটদের সাথে বিবাদ চলছিল, যার ফলে রাজ্যের প্রায় অর্ধেকাংশে বোখারায় প্রভুত্ব স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। ৩৮৫ হিঃ/৯৯৫ খৃীঃ বাকী অংশেও সামানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যার ফলে খোরেজম রাজ আবুল আব্বাস সিংহাসনচ্যুত হন। এর কয়েক বৎসর পরই ইলকখানি তুর্কীরা বোখারার সামানি রাজবংশ উচ্ছেদ করে বোখারা দখল করে নেয়। এই সুযোগে খোরেজমের মামুনী রাজবংশ পুনরায় স্বীয় ক্ষমতা অধিকার করে নিতে সক্ষম হল বটে, কিন্তু গজনীর নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির সাম্রাজ্য লিপ্সার দরুন সে ক্ষমতা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

মামুনী রাজবংশের আল-বেরুনীর সাথে হৃদ্যতা ছিল; তাদের অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষণের ফলে তিনি সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে তাই তাঁরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক। খোরেজম ত্যাগ করে তিনি বোখারায় সুলতান মনসুরের দরবারে কিছুদিন বাস করেছিলেন; সুলতানের সাহায্যও তিনি পেয়েছিলেন, কৃতজ্ঞতার সাথে তিনি তা উল্লেখও করেছেন। কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতার কারণে হয়ত সেখানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে কারণেই হোক, বোখারা ত্যাগ করে তাঁকে কিছুকাল ইতস্তত: ঘুরে বেড়াতে হয় উত্তর পারস্যে ও তাবারিস্তানের বিভিন্ন শহরে। এ সময়ে তাঁর আর্থিক দুরবস্থা চরমে উঠেছিল। তিনি নিজেই তাঁর এ সময়ের

দৈন্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে 'আসারুল বাকিয়া'র একটি পরিচ্ছেদে। বিষয়বস্তুর অবতারণা করে তিনি লিখেছেন : 'এই পরিচ্ছেদ লিখতে বসে আমার এমন এক অবস্থার কথা মনে পড়েছে যে অবস্থা সম্বন্ধে জনৈক কবির এই কয়টি পংক্তি প্রযুক্ত হতে পারে—

অতীতের এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেছিলেন
মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তার দুইটি ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ থেকে
(অর্থাৎ জিহ্বা আর হৃদয় থেকে)।
আমি কিন্তু এক বিচক্ষণ লোকের উক্তি স্মরণ করি
'মানুষ মানুষ হয় দুইটি দিরহামের জোরে।'
যার কাছে দুই দিরহাম-ও নাই
তার স্ত্রীও তার দিকে ফিরে তাকায় না।
দৈন্যের জন্য যে পরিচয়হীন,
বেড়ালও তার মাথায় লাথি মারতে ছাড়ে না।'

'আমি যে সময়ে সুলতানের দরবার থেকে দূরে ছিলাম তখন Rayy শহরে জ্যোতিষী বলে পরিচিত এক ব্যক্তিকে দেখেছিলাম যিনি জ্যোতিষ গণনার এমন এক পদ্ধতি ব্যবহার করছিলেন যা স্পষ্টতঃ ভ্রান্ত। আমি তাকে সে কথা বলে সঠিক প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি অহঙ্কার বশতঃ আমাকে নগণ্য লোক মনে করে আমার কথা অগ্রাহ্য করলেন, যদিও বিদ্যায় তিনি আমার সমকক্ষও ছিলেন না। আমায় তিনি মিথ্যুক বললেন এবং আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করতেও ছাড়লেন না। তাঁর এরূপ আচরণের কারণ আমি বুঝলাম; তাঁর আর আমার মধ্যে পার্থক্য ছিল ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের। দারিদ্র্য এমনই এক অবস্থা যে তার অভিশাপে সমস্ত কীর্তি ও গৌরব কলঙ্ক ও অপযশে রূপান্তরিত হয়। বস্তুতঃ সে সময়ে আমি সর্বপ্রকার দুর্গতি ও দারিদ্র্যে বিপন্ন ছিলাম। পরে, যখন আমার দুরবস্থা কিছুটা লাঘব হোল, সে লোকটি আমার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছিল'।

অবশেষে তিনি তাবারিস্তানের Ziyarid রাজবংশের বিদ্যোৎসাহী সুলতান আবুল হাসান কাবুস বিন ওয়াশমুগীর শামসুল-মা আলির দরবারে আশ্রয় লাভ করে, গুরগান বা জুর্জানে বেশ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। এখানেই তিনি বিভিন্ন প্রাচীন জাতির ঐতিহাসিক ধারণা ও কাল নিরূপণের পদ্ধতির বিবরণ সম্বলিত, 'আসারুল বাকিয়া' নামক তাঁর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করে সুলতান আবুল হাসান শামসুল মা আলিকে উৎসর্গ করেন।

জুর্জানে তিনি ১০০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। খোরেজমে মামুনী সুলতানের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। খোরেজম সুলতানের ভাই আবুল হাসান আলী তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরই অনুরোধে আল-বেরূনী দেশে ফিরে আসেন। দেশ তখন স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে সত্য কিন্তু গজনীর পরাক্রান্ত নরপতি সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যের আওতামুক্ত থাকার কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। সামরিক শক্তিতে খোরেজম গজনীর সামনে দাঁড়াতে পারে না। তাই কূটনৈতিক প্রচেষ্টাই ছিল সম্বল। বিদ্যাবত্তা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুমিষ্ট বাচনভঙ্গির জন্য সুলতান আবুল আব্বাস আল-বেরূনীকে এই প্রচেষ্টায় সহায়ক করে তাঁর উপর কূটনৈতিক কর্মভার অর্পণ করেন। খুব সম্ভব এই কূটনৈতিক কাজের দরুনই তার জ্ঞানের খ্যাতি গজনীর রাজদরবারে পৌঁছেছিল।

(২)

১০১৬ খ্রীস্টাব্দে খোরেজমে এক সামরিক বিদ্রোহে সুলতান আবুল আব্বাস নিহত হন, এবং রাজ্যে আবার অশান্তি-উপদ্রব ছড়িয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহ দমন করার ওজুহাতে পর বৎসরই সুলতান মাহমুদ সৈন্য নিয়ে খোরেজমে প্রবেশ করেন। এইভাবে খোরেজম গজনীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে গেল। ফেরার সময়ে ১০১৭ সালে তিনি খোরেজমের বহু সৈন্য ও সামরিক বেসামরিক গণ্যমান্য লোককে মামুনী রাজপুত্রদের সঙ্গে বন্দী করে গজনীতে নিয়ে আসেন। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন আল-বেরূনী, তাঁর ওস্তাদ আবু নসর, পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক আবুল হুসেন বিন বাবা আল খাম্মার আল-বাগদাদী প্রমুখ বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি।

আল-বেরূনী গজনীতে নীত হওয়ার ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী পরবর্তী আখ্যায়িকায় ও জীবনীগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ১২ শতকে নিজামী গুরুজী সামারকান্দি তাঁর 'চাহার মাকালাতে' এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তাতে সুলতান মাহমুদের এক হুকুমনামার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে খোরেজমের সুলতানকে বলা হয়েছিল ইবনে সীনা, আল-বেরূনী, আবুল খায়ের মসীহী' আবু নসর প্রমুখ পণ্ডিতবর্গকে যেন গজনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খোরেজম সুলতান হুকুমনামাটি এদেরকে দেখালেন। ইবনে সীনা ও আবুল খয়ের গজনী যেতে অসম্মত হয়ে মাহমুদের ভয়ে তৎক্ষণাৎ খোরেজম ত্যাগ করে তাবারিস্তান ও পরে জুর্জান গিয়ে সুলতান আবুল হাসান বিন কাবুস শামসুল মাআলির দরবারে আশ্রয় নেন; পথিমধ্যে

আবুল খয়েরের মৃত্যু ঘটে। এদিকে আল-বেরুনীসহ অন্যদেরকে গজনীতে যেতে হোল। সেখানে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।

এ কাহিনীতে ইতিহাসের একটু গলদ আছে। ইব্‌নে সীনা প্রায় ৮ বৎসর পূর্বেই, অর্থাৎ ১০০৮ খৃষ্টাব্দে, খোরেজম ত্যাগ করেছিলেন, সুলতান মাহমুদের ভয়ে নয়, স্বেচ্ছায়। সুলতান মাহমুদ সেই বৎসরই পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাজেই, তিনি আল-বেরুনীর সঙ্গে একই সময়ে খোরেজমে কখনই বাস করেননি। আল-বেরুনীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আসলে অন্য কারণে। সদ্য অধিকৃত খোরেজমে রাজবংশের কূটনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে তিনি যে গজনীর প্রতি অনুগত হবেন না তা মাহমুদের জানা ছিল। গজনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বা বিদ্রোহ ঘটিয়ে পুরাতন রাজ-বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তার মত নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতরা উদ্যোগী হতে পারেন, মাহমুদের এ আশংকা স্বাভাবিক। সেজন্য তিনি মামুনী রাজপুত্রদের বন্দী করে নিয়ে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন দুর্গে আটক করে রাখেন এবং তার সঙ্গে খোরেজমের সৈন্য সামন্ত ও বিশিষ্ট নাগরিকদেরকেও গজনীতে পাঠিয়ে দেন। সামরিক লোকজনকে গজনীর সৈন্যে ভর্তি করা হয়। আবুল খয়ের গজনীতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন; অন্যান্য লোককে কয়েক বৎসর নজরবন্দী রেখে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হয়; জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে আল-বেরুনীরও মধ্যে মধ্যে দরবারে ডাক পড়ত। তবে এঁরা যে খুব সুখে ছিলেন না তা তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায়। তাঁকে বিদ্রূপ, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের গতিবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং প্রায়ই তাঁকে সুলতান, কিম্বা তাঁর সৈন্যের সঙ্গে থাকতে হোত। যদৃচ্ছা ভ্রমণের স্বাধীনতা তাঁর ছিল না। এই রকম অবস্থাতেই খুব সম্ভব মামুনী রাজপুত্রদের সহবন্দী হিসাবে, তিনি ভারতের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটি শহরে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ভারতীয় ভাষা শিক্ষা, গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও পণ্ডিতদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন। গজনীতে তখন ভারতীয় হিন্দুদের যাওয়া-আসা ছিল, মাহমুদের সৈন্যদলে কয়েকজন হিন্দু সেনানায়কও ছিল, এবং হিন্দু ক্রীতদাস, ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পুরোহিত নিশ্চয় ছিল। আফগানিস্তানে এককালে হিন্দু রাজা ছিল, সেখানে প্রাচীন হিন্দু অধিবাসী থাকাও বিচিত্র নয়।

বন্দী অবস্থায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা ও ভিন্ন সংস্কৃতি-সভ্যতার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় স্থাপন করা যে কী কঠিন তা আল-বেরুনী খুলে না

বললেও তাঁর প্রস্তাবনার এই সংক্ষিপ্ত কৈফিয়াৎ থেকেই বোঝা যায়। 'হিন্দুদেরকে সম্যকভাবে বোঝা আমারই পক্ষে খুব কষ্টকর হয়েছে, অন্য কারুর ত কথাই নাই, যদি না আল্লাহর অনুগ্রহ তাকে ইচ্ছামত ভ্রমণের স্বাধীনতা না দেয়, যে স্বাধীনতা আমার অদৃষ্টে ছিল না, কারণ কোনও কাজই আমার ইচ্ছা ও সুবিধামত সম্পন্ন করার সুযোগ ও ক্ষমতা আমার ছিল না"।

( )

সুলতান মাহমুদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল হতে পারেননি। রাজনৈতিক কারণ ত ছিলই, সুলতানের ধনলিপ্সা ও গুণীর মর্যাদাদানে কৃপণতা, আল-বেরুনীর মত অনেক রুচিবান লোককেই তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। মহাকবি ফিরদৌসির প্রতি ব্যবহার সুলতানের চরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। তাঁর অর্থলোলুপতার দুর্নাম মুসলিম জগতে তখন থেকেই ছড়িয়েছিল। প্রায় ২০০ বৎসর পরে একটি গল্পচ্ছলে কবি শেখ সা'দী সুলতান মাহমুদের এই দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'একজন লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন সুলতান মাহমুদের শব কবরে শায়িত, কেবল তার চোখের তারা দুইটি জীবন্ত, ক্রমাগত এদিক ওদিক ঘুরছে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, কি খুঁজছেন? উত্তর এল, আমি অনেক ধনরত্ন রেখে এসেছিলাম, কোথায় কি ভাবে আছে দেখতে চাচ্ছি'।

মাহমুদের সামরিক পরাক্রম ও সাম্রাজ্য বিস্তার তাঁকে মুসলিম ইতিহাসে বিখ্যাত করেছে; একশ্রেণীর ইতিহাসকার তাঁকে ইসলামের আদর্শ নেতা হিসাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল-বেরুনীর মত বিদগ্ধ জনের মনে সুলতানের কীর্তি কোনও দাগ কাটতে পারেনি। মাহমুদের এ সব সামরিক বিজয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কি সর্বনাশা ক্ষতিসাধন করেছিল মৃদুভাষী আল-বেরুনী তার প্রতি ইঙ্গিত না করে পারেননি: "সবুক্তগীন ধর্মযুদ্ধের পথ অবলম্বন করলেন, এবং গাজী উপাধি ধারণ করে ভারতবর্ষের সীমান্ত ভেদ করার উদ্দেশ্যে স্বীয় উত্তরাধিকারীর জন্য পথ তৈরী করলেন, যে পথ ধরে ইয়ামিনুদ্দৌলাহ মাহমুদ (উভয়কে আল্লাহ যেন ক্ষমা করেন!) তিরিশ বৎসরের অধিককাল ধরে অভিযান চালিয়ে হিন্দুদের শস্য শ্যামল অঞ্চলগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করলেন এবং এমন সব আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখালেন যার ফলে হিন্দুরা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত চতুর্দিকে উড়ে গেল"। আল-বেরুনীর চোখে মাহমুদ মহৎ নন, অপরাধী, যার জন্য তিনি আল্লাহর

অনুকম্পা ভিক্ষা করবেন; আল্লাহর দয়া যেন তাঁকে অভিসিক্ত করে," "আল্লাহ যেন তাঁকে ক্ষমা করেন," "আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা করেন। সুলতানের সরকারী খেতাবের তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে শ্লেষের সুর খুব প্রচ্ছন্ন নয়ঃ 'ইসলামের দৃঢ়তম স্তম্ভ, সুলতানের আদর্শ দৃষ্টান্ত, বিশ্বের সিংহ সবিশেষ, যুগের অন্যান্য কীর্তি মাহমুদ, আল্লাহ যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।'

যে অবস্থাতে থেকে আল-বেরুনীকে ভারতীয় ভাষা ও দর্শন বিজ্ঞানের সাধনা করতে হয়েছে তাতে কোনও লোকের আগ্রহ টিকে থাকা অসম্ভব। এ কাজে সুলতানের উৎসাহ তিনি পাননি, কারও অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশাও তাঁর ছিল না। একক প্রচেষ্টায়, নিছক 'জ্ঞান তৃষ্ণা' মেটাতে তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার সাথে নিয়ত লড়াই করতে হয়েছে। ভারত-তত্ত্ব গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে একআধটি মন্তব্য তিনি করেছেন যার থেকে তাঁর দুঃখের পরিমাণ করা যায়। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কথা বলতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'এসব বিদ্যার সাধনায় রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা একান্ত দরকার, কেননা জ্ঞান সাধকের মনকে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর দুশ্চিন্তা থেকে কেবল রাজারাই মুক্তি দিতে পারেন, তাদের মনন শক্তিকে উজ্জীবিত করে জ্ঞানের নতুন নতুন দিক নির্ণয় করতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। বর্তমান যুগ কিন্তু তেমন নয়, বরঞ্চ তার বিপরীত; কাজেই বিজ্ঞানের কোনও নতুন শাখার বিকাশ বা গবেষণা হবে, তেমন সম্ভাবনা আমার এ যুগে আর নাই।

ভারত-তত্ত্ব রচনা সমাপ্ত হয় ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে, সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পাঁচ মাসের মধ্যে। প্যারিসে যে পান্ডুলিপিটি আছে, তার শেষে লিপিকার বলেছেন—আল-বেরুনী ভারত-তত্ত্বের একটি পান্ডুলিপি নিজ হাতে লিখে প্রস্তুত করেছিলেন—সেটি লেখা সমাপ্ত হয়েছিল পহেলা মুহরম ৪২৩ হিজরীতে (১১ই ডিসেম্বর ১০৩১ খৃষ্টাব্দ)। দেখা যাচ্ছে, সুলতানের মৃত্যুর পরেই তিনি ভারত-তত্ত্বের যে সব উপাদান এতদিন সংগ্রহ করছিলেন তা গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ করতে আরম্ভ করেন। এত জটিল ও বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্য, এত নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাকে এত অল্প সময়ে প্রাঞ্জল ভাষায় ও বৈজ্ঞানিকের মিতবাক্যে এমন বিরাট গ্রন্থ রচনা করা বিস্ময়কর শক্তির পরিচায়ক। অবশ্য সাংখ্য ও পাতঞ্জলের আরবী অনুবাদ তিনি আগেই করেছিলেন—সে রচনা দুইটির সারাংশ ভারত তত্ত্ব রচনায় ব্যবহার করেছেন; জ্যোতিষ গণনা ও অন্যান্য তালিকাগুলি হয়ত আগেই তৈরী করা ছিল, এবং

এমনও মনে হয় এক আধজন বিদ্বান লিপিকারের সাহায্যও তিনি পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও আধুনিক পন্ডিতদের চোখে এত অল্প সময়ে এরকম গ্রন্থ রচনা এক অসাধারণ কীর্তি। গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি। মাহমুদের জীবদ্দশাতে হয়ত ইচ্ছা করেই তিনি এর রচনায় হাত দেননি, সুলতানের ক্রোধকে উপেক্ষা করার সাহস তাঁর ছিল না।

মাহমুদের পুত্র মাসুদ (১০৩০—১০৪১) সিংহাসন আরোহণ করলে আল-বেরুনীর ভাগ্যের উন্নতি হয়—তিনি মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস নিতে পারলেন। মাসুদ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, দরাজদিল ও আল-বেরুনীর গুণগ্রাহী। তার প্রমাণ পাই ঐ বৎসরেই সমাপ্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান 'গণিত শাস্ত্র ও জ্যামিতি বিষয়ক' কিতাব কানুন আল-মাসুদী ফি হাই ও আল নজুম' (**Kitab Qanun al Masudi fi Hayy wal Najum**) নামক তাঁর তৃতীয় বৃহৎ গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে, যা সুলতান মাসুদের নামাঙ্কিত। মাসুদ তাঁকে প্রচুর অর্থ উপহার পাঠান, কিন্তু আল-বেরুনী তা গ্রহণ করেননি। সুলতান কিন্তু তাতে রাগ করেননি; বরঞ্চ যাতে তাঁর জীবনযাপন সচ্ছল ও নিরুদ্বিগ্ন হয় তার জন্য বেশ মোটা অংকের আজীবন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মাসুদের ইচ্ছাক্রমে তিনি আরও কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন জ্যোতিষও পদার্থবিজ্ঞানের উপরে।

মাসুদের পুত্র সুলতান মওদুদও (১০৪১—১০৪৯ খৃীঃ) আল-বেরুনীর সমাদরে কোনও তারতম্য করেননি। এই সুলতানের নামেও তিনি একটি পুস্তক উৎসর্গ করেন, 'কিতাবুল জামাহীর ফি মারেফাতুল জওয়াহীর' ধাতুবিদ্যা (**Minerology**) সম্বন্ধে।

গ্রন্থকার গজনীতেই পরলোক গমন করেন বেশ পরিণত বয়সে। এক জীবনীকারের উক্তির সাপেক্ষ **Edward Zachau** ৪৪০ হিঃ। ১০৪৮ খৃীস্টাব্দ আল-বেরুনীর মৃত্যুর তারিখ বলে ধরেছেন, যখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ চান্দ্র বৎসর ৭ মাস। কিন্তু 'কিতাব আল সয়দনা ফিল-তিব্ব্' নামক ভেষজ বিষয়ক তাঁর সর্বশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থে আল-বেরুনী নিজেই বলেছেন যে, এই পুস্তক রচনা যখন শেষ হয়েছে তখন তাঁর বয়স আশী বৎসর অতিক্রম করেছে। সে হিসাবে তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১০৫০ খৃীস্টাব্দের পূর্বে হতে পারে না।

ইয়াকুত রুমী নামক ১২ শতকের একজন লেখক যিনি বেশ কয়েক বৎসর খোরেজমে বাস করেছিলেন, 'মুজামুল আদিব্বা' নামক সাহিত্য সাধকদের

চরিত গ্রন্থে, আল-বেরূনীর মৃত্যু কালের একটি ঘটনা তাঁর সমসাময়িক নৈয়ায়িক আবুল হাসানের মুখের কথায় বর্ণনা করেছেন : 'ওস্তাদ আল-বেরূনী যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর, তখন আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। সে অবস্থাতেও তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'একদিন তুমি উত্তরাধিকার আইনে মাতামহীর সম্পর্কের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করার নিয়ম সম্বন্ধে কি বলেছিলে ?' তাঁর অবস্থা দেখে আমি বললাম, এখন কি সে আলোচনা করার সময় ? তিনি বললেন, বিষয়টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা নিয়ে মর্ত জগৎ ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে বিষয়টির জ্ঞান লাভ করে যাওয়া কি তুমি শ্রেয় মনে কর না ? অগত্যা আমি বিষয়টির পুনরায় ব্যাখ্যা করলাম। তিনি তা স্মরণ করে নিলেন। তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমি তখনো পথেই ছিলাম এমন সময়ে কান্নার রোল শোনা গেল। বুঝলাম ওস্তাদ আল-বেরূনী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন'।

তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে, কথাবার্তায় তিনি ছিলেন নির্ভীক, স্পষ্টবাক ও অনমনীয়, তবে তাঁর ব্যবহার ছিল মার্জিত, অমায়িক ও আন্তরিকতাপূর্ণ। রঙ ছিল উজ্জ্বল, দেহ নাতিদীর্ঘ, ঈষৎ স্ফীত।

(৪)

৪২৭ হিঃ।১০২৫ খৃীস্টাব্দে এক বন্ধুর জিজ্ঞাসার জবাবে লেখা আল-বেরূনীর একটি চিঠির নকল পাওয়া গেছে যাতে তিনি তখন পর্যন্ত তাঁর লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার একটি ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। চিঠি লেখার সময়ে তিনি বলেছেন তাঁর বয়স ৬৫ চান্দ্র অথবা ৬৩ সৌর বৎসর পূর্ণ হয়েছে। তালিকাতে ১০৮টি পুস্তকের নাম আছে, তার মধ্যে ২৫টি পুস্তিকা তাঁর নিজের নামে প্রচলিত হলেও তাঁর নিজের রচনা নয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ওস্তাদ আবু নসর ও সহকর্মী আবু সহল ও আবু আলী বিন আল-হাসান আল জিলী এগুলির আসল রচয়িতা। বাকীগুলির মধ্যে দশটি পুস্তককে তখন পর্যন্ত তিনি অসম্পূর্ণ মনে করতেন, তাতে সংযোজনা ও সংশোধন করছিলেন।

এ তালিকা তৈরীর পরেও তিনি প্রায় ১৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। সপ্তাহের কেবলমাত্র একদিন তিনি আহার্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে শহরে বেরোতেন। বাকী দিনগুলি তিনি অধ্যয়ন ও রচনাতেই ব্যাপৃত থাকতেন। তালিকা থেকে কিছু কিছু রচনার নাম বাদ পড়েছে, এবং পরবর্তী ১৭ বৎসর ধরে

তিনি আরও যে সব বই লিখেছেন, তা ধরলে এবং অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জীতে যে সব বই এর নাম পাওয়া যায়, সে সব মিলিয়ে বর্তমান পন্ডিতরা আল-বেরুনীর রচিত ১৮০টি পুস্তকের নাম পেয়েছেন।

তিনি নিজের প্রস্তুত তালিকাটি বিষয়ানুগঃ জ্যোতিষ পদ্ধতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে ১৮টি, (সূর্য সিদ্ধান্ত ও অর্থশেডর আরবী তর্জমা দুটি এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত); বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক তথ্য, আয়তন, দূরত্ব, দিক নির্ণয় ইত্যাদি—১৫; গণিত পদ্ধতি—৮; সূর্য কিরণ ও ছায়ার বৈজ্ঞানিক তথ্য—৪; জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণ বিষয়ে—৫; কাল ও সময় নির্ণয়—৫; জ্যোতিষ শাস্ত্রে শুভাশুভ ফলাফল নির্ণয়—১২; জ্যোতিষ গণনাবিধি—৭; উপন্যাস, কাব্য ও অতিপ্রাকৃত কিম্বদন্তি বিষয়ক—১৩; ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ বিষয়ে—৬। আরও ছয়টি পুস্তকের পান্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল। এসব রচনার অনেকগুলি পত্র-সংখ্যাও তিনি উল্লেখ করেছেন; কোনটির ১০, কোনটিরও পত্র-সংখ্যা (পৃষ্ঠা নয়) ৭০০। ৮০০। উপরোক্ত ইয়াকুত বলেছেন মারভ্ শহরের জুমা মসজিদের লাইব্রেরীতে আল-বেরুনীর রচিত পুস্তকের একটি তালিকা দেখেছিলাম, খুব ছোট অক্ষরে লেখা ৬০ পত্রে (১২০ পৃষ্ঠায়) সম্পূর্ণ।

তাঁর এই বিপুল রচনাবলীর মাত্র কয়েকটির সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত সবশুদ্ধ আটটি পুস্তক সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছে; কয়েকটির অনুবাদ হয়েছে, ইংরাজী, ইটালীয় ও জার্মান ভাষায়। আরও কুড়িটির আংশিক সম্পাদনা বা তর্জমা ছাপা হয়েছে। বাকীগুলির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

যে কয়টির সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তারও পুঁথি অত্যন্ত কম। 'আসারুল বাকিয়া'র মাত্র তিনটি পুঁথি অদ্যাবধি পাওয়া গেছে। 'ভারত-তত্ত্বের'ও মাত্র তিনটি পান্ডুলিপির অস্তিত্ব জানা গেছে, যার একটি মূল পুঁথি থেকে অন্য দুইটি নকল করা হয়েছে। এই মূল পুঁথিটি এখন প্যারিসে আছে। এটি গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত পান্ডুলিপি থেকে নকল করা, তাঁর মৃত্যুর একশত বৎসর পরে; বাকী দুইটি ৪। ৫ শত বৎসর পরে এই প্রথম অনুলিখিত পুঁথি থেকে নকল করা। অর্থাৎ গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতে এবং মৃত্যুর শত বৎসরের মধ্যে ঐ গ্রন্থের আর কোনও নকল হয়নি; গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরও তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর বৃহত্তম গ্রন্থ 'কানুন আল মাসুদী'রও একই অবস্থা. তাঁর নিজের হাতে লেখা

পাণ্ডুলিপির আর কোনও নকল তাঁর জীবদ্দশাতে হয়েছিল কিনা জানা যায় না। মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পর যে নকল হয় সেইটিই প্রাচীনতম পুঁথি। 'তাহদীদ ফী নেহায়াতুল আমাকিন'—নামক ভৌগোলিক তথ্য বিষয়ে তাঁর অন্য একটি পুস্তকের মাত্র একটি গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে। তাঁর অন্যান্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপিরও একটি কি দুইটির বেশী পাওয়া যায়নি—সেগুলিও হয় তাঁর জীবদ্দশাতে নয়ত মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই লেখা। দেখা যাচ্ছে আল-বেরুনীর রচনার প্রচার তাঁর সময়ে এবং পরেও তেমন হয়নি। অথচ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হিসাবে তখনই 'ওস্তাদ' নামে খ্যাত হয়েছিলেন; পাঞ্জাবের জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শনের হিন্দু পণ্ডিতরা তাঁকে অগাধ শ্রদ্ধা করতেন, এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁর অভিমত চেয়ে পাঠাতেন। সে সব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন সাতটি পুস্তিকার আকারে, যার পত্রসংখ্যা ছিল ৭ থেকে ৫০ পর্যন্ত।

তাঁর সমসাময়িক ইবনে সীনার খ্যাতি আরও বিস্তৃত ও গভীর। কিন্তু তখনকার মুসলিম জগতে তাঁর দর্শন বা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রাচীন অনুলিপির স্বল্পতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে চিকিৎসা শাস্ত্রের "কানুন-ফিল্-তিব্ব্" ছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেরও প্রচার তেমন হয়নি। তাঁর গ্রন্থাবলী ইয়োরোপে ১২ শতক থেকে যতটা আদৃত হয়ে এসেছে, প্রাচ্যে ততটা হয়নি।

ব্যাপারটি আশ্চর্য। এর কারণ নির্ণয় করতে হলে আরও অনুসন্ধান দরকার। কেবল প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আল-বেরুনী ও ইবনে সীনার মত তাঁদের সমসাময়িক আবু নসর, এমনকি কবি ফিরদৌসীর মত বেশ কিছু লেখক-বৈজ্ঞানিক ছিলেন মুক্ত বুদ্ধির অনুসারী, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত সনাতন সুন্নী মতানুযায়ী ছিল না; আল-বেরুনীর সহকর্মী-বৈজ্ঞানিক আবুল খয়ের ও আবু সহল ত' খৃীস্টান-ই ছিলেন। ঠিক ইসমাইলী (শিয়া) সম্প্রদায়ভুক্ত না হলেও এঁদের অনেকেই ইসমাইলী মত-বাদের পক্ষপাতী ছিলেন বলে ধারনা করা হোত। ইসমাইলী মতবাদ পোষণের অভিযোগে মহাকবি ফিরদৌসীর মরদেহকেও তুস্ শহরের মুসলিম গোর-স্থানে কবর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। দশ শতকে মুসলিম জগতে ইসমাইলী মতবাদের গোপন প্রসার ঐতিহাসিক ঘটনা, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের মধ্যে ইসমাইলী চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। মেসো-পোটেমিয়াতে ইখ্ওয়ানুস-সাফার ছদ্মনামে দশ শতকে যারা বিজ্ঞান ও দর্শনের

বিভিন্ন শাখায় পঞ্চাশটিরও বেশী পুস্তিকা রচনা করে প্রচার করেন তাঁরাও যে ইসমাইলী ছিলেন তাতে এখন আর সন্দেহ নাই। আলোক-বিজ্ঞানের (Optics) সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আল-হায়সাম (Al-Hazm ১০ শতক) ও সুন্নি মতবাদের চেয়ে মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন; এমন সন্দেহও করা হয়েছে যে তিনি নিজেও ইসমাইলী ছিলেন।

সনাতন সুন্নি মতবাদ বহির্ভূত, মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাস পোষণ করার জন্যই কি আল-বেরুনীর রচনাবলী প্রচারে বাধা এসেছিল রাজশক্তি ও সুন্নি সমাজপতিদের কাছ থেকে? তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই গজনীর সাম্রাজ্য সেলজুক তুর্কীদের করতলগত হয়ে যায়, এবং এশিয়াতে তারাই সর্বপ্রধান মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের অভিভাবক হয়ে সেলজুক সুলতানরা সুন্নি চিন্তারীতি ও ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ধর্মমত, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা ছিল ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আর যারা এই প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী তারা আব্বাসীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বী শিয়া-ইসমাইলী মতবাদের সপক্ষে বিকল্প রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য গোপন প্রচার ও জনমত সংগঠনে সচেষ্ট ছিল। এই প্রচারের ফলশ্রুতি হোল দশ শতকের মাঝামাঝি বিপক্ষ ব্যবস্থা হিসাবে মিসরে ও উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমী বংশের নেতৃত্বে ইসমাইলী খিলাফত প্রতিষ্ঠা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কায়রোতে ইসমাইলী ধর্মমত প্রচার পদ্ধতি শেখানোর জন্য আল-আজহার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে ইসমাইলী ইডিওলজিকাল অনুপ্রবেশ থেকে আত্মরক্ষা করতে তাই আব্বাসীয় সেলজুক নেতাদেরকেও প্রতিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। সেলজুক উজীর নিজামুল মুল্ক তখন বাগদাদে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইরাক-ইরানের বিভিন্ন শহরের মাদ্রাসা স্থাপন করে সুন্নি মতবাদের পবিত্রতা রক্ষা ও ইসমাইলী মতবাদের প্রসার রোধ করতে আব্বাসীয় রাষ্ট্র ও সমাজ নায়কদের সচেষ্ট হতে হয়। সনাতন সুন্নী ইসলামের বিশ্বাস ও আচরণের শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয়, প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ও তত্ত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন বা সন্দেহ জন্মায় এমন সব বই পুস্তকের প্রতি রাজশক্তির তরফ থেকে সমাজ মনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণার অনুমোদিত ও প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বাইরে চিন্তার স্বাধীনতা সংকুচিত করারও চেষ্টা চলতে থাকে। এগারো শতকের শেষে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমাম গাজ্জালী সুফীবাদ, দর্শন, আইন

ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে যে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করে মুসলমানদের ধর্মচিন্তাকে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করতে সফল প্রভাব বিস্তার করেন, তাতেও স্বাধীন বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণাতে স্পষ্ট নিরুৎসাহ ও নিন্দা ব্যক্ত করা হয়েছে, "কেননা তার ফলে সৃষ্টির সূচনা ও স্রষ্টার প্রতি ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে।"

তখন থেকে উদার ধর্মমত ও মুক্ত চিন্তার প্রতি সমাজ মনে যে বিরোধের সৃষ্টি হতে থাকল তার ফলে, ৯ থেকে ১১ শতক পর্যন্ত যে যুগ মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন ও মৌলিক সৃষ্টির জন্য যখন মুসলমানরা সভ্যজগতের নেতা বলে পরিগণিত হোত, সে যুগের অবসান হল। এবং সাহিত্য, ইসলামী শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদের বাইরে কোনও নতুন বৈজ্ঞানিক আলোচনা বা জিজ্ঞাসার সুযোগ আর থাকল না। মুসলিম মনীষা বিকাশের ক্ষেত্রে যেন চিরতরে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেল আর সেই থেকে গোড়া সনাতন ধর্মীয়তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের মাপকাঠি হয়ে রইল।

একমাত্র এই কারণেই মুসলিম জগতে আর স্বাধীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদের আবির্ভাব হয়নি একথা এখনও হয়তো বলা যাবে না। তবে আল-বেরুনী, ইবনে সীনার মত স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী, উদারধর্মী বৈজ্ঞানিকদের লেখার বহুল প্রচার রোধ করতে সমাজ মনে সৃষ্ট উপরোক্ত মনোভাব যে অন্যতম সহায়ক হয়েছিল তাতে সন্দেহ করা চলে না। বিশেষ করে ভারততত্ত্বের মত পুস্তক ত আরও আপত্তিজনক, যাতে বিধর্মী পৌত্তলিক হিন্দুদের ধর্মকর্ম, রীতিনীতি ও দর্শন বিজ্ঞানের বর্ণনা আছে, যা শুনলেও পবিত্র ইসলাম অনুসারীদের ধর্মবিশ্বাস কলুষিত হয় বলে তখন মসজিদ মাদ্রাসা থেকে প্রচার করা হচ্ছিল। ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোনও পুথি পাওয়া যায় নাই। ১৬ শতকে ঐতিহাসিক আবুল ফজল হিন্দু সভ্যতা ও বিজ্ঞানের এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন আইন-এ-আকবরীর তৃতীয় খণ্ডে, কিন্তু তিনি আল-বেরুনীর এ গ্রন্থটি নিজে দেখেছিলেন এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

আমাদের অবশ্য একটা প্রাসঙ্গিক কথাও মনে রাখা দরকার। তেরো শতকে মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে চেঙ্গিস খানের মোঙ্গোল সৈন্যরা যে ধ্বংস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে প্রায় ৩০ বৎসর ধরে, তাতে অসংখ্য গ্রন্থাগার ও পুস্তকালয় বিনষ্ট হয়। কী পরিমাণ বই পুস্তক চিরতরে ধ্বংস হয়েছিল তার আন্দাজ করা যায় কেবল এই কথা মনে করলে যে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে আরবী রচনাবলীর যা অবশিষ্ট আছে তা প্রাক-মোঙ্গোলীয় যুগের রচিত

পুস্তকাবলীর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। মুসলিম সভ্যতার এই দুর্যোগে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে আল-বেরুনীর রচনাবলীর বেশ কিছু পুঁথি যে ধ্বংস হয়ে যায় নাই তা কি করে বলা যাবে ?

বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস করে মোঙ্গোলরা ইরান-মেসোপোটে-মিয়াতে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল তাতে নতুন রীতিনীতি, প্রশাসন ও সমাজ-বিন্যাস প্রবর্তিত হোল। তার ফলে যে নতুন মূল্যবোধের সঞ্চার হোল তাতে সংস্কৃতি-চিন্তার গণ্ডীও কিছুটা বিস্তৃততর হবার সুযোগ পেল। তার দৃষ্টান্ত দেখি ১৪ শতকে প্রাক-মুসলিম যুগের ও অমুসলিম জাতির ইতিহাস, রীতি-নীতি ও ধর্মকাহিনী বিষয়ে আরবী ও ফার্সিতে রচিত কয়েকটি গ্রন্থে। এবং চিত্রশিল্পের নতুন টেকনিক ও বিষয়বস্তুতে। মুসলমানদের জন্য যা এতদিন কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ছিল, সেই অকল্পনীয় বিষয়—হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরদের জীবনকাহিনী চিত্রিত হতে আরম্ভ করল। এই রকম একটি চিত্রিত পুঁথি প্রস্তুত করা হয় আল-বেরুনী উপরোক্ত প্রাচীন জাতির কাল নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ 'আসারুল বাকিয়া'র, যা এখন ইয়োরোপে আছে। ভারত-তত্ত্বের কোনও পুঁথি এ সময়ে অনুলিখিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে এ পুস্তকের প্রচুর উপকরণ ও উদ্ধৃতি মোঙ্গোল রাজার উজীর রশীদুদ্দিন ফজলুল্লাহর বিশ্ব-ইতিহাস জামেউত তাওয়ারীখ' গ্রন্থের ভারতবর্ষ খণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু উদার, মুক্ত চিন্তার এ সম্ভাবনা তার অগ্রসর হয়নি। ১৪ শতকের শেষ থেকে তৈমুরী সাম্রাজ্যে সনাতন সুন্নি চিন্তারীতি ও আইন-কানুন আবার কঠিন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল। এই ভাবে আল-বেরুনীর আক্ষেপ—"বিষয়টির (হিন্দু সংস্কৃতির গবেষণা) গবেষণায় আমি এযুগে একবারেই একা—"চিরন্তন হয়ে রইল।

(৫)

আল-বেরুনীর মাতৃভাষা ছিল 'খোরেজমি'—প্রাচীন ইরানী সোগদির (Soghdian) ভাষার এক আঞ্চলিক শাখা। তিনি এ ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভাবপ্রকাশের উপযোগী মনে করেননি। আরবী তখন সংস্কৃতির ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভাষা সেজন্য তাঁর বেশীর ভাগ গ্রন্থই আরবীতে রচিত। কিছু বই তিনি ফার্সীতেও লিখেছিলেন। সেগুলির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। Edward Zachau দেখিয়েছেন যে যার মাতৃভাষা আরবী নয়, তার মত আল-বেরুনী মধ্যযুগের ক্লাসিকাল আরবী ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু ব্যাকরণের

সমস্ত নিয়ম তিনি মানেন নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার বক্তব্যকে স্পষ্ট, শুদ্ধ ও তীক্ষ্ণ করার জন্য ব্যাকরণের কিছু নিয়ম তিনি উপেক্ষা করেছেন। ভারতবর্ষের কথা আরবী ভাষায় লিখতে গিয়ে হিন্দু দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের এমন সব শব্দ ও ভাব তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে যার আরবীতে কোনও প্রতিশব্দ বা প্রতিকল্প ধারণা ত নাই-ই, যা আরবী চিন্তারীতিতেও অকল্পনীয়। তিনি এ অসাধ্য সাধন করেছেন হয় ভারতীয় শব্দকেই আরবী ছাঁচে ব্যবহার করে (যেমন সংস্কৃত শব্দ ভুক্ত, গ্রহের প্রাত্যহিক আবর্তন, প্রাকৃত 'বুহত', আরবী নিয়মে তার বহু বচন করেছেন' আবহাত,' নয়ত আরবীতে তার ব্যাখ্যা করে আর নয়ত যেখানে হুবহু আরবী অনুবাদ করা যায় না সেখানে বিকল্প আরবী শব্দকে এই ভারতীয় শব্দের অর্থে ব্যবহার করে, যেমন 'অমৃত' আরবীতে 'হায়াআৎ' 'ঊনরাত্র' বা 'তিথিক্ষয়'—আরবী 'নোক্সান্' শব্দকে সে অর্থে ব্যবহার করেছেন)। ভাষার ঐশ্বর্য, পদ ও শব্দ বিন্যাসের আশ্চর্য নমনীয়তা ও ধাতুরূপের বিপুল বৈচিত্র্যের সাহায্যে আল-বেরুনী আরবীকে বিদেশী বিজ্ঞান-দর্শনের ভাবপ্রকাশের উপযোগী করার যে পন্থা এইভাবে নির্দেশ করেছিলেন তাতে আরবী এক নতুন দিকে বিকশিত হতে পারত। কিন্তু তাঁর কোনও উত্তরসূরী আর এ বিষয় নিয়ে চর্চা করেনি, কাজেই তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলী ও বাক্য রীতি সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য এবং সে কারণে বিষয়টিও অবহেলিত হয়ে রয়ে গেল।

তিনি নিজ মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান আলোচনার মাধ্যম হওয়ার উপযুক্ত মনে করেন নি বটে, কিন্তু মাতৃভূমি ও স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর মমতা ছিল গভীর। ইতিহাসে আরব মুসলমানদের ভূমিকার প্রতি তিনি প্রসন্ন হতে পারেন নি। তিনি আরব জাতিকে দেখেছেন ইরানী সভ্যতা ও ইরানী জাতির বিনাশকারী হিসাবে। যে ইরানের সভ্যতা ও কীর্তিতে তিনি গৌরব বোধ করতেন সে গৌরবকে যে মরুচারী বর্বর আরবরা ধ্বংস করেছে তাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ও ক্ষোভ চেষ্টা করেও তিনি গোপন করতে পারেননি। খোরেজম্ বিজয়ী আরব সেনাধ্যক্ষ কুতাইবা বিন মুসলিমের প্রতি তাঁর বিরাগ সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কেননা তাঁর মাতৃভূমির সভ্যতা এঁরই দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিল, "খোরেজমী লিপির লেখক, শিক্ষক ও খোরেজমী ভাষাতাত্ত্বিক, সবাইকে কুতাইবা নিহত করে খোরেজমী সংস্কৃতির নাম গন্ধ নিশ্চিহ্ন করে দিলেন; খোরেজমের জ্ঞানী-পণ্ডিতদেরকে হত্যা করে সমস্ত লিখিত পুস্তকাদি পুড়িয়ে ও সমস্ত লিপি চিহ্ন ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে খোরেজমের লোক সবাই

নিরক্ষর হয়ে রইল এবং স্মৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর রইল না"। নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরবদের অহংকারকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন—"আবদুল্লাহ বিন মুসলিম একটি বই লিখেছেন আরবেতর ইরানীদের উপরে আরবদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে। তাতে তিনি বলেছেন, নক্ষত্র বিদ্যায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আরবরা শ্রেষ্ঠ। আমি বুঝতে পারি না তিনি কি সত্যিই বিষয়টি জানেন না, না না-জানার ভান করছেন। এরকম উক্তি থেকে ইরানীদের বিরুদ্ধে তাঁর (আবদুল্লাহ বিন মুসলিম) আক্রোশই প্রমাণিত হয়। আরবদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার জন্য ইরানীকে হীন ও ঘৃণ্য জাতি বলে উপস্থাপিত করতে হবে; তাদেরকে কাফির, ইসলাম-বিরোধীও বলতে হবে, এবং সেই সব দোষ তাদের ওপর আরোপ করতে হবে যে সব দোষের জন্য কোরানে বেদুঈন আরবদেরই নিন্দা করা হয়েছে"।

বিদেশী বর্বরদের দ্বারা স্বদেশের ঐশ্বর্য বিনষ্ট হওয়ার তীব্র বেদনা তাঁর মনে ছিল বলেই কি আল-বেরুনী সুলতান মাহমুদ কর্তৃক বিধ্বস্ত হিন্দুদের প্রতি সমবেদনায় তাদের সংস্কৃতিগৌরবের সাক্ষাৎ বিবরণ দিতে গিয়েছিলেন? ভারতীয়দের দুরবস্থায় তাঁর সহানুভূতি প্রস্তাবনাতেই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নিজে ইসলামে বিশ্বাসী, ইসলামের শ্রেষ্ঠতার কথা বলতে সোচ্চার কিন্তু হিন্দুদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল না; তাদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, মূর্খতা, আত্মম্ভরিতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদি দোষের তিনি নিন্দা করেছেন। কিন্তু যেখানে তাদের কৃতিত্ব ও মহৎ চিন্তার পরিচয় পেয়েছেন সেখানে অল্প-কথায় হলেও, প্রশংসা করেছেন নিঃসঙ্কোচে। তাঁর সমকালীন হিন্দুদের জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের অহমিকার তিনি বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু তাদের পূর্বসূরীদের প্রজ্ঞার ও সত্যানুসন্ধিৎসার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন একই সাথে। ধর্মচিন্তায় ও ধর্মাচরণে হিন্দুদের শিক্ষিত-অভিজাত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি; শিক্ষিত হিন্দুরা একেশ্বরবাদী, কিন্তু জনসাধারণের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের দরুন হিন্দুর ধর্ম ও আচরণ সভ্য জাতির চোখে হেয় হয়ে রয়েছে; ব্রাহ্মণরা নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য শাস্ত্রবিধান তৈরী করে জনসাধারণের বিদ্যা লাভ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ নিষেধ করে ধর্মজ্ঞান লাভের পথে কঠিন বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে—অল্প কথায় মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে আল-বেরুনী হিন্দু সমাজের এই মূল রোগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সুসভ্য

মুসলমান ও গ্রীকদের মধ্যেও এরকম কুসংস্কার ও গর্হিত আচরণের দৃষ্টান্ত যে অপ্রতুল নয়, সে কথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। ভারতবর্ষের মন্দিরে দেবদাসীদের উপার্জনের উপর কর ও জরিমানাতে রাজাদের কোষাগার ভর্তি হয় যার থেকে সৈন্যদের খরচ ওঠানো যায়, সেজন্য রাজারা এই প্রথার উচ্ছেদ চায় না, নইলে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা কখনই এসব নটিদেরকে মন্দিরের কাছে ঘেঁষতে দিত না, একথা বলেই আল-বেরুনী ঐ একই নীতিতে বুয়ায়েহিদ সুলতান আজদুদ্দৌলার বারঙ্গনা বৃত্তি অনুমোদনের কথাও উল্লেখ করেছেন, "আসলে এই কদাচার টিকিয়ে রাখার জন্য রাজারাই দায়ী। হিন্দু জাতি দায়ী নয়।" হিন্দুশাস্ত্রের নানারূপ গর্হিত বিবাহ রীতির উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছেন "এরকম অস্বাভাবিক বিবাহ-রীতি পাঞ্জাব থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। এবং অতীতে আরবদের মধ্যেও ছিল। কুপ্রথার জন্য কেবল হিন্দুদের নিন্দা করা আমার উচিত হবে না।" Sicily জয় করার পর যে সব মণি-মুক্তা খচিত সোনার মূর্তি আরবদের হাতে পড়ে, সেগুলোকে খলিফা মুআবিয়া ভেঙ্গে না ফেলে সিন্ধুদেশের হিন্দু রাজাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; 'মূর্তিগুলি যে ঘৃণ্য পৌত্তলিকতার উপকরণ হতে পারে, তাতে তার লেশমাত্র আপত্তি হোল না; তিনি ব্যাপারটিকে ধর্মের চোখে না দেখে রাজনীতি ও অর্থনীতির চোখ দিয়ে দেখলেন"। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহ বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনে ভারতীয় হিন্দুদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, তাদের যেমন প্রশংসনীয় গুণ আছে তেমনই তাদের বহু জঘন্য রীতি ও অভ্যাসও আছে যা সভ্য মুসলমানের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে, কিন্তু তার জন্য জাতি হিসাবে একমাত্র হিন্দুদেরই দোষী মনে করা উচিত নয়; কেননা সে রকম কদাচার ও ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত অন্যান্য সভ্য জাতি, আরব, গ্রীক, ইরানী ও মুসলমানদের মধ্যেও ত পাওয়া যায়। স্বচ্ছ দৃষ্টি ও নিরপেক্ষ বিচারের সমন্বয়ে আল-বেরুনী হিন্দু সংস্কৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে আভাষে ইঙ্গিতে এই কথাই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের কিছু কিছু তত্ত্ব আগেই আরব মুসলমানদের কাছে পেঁৗছেছিল, যার একটা আবছা, অসংলগ্ন ধারণা আল-বেরুনী তাঁর পূর্বসূরীদের লেখায় পেয়েছিলেন। হিন্দুদের মূল গ্রন্থের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম স্থাপন করেন। ভাগবদগীতার মহৎ ভাবের প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে আরবরা এ গ্রন্থের

সংবাদ পেয়েছিল বলে শোনা যায়নি। আল-বেরুনী তার সম্পূর্ণ তর্জমা করেননি বটে, কিন্তু বেশ কয়েকটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভারত-তত্ত্বে, যার থেকে বোঝা যায় গ্রন্থটি তিনি সম্পূর্ণ পাঠ করেছিলেন। তেমনই, বেদ, পুরাণ, মনুস্মৃতির সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতেও কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। বৌদ্ধ ধর্মের কোনও গ্রন্থ তিনি পাননি, কোনও বৌদ্ধ শ্রমণের সাথেও তাঁর দেখা হয়নি। তার জন্য তাঁর আক্ষেপ ছিল। বৌদ্ধদের সম্বন্ধে তাঁর যৎসামান্য জ্ঞান তাঁর পূর্বসূরী আবুল আব্বাস ইরান শাহরীর অধুনালুপ্ত পুস্তক থেকেই সংগ্রীত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এ পুস্তকের বিবরণ যে অভ্রান্ত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং পুস্তক লেখকের যে বিষয়টির সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল না, তাঁর পূর্বতন লেখক Zurqan-এর লোকশ্রুতি থেকে সংগৃহীত গালগল্পেরই যে ইরান শাহরী নিজ পুস্তকে পুনরাবৃত্তি করেছেন, এ কথা আল-বেরুনী নিজেই বলেছেন এবং বৌদ্ধ বা শ্রমণদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য তিনি কুণ্ঠাও প্রকাশ করেছেন একাধিকবার।

হিন্দু-দর্শন বিজ্ঞানের যে সব বইএর তিনি আরবী তর্জমা করেছিলেন বলে উপরোল্লিখিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন তার মধ্যে কপিলের সাংখ্য, পাতঞ্জল দর্শন, পৌলিশ সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, বৃহৎ সংহিতা, খণ্ডখাদ্যক, বরাহমিহিরের লঘুজাতকম সহ বাইশটি ছোট বড় পুস্তকের নাম আছে। এর মধ্যে মাত্র দুইটির পাতঞ্জল দর্শন ও রাশি নির্ণয় (রাশিকাতুল হিন্দ) পুঁথি আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়টি কেবল মূল আরবীতে মুদ্রিত হয়েছে হায়দরাবাদ থেকে। অন্যটি এখনও অমুদ্রিত। ভারতীয় পণ্ডিতদেরকে আরব-গ্রীক বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃতেও কয়েকটি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন, Euclid-এর Elements, Ptolemy-এর Almajest এবং Astrolable তৈরী করার পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর নিজের একটি রচনা। এগুলিরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। হিন্দু জ্যোতিষী ও কাশ্মীরী পণ্ডিতদের প্রশ্নের উত্তরেও তিনি আরবীতে দুইটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬)

ভারত-তত্ত্ব গ্রন্থের আসল আরবী নাম হচ্ছে كتاب في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة বাঙলা গদ্যে তার মানে দাঁড়ায় 'বুদ্ধি বিচারে যা গ্রহণযোগ্য আর যা গ্রহণযোগ্য নয়, হিন্দুদের সব রকম চিন্তা পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা : (Book on an accurate

description of all categories of Hindu thought, those which are admissible to reason as well as those which are not)। Edward Zachau কর্তৃক সম্পাদিত মূল আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে লণ্ডন থেকে। পর বৎসরে Zachau টীকা সহ Alberuni's India নামে তার একটি সম্পূর্ণ ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন দুই খণ্ডে। আজ পর্যন্ত ইংরাজি অনুবাদের কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। ভারত-সরকারের উদ্যোগে মূল আরবীর আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৭ সালে হায়দরাবাদ থেকে। প্রথম সংকরণ থেকে এর পাঠে খুব বেশী তফাৎ নেই, কেননা উপরোল্লিখিত Paris-এর একমাত্র মূল পুঁথি অবলম্বনে এটিও প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই অনুবাদের জন্য আমি হায়দরাবাদ সংস্করণ ব্যবহার করেছি। প্রয়োজনমত আগের সংস্করণের পাঠেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ভারত-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি এত বিচিত্র ও জটিল, লেখকের আরবী বাক্য বিন্যাস এত সতর্ক ও সুসংবদ্ধ এবং শব্দগুলি এত সুনির্দিষ্ট অর্থবহ করে প্রযুক্ত যে, সর্বত্র লেখকের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল বাংলায় নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি এমন দাবি আমি করতে পারি না। বিষয়গুলির সাথে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তার ভিতরে প্রবেশ করতে যে বিদ্যাবুদ্ধি, সময় ও সুযোগের দরকার তা আমার নাই, সে জন্য টীকা বা নোট দেওয়ার দুঃসাহস করিনি। Zachau-এর তর্জমার সাথে বিভিন্ন পণ্ডিদের সাহায্যে প্রস্তুত যে ইংরাজি টীকা আছে ঐসব বিদ্যার পণ্ডিতরা এখন তা আরও সংশোধন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন। বিভিন্ন ভাষায় ভারত-তত্ত্বের অনেক বিষয়ের উপর প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত ও পরিশ্রম লাঘব করার দায়িত্ব আমার নয়।

প্রায় বারো বৎসর আগে এই তর্জমার কাজ হাতে নিয়েছিলাম, কতকটা নিজেকে পরীক্ষা করার ঝোঁকে। প্রথম খসড়ার কিছু কিছু অংশ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছিল, মরহুম অধ্যাপক আবদুল হাইএর আগ্রহে। ডক্টর শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর এনামুল হক প্রমুখ সুধীজনের অনুকূল মন্তব্যে উৎসাহিত হয়ে তর্জমাটি সম্পূর্ণ করেছি। দু'বৎসর সময় লেগেছে। বাঙলা একাডেমীর আগ্রহ না হলে এ তর্জমা পাণ্ডুলিপিতেই থেকে যেত। একাডেমীর বর্তমান ও আগের পরিচালক ও কর্মকর্তারা তাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

১৯৭১ এর আগেই মুদ্রণের কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী পরিস্থিতির দরুন প্রকাশনা বিলম্বিত হোল। পুস্তকে উল্লিখিত স্থান ও পাত্রের একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরী করে দিয়েছিলেন আমার সহকর্মী আবুল কাসেম মুহম্মদ আবদুল আলীম; তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ইচ্ছা ছিল, গ্রন্থোল্লিখিত সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ যেভাবে আরবী অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে তার পাশাপাশি সংস্কৃত অক্ষরে সে শব্দগুলির একটি তালিকা দেওয়ার, তখনকার সংস্কৃত উচ্চারণ রীতি বোঝার জন্য। সে ইচ্ছা অবশেষে ত্যাগ করেছি, কেননা সংস্কৃতে সে পরিমাণ জ্ঞান আমার নাই, আর ঢাকাতে দেবনাগরী টাইপ এখনও তেমন পাওয়া যায় না। বিশ্বভারতী পত্রিকায় এবং Alberuni Commemoration Volume-এ ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাতে সংযোজনও করা আমার সাধ্যের বাইরে।

আমার এই প্রয়াসে যিনি সর্বদা আমার পাশে থেকে সাহস দিয়েছেন, সমালোচনা করে ভাষার ভুলত্রুটি সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করেছেন, এবং সময়মত তাড়না করে কাজটি সম্পূর্ণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি আমার স্ত্রী লুৎফন্নেসা মিনু। আমার হাতের লেখা নকল করার পরিশ্রম তিনি স্বেচ্ছায় না নিলে পান্ডুলিপি তৈরী করা আমার দ্বারা কোনদিনই সম্ভব হোত না। পুস্তকের নির্ঘন্টটি শুদ্ধ করে তার আক্ষরিক বিন্যাস করে দিয়েছেন তিনিই। বারো বৎসরের আরব্ধ কাজ যে এখন শেষ হোল তাতে তিনিই সবচেয়ে বেশী আনন্দিত। তাঁর সাথে আমার যে সম্পর্ক তাতে মামুলি কথায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর কাছে আমার ঋণের গভীরতা লাঘব করতে চাই না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পহেলা বৈশাখ
১৩৮১

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

গ্রন্থকারের সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

ইতিহাস কখনও প্রত্যক্ষদর্শনের সমান হতে পারে না, এ কথা অতি সত্য। কারণ, প্রত্যক্ষদর্শী দৃষ্ট বস্তুকে চক্ষু দিয়ে, স্থান ও কালের সীমার মধ্যে উপলব্ধি করে। ইতিহাসের নানারূপ দোষ না থাকলে তা প্রত্যক্ষ দর্শনের চেয়ে বেশী গ্রহণীয় হতো; কেননা, চক্ষু দ্বারা যা দেখা যায় তার প্রকৃত অস্তিত্ব ক্ষণকালের, কিন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, যা আছে আর যা নাই, (অতীত হয়ে গেছে বা এখনও অস্তিত্বে আসেনি), সব একই সঙ্গে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। লিখিত বিবরণ ইতিহাসেরই শ্রেণীবিশেষ, অন্য প্রকারের ইতিহাসের মধ্যে প্রায় শ্রেষ্ঠ বলা চলে। লেখনীর অমর কীর্তি ব্যতিরেকে, জাতিসমূহের সংবাদ আমরা কেমন করে পেতাম ?

যে ঘটনা স্বাভাবিক নিয়মে ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ঘটা অসম্ভব নয়, তার বিবরণের সত্যাসত্য-ও সংবাদদাতার সত্যবাদিতার উপর নির্ভর করে; তার সত্যনিষ্ঠা আবার ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা বা জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈরিতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কোনও সংবাদদাতা নিজ স্বার্থে মিথ্যা খবর প্রচার করে, হয় নিজের সমাজ বা জাতিকে বড় করে, নয়তো বিপক্ষ জাতি বা সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তদ্দ্বারা সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশা করে। স্পষ্টতঃ, উভয় ক্ষেত্রেই লাভ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে সে এরূপ করে থাকে। আর এক-প্রকারের মিথ্যা সংবাদদাতা হতে পারে, যে কোনও সমাজ বা শ্রেণীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকার দরুন তাদের প্রতি অনুরক্ত, কিংবা কোন অপ্রিয় ব্যাপারের জন্য তাদের প্রতি সে বিরূপ। এও প্রথমোক্ত সংবাদদাতার সমপর্যায়ভুক্ত, কারণ তার কার্যও ব্যক্তিগত অনুরাগ ও বিদ্বেষ প্রসূত। আর একজন হয়তো এমন ইতর প্রকৃতির যে লাভের আশায় সে মিথ্যা সংবাদ দেয় এবং নীচ প্রকৃতি ও চারিত্রিক বিকারের জন্য তার অন্যথা সে করতে পারে না। আবার কেউ অজ্ঞতার দরুনও পূর্ব-কথিত কাহিনীর উপর অন্ধের মত নির্ভর করে অসত্য বিবরণ দিতে পারে।

এই ধরনের সংবাদদাতার সংখ্যা বাড়তে থাকলে, কিংবা একদল আর একদলকে অনুসরণ করে চলতে থাকলে কালক্রমে প্রথম সংবাদদাতা ও তার অনুসারীরা শ্রোতা ও আদি মিথ্যা কথকের মধ্যেকার একমাত্র যোগসূত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই যোগসূত্রটি যদি ছিন্ন করে দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের উপরি-উল্লিখিত মিথ্যুকদের মধ্যে সেই আদি মিথ্যুকটিই থেকে যায়।

যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিহার করে সর্বদা সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে, একমাত্র সেই-ই প্রশংসাভাজন। অন্যদের তো কথাই নাই, মিথ্যুকদের কাছেও সে শ্রদ্ধেয়।

৩. কুরআনে উক্ত হয়েছে 'সত্য বল, তোমার নিজের বিরুদ্ধে হলেও।' বাইবেল-এ মসীহ্ (যীশু) এইরূপ উক্তি করেছেন: 'রাজাদের সম্মুখে সত্য কথনে, তাদের শক্তিকে ভয় করো না: তাদের ক্ষমতা কেবল তোমার দেহের উপর; তোমার আত্মার উপর তাদের কোনও অধিকার নাই।' এখানে তিনি প্রকৃত সাহসী বা দৃঢ়চেতা হতে নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা, জনসাধারণ যাকে বীরত্ব মনে করে, যেমন নিঃসংকোচে সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া কিংবা নিশ্চিত মৃত্যুর আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়া,—তা সাহসের একটি উপশ্রেণী মাত্র। সকল শ্রেণীর ঊর্ধ্বে, আসল বীরত্ব হচ্ছে মৃত্যুকে অবজ্ঞা করা, তা সে বাক্যেই হোক আর কর্মেই হোক।

ন্যায়নিষ্ঠা যেমন নিজগুণেই মানুষের প্রিয় ও তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের জন্য সকলেরই কাম্য, সত্যবাদিতাও তেমন। যারা সত্যের মাধুর্যের স্বাদ পায়নি, তার প্রকৃত পরিচয় না পেয়ে তাকে সজ্ঞানে পরিহার করেছে, কেবল তাদের ক্ষেত্রেই হয়তো এ কথা বলা চলে না। যেমন একজন বিখ্যাত মিথ্যুককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোনকালে সে সত্য কথা বলেছে কি-না। উত্তরে সে বলেছিল—' সত্য কথাকে যদি ভয় না করতাম তাহলে বলতাম,—না।" মিথ্যুক সর্বদাই ন্যায় বিচারকে এড়িয়ে চলবে; স্বেচ্ছায় সে উৎপীড়ন, মিথ্যা সাক্ষ্য, বিশ্বাসহানি, গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ পরস্বার্থাপহরণ ইত্যাদি, জগৎ ও মানুষের যাবতীয় অনিষ্টকর কার্যের সমর্থন করবে।

একবার আমি মাননীয় আবু সহল আবদুল মু'নি'ম বিন আলি বিন নূহ্ তিফলিসির (আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমতাসম্পন্ন করুন) সাথে আলাপ করছিলাম, তখন লক্ষ্য করলাম যে তিনি মু'তাজিলাদের সম্বন্ধে লিখিত একটি পুস্তক রচয়িতার মু'তাজিলাদের নীতিকে বিকৃত করে উপস্থাপিত করার অভ্যাসকে নিন্দা করছেন। তাদের একটি মত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ স্বয়ংজ্ঞানী। এই সূত্রটিকে গ্রন্থকার এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যেন তার সারমর্ম দাঁড়ায়, আল্লাহ্‌র কোন জ্ঞান নাই। এ-রকম ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি অশিক্ষিত লোকের মনে ধারণা জন্মাবার চেষ্টা করলেন যে, মু'তাজিলারা আল্লাহ্‌কে জ্ঞানহীন মনে করে। আল্লাহ্ তার বহু ঊর্ধ্বে, এরূপ অযোগ্য বর্ণনার স্পর্শাতীত। আমি তখন মান্যবর আবু সহল্‌কে জানালাম যে, যারাই বিপক্ষ বা ভিন্ন-
৪. মতাবলম্বীদের বর্ণনা দিতে গিয়েছে তাদের প্রায় সবাই ঐ রীতি অনুসরণ

করেছে। একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণে এরূপ করলে তেমন ক্ষতি হয় না। কেননা নৈকট্য ও মেলামেশার ফলে সে সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ হতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম, যার মূলনীতি বা খুঁটিনাটির সঙ্গে কিছুরেই মিল নাই তার প্রকৃত তথ্য এরূপ মিথ্যা বা বিকৃত বিবরণের আড়ালেই থেকে যায়, দূরত্বের দরুন তার আসল পরিচয় পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। বর্তমানে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন দর্শন, ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ ও পুস্তক আছে তার সবগুলোতেই ত্রুটি বিদ্যমান। যে গ্রন্থকার অন্য ধর্মের আসল তথ্য সংগ্রহে যত্নবান নয়, সে এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ রচনা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যে সংবাদ আহরণ করবে তা, না সেই ধর্মাবলম্বীদের কাজে লাগবে, না অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের মনঃপূত হবে। গ্রন্থকার সজ্জন ব্যক্তি হলে সে তাতে কেবল নিজ ভ্রমোপলব্ধিজনিত লজ্জা-ই পাবে, আর অসৎ ব্যক্তি হলে নিজ অজ্ঞতাকে সমর্থন করার চেষ্টায় কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা ও তর্ক করতে থাকবে। অন্যপক্ষে, গ্রন্থকার যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবগত থাকে তাহলে ঐ সব সম্প্রদায়ের কিংবদন্তী ও গালগল্প থেকে তাদের প্রকৃত বিশ্বাস ও রীতিনীতি উদ্ধার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, লোকমুখে সে চিত্তাকর্ষক কাহিনীগুলো শুনে যাবে বটে, কিন্তু তাকে সত্য বা নির্ভরযোগ্য বলে অনুমান করার কথা কখনও তার মনে উদয় হবে না।

এই আলোচনায়, দৃষ্টান্তস্থলে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও রীতির কথা উঠল। আমি বললাম, এ বিষয়ে পুস্তকাকারে আজ পর্যন্ত যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার প্রায় সবই দ্বিতীয় স্তরের সংবাদ, নকলের নকল, তাতে না আছে কোন সামঞ্জস্য, না আছে বিচার-বিশ্লেষণের সামান্যতম চেষ্টা। এই সব লেখকের মধ্যে কেবল একজন ছাড়া আমি এমন কাউকে দেখিনি যে নিরপেক্ষভাবে, তৈলমিশ্রণ না করে শুধু নির্ভেজাল বিবরণ দিতে চেয়েছে। সে ব্যতিক্রম হচ্ছেন আবুল 'আব্বাস ইরান্‌ সহ্‌রী। প্রচলিত কোন ধর্মনীতি তিনি অনুসরণ করতেন না, তিনি নিজেরই উদ্ভাবিত এক ধর্মে বিশ্বাস করতেন এবং তাই প্রচার করতেন। ইহুদি ও খ্রীস্টানদের ধর্মনীতি, তোরাহ্‌ (Torah) ও ইঞ্জিল
৫. (Evangel)-এর যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা খুবই মূল্যবান। Manichaean ও তাদের গ্রন্থোক্ত অধুনালুপ্ত প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসগুলোরও তিনি অত্যন্ত বিশদ ও প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন, অথচ, হিন্দু ও সামানি (শ্রমণ) বৌদ্ধদের বর্ণনায় এসে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছেন। কারণ, শেষের দিকে আলস্য বশতঃ তিনি Zorquan-এর পুস্তক নির্ভর করে তার বিবরণ নিজ রচনায় উদ্ধৃত করেছেন।

Zorquan-এর পুস্তক থেকে যা নকল করা হয়নি তা তিনি নিজে এই দুই সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত লোকদের মুখে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিছুকাল পরে ইরান সহুরীর এই রচনাটি শ্রদ্ধের আবু সহল নিজে পড়ে দেখে যখন আমার মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করলেন, তিনি তখন আমাকে হিন্দুদের বিষয়ে যা জানি তা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করতে প্রলুব্ধ করলেন, যাতে হিন্দুদের সঙ্গে তর্কাভিলাষীদের তাতে সাহায্য হয় এবং যারা তাদের সাথে মেলামেশা করতে ইচ্ছুক তারাও যেন প্রয়োজনীয় তথ্যের সংগ্রহ হিসাবে পুস্তকটি ব্যবহার করতে পারে। ওঁর এই অনুরোধক্রমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার লব্ধ-জ্ঞান এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করলাম। প্রতিপক্ষ হিসাবে বিদ্বেষ প্রযুক্ত হয়ে তাদের যেমন কুৎসা আমি করি নি, তেমনি বিবরণের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য তাদের নিজস্ব কাহিনীগুলো উদ্ধৃত করতেও আমি সংকোচ বোধ করিনি। সে কাহিনীগুলো ইসলাম ধর্মের বিপরীত মনে হলে ও সত্যধর্মীদের কানে আপত্তিকর ঠেকলে কেবল এই কথা মনে রাখা উচিত যে, সে সব হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের কথা এবং তার সত্যাসত্য ওরাই বোঝে ভাল।

এ রচনাটি তর্ক বা বাদানুবাদের পুস্তক নয়। প্রতিপক্ষের যুক্তি ও প্রমাণাদির ভ্রান্তি দেখানোর উদ্দেশ্যে আমি সে সবের উল্লেখ করিনি। আমার এ রচনাটি নিতান্ত বর্ণনামূলক। আমি হিন্দুদের রীতিনীতির যথাযথ বর্ণনা দেব এবং প্রসঙ্গক্রমে ইউনানীদের অনুরূপ রীতিনীতিরও উল্লেখ করব, যাতে ইউনান ও ভারতবর্ষের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝান যায়। কেননা, সত্যানুসন্ধী হওয়া সত্ত্বেও ইউনানী দার্শনিকরা ধর্মতত্ত্ব ও আইন-কানুনের ব্যাপারে অশিক্ষিত জনসাধারণের মত স্থূল ব্যাখ্যার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। আলোচনা প্রসঙ্গে একমাত্র সুফী কিংবা খৃষ্টান সম্প্রদায় বিশেষের চিন্তারীতি ছাড়া অন্য আর
৬০ কারো উল্লেখ আমি করব না, কেননা আত্মার পরিভ্রমণ (Transmigration) ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ভারতীয়দের সঙ্গে এদের অনেকটা মিল আছে।

ইতিপূর্বে আমি দুইটি ভারতীয় পুস্তকের আরবী তর্জমা করেছি। তার একটি সৃষ্টিতত্ত্ব ও বস্তুজগতের বর্ণনার বিষয়ে, নাম 'সাংখ্য', অপরটি দেহবন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে, যার নাম 'পাতঞ্জল'। এই পুস্তিকা দুটিতে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের অধিকাংশ সূত্র পাওয়া যাবে, কেবল ওদের শাস্ত্রবিধির নিয়মগুলো তাতে নেই। আশা করি, বর্তমান পুস্তকটি আমার পূর্বরচিত পুস্তিকাদ্বয়ের স্থান গ্রহণ করবে এবং এই বিষয়ে অন্য পুস্তক পাঠের প্রয়োজনও মেটাতে পারবে এবং ঈশ্বরানুকূল্যে বিষয়টির স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পাঠককে সাহায্য করবে।

অধ্যায়—১

উপক্রমণিকা—ভারতীয়দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১০. ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে বোঝার পথে আমাদের কি অন্তরায় আছে তা প্রথমে জেনে রাখা উচিত। তাতে আমাদের আলোচনা যেমন সহজ হবে, তেমনি তার দোষত্রুটির কারণও বোঝা যাবে।

ঘনিষ্ঠতা থাকলে যা সহজবোধ্য হয় হিন্দুদের দূরত্বের দরুন তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ দূরত্বের কারণ অনেক। যে সব ব্যাপারে অন্য জাতিদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে তার প্রত্যেকটিতেই হিন্দুর থেকে আলাদা। প্রথম হল ভাষা, যদিও ভাষার পার্থক্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে থাকেই। ভাষার এই দূরত্ব অতিক্রম করা কারোর পক্ষে সহজ নয়। কারণ, শব্দসম্ভার ও শব্দরূপের বৈচিত্র্যে এ ভাষার গভীরতা ও বিস্তার বিপুল। আরবীর মত একটি বস্তুকে বহু মৌলিক ও তদ্ভব শব্দে প্রকাশ করা হয়, আবার একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়, যার জন্য গুণবাচক বিশেষণের সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে হয়। বাক্যের অর্থ না ধরতে পারলে এসব শব্দের পার্থক্য বোঝা যায় না। অন্য জাতিদের সঙ্গে তাদের এই ভাষার পার্থক্যের জন্য এরা আবার গর্ববোধ করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে ভাষার একটি ত্রুটি। এ ভাষার আবার দুইটি রূপ। একটি, সাধারণের মধ্যে অতি প্রচলিত কথ্যরূপ, অন্যটি সম্ভ্রান্ত, যা শব্দরূপ ও তদ্ভব প্রভৃতিতে ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং উচ্চবর্ণের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই যার ব্যবহার হয়। এ ভাষা এমন সব ব্যঞ্জন বর্ণ নিয়ে তৈরী যার কোন কোন ধ্বনির সঙ্গে আরবী ফার্সীর মিল ত' নাই-ই; সাদৃশ্যও নাই, এমনকি আমাদের জিহ্বা ও কণ্ঠনালী সে ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে না, আমাদের কান সেসব ধ্বনির তারতম্য ধরতেও পারে না এবং আমাদের বর্ণমালায় সে অক্ষর ও ধ্বনির প্রতিরূপ লিখতেও আমরা পারি না। সেজন্য তাদের ভাষার কোন কিছুকে আমাদের বর্ণমালায় প্রকাশ করা কঠিন, কারণ আমাদের ভাষায় সে শব্দের উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য আমাদের আরবীয় নোক্তা ও অন্যান্য

চিহ্নগুলোকে প্রয়োজন মত বদলে নিতে হয়। এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে, নয়ত নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে সে সব শব্দকে আরবী (Declension)
১৪. অভিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়। উপরন্তু এদের লিপিকাররা অত্যন্ত অসাবধান, পাঠ মিলিয়ে শুদ্ধ নকল করতে যত্ন নেয় না। তার ফলে, একটি বা দু'টি নকলের পরেই গ্রন্থকারের গবেষণা পন্ডশ্রমে পরিণত হয়, কারণ, পুস্তকটি তখন এত অশুদ্ধিতে ভরে ওঠে আর পাঠ এত বিকৃত হয়ে যায় যে দেশী বা বিদেশী কেহই তার অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। পাঠকের এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, বহুবার আমরা ওদের মুখ থেকে শোনা শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে লিখে নিয়েও দেখেছি যে সে শব্দের পুনরাবৃত্তি শুনে তাকে চিনতে এদের বেশ বেগ পেতে হয়। অন্যান্য আরবেতর ভাষার মত ওদের ভাষাতেও দুই বা তিনটি হলন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ পর পর বসতে পারে, যে রকম ব্যঞ্জন বর্ণকে আমাদের ভাষায় "প্রচ্ছন্ন স্বর-বর্ণযুক্ত" মনে করা হয়। এদের ভাষার বেশীর ভাগ শব্দ ও নাম এ-রকম হলন্ত বর্ণ দিয়ে আরম্ভ হয় বলে আমাদের পক্ষে সেগুলো উচ্চারণ করা কঠিন হয়ে উঠে।

যাতে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের তথ্যগুলো অবিকৃতভাবে কোনরূপ প্রক্ষেপণ বা পরিবর্তন ব্যতিরেকে রক্ষিত হতে পারে, সেজন্য এদের পুস্তকগুলোর সবই বিভিন্ন ছন্দে ও পদ্যে রচিত, কারণ মুখস্থ রাখার জন্য পদ্য সহজ এবং লিখিত গ্রন্থের চেয়ে হিন্দুরা শ্রুতির উপরই বেশী আস্থাশীল। অথচ, পদ্য যে কৃত্রিমতা বা অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত নয় সে তো জানা কথা; ছন্দ ও মিল ঠিক রাখার জন্য তাতে কিছুটা জোড়াতালির প্রয়োজন হয় যার দরুন বাক্যাড়ম্বর বেড়ে যায়। এদের ভাষায় একই অর্থে বিভিন্ন শব্দ বা বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ ব্যবহারের এও একটি কারণ। ভাষার দুরূহ-তার জন্য এদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে কত শক্ত এর থেকেই বোঝা যাবে।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে ধর্ম চিন্তা ও আচরণে এরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওদের মধ্যে যা আছে তার কোনটাই আমাদের মধ্যে নেই, আর আমাদের মধ্যে যা আছে তারও কিছুই ওদের মধ্যে নেই। যেমন এদের নিজেদের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব ও আচরণ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ বেশী হয় না, হলেও তর্ক ও বাদপ্রতিবাদ ছাড়া সে মতানৈক্য কখনই ধনপ্রাণ হানিকর মারামারিতে পরিণত হয় না। তেমনি আবার বর্তমান যুগে যারা চলনে

ঐদের থেকে ভিন্ন, তাদের সঙ্গে হিন্দুদের কোন প্রীতি নেই। তাদিকে ওরা 'ম্লেচ্ছ' (ملچ) অর্থাৎ আবর্জনা বলে; তাদের সঙ্গে বিবাহ ও বসা-ওঠা, পানাহার ইত্যাদি কোন প্রকারের ঘনিষ্ঠতা করা কলুষ
১৫. স্পর্শ করার মত এদের পক্ষে নিষিদ্ধ। 'ম্লেচ্ছ'দের জল ও অগ্নিবাঁরা স্পৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুই এরা অশুচি মনে করে, অথচ জীবনযাত্রার জন্য এ দুটি দ্রব্য অপরিহার্য। কোন বস্তু অপবিত্র হলে তাকে যেমন শোধন করে পুনরায় পবিত্র করা যায় সে রকম শোধন করতেও এরা নারাজ। ফলে, যে এদের অন্তর্ভুক্ত নয় তাকে এরা কখনই নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না, সে যতই এদের ধর্মের প্রতি অনুরাগী হোক না কেন? ভারত-বর্ষীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতা করার এ হল আর একটি বড় অন্তরায় যার দরুন ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

আমাদের সঙ্গে রীতিনীতির এত তফাৎ যে আমাদের নাম শুনিয়ে আমাদের পোশাক পরিয়ে, আমাদের চেহারার নকল করে এরা শিশুদের ভয় দেখায়; আমাদেরকে এরা দৈত্যের সৃষ্টি বলে মনে করে, যার সবকিছু মানবীয় রুচি স্বভাবের বিপরীত। যদিও, আমাদের স্বীকার করা উচিত যে ভিন্ন জাতিকে ঘৃণা করার অভ্যাস আমাদের মধ্যেও আছে, এবং অন্যান্য জাতের মধ্যেও দেখা যায়। আমি এদের একজনের সম্বন্ধে শুনেছি, যে আমাদের (মুসলমানদের) উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল, কারণ এদের এক রাজা আমাদের দেশ থেকে অভিযাত্রী এক রাজার হাতে নিহত হয়েছিল। মৃত্যুর পরে নিহত রাজার এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, যে সাগর নামে পরে সিংহাসন আরোহণ করে। বয়োপ্রাপ্ত হলে সাগর তার পিতার কথা জিজ্ঞাস করলে তার মাতা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে; তা শুনে সাগর ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুর দেশ আক্রমণ করে এবং শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত শত্রু হত্যা করে প্রতিহিংসা পিপাসা মেটাতে থাকে। অবশেষে যারা প্রাণভিক্ষা পেল তাদিগকে চূড়ান্ত-ভাবে অপমান করার জন্য আমাদের (মুসলমানদের) মত পোশাক পরবার আদেশ দেওয়া হল। এ কাহিনী যখন আমি শুনলাম তখন সাগরের এ কার্যকে অভিনন্দিত করলাম, কারণ সে আমাদিগকে অন্ততঃ হিন্দু হয়ে যেতে বা হিন্দু আচার গ্রহণ করতে বাধ্য করেনি।

বিদেশীদের প্রতি এদের ঘৃণা ও আক্রোশ বৃদ্ধি হবার আর একটি কারণ হচ্ছে 'সামানি' (শ্রমণ) নামিত সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদের গভীর শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় এরা হিন্দুদের নিকটতম

সম্প্রদায়। অতীতে খুরাসান, পারস্য (ফারস), ইরাক, মোসুল থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে শ্রমণদের ধর্ম প্রচলিত ছিল। তারপর আজরবাইজান থেকে জরথুস্ত্র (Zarathustra) বলখে তাঁর Magian ধর্ম প্রচারণা আরম্ভ করেন। Gushtasp সে ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর পুত্র, ইসফান্দিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোতে, কোথাও বলপূর্বক, কোথাও বা শান্তিপূর্ণভাবে সে
১৬. ধর্ম প্রসারে সচেষ্ট হন। এইভাবে চীন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশে তিনি অগ্নি মন্দির স্থাপন করেন। এর পরবর্তী রাজারা পারস্য ও ইরাককেও তাদের ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তার ফলে শ্রমণরা সে দেশগুলো থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বলখের (বাহ্লীক) পূর্ব প্রান্তে এসে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে Magian-রা ভারতভূমিতে আছে; তাদেরকে মগ বলা হয়।

এসব কারণেই ইসলামের অভ্যুত্থান ও পারসিক রাজ্যাবসান পর্যন্ত হিন্দুদের মনে খুরাসান দেশ ও তৎসংশ্লিষ্ট জাতি ও ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ জমা হতে থাকে। মুহম্মদ বিন্ কাসিম অল্-মুনাব্বিহ্, শিস্তানের মধ্য দিয়ে সিন্ধু দেশে প্রবেশ করার ফলে ভারতবর্ষে যে আক্রমণ শুরু হ'ল তার দরুন এই বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পেল। সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণাবাদ ও মূলস্থান জয় করে সে নগরগুলোর যথাক্রমে 'মানশুরা' ও 'মামুরা' নামকরণ ক'রে মুহম্মদ বিন্ কাসিম ভারতবর্ষের কনৌজ নগরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং কান্দাহার (গান্ধার) দেশের সৈন্য নিয়ে কাশ্মীরের প্রান্তদেশ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। কোথাও যুদ্ধ করে, কোথাও সন্ধি দ্বারা তিনি অভিষ্ট সিদ্ধ করেন এবং যারা ধর্ম পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক তাদের ছাড়া অন্য সকলকে নিজ নিজ ধর্ম আচরণে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এইসব ঘটনা হিন্দুদের অন্তরে অপরিসীম ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক করল।

তারপর সামানি রাজবংশের সময় গজনীতে তুর্কীদের ক্ষমতালাভ ও নাসিরুদ্দিন ও সবুক্তগীনের রাজ্যলাভ পর্যন্ত কাবুলের সীমান্ত ও সিন্ধুনদ পেরিয়ে আর কেউ এদের দেশে যুদ্ধাভিযান করে নি। সবুক্তগীন ধর্মযুদ্ধের পথ অবলম্বন করলেন এবং গাজী উপাধি গ্রহণ করে ভারতবর্ষের সীমান্ত ভেদ করার উদ্দেশ্যে স্বীয় উত্তরাধিকারের জন্য রাস্তা তৈরী করলেন, যে রাস্তা ধরে ইয়ামিনুদ্দৌলাহ্ মহ্মুদ্ (উভয়কে আল্লা ক্ষমা করুন) তিরিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল ধরে অভিযান চালিয়ে হিন্দুদের শস্যশ্যামল অঞ্চলগুলোকে মরু-ভূমিতে পরিণত করে দিলেন; এবং এমন সব আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখালেন যার ফলে হিন্দুরা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতন চতুর্দিকে উড়ে গেল এবং ওদের

কীর্তি কাহিনীর সবই বিস্মৃত রূপকথায় পরিণত হয়ে গেল। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অবশিষ্ট রইল তাদের মনে মুসলমানদের প্রতি নিদারুণ আক্রোশ ও বিতৃষ্ণা বদ্ধমূল হয়ে রয়ে গেল। বস্তুতঃ এই জন্যই ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিজিত অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে কাশ্মীর ও বানারসীর মতন এমন সব স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে যেখানে আমাদের হাত পৌঁছায় না, আর যেখানে বিদেশীদের প্রতি ওদের পূর্বতন বিদ্বেষ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে আরও গভীরতর হচ্ছে।

১৭. এছাড়া আরো কারণ আছে, যা বলতে গেলে কুৎসার মত শোনাবে কিন্তু তা আসলে ওদের জাতীয় চরিত্রের একটি সর্বজনবিদিত বৈশিষ্ট ; আর নির্বুদ্ধিতা এমন রোগ যার কোন ঔষধ নাই। এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : এরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তাদের দেশই শ্রেষ্ঠ, মানব জাতির মধ্যে একমাত্র তারাই সর্বোত্তম, রাজাদের মধ্যে একমাত্র তাদের রাজারাই সর্বশ্রেষ্ঠ, ধর্মের মধ্যে তাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। মূর্খের মত নিজেকে বড় ঘোষণা করে নিজেকে জাহির করে ওরা পরম পরিতৃপ্ত। জ্ঞান বিতরণে কার্পণ্য করা ওদের স্বভাব। ওদেরই মধ্যে যাদেরকে ওরা শিক্ষার অধিকারী মনে করে না তাদের থেকে জ্ঞানকে ওরা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে রক্ষা করে। এ অবস্থায় বিদেশীর কাছ থেকে সে জ্ঞান কত বেশী পরিমাণ ওরা রক্ষা করে থাকে তা সহজেই অনুমেয়। ওদের বিশ্বাস, ওদের দেশ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন দেশ নাই ; ওরা ছাড়া আর কোন মনুষ্য জাতি নাই এবং সৃষ্টজীবদের মধ্যে ওরা ছাড়া আর কারোরই কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান নাই। ফলে, যদি খুরাসান বা পারস্যের কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বিজ্ঞানের কথা ওদের কাছে বলে তাহলে ওরা তার কথায় বিশ্বাস করে না, নিজ অহমিকার বশে ওরা তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। হিন্দুরা যদি বিদেশ ভ্রমণ করত এবং অন্য দেশের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত তাহলে ওদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা দূর হত। ওদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু এরূপ কূপমণ্ডূক ছিল না। ওদেরই একজন পণ্ডিত, বরাহমিহির ব্রাহ্মণকে সম্মান করার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—ইউনানীরা অশুচি ও অস্পৃশ্য হলেও জ্ঞান সাধনায় কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে বলে যখন সম্মানের অধিকারী তখন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আমরা কি বলতে পারি, যে কুলগৌরবের সাথে জ্ঞানগৌরবেরও অধিকারী হয়।' ওদের পূর্বপুরুষরা এও স্বীকার করত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউনানীদের কৃতিত্ব আরও গুরুত্বপূর্ণ। অন্য লোককে মর্যাদা দেবার

কথাপ্রসঙ্গে বরাহমিহির ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তার থেকেই কিছু বোঝা যাবে আত্মস্তুতি করা এদের কিরকম স্বভাব। এদের জ্যোতিষীদের কাছে প্রথম প্রথম আমি শিক্ষার্থী ছাত্রের মত থাকতাম, কারণ এদের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত অল্প ছিল। কিন্তু কিছুটা শিক্ষা করার পর
১৮· আমি ওদের জ্যোতিষের মৌলিক নীতিগুলো বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলাম এবং যুক্তি প্রমাণ ও গণিতের মূল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে লাগলাম। তখন তারা আশ্চর্য হয়ে আমাকে ঘিরে আমার কাছে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল এবং প্রশ্ন করতে লাগল, ভারতবর্ষের কোন্ পণ্ডিতের কাছে আমি এসব শিক্ষা করেছি ? আমি কিন্তু তাদের জ্ঞানের পরিমাণ তখন বুঝে নিয়েছি, তাই নিজেকে ওদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে হল এবং ওদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার প্রবৃত্তি হল না। ওরা আমাকে প্রায় অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মনে করতে আরম্ভ করেছিল এবং ওদের পণ্ডিতদের সমক্ষে আমার বিদ্যা ও বুদ্ধিকে ওদের নিজ ভাষায় সাগরের উপমা দিয়ে বর্ণনা করত।

এই তো অবস্থা। এদেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংগ্রহ করার আগ্রহ এ যুগে আমার মত আর কারুর দেখছি না। যেখানেই এদের বইপুস্তক পাওয়ার সম্ভাবনা মনে করেছি সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করতে এবং সেসব পুস্তক ব্যাখ্যা করতে পারে তেমন পণ্ডিতদের সাহায্য পেতে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে আমি কার্পণ্য করিনি। তবুও, হিন্দুদেরকে সম্যকভাবে বোঝা আমারই পক্ষে খুব কষ্টকর হয়েছে, অন্য কারুর তো কথাই নাই, যদি না আল্লার অনুগ্রহ তাকে ইচ্ছামত ভ্রমণের স্বাধীনতা দেয়, যে স্বাধীনতা আমার অদৃষ্টে ছিল না; কারণ কোন কাজই আমার ইচ্ছা বা সুবিধামত সম্পন্ন করার সুযোগ ও ক্ষমতা আমার ছিল না। তবুও আল্লাহ্ আমার জন্য যা সম্ভব করেছেন তার জন্য আমিও তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

খ্রীস্টধর্ম উদ্ভবের আগে প্রাচীন ইউনানীরাও ধর্মবিশ্বাসে ভারতীয় হিন্দুদের মতই ছিল। ওদের শিক্ষিত অভিজাতদের দৃষ্টিভংগী ছিল ভারতের অভিজাতদের মতই; ভারতীয় জনসাধারণের মত ইউনানী জনসাধারণও ছিল মূর্তি উপাসক। এই দুই জাতির গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে এদের চিন্তারীতি পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখাব। ভারতীয় চিন্তারীতির ভুল প্রমাণ বা সংশোধন করার উদ্দেশ্য আমার নয়, কারণ যা সত্য নয় তার সংশোধন বৃথা, এবং ইউনানীই হোক আর ভারতীয়ই হোক, সবরকম অসত্যই একই সত্য ধর্মের ব্যতিক্রম। কিন্তু ইউনানীরা দর্শন শাস্ত্রে খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছিল।

তাদের দার্শনিকরা বিজ্ঞানের যে মূল তত্ত্বগুলো নির্ণয় করেছিল তা বিশিষ্ট লোকদের জন্য, জনসাধারণের জন্য নয়, কারণ যারা বিশিষ্ট তারা যুক্তি ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করে আর জনসাধারণের স্বভাব হল যে শাস্তির ভয়ে নিরস্ত না হওয়া পর্যন্ত অযথা বাদবিসংবাদ করার দিকে অশ্বের মত ধাবিত হওয়া। তার একটি নজির সক্রেটিস্ নিজে। তিনি যখন জনসাধারণের
১১. মতের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং গ্রহ নক্ষত্রকে ওদের ভাষায় ভগবান বলতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এথেন্সের বারোজন বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে এগারো জনই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতে একমত হয়েছিল। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রেটিসের মৃত্যু হয়েছিল। ভারতবর্ষে এইরূপ দার্শনিকের মত কোন লোক জন্মায়নি যার দরুন জ্ঞানের তেমন উৎকর্ষ সাধন হতে পারত। সেজন্য তুমি দেখতে পাবে এদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো অত্যন্ত অসংলগ্ন অবস্থায় আছে এবং অজ্ঞ জনসাধারণের অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছে; যেমন বিরাট বিরাট সংখ্যার ব্যবহার, অসম্ভব দীর্ঘকালের অনুমান ও শিশুসুলভ নানা রকমের ধারণা ও ধর্ম বিশ্বাস, যার প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধ মন্তব্য ওরা সহ্য করে না। এই সব কারণে অন্ধ অনুসরণ ও পুনরাবৃত্তি করার স্বভাব ওদেরকে পেয়ে বসেছে। এদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাই আমি বলি যে, এদের অংকশাস্ত্র ও জ্ঞান-সাধন-পদ্ধতিকে কর্দমাক্ত যুক্তি, গোময় মাখান মুক্তা অথবা অতি সাধারণ পাথরের টুকরার মধ্যে বহুমূল্য রত্নের সংগেই একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে। এই দুই প্রকার বস্তুই ওদের কাছে সমান মূল্যবান, কেননা, সাক্ষ্য প্রমাণের পথ ধরে অগ্রসর হবে, হিন্দুদের মধ্যে তেমন দৃষ্টান্ত নাই।

আমরা এ আলোচনায় কোনও মন্তব্য না করে ওদের নিজেদের কথা-ই কেবল বর্ণনা করে যাব। ওদের ভাষায় যেসব নাম বা সংজ্ঞার ব্যবহার আমার আলোচনার জন্য অপরিহার্য, তার উল্লেখ আমি একবারই করেছি। যেসব তদ্ভব শব্দের অর্থ আরবীতে প্রকাশ করা যায় তার জন্য আমি আরবী শব্দই ব্যবহার করেছি, কিন্তু যেখানে ব্যবহারের দিক দিয়ে ভারতীয় শব্দটি সহজতর, সেক্ষেত্রে উচ্চারণ যথাসম্ভব আক্ষরিকভাবে অবিকৃত রেখে আমি সেই শব্দটি ব্যবহার করেছি; কিংবা যদি শব্দটি তদ্ভব অথচ সুপ্রচলিত হয়, আমাদের ভাষায় তার সুবিদিত প্রতিশব্দ থাকলেও আমি ভারতীয় শব্দটিই সেখানে ব্যবহার করেছি, অবশ্য আরবীতে তার ব্যাখ্যা করার পর, কারণ এভাবে আলোচনা সহজ হয়। পরিশেষে আর একটি কথা বলা উচিত। জ্যামিতিকদের

নিয়মে যেমন পূর্ববর্ণিতব্যটির উল্লেখ না করে পরবর্তী বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায় না, আমার এ নিবন্ধে সে নিয়ম পালন করা সম্ভব হবে না, কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে এমন এক-আধটি নূতন বিষয়ের উল্লেখ করতে হবে যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। আল্লাহ্ আমার সহায় হউন।

অধ্যায়—২

ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশ্বাস

২০. সবজাতির মধ্যেই জনসাধারণ ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। কারণ মার্জিত বুদ্ধি লোকের স্বভাব হল বিচার বিশ্লেষণ করা এবং তার দ্বারা মৌলিক নীতি আবিষ্কার করা; আর সাধারণ লোক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাইরে যেতে চায় না, উৎপন্ন বিধান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, খুঁটিয়ে দেখার উৎসাহ পায় না, বিশেষ করে সেই সব ব্যাপারে যেখানে মতামত ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধে।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশ্বাস এই যে, তিনি এক, চিরন্তন, অনাদি, অনন্ত, স্বাধীন, সর্বশক্তিমান, সমস্ত জ্ঞানের আকর, চিরজীব, প্রাণদাতা, সর্বনিয়ন্তা ও সৃষ্টিপালক; তিনি সমস্ত সাদৃশ্য বা বৈপরীত্যের অতীত, তার শক্তির তুলনা তিনিই; কিছুই তাঁর মত নয়, তিনিও কোন কিছুর মত নন।

ওদের বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার এই উক্তি যাতে নিতান্ত জনশ্রুতি বলে মনে না হয়, সেজন্য এ বিষয়ে ওদের গ্রন্থাদি থেকে কিছু উদ্ধৃত করব।

পাতঞ্জল গ্রন্থে শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে : যাঁর উপাসনায় পরমানন্দ লাভ হয় সেই উপাস্য কে ?

গুরু বলছেন : তিনি সেই আদি ও অদ্বিতীয় পুরুষ যিনি এমন কোন কর্মের অপেক্ষা রাখেন না যার প্রতিফল স্বরূপ মানুষকে তার পরম কাম্য, শান্তি বা চরম ভীতির আকর, দুঃখ-কষ্ট দিতে পারেন। সমস্ত বৈসাদৃশ্য ও উপমার অতীত বলে তিনি সমস্ত চিন্তারও অতীত। চিরন্তন জ্ঞান তাঁর গুণ। জ্ঞান লাভ করার অর্থ, যা অজ্ঞাত ছিল তাকে জানা, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি এক মুহূর্তের জন্যও অজ্ঞতা আরোপ করা যায় না।

শিষ্য আবার প্রশ্ন করে : যা বললেন তা ছাড়া তাঁর আর কি কি গুণ আছে ? গুরু তার উত্তরে বলেন : স্বয়ংভূশক্তিতে তিনি সবার ঊর্ধ্বে; স্থানকালের প্রয়োজন থেকে তিনি মুক্ত। যাকে সমস্ত বস্তু একান্তভাবে কামনা করে তিনি সেই পরম কল্যাণ। তিনি ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা বিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান।

শিষ্য প্রশ্ন করে : তাঁকে বাকশক্তির অধিকারী মনে করেন কি না ? উত্তরদাতা বলছেন : যেহেতু তিনি সর্বগুণী, সেহেতু তাঁর বাক্য গুণ আছেই।

২১. শিষ্য আবার প্রশ্ন করে : জ্ঞান আছে বলেই যদি তিনি সবাক, তাহলে তার আর জ্ঞানী পন্ডিতদের মধ্যে কী তফাৎ, যারা তাদের জ্ঞাত তথ্যের সংবাদ বাক্যে প্রকাশ করেন ?

গুরু জবাব দেন : তফাৎ হচ্ছে কালের। জ্ঞানহীন ও নির্বাক থাকার পর পরবর্তীকালে তাদের সংগৃহীত জ্ঞানের তথ্য পন্ডিতরা অন্যদের কাছে বাক্যে প্রকাশ করেছেন, কাজেই তাদের জ্ঞান সংগ্রহ ও কথায় তার প্রকাশ নির্দিষ্ট-কালের পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে কাল বা সময়ের কোন যোগ নাই সেহেতু ঈশ্বর চিরকালই সর্বজ্ঞানী ও সবাক। তিনিই ব্রহ্মা ও অন্যান্য আদি পুরুষের সাথে নানাভাবে কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কাউকে তিনি গ্রন্থদান করেছেন, তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য কাউকে বা তিনি দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, আবার কাউকে তিনি ধ্যান ও চিন্তার দ্বারা তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার প্রেরণা দিয়েছেন।

প্রশ্নকারী বলল : এ জ্ঞান তাঁর কোথা থেকে আসে ?

উত্তর : তাঁর পূর্ব জ্ঞান অনন্তকাল ধরেই আছে এবং যেহেতু এক মুহূর্ত'ও তিনি অজ্ঞানী নন সেহেতু তিনিই জ্ঞান;—যা তাঁর নাই এমন কোন জ্ঞান তাঁকে আহরণ করতে হয় না। যেমন, ব্রহ্মাকে প্রদত্ত বেদে বলা হয়েছে 'প্রশংসা ও স্তব কর তাঁর যিনি বেদমন্ত্র ব্যক্ত করেছেন এবং যিনি বেদ সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন।'

প্রশ্নকর্তা আবার বললে : যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন তাঁকে কেমন করে পূজা করেন ?

উত্তরদাতা বলেন : তাঁর নামোচ্চারণই তাঁর অনন্যতা সপ্রমাণ করে, যেমন, তথ্য থাকলেই তার সংবাদ হতে পারে তেমনই, নামের ধারক থাকলেই তবে নাম থাকতে পারে, যদিচ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত ও অপ্রত্যক্ষ। তাঁকে আত্মাই উপলব্ধি করতে পারে এবং একমাত্র ধ্যান ও চিন্তার দ্বারাই তাঁর গুণাবলীর ধারণা করা যেতে পারে। এই উপলব্ধি ও ধ্যানই তাঁর প্রকৃত উপাসনা, এবং অনবরত উপাসনার দ্বারাই ভূমানন্দ লাভ হয়।'

এই বিখ্যাত পুস্তকে হিন্দুদের কথা যা বলা হয়েছে তা এই। 'ভারত' গ্রন্থের 'গীতা' নামক অংশে বাসুদেব ও অর্জুনের কথোপকথন আছে :

২২. আমিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জন্ম-মৃত্যু-বিহীন অনাদি অনন্ত; আমার কর্মের কোনই প্রতিফল আমার অভিপ্রেত নয়; সৃষ্ট বস্তুর কোন বিশেষ শ্রেণীরও আমি পক্ষপাতি নই, কোন বিশেষ শ্রেণী আমার বিরাগ বা প্রীতিভাজনও নয়। আমার সৃষ্ট সকল জীবকেই তার প্রয়োজন মত কর্মক্ষমতা দিয়েছি। যে আমাকে এই গুণ দ্বারা চেনে এবং কর্মফলের লোভ বর্জন করে যে আমার মত হবার সাধনা করে তার বন্ধন শিথিল হয়ে, পরমার্থ লাভ ও মুক্তি সহজ হয়'।

দর্শনের সীমা নির্দেশক সংজ্ঞা হিসাবে পন্ডিতরা সচরাচর যা বলে থাকেন তার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, সাধ্যমত ঐশ্বরিক গুণের নিকটবর্তী হওয়ার নামই দর্শন।

এই পুস্তকে বাসুদেব আরও বলেছেন : বহু লোক পার্থিব অভাব মোচনের লোভে ভগবানের স্মরণ নেয়। তাদের অবস্থা বিচার করে দেখলে দেখতে পাবে যে ভগবৎ জ্ঞান থেকে তারা বহু দূরে পড়ে আছে, কারণ ভগবান প্রত্যেকের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে প্রত্যক্ষ নন—, সেজন্য তারা তাকে জানে না। অনেকে আছে যাদের ঈশ্বর জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু পর্যন্ত সীমা-বদ্ধ; আবার এমন অনেকে আছে যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে অতিক্রম করতে পারলেও প্রাকৃতিক তথ্যের জ্ঞান লাভ করেই ক্ষান্ত হয়। তারা জানে না যে তারও উপরে আছেন তিনি যাঁর ঔরষে কেউ জন্মায় না, যিনি কারও ঔরষজাত নন, যাঁর অস্তিত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান কেউ আয়ত্ত করতে পারেনি ও যাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী।

হিন্দুদের মধ্যে কর্মের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ আছে। যারা ঈশ্বরকে বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ বলে মনে করে তারা সমস্ত কর্মের দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পণ করে থাকে। কেননা, কারকের অস্তিত্ব যখন তাঁর থেকে পাওয়া এবং তিনিই যখন সমস্ত কর্মের হেতু তখন কারক তাঁরই কার্যের নিমিত্ত মাত্র। অন্য পক্ষের মতে, কর্মের সম্পর্ক ঈশ্বরের সঙ্গে নয়, তাঁর অধস্তন জীবাত্মার সঙ্গে।

সাংখ্য গ্রন্থে সাধক বলেছেন : কর্মকারক সম্বন্ধে কোন মতভেদ আছে কি না?

ঋষি বলেছেন: একদল বলে, আত্মা নিষ্ক্রিয়, আর পদার্থ প্রাণহীন জড়। স্বয়ং সম্পূর্ণ ঈশ্বর এই দুইটে বস্তুকে যুক্ত ও বিযুক্ত করেন, কাজেই তিনি মূল কারক। এ দুইটির সঞ্চালন ক্রিয়া তার কাছ থেকেই

আসে, যেমন নির্জীব গতিশক্তিহীন বস্তুকে সজীব শক্তি চালনা করে। অন্যেরা কিন্তু বলে, এ দুটি বস্তুর মধ্যে যোগ স্থাপন প্রকৃতিই করে থাকে; কারণ যে সব বস্তু বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের নিয়মাধীন, তাদের স্বভাবই তাই। আরো একদল বলে, আত্মাই প্রকৃত কারক, কারণ বেদে উক্ত হয়েছে যে সমস্তই পুরুষ থেকে উদ্ভূত। আবার আর একদল বলে, কালই আসল কারক, কেননা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মেষশাবকের ন্যায় কালের শক্ত রজ্জুতে বাঁধা, যার দরুন রজ্জুত
২৩. সংকোচন-সম্প্রসারণ অনুসারে বিশ্বও গতিশীল হয়। আর একদল বলে, কর্ম পূর্বকৃত কর্মের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। এসমস্ত মতই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কর্মই জড় পদার্থ থেকে উদ্ভূত, কারণ এই জড় পদার্থই আত্মাকে বাঁধে এবং ইতস্ততভাবে বিভিন্ন আকৃতি গ্রহণ ও বর্জন করায়। সেইজন্য পদার্থই (matter) আসল কারক এবং পদার্থগত অন্য যা কিছু আছে তার সবই এই ক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করে। বিভিন্ন রকমের ক্ষমতা না থাকার জন্য আত্মা প্রকৃত কারক হতে পারে না। যে সব ক্ষমতার বলে কর্ম সম্পাদিত হয় সেসব ক্ষমতা নাই বলে আত্মা কারক নয়।'

আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভারতীয়দের মত এই। এদের ভাষায় আল্লার নাম 'ঈশ্বর' যিনি পরম দাতা, যিনি দান করেন কিন্তু প্রতিগ্রহণ করেন না। এদের মতে আল্লার ঐক্য হচ্ছে absolute এবং, আপাতদৃষ্টিতে অন্যান্য বস্তু ভিন্ন মনে হলেও আসলে তারা একেরই বহুরূপ। ওরা আরও মনে করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রকৃত অস্তিত্ব, কারণ অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব তাঁর থেকেই পাওয়া। তিনি আছেন আর অন্য কিছুই নাই; এরূপ কল্পনা অসম্ভব নয়, কিন্তু অন্যসব কিছুর অস্তিত্ব আছে আর তাঁর অস্তিত্ব নাই, এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব।

হিন্দুদের চিন্তাশীল লোকদের ছেড়ে যদি আমরা জনসাধারণের কথায় আসি তাহলে এদের বিশ্বাস রীতির নানা বৈচিত্র্য দেখতে পাই। তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা বীভৎস, যেমন প্রায় প্রত্যেক সমাজেই, এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও কিছুটা পাওয়া যায়। আল্লার প্রতি মানবীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির আরোপ, মানুষের উপর তাঁর যথেচ্ছাচারে বিশ্বাস পোষণ করা, কিংবা ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে নিষিদ্ধ মনে করা, ইত্যাদি নানা প্রকারের কুরীতি ইসলামেও দেখা যায়। জনসাধারণের জন্য রচিত ধর্মপুস্তকগুলো অবশ্য স্পষ্ট ও সরলভাবে লিখিত হওয়া দরকার। তা না হলে জনসাধারণের বিশ্বাসে কিরূপ ভ্রান্তি জন্মাতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে। ভারতবর্ষের কতক মনীষী ঈশ্বরের নিরাকারত্বের উপর জোর দিতে

গিয়ে তাঁকে বিন্দু বা শূন্য বলে অভিহিত করেছেন। অশিক্ষিত জনসাধারণ এই সংজ্ঞাটির আসল তাৎপর্য না বুঝে মনে করল যে ঈশ্বর সত্যই হয়তো বিন্দুর মতই ক্ষুদ্রাকৃতি। এইরূপ বীভৎস সমীকরণ করেই তারা ক্ষান্ত হ'ল না, এমনও ধারণা করল যে, ঈশ্বর বারো আঙ্গুলী দীর্ঘ আর দশ আঙ্গুলী প্রস্থ। আল্লাহ্ সমস্ত পরিমাণ ও পরিমাপের ঊর্ধ্বে। তেমনই, আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বদর্শী, কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়, আমাদের এই উক্তি থেকে অজ্ঞ জনসাধারণ মনে করতে পারে যে আল্লাহ্‌র এই সর্বজ্ঞতা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং দর্শন কেবল চক্ষু দ্বারাই সম্ভব। যেহেতু একচক্ষু অপেক্ষা একাধিক
২৪. চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষমতা বেশী সেহেতু তারা ঈশ্বরকে সহস্রাক্ষ বলে বর্ণনা করে, যার আসল অর্থ হচ্ছে তাঁর সর্বজ্ঞতা।

ইত্যাকার নানা কদর্য ধারণা ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে, বিশেষ করে সেই সব শ্রেণীর মধ্যে, জ্ঞান আহরণ যাদের জন্য নিষিদ্ধ এবং যাদের কথা এই পুস্তকের অন্যত্র আলোচনা করা হবে।

অধ্যায়—৩

ভাব ও ইন্দ্রিয়জগৎ সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা

এথেন্সের সোলন (Solon), প্রিয়েনের বিয়াস (Bias), কোরিন্থের পেরিয়ান্দার (Periander), মিলেটাসের থেলিস (Thales), লেসিডিমনের চিলন (Chilon), লেসবসের পিথেকিউস (Pithacus) এবং লিন্দসের ক্লিউবলস, জ্ঞানের সপ্তর্ষি বলে খ্যাত এই সব পণ্ডিত ও তাদের শিষ্যদের চেষ্টায় ইউনানী দর্শনের উৎকর্ষ সাধন হবার পূর্বে গ্রীকরা ভাব ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে হিন্দুদের মতই ধারণা পোষণ করত। কেউ কেউ বিশ্বাস করত যে সমস্ত বস্তুজগৎ-ই এক; এই জগতের মূলে এক প্রচ্ছন্ন সত্তা আছে বলে কারো কারো ধারণা ছিল। আবার কেউ বিশ্বাস করত যে এর মূলে আছে এক পরম শক্তি। মানুষ, প্রস্তর বা অনুরূপ জড় পদার্থের তুলনায় এই মূল সত্তার নিকটতম বলেই তার মর্যাদা, নচেৎ মানুষ ও জড় পদার্থের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আবার কারোর মতে, অস্তিত্ব একমাত্র সেই আদি কারণে আছে, কারণ সে স্বয়ম্ভূ, অন্যান্য বস্তুর মত তার কোন কারণ নাই; যার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভরশীল, তার অস্তিত্ব সত্য নয়, কল্পনা মাত্র; প্রকৃত অস্তিত্ব একমাত্র সেই এক ও আদি সত্তার।

শেষোক্ত মতটি ইউনানী **Sophist**-দের। এরা দার্শনিক। ইউনানী ভাষায় (**Soph**) শব্দের অর্থ বোধি। দার্শনিককে তাই ইউনানী ভাষায় পিলসোপা (پیلاوسوپا) বলা হয়, অর্থাৎ বোধি যার প্রিয়। মুসলমানদের মধ্যে যারা এদের নিকটবর্তী মতামত অবলম্বন করল, তারাও ঐ নামে অভিহিত হতে
২৫. লাগল। অনেকে শব্দটির আসল তাৎপর্য না বুঝে, তাকে আরবী সুফ্‌ফা (الصفّه) শব্দের সাথে সম্পর্কিত মনে করেছে। 'সুফ্‌ফা' শব্দটি আসলে রসূলুল্লাহ্‌র সহচরদের প্রতিই প্রযোজ্য হবার কথা। শব্দটির উচ্চারণে ও বানানে আরও বিকৃতি ঘটে অবশেষে এমন দাঁড়াল যে তাকে 'সুফ্' শব্দ (যার অর্থ ভেড়ার লোম) থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হতে লাগল। একটি কবিতায় বসুতের সুফী শব্দের তাৎপর্য নিয়ে লোকেরা কলহ করছে বহুকাল ধরে। তারা ভেবেছে 'সুফ' শব্দটি উদ্ভূত। আমি কিন্তু এই শব্দটির অর্থ পূতচরিত্র

(صافی) মূরকই বুঝি। এই 'সাফি' থেকে 'সূফী', এবং সেজন্য নির্মল স্বভাব সাধকরাও 'সূফী'।

ইউনানীরা আরো মনে করত যে বস্তুজগৎ মাত্র একটি, যার মধ্যে নানা আকারে ও নানা রূপে 'আদি কারণ' (first cause) নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন বস্তুরূপের মধ্যে সেই আদি কারণেরই শক্তি বিভিন্ন অবস্থায় ক্রিয়াশীল; অন্তর্নিহিত ঐক্য সত্ত্বেও এই অবস্থার পার্থক্যের দরুনই তাদের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইউনানীদের মধ্যে আরও একদল ছিল যারা বিশ্বাস করত যে, কায়মনোবাক্যে যে এই আদি কারণের প্রতি নিবিষ্ট হয়, এবং সাধ্যমত তার মত হবার সাধনা করে, সে সমস্ত মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম ক'রে ও সমস্ত ভয় ও বাঁধামুক্ত হয়ে তার সাথে মিলিত হয়। সূফীদের লক্ষ্যও এই রকম বলে তারাও এইরূপ মত পোষণ করে।

আত্মা ও অশরীরী জীব সম্বন্ধে ইউনানীদের বিশ্বাস ছিল যে কায়া পরিগ্রহণের পূর্বেও তাদের অস্তিত্ব থাকে, তাদের সংখ্যা ও শ্রেণীমত সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব, পরিচয় ও অপরিচয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধও তাদের মধ্যে আছে এবং শরীরী অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃত কর্ম দ্বারা তাদের দেহত্যাগের পরের নির্ধারিত অবস্থা তারা অর্জন করে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে দৃশ্য-জগৎকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন করে। এইজন্য ইউনানীরা তাদেরকে দেবতা নাম দিত এবং তাদের নামে মূর্তি নির্মাণ করে নানা অর্ঘ্য দিয়ে তাদের পূজা করত। যেমন Galenus তাঁর শিল্পশিক্ষা প্রেরণা' নামক পুস্তকে লিখেছেন: 'যে সব মহাপুরুষ ঠাকুর দেবতার মধ্যে পরিগণিত হবার সম্মান অর্জন করেছেন, শিল্প-কলার চর্চায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলেই তাঁদের সে সম্মান—শারীরিক বলপ্রয়োগ, কুস্তি বা discus নিক্ষেপে কৃতিত্বের জন্য নয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ Ascelpius ও Dionysius এর নাম করা চলে। দেবত্বে উন্নীত মানব বা প্রকৃত দেবতা, অতীতে এ'রা যাই থেকে থাকুন, এ'রা যে বিপুল শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছেন তা এইজন্য যে এ'দের একজন মানুষকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়েছিলেন, আর অপর জন শিখিয়েছিলেন দ্রাক্ষার চাষ।'

২৬. Hiippocrates-এর সূত্রের টীকায় Galenus আরও বলেছেন: 'Ascelpius এর মন্দিরে ছাগল অর্ঘ্য দেওয়ার কথা আমি কখনও শুনিনি, কেননা ছাগলের লোম বোনা সহজ নয়, আর ছাগলের প্রকৃতির দোষে অতিরিক্ত ছাগ মাংস ভক্ষণে মৃগিরোগ জন্মায়। লোকে আসলে Ascelpius-কে

কুক্কুট অর্ঘ্য দেয়। Hippocrates-ও তাই করতেন. কারণ, এই দেবোপম পুরুষ মানুষকে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিখিয়েছিলেন যা Dionyzius ও Demeter এর আবিষ্কৃত দ্রাক্ষারস ও শস্যবীজের জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামেই শস্য বীজের নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে।'

Plato তাঁর Timaeus নামক গ্রন্থে বলেছেন : 'ত্বক ছেদনকারী বর্বর (সেমিটিক) জাতিরা 'ডী' (Dei) নামক যে সব অশরীরী জীবকে অমর বলে বা ভগবান আখ্যা দেয়, আসলে তারা দেবতা (angels); আল্লাহকে তারা প্রধান বা আদি দেবতাই বলে থাকে।'

তিনি আরো বলেছেন 'ঈশ্বর (আল্লাহ) দেবগণকে বললেন : 'অমর হবার নিজ ক্ষমতা তোমাদের নাই, তবে তোমাদের মৃত্যু হবে না। কারণ তোমাদের সৃষ্টির সময়েই তোমরা এই মর্মে আমার নিকট থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করেছ।'

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র Plato লিখেছেন : 'ঈশ্বর (আল্লাহ্) এক বচনীয় শব্দ, যার বহু বচন হতে পারে তেমন দেবতা (এলাহ্) নয়।'

এসব উদ্ধৃত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইউনানীদের মধ্যে দেবতা (এলাহ্) শব্দটি ব্যাপক অর্থে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বস্তু মাত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে। আরও অনেক জাতির মধ্যে শব্দটির এইরূপ প্রয়োগ নীতি দেখা যায়, যারা পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতিকেও দেবতা বা ভগবান আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর, বিশেষ অর্থে শব্দটি ওরা 'আদিকারণ' (first cause), দেবদূত ও তাদের আত্মার জন্যও ব্যবহার করে থাকে। আর এক অর্থে Plato এগুলোকে Sekinat سکینات নাম দিয়েছেন। এই 'সকিনাত' শব্দটির পূর্ণ ব্যাখ্যা কোনও টীকাকারের লেখাতেই পাওয়া যায় না, সেজন্য আমরা শব্দটির ব্যবহারই পাচ্ছি, আসল অর্থ পাই না।

২৭. বৈয়াকরণিক ইয়াহিয়া (Johnnes Grammaticus) Proclus এর মত খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন : 'আকাশমণ্ডলীর দৃশ্যমান বস্তুগুলোকে ইউনানীরা (এলাহ্) দেবতা আখ্যা দিত, যেমন আরবেতর জাতিদের অনেকেই করে থাকে, তারপরে, ভাবজগতের মৌলিক তথ্য নিয়ে যখন তারা চিন্তা করতে আরম্ভ করল, তখন সেই মূল তত্ত্বকেই তারা দেবতা নাম দিল।'

অতএব আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে দেবত্বে উন্নীত হওয়ার অর্থ হ'ল (আমাদের) ফেরেস্তার পর্যায়ভুক্ত হওয়া। একথা Galenus

তাঁর উপযুক্ত গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলেছেন: 'একথা যদি সত্য হয় যে Ascelpius পূর্বে মানুষ ছিলেন এবং অবশেষে ঈশ্বর তাকে ফেরেশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা দিলেন, তাহলে অন্যরকমের সব কথাই বাতুলের প্রলাপ।' অন্যত্রও Galenus বলেছেন: ইশ্বর Lycurgus-কে বললেন: 'তোমাকে মানব না দেবতা বলব, তা নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত, তবে শেষের নামটিরই আমি পক্ষপাতী।'

কতকগুলি এমন শব্দ ও বাক্য আছে যা কোন কোন ধর্মে আপত্তিকর, আবার কোন কোন ধর্মে অনুমোদিত, যা কোনও ভাষায় গ্রহণযোগ্য আবার কোনও ভাষায় বর্জনীয়। 'তা-আল্লাহ্' বা 'দেবত্বারোপ' এইরূপ একটি শব্দ, যা মুসলমানদের কাছে অতিশয় নিন্দনীয়। আরবী ভাষায় আল্লাহ্ শব্দের ব্যবহার অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই যে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে যেসব নামে অভিহিত করা হয় তার মধ্যে একমাত্র 'আল্লাহ্' ব্যতীত অন্যসব নামই কোন না কোন ভাবে অন্য জীবেও আরোপ করা চলে; কেবল 'আল্লাহ্' শব্দ একমাত্র ঈশ্বরেই প্রযোজ্য। এইটিই তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম।

কুরআনের পূর্বে যে হিব্রু ও সিরীয় ভাষাতে ঐশ্বরিক গ্রন্থ প্রেরিত হয়েছিল সে ভাষা দুটি বিবেচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে Torah এবং তৎপরবর্তী গ্রন্থসমূহে (যা Torah-রই অংশ বলে গণ্য হয়) 'রব্‌ব্' (অর্থাৎ 'স্বামী') শব্দটি আরবী 'আল্লাহ্' শব্দের সমার্থবাচক শব্দরূপেই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় এই 'রব্‌ব্' শব্দটি কোনও বস্তুর সঙ্গে বিশেষণরূপে যেমন ব্যবহার হতে পারে, হিব্রু বা সিরীয় ভাষায় তেমন হয় না; 'গৃহের রব্‌ব্' 'ধনের রব্‌ব্' ইত্যাদি ঐ দুই ভাষায় বলা চলে না। অথচ ঐ দুই ভাষাতেই 'এলাহ্' (=Eloah—দেবতা) শব্দের ব্যবহার আরবীতে 'রব্বে'র মত বস্তু সম্পর্কিত বিশেষ্য হতে বাধা নাই।

এই Torah গ্রন্থেই আছে: "মহাপ্লাবনের পূর্বে এলোহিমের পুত্ররা
২৮. মানব কন্যা সমূহে উপগত হল," "Elohim-এর পুত্রদের সঙ্গে শয়তান তাদের সভায় প্রবেশ করল।" এই উক্তি Book of Job-এ পাওয়া যায়। Torah গ্রন্থে উদ্ধৃত মুসার প্রতি প্রভুর বাণীতেও আছে: "Pharaoh-এর জন্য আমি তোমাকে 'এলাহ্' নিযুক্ত করেছি।" Psams of David-এর ৮২ সংখ্যক স্তবে আছে: "ঈশ্বর 'এলাহ্,' অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন।"

Torah গ্রন্থে দেববিগ্রহগুলোকে 'বৈদেশিক দেবতা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐ গ্রন্থে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা, কোনও মূর্তিকে

প্রণাম করা, এমনি কি তার উল্লেখ বা কল্পনা করা, যদি এমন কঠিনভাবে বারণ করা না থাকত তাহলে ঐ বাক্য থেকে অনুমান করা চলত যে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বৈদেশিক দেবতাদের পূজা, হিব্রু দেবতাদের নয়। Palestine-এর চতুর্দিকে যে সব জাতি বাস করত তারা গ্রীক দেবতাদের মূর্তি উপাসনা করত আর ইস্রাইল বংশীয়রা নিয়ত-ই আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে Baal ও Ashtorath (অর্থাৎ Venus)-এর মূর্তি পূজায় প্রবৃত্ত হত।

দেখা যাচ্ছে, হিব্রুরা রাজ্যপ্রাপ্তির মত দেবত্ব প্রাপ্ত বা 'তাআল্লাহ' (تألّه) বাক্যটি ফেরেশ্‌তা ও ঐশী শক্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা সম্পর্কেই ব্যবহার করত, আর উপ-মাচ্ছলে, ঐসব জীবাত্মার কল্পিত প্রতিমূর্তির প্রতি, এবং রূপক হিসাবে, রাজা বা অনুরূপ কীর্তিমান ব্যক্তিদের প্রতিও শব্দটি প্রয়োগ করত।

এইরকম, 'পিতৃত্ব' ও 'পুত্রত্ব' শব্দ দুটির প্রয়োগরীতি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে ইসলাম এ দুটি শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করে না, কেননা আরবীতে 'সন্তান' ও 'পুত্র' প্রায় সমার্থবাচক; জনক জননীর দেহজ সন্তান বা শারীরিক জন্মসংক্রান্ত কোনও কিছুই আল্লাহ্‌র বা বিধাতার অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে না। অন্যান্য ভাষায় অবশ্য শব্দ দুটির আরও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়; সেসব ভাষায় 'পিতা' সম্বোধন 'মহাশয়' সম্বোধনেরই সমান। খ্রীস্টানদের মধ্যে এ শব্দ দুটির বহুল ব্যবহার সুবিদিত; এমন কি সম্বোধন কালে কেউ যদি শব্দ দুটি ব্যবহার না করে তাকে প্রায় সমাজত্যাগী মনে করা হয়। পুত্র শব্দটি বিশেষ করে যীশুর জন্যই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ঐ একটি অর্থেই শব্দটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। অন্যের প্রতিও পুত্র শব্দ ব্যবহার করা চলে। যীশুই তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনা
২৯. প্রসঙ্গে বলতে বলেছেন : 'স্বর্গচারী হে আমাদের পিতা'। তিনি তাঁর শিষ্যদিগকে নিজের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছেন এই বলে যে, তিনি তাঁর ও তাঁদের পিতার নিকট উপস্থিত হতে যাচ্ছেন। অধিকাংশ উক্তিতেই যেখানে তিনি পুত্র শব্দটি নিজের উপরে প্রয়োগ করেছেন সেখানে তার ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে তিনি মানবসন্তান।

শুধু খ্রীস্টানরাই নয়, ইহুদীদেরও এই রকম বাক্যরীতি আছে। ওদের রাজন্য খণ্ডে (Book of Kings) আছে যে আল্লাহ্‌ দাউদকে উরিয়ার স্ত্রীর গর্ভজাত তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং ঐ নারীর গর্ভে তাঁকে অন্য সন্তান দান করে সেই সন্তানকে নিজ পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করার

প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি বলে দাউদপুত্র সুলেমানকে ঈশ্বর পুত্র বলা যদি হিব্রু ভাষায় শুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে পোষ্যপুত্র গ্রহণকারী, অর্থাৎ ঈশ্বরকে পিতা বলাও অশুদ্ধ হবে না।

ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্ত ধর্মসমাজের মধ্যে একমাত্র খৃষ্টানদের সঙ্গেই Manichaean-দের সাদৃশ্য আছে। তাঁর 'সঞ্জীবনী কোষ' (كنز الاحياء) নামক ধর্মগ্রন্থে মানী কতকটা এইরূপ উক্তি করেছেন: 'সূর্য-চন্দ্রের সৈন্য-সামন্তরা কুমারী, তরুণী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভগ্নী ও ভ্রাতা নামে অভিহিত হবে, কারণ প্রেরিত গ্রন্থমাত্রেই এই রীতি দেখা যায়। আনন্দের দেশে পুরুষ নাই, স্ত্রী নাই, জননেন্দ্রিয়ও নাই; সবারই সজীব দেহ, কিন্তু যেহেতু সবাই ঐশ্বরিক দেহসম্পন্ন, সেহেতু অক্ষমতায় ও শক্তিতে, দৈর্ঘ্যে ও ক্ষুদ্রতায়, আকৃতি ও ভূষণে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তারা সবাই একই দীপ থেকে প্রজ্বলিত এবং একই পদার্থে পুষ্ট সমাকৃতি প্রদীপের মত। এরূপ নামকরণের আসল কারণ হচ্ছে দুই রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদ ও সংগ্রাম। যখন অতল গহ্বর থেকে তামসী শক্তিরা স্ত্রী ও পুরুষের যুগ্মরূপ ধরে উপরের দিকে উঠে আসতে লাগল তখন উর্ধ্ব থেকে জ্যোতির্লোক তা দেখে নিজ সন্তানদিগকে পুরুষ ও স্ত্রীর বাহ্যিক রূপ দিয়ে তাদের সাথে সংগ্রাম করতে পাঠাল। এমনি করে প্রত্যেক শ্রেণী বিপক্ষদলের সমশ্রেণীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল।'

হিন্দুদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা ঈশ্বরের প্রতি এ ধরনের মানবীয়তা আরোপ করাকে ঘৃণা করে। কিন্তু ওদের জনসাধারণ ও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তা অতি মাত্রায় করে থাকে। এমনকি উপরোল্লিখিত বর্ণনাকেও তারা ছাড়িয়ে যায়, এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গর্ভধারণ, প্রসব ইত্যাদি যাবতীয় শারীরিক প্রক্রিয়ার সবই ঈশ্বরের সম্বন্ধে কল্পনা করতে তারা সংকোচ বোধ করে না, এবং এসবের বর্ণনাকালে অসঙ্গত ভাষা ব্যবহার করতেও তারা শঙ্কিত হয় না। তবে, সংখ্যায় বেশী হলেও এসব লোকের ধর্ম মতকে তেমন কেউ গ্রাহ্য করে না। আসলে ব্রাহ্মণদের চিন্তা ও বিশ্বাসই হিন্দু
৩০. ধর্মচেতনার কেন্দ্রস্বরূপ, কারণ ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য এরা বিশেষভাবে নিজকে শিক্ষিত করে থাকে। এই ব্রাহ্মণদের চিন্তা ও ধারণার কথাই এখন আমরা আলোচনা করব।

যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাস যে এ সমস্তই এক বস্তু। এদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ গীতাতে বাসুদেব বলেছেন: 'প্রকৃত বিশ্লেষণে

দেখা যাবে যে, সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের অংশ; কেননা বিষ্ণু নিজেকে পৃথিবীতে পরিণত করলেন যাতে জীবজন্তু তার উপরে অবস্থান করতে পারে; তিনি নিজে জল হলেন, যাতে তাদের পুষ্টি হতে পারে; তিনি অগ্নি ও বায়ু হলেন, যার দ্বারা তাদের বৃদ্ধি হতে পারে। তাদের প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ডও তিনিই হলেন। এবং যেমন বেদে উক্ত হয়েছে, স্মরণশক্তি, জ্ঞান ও তার বিপরীত গুণাবলী, সব তাদেরকে তিনিই দিয়েছেন।'

প্লিনাস (Appollonius)-এর 'বস্তুর হেতু' নামক গ্রন্থের উক্তির সাথে এই কথাগুলির কি আশ্চর্য মিল, যেন এটি অপরটির নকল! প্লিনাস বলছেন: 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঐশ্বরিক শক্তি আছে, যার ফলে সমস্ত জড় ও অশরীরী বস্তু বোধগম্য হয়।' ফার্সীতে নিরাকার ঈশ্বরকে 'খোদা' বলা হয়, আবার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে শব্দটি মানুষেও প্রয়োগ করা চলে।

যে সব ভারতীয় অস্পষ্ট ইঙ্গিতের চেয়ে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার বেশী পক্ষপাতী, তারা আত্মাকে 'পুরুষ' আখ্যা দেয় (পুরুষের অর্থ মানুষ), কারণ বস্তুজগতের মধ্যে এই আত্মাই একমাত্র জীবন্ত সত্তা। হিন্দুদের মতে, এক জীবন-শক্তি ছাড়া আত্মার অন্য কোন গুণ নাই; জ্ঞান ও অজ্ঞান পর্যায়ক্রমে এর মধ্যে থাকে; কার্যতঃ সে অ-জ্ঞানী, কিন্তু সম্ভাবনায় সে জ্ঞানী। প্রয়াস বা কর্মের ফলে তার জ্ঞান লাভ হয়; এই অ-জ্ঞানই তার কর্মপ্রয়াসের হেতু এবং জ্ঞান বা বোধিলাভ এই কর্মপ্রয়াসকে রহিত করে।

'পুরুষের' পরে ওদের (হিন্দুদের) বিশ্বাসমতে এক মৌলিক নিরাকার সত্তা আছে, যাকে ওরা, 'অব্যক্ত' আখ্যা দিয়ে থাকে, অর্থাৎ যার কোন আকার নাই। এটি মৃত জড়পদার্থের ন্যায়। তার কোন কার্যক্ষমতা নাই, তবে তিনটি গুণ আছে। গুণগুলির নাম সত্য, রজঃ, তমঃ। শুনেছি বুদ্ধোধন (?) তার শ্রমণ শিষ্যদেরকে উপদেশ প্রসঙ্গে এই গুণত্রয়কে 'বুদ্ধধর্মসঙ্ঘ' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেন এ শব্দগুলো বোধি, ধর্ম ও অ-জ্ঞানের নামান্তর। প্রথম গুণটি শান্তি ও কল্যাণের, অস্তিত্ব ও বৃদ্ধিতে যার
৩১ প্রকাশ; দ্বিতীয়টি শ্রম ও ক্লেশসূচক, স্থিতি ও survival-এ যার বহিঃপ্রকাশ, আর তৃতীয় গুণটি শ্রান্তি, অবসন্নতা ও প্রত্যয়াভাবের, যার পরিণাম ক্ষয় ও বিনাশ। এই জন্য প্রথম গুণটি দেবতা (ফেরেশ্‌তা)দের, দ্বিতীয়টি মানুষের, আর তৃতীয়টি পশুদের প্রতি আরোপ করা হয়ে থাকে। এইসব গুণ ও বস্তু সম্বন্ধে পূর্বাপরের যে অনুক্রম ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে তা আসলে কালবাচক নয়, মর্যাদাসূচক; ভাষার দৈন্যের জন্যই তা করা হয়!

যে সত্তা এই ত্রিগুণসম্পন্ন বিভিন্ন আকার ধারণ করে ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তার নাম ওরা দিয়েছে 'ব্যক্ত', অর্থাৎ আকৃতিবিশিষ্ট। সাকার ও নিরাকার সত্তার সম্মিলিত অবস্থাকে ওরা 'প্রকৃতি' বলে। এই নাম জেনে অবশ্য আমাদের কোনও লাভ নাই, কারণ আমরা সূক্ষ্ম নিরাকার সত্তার আলোচনা এখানে করছি না। এ আলোচনায় সত্তা বা পদার্থ শব্দই আমাদের জন্য যথেষ্ট, কেননা, একটি ব্যতিরেকে অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না।

সত্তার বা পদার্থের পরে আসে স্বভাব বা প্রবৃত্তি; তার নাম ওরা দিয়েছে 'অহঙ্কার'। শব্দটি প্রভুত্ব, সম্প্রসারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা থেকে উদ্ভূত। এ শব্দপ্রয়োগে কারণ হচ্ছে যে, আকার ধারণ করার কালে সত্তা বিভিন্ন বস্তুকে নব নব রূপে বর্ধিত করে এবং এই বর্ধনের অর্থ হল, অন্যান্য বস্তুকে পরিবর্তন করে বর্ধিত বস্তুর মধ্যে আত্মসাৎ করা, যেন স্বভাবই অন্য বস্তুগুলোকে পরাভূত, পরিবর্তিত ও করায়ত্ত করছে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক মিশ্র বস্তুই সেসব পদার্থের সমষ্টি যাতে বস্তুটিকে পুনরায় বিশ্লিষ্ট করা যায়। বিশ্বজগতে সামগ্রিক বস্তু হচ্ছে পাঁচটি উপাদান; হিন্দুদের মতে এই পাঁচটি উপাদান হ'ল ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ্, ক্ষিতি। এদের নাম 'মহাভূত', অর্থাৎ প্রবল স্বভাববিশিষ্ট। অন্যান্য জাতি যেমন অগ্নিকে ঈশ্বরের তলদেশের উত্তপ্ত শুষ্ক বস্তু মনে করে, হিন্দীয়রা (হিন্দের অধিবাসী বা ভারতীয় হিন্দুরা) তেমন মনে করে না। ভূপৃষ্ঠে প্রজ্বলিত ধূম থেকে যে সাধারণ শিখার সৃষ্টি হয়, অগ্নি অর্থে ওরা তাকেই বোঝে। যেমন বায়ুপুরাণে উক্ত হয়েছে: 'আদিতে কেবল ভূমি, জল- বায়ু ও আকাশ ছিল; ভূগর্ভে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়ে ব্রহ্মা তাকে বাইরে এনে
৩২. তিন ভাগে ভাগ করলেন। প্রথম ভাগ হল 'পার্থিব', অর্থাৎ সাধারণ অগ্নি, যা কাষ্ঠের মাধ্যমে জ্বলে ও জল দ্বারা নির্বাপিত হয়; দ্বিতীয় ভাগ হল 'দিব্য', অর্থাৎ সূর্য, আর তৃতীয় ভাগ হল 'বিদ্যুৎ'। সূর্য জলকে আকর্ষণ করে, আর বিদ্যুৎ জলের অন্তরালে চমকিত হয়। জীবজন্তুর দেহের জলীয় অংশের মধ্যেও অগ্নি আছে, জলীয় ভাগ থেকেই সে ইন্ধন পায়, কিন্তু নির্বাপিত হয় না।

এই উপাদানগুলোও মিশ্র, সেজন্য এগুলোরও প্রাথমিক উপাদানের কল্পনা ওরা করেছে, যার নাম দিয়েছে 'পঞ্চমাতৃ' অর্থাৎ পঞ্চজননী। এগুলোকে ওরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার নামে অভিহিত করে থাকে। আকাশের প্রাথমিক সত্ত্ব যেমন 'শব্দ', যা শ্রুত হয়; বায়ুর প্রাথমিক সত্ত্ব হচ্ছে স্পর্শ', যা স্পৃষ্ট হয়;

অগ্নির প্রাথমিক সত্ত্ব 'রূপ' যা দৃশ্যমান হয়; জলের প্রাথমিক সত্ত্ব হচ্ছে 'রস' অর্থাৎ যা আস্বাদিত হয়; আর ভূমির সত্ত্ব হচ্ছে 'গন্ধ', অর্থাৎ ঘ্রেয়।

প্রত্যেকটি মহাভূতের সাথে ওরা প্রথমে 'পঞ্চমাতৃ'র এক একটিকে যুক্ত করে নেয় এবং সেই সঙ্গে উপরোল্লিখিত তালিকার ক্রমানুযায়ী তার পূর্ববর্তী মহাভূতের অবশিষ্ট সত্ত্বগুলোকেও তার সাথে যোগ করে যায়। এইভাবে ভূমিতে (যা মহাভূতের উপর্যুক্ত তালিকার সর্বশেষে আছে) পাঁচটি সত্ত্বই আছে; জলে এক 'গন্ধ' ব্যতীত অন্য চারটি 'মাতৃ' বা উপাদানই বিদ্যমান; অগ্নিতে 'গন্ধ' ও 'রস' ছাড়া বাকী উপাদানগুলো আছে; বায়ু 'গন্ধ', 'রস' ও 'বর্ণ' (রূপ) ছাড়া অন্য দুইটি গুণের অধিকারী, এবং আকাশের 'গন্ধ', 'রস' 'বর্ণ' বা 'স্পর্শ' গুণ নাই, কেবল 'শব্দ' আছে।

আকাশের প্রতি শব্দগুণ আরোপ করে হিন্দুরা কী বোঝাতে চায় আমি জানি না। তবে অনুমান করি, গ্রীক কবি হোমারের বক্তব্যের সাথে ওদের প্রতিপাদ্যের কিছুটা মিল আছে। 'সপ্তস্বরের অধিকারীরা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন ও উত্তর-প্রত্যুত্তরে রত থাকে এই উক্তির দ্বারা তিনি সপ্তগ্রহই বোঝাতে চেয়েছেন।' যেমন অন্য এক কবি বলেছেন: 'বিভিন্ন সুরবিশিষ্ট সাতটি গ্রহ আছে যা অনন্তকাল ধরে আবর্তিত হয়, আর স্রষ্টার স্তব পাঠ করে, কারণ তিনিই তাদেরকে ধারণ করেন এবং নক্ষত্রহীন মহাশূন্যের প্রত্যন্ত সীমায় তাদেরকে বেষ্টন করে থাকেন।

গ্রহাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মতামত নিয়ে Prophyry যে পুস্তক রচনা করেছেন তাতে লেখা আছে: 'Pythagorus ও Diogenes যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, নভোমণ্ডলে তাদের চিরনির্দিষ্ট আকার, রূপ ও আশ্চর্য সুরে গ্রহ-তারকাদির আবর্তন সেই স্রষ্টার দিকেই ইঙ্গিত করে, যাঁর কোনও তুলনা নাই আর কোনও আকারও নাই। কথিত আছে যে Diogenes-এর এমন সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি ছিল যে, একমাত্র তিনিই গ্রহমণ্ডলীর গতিশব্দ শুনতে পেতেন।

৩৩ এ সব কথা আসলে সংকেত যার মধ্যে সরল বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত। এই দার্শনিকদের উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা পূর্ণ সত্যে উপনীত হতে পারেননি তাদেরই একজন বলেছেন: 'দর্শনেন্দ্রিয় জলীয়, ঘ্রাণশক্তি আগ্নেয়, ভক্ষণ মৃন্ময় আর আত্মার সাথে মিলনের ফলে প্রত্যেক দেহ যা লাভ করে তা হচ্ছে স্পর্শন।'

আমার মনে হয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের সাথে তিনি জলের সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এইজন্য যে চক্ষুর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর আর্দ্র পদার্থের কথা তিনি

শুনেছিলেন। ঘ্রাণশক্তিকে অগ্নির সাথে যুক্ত করেছেন বোধ হয় ধূম ও ধূপের কারণে, আর মাটির সঙ্গে আহারের সম্বন্ধ অনুমান করেছিলেন বোধ হয় এইজন্য যে, মাটিই তার সমস্ত খাদ্যবস্তু উৎপাদন করে। এইভাবে যখন চারটি ইন্দ্রিয়ের কথাই বলা হয়ে গেল, তখন স্পর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে তিনি আত্মার অবতারণা করেছেন।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, এতক্ষণ পদার্থের যে সব উপাদানের পরিগণন করা গেল, তার যৌগিক রূপ হচ্ছে প্রাণী বা জীব। হিন্দুরা উদ্ভিদকেও একরকম প্রাণী মনে করে থাকে, যেমন, Plato মনে করতেন যে গাছপালার বোধশক্তি আছে, কেননা দেখা যায় যে, কোন্ বস্তুটি ওদের জন্য উপযোগী বা অনুপযোগী, বৃক্ষলতা তার প্রভেদ করতে পারে। আর প্রাণীরা ত' ইন্দ্রিয়শক্তির গুণেই প্রাণী।

এই অনুভব শক্তিকে 'ইন্দ্রিয়' বলা হয়; ইন্দ্রিয় হচ্ছে কর্ণদ্বারা শ্রবণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, আর ত্বক দ্বারা স্পর্শন ক্ষমতা।

তারপর আসে ইচ্ছা, যা এই ইন্দ্রিয়গুলোকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে। ইচ্ছার আবাস হৃদয়ে, যার নাম ওরা দিয়েছে 'মন'।

জৈবিক প্রবৃত্তি পাঁচটি আবশ্যকীয় কর্মের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়, যাকে হিন্দুরা কর্মেন্দ্রিয়' বলে। পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ হয়, আর এই শেষোক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ হয় ক্রিয়া ও শিল্প। সেজন্য এই ইন্দ্রিয়গুলোকে আমরা আবশ্যকীয় আখ্যা দিচ্ছি। এগুলি হ'ল : বিভিন্ন প্রয়োজন ও ইচ্ছাক্রমে ধ্বনি সৃষ্টি করা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণের জন্য হস্ত সঞ্চালন করা, নিকট বা দূরবর্তী হওয়ার জন্য পদক্ষেপ করা, ভক্ষদ্রব্যের অনাবশ্যক অংশকে শরীরে নির্ধারিত দুইটি রন্ধ্রপথে নিষ্কাশিত করা।

এই হচ্ছে পঁচিশটি পদার্থ বা সত্ত্ব। তাদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ :

১। সামগ্রিক আত্মা।
২। নিরাকার সত্ত্ব।
৩। সাকার পদার্থ।
৪। প্রবল প্রবৃত্তি।
৫—৯। পঞ্চমাতৃ।
১০—১৪। প্রাথমিক উপাদান।

১৫—১৯। জ্ঞানেন্দ্রিয়।

২০ ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রক ইচ্ছা বা মন।

২১—২৫। জৈবিক কর্মের জন্য নির্দিষ্ট যান্ত্রিক ইন্দ্রিয়।

৩৪ এই পঁচিশটি সত্ত্বের সমষ্টিক নাম 'তত্ত্ব'। সমস্ত জ্ঞানই এই 'তত্ত্ব'-এ সীমাবদ্ধ। এইজন্য পরাশর-পুত্র ব্যাস বলেছেন; 'এ পঁচিশের সংজ্ঞা, স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ, কেবল জিহ্বার দ্বারা পাঠ করেই নয়, ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণিত সিদ্ধান্ত ও নিশ্চিত প্রত্যয়ের মত মনের গভীরে বুঝে নাও। তারপর, যে ধর্মে মতি হয় তাই অবলম্বন কর, পরিণামে তোমার মোক্ষলাভ হবেই হবে।'

চতুর্থ অধ্যায়

কার্যকারণ—আত্মার সঙ্গে জড় পদার্থের সম্বন্ধ

৩৪ জীবদেহে প্রাণ সঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত এবং স্বয়ংজীবী আত্মার সঙ্গে
নিরবচ্ছিন্ন বাস ব্যতিরেকে ইচ্ছাপ্রণোদিত কোন কর্মের উৎপত্তি হয় না।
হিন্দুদের বিশ্বাস যে নিজের প্রকৃতি ও পদার্থিক ভিত্তি সম্বন্ধে আত্মা সম্পূর্ণ
অচেতন। তবে অজানাকে আয়ত্ত করার আগ্রহ তার আছে এবং জড় পদার্থ
ব্যতিরেকে যে তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, এ ধারণাও তার আছে। স্থিতিতে
যে মঙ্গল, তার প্রতি আত্মার আসক্তি, এবং যা প্রচ্ছন্ন তাকে আবিষ্কার করার
ইচ্ছা ওর প্রবল, সেহেতু আত্মা জড় পদার্থের সাথে যুক্ত হবার জন্য যাত্রারম্ভ
করে। কিন্তু ঘনত্ব ও সূক্ষ্মতা বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে যদি ঘনত্ব (density)
ও সূক্ষ্মতা সর্বোচ্চ পরিমাণে থাকে, তাহলে তাদের মিশ্রণ এমন এক বস্তুর
মাধ্যম ব্যতিরেকে হতে পারে না, যার সঙ্গে এই উভয়বিধ পদার্থের সম্বন্ধ
আছে। যেমন, সূক্ষ্মতা ও ঘনত্বের বৈপরীত্যের দরুন অগ্নি ও জলের মিশ্রণ
বাতাসের মাধ্যমেই সম্ভব, কারণ এই উভয়গুণেরই কিছু পরিমাণ বাতাসের
মধ্যে আছে, আর সেজন্য একটির সঙ্গে অন্যটিকে মিশ্রিত করার সামর্থ্য তার
আছে। দেহ ও অ-দেহের মধ্যে যে পার্থক্য, তেমন আর অন্য কিছুর মধ্যে
নাই। আত্মার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে এই
রকম মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এসব মাধ্যম হচ্ছে সূক্ষ্মদেহী, ভূতপ্রেতাদি
'যা ভূর্লোক', 'ভুবরলোক' ও 'স্বরলোকে', আদি বা প্রাথমিক মাতৃকা থেকে
উদ্ভূত হয়। সাধারণ পঞ্চভূত থেকে উদ্ভূত ঘনত্ব-বিশিষ্ট জড় দেহ থেকে
পৃথক করার জন্য ওরা এসব ভূতপ্রেতকে সূক্ষ্মদেহী বলে মনে করে থাকে।
পৃথিবীর উপর যেমন সূর্যের উদয় হয়, এই সূক্ষ্মদেহী প্রেতাদির উপরও
তেমনি আত্মার উদয় হয়। আত্মার সংগে যুক্ত হওয়ার ফলে তখন এগুলো
আত্মার বাহনে পরিণত হয়, সূর্য যেমন সম্মুখে স্থাপিত একাধিক দর্পণে
৩৫ অথবা বিভিন্ন আধারে রক্ষিত জলের মধ্যে একইভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, এবং
প্রত্যেকটিতেই সূর্যের তাপ ও জ্যোতির প্রতিফলন সমানভাবে পাওয়া যায়।

নানা উপাদান থেকে সমুদ্ভূত পুরুষ ও স্ত্রীর সংমিশ্রণে গঠিত (অস্থি, স্নায়ু ও শুক্র—এগুলো পুরুষ উপাদান; আর রক্ত, মাংস, লোমকেশ—এগুলো

স্থী উপাদান) বিভিন্ন অবয়বগুলি যখন অস্তিত্ব লাভ করে এবং জীবন গ্রহণের উপযোগী হয়, তখন এই সূক্ষ্মদেহী প্রেতগুলি তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। রাজকার্যের জন্য রাজপুরী বা দুর্গ যেমন, এই প্রেতাদির জন্য অবয়বের তেমনই প্রয়োজন। অতঃপর এই অবয়বগুলোতে পঞ্চবায়ু প্রবিষ্ট হয়। প্রথম দুটি বায়ুর দ্বারা নিঃশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ সম্পন্ন হয়; তৃতীয়ের দ্বারা পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্যের সংমিশ্রণ হয়; চতুর্থ বায়ুর দ্বারা শরীর একস্থান থেকে অন্যস্থানে গতিশীল হয়, আর পঞ্চমটির দ্বারা ইন্দ্রিয়ানুভূতি শরীরের একদিক থেকে অন্য দিকে সঞ্চারিত হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে এই সূক্ষ্মদেহী প্রেতাদির মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই, সকলের প্রকৃতি এক ও অভিন্ন; কেবল এদের ব্যবহার ও প্রভাবে পার্থক্য থাকে। সে পার্থক্যও আসলে যে দেহের সঙ্গে সে মিলিত হয়, তার মধ্যস্থিত ত্রিগুণের কোনও একটির প্রাধান্যের অনুযায়ী হয়ে থাকে, যা হিংসা ও ক্রোধ দ্বারা দেহকে দুষ্ট করে। এই হ'ল সক্রিয় হওয়ার পথে আত্মার যাত্রারম্ভ করার সর্বপ্রধান হেতু।

আর, পদার্থের দিক দিয়ে সর্বনিম্ন কারণ হ'ল তার নিরন্তর পূর্ণতার সন্ধান। পদার্থ সব সময়েই শ্রেয় থেকে শ্রেয়তরের প্রতি আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ শক্তি থেকে ক্রিয়ার দিকে যাত্রা করে। আত্মগরিমা ও আত্মপ্রসার পদার্থের রক্তমজ্জাবিশেষ; তার তাড়নায় পদার্থের মধ্যে নিহিত সমস্ত সম্ভাবনাকে সে শিক্ষার্থী আত্মাকে প্রকাশ করে দেখায়, এবং উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর যাবতীয় স্তরের মধ্য দিয়ে আত্মাকে পরিভ্রমণ করায়। হিন্দীয়রা পদার্থ ও আত্মার এই আচরণকে নিপুণা নর্তকীর সাথে তুলনা করে থাকে, যে নিজের অংগভংগির আকর্ষণ ও প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন, এবং যে এমন এক বাসনাসক্ত ব্যক্তির সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাচ্ছে যে অতীব আগ্রহের সংগে তার নৃত্যকলা উপভোগ করছে।
৩৬ সভাপতির মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নর্তকী একে একে তার কলাকৌশল দেখাতে দেখাতে একসময়ে যখন তার অনুশীলিত নৃত্যসূচী শেষ করে, এবং দর্শকদের আগ্রহও উপশমিত হয়ে আসে, নর্তকী তখন সহসা ক্ষান্ত হয়, কারণ এরপর পুনরাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছু তার করণীয় নাই। যেহেতু, পুনরাবৃত্তি তার মনঃপূত নয়, সেহেতু সভাপতি নর্তকীকে বিদায় দেয় এবং তৎক্ষণাৎ কর্মেরও অবসান ঘটে।

মরুপথে বিপন্ন সহযাত্রীদের মধ্যে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টায় যে রকম সখ্য গড়ে ওঠে, এ ব্যাপারটিও কতকটা সেই রকম। দস্যুদল আক্রান্ত হয়ে যাত্রীদিগের সবাই দিগ্‌বিদিক পালিয়ে গেছে, কেবল একটি অন্ধ ও একটি খঞ্জ লোক স্থান

ত্যাগে অপারগ হয়ে পরিত্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছে। পরস্পরের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হলে অন্ধ লোকটিকে খঞ্জ বললে– 'আমি চলনশক্তি রহিত, কিন্তু পথ দেখাতে পারি, আর তোমার অবস্থা ঠিক আমার বিপরীত, অতএব আমাকে স্কন্ধে বহন করে নিয়ে চল, যাতে তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আর এই বিপদ থেকে আমরা উভয়েই উদ্ধার পেতে পারি। অন্ধ লোকটি তাই করলে এবং পরস্পরকে সাহায্য করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করলে। বিপদ-সংকুল মরু প্রান্তর থেকে বেরিয়ে তারা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

যেমন আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কারক সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বিভিন্ন রকমের উক্তি আছে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছ : ,পদার্থ হচ্ছে জগতের মূল সত্তা, পৃথিবীতে এর যে ক্রিয়া দেখা যায় তা 'পদার্থের নিজস্ব স্বভাবের দরুন। যেমন বৃক্ষ নিজের স্বভাবগুণে নিজের বীজ ছড়িয়ে দেয়, কোনও সজ্ঞান উদ্দেশ্য বা অভিলাষের বশবর্তী হয়ে নয়, কিংবা যেমন বায়ু জলকে শীতল করে,যদিও প্রবাহিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তার নাই। সচেতন কর্ম (voluntary action) কেবল বিষ্ণুর ইচ্ছায় ও তাঁর দ্বারাই ঘটে থাকে'—এ উক্তি দিয়ে পুরাণকার সকল পদার্থের ঊর্ধ্বে যে চিরঞ্জীব বিরাজ করছেন তাঁরই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর ইচ্ছার দরুন পদার্থ কেবল নিমিত্তের কাজকরে যায়, যে কোনও রূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে, বন্ধুর মত পরিশ্রম করে চলে।

এই ধারণাকে ভিত্তি করে 'মানী'-ও বলেছেন : শিষ্যরা মৃত জড় বস্তুর জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে যীশু খ্রীস্ট বললেন : 'যে জীবন জড় বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল সে জীবন যখন তার থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তার পদার্থ নিজস্ব সত্তায় অবিমিশ্রভাবে বিরাজ করে, তখন সে আবার জড়তা প্রাপ্ত হয়, তার জীবন ধারণের শক্তি থাকে না। আর জীবনীশক্তি তাকে ছেড়ে গেলেও যে জীবিত থাবে, তার মৃত্যু হয় না।

সাংখ্যের গ্রন্থে কিন্তু পদার্থ থেকেই কর্মের উৎপত্তি হয় বলে বলা হয়েছে তার যুক্তি এই : পদার্থের আকৃতি ও রূপের পার্থক্য আসলে তিনটি প্রাথমিক শক্তি অথবা স্বভাবের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ, তাঁর একটি বা দুটি শক্তি তৃতীয়টিকে পরাভূত করতে পারে কিনা, তার উপর নির্ভর করে। এই তিনটি শক্তি হচ্ছে, 'দেবশক্তি' 'মানবশক্তি' আর 'পশুশক্তি'। এগুলোর সম্পর্ক কেবল পদার্থের সাথে,– আত্মার সাথে নয়। আত্মা কেবল নির্লিপ্ত দর্শকের মত পদার্থের কার্যকলাপ অনুধাবন করে যায়, যেমন গ্রামের পথে বিশ্রামরত পথিক নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত গ্রামবাসীদিগকে অলসভাবে দেখতে থাকে।

৩৭ তাদের কোন কোন কাজ ওর ভাল লাগে না, কোনটা হয়তো ভাল লাগেও এবং এর থেকে তার মন কিছুটা শিক্ষাও গ্রহণ করে। এসব কর্মে কোনও অংশ না নিয়ে এবং কোনপ্রকারেই এই কর্মব্যস্ততার হেতু না হয়ে পথিক নিজের মনকে এই সব দৃশ্যে ব্যাপৃত রাখে।

সাংখ্যের পুস্তকে বলা হয়েছে যদিও আত্মার সাথে কর্মের যোগ নাই, তবুও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক সেই ব্যক্তিটির ন্যায়, যে একদল অপরিচিত লোকের সংগে জুটে পথ চলতে থাকে। লোকগুলো আসলে দস্যু, গ্রামলুণ্ঠন করে ফিরছে। কিছুদূর এদের সংগে চলার পরই পশ্চাদ্ধাবনকারীরা দস্যুদলকে ধরে ফেললে; এবং দস্যুদের সংগে এই নিরপরাধ ব্যক্তিটিও বন্দী হল। দস্যুতায় কোন অংশ না নিয়েও লোকটি দস্যুদের মত ব্যবহার পেল এবং একই শাস্তি ভোগ করল।

ওরা আরো বলে: 'আত্মা বৃষ্টির জলের মত; যার গুণ ও স্বভাব সর্বদা একই রকম। কিন্তু সে জলকে যখন স্বর্ণ, রৌপ্য, কাচ, কর্দম, দগ্ধ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা জাতীয় বিভিন্ন উপাদানে তৈরী পাত্রে ধারণ করা হয়, তখন তার বর্ণে, স্বাদে ও গন্ধে প্রভেদ দেখা দেয়। এই রকম, আত্মা পদার্থকে সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত করে না, কেবল একত্র বাস করে পদার্থকে জীবনীশক্তি দেয়। পরে, যখন পদার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, ত্রিশক্তির মধ্যে প্রবলতম শক্তির গুণভেদে এবং অপর দুই শক্তির সহযোগিতার অনুপাতে সে কর্মফলে পার্থক্য দেখা দেয়। এই সহযোগিতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন প্রদীপ জ্বালাতে বিশুদ্ধ তৈল, শুষ্ক সলিতা এবং স-ধূম অগ্নি পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে। এই ব্যাপারে আত্মা শকটারোহী ব্যক্তির মত, যার শকটকে ইন্দ্রিয়রূপ অনুচরেরা তার অভিপ্রেতানুযায়ী টেনে নিয়ে বেড়ায়। আত্মা কিন্তু ঈশ্বরদত্ত বোধি দ্বারা চালিত হয়। এই বোধি অর্থে ওরা এমন এক গুণ বা ক্ষমতা মনে করে যার দ্বারা সত্যোপলব্ধি হয়, ঈশ্বর জ্ঞান যার
৩৮ লক্ষ্য এবং যা এমন সব কর্মের দিকে নিয়ে যায় যা সকলের কাছেই প্রিয় ও প্রশংসনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়

জন্মান্তর ও আত্মার বিশ্বপরিক্রমা

কুর্‌আনের 'ইখ্‌লাস্‌' নামক সূরায় বর্ণিত আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে বিশ্বাসস্থাপন যেমন মুসলমান ধর্মের লক্ষণ, ত্রিত্ববাদ বা Trinity-তে বিশ্বাস যেমন খ্রীস্টান ধর্মের লক্ষণ, আর Sabbath পালন করা যেমন ইহুদী ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস তেমনই হিন্দু ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না, সে হিন্দু নয়, তাকে হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে গণ্য করে না।

ওরা বলে : আত্মা যতক্ষণ না প্রজ্ঞা লাভ করে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্বকে একই মুহূর্তে সামগ্রিকভাবে জানার সামর্থ তার হয় না। সেজন্য তাকে জগতের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ ও জাগতিক অস্তিত্বের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে পর্যায়ক্রমে অর্জন করতে হয়। এসব অভিজ্ঞতা যদিও গণনা বহির্ভূত নয়, তবুও এর সংখ্যা এত বিরাট যে এক এক করে সেসব অর্জন ও সেসব অবস্থা অতিক্রম করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই আত্মাকে বিভিন্ন জীব ও তাদের বিভিন্ন শ্রেণী ও এই শ্রেণীগুলোর স্বভাবগত ক্রিয়াকলাপের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও তার দরুন নতুন চৈতন্য অর্জন করতে হয়। কিন্তু দেবতা, মানব ও পশু ধর্মের পার্থক্য হেতু আত্মার কর্মেরও পার্থক্য হয়। আর বিশ্বজগৎও অনিয়ন্ত্রিত নয়, কেননা রজ্জুবদ্ধ অশ্বের ন্যায় বিশ্ব এক বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত। সুতরাং অবিনশ্বর আত্মা স্বীয় কর্মের সৎ-অসৎ ভেদানুযায়ী বিভিন্ন নশ্বর দেহের মধ্য দিয়ে জন্মান্তরিত হতে থাকে, যাতে আনন্দের মধ্যে বাস করার ফলে আত্মার শ্রেয়োজ্ঞান জাগ্রত হয়ে তার মনে স্বীয় হিতবুদ্ধির কামনা জন্মে, আর দুঃখক্লেশের মধ্যে থাকার দরুন মন্দ ও নিকৃষ্টের প্রতি ঘৃণা ও তাকে পরিহার করার ইচ্ছা জাগরূক হয়।

এই জন্মান্তরের ধারা ঊর্ধ্বাভিমুখী, কখনও তার ব্যতিক্রম হয় না, যদিও ঊর্ধ্ব ও নিম্ন, উভয়বিধ গতিই সম্ভব। কর্মভেদে উচ্চ বা নীচ স্তরের জীবে জন্ম হয়ে থাকে। কর্মের এই প্রভেদ আবার পূর্বোক্ত ত্রিগুণাত্মক স্বভাবের সমন্বয় ও বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

৩৯. আত্মা ও জড় পদার্থ আপন আপন লক্ষ্যে পরিপূর্ণভাবে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এই জন্মান্তর চলতে থাকে। নিম্নতম লক্ষ্য হল, বাঞ্ছিতরূপে ব্যতীত জড় পদার্থের আর সমস্ত আকৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া; আর উচ্চতম লক্ষ্য হ'ল, আত্মার অজ্ঞাতকে জানার বাসনার নিবৃত্তি হওয়া, স্বীয় মহিমার ও অনন্যতার উপলব্ধি এবং জড়জগৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতির নশ্বরতাবোধ জন্মাবার ফলে জড় পদার্থের প্রতি নিরাসক্তির উদ্রেক। আত্মা তখন জড় পদার্থকে ত্যাগ করে এবং তার ফলে সমস্ত যোগ ছিন্ন হয়ে তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। জড় পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আত্মা তার নিজ সত্তায় ফিরে যায়, এবং জলপাই যেমন বীজ ও ফুলে রূপান্তরিত হয়েও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, তেমনি আত্মাও পরম জ্ঞানের আনন্দ, নিজের সত্তায় ফিরে আসার সময়ে, তার সঙ্গে নিয়ে আসে। তখন, জ্ঞানী, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ লুপ্ত হয়ে সব একাকার হয়ে যায়।

এদের গ্রন্থ থেকে এ-বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করা এখন আমাদের কর্তব্য। তারই সঙ্গে, অন্যান্য জাতির চিন্তায় অনুরূপ ভাব কি পরিমাণে পাওয়া যায়; তাও দেখান আমাদের উচিত।

দুই বিপক্ষ সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনে দণ্ডায়মান অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করে বাসুদেব বলেছেন: 'তোমার যদি পূর্ব নির্ধারিত বিধিলিপিতে বিশ্বাস থাকে তাহলে জেনো যে শত্রুসৈন্যেরা বা আমরা, কেউই মর নই, প্রত্যাগমন ব্যতিরেকে আমরা কেউই পৃথিবী ত্যাগ করব না। আত্মার মৃত্যু নাই, পরিবর্তনও নাই। কেবল দেহের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মা তার শৈশব, কৈশোর ও বার্ধক্য পরিক্রমণ করে, দেহক্ষয়ে তার পরিক্রমণ শেষ হয়, যার পরে আত্মার প্রত্যাবর্তন আবার শুরু হয়।'

তিনি আরও বলছেন: 'যে ব্যক্তি জানে যে আত্মা অবিনশ্বর, তার জন্ম বা ক্ষয় নাই, সে মৃত্যু বা নিহত হবার কথা কেমন করে ভাবতে পারে? আত্মা ধ্রুব ও নিত্য; তরবারি তাকে খণ্ডিত করে না, অগ্নি তাকে দহন করে না, জল তাকে নির্বাপিত করে না, বায়ু তাকে শুষ্ক করে না। দেহ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আত্মা অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়। যে আত্মার বিনাশ নাই তার জন্য তোমার শোকার্ত হওয়ার কি কারণ? যদি আত্মা নশ্বর হত তাহলেও এই অনিত্য নিরর্থক বস্তুর জন্য শোক করা তোমার আরও অনুচিত হত। আর যদি আত্মার চেয়ে দেহের প্রতি
৮০. তোমার পক্ষপাত বেশী থাকে, আর তার ক্ষয়ের সম্ভাবনায় তুমি বিহ্বল হয়ে থাক, তাহলে জেনে রাখ, জাত প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু আছে এবং মৃত্যুর পর

প্রত্যেক প্রাণীই অন্যরূপে ফিরে আসে। এই জীবন ও মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন নয়, জীবন-মৃত্যু সেই পরম ঈশ্বরের হাতে, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস এবং যাঁর মধ্যে এ সমস্তই লীন হবে।'

এই কথোপকথন প্রসঙ্গে অর্জুন তাঁকে বললেন : 'যে ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে মানবজাতির পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাঁর সাথে কেমন করে আপনি এরূপ যুদ্ধ করেন ? আপনি এখন আমাদের মধ্যে সেই মানুষেরই একজন হয়ে বাস করছেন, যাঁর জন্ম ও বয়সের বৃত্তান্ত সুবিদিত।' তার উত্তরে বাসুদেব বললেন 'আমাদের উভয়েরই অস্তিত্ব কালের অতীত। কতবার আমরা জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেছি, যখন জীবনের প্রতিক্ষণের পূর্বজ্ঞান আমার ছিল, কিন্তু তোমার কাছে তা ছিল অজ্ঞাত ! জগতের কল্যাণের জন্য যখনই অমি আবির্ভূত হওয়ার ইচ্ছা করি তখনই আমি দেহ ধারণ করি, কেননা মানুষের মধ্যে বাস করার জন্য মানবাকৃতি ধারণ ভিন্ন গতি নাই।

একজন রাজা সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে,—রাজার নাম আমার স্মরণ নাই,—যে তার অনুচরদেরকে আদেশ দিয়েছিল, যেন মৃত্যুর পর তার শব এমন স্থানে দাহ করা হয়, যেখানে পূর্বে আর কোন শবদাহ হয় নি। ঐরূপ স্থান খুঁজে না পেয়ে, তারা নিরাশ হয়ে পড়েছে, এমন সময়ে সমুদ্রের জলের উপরে দৃশ্যমান এক প্রস্তরখণ্ড দেখতে পেয়ে, তাদের অভিষ্ট স্থান পেয়েছে মনে করে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বাসুদেব তখন তাদের বললেন, 'এই প্রস্তর-খণ্ডের উপর বহুবার এই রাজারই শব দহন করা হয়েছে; কিন্তু তোমাদের সংকল্প মত কার্য কর, কেননা রাজা তোমাদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন; তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে'।

বাসুদেব বলছেন : 'মোক্ষের আশায় যে সংসার থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে, অথচ এই লক্ষ্যসাধনে যার মন বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার প্রয়াসের জন্য সে পুরস্কৃত হবে কিন্তু অক্ষমতার দরুন তার ইষ্টসিদ্ধি হবে না। সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং তপস্যার উপযোগী দেহধারণের যোগ্য হবে 'এই নতুন দেহ ঈশ্বরানুপ্রেরণায় তার পূর্বজন্মের অভীষ্টের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হবার যোগ্যতা জন্মাবে এবং মন তার আয়ত্তাধীন হবে। এইভাবে দেহ থেকে দেহান্তরে ভ্রমণ করে তার আত্মশুদ্ধি হতে থাকবে এবং অবশেষে সে জন্ম-পরম্পরায় শৃঙ্খল-মুক্ত হবে।'

বাসুদেব আরও বললেন : 'জড়দেহ-মুক্ত হলে আত্মা প্রজ্ঞা লাভ করে; যতক্ষণ দেহ দ্বারা আবৃত থাকে, জড়-পদার্থের মালিন্যের কারণে আত্মার

অজ্ঞানতা ঘোচে না। সে মনে করে কর্মের সেই-ই কারক এবং জগতের জন্যই জাগতিক কর্ম সাধিত হয়; সেজন্য সে ঐ কর্মে আসক্ত থাকে এবং তার উপর ইন্দ্রিয়ানুভূতির ছাপ পড়ে। দেহত্যাগ করার পরও তাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বাদ তাতে থেকে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় না। আত্মা তখন ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে আর সেখানে ফিরে যেতে চায়। যেহেতু বিভিন্ন দেহের মধ্য দিয়ে পরিক্রমণ কালে তার পরস্পরবিরোধী পরিবর্তন হতে থাকে, সেহেতু আত্মা মৌলিক ত্রিগুণের (সত্ত, রজঃ, তমঃ) প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। তার পক্ষ যখন কর্তিত, তখন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজকে প্রস্তুত করা ব্যতীত আত্মার আর কি উপায় আছে?"

তিনি আরও বলেছেন: 'প্রজ্ঞা যার লাভ হয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, কারণ সে ঈশ্বরানুরক্ত এবং ঈশ্বরও তার অনুরাগী। কতবার যে তার জন্মান্তর হয়েছে! আর সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত, প্রত্যেক জন্মে সে পূর্ণ তারই একনিষ্ঠ সাধনা করেছে।'

"বিষ্ণুধর্মে" অশরীরী জীব প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় বলেছেন: 'ব্রাহ্মণ, মহাদেবপুত্র কার্তিকেয়, লক্ষ্মী (যিনি সমুদ্র থেকে অমৃত উত্তোলন করেছিলেন), দক্ষ (মহাদেব যাকে পরাস্ত করেছিলেন) এবং মহাদেবের স্ত্রী উমাদেবী—এঁদের প্রত্যেকেই এই কল্পের মধ্যভাগে বিদ্যমান আছেন এবং এই রকম তাঁরা বহুবার বিদ্যমান থেকেছেন তার ইয়ত্তা নাই!

ধূমকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে বরাহ মিহির লিখেছেন: "ধূমকেতুর আবির্ভাবকালে মানুষ অমঙ্গল আশংকায় এত ভীত হয়ে পড়ে যে, তারা বাড়িঘর ছেড়ে সন্তান-সন্ততির হাত ধরে, বিলাপ করতে করতে আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করতে থাকে এবং পরস্পরকে বলতে থাকে যে 'রাজার পাপের জন্য আমাদের এই শাস্তি।' অন্যেরা তার উত্তরে বলে, 'না, এ আমাদেরই পূর্বজন্মের কর্মফল।"

'মানি' ইরান শহর থেকে বহিষ্কৃত হবার পর ভারতবর্ষে এসে এখানকার জন্মান্তরবাদকে স্বীয় ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেন। তার 'রহস্যগ্রন্থ' নামক পুস্তকে তিনি বলেছেন: 'যীশুখৃীস্টের শিষ্যেরা যখন জানতে পারলেন যে আত্মার বিনাশ নাই, যোনি ভ্রমণ করে আত্মা বিভিন্ন আকৃতিতে, পরিচ্ছেদের ন্যায় নিজকে আবৃত করে, প্রত্যেক জীবদেহের রূপ সে পরিগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক আকৃতির ছাঁচে সে নিজেকে গড়ে, তখন যে আত্মা সত্যকে গ্রহণ করেনি এবং নিজ অস্তিত্বের মূল কারণ যে জানে না, তার পরিণাম সম্বন্ধে তাঁরা খৃীস্টকে

প্রশ্ন করলেন। যীশু বললেন, 'যে নিজ সত্যকে গ্রহণ করে না সে দুর্বল আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তার শান্তি নাই।' 'বিনাশ' শব্দের দ্বারা মানি আত্মার ক্লেশ বোঝাতে চেয়েছেন, তার বিলুপ্তি নয়, কারণ অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'দ্যায়সানীয়'দের ধারণা যে মানুষের দেহই আত্মার উন্নতি ও শুদ্ধিলাভ হয়। ওরা জানে না যে দেহই আত্মার শত্রু, তার উন্নতির প্রতিবন্ধক, তার কারাগার ও নিদারুণ শাস্তি। যদি এই মানবদেহের অস্তিত্ব সত্য হত তাহলে তার স্রষ্টা এ দেহকে ক্ষয় ও বিনষ্ট হতে দিত না এবং গর্ভাশয়ে শুক্রকোষ দ্বারা নিজের বংশ রক্ষা করতে তাকে বাধ্য করত না।

'পাতঞ্জল' গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'অজ্ঞান-ই আত্মার শৃঙ্খল। এই অজ্ঞানতা পরিবেষ্টিত আত্মা খোসায় আবৃত তণ্ডুলের ন্যায়। নিজের জন্ম থেকে অন্য তণ্ডুলের জন্ম দেওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী অবস্থায় যতক্ষণ সে থাকে, ততক্ষণ তার পুষ্ট ও পরিপক্ক হওয়ার ক্ষমতা থাকে; খোসামুক্ত হলে তন্ডুলের সে যোগ্যতা আর থাকে না; সে তখন চিরকালের মত নির্জীব জড়ে পরিণত হয়। যে সব বিভিন্ন জীবদেহের মধ্যে দিয়ে আত্মা পরিভ্রমণ করে, তাদের বৈচিত্র্যের, তাদের আয়ুষ্কাল ও সুখ-দুঃখের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর আত্মার প্রতিফল প্রাপ্তি নির্ভর করে।'

শিষ্য প্রশ্ন করে : 'সেই আত্মার কি হবে, যে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য কর্ম করে তার প্রতিফল ভোগ করতে গিয়ে অন্য জন্মের দুঃখে জড়িয়ে পড়ে?'

গুরু উত্তর করেন : 'সে পূর্বজন্মের কর্মানুযায়ী আনন্দ ও বেদনার মধ্যে বাস করবে, কখনও সুখ আর কখনও দুঃখ ভোগ করবে।'

শিষ্য আবার প্রশ্ন করে : 'যদি মানুষ এই জন্মে এমন কর্ম করে, যার প্রতিফলস্বরূপ মনুষ্যেতর জীবদেহে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং দুই জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকায় তার কৃতকর্মের প্রকৃতি সে বিস্মৃত হয়, তাহলে কি হবে?'

গুরু উত্তর করলেন : 'আত্মার সাথে সম্পৃক্ত থাকাই কর্মের প্রকৃতি। কারণ কর্ম আত্মারই ইচ্ছার ফল, দেহ তার যন্ত্র মাত্র। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বিস্মৃতি নাই, কারণ সেসব ব্যাপার কালের বন্ধনমুক্ত, সময়ের নৈকট্য বা দূরত্ব তাতে প্রযুক্ত হয় না। আত্মার সাথে সংলগ্ন থেকে কর্ম তার পরজন্মের উপযোগী চরিত্র ও মেজাজ গঠন করে; স্বীয় নির্মলতার গুণে আত্মা তা চিন্তা করে এবং স্মরণে রাখে। কিন্তু যতদিন দেহের সাথে সে যুক্ত থাকে, ততদিন জড় পদার্থের মালিন্য আত্মার আলোককে আচ্ছন্ন করে রাখে। মানুষের

ক্ষেত্রেও ঐই রকম হয়ে থাকে; জানা বিষয়কে মনে রেখেও মানুষ পীড়া, মস্তিষ্কবিকৃতি বা নেশার প্রভাবে সাময়িকভাবে তা ভুলে যায়। তুমি কি দেখ নাই যে 'দীর্ঘজীবী হও' এই আশীর্বচনে শিশুরা কেমন খুশী হয়, আর 'তোমার মৃত্যু হোক' এই অভিশাপে তারা কি রকম ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে ? তাদের কাছে এ দুটি ব্যাপারের কি তাৎপর্য থাকতে পারে—যদি তারা কর্মফল স্বরূপ জন্মান্তর অতিক্রম কালে জীবনের সুখ ও মৃত্যুর দুঃখ ভোগ না করে থাকে ?'

এইরূপ বিশ্বাস পোষণে ইউনানীরাও হিন্দুদের মত ছিল। সক্রেটিস তাঁর Phaedo নামক গ্রন্থে বলেছেন : 'প্রাচীনদের উক্তি থেকে আমাদের মনে পড়ে যে ইহজগৎ থেকে আত্মা Hades-এ যায়, সেখান থেকে আবার এখানে আসে। মৃতবস্তু থেকেই জীবের সৃষ্টি হয় এবং বস্তুমাত্রই সচরাচর তার বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তু থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। কাজেই, যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা আসলে জীবিত আছে। Hades এ আমাদের আত্মাগুলি স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে, বিষয়ানুযায়ী প্রত্যেক আত্মাই সুখী বা দুঃখী হয় এবং সেই বিষয়টির চিন্তা করে। এই সংবেদনশীলতা আত্মাকে দেহের সাথে যুক্ত করে রাখে এবং উভয়কে একত্রে গ্রথিত করে শারীর রূপ দেয়। যে আত্মা বিশুদ্ধ নয় সে Hades-এ যেতে পারে না; দেহ-প্রকৃতির স্বভাব-পরিপূর্ণ অবস্থাতে সে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং অনতিবিলম্বে অন্য দেহে পতিত হয়ে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মত তাতেই সংলগ্ন হয়ে থাকে। সেই জন্য, অনন্য ও পূত ভগবৎ সত্তার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য তার হয় না।'

সক্রেটিস আরও বলেছেন : 'আমাদের আত্মার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে তাহলে আমাদের বর্তমান জ্ঞান, পূর্বার্জিত জ্ঞানেরই স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, মানব রূপ ধারণের পূর্বে আত্মা অন্যত্র ছিল। শৈশবে যে বস্তুর
৪৪ ব্যবহারে মানুষ অভ্যস্ত হয়, সেই বস্তু পুনরায় দেখলে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে, যেমন কেহ খঞ্জনি বা করতাল দেখলে, তার শৈশবে যে অজ্ঞাতনামা ছেলেটি এই যন্ত্র বাজাত তার কথা মনে পড়ে যায়। জ্ঞান তিরোহিত হওয়ার নামই বিস্মৃতি, আর দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে আত্মা যে সব বিষয় বা বস্তুর পূর্ণ পরিচয় লাভ করেছিল, জ্ঞান সে পরিচয়ের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে।'

Proclus বলেছেন : 'স্মরণ ও বিস্মরণ বিচারশক্তিসম্পন্ন আত্মার বৈশিষ্ট্য। আত্মা যে শাশ্বত তা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং এ কথাও মানতে হয় যে আত্মা চিরকালই সজ্ঞান ও অজ্ঞান; দেহ থেকে পৃথক থাকাকালে সে জ্ঞানী,

আর দেহের সন্নিকট হবার কালে সে অজ্ঞানী। কারণ, অ-দেহী অবস্থায় আত্মা চৈতন্যলোকের অংশ, আর সেইজন্যে সে জ্ঞানী; দেহ সংস্পর্শে আত্মা অধোগামী হয়, আর তখন অন্য শক্তির প্রভাবে তাতে বিস্মৃতি ছেয়ে যায়।

যেসব সুফী বলেন যে, ইহজগৎ হচ্ছে আত্মার ঘুমন্ত অবস্থা, আর পরলোক জাগৃতির, আর সেই সঙ্গে আকাশ, আরশ, কুরসী ইত্যাদির মত স্থান বিশেষে আল্লাহ্‌র মর্ত্যে স্বাবতরণ (Incarnation of God) যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাও এ তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে থাকেন। অবশ্য এমন সুফীও আছেন যাঁদের মতে পশু, বৃক্ষ, জড়পদার্থ প্রভৃতি বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ, যাকে তাঁর সামগ্রিক প্রকাশ অথবা বিশ্বরূপ বলা হয়ে থাকে। এই তত্ত্বে যখন তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেন, তখন তাঁদের কাছে আত্মার বিভিন্ন জীবদেহ ধারণের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন 'লোক', ও ফলপ্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট স্বর্গ ও নরকাদির বর্ণনা

সমাগমের স্থানকে 'লোক' বলা হয়। বিশ্বজগৎ উত্তম, অধম ও মধ্যম,---এই তিন প্রাথমিক শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্বোচ্চ জগতের নাম 'স্বর্গলোক' অর্থাৎ 'স্বর্গ'। নিম্নতম জগৎ হচ্ছে 'নাগলোক' অর্থাৎ সর্পরাজ্য; আসলে এটি নরক। একে আবার 'নাশলোক', আর কখনও 'পাতাল'ও বলা হয়। এই দুই-এর মধ্যবর্তী যে জগৎ, যাতে আমরা আছি, তার নাম 'মাদলোক'
৪৫ (মধ্য লোক ?), 'মর্ত্যলোক' কিংবা 'মনুষ্যলোক' অর্থাৎ মানব জগৎ। শেষোক্ত জগৎ মানুষের পুণ্য অর্জন করার জন্য এবং সর্বোচ্চ লোক তার প্রতিফল প্রাপ্তির স্থান, আর নিম্নতম লোক তার দণ্ডপ্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট। যে স্বর্গ বা নরকের যোগ্য হয়, সে তার কর্মকালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তার ফলভোগ করতে থাকে; কিন্তু এই দুই লোকের যে 'লোকে'ই সে থাকুক না কেন, দেহ বিমুক্ত আত্মারূপেই সে থাকে। আর, যে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য নয় অথচ নরকের শাস্তিও প্রাপ্য হয়নি তার জন্য আর এক জগৎ আছে যার নাম তির্যগ' লোক, অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিহীন পশু ও বৃক্ষাদির জগৎ। এই জগতের নিম্নতম জীব থেকে জন্মান্তর আরম্ভ করে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন মানবজীবনের দিকে আত্মাকে আরোহণ করতে হয়। এই 'তির্যগলোকে' আত্মাকে থাকতে হয়, হয় তার কর্মফল স্বর্গ বা নরকে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বলে, নয়ত নরক থেকে সে প্রত্যাবর্তন করেছে বলে। কারণ, হিন্দুদের মতে আত্মা যদি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসে তাহলে সে মানব রূপেই আসে, কিন্তু নরক থেকে এলে তাকে প্রথমে বৃক্ষ ও পশুদেহে বিচরণ করে মানব দেহ ধারণের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

হিন্দুদের পুরাণাদিতে বহুসংখ্যক নরক, তার গুণাগুণ ও নামের বর্ণনা আছে। প্রত্যেক পাপের জন্য পৃথক নরকের ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণু-পুরাণানুযায়ী নরকের সংখ্যা হচ্ছে আশি হাজার। এই গ্রন্থ থেকে আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

'যে মিথ্যা দাবী করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আর যে এরূপ কর্মে সহায়তা করে এবং যে অন্যকে উপহাস করে তারা সব 'রৌরব নরকে যাবে।'

'যে নির্দোষকে হত্যা করে, যে পরস্বাপহরণ করে, যে অপরকে লুণ্ঠন করে, যে গো-হত্যা করে, তারা 'রুধো' নামক নরকে যাবে। যারা শ্বাসরুদ্ধ করে প্রাণী হত্যা করে তারাও নরকে যাবে।'

'যে ব্রাহ্মণ হত্যা করে, যে স্বর্ণ চুরি করে এবং যে তার সাহায্য করে, যে রাজা প্রজাপীড়ন করে, যে গুরুপত্নী গমন করে, কিংবা যে শাশুড়ীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের জন্য 'তপ্তকুম্ভ' নামক নরক আছে।

'লোভের বশে যে নিজ স্ত্রীর ব্যভিচারকে উপেক্ষা করে, যে নিজ কন্যা বা
৪৬. পুত্রবধূর সাথে ব্যভিচার করে, যে নিজ সন্তান বিক্রয় করে, কিংবা ধন রক্ষার জন্য যে নিজের প্রতিও কৃপণতা করে, তারা 'মহাজ্বাল' নামক নরকে যাবে।'

'যে গুরুকে অসম্মান করে, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, যে মানুষকে অবজ্ঞা করে, পশু গমন করে, যে বেদ পুরাণাদিকে উপহাস করে, কিংবা তদ্দ্বারা পণ্যশালায় জীবিকা নির্বাহ করে, তারা 'শবল' নরকে যাবে।'

তস্কর, ঠগ, আর যে মানুষের সরল পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, যে স্বীয় পিতার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, যে ঈশ্বর বা মানুষ কাউকেই ভালবাসে না, ঈশ্বর যে সব রত্নকে মহার্ঘ করেছেন তার সম্মান না করে যে সেগুলোকে সামান্য প্রস্তরবৎ মনে করে তাদের স্থান 'ক্রিমিষ' নরকে।'

'যে জনক-জননী বা পূর্বপুরুষদের অধিকার উপেক্ষা করে, যে দেবতাদের প্রতি কর্তব্য পালন করে না, যে বাণ বা বর্ষাফলক নির্মাণ করে, তারা 'লারাপক্ষ' (লালাভক্ষ?) নামক নরকে বাস করবে।'

'তরবারি ও ছুরি নির্মাতারা 'বিষাসন' নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

'রাজার প্রাপ্য না দেবার জন্য লোভের বশবর্তী হয়ে যে স্বীয় ধন গোপন করে, যে ব্রাহ্মণ হয়ে মাংস, তৈল, ঘৃত ও রক্ষিত ব্যঞ্জন বা মদ্য বিক্রয় করে, তাদের জন্য 'অধোমুখ' নরকের বিধান আছে।'

'যে কুক্কুট, মার্জার, মেষ, শূকর ও পক্ষী পালন করে সে 'রুধীরান্ধ' নরকে যাবে।'

'যারা বাজারে তামাশা ও গান করে বেড়ায়, জল উত্তোলনের জন্য যে কূপ খনন করে, পূজার দিনে যে স্ত্রীসংগম করে, লোকের গৃহে অগ্নি সংযোগ করে, যে বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও তার ধনের লোভে আবার তাকে গ্রহণ করে, 'রৌদ্র' (রুধীর?) নরকে তাদের বাস হবে।'

'যে মধুচক্র থেকে মধু সংগ্রহ করে সে 'বৈতরণে' (?) যাবে।'

'যৌবন মদে মত্ত হয়ে যে অন্যের ধন বা স্ত্রী লুণ্ঠন করে তার স্থান হবে 'কয়ক' (কৃক) নরকে।

'বৃক্ষ কর্তনকারী 'অসিপত্রবনে' যাবে।'

'ব্যাধ' পক্ষাদি ধরার ফাঁদ ও জাল নির্মাতা 'বনজ্বালা' ('বহ্নিজ্বালা'?) নরকে যাবে।

'আচার ও রীতিকে যে অবহেলা করে এবং যে শাস্ত্রের বিধান অমান্য করে—পাপীদের মধ্যে সেই সর্ব নিকৃষ্ট—সে 'সন্দংসক' নরকে যাবে'।

এই দীর্ঘ তালিকা আমরা এই জন্য দিলাম যে, কোন্ কোন্ কর্মকে হিন্দুরা পাপ মনে করে, তা এর থেকে বোঝা যাবে।

ওদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে, পুণ্যার্জনের এই মধ্যবর্তী জগৎই মনুষ্যলোক এবং এখানে মানুষকে বাস করতে হয়। তা এইজন্য যে তার
৪৭. কর্মফল তাকে স্বর্গারোহণ বা নরক ভোগ কোনটারই যোগ্য করেনি। তাদের মতে স্বর্গ এক উচ্চস্তরের জগৎ; আত্মা সেখানে যে আনন্দ উপভোগ করে তার স্থিতির দৈর্ঘ্য তার সৎকর্মের অনুপাতে নির্দিষ্ট থাকে। তেমনই, শাস্তি হিসাবে পশু, বৃক্ষাদি ইতর জীবের মধ্যে বিচরণ করার দৈর্ঘ্যও দুষ্কর্মের অনুপাতে নির্দিষ্ট থাকে। এদের মতে, মানব জীবন থেকে অধঃপতিত হওয়া ছাড়া নরকের অন্য কোন অস্তিত্ব নাই।

মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের এই সব পরিণাম ভোগ করতে হয় এই জন্য যে, বন্ধন মোচনের এমন কোন সরল পথ নাই যা তাকে নিশ্চিত প্রজ্ঞার দিকে নিয়ে যেতে পারে; নিজে অনুমান করে বা পূর্বগামীদের অনুসরণ করেই সে পথে অগ্রসর হতে হয়। কোন কর্মই, এমন কি, মানুষের শেষ কৃতকর্মও কখনও বিফলে যায় না, তার অর্জিত পাপপুণ্যের হিসাব-নিকাশ হয়ে যাওয়ার পরও তা গণনা করা হয়। কিন্তু কর্মের প্রতিফল, তার উদ্দেশ্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে। সে প্রতিফল, হয় তার বর্তমান জন্মে, নয়তো তার পরজন্মে কিংবা দেহত্যাগ ও পুনরায় দেহ ধারণের মধ্যবর্তী অবস্থাতেই সে পায়।

এই পর্যন্ত এসে হিন্দুরা দার্শনিক তত্ত্ব ছেড়ে শ্রুতি ও কিংবদন্তীর দিকে চলে যায়। দণ্ড ও পুরস্কারের স্থান দুটির বর্ণনা প্রসঙ্গে ওরা বলে যে, এই দুইটি স্থানে মানুষ কায়াহীন অবস্থায় থাকে এবং কর্মফল পাওয়ার পর সে আবার দেহ ধারণ করে বিধিনির্দিষ্ট অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে মানবজীবনে প্রত্যাবর্তন করে। এই জন্য 'সাংখ্য' গ্রন্থের লেখক স্বর্গলাভের পুরস্কারকে মঙ্গল বা পরম কাম্য বলে মনে করে না, কারণ স্বর্গবাস স্থায়ী

নয়, তারও শেষ আছে এবং স্বর্গের জীবনের সঙ্গে পৃথিবীর জীবনের সাদৃশ্য আছে; কেননা সেখানেও অহংকার ও ঈর্ষার রেশ থাকে এবং স্বর্গীয় অস্তিত্বের ও মর্যাদারও শ্রেণীভেদ আছে, অথচ পূর্ণ সাম্য না হলে লোভ ও ঈর্ষা কখনও দূর হয় না।

সূফী সাধকরাও স্বর্গবাসকে অন্য কারণে শুভ বা কাম্য করে না, তার কারণ স্বর্গে পরম সত্তা (আল্লাহ্) কে ছেড়ে আত্মা অন্য বস্তুকে আকৃষ্ট ও তৃপ্ত থাকে এবং পরম মঙ্গলস্বরূপ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য বস্তুতে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে হিন্দুদের ধারণামতে, দেহহীন অবস্থায় আত্মা স্বর্গ ও নরকে বাস করে। এই ধারণাটি কিন্তু ওদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের, যারা আত্মাকে স্বয়ম্ভূ মনে করে। কিন্তু যারা নিম্নশ্রেণীর লোক, দেহ ব্যতিরেকে আত্মার কল্পনা যারা করতে পারে না, আত্মা সম্বন্ধে তারা নানারূপ ধারণা পোষণ করে। একদল মনে করে যে, নির্মীয়মাণ নতুন
৪৮. অবয়বের জন্য আত্মার প্রতীক্ষাই মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণার কারণ। যতক্ষণ না অনুরূপ ক্রিয়াগুণ-সম্পন্ন কোন সগোত্র জীবের উন্মেষ হয়, ততক্ষণ আত্মা দেহ থেকে বিচ্যুত হয় না। প্রকৃতির নিয়মে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বা মৃত্তিকা গর্ভে বীজরূপে যে সব জীবনের সূচনা হয়, সেইরূপ কোন জীবের সৃষ্টি হলেই তবে আত্মা তার পূর্বদেহ ত্যাগ করে।

আর একদল কিন্তু প্রচলিত মতানুযায়ী বলে থাকে যে, আত্মা নতুন অবয়বের জন্য অপেক্ষা করে না; পঞ্চভূত থেকে তার জন্য আর একটি আকৃতি প্রস্তুত হলেই পুরাতন দেহের জীর্ণতাহেতু আত্মা তাকে ত্যাগ করে। এই নতুন অবয়বকে 'অতিবাহিকা' বলা হয়, অর্থাৎ দ্রুতনির্মিত সত্তা। এই নামকরণের হেতু এই যে, এই অবয়বের সৃষ্টি জন্মের প্রক্রিয়ায় হয় এবং এই দেহে আত্মার পূর্ণ এক বৎসরকাল নিরতিশয় যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করতে হয়, পুরস্কার বা দণ্ডের যোগ্য সে হোক আর না হোক।

এ অবস্থাটি 'বরজখের' মত, যা পারসীকরা কর্ম ও কর্মফল প্রাপ্তির মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলে। এইজন্য হিন্দু শাস্ত্রে মৃতের উত্তরাধিকারীকে তার সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মাদি পালন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বৎসরান্তে এই অনুষ্ঠানাদি শেষ হয়, কারণ তখন আত্মা তার নির্দিষ্ট স্থানে চলে যায়।

আমার এই কথার প্রমাণ হিসাবে, এখন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেব। বিষ্ণু পুরাণে আছে: "নরক ও শাস্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

মৈত্রেয়ী পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর করলেন: এর উদ্দেশ্য হল ভাল ও মন্দ, জ্ঞান ও অজ্ঞানতার পার্থক্য বিধান এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। পাপী মাত্রেই 'নরকে' যাবে তা নয়। তাদের কেউ কেউ জীবদ্দশায় অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নরক ভোগ থেকে অব্যাহতি পায়। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হল প্রত্যেক কর্মে বিষ্ণু নাম স্মরণ করা। পাপীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার লতা-বৃক্ষ অথবা কীট-পতঙ্গের মত নিকৃষ্ট জীব, কিংবা উৎকুন মহীলতা মত ঘৃণ্য সরীসৃপের মধ্যে তার কর্মানুযায়ী নির্দিষ্টকাল ধরে বিচরণ করবে।"

'সাংখ্য' পুস্তকে আছে: "যে সম্মান ও সুফলের অধিকারী হয়, সে দেবতার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়, দেবাত্মাদের সাথে সে মেলামেশা করে, আকাশ-মণ্ডলের অধিবাসীদের বা অষ্ট প্রকারের অশরীরী আত্মাদের মত হয়ে সে এখানে অবাধে বিচরণ করতে পারে। আর পাপ ও দুষ্কর্মের জন্য যে অধঃ-
৪৯. পতিত হওয়ায় যোগ্য, সে পশু বা বৃক্ষে পরিণত হবে এবং পুরস্কারের যোগ্য হয়ে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মত্যাগ করে দেহরূপী বাহন পরিত্যাগের ফলে মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত ঐ অবস্থায় সে বিচরণ করতে থাকবে।"

জন্মান্তরবাদে আকৃষ্ট কোনও এক (মুসলমান) শাস্ত্রবেত্তা (মুতাকাল্লেম) বলেছেন: "আত্মার পরিক্রমণের চার চারটি স্তর আছে। এক, দেহান্তর (نسخ); এ স্তর মনুষ্যজন্মে সীমাবদ্ধ, কেননা জন্ম প্রক্রিয়ার দ্বারাই এক ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তিতে জীবন সঞ্চারিত হয়। এর বিপরীত স্তর হোল, দুই: বিকৃতি; এ স্তরও বিশেষ করে মানুষ সম্বন্ধে-ই প্রযোজ্য, কারণ মানুষই বানর, শুকর, হস্তী ইত্যাদিতে পরিণত হয়। তিন: উদ্ভিদের মত স্থানুত্ব। এ স্তর বিকৃতির চেয়েও কষ্টকর, কারণ এ অবস্থা অনন্ত-কাল ধরে পর্বতের মত স্থায়ী হয়। এর আবার বিপরীত দশা হোল: চার অবলুপ্তি। এ দশা মুলোৎ-পাটিত বা কর্তিত উদ্ভিদ ও বলির পশুর হয়, কারণ এগুলো নিশ্চিহ্ন হবার সময়ে কোনও জের বা বংশ রেখে যায় না।"

আবু ইয়াকুব সিযুজি তাঁর 'কাশফুল মাহযুব' নামক পুস্তকে বলতে চেয়েছেন যে, জীবজগতের কোনও প্রজাতি কখনও লোপ পায় না এবং জন্মান্তর এক জাতির। প্রজাতির মধ্যেই হতে থাকে, কোনও প্রাণী তার প্রজাতি অতিক্রম করে অন্য প্রজাতিতে জন্মান্তরিত হয় না।

প্রাচীন ইউনানীদেরও এইরূপ ধারণা ছিল। বুদ্ধিসম্পন্ন জীব পশুদেহে আবৃত হবে, প্লেটোর এই মত উদ্ধৃত করে বৈয়াকরণিক ইয়াহইয়া (Johanues

Grammaticus) মন্তব্য করেছেন যে এই ব্যাপারে প্লেটো Pythagoras এর উদ্ভট গালগল্পেরই প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র।

Phaedo (فاذن) নামক গ্রন্থে সক্রেটিস বলছেন: "দেহ পার্থিব, মৃন্ময়, গুরুভার ও স্থূল। দেহাসক্ত ভ্রাম্যমাণ আত্মা নিরবয়বের ভয়ে ও Hades (আত্মার সমাগমের স্থান) এর আতঙ্কে যে স্থান দেখে তাতেই সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখন আত্মা মলিন হয়ে যায় এবং কবর ও সমাধি ক্ষেত্রে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এই সব স্থানেই ছায়ারূপে আত্মাকে আবির্ভূত হতে দেখা গিয়েছে। এই ছায়ারূপ ধারণ সেই সব আত্মারই হয় যাদের বন্ধন মোচন সম্পূর্ণ হয়নি, যাদের মধ্যে তাদের প্রিয় বস্তুর এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।"

সক্রেটিস আরও বলেছেন: "এগুলো সৎলোকের আত্মা বলে মনে হয়
৫০. না। এগুলো দুষ্টলোকের আত্মা, যারা এই সব বস্তুর মধ্যে বিচরণ ক'রে তাদের পূর্বের কুশিক্ষার প্রতিশোধ নেয়। দেহ ধারণের যে কামনা তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে তার দরুন কোনও দেহের সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এই অবস্থাতেই থাকে। পৃথিবীতে থাকাকালে তাদের যে চরিত্র ছিল, সেইরূপ চরিত্রসম্পন্ন দেহতেই তারা বাসা করবে। যেমন পান ও ভোজন ছাড়া যে আর কিছু জানে না, সে বিভিন্ন প্রকারের বলিবর্দ ও হিংস্র পশুর দেহে প্রবিষ্ট হবে; যে উৎপীড়ন ও অবিচারকে উত্তম জ্ঞান করেছে সে নেকেড়ে বাঘ, শ্যেন ও বাজপক্ষীর দেহ প্রাপ্ত হবে।"

মৃত্যুর পর আত্মার সমাগম স্থানগুলো সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন: "যদি আমি না মনে করতাম যে সর্বপ্রথমে আমি প্রাজ্ঞ, মুখ্য ও মহৎ দেবতাদের কাছে যাব এবং তারপরে সেইসব মৃত মানবাত্মার কাছে যাব, সততায় যারা এখানকার মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে মৃত্যুর জন্য শোকার্ত না হওয়া আমার অন্যায় হোত।"

পুরস্কার ও শাস্তির স্থান দুটি সম্পর্কে প্লেটো বলেছেন: "মানুষের মৃত্যু হলে Daimon নামক নরক-প্রহরীদের একজন তাকে বিচারস্থলে নিয়ে যায়, আর ভারপ্রাপ্ত, আর একজন অন্যান্য আত্মার সাথে তাকে পথ দেখিয়ে Hades-এ নিয়ে আসে। সেখানে সে বিধিনির্দিষ্ট সংখ্যার দীর্ঘ কালচক্র অতিবাহিত করতে থাকে।" Telephos বলেন: "Hades-এ যাবার পথ সমতল।" আমি বলি, "Hades-এ যাবার পথ যদি একটিমাত্র কিংবা সমতলই হবে, তাহলে পথপ্রদর্শকের আবশ্যক হোত না। যে আত্মার দেহকামনা আছে, কিংবা যে দুষ্কর্ম ও অন্যায়াচরণ করেছে এবং হত্যাকারীর

আত্মার সাথে যার সাদৃশ্য আছে, সে 'Hades' থেকে পলায়ন করে, প্রত্যেক প্রজাতির দেহে নিজকে গোপন করতে থাকে। এইভাবে কিছুকাল কাটার পরে বাধ্যমূলকভাবে তাকে তার যোগ্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আর, যারা পবিত্র আত্মা, তারা দেবতাদিগকে সহচর ও পথপ্রদর্শকরূপে পায় এবং তাদের যোগ্য স্থানে তারা বাস করে।

তিনি আরও বলেন: 'মৃতদের মধ্যে যার চরিত্র মধ্যম পর্যায়ের, তার আত্মা 'Acheron-এ তার জন্য প্রস্তুত তরণীতে আরোহণ করবে। শাস্তি ভোগ করে পাপমুক্ত হবার পর সে স্নান করে তার সৎকার্যের গুণানুযায়ী সম্মান লাভ
৫১. করবে। আর, যারা দেবতাদের জন্য উৎসর্গিত বস্তু অপহরণ, দস্যুতা, অন্যায় হত্যা ও ক্রমাগত ধর্মের বিধান স্বেচ্ছায় লংঘনের মত মহাপাপ করেছে, তারা 'Tartarus' নামক ভয়াবহ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, সেখান থেকে তারা কখনও মুক্তি পাবে না। তবে যারা জীবদ্দশাতেই তাদের দুষ্কৃতির জন্য অনুতপ্ত হয়েছে, যেমন জনক-জননীর প্রতি দুর্ব্যবহার, কিংবা অনিচ্ছাক্রমে প্রাণীহত্যার মত যাদের অপরাধ কিছুটা লঘুতর, তারাও Tartarus-এ নিক্ষিপ্ত হয়ে পূর্ণ এক বৎসরকাল শাস্তি ভোগ করবে বটে, তবে তরঙ্গমালা তাদেরকে এমন একস্থানে নিক্ষেপ করবে যেখান থেকে তারা চিৎকার করে তাদের প্রতিপক্ষদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকবে, প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে নিরস্ত হতে তাদের কাছে অনুনয় করতে থাকবে, যাতে শাস্তি থেকে তাদের নিষ্কৃতি হয়। প্রতিপক্ষরা সন্তুষ্ট হলে, তারা মুক্তি পাবে, নচেৎ তাদিগকে আবার Tartarus-এ প্রেরণ করা হবে। এইভাবে তাদের দণ্ড ভোগ চলতে থাকবে, যতদিন না প্রতিপক্ষরা তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে। আর, যারা পূত চরিত্রের লোক ছিল, তারা এই পৃথিবীতেই এসব ভয়াবহ স্থান থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়, বন্ধন দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দভোগ করে এবং নির্মল জগতে বাস করার অধিকারী হয়।"

Tartarus হচ্ছে এক বিরাট গভীর খাদ, যাতে সমস্ত নদী এসে পড়েছে। প্রত্যেক জাতি নিজ অভিজ্ঞতানুযায়ী নরকের ভয়াবহতা কল্পনা করে থাকে। পশ্চিম ভূভাগের দেশগুলো প্রায়ই বন্যা ও জল প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে Plato-র উপরোল্লিখিত বর্ণনায় এমন স্থানের ইঙ্গিত আছে, যেখানে লেলিহান অগ্নিশিখা রয়েছে। মনে হয়, তিনি সমুদ্র বা সমুদ্রের কোনও স্থান বিশেষ বোঝাতে চেয়েছেন, যেখানে মহা আবর্ত 'দুরদুর' আছে। এসব বর্ণনা যে তখনকার লোকের বিশ্বাসের প্রতিফলন, তাতে সন্দেহ নাই।

সপ্তম অধ্যায়

মোক্ষলাভের প্রকৃতি ও পন্থা

আত্মা যদি পৃথিবীর সাথে আবদ্ধ থাকে আর সে বন্ধনের যদি বিশেষ কারণ থেকে থাকে, তাহলে তার বিপরীত কারণ দ্বারাই সে বন্ধন মোচন হতে পারে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে ওদের মতে, এই বন্ধনের কারণ
৫২. হচ্ছে অজ্ঞানতা; অতএব মোক্ষের উপায় হচ্ছে এমন বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম বিচারক্ষম জ্ঞান লাভ, যা ব্যাখ্যা বা যুক্তি-তর্ক-নির্ভর নয় এবং যা সমস্ত সন্দেহকে বিদূরিত করে। সংজ্ঞা দ্বারা বস্তুকে জানার ফলে আত্মা নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং নিজের অমরত্বের মহিমা এবং ক্ষয়িষ্ণু ও পরিবর্তনশীল জড়দেহের হীনতা উপলব্ধি করে। আত্মা তখন আর জড়ের প্রয়োজন বোধ করে না এবং বুঝতে পারে যে, এতদিন সে যা কিছু শ্রেয় ও আনন্দদায়ক বলে মনে করে এসেছে, তা আসলে মন্দ ও দুঃখজনক। এইভাবে তার প্রজ্ঞা লাভ হয় আর জড়দেহ ধারণ থেকে সে বিরত হয়। ফলে কর্মের অবসান ঘটে এবং আত্মা ও জড়ের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় সে মুক্তি লাভ করে।

'পাতঞ্জল' গ্রন্থের লেখক বলেছেন: যে সব ব্যাপারে মানুষ সচরাচর লিপ্ত থাকে ঈশ্বরের ঐক্যে ধ্যাননিমগ্ন হলে তার বাইরের জগৎ মানসগোচর হয়। যে ঈশ্বরকে চায়, সে কোন কারণ ব্যতিরেকেই সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গলকে চায়। আর একান্ত যে আত্মসর্বস্ব সে সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসও গ্রহণ করে না। যখন মানুষ এই অবস্থায় (ঈশ্বরানুরাগের ফলে সৃষ্টির মঙ্গল কামনায়) উপনীত হয়, তখন তার দৈহিক শক্তির উপর তার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাধান্য লাভ করে। তখন তার আট প্রকারের ক্ষমতা লাভ হয় যার দরুন তার চিত্ত নিষ্কাম হয়। কারণ, সাধ্যের অন্তর্গত, এমন বস্তুই মানুষ ত্যাগ করতে পারে; যা সাধ্যের অতীত তাকে ত্যাগ করার কী অর্থ? এই আট প্রকারের শক্তি হচ্ছে:

এক: নিজ দেহকে এমন সূক্ষ্ম করা যা চোখে দেখা যায় না।

দুই: নিজ দেহকে এমন লঘু করা যার দরুন চলাফেরা করার সময়ে কণ্টক, কর্দম বা বালুকার পার্থক্য সে অনুভব করে না।

তিন : দেহের আকার বৃদ্ধি করে ভয়ংকর রূপ ধারণ করা।

চার : নিজের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করা।

পাঁচ : ইচ্ছামাত্র সমস্ত কিছু জানতে পারা।

ছয় : ইচ্ছামত যে কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের গুরু হওয়া।

সাত : সে সম্প্রদায়ের সকলকে তার প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল করে রাখা।

আট : মানুষ ও তার দূরতম লক্ষ্যের অন্তর্বর্তী সমস্ত ব্যবধান তিরোহিত হওয়া।

তত্ত্বসাধক ও পরমতত্ত্বে উন্নীত হওয়া সম্বন্ধে সুফীরা যা বলেন, তাও প্রায় এইরূপই দাঁড়ায়। তাঁদের মত যে, তত্ত্বসাধকের দুইটি আত্মা থাকে; একটি চিরন্তন, যার কোন পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে না, যার দরুন সে অজ্ঞেয়কে জানতে পারে এবং অলৌকিক কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়টি পরিবর্তন ও জন্ম সাপেক্ষ বলে মানবীয়। এই রকম সব বিশ্বাসের সঙ্গে খ্রীস্টানদের ধারণার তেমন পার্থক্য নাই।

৫০. হিন্দু বলে : 'মানুষের যখন এইরূপ ক্ষমতা জন্মায়, তখন তার আর সে ক্ষমতা প্রয়োগ করবার স্পৃহা থাকে না; সে তখন পর্যায়ক্রমে তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

পর্যায়গুলো এই : ১। সমুদয় বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও পারস্পরিক পার্থক্যের জ্ঞান। এর দ্বারা কিন্তু বস্তুর মৌলিকতার জ্ঞান তার হয় না।

২। বস্তুর প্রভেদ জ্ঞান থেকে এমন সংজ্ঞানের উদয়, যার দ্বারা বিশেষকে সার্বিকের (Universal) শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যদিও বিশেষের পার্থক্যবোধের তখনও প্রয়োজন থাকে।

৩। এই পার্থক্য বোধের বিলুপ্তি এবং সমুদয় বস্তুকে সামগ্রিক কিন্তু কালের পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি।

৪। চতুর্থ স্তরে এই উপলব্ধি কালের বন্ধনমুক্ত হয়। সে তখন নাম ও বিশেষণ ইত্যাদি, যা কেবল মানবীয় প্রয়োজনের জন্যে উদ্ভাসিত যন্ত্র স্বরূপ সমস্তই ত্যাগ করে। এই স্তরে উপনীত হলে সে বুদ্ধি (Intellect), বুদ্ধ (Intelligence) ও বোধির (Intelligence) সাথে একত্রীভূত হয়ে একাকার হয়ে যায়।

আত্মার মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে পাতঞ্জল যা বলেছে তা এই। এই মুক্তিকে ভারতীয় ভাষায় 'মোক্ষ'—বলা হয়, অর্থাৎ পরিণাম। সূর্য-চন্দ্রের গ্রহণ শেষ

হওয়াকেও ওরা 'মোক্ষ' বলে থাকে, কারণ সূর্য-চন্দ্র রাহুমুক্ত হবার মুহূর্তে গ্রহণেরও অবসান হয়।

হিন্দুদের মতে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এ দুটি থেকে যে সুখানভূতি হয় তাও জ্ঞান সঞ্চয় করতে মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য। যেমন, পানাহারে জিহ্বার স্বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে খাদ্য দ্বারা প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। তেমনই, মৈথুনের সুখ প্রজননের দ্বারা প্রজাতি (Species) রক্ষার সহায়তা করে। যদি মৈথুন ও প্রজননে কোনও সুখ না পাওয়া যেত তাহলে শুধু প্রজাতি রক্ষার জন্য মানুষ বা পশু কেউই এই কর্মে প্রবৃত্ত হত না।

গীতায় উক্ত হয়েছে, 'জ্ঞান সঞ্চয় করার জন্যই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে; যেহেতু জ্ঞান লাভের প্রকার একই, সেহেতু মানুষকে একই প্রকারের জীবাঙ্গ দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি কর্মের জন্য সৃষ্ট হত, তাহলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিন্ন প্রকারের হত, কারণ মৌলিক ত্রিশক্তির পার্থক্যের দরুন কর্মেরও পার্থক্য হয়। কিন্তু দেহ প্রকৃতিতে জ্ঞান সঞ্চয়ের বিপরীত গুণ আছে বলে দেহ কর্মের দিকেই ধাবিত হয়। কর্মকে সে ইন্দ্রিয় সুখ দিয়ে ঢাকা দিতে চায়, যদিও আসলে সে সুখ নয়, দুঃখ। জ্ঞান কিন্তু এই দেহপ্রকৃতিকে ভূপাতিত শত্রুর ন্যায় পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলে, এবং সূর্য থেকে রাহু বা মেঘ যেমন বিদূরিত হয়, তেমনই আত্মা থেকে সমস্ত অন্ধকারকে দূরীভূত করে।

এ কথা কয়টি সক্রেটিসের উক্তির মত। তিনি মনে করতেন: 'শরীরের সঙ্গে থাকাকালে আত্মা কোন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হলে, শরীর দ্বারা সে
৫৪৹ প্রতারিত হয়; কিন্তু চিন্তার ফলে অভীষ্টের কিছুটা তার কাছে স্পষ্ট হয়। সে চিন্তা এমন একসময়ে হয় যখন সে শ্রবণ, দর্শন, দুঃখ বা সুখ প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হয় না, যখন সে আত্মনিবিষ্ট থাকে, এবং যখন সে দেহ ও দেহের আনুসঙ্গিক সব কিছুকে সাধ্যমত বর্জন করে। দার্শনিকের আত্মা তখনই বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যখন সে দেহকে উপেক্ষা করে এবং তার থেকে বিচ্ছেদ চায়। আমাদের ইহজীবনে যদি আমরা শরীরকে ব্যবহার না করি এবং একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত দেহের কোনও ব্যাপারে অংশ গ্রহণ না করি এবং শরীর প্রকৃতি যদি আমরা অর্জন না করি, বরঞ্চ তার থেকে নিষ্কলুষ থাকি, তাহলে আমরা দেহের অজ্ঞানতা থেকে বিরাম লাভ করে প্রজ্ঞার নিকটবর্তী হতে থাকব এবং ঈশ্বরানুমতিক্রমে আত্মদর্শন লাভ করে পবিত্র হতে পারব। এ সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়াই কর্তব্য'।

এখন আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে অর্থাৎ গীতার উদ্ধৃতিতে ফিরে যাব।

'এই রকম' সকল ইন্দ্রিয়ই জ্ঞান অর্জনের জন্য সৃষ্ট। জ্ঞান-সাধক সে ইন্দ্রিয়গুলোকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সুখ পায়; যেন এগুলো তার গুপ্তচর। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সময়ের পার্থক্যানুযায়ী তাতে প্রভেদ থাকে। ইন্দ্রিয় হৃদয়ের (হৃৎপিণ্ড) সেবা করে; হৃৎপিণ্ড কেবল জ্ঞানকে উপলব্ধি করে এবং অতীতকে স্মরণ করে। প্রকৃতি বর্তমানকে আয়ত্ত করে, অতীতকে দাবী করে এবং ভবিষ্যতে তাকে পরাভূত করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। বুদ্ধি কিন্তু সময় বা কাল নিরপেক্ষভাবে বস্তুর মূল জানতে পারে এবং তার কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ সমান হয়ে যায়। এই বুদ্ধির নিকটতম সহকারী হচ্ছে চিন্তা (বা ধ্যান) ও প্রকৃতি এবং দূরতম সহকর্মী হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় যখন জ্ঞানের কোনও বিষয়কে চিন্তার (ধ্যান) কাছে নিয়ে আসে, চিন্তা সে বিষয় বা বস্তুকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভ্রমপ্রমাদ থেকে নিষ্কলুষ করে বুদ্ধির কাছে সমর্পণ করে। বুদ্ধি তখন তাকে বিশেষ থেকে সার্বিকে (Universal) পরিণত করে এবং আত্মার গোচরীভূত করে। আত্মা এইভাবে জ্ঞান লাভ করে।

ওরা মনে করে, মানুষ নিম্নলিখিত তিনটির যে-কোন একটি উপায়ে জ্ঞানী হতে পারে।

প্রথম : প্রেরণা দ্বারা, যা কালের অনুবর্তী নয়, বরং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃক্রোড়েই যা পাওয়া যায়। এর দৃষ্টান্ত 'কপিল' মুনি, যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

৫৫. **দ্বিতীয় :** কিছুকাল অতীত হবার পর অনুপ্রাণিত হওয়া, যেমন 'ব্রহ্মার' সন্ততিরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর প্রেরণা পেয়েছিল।

তৃতীয় : কিছুকাল ধরে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা, অন্য সব লোকের মত মন সুগঠিত হবার পর যারা শিক্ষিত হয়।

জ্ঞানমার্গে যে 'মোক্ষ' লাভ হয়, তা পাপ পরিহার না করলে সম্ভব নয়। এই পাপের নানা শাখা প্রশাখা আছে; সেগুলোকে লোভ, ক্রোধ ও মূর্খতা—এই তিনটি প্রধান কুপ্রবৃত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। মূল কর্তন করলে শাখা-প্রশাখাগুলো নিজ হতেই শুকিয়ে যায়। দুটি প্রকৃতির প্রাধান্যের উপর এই পাপ নির্ভর করে—ভোগলিপ্সা ও ক্রোধ, যা মানুষের পরম শত্রু ও বিনাশ-কারী। কারণ এ প্রবৃত্তিগুলো মানুষকে ভোজন ও প্রতিহিংসার সুখে প্রলুব্ধ করে, যা আসলে তাকে যন্ত্রণা ও দুষ্কর্মের দিকেই প্রায় ঠেলে দেয়। এই দুটি

প্রবৃত্তি মানুষকে হিংস্র পশু ও জন্তু, এমন কি দানব ও দৈত্যের পর্যায়ভুক্ত করে ফেলে।

মোক্ষলাভের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া একান্ত কর্তব্য, যা মানুষকে যজ্ঞের দেবতার সমান করে দেয়। সাংসারিক কর্ম থেকে বিরত থাকা তেমনই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যতক্ষণ না এই কর্মের মূল কারণ, 'লোভ ও অহংকার' দূর হয় ততক্ষণ সে কর্ম থেকে নিরস্ত হতে পারে না। লোভ ও অহংকার দূর হলে উপরোক্ত কুপ্রবৃত্তি দুইটির মূলোচ্ছেদ হয়।

অবশ্য, দুই উপায়ে কর্মকে ত্যাগ করা যেতে পারে। এক : তমোগুণের প্রভাবে আলস্য, বিলাস ও অজ্ঞতার দ্বারা। এ উপায় কাম্য নয়, কারণ এর পরিণাম দোষণীয়।

দুই : বিচার-বিবেচনা দ্বারা শ্রেষ্ঠতমকে বেছে নেওয়া। এই উপায়ের পরিণাম শুভ। যতক্ষণ না মানুষ সংসারের সবকিছু পরিহার করে নিজেকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কর্মত্যাগ সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন করে রাখলে বাহ্যবস্তু থেকে তার ইন্দ্রিয়কে সে এমনভাবে রুদ্ধ করতে পারে যে নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুর জ্ঞান তার থাকে না এবং তার সমস্ত গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারে। সবাই জানে, লোভী তার কাম্যবস্তু পাবার জন্য প্রয়াস করে থাকে। প্রয়াসের দরুন তার কষ্ট হয়, আর কষ্ট হলেই সে হাঁপায়। অতএব, লোভের ফল হচ্ছে এই শ্বাসকষ্ট। এই লোভ দূর হলে তার নিশ্বাস জলচর জীবের নিশ্বাসের মত হয়, সে বায়ুর প্রয়োজন অনুভব করে না। তখন তার হৃদয় কেবলমাত্র মোক্ষের অন্বেষণে ও পরম ঐক্যে উপনীত হতে একান্তভাবে নিবিষ্ট থাকে।

গীতাতে আরও আছে : 'হৃদয়কে একান্তভাবে ঈশ্বরে নিযুক্ত না রেখে,
৫৬ তার সমস্ত কর্মকে একমাত্র ঈশ্বরে উদ্দিষ্ট না করে, নানা ক্ষেত্রে যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে, সে মুক্তি কেমন করে পাবে ? 'সমস্ত' চিন্তা-ভাবনাকে যে সমস্ত বস্তু থেকে নিরস্ত করে পরম এককের প্রতি নিবদ্ধ রাখে, বাতাস থেকে সুরক্ষিত নির্মল তেলের প্রদীপ শিখার মত তার হৃদয়ের জ্যোতি স্থিরনিষ্কম্প থাকে। এই চিন্তায় সে এমন নিবিষ্ট হয়ে থাকে যে উষ্ণতা বা শীতের দরুন কোনও কষ্টের অনুভূতি তার আর থাকে না, কারণ সে জানে সে সেই অদ্বিতীয় সত্য ব্যতীত অন্য সবকিছুই ভ্রান্ত কল্পনা মাত্র।'

এই গ্রন্থে আরও আছে : 'দুঃখ বা সুখের কোন প্রভাব সত্যলোকে পড়ে না, যেমন নদীর অবিরাম জলস্রোতের কোনও প্রভাব সমুদ্রের জলের উপর হয়

না। লোভ ও ক্রোধকে নিষ্ক্রিয় ও মূলোচ্ছেদ না করা পর্যন্ত এই গিরিশৃঙ্গে কেমন করে কেউ আরোহণ করবে ?'

যে বিষয়ের আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের মোক্ষলাভ তার জন্য অবিরত চিন্তা বা ধ্যান করা প্রয়োজন, যা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। কারণ সংখ্যা পুনরাবৃত্তিবাচক এবং পুনরাবৃত্তির অর্থ, দুই আবৃত্তির মধ্যে ব্যবধান বা বিরতি, যা চিন্তা বা চিন্তের ঐক্যে বাধা সৃষ্টি করে। অথচ লক্ষ্য তা নয়, আসল লক্ষ্য নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান।

একই দেহে, কিংবা বিভিন্ন দেহের মধ্য দিয়ে ক্রমপর্যায়ে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। বাধ্যতামূলকভাবে সত্যাচরণ করে মানুষ তার আত্মাকে সৎকর্মে এমন অভ্যস্ত করে যে সত্যাচরণ তার প্রকৃতি ও মৌলিক স্বভাবে পরিণত হয়।

ধর্মের বিধান পালন করাই সত্যাচরণ। এই বিধানগুলো থেকে ওরা বহু উপবিধি তৈরি করেছে। তবে মোটামুটি সে বিধানগুলোকে এইভাবে সংখ্যায়িত করা যায় : (১) হত্যা না করা, (২) মিথ্যা না বলা, (৩) পরস্বাপহরণ না করা, (৪) ব্যভিচার না করা, (৫) ধন সঞ্চয় না করা এবং (৬) শুদ্ধাচার ও পবিত্রতা পালন করা, (৭) বিধিমত অবিরত অনশন করা, (৮) নামজপ ও স্তোত্র পাঠ সহ ভগবানের পূজায় অবিচলিত থাকা এবং উচ্চারণ না করে সৃষ্টিধ্বনি, 'ওম' মন্ত্র হৃদয়ে জাগরূক রাখা।

জীবহত্যা না করার বিধানটি আসলে হিংসা ও অনিষ্ট চিন্তা থেকে বিরত থাকার সাধারণ নীতির এক বিশেষ অংশ। পরস্বাপহরণ ও মিথ্যাচারও এই নীতির অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে, এই কর্ম দুটির নিজস্ব জঘন্যতা ও নীচতা না ধরেও সে কথা বলা যায়। ধন সঞ্চয় না করার অর্থ ক্লেশ পরিহার করা এবং ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাস স্থাপন করা, যার দরুন পার্থিব সম্পদের হীন দাসত্ব থেকে মুক্তির সম্মান লাভ করে মানুষ পরম শান্তি পেতে পারে। তেমনই, শুচিতা রক্ষার অর্থ শরীরের গ্লানি ও ক্লেদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, মালিন্যকে ঘৃণা করতে এবং শুদ্ধচিত্ততাকে ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়া। দীনবস্ত্র পরিধান করে আত্মনিগ্রহের অর্থ শরীরকে ক্ষীণ করা, তার দুষ্ট উত্তেজনাকে
৫৭ শান্ত করে ইন্দ্রিয়সমূহকে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণতর করা। যেমন 'Pythagoras' দেহ চর্যায়রত, ব্যসনে উৎসাহী এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, নিজের কারাগারকে সুদৃঢ় করতে ও নিজের শৃংখলকে কঠিনতর করতে তোমার এতটুকু আলস্য দেখা যায় না।'

ঈশ্বর ও দেবতার আরাধনায় অবিচলিত নিষ্ঠার ফলে তাদের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য জন্মায়। সাংখ্য গ্রন্থে আছে: 'যে সব বস্তুকে মানুষ তার চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, সেগুলোকে অতিক্রম করতে সে পারে না। গীতায় উক্ত হয়েছে: 'যে সব বিষয় মানুষ নিরন্তর চিন্তা ও স্মরণ করে, সেগুলো তার মনে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়; এমন কি অবচেতনভাবে সেগুলোর দ্বারা সে চালিত হতে থাকে। যেহেতু, মৃত্যুকালে মানুষ তার প্রিয় বস্তুগুলো স্মরণ করে সেজন্য আত্মা দেহত্যাগের সময় তার প্রিয়বস্তুর সাথে মিলিত হয় এবং তাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।'

যে সব বস্তুর প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তন (মৃত্যু ও পুনর্জন্ম) অবধারিত, তার সঙ্গে মিলন হওয়াই আত্মার প্রকৃত মোক্ষ নয়। এই মর্মে গীতায় উক্ত হয়েছে: 'মৃত্যু কালে যে স্মরণ করে যে, ঈশ্বরই সব, তিনিই সমস্ত কিছুর কারণ সে মুক্ত, যদিও তার স্থান সত্য সাধকদের নীচে।' গীতায় আরও আছে: 'পৃথিবী থেকে নিষ্কৃতি চাইতে হলে পৃথিবীর সমস্ত বিভ্রম ও ছলনার সঙ্গ ত্যাগ কর, কর্মে ও যজ্ঞাদিতে সৎ উদ্দেশ্য রাখ, কোনও পুরস্কার বা প্রতিফলের আশা কোর না এবং মানুষ থেকে দূরে থাক।' শেষের কথাটির অর্থ, 'তোমার বন্ধুকে তোমার শত্রু অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান কোর না; মানুষের জেগে থাকার সময়ে তুমি নিদ্রিত থেকে তাদের উপস্থিতির বৈপরীত্য কর, তাদের নিদ্রার সময়ে তুমি জেগে থাক; মানুষের মধ্যে থেকেও তাদের সঙ্গ ত্যাগ করার এইই বিধি।' আবার 'আত্মাকে আত্মা থেকে রক্ষা কর, কারণ কামাসক্ত আত্মা পরম শত্রু, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা পরম বন্ধু।'

Socrates তাঁর আসন্ন মৃত্যুতে বিমর্ষ না হয়ে বরং ভগবৎ মিলনের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের কারুর চোখে আমার স্থান রাজহংস
৫৮ Cycnus-এর নীচে যেন না হয়,' যার সম্বন্ধে বলা হয় যে, সে সূর্য দেবতা Apollo-বাহন ছিল এবং সেজন্য অদৃশ্য জগতের খবর জানত, এবং মৃত্যু আসন্ন জেনে তার প্রভুর কাছে যাওয়ার আনন্দে সুললিত কণ্ঠে অবিশ্রাম গান করে যেত। 'আমার প্রভুর সঙ্গে মিলনের আনন্দ অন্ততঃ এই পক্ষীর আনন্দের চেয়ে কম নয়।'

এই কারণে সূফীরাও 'প্রেমের' (عشق) সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'প্রেমের অর্থ, পরম সত্যকে ছেড়ে মানুষে নিবিষ্ট হওয়া।'

'পাতঞ্জলের গ্রন্থে আছে: 'মোক্ষলাভের পথকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি: প্রথম ক্রিয়া যোগ; তার পন্থা হল ক্রমান্বয়ে অভ্যাস করে দৃশ্যজগৎ

থেকে ইন্দ্রিয়কে ফিরিয়ে অন্তর্জগতে এমনভাবে নিবিষ্ট করা, যার ফলে তোমার নিজ সত্তাতে একান্তভাবে নিমগ্নচিত্ত থাকতে পার। জীবন ধারণ যার উদ্দেশ্য তার জন্য এইটিই সাধারণ পথ। 'বিষ্ণু' ধর্মে উক্ত হয়েছে : ভৃগু বংশের রাজা 'পরীক্ষ' (পরীক্ষিৎ) উপস্থিত ঋষি শ্রেষ্ঠ শতনিককে ঈশ্বর তত্ত্বের একটি বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে, শতনিক সৌনক ও উৎানগের মাধ্যমে ব্রহ্মার মুখ থেকে যা শুনেছিলেন তা বললেন : ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, অ-যোনীজ, যিনি এমন কিছুর জন্ম দেন না যাকে তাঁর থেকে ভিন্ন বা অভিন্ন মনে করা সম্ভব। তাঁর সন্তুষ্টিতে কী পরম কল্যাণ, তাঁর ক্রোধে কী নিদারুণ অমঙ্গল, তা আমি কেমন্ করে বাক্যে প্রকাশ করি? সংসার বিমুখ হয়ে তদ্‌গতচিত্তে তাঁর উপযুক্ত পূজা করা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব কেমন করে জানা সম্ভব হবে?'

ব্রহ্মা'কে প্রতিপ্রশ্ন করা হল : 'মানুষ দুর্বল, তার আয়ুষ্কাল ক্ষণস্থায়ী, জীবন ধারণের প্রয়োজনকে বর্জন করার মত মনের শক্তি তার নাই, সেজন্য তার পরিত্রাণের পথ বিঘ্নসংকুল। মানুষ যদি আদিম যুগের (সত্যযুগ) মত সহস্র বৎসর জীবিত থাকত এবং পৃথিবী তখনকার মত পাপশূন্য হত, তাহলে অবশ্য সেরূপ কর্ম করতে পারার আশা থাকত। কিন্তু শেষ (কলি) যুগে এই ঘূর্ণীয়মান জগতে, তোমার মতে মানুষের জন্য কী এমন আছে যার বলে সে
৫৯ সাগর লংঘন করবে অথচ নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে?'

তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন : 'অন্ন, আশ্রয় ও বস্ত্রের প্রয়োজন থেকে মানুষের পরিত্রাণ নাই : তাই এসবের জন্য তার কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু এ সবের অতিরিক্ত বস্তু ও ক্লেশজনক কর্ম পরিহার ব্যতীত শান্তি আসতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরকেই তোমরা ভজনা কর, তাঁকে প্রণতি জানাও, তাঁর মন্দিরে সুগন্ধি ও ফুল দিয়ে তাঁর অর্চনা কর; তাঁর স্তোত্র পাঠ কর এবং তোমাদের হৃদয় তাঁতেই নির্দিষ্ট রাখ, যাতে সে কখনও অনামুখী না হয়। ব্রাহ্মণ ও অন্য সকলকে দান কর। তাঁর সমক্ষে মাংসাহার বর্জন বা উপবাস পালনের মত বিশেষ বা সাধারণ ব্রত গ্রহণ কর। ঈশ্বরের নামে পশু উৎসর্গ কর এবং সে পশুকে নিজের মত জ্ঞান করে তাকে হত্যা কর না। জেনো যে তিনিই সব, অতএব তোমাদের সমস্ত কর্ম তাঁর জন্যেই সাধিত হওয়া উচিত। পৃথিবীর মিথ্যা সম্পদের কিছুভাগ যদি তোমাদের হাতে আসে, তা ভোগ করার সময়ে তাঁকে বিস্মৃত হয়ো না; সে সম্পদ ভোগে যদি ভগবানকে তুষ্ট করা ও তাঁর আরাধনায় সামর্থ অর্জন যদি তোমাদের লক্ষ্য থাকে, তাহলে আর কিছু ব্যতিরেকেই তোমরা পরিত্রাণ লাভ করবে।

গীতাতে বলা হয়েছে : 'যে কামাদি রিপু সংহার করেছে, যা তার করা উচিত তার অতিরিক্ত কিছু সে করেনি, আর যদি কেউ জীবন ধারণোপযোগী সামগ্রিতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার জন্য সে ধিকৃত বা নিন্দিতও হবে না।'

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র আছে : 'দেহের চাহিদা অনুযায়ী ক্লেশকর জঠরাগ্নি নির্বাপিত ও অঙ্গ সঞ্চালনের শ্রান্তি দূর করার জন্য, যদি মানুষ আহার, নিদ্রা ও শয্যার প্রয়োজন থেকে মুক্ত না হতে পারে, তাহলে এই শয্যাটি পরিষ্কার ও মসৃণ, ভূমি থেকে ঈষৎ উচ্চে ও দেহকে বিস্তৃত করার মত দৈর্ঘ্য প্রস্থে যথেষ্ট হতে হবে। নাতিশীতোষ্ণ স্থানে তার বাসস্থান হওয়া উচিত যাতে শীত ও গ্রীষ্ম তার পক্ষে কষ্টকর না হয় এবং যেখানে সরীসৃপের উপদ্রপ থেকে সে নিরাপদ থাকে। কারণ এগুলো চিত্তকে শানিত করতে সাহায্য করে যাতে অবিরত সে অদ্বৈতের ধ্যান করতে পারে। কারণ অন্নবস্ত্রের অতিরিক্ত যা কিছুর অভাব মানুষ বোধ করে, আপাতত সুখদায়ক হলেও আসলে তা কষ্টের ছদ্মরূপ। তাতে নিমগ্ন থাকা সর্বনাশকর, কঠিনতম যন্ত্রণা যার পরিণাম। প্রকৃত সুখী সেই, যে কাম, ক্রোধ নামক দুই পরাক্রান্ত শত্রুকে তার জীবদ্দশাতেই নিহত করেছে, যে বহির্জগতে শান্তির আশা না করে নিজ
৬০. অন্তর থেকেই শান্তিলাভ করতে চায় এবং যে তার ফলে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন আর অনুভব করে না।'

অর্জুনকে বাসুদেব বলেছিলেন ; 'যদি তুমি অবিমিশ্র কল্যাণ চাও, তাহলে শরীরের যে নয়টি দ্বার আছে তার প্রহরা দাও। তার মধ্যে দিয়ে গমনাগমনকারীর সন্ধান রাখ; অন্তরের চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত হতে দিও না; নিজ মনকে নবজাত শিশুর মস্তিষ্কের কথা স্মরণ করে শান্ত কর, যা প্রথমে অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে এবং পরে এই কোমল আবরণ কঠিনতা লাভ করে মস্তিষ্কের স্পর্শকাতরতা বন্ধ করে দেয়, যেন কোন বাহ্য প্রভাবের আর তার প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয় লব্ধ অনুভূতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বই আর কিছু নয়, সেজন্য সেই অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়ো না।

মোক্ষলাভের পথে দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল, পরিবর্তনশীল বস্তুজগৎ ও নশ্বর দেহের কুপরিণাম উপলব্ধিজনিত অনাসক্তি বা ঔদাসীন্য, যার ফলে মনে বিতৃষ্ণা এবং এই বস্তুজগতের প্রতি আসক্তির অবসান হয়। এইভাবে যে মূল ত্রিশক্তি (সত্য-রজঃ-তমঃ) কর্ম ও কর্ম বৈচিত্র্যের কারণ, তাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আসে। পৃথিবীকে যে সম্পূর্ণ করে জেনেছে সে জানে যে পার্থিব মঙ্গল আসলে অকল্যাণ পৃথিবীর সুখ পরিণামে নিদারুণ কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়,

যা তাকে পৃথিবীর সঙ্গে জড়াতে চায়, এবং যার দরুন পৃথিবীতে তাকে বেশী দিন বাস করতে হয়। তার সবই সে পরিহার করে চলে।'

'গীতা' পুস্তকে আছে : 'কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয়ে মানুষ ভ্রমে পতিত হয়। কর্মের ভাল মন্দ নির্ণয় করার কোনও আদর্শ তার নাই। কাজেই কর্ম ত্যাগ করা এবং কর্মের সাথে অসম্পৃক্ত থাকাই প্রকৃত কর্ম।'

এই গ্রন্থে আরও আছে: 'জ্ঞানের পবিত্রতা অন্য সব বস্তুর পবিত্রতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা জ্ঞান অবিদ্যা দূর করে এবং নিশ্চিত প্রত্যয় দ্বারা সংশয় নাশ করে। সংশয়ের দরুনই কষ্ট হয়, সেজন্য সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তি কখনও শান্তি পায় না।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মোক্ষ পথের প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের উপায় মাত্র।

তেমনই, তৃতীয় পর্যায়ও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্র স্বরূপ। এই পর্যায় হচ্ছে ঈশ্বর সাধনা, যাতে মানুষকে পরিত্রাণ লাভের সামর্থ দান করেন এবং তাঁর কৃপায় মানুষের এমন দেহে পুনর্জন্ম হয় যাতে পরম সুখের দিকে (মোক্ষের) সে ক্রমাগত অগ্রসর হতে পারে।

গীতাকার ঈশ্বরোপাসনাকে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক—এই তিন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করেছেন। উপবাস পালন, শাস্ত্র বিধান অনুসরণ, দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা, দেহের শুচিতা রক্ষা, অহিংসা, পরস্ত্রী ও পরধনে অনাসক্তি, এইগুলো কায়িক উপাসনার অন্তর্ভুক্ত। বাচনিক পূজার অর্থ বেদাদি শাস্ত্র
৬১ পাঠ, নামোচ্চারণ, সত্য ভাষণ, সকলের সঙ্গে নম্রভাবে কথোপকথন এবং মানুষকে সততা ও সৎকর্ম করতে উপদেশদান। আর মনের ভগবতারাধনা হল উদ্দেশ্যের সরলতা ও সততা, দম্ভ পরিহার, ধৈর্য ধারণ ও ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ আর তার সঙ্গে উদার ও নির্মল অন্তঃকরণ।

এই তিন প্রক্রিয়ার সাথে গ্রন্থকার একটি নিরর্থক চতুর্থ প্রক্রিয়াও যোগ করে দিয়েছেন। এর নাম রসায়ন। এটি হচ্ছে ঔষধির দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করার বিদ্যা। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। আসলে অনিদ্রষ্টের প্রতি অটল বিশ্বাস, লক্ষ্য সাধনে সংকল্পের দৃঢ়তা ও চেষ্টার ঐকান্তিকতা ছাড়া মোক্ষতত্ত্বের সাথে এই রসায়ন বিদ্যার অন্য কোথাও যোগ নাই।

ওদের বিশ্বাস মতে পরিত্রাণ বা মোক্ষের অর্থ ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা ভগবানে লীন হওয়া, কারণ ঈশ্বর প্রতিদানের আশা বা প্রতিফলনের শঙ্কা থেকে চিরমুক্ত।

তিনি রূপ-অরূপের বহু ঊর্ধ্বে, সেজন্য তিনি অচিন্ত্য। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, তাঁর জ্ঞান সময়াপেক্ষিক বা আকস্মিক নয়। প্রত্যেক বিষয় বা বস্তুর প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর জ্ঞানের অন্তর্গত।

এই বিশেষণগুলো ওরা কৈবল্যপ্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধেও প্রয়োগ করে থাকে। ঈশ্বরের সাথে সে আত্মার যে পার্থক্য তা কেবল আরম্ভ বা উৎপত্তি নিয়ে, কারণ আত্মার অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে নয়। আর একটি প্রভেদ এই যে মুক্তি লাভের পূর্বে সে মায়াজালের মধ্যে বাস করত, তাকে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞানলাভ করতে হত এবং অশেষ চেষ্টাপ্রসূত হলেও সে জ্ঞান কল্পনামাত্র, কারণ আসল তত্ত্ব আবরণের আড়ালেই থেকে যেত। কিন্তু মোক্ষের পর্যায়ে সমস্ত আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়, সমস্ত বাধা বিদূরিত হয় এবং ইন্দ্রিয়াদির দূষিত অনুভূতির দ্বারা আবৃত কোন অজ্ঞাত বিষয়কে জানার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই সত্তা প্রজ্ঞাশীল থাকে এবং চিরন্তন তত্ত্বের সাথে একীভূত হয়ে যায়।

এইজন্য 'পাতঞ্জল' গ্রন্থের উপসংহারে শিষ্য মোক্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে গুরু উত্তর করেছেন: 'তুমি ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, সত্য-রজঃ-তমর ক্ষমতা লোপ হওয়া এবং এই শক্তিত্রয়ের নিজ উৎসে ফিরে যাওয়ার নামই মোক্ষ। অন্যভাবে এও বলা চলে যে পরম জ্ঞানী হয়ে আত্মার নিজ প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়ার নামই মোক্ষ লাভ।'

মোক্ষের পর্যায়ে উপনীত আত্মার সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদও হয়েছে। 'সাংখ্য' গ্রন্থে সন্ন্যাসী প্রশ্ন করছেন: 'কর্মের অবসান হলেই মৃত্যু হয় না
৬২ কেন?' ঋষি উত্তর করছেন: 'এই জন্য যে জীবসত্তার এক বিশেষ অবস্থার দরুনই বিচ্ছেদ ঘটে যখন আত্মা তখনও দেহ থেকে পৃথক হয়নি। দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই ঘটে, কিন্তু কারণ দূর হওয়ার পরও তার প্রভাব কিছুকাল পর্যন্ত প্রায়ই থাকে। এই প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে এবং অবশেষে একেবারে লুপ্ত হয়। রেশমের সুতো প্রস্তুত কালে তাঁতি তার চাকার ঘূর্ণিবেগ বাড়িয়ে নেওয়ার পর কাষ্ঠখণ্ড সরিয়ে নিলেই যেমন চাকাটির ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যায় না বরঞ্চ একটু একটু করে কমে তবে বন্ধ হয়, তেমনই কর্মাবসানের পরও গতি ও স্থৈর্যের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে যাবার ফলে বাহ্যশক্তির প্রভাব ও পূর্বাবস্থার রেশ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দেহে কর্মের প্রভাব থাকে।'

'পাতঞ্জল' গ্রন্থেও এই মর্মে সমর্থক উক্তি আছে। ত্রস্ত কূর্ম যেমন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ দেহে গোপন করে নেয়, ইন্দ্রিয় দমনকারী সেই রকম মানুষের

কথা বলতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন : 'এই ব্যক্তি শৃঙ্খলমুক্ত। তবে, তার বন্ধন শিথিল হয়েছে বটে,---কিন্তু মুক্তি হয়নি, কেননা সে এখনও দেহবিমুক্ত হয়নি।'

এই গ্রন্থের অন্যত্র আবার এই মতের বিপরীত কথাও আছে; যেমন, 'প্রতিফল আকর্ষণ করার জন্য শরীরগুলি আত্মার ফাঁদ বিশেষ। যে মোক্ষের স্তরে পৌঁছেছে সে তার বর্তমান দেহে অতীতের সমস্ত কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়ে গেছে; ভবিষ্যৎ প্রতিফলের অধিকার অর্জনের জন্য সে তখন আর প্রয়াস করে না। সে তখন এই ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়, দেহাকৃতির আর প্রয়োজন বোধ করে না এবং দেহের মায়ায় জড়িত না হয়ে সে সচ্ছন্দে তার মধ্যে বিচরণ করে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবার তার সামর্থ্য হয়। এমনকি সে মৃত্যুর ঊর্ধ্বেও উঠতে পারে, কারণ কোন স্থূল বস্তুই তার দেহকে বাধা দিতে পারে না। সে অবস্থায় তার আত্মাকে দেহ কেমন করে বাধা দেবে ?

সুফীরাও প্রায় এই রকম মতই পোষণ করেন। তাঁদের কোনও এক গ্রন্থকার কোনও এক সুফী বর্ণিত এই ঘটনাটি লিখেছেন : 'একদল সুফী আমাদের কাছে এসে উপনীত হলেন; এবং আমাদের থেকে কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন নামাজ পড়তে উঠলেন। নামাজ শেষ
৬৩ করে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন : সুধীবর, এমন কোনও স্থান আপনি জানেন কি যেখানে আমি দেহ রক্ষা করতে পারি ? আমরা অনুমান করলাম যে তিনি নিদ্রা-ইচ্ছুক, তাই তাকে একটি স্থান দেখিয়ে দিলাম। তিনি সেখানে গেলেন এবং দেহ বিস্তৃত করে স্থির হয়ে শুয়ে রইলেন। একটু পরে আমরা কাছে গিয়ে তাঁকে নড়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু তখন তাঁর দেহ শীতল হয়ে গেছে।

'আমরা তার জন্য পৃথিবীতে স্থান করে দিয়েছি'—আল্ল হূর এই বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুফীরা বলেছেন : 'আল্লার ইচ্ছায় পৃথিবী তার জন্য নিজকে গুটিয়ে নেবে; জল ও বায়ু স্তম্ভিত হয়ে তার'উপর দিয়ে তাকে চলতে সক্ষম করবে, এবং তার পথে পর্বতের উচ্চতা লুপ্ত হবে।'

আবার, চেষ্টা সত্ত্বেও কেউ কেউ মোক্ষলাভের যোগ্য হয় না। এই অবস্থার স্তরভেদ আছে। 'সাংখ্যে' উক্ত হয়েছে সদাচরণ, নিজ বিত্তের অকৃপণ ব্যবহার প্রভৃতি সদ্গুণ নিয়ে যে পৃথিবীতে বাস করে সে এইভাবে পুরস্কার পায় যে তার সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় এবং দৈহিক ও মানসিক আনন্দে সে পৃথিবীতে বিচরণ করে। পূর্বজন্মে বা ইহজন্মে কৃতকর্মের পুরস্কারই হল সম্পদের

আসল অর্থ'। নির্জন হয়েও যে পৃথিবীতে সাধুর জীবন যাপন করে সে উন্নীত ও পুরস্কৃত হবে, কিন্তু সাধন মন্ত্রের অভাবে তার মোক্ষলাভ হবে না। আর, যে পূর্বোক্ত অষ্টশক্তি লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে এবং তার সফল প্রয়োগে গর্বিত হয়ে তাকেই মোক্ষ বলে মনে করে, ঐ অবস্থা থেকে তার আর উন্নতি হবে না।'

তত্ত্বজ্ঞান সাধনায় প্রতিযোগীদের সম্বন্ধে একটি উপমা প্রয়োগ করা হয়। কোনও কর্মোপলক্ষে শিষ্যমণ্ডলীসহ একটি লোক শেষ রাত্রে যাত্রা করেছে, পথিমধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় একটি মনুষ্য মূর্তি চোখে পড়ল, অন্ধকারের জন্য যাকে ভাল ভাবে চেনা যায় না। লোকটি তার শিষ্যদের প্রত্যেককে এই মূর্তিটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। একজন বলল, 'এটি কি বস্তু আমি জানি না।' দ্বিতীয়জন বলল, 'এটি কি, জানিবার উপায়ও আমার জানা নেই। তৃতীয় শিষ্য বললে, 'এখনই এর অনুসন্ধান করে কি হবে? কিছুক্ষণের মধ্যে প্রভাত হলেই সব বোঝা যাবে, যদি ভূতপ্রেত কিছু হয় তাহলে
৬৪ সূর্যালোকে সরে যাবে, আর যদি অন্য কিছু হয়, তাও জানা যাবে।

এই তিনজনের কেউ-ই জ্ঞান লাভ করেনি। প্রথমটি, তার মূর্খতার জন্য, দ্বিতীয়টি তার ক্ষমতা ও বুদ্ধির অভাবের জন্য, আর তৃতীয়টি তার আলস্য ও অজ্ঞতায় সন্তুষ্ট থাকার জন্য। চতুর্থ শিষ্য কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ না করে উত্তর দিতে চাইল না। সে নিকটে গিয়ে দেখল যে ছায়ামূর্তিটি অন্য-কিছু নয়, লতাগুল্মে আকীর্ণ একটি অলাবু মাত্র। সে জানে যে জীবন্ত স্বেচ্ছাধীন মানুষ মাথায় ঐ রকম কিছু জড়িয়ে না গেলে একস্থানে কখনই স্থির হয়ে থাকে না। তখন সে বুঝতে পারল যে মূর্তিটি আসলে লম্বাভাবে অবস্থিত একটি জড়বস্তু। বস্তুটি গোময়ের কোনও আবৃত স্তূপ কিনা জানার জন্য সে নিকটে গিয়ে তাতে পদাঘাত করল। তাতে অলাবুটি মাটিতে পড়ে গেল। তার সমস্ত সন্দেহ এই ভাবে দূর হলে গুরুর নিকটে ফিরে গিয়ে সে বস্তুটির সঠিক বিবরণ দিল। এইভাবে শিষ্যের মাধ্যমে গুরু জ্ঞান লাভ করল।

ইউনানীদের মধ্যে Ammonius এর রচনায় Pythagoras থেকে উদ্ধৃত উক্তিতে উপরোক্ত মতের সাদৃশ্য দেখা যায়। 'যাতে তুমি অক্ষয় হতে পার, সেজন্য ইহজগতে তোমার সমস্ত বাসনা ও কর্মপ্রয়াস সেই আদি কারণের সাথে মিলনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত, যে তোমার সমস্ত কারণের কারণ, যার দরুন তুমি ক্ষয় ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পাবে, সত্যকার অনুভূতি ও প্রকৃত আনন্দের লোকে যেতে পারবে এবং অনন্ত সুখ ভোগের প্রকৃত সম্মান লাভ করবে।'

Pythagoras আরও বলেছেন: দেহরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে নির্লিপ্ততার আশা কেমন করে কর? দেহ দ্বারা শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুক্তির আশাই বা কেমন করে কর?

Ammonius বলেছেন: 'Empedocles ও Heracles প্রমুখ তাঁর পূর্ব সূরীদের মত যে, বিশ্ব আত্মার সাহায্য চাওয়া পর্যন্ত মলিন আত্মা সর্বদাই পৃথিবীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। সাহায্য চাওয়ার পর বিশ্ব আত্মা বোধির কাছে তার হয়ে অনুনয় করে, বোধি আবার স্রষ্টার কাছে অনুরোধ জানায়। স্রষ্টা তখন নিজ জ্যোতির অংশ বোধিকে দেন। বোধি সেই জ্যোতি দিয়ে বিশ্বের অন্তর্নিহিত সামগ্রিক আত্মাকে আশীর্বাদ করে। জীবাত্মা সেই জ্যোতির আলোকে সামগ্রিক আত্মাকে উপলব্ধি করতে, তার সাথে মিলিত হয়ে তার সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে চায়। এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কিন্তু বহু
৬৫ যুগের প্রয়োজন। তখন আত্মা স্থান ও কালের ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছায়, যেখানে জগতের ক্ষণস্থায়ী দুঃখ ও সুখ স্পর্শে না।

Socrates বলেছেন: স্থানের বন্ধন ত্যাগকালে মানবাত্মা স্বভাবতই পবিত্রলোকের দিকে যাত্রা করে, যা চিরজীব ও চিরস্থায়ী, এবং যার সাথে আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। আত্মাও তখন স্থায়িত্বে এই পবিত্রতার সাদৃশ্য লাভ করে, কারণ সংস্পর্শের মতন অবস্থার ফলে সে তার ছাপ গ্রহণ করে। এই ছাপ গ্রহণ ক্ষমতাকেই বোধি বলা হয়।'

তিনি আরও বলেছেন: 'আত্মা অনেকটা ভগবৎ-সত্তার অনুরূপ যার মৃত্যু বা ক্ষয় নাই, যা বুদ্ধির একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, যা চিরন্তন। দেহ তার বিপরীত। আত্মা ও দেহ যখন মিলিত হয়, তখন প্রকৃতি দেহকে সেবা করতে আর আত্মাকে শাসন করতে আদেশ দেয়। যখন তারা বিযুক্ত হয়, আত্মা ও দেহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যায়। আত্মা সেখানে তার উপযোগী বস্তু পেয়ে সন্তুষ্ট হয়, স্থানের বন্ধন মুক্ত হয়, ভ্রান্তি, শোক, আসক্তি, ভয় প্রভৃতি মানবীয় দোষ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শান্তি লাভ করে। অবশ্য, শুদ্ধচিত্ত ও দেহের প্রতি ঘৃণা থাকলেই এ অবস্থা পাওয়া যেতে পারে। শরীরকে প্রিয় জ্ঞান দ্বারা যদি আত্মা নিজকে কলুষিত করে থাকে, যার ফলে দেহ তার কামনা ও সুখানুভূতির দাস হয়ে পড়ে, তাহলে শরীর বস্তুসমূহ ও তাদের সংস্পর্শ ছাড়া অন্য কোনও সত্য-অভিজ্ঞতা সে আত্মার হয় না'।

Proclus বলেছেন: 'চৈতন্যময় আত্মা যে পদার্থে বাস করে, তাকে ভূ-গোলকের আকার দেওয়া হয়, যেমন ঈথর ও তার বিভিন্ন প্রাণীসমূহ।

আর যাতে চৈতন্যময় ও অর্ধ চেতন আত্মা থাকে, তার আকার মানুষের ন্যায় খাড়া। যাতে শুধু মাত্র অচৈতন্য আত্মা থাকে, তার আকার চিন্তাশক্তিহীন পশুদের ন্যায় খাড়া ও ন্যুব্জ। যে সব দেহে এ দুটি গুণের কোনটিই নাই, যাতে কেবল খাদ্য গ্রহণ ছাড়া অন্য শক্তি নাই, তার আকার খাড়া বটে কিন্তু ন্যুব্জ ও নিম্নমুখী; তার শিরোদেশ মৃত্তিকায় প্রোথিত, যেমন লতা ও বৃক্ষাদি। এই শেষোক্ত অবস্থা মানুষের অবস্থার বিপরীত। সেইজন্য মানুষ স্বর্গীয় বৃক্ষ, যার মূল তার উৎস, অর্থাৎ স্বর্গের দিকে প্রসারিত। বৃক্ষাদির
৬৬ মূল তার উৎসের দিকে অর্থাৎ মৃত্তিকার দিকে প্রসারিত।"

হিন্দুরা প্রকৃতি সম্বন্ধে এই রকম মত পোষণ করেন। অর্জুন প্রশ্ন করেন: 'জগতের কোনও বস্তুর সাথে ব্রহ্মের সাদৃশ্য আছে?' বাসুদেব বললেন 'তাঁকে, অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় কল্পনা কর।' এই অশ্বত্থ ভারতবর্ষের অতি সুপরিচিত মহীরুহ; এও নিম্নমুখী, অর্থাৎ এর শিকড় উর্ধে, আর শাখা প্রশাখা নিম্নে থাকে। রস পেলে বৃক্ষটি বিরাটাকার ধারণ করে, তার শাখা বিস্তৃত হয়ে মৃত্তিকা স্পর্শ করে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করে। তখন উপরের শিকড় ও নিম্নের শাখা এমন সমান দেখায় যে, তাদের প্রভেদ বোঝা যায় না। 'ব্রহ্ম' এই বৃক্ষের উপরকার শিকড়, 'বেদ' তার কাণ্ড, বিভিন্ন মত, ধর্ম ও সম্প্রদায় তার শাখা প্রশাখা, আর ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদি তার পত্ররাজি। ত্রিগুণ (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ) থেকে সে পুষ্টি গ্রহণ করে। আর ইন্দ্রিয়াদি থেকে বৃক্ষের স্ফীতি ও দৃঢ়তা আসে। এই বৃক্ষকে কর্তন করা অর্থাৎ পৃথিবী ও তার বিভ্রম পরিত্যাগ করা ব্যতীত বুদ্ধিমান ব্যক্তির কোনও প্রবল কামনা নাই। বৃক্ষটিকে কর্তন করার পর তার উৎপত্তির স্থানে সে বাস করতে চায় যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন (জন্মান্তর নাই)। যখন তার এই মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তখন সে উষ্ণ-শীতলের কষ্ট পেছনে ফেলে আসে এবং চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির আলোক অতিক্রম করে সে ঈশ্বরের জ্যোতির্লোকে প্রবেশ করে।'

পাতঞ্জলের মতের সঙ্গে সুফীদের ঈশ্বর সাধনা সংক্রান্ত উক্তির মিল আছে। সুফীরা বলেন: 'যতক্ষণ তুমি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে নিবিষ্ট থাক, ততক্ষণ তুমি অদ্বৈতবাদী হতে পার না। সত্য স্বরূপ যখন তোমার এই লক্ষ্য বস্তুকে করায়ত্ত করে তার বিলুপ্তি ঘটান, তখন লক্ষ্যও থাকে না, লক্ষ্য বস্তুও থাকে না (সব একাকার সত্যময় হয়ে যায়)।'

সর্বেশ্বরবাদে (Pantheism) র সমর্থক মতও সুফীদের উক্তিতে পাওয়া যায়। যেমন, সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে একজন বলেছিলেন:

'যিনি প্রকৃত সত্তায় 'আমি' এবং শূন্যে 'আমি-নয়' তাঁকে কেন আমি চিনব না? যদি পুনরায় আমি পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করি তাহলে প্রত্যাগমনের দরুন তাঁর থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হই; আর যদি (পৃথিবী থেকে) পরিত্যক্ত হই তাহলে পরিত্যক্ত হওয়ার দরুন আমি ভারশূন্য হই এবং তাঁর সঙ্গে মিলনে অনুরক্ত হই।'

আবুবকর শিবলী যেমন বলেছেন: 'সমস্ত কিছু ত্যাগ কর, তাহলে আমাকে সম্পূর্ণভাবে পাবে, তাহলে 'তুমি বর্তমান থাকবে। কিন্তু আমা ভিন্ন তোমার কোনও পরিচয় থাকবে না; এবং তোমার কর্ম আমারই কর্ম হবে।'

বায়েজীদ বোস্তামীকে প্রশ্ন করা হয়: 'আপনি যে শক্তি বা মর্যাদা লাভ করেছেন, তা কেমন করে পেলেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন; 'সর্প যেমন তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি আমার আমিত্ব থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। তখন নিজ সত্তাকে অনুধাবন করে দেখলাম যে আমিই তিনি।'

'আমরা তখন বললাম: মৃত গাভীর কোন অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত কর,' কোরানের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা সুফীরা এই প্রকার করে থাকেন: 'জীবিত করার উদ্দেশ্যে মৃতকে নিহত করার অর্থ হল যে দেহের মৃত্যু না হলে আত্মা জ্ঞানের আলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত হয় না, যতক্ষণ না কঠোর তপোশ্চারণের ফলে দেহের এমনভাবে মৃত্যু ঘটে যে, তার অস্তিত্ব নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং তোমার আত্মাই একমাত্র সত্য হয়ে থাকে যার উপরে নিয়মাধীন জগতের কোন প্রভাব পড়ে না।'

সুফীরা আরও বলেন: 'মানুষ ও আল্লার মধ্যে আলোক ও আঁধারের সহস্র স্তর আছে। মানব জাতি অন্ধকার ভেদ করে আলোর দিকে অগ্রসর হতে প্রয়াস পায়। আলোকে উপনীত হবার পর তাদের আর প্রত্যাবর্তন হয় না।'

অষ্টম অধ্যায়

সৃষ্ট জীবসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও তাদের নাম

৬৭ এই অধ্যায়ের বিষয়টিকে সম্যকরূপে বোঝা আমাদের পক্ষে দুরূহ কেননা আমরা (মুসলমানেরা) বিষয়টিকে বাইরে থেকে বুঝতে চেষ্টা করি কিন্তু হিন্দুরা সেটিকে কখনও বৈজ্ঞানিকভাবে সুবিন্যস্ত করে নাই। অথচ এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত বিষয়ের প্রাঞ্জলতার জন্য আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে যা শোনা গেছে, তা বর্ণনা করা আমাদের প্রয়োজন। প্রথমে 'সাংখ্য' গ্রন্থে যা আছে তা উদ্ধৃত করছি।

তপস্বী বললেন: 'জীবের কি কি স্তর ও শ্রেণী আছে?' ঋষী বললেন, 'জীবের তিনটি প্রধান স্তর আছে। সর্বোচ্চ স্তরে আছেন আধ্যাত্মিক জীব দেবতা; মধ্যে মানব, আর সর্ব নিম্নে পশু। এদের আবার চতুর্দশ শ্রেণী বা প্রকার আছে। তন্মধ্যে দেবতারা আট প্রকারের: ব্রহ্ম, ইন্দ্র, প্রজাপতি, সোম্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচ। পশু পাঁচ প্রকারের: গৃহপালিত, বন্য, পক্ষী, সরীসৃপ ও উদ্ভিদ অর্থাৎ বৃক্ষাদি। মানুষ কিন্তু একপ্রকারের হয়।'

অন্যত্র গ্রন্থকার প্রকারগুলোকে ভিন্ন নামে সংখ্যায়িত করেছেন, যেমন ব্রহ্ম, ইন্দ্র, প্রজাপতি, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিতর ও পিশাচ।

এই হিন্দু জাতিটি এমন যে কোন বিষয়ের বর্ণনায় শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা
৬৮ এরা কচিৎ করে থাকে। গণনাতেও ওরা প্রায় স্বেচ্ছাচারী কাজেই ওরা অসংখ্য নাম ব্যবহার করে থাকে, ক্ষেত্র যখন উন্মুক্ত, কে তাতে বাধা দেবে?

গীতাতে বাসুদেব বলেছেন: 'প্রাথমিক ত্রিগুণের প্রথম গুণ (সত্ত্ব) প্রবল হলে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা বিধানে নিযুক্ত হয় এবং দেবতার ন্যায় (সৎ) কর্মে প্রবৃত্তি জন্মায়। এই সত্ত্ব গুণের দরুন পরম শান্তি লাভ হয়; পরিত্রাণ তার অন্যতম ফল।

'দ্বিতীয় গুণ (রজঃ) প্রবল হলে লোভ (বা কামনা) বৃদ্ধি করে। তার প্রভাবে মানুষ যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এ অবস্থায় প্রতিফল কর্মানুযায়ী হয়ে থাকে।'

'আর তমোগুণ প্রবল হলে অজ্ঞানতা ও মনের বিভ্রম বাড়ে। তার থেকে দুশ্চিন্তা বিস্মৃতি, আলস্য, কর্তব্যে অমনোযোগ ও অবসাদের জন্ম হয়। তমোগুণের প্রভাবে মানুষ ভূত, পিশাচ ও প্রেতের মনোমত কর্মে রত হয়, যারা আত্মাকে স্বর্গ বা নরকে না নিয়ে গিয়ে বাতাসে বহন করে বেড়ায়। তমোগুণের পরিণাম শাস্তি, মানব শ্রেণী থেকে উদ্ভিদ শ্রেণীতে পতন।'

গীতার আর এক স্থানে বলা হয়েছে: 'আধ্যাত্মিক জীবের মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পুণ্য দেবতাদেরই থাকে। সেজন্য যে মানুষ দেবতুল্য হয়, সে ঈশ্বরে আস্থাশীল, ঈশ্বর ভক্ত এবং ঈশ্বরানুরাগী হয়। অবিশ্বাস ও পাপাচার অসুর ও রাক্ষস নামক দৈত্যদের গুণ, দৈত্যস্বভাব-মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাঁর আদেশ গ্রাহ্য করে না। বরঞ্চ সে পৃথিবীকে ঈশ্বরশূন্য করতে চায় এবং এমন সব কর্মে রত থাকে যা ইহকাল-পরকাল উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর ও মূল্যহীন।'

এ উক্তিগুলি একত্র করলে দেখা যাবে যে নাম ও বিন্যাসে বিশৃঙ্খলা রয়েছে। ওদের সবচেয়ে বেশী প্রচলিত মতানুযায়ী, আধ্যাত্মিক জীব হচ্ছে আট প্রকারের:

১। 'দেব' অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত (Anygls)। উত্তর দিক এদের। এরা বিশেষ করে হিন্দুদের নিজস্ব। কথিত আছে, (নিজ ধর্মে) দৈত্যদিগকে (শয়তান) শ্রমণদের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর নামে অভিহিত করাতে জরথুস্ত্র
৬৯. বৌদ্ধদের শত্রুতা ভাজন হয়েছিলেন। শব্দটির এই অর্থ (দেব-দৈত্য) Magian-দের সময় থেকে ফার্সি ভাষায় আজ পর্যন্ত চলে এসেছে।

২। 'দৈত্য দানব': এগুলো প্রেত, (Jinn) যারা দক্ষিণে থাকে। যে হিন্দু ধর্মের বিরোধী এবং যে গো-নিগ্রহ করে, সে এই দৈত্যদানবের অধীন। হিন্দুরা বলে, দেব দৈত্যের নিকট-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্ত নাই।

৩। 'গন্ধর্ব', এরা দেবতাদের সম্মুখে গীতবাদ্য করে; এদের নটীদের নাম 'অপ্সরা'।

৪। 'যক্ষ'; দেবতাদের কোষাগার রক্ষী।

৫। 'রাক্ষস'; ভয়ংকররূপী দৈত্য (Devil)।

৬। 'কিন্নর'; এদের আকৃতি মানুষের, মস্তক ঘোটকের অর্থাৎ দেহের নিম্ন ভাগ ঘোটক ও ঊর্ধ্বভাগ মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট, গ্রীক centarur-দের বিপরীত। সূর্যের ধনু রাশিতে এই centarur-এর আকৃতি আছে।

৭। 'নাগ' এগুলো সর্পাকৃতি।

৮। 'বিদ্যাধর'; এরা যাদুকর প্রেত; এদের যাদুর প্রভাব অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

দেখা যাচ্ছে, সর্বোচ্চে দেবগুণ, সর্বনিম্নে পৈশাচিক গুণ, আর মধ্যবর্তী স্তরগুলোতে উভয় গুণের মিশ্রণ আছে। গুণের তারতম্য এইজন্য যে এরা কর্ম-গুণে এই মর্যাদা পেয়েছে, আর মৌলিক ত্রিগুণ ভেদে কর্মের পার্থক্য হয়। এদের দীর্ঘায়ু হওয়ার কারণ এরা দেহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছে, সব রকম পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়েছে এবং মানুষের অসাধ্য কর্ম সাধনে তাদের ক্ষমতা জন্মেছে। এরা মানুষের ইচ্ছানুযায়ী অভিপ্রেতানুযায়ী তাদের সেবা করে এবং তাদের অন্তিমকালে বা প্রয়োজনের সময়ে উপস্থিত থাকে।

সাংখ্য থেকে যে উদ্ধৃতি আমরা উপরে দিয়েছি, তাতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, এই মত ভ্রান্ত। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি কোনও প্রজাতি (*Species*) বা প্রকারের নাম নয়। ব্রহ্মা ও প্রজাপতি প্রায় একই অর্থ বাচক, কেবল
৭০· গুণভেদে তাদের নামের পার্থক্য। ইন্দ্র বিশ্ব সমূহের অধীশ্বর। তা ছাড়া বাসুদেব 'যক্ষ' ও 'রক্ষ'কেও দৈত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেছেন; কিন্তু পুরাণগুলো যক্ষ সম্বন্ধে বলেছে, ওরা কোষাধ্যক্ষ ও কোষাগার রক্ষীদের অনুচর।

পরিশেষে আমরা বলি যে এই আধ্যাত্মিক জীবগুলো সবই এক পর্যায়ের। মানব জন্মে কৃতকর্মের গুণে ওরা স্ব স্ব মর্যাদা লাভ করেছে; ওরা সব রকমের দেহ পশ্চাতে ফেলে এসেছে; কারণ দেহ ভারস্বরূপ বা শক্তি হরণ করে এবং আয়ু ক্ষয় করে। ত্রিগুণের প্রভাবানুযায়ী তাদের গুণ ও অবস্থার প্রভেদ হয়েছে। সত্যগুণ 'দেব' বা (Angel) ফেরেস্তাদের বৈশিষ্ট্য, যারা প্রশান্তি লাভ করেছে। পদার্থকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারা যেমন মানুষের প্রধান লক্ষণ, ভাব বা তত্ত্বকে পদার্থ ব্যতিরেকে উপলব্ধি করা তেমই দেবতার প্রধান লক্ষণ। তৃতীয় অর্থাৎ তমোগুণের প্রাবল্য প্রেত ও পিশাচের বৈশিষ্ট্য, এবং এই দুই-এর মধ্যবর্তী আত্মাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বিতীয় অর্থাৎ রজঃগুণের প্রাবল্য।

ওরা বলে যে দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি, তার মধ্যে এগার কোটি মহাদেবের। এজন্য এই সংখ্যাটি (এগার) মহাদেবের অন্যতম পদবী এবং তাঁর নাম (মহাদেব) এই সংখ্যার দিকেই ইঙ্গিত করে। উপরোক্ত দেবতাদের মোট সংখ্যা হবে ৩৩'০০০০'০০০।

যেহেতু অতি সূক্ষ্মভাবে হলেও দেবতারা পদার্থের মধ্যেই বাস করে এবং যেহেতু জ্ঞানের পরিবর্তে কর্মের গুণে তারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, সেহেতু হিন্দুরা এই দেবতাদের জন্য পানাহার, স্ত্রী সঙ্গম, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি সমস্ত জৈব কর্মই সম্ভব বা স্বাভাবিক মনে করে থাকে। যেমন, 'পাতঞ্জল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে 'নন্দীকেশ্বর' বহু যজ্ঞ করে মহাদেবকে তুষ্ট করাতে মর দেহেই স্বর্গারোহণ করেছিল; কিংবা যেমন, স্বর্গরাজ 'ইন্দ্র' 'ব্রাহ্মণ' 'নহুষের' স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের শাস্তিতে সর্পে পরিণত হয়েছিল।

দেবতাদের নীচে 'পিতর' অর্থাৎ পরলোকগত পিতৃপুরুষদের স্থান। আর এদের সকলের নীচে আছে 'ভূত', অর্থাৎ সেই সব মানুষ যারা আধ্যাত্মিক জীবদের (দেবতাদের) সঙ্গে নিজকে যুক্ত রাখাতে দেব ও মানবের মধ্যবর্তী অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। মরদেহ ত্যাগ না করেই যে এই স্তরে উপনীত হয় তাকে ওরা 'ঋষি', 'সিদ্ধা' ও 'মুনী' বলে থাকে। নিজ নিজ গুণানুযায়ী এদের
৭১. মধ্যে প্রভেদ আছে। নিজ কর্মগুণে ইহজগতে তার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করার ক্ষমতা যে লাভ করেছে, তার অতিরিক্ত আর কিছু যে চায় না, বা মোক্ষের সাধনা করে না, তাকে 'সিদ্ধা' বলা হয়। সে অবশ্য ঋষির স্তরে উন্নতি করতে পারে। ব্রাহ্মণ 'ঋষির' স্তরে উঠলে তাকে 'ব্রহ্মর্ষী' বলা হয়, আর ক্ষত্রিয় ঋষী হলে তাকে বলা হয় 'রাজর্ষি'। তন্নিম্নস্তরের লোকের পক্ষে ঋষিত্ব লাভ সম্ভব নয়। জ্ঞানের দরুন ঋষিরা মানুষ হয়েও দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেজন্য এরা দেবতাদের গুরু স্থানীয়; এক ব্রহ্ম ছাড়া এদের উপরে আর কেউ নেই। এই ক্ষত্রির, ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের নীচে যে সব শ্রেণী আছে তারা আমাদের মধ্যেও আছে। আমরা অন্য স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাদের বিবরণ দিব।

শেষোক্ত এইসব প্রাণী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। পদার্থের (বস্তুর) অতীত কল্পনা সত্তার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আদ্যা শক্তি (বা আদি ভূত), পদার্থ ও পদার্থের উর্ধ্বেস্থিত আধ্যাত্মিক ঈশ্বরত্বের মধ্যবর্তী স্তর। এই আদিভূতে মৌলিক ত্রিগুণ পুঞ্জিত শক্তি রূপে (Dynamically) অবস্থান করে। কাজেই, আদিভূত ও তন্নিহিত যা কিছু আছে, তা উর্ধ্ব থেকে নিম্ন পর্যন্ত এক সেতু বিশেষ। আদিভূতে বিচরণশীল কেবল সত্যগুণ দ্বারা চালিত জীব মাত্রকেই ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রচলিত নানা নামে অভিহিত করা হয়। আসলে, এটি ক্রিয়ার সূচনাকারী প্রকৃতির সমার্থ বাচক, কারণ, সমস্ত কিছুর উৎপত্তি বা অস্তিত্বে আনয়ন, এমন কি বিশ্বসৃষ্টিও ওরা ব্রহ্মার প্রতি আরোপ করে থাকে।

রজোগুণের প্রভাবাধীন যে শক্তি আদিভূতে বিচরণ করে তাকে ওদের স্মৃতিশাস্ত্রে 'নারায়ণ' বলা হয়। তার আসল অর্থ, ক্রিয়ান্তে তার প্রস্তুত বস্তুর রক্ষায় সচেষ্ট প্রকৃতি। 'নারায়ণ' তাই স্থায়িত্বের জন্য বিশ্বের শৃংখলা বিধানে যত্নবান।

তৃতীয় 'তমোগুণের' অধীন যে শক্তি আদিভূতে বিচরণ করে, তাকে 'মহাদেব' ও 'শংকর' বলা হয়; তার সবচেয়ে বিখ্যাত নাম হচ্ছে রুদ্র। বিশৃংখলা ও ধ্বংস তার কাজ, প্রকৃতি যেমন ক্রিয়ার অন্তিম অবস্থায়, যখন তার শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে।

ঊর্ধ্ব ও নিম্নের বিভিন্ন স্তরে বিচরণ অনুসারে এই তিন শক্তির পৃথক নাম আছে। সেই অনুযায়ী তাদের কর্মেও প্রভেদ হয়। কিন্তু এই শক্তিত্রয়েরও
৭২. আদিতে একটি উৎস আছে। এই একক উৎসের ভিতরে ওরা এই তিনটি শক্তির সমষ্টিকে একত্রিত করে কল্পনা করে থাকে এবং তখন এর কোনটিকেই অন্যোতর জ্ঞান করে না। এই মূলে ঐক্যকে ওরা 'বিষ্ণু' বলে; নামটিকে মধ্যম শক্তির সমার্থ বাচক মনে করাই বিশেষ সমীচীন। তবে আবার কখনো কখনো ওরা এই মধ্যম শক্তি ও আদি কারণকে (বিষ্ণু ও নারায়ণ) অভিন্ন মনে করে থাকে।

এ বিষয়ে হিন্দুদের সাথে খৃীস্টানদের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। খৃীস্টানরাও পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা (Holy Ghost) নাম দিয়ে ত্রি-সত্তাকে স্বতন্ত্র করেছে, অথচ মূল সত্তায় আবার তাদেরকে একত্র করেছে।

হিন্দুদের ধর্ম তত্ত্বকে প্রণিধান ও বিশ্লেষণ করলে এই পাওয়া যায়। তবে ওদের শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সব অর্বাচীন ও অলীক ধারণা আছে, তার উল্লেখ আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে করব।

যে 'দেব' শব্দের আমরা ফেরেস্তা অর্থ করেছি, তাদের সম্পর্কে হিন্দুরা যে সব অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে থাকে, যে সব অযৌক্তিক ও আপত্তিকর কার্যকলাপ তাদের প্রতি আরে... থাকে—(যা মুসলমান শাস্ত্রবিদরা ফেরেস্তাদের প্রকৃতিবিরোধী ও ম... ...গুল গণ্য করে) তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। হিন্দুদের ... র সাথে প্রাচীন গ্রীকদের শাস্ত্রীয় কাহিনীগুলো তুলনা করলে ... কারণ থাকে না।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে গ্রীকরা ... 'ভগবান' বলত। Zeus সম্বন্ধে ওদের কাহিনীগুলো পড়লেই আম... ...স্তব্যের যাথার্থ প্রমাণিত হবে। Zeus-এর প্রকৃতিতে আরোপিত মানবীয় ও পাশবিক গুণ সম্বন্ধে

ওদের এই গল্পটি প্রণিধানযোগ্য। Zeus ভূমিষ্ঠ হলে, তার পিতা তাকে খেয়ে ফেলতে চাইল। তখন তার মাতা একটি প্রস্তর খণ্ডে জীর্ণ বস্ত্র জড়িয়ে তাকে খেতে দিল। সেটি গিলে নিয়ে Zeus-এর পিতা চলে গেল। Galenus-ও তার Book of Speches (كتاب الميامر) গ্রন্থে Philon-এর নিম্নলিখিত সাংকেতিক কবিতায় Phlonia নামক মোদক প্রস্তুতের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কাহিনীর উল্লেখ করেছেন :

'সুগন্ধি লালকেশ নাও, যা ঈশ্বরকে অর্চনাতে ব্যবহার করা হয় : আর মানুষের বুদ্ধির ওজন পরিমাণ মানুষের রক্ত নাও।'

এর অর্থ, পাঁচ মেসকাল (مثقال) 'জাফরান' কারণ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচ। অন্যান্য উপাদানের পরিমাণও Philon এমনই সংকেতে বর্ণনা করেছেন।

৭০ Galenus এই সংকেতের একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। 'এই কবিতা (শ্লোক)-তেই আছে : 'এবং সেই শিকড়ের কিয়দংশ, যা Zeus-এর জন্মভূমিতে জন্মেছিল।' Galenus বলেছেন : এটি আসলে سنبل নামক শিকড়, যার প্রচলিত sumbal বা 'শীষ' নাম ভুল, কারণ এটি আসলে শিকড়, শীষ নয়। Philon বিধান দিয়েছেন যে শিকড়টি Grete-এর হওয়া উচিত। কারণ, পুরাণকাররা বলেছেন, 'Zeus, Crete-এর Dektaon পর্বতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন যেখানে তাঁর মাতা তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে তার পিতা Kronos অপর শিশুগুলোর মত এই শিশুকেও খেয়ে না ফেলে।'

প্রচলিত ইতিহাসে আরও কথিত আছে যে Zeus একের পর এক কয়েকটি নারীর পাণি গ্রহণ করেছিল এবং বিবাহ না করে অন্য নারী ধর্ষণ-সহবাস-ও করেছিল। এই নারীদেরই একজনের নাম Europa, Phoenix-এর কন্যা, যাকে Crete-এর রাজা Asterios-এর নিকট থেকে হরণ করে।' পরে তার ঔরসে Europa Minos ও Rhadamanthus নামক দুই পুত্র প্রসব করে : এই ঘটনা ইসরাইল বংশীয়দের মরুভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে Pelestine প্রবেশের বহু পূর্বের।

Zeus সম্বন্ধে ... যায় যে Crete-এ ৭৪০ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছিল, এবং ... রীয় Sameon-এর সময়ে সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। আরও ... হয় যে প্রথমে তার নাম ছিল Dios, বৃদ্ধ বয়সে তাকে Zeus নাম দেওয়া হয় : Athens-এর রাজা Cecrops-ই সর্বপ্রথম তাকে এই নাম দিয়েছিলেন। কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে যথেচ্ছাচার, উচ্ছৃংখলতা এদের উভয়েরই অভ্যাস ছিল এবং নারীব্যবসায়ের সহায়তা করত।

কতকটা জরথুস্ত্র ও গুস্তাসপের মত, যখন এরা রাজ্যের ক্ষমতা ও শাসন যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করতে যত্নবান ছিল (?)।

ঐতিহাসিকেরা বলে যে Cecrops ও তার পরবর্তী রাজাদের সময় থেকেই গ্রীকদের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার হয়েছে। একথার উপর তারা Alexander এর কাহিনীর মত কাহিনীর প্রতি ইংগিত করে। যেমন, মিশরের রাজা
৭৪ Nectanebus Ardashir, the Black এর কাছ থেকে পালিয়ে Macedodia তে আশ্রয় নিয়ে জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনায় সময় কাটাইতেছিল। একদা সেখানকার রাজা Philippus-এর অনুপস্থিতির সুযোগে সে মেষ শৃংগ যুক্ত সর্পাকৃতি দেবতা Ammon-এর বেশ ধরে তার স্ত্রী Olympias-কে প্রতারণা করতঃ তার সঙ্গে সহবাস করে। তার ফলে Olympias-এর গর্ভে Alexander -এর জন্ম হয়। গৃহে ফিরে Philsippus সে শিশুর পিতৃত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে স্বপ্নে দেখে যে শিশুটি দেবতা Ammon-এর ঔরসজাত। তখন Philippus 'মানুষ দেবতাদের বিরুদ্ধতা করতে পারে না' এই বলে শিশুকে নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করল। নক্ষত্র গণনায় Nectanebus দেখেছিল যে নিজ পুত্রের হাতে তার মৃত্যু হবে। Alexander-এর কাছে আহত হয়ে একটি স্কন্ধের ক্ষত থেকে যখন তার মৃত্যু হল, তখন সে বুঝল যে সেই তার জনক।

গ্রীকদের পুরাণে এরূপ বহু গল্প আছে। হিন্দুদের বিবাহ প্রথা বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা আরও উদাহরণ দেব।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে আমরা বলি : Zeus প্রকৃতির যে অংশের সাথে মানবত্বার যোগ নাই, সে অংশের প্রতি ইঙ্গিত করে গ্রীকরা বলে যে Zeus শনির (Saturn) পুত্র, কারণ Galenus এর 'প্রমাণ গ্রন্থে' বলা হয়েছে যে Academy-র সভ্যদের মতে শনিই একমাত্র অ-জাত ও চিরন্তন। 'দৃশ্য বস্তু' সম্বন্ধে Aratos-এর গ্রন্থে যা আছে একথা প্রমাণ করতে তাই যথেষ্ট হবে। Zeus বন্দনা দিয়ে এ গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে :

'তিনি সেই যাঁকে আমরা (মানবজাতি) কখনও ত্যাগ করতে পারি না, যাঁকে ছাড়া আমাদের গতি নাই।

'পথ ও লোকালয় যাঁর দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং যিনি তাদের প্রতি কৃপাশীল।

'তিনি তাদের কামনার সামগ্রি উৎপন্ন করেন এবং তাদিগকে জীবিকার কথা স্মরণ করিয়ে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন।

'শস্যের উৎপাদন ও বৃদ্ধির জন্য যিনি ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপনের উপযুক্ত সময়ে সংবাদ দেন।

'যিনি আকাশকে নক্ষত্রাদি দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। সেজন্য আদি ও অন্তে তাঁর কাছেই মাথা নত করি।"

এরপর তিনি আধ্যাত্মিক সত্তাদের গুণকীর্তন করেছেন।

এখন এই দুই জাতির (হিন্দু ও গ্রীক) ধর্ম শাস্ত্রকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ব্রহ্মা ও Zeus-এর গুণ একই।

Aratos-এর গ্রন্থের টীকাকার বলেছেন যে দেবতাদের প্রশংসা দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করে Aratos সমকালীন কাব্য রীতির ব্যতিক্রম করেছেন এবং তিনি আসলে আকাশের কথাই বলতে চেয়েছেন। টীকাকার তারপরে Galenus-এর মত Ascelpius-এর উৎপত্তি আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন : আমার জানতে ইচ্ছা করে, Aratos কোন্ Zeus-এর কথা বলছেন, আধ্যাত্মিক অথবা প্রাকৃতিক Zeus ? কারণ কবি **Krates** আকাশের Zeus নাম দিয়েছেন; Homer-ও বলেছেন; 'Zeus থেকে যেমন তুষারখন্ড কেটে নেওয়া হয়।' 'পথ ও লোকালয় তার দ্বারা পূর্ণ থাকে, আমরা সবাই তাকেই নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য,' তাঁর এই উক্তিতেও Aratos ইথর ও বায়ুকে Zeus বলে অভিহিত করেছেন।"

এজন্য, Stoic দার্শনিকদের মত, যে আদিভূতে যে আত্মা পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে এবং যা আমাদের আত্মার অনুরূপ অর্থাৎ, যে প্রাকৃতিক শক্তি সমস্ত বস্তু-দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নামই Zeus। Zeus স্বভাবতঃ দয়াশীল, কারণ সে মঙ্গলের হেতু। টীকাকার সেজন্য ঠিকই বলেছেন যে Zeus শুধু মানুষকেই সৃষ্টি করেননি; দেবতাদিগকে সৃষ্টি করেছেন।

নবম অধ্যায়

বর্ণনামিত শ্রেণীসমূহ ও তন্নিম্নের সমাজ

৭৫ প্রভুত্বাভিলাস যার প্রকৃতিগত স্বভাব, চরিত্রগুণ ও কর্মক্ষমতায় রাজদণ্ড ধারণের উপযুক্ত এমন কোনও নিশ্চিত প্রত্যয়ী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি, শক্তিধর, উচ্চাভিলাসী নিজ কীর্তির বলে বিপদকালেও জনসাধারণের সমর্থন লাভ করার মত সৌভাগ্য অর্জন করেছে এমন ব্যক্তি যদি কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে সে ব্যবস্থা পর্বতের মত অটল ও স্থায়ী হয়, এবং যুগযুগান্তর ধরে পুরুষানুক্রমে সাধারণ নিয়ম হিসাবে সেটি পালিত হতে থাকে। উপরন্তু. এই সমাজ বা রাষ্ট্র কোন ক্ষেত্রে যদি ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে, তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সামঞ্জস্যে সে সমাজব্যবস্থা আরো দৃঢ় হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্মিলন-ই সমাজ-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিণতি।

পুরাকালের কর্তব্যনিষ্ঠ রাজারা প্রজাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরে ভাগ করে সংমিশ্রণ ও বিশৃঙ্খলা থেকে তাদিগকে রক্ষা করতে নিজকে বেশীর ভাগ নিযুক্ত রাখত। সে জন্য একশ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীর লোকের সাথে
৭৬ মেলামেশা করতে নিষেধ করত; এবং বৃত্তি হিসাবে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবসায় বা শিল্প নির্দিষ্ট করে দিত। কাউকে নিজ শ্রেণী বা স্তরের সীমা লঙ্ঘন করতে দিত না, এবং যে নিজ শ্রেণীতে সন্তুষ্ট থাকত না তাকে শাস্তি দিত।

প্রাচীন ইরানী সম্রাটদের বৃত্তান্ত থেকে এর নজীর পাওয়া যায়। এরা এই রকম বহু স্থায়ী রীতি প্রবর্তন করেছিলেন যা সেবা বা উৎকোচ দ্বারা কোন মতেই লংঘন করা যেত না। পারস্য সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করার সময়ে **Ardashir b. Babak** (বাবকের পুত্র আর্দশীর) শ্রেণীভেদ এইভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন: প্রথম শ্রেণীতে রাজপুত্র ও রাজপুরুষ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাধু-সন্ন্যাসী, অগ্নি-পুরোহিত ও শাস্ত্রবিদ; তৃতীয় শ্রেণীতে চিকিৎসক, জ্যোতিষী প্রমুখ বিদ্বজ্জন; আর চতুর্থ শ্রেণীতে কৃষক ও কারিগর। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রজাতির মত, প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার স্তরভেদ করে দেওয়া

হয়েছিল। সূচনা মনে থাকলে এই ধরনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই বংশলতিকার মত হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণ ও নীতি বিস্মৃত হয়ে গেলে সেটি মহীরুহের মত জাতির বদ্ধমূল সম্পদে পরিণত হয়। আর বহু যুগ ও শতাব্দী অতীত হবার পর বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী।

হিন্দুদের মধ্যে এইরকম বহু প্রথা আছে। আমরা মুসলমানরা সকল মানুষকে এক সততা (piety) ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে সমান মনে করি ; ওদের এই প্রথা, আর আমাদের সে প্রথার বিরুদ্ধাচরণ সেজন্য মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

শ্রেণীকে ওরা 'বর্ণ' অর্থাৎ 'রঙ' নাম দিয়েছে ; বংশের দিক দিয়ে শ্রেণীকে ওরা 'জাতক' অর্থাৎ জন্ম বলে। এই 'বর্ণে'র আদিভাগ হল চার। সর্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণের। ওদের গ্রন্থগুলোতে উক্ত হয়েছে যে, ব্রহ্মার মস্তক থেকে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু 'ব্রহ্ম' প্রকৃতি নামক শক্তিরই অন্য নাম, এবং দৈব-দেহের উত্তম অংশ হচ্ছে মস্তক, সেহেতু ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এজন্য হিন্দুদের চোখে ব্রাহ্মণ মানবশ্রেষ্ঠ। এদের নিম্নের শ্রেণী 'ক্ষত্রিয়'দের ওদের বিশ্বাস মতে ব্রহ্মার স্কন্ধ ও বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মর্যাদায় খুব বেশী পার্থক্য নাই।

৭৭ তার নীচে 'বৈশ্য'; ব্রহ্মার উরুদেশ থেকে এদের সৃষ্টি। চতুর্থ শ্রেণীতে আছে শূদ্র; ব্রহ্মার চরণ থেকে যাদের সৃষ্টি হয়েছে। শেষের দুই শ্রেণীর মর্যাদার মধ্যে বিশেষ দূরত্ব নেই। ভিন্ন শ্রেণীর হলেও এই চার শ্রেণীর লোকেরা নগর ও গ্রামে মিলেমিশেই বাস করে।

এদের নীচে আছে মেহনতি বা শ্রমজীবীরা। এদেরকে কোন বিশেষ 'বর্ণ' বলে গণ্য করা হয় না; পেশা বা জীবিকাই এদের 'বর্ণ'। এদেরকে 'অন্ত্যজ' বলা হয়। জীবিকা অনুযায়ী এদের আট শ্রেণী। পেশার সাদৃশ্য অনুযায়ী এরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও বিবাহাদি করে থাকে। কেবল রজক, চর্মকার ও তন্তুবায়ের সাথে অন্য পেশার লোকেরা কোন সম্পর্ক রাখে না। এই আট শ্রেণী হচ্ছে; রজক, চর্মকার, বাজীকর, ঝুড়ি ও ফাল নির্মাতা, নৌবাহক, মৎস্যজীবী, ব্যাধ ও তন্তুবায়। চতুর্বর্ণের লোকেরা এদের সঙ্গে একস্থানে বাস করে না; এরা নগরের বা গ্রামের নিকটেই বাস করে। কিন্তু তার বাইরে যাদিকে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ও "বধতও" (? بدهتو ?) বলা হয়, তারা কোন শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে না। এরা গ্রাম পরিষ্কার ও অনুরূপ হীন কার্যে নিযুক্ত থাকে। এরা সবাই মিলে একশ্রেণী বা জাতি, যেন জারজ

সন্তান; শুধু কর্মে তাদের প্রভেদ ধরা যায়। সাধারণ বিশ্বাস মতে ওরা শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার ব্যভিচারের ফল, সেজন্য ওরা পতিত, জাতিভ্রষ্ট।

চারি বর্ণের প্রত্যেক লোকেরই কর্ম ও আচরণ অনুযায়ী নাম ও উপাধি আছে। যেমন, স্বীয়-কর্তব্যরত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু যখন সে একটি হোমাগ্নির অর্চনা করে তখন তাকে 'ইষ্টি' বলা হয়। তিনটি অগ্নির পূজা করলে তার নাম হয় 'অগ্নিহোত্রি'; তার সঙ্গে সে যদি অগ্নিতে আহুতি দেয়, তখন তার নাম হয় 'দিক্ষিত'। অন্য শ্রেণীর লোকেরও এই রকম নামকরণ বিধি আছে। তবে, অস্পৃশ্যদের মধ্যে 'হাড়ি'কে সর্বোত্তম মনে করা হয়, কারণ এরা সমস্ত ক্লেদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এদের নীচে ডোম, কারণ এরা গীতবাদ্য করে। এদের নীচে যে শ্রেণী, রাজাদেশে অপরাধীকে বধ
৭৮ করা ও শাস্তি দেওয়া তাদের পেশা। সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে "বধতও" (?) কারণ তারা শুধু মৃত পশুর মাংসই খায় না, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর মাংসও খেয়ে থাকে।

চারি বর্ণের প্রত্যেক বর্ণকেই একত্র ভোজনকালে স্বপংক্তিভুক্ত হতে হয়; এক পংক্তিতে ভিন্ন বর্ণের কেউ বসতে পারে না। এমন কি ব্রাহ্মণের পংক্তিতে একে অন্যের শত্রু এমন দুইজন যদি বসে এবং তাদের আসন যদি পাশাপাশি থাকে, তাহলে উভয়ের মধ্যে একটি কাষ্ঠখণ্ড বা বস্ত্র বা অন্যকিছু দ্বারা ব্যবধান করা হয়ে থাকে। অন্ততঃ একটা রেখা টেনেও এদের দুজনকে ভিন্ন করা হয়। যেহেতু উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষিদ্ধ, সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির আহার্য ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এক পাত্রে আহার করলে, একজন ভোজনকারী গ্রাস তোলার পর পাত্রে অবশিষ্ট আহার্য অন্য ভোজনকারীর জন্য উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। যা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। চতুর্বর্ণের এই রীতি।

অর্জুন চতুর্বর্ণের প্রকৃতি ও তাদের ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বাসুদেব বললেনঃ 'প্রখর বুদ্ধি শান্ত স্বভাব, সৎ কথন, ধৈর্য, ইন্দ্রিয় সংযম, ন্যায়নিষ্ঠা, শুচিদেহ, পূজার্চনা ও ধর্মপ্রাণতা—এগুলো ব্রাহ্মণের আবশ্যকীয় গুণ।

বীর্যবান, নির্ভীক, মহানুভব, বাকপটু, মুক্তহস্ত, কালোচিত কর্তব্য সাধনে একাগ্রচিত্ত হওয়া ক্ষাত্রধর্ম।

বৈশ্যের কর্তব্য কৃষিকর্ম, পশুপালন ও বাণিজ্য।

আর শূদ্রের কর্তব্য সেবা, যাতে উপরোক্ত প্রত্যেক বর্ণ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

নিজ নিজ ধর্ম ও রীতি পালনে রত থাকলে এদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষিত সুখ পাবে, যদি ঈশ্বরাধনায় ত্রুটি না করে এবং প্রতি কর্মের সূচনায় তাকে

স্মরণ করে৷ নিজ বর্ণের কর্তব্য ত্যাগ করে অন্য বর্ণের কর্ম গ্রহণ করলেন, সে কর্মে ঐশ্বর্য ও সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও সে পাপগ্রস্ত হবে, কারণ এরূপ করা অবিধেয়।

৭৯. বাসুদেব অর্জুনকে শত্রু ধ্বংসে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে আরও বলেছেন: 'মহাবাহু, তুমি কি জান না যে তুমি ক্ষত্রিয়? ক্ষত্রিয়কুল বীরত্ব ও শত্রুনাশের জন্য-ই সৃষ্ট হয়েছে। কালের বিপর্যয়ে ক্ষত্রিয় কখনও ভীত হয় না। মৃত্যুর আশংকায় সে কখনও বিচলিত হয় না। কারণ, পুণ্যার্জনের আর অন্য পন্থা নাই। সে জয়ী হলে রাজ্য ও ঐশ্বর্য তার হবে; নিহত হলে সে স্বর্গের আনন্দ ভোগ করবে। তোমার চিত্তদৌর্বল্য হয়েছে; তাদের হত্যা করতে হবে বলে শত্রুর জন্য তুমি বিষাদগ্রস্ত হচ্ছ। কিন্তু তাতে ভীত ও কাপুরুষ বলে তোমার দুর্নাম রটবে, বীর, শত্রুজয়ী যোদ্ধাদের মধ্যে তোমার খ্যাতি থাকবে না। তাদের চোখে তুমি হেয় হবে, এবং তোমার সমস্ত কীর্তি নষ্ট হবে। এর চেয়ে কঠিনতম শাস্তি আমার জানা নাই। অপযশের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর। ভগবান যখন তোমাকে আদেশ দিয়েছেন, তোমার কুলকে যুদ্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তোমাকে তারই জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর আদেশ পালন কর, তাঁর ইচ্ছা পালনে কৃতনিশ্চয় হও; ফলাফলের লোভ করো না, তোমার কর্ম তাঁকেই অর্পণ কর।'

এই সকল বর্ণের মধ্যে মোক্ষলাভের সামর্থ্য (সম্ভাবনা) কার আছে, সে বিষয়ে ওদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত আর কারও মোক্ষলাভ সম্ভব নয়, কেননা তাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই। দার্শনিক পন্ডিতদের মতে কিন্তু, মোক্ষে মানুষ মাত্রেরই অধিকার আছে, যদি তার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে। এই মতবাদ ব্যাসের এই উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: 'পঁচিশটি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ কর; তারপর যে ধর্ম অবলম্বন করতে চাও কর: তোমার মুক্তি হবেই। এই মতের সমর্থনে আর একটি তথ্য এই যে, বাসুদেব নিজে শূদ্র বংশজাত ছিলেন। তাঁর নিজের উক্তিও আছে—অর্জুনকে বলছেন: 'কর্মের প্রতিদানে ঈশ্বর পক্ষপাত বা অন্যায় করেন না, সৎকর্ম করতে যদি কেউ তাঁকে বিস্মৃত হয়, সে কর্মকে তিনি মন্দ বলে গণ্য করেন। আর মন্দ কর্ম করতে যদি কেউ তাঁকে স্মরণ করে, সেই মন্দ কর্মকেও তিনি সৎকর্ম বলে গণ্য করেন, যদি কর্মকারক বৈশ্য, শূদ্র বা নারী-ও হয়; আর যদি কারক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হয়, তাহলে ত' কথা-ই নাই।'

দশম অধ্যায়

ধর্ম ও রাষ্ট্রবিধানের সূচনা, নবী (প্রেরিত পুরুষ) ও শাস্ত্রবিধি রহিত করণ

৮০. ইউনানীরা তাদের রীতি ও ধর্মকথাগুলো ঐ কর্মে নিয়োজিত দার্শনিকদের কাছ থেকে নিয়েছিল, তারা মনে করত যে এরা আইন প্রণয়নে ভগবানের সাহায্য পেয়েছে। যেমন Solon, Dracon Pythagoras, Mianos। প্রভৃতি গ্রীকদের রাজারাও এইরূপ করত; যেমন Mianos (?) মূসার দুইশত বছর পূর্বে Crete ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপ সমূহের উপর রাজত্ব করার কালে যে বিধান প্রবর্তন করেন তা Zeus-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত বলে প্রচার করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে Mianos ও তাঁর আইন রচনা করেন।

Cyrus-এর উত্তরাধিকারী প্রথম দারায়ুসের সময়ে, রোমবাসীরা এথেনীয়দের নিকট দূত প্রেরণ ক'রে তাদের নিকট থেকে দ্বাদশ খন্ডে সম্পূর্ণ এক আইন গ্রহণ করে। Pompilius পর্যন্ত রোমানরা এই আইনের অধীনেই থাকে। এই রাজা নতুন আইন প্রবর্তন করে এবং দশ মাসের স্থলে দ্বাদশ মাসের বছর গণনা করার নিয়ম করে। মনে হয় যে রোমান নাগরিকদের উপর তিনি রুষ্ট ছিলেন। কারণ তাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যে রূপার পরিবর্তে মৃৎপাত্রের টুকরো, অভ্র ও চর্ম খণ্ড ব্যবহার করার তিনি আদেশ দিয়েছিলেন। এর থেকে অবাধ্য প্রজাদের উপর তাঁর আক্রোশ প্রকাশ পায়।

Plato-র 'বিধান' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে এথেন্স থেকে আগত বিদেশী লোকটি বলছে, 'কে প্রথম তোমাদের আইন প্রণয়ন করেছে মনে কর? দেবতা না মানুষ?' Cnossos-এর লোকটি বললে, 'দেবতা; আমাদের আইন আসলে Zeus প্রদত্ত।' কিন্তু Lacedaemonian-দের মতে, তাদের আইনকার হচ্ছে Apollo। এই পরিচ্ছেদে Plato আরও বলেছেন "বিধান রচয়িতা যদি ঈশ্বর প্রেরিত হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠতম গুণ অর্জন ও সর্বোচ্চ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই সে
৮১. আইনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। Plato এই বলে Crete-এর আইনের বর্ণনা করেছেন যে যথার্থভাবে সে আইন পালনের ফলে Crete-বাসীরা সর্ববিধ

সুখ লাভ করে, কারণ পারমার্থিক কল্যাণের উপর যে মানবীয় কল্যাণ নির্ভর করে, এই আইনের দ্বারা সে সমস্তই লাভ হয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এথেনীয় লোকটি বলছে: 'দুঃখকষ্টে কাতর মানব জাতির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ঈশ্বর তাদের জন্য 'ভগবান, শিল্প সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ ও তাদের অধিনায়ক Apollo ও Dionysos-এর নামে পর্ব উদযাপন করার নিয়ম করেছেন। Dionysos বৃদ্ধ বয়সের দুঃখ লাঘব করার উপায় স্বরূপ মানুষকে সুরা উপহার দিয়েছেন, যাতে অবসাদ বিস্মৃত হয়ে সে আবার যৌবনোচিত স্ফূর্তি লাভ করে এবং বিপন্ন অবস্থা থেকে তার ব্যক্তিসত্তা সুস্থতা লাভ করে।' Plato আরও বলেছেন: দেবতারা মানুষের ক্লান্তি দূর করার জন্য নৃত্য ও ছন্দময় গীতানুষ্ঠানের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, যাতে তারা একত্রে উৎসব ও আনন্দ করতে পারে, সেজন্য একরকমের সঙ্গীতকে তারা স্তোত্র (Hymn) বা বন্দনা বলে থাকে; এ নামে দেবারাধনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

এই ত গেল গ্রীকদের ব্যাপার। ভারতীয়দের বেলায়ও তাই। ওদের বিশ্বাস মতে শাস্ত্র ও বিধানগুলো সমস্তই 'ঋষি'দের দ্বারা প্রবর্তিত। ঋষিরা ওদের দার্শনিক, শাস্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ। শাস্ত্র বিধানগুলো প্রেরিত পুরুষ (রসূল) অর্থাৎ নারায়ণের নিকট থেকে পাওয়া বলে ওরা মনে করে না। নারায়ণ যখন ধরায় অবতীর্ণ হন, তখন মানব রূপ ধারণ করেন। সৃষ্টি ধ্বংসী অধর্মের বিনাশ করতে বা সংকট ত্রাণ করতেই তিনি আবির্ভূত হন, শাস্ত্র বিধানের কোন অংশ পরিবর্তন করতে তিনি আসেন না। প্রচলিত ধর্ম বিধানানুযায়ীই তিনি কাজ করে থাকেন। এই জনাই শাস্ত্র ও পূজা পদ্ধতির জন্য ভারতীয়রা রসূল (Prophet)-এর প্রয়োজন মনে করে না, যদিও পৃথিবীর অন্যান্য ব্যাপারে কখনও কখনও নবীর প্রয়োজন তারা বোধ করে থাকে।

৮২ মনে হয় যেন কোনও শাস্ত্রবিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনায় ভারতীয়রাও বিশ্বাস করে। কারণ ওরা বলে, এমন অনেক বিষয় আছে, যা বাসুদেবের পূর্বে অনুমত ছিল, পরে নিষিদ্ধ হয়েছে, যেমন গোমাংস। মানব স্বভাবের পরিবর্তন ও কর্তব্য পালনে তাদের অক্ষমতার জন্যই এরূপ পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিবাহ রীতি ও কৌলিন্যপ্রথাও এই পরিবর্তিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। পুরাকালে তিন প্রকারে বংশ বা কুল নির্ণয় হতো:

(১) বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে পিতার ঔরসজাত সন্তানে পিতার অধিকার, যেমন মুসলমান ও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে নিয়ম আছে।

(২) বিবাহের শর্ত অনুযায়ী, তার স্বামীর ঔরসজাত নবোঢ়া কন্যার গর্ভের সন্তান পিতার বংশধর না হয়ে, শর্তানুযায়ী মাতামহের বংশে গণ্য হবে।

(৩) বিবাহিত নারীর গর্ভে কোন অপরিচিত পুরুষ পুত্রের জন্ম দিলে সে পুত্র তার স্বামীর হবে, যেহেতু স্ত্রীরূপ ভূমিতে তার অনুমতিক্রমে উৎপাদিত শস্যে স্বামীরই অধিকার থাকে। এ নিয়মেই পান্ডু শান্তনুর পুত্র বলে পরিচিত। নিঃসন্তান অবস্থায় কোন মহা তপস্বীর অভিশাপে এই রাজা স্ত্রী সঙ্গমের সামর্থ হারিয়েছিলেন। তিনি তখন পরাশর পুত্র ব্যাসকে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে তাঁর জন্য পুত্র উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। ব্যাসের সঙ্গে সঙ্গমকালে তাঁর এক স্ত্রী ভয়ে কম্পিত হয়েছিল, তার ফলে সেই অবস্থায় পান্ডুবর্ণের এক রুগ্ন পুত্রকে সে গর্ভে ধারণ করে। রাজা তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তাঁর কাছে পাঠালে এই স্ত্রীও ব্যাসের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে নিজকে বসনাবৃত করে রাখে। তাঁর গর্ভে অন্ধ ও অসুস্থ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। তৃতীয় স্ত্রীকে ব্যাসের কাছে পাঠাবার সময়ে রাজা তাকে ভয় ও শ্রদ্ধা পরিহার করতে বলে। হাস্যমুখে ও উৎফুল্লচিত্তে ব্যাসের বীর্য ধারণ করাতে সে স্ত্রীর গর্ভে সুভাষ ও তীক্ষ্ণধী 'বিদুরের' জন্ম হয়।

পান্ডুর চারি পুত্রের একটি স্ত্রী ছিল, প্রত্যেক স্বামীর সঙ্গে সে একমাস কাল বাস করত। ওদের শাস্ত্র গ্রন্থে আরও আছে যে, পরাশর মুনি একদিন নৌকা আরোহণ করে পাটনীর কন্যাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়। মুনি তাকে ধর্মভ্রষ্ট করতে চাইলে, কন্যা অবশেষে সম্মত হয়, কিন্তু নদী তীরে
৮০ লোকচক্ষুর অন্তরালে যাওয়ার মত কোনও আড়াল ছিল না বলে তাদের অভিলাস পূর্ণ হওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ সেখানে একটি ঝাউগাছ জন্মাল। পরাশর সেই গাছের আড়ালে গিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গম করে এবং তার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম দেয়, সে-ই মহামুনি ব্যাস।

এই সমস্ত রীতিই এখন পরিত্যক্ত ও বর্জিত হয়েছে। ওদের এসব কাহিনী থেকে তাই মনে হয় যে বিধান রহিত করার অনুমতি ওদের শাস্ত্রেও আছে।

এইরূপ গর্হিত বিবাহ রীতি কিন্তু এখনও দেখা যায়; প্রাক্ ইসলামী আরবদের মধ্যেও ছিল। পঞ্জশীর থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের মধ্যে সহোদর ভ্রাতাদের একটি মাত্র স্ত্রী থাকার প্রথা আছে।

প্রাচীন আরবদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল; একটি যেমন, স্বামী তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করতে পাঠাত; সুপুত্রলাভের আশায় গর্ভকালে স্বামী আর সে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করত না। এটি হিন্দুদের উপরেউল্লিখিত তৃতীয় প্রকারের বিবাহ রীতির সমান। আরেক প্রকারের বিবাহ হোল যে, এক পুরুষ অন্য পুরুষকে বললে : "তোমার স্ত্রী আমাকে দাও, আমার স্ত্রী তোমাকে দেব", এই ভাবে তারা স্ত্রী বিনিময় করত। আরও একপ্রকারের বিবাহ ছিল যে বহু পুরুষ এক নারীর সাথে সঙ্গম করত; সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার জনক কে, নারী তা বলে দিত। সে নির্দেশ করতে অপারগ হলে, গণকরা বলে দিত। চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হোত বিমাতার সাথে (যার নাম نكاح المقت)। মৃত পিতার বা মৃত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করলে সে স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানকে Zaizan (ضيزن) বলা হোত। এর সঙ্গে ইহুদীদের বিবাহ প্রথার বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহুদীদের নিয়ম আছে যে, অপুত্রক অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার ভ্রাতা তার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করবে, যাতে তার পরলোকগত ভ্রাতার বংশ রক্ষা পায়। তার ঔরসজাত হলেও এ স্ত্রীর সন্তান তার ভ্রাতারই হবে, তার নিজের নয়। পৃথিবী থেকে যাতে মৃত ব্যক্তির নাম লুপ্ত না হয়ে যায়, ওরা এই উপায়ে তার যত্ন করে। এইভাবে বিধবার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে যে মৃত ব্যক্তির বংশ রক্ষায় সহায়তা করে, হিব্রু ভাষায় তাকে Yabham বলা হয়।

Magian-দের মধ্যেও এই প্রকার রীতি ছিল। 'মহা হরবাজ' (Harbadh) তওসর (Tausar, the great harpadh), padashwar Girshah-এর উদ্দেশে বাবক পুত্র আরদেশির-এর বিরুদ্ধে তার আক্রমণের প্রত্যুত্তর হিসাবে লিখিত গ্রন্থে বলেছেন :—পারসিকদের মধ্যে নিয়ম আছে যে নিঃসন্তান অবস্থায় কারো মৃত্যু হলে, তার সম্বন্ধে সকলের দায়িত্ব আছে। যদি তার স্ত্রী বর্তমান থাকে, তবে তার নিকটতম আত্মীয়ের সাথে তার বিবাহ দেয়। যদি তার স্ত্রী বর্তমান না থাকে তবে তার কন্যা অথবা তার নিকটতম আত্মীয়াকে বংশের নিকটতম পুরুষের সাথে বিবাহ দেবে। আর তার বংশে যদি কোনও স্ত্রীলোকই না থাকে, তাহলে, মৃত ব্যক্তির ধন ব্যয় করে তার বংশের জন্য কন্যা সংগ্রহ করে তার সাথে বংশের কোন পুরুষের বিবাহ দেবে। এই বিবাহের সন্তান মৃত

৮৪ ব্যক্তির সন্তান বলে গণ্য হবে। যে এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, সে অসংখ্য প্রাণী হত্যার ভাগী হবে, কারণ তার অবহেলার দরুন মৃত ব্যক্তির বংশ লুপ্ত হবে এবং ধরা থেকে চিরকালের মত তার নাম মুছে যাবে।

এসব বৃত্তান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য (ইসলাম) ধর্মবিধানের শ্রেষ্ঠতা এবং তার নীতি বিরুদ্ধ প্রথার কদর্যতা পরিস্ফুট করানই আমার এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

একাদশ অধ্যায়

মূর্তি পূজার সূচনা ও বিগ্রহসমূহের বিবরণ

এ কথা সুবিদিত যে সাধারণ লোকের মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ভাবজগতের প্রতি তাদের সহজাত বিরাগ থাকে। যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভাবাত্মক বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক যুগেই তাদের সংখ্যা অল্প হয়ে থাকে। যেহেতু সাধারণ লোকের মন চাক্ষুস দৃষ্টান্তেই তৃপ্ত হয়, সেহেতু ইহুদী, খৃীস্টান ও বিশেষ করে Manichaean প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের গ্রন্থে ও উপাসনা গৃহে চিত্র ও প্রতিমূর্তি রচনা করে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। একটি উদাহরণ থেকেই আমার এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমাদের নবীর বা মক্কা মদীনার একটি চিত্র যদি কোনও অশিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী লোককে দেখান হয়, তুমি দেখবে যে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চিত্রটিকে চুম্বন করছে, কপোল স্পর্শ করাচ্ছে, তাকে সম্মুখে রেখে ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, যেন সে আসল ব্যক্তি বা পবিত্র গৃহকেই দেখছে, এবং সেই ধারণায় সে যেন সাধারণ ও বিশেষ হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানই পালন করছে।

প্রতিমা নির্মাণ এই কারণেই হয়ে থাকে। এগুলো আসলে নবী, জ্ঞানী, দেবতা প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে তৈরি হয়, যার দ্বারা তাদের অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুর পরে তাদের গুণের কথা লোকের মনে জাগরূক থাকে। সাধারণের অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব অম্লান থাকে। স্মারক মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবার বহুকাল, বহু শতাব্দী কেটে গেলে, তার আসল উদ্দেশ্য লোকে ভুলে যায় এবং তাকে অর্চনা করে সম্মান করা প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে। পরে সাধারণের এই মনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে শাস্ত্রকারেরা এ অভ্যাসকে বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। তখন, এই মূর্তি ও চিত্রগুলোকে পূজা করা লোকের ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মহাপ্লাবনের পূর্ব ও পরের ইতিবৃত্তগুলোতে এ ধরনের কথাই পাওয়া যায়, এমন কি এ-ও কথিত হয় যে ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত মনুষ্য জাতি-ই মূর্তি উপাসক ছিল।

Torah গ্রন্থের অনুগামীরা মূর্তি পূজার সূচনা ইব্রাহিমের প্রপিতামহ সারুখের সময়ে হয়েছিল বলে মনে করে। রোমানরা কিন্তু বলে যে Romulus ও Romanus নামক ফ্র্যাঙ্ক জাতীয় ভ্রাতাদ্বয় রাজা হয়ে রোম নগরীর পত্তন করে। পরে Romulus তার ভ্রাতাকে হত্যা করে, যার ফলে দীর্ঘকাল ধরে অন্তর্বিপ্লব ও যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে Romulus নতি স্বীকার করে এবং স্বপ্ন দেখে যে তার ভ্রাতাকে সিংহাসনে না বসালে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। সে তখন তার ভ্রাতার এক স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করে তার পার্শ্বে রাখে এবং প্রতিটি ঘোষণায় 'আমরা (উভয়ে) এই আদেশ দিচ্ছি' এই বাক্য ব্যবহার করতে থাকে। সেই হতে বহু বচন ব্যবহার করা রাজাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এর পর বিপ্লব শান্ত হয়। Romulus তখন এক উৎসবের আয়োজন করে অশ্বিনয়াদির দ্বারা তার প্রতি তার ভ্রাতার সমর্থকদের শত্রুতা প্রশমিত করতে চেষ্টা করে। তাছাড়া চার রঙের চারটি অশ্বারোহী মূর্তি রচনা করে সে সূর্যের একটা কীর্তিসৌধ নির্মাণ করে: সবুজ বর্ণের মূর্তিটি মৃত্তিকার প্রতীক, নীল বর্ণের মূর্তি জলের, লাল অগ্নির আর শ্বেত বায়ুর। এই সৌধটি এখন পর্যন্ত রোমে বিদ্যমান আছে।

যেহেতু হিন্দুদের মূর্তি পূজাই আমাদের আলোচনার বিষয়, সেজন্য ওদের হাস্যকর মতামতের এখন আমরা কিছু বিবরণ দেব। কিন্তু এখানে আমি বলে রাখি যে এসব মতামত ওদের অশিক্ষিত লোকেরা পোষণ করে। যারা মুক্তি পথের পথিক, কিংবা যারা দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন করে এবং যারা ভাব-সাধক, যাকে ওরা 'সার' বলে একমাত্র সেই মৌলিক তত্ত্বের জ্ঞান যাদের আকাঙ্ক্ষা, তারা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারুর উপাসনা করে না, মানুষের নির্মিত মূর্তি উপাসনা করার কথা তারা কখনও চিন্তাও করে না।

এ সম্বন্ধে ওদের যে সব কাহিনী আছে তার একটি এই যা সৌনিক রাজা পরীক্ষিতকে বলেছিল : পুরাকালে অম্বরীষ নামে এক রাজা ছিল। সে তার মনোমত বিস্তৃত রাজ্য পেয়েছিল। পরে সে রাজ্য ত্যাগ ক'রে একান্তে দীর্ঘকাল ঈশ্বরারাধনায় রত থাকে। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্রের রূপ ধরে হস্তী পৃষ্ঠে ঈশ্বর তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাকে বর চাইতে বলেন। অম্বরীষ বললেন, 'তোমার দর্শনেই আমি তৃপ্ত হয়েছি, তোমার প্রসাদে আমার এ সৌভাগ্য, সেজন্য
৮৬ আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার প্রার্থনা তোমার কাছে নয়, তোমাকে যে সৃষ্টি করেছে তার কাছে।' ইন্দ্র বললেন : "তপস্যার উদ্দেশ্য সুফল লাভ। অতএব যার নিকটে থেকে পুরস্কার পেয়ে এসেছ তার কাছেই তোমার মনস্কামনা ব্যক্ত কর। 'তোমার কাছে নয় অন্যের কাছে' এমন তর্ক তুলো না।"

রাজা বললে : "পৃথিবী আমার আয়ত্তে আছে, কিন্তু পৃথিবীর কিছুতে আমার আসক্তি নাই। আমার সাধনার উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন—যা তুমি আমাকে দিতে পার না। তোমার নিকট আমার ইষ্টসিদ্ধি কেন চাইব ?"

ইন্দ্র বললেন : "বিশ্ব ও বিশ্বের সব কিছু আমার বাধ্য। কে তুমি যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করছ ?"

রাজা বললে : "আমিও তোমার আজ্ঞা শুনি ও পালন করি। কিন্তু আমি তাঁরই আরাধনা করি যার নিকট হতে তুমি তোমার এই প্রভুত্ব লাভ করেছ। তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যিনি তোমাকেও বলি ও হিরণ্যাক্ষরাজাদ্বয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব আমার অভীষ্ট কর্ম করতে দাও, আমার প্রণাম নিয়ে বিদায় হও।"

ইন্দ্র বলিলেন : "তুমি যখন আমাকে অমান্য করতে কৃতসংকল্প হয়েছ, তোমাকে আমি বধ ও ধ্বংস করব।"

অম্বরীষ রাজা উত্তর করলে : 'লোকে বলে সুখ ঈর্ষার উদ্রেক করে, দুঃখে করুণা হয়। মরজগৎ থেকে যে মুক্তি পায় দেবতারা তাকে ঈর্ষা করে, সেজন্য তাকে ভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে। যারা সংসার ত্যাগ করে একান্তভাবে ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত আছে আমি তাদের একজন। যতদিন বাঁচব সে আরাধনা আমি ত্যাগ করব না, আমার এমন কোন পাপ কর্ম আমি জানি না, যার জন্য আমি তোমার বধ্য হোতে পারি। যদি বিনা দোষে আমাকে হত্যা করতে চাও, সে তোমার অভিরুচি। কি চাও তুমি ? যদি আমার মন ঈশ্বরে একান্তভাবে নিবিষ্ট থাকে, যদি আমার ভক্তি নির্মল হয়, তাহলে তুমি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যে ঈশ্বর ধ্যানে আমি নিযুক্ত আছি আমার জন্য তাই যথেষ্ট। সেই ধ্যানই এখন আবার করব।'

রাজা পুনরায় ধ্যানস্থ হলে মানবরূপে ঈশ্বর তার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন, নীল পদ্মের বর্ণ, গৈরিক বসন, গরুড় নামক পক্ষীর পৃষ্ঠে আসীন। তাঁর এক হাতে 'শংখ' (একরূপ সামুদ্রিক ঝিনুক বা হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ কালে ফুৎকার দিয়ে বাজান হয়) অন্য হাতে চক্র (এটি বৃত্তাকারের এক
৮৭ তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিশেষ, যা নিক্ষেপ করলে যাতে লাগবে তাকে কেটে বেরিয়ে যায়), তৃতীয় হাতে কবচ, আর চতুর্থ হাতে পদ্ম, (অর্থাৎ রক্ত কমল) তাঁকে দেখে রাজা ভয়ে কম্পিত হল, ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগল। ভগবান তাঁকে শান্ত করে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হবার আশ্বাস দিলেন। রাজা তখন বললেন : "আমার রাজ্যের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; রোগ বা শোকে কখনও

আমি পীড়িত হইনি; সমস্ত পৃথিবী যেন আমারই ছিল। কিন্তু আমি পৃথিবী থেকে বিমুখ হয়েছি, যখন জেনেছি যে পার্থিব সুখের পরিণাম আসলে মন্দ হয়। যা এখন পেয়েছি তা ছাড়া আমি আর কিছু কামনা করি না। এরপর ভববন্ধন থেকে মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু চাই না।

ভগবান বললেন: "পৃথিবীকে সযত্নে পরিহার করে নির্জনে বাস করলে নিয়ত ভগবৎ চিন্তা ও ইন্দ্রিয় সংযম করলেই তুমি তা পাবে।"

রাজা আবার বললে: "তুমি না হয় এমন শক্তি আমাকে দিয়েছ যার প্রসাদে আমি তা করতে পারি। কিন্তু অন্য লোক তা কি করে করবে? অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন মানুষের চিরন্তন, এই দুইটি বস্তুই ত তাকে পৃথিবীর সাথে যুক্ত করে রাখে। কেমন করে সে অন্য চিন্তা করবে?"

ভগবান উত্তর করলেন: "তোমার রাজ্য এবং সংসারকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও হিত সাধনে নিযুক্ত রাখ, পৃথিবীর শ্রীসাধন, তার অধিবাসীদের সংরক্ষণ, দান-দক্ষিণা, প্রভৃতি তোমার প্রত্যেক কর্মেই আমাকে চিন্তা কর। যদি স্বাভাবিক মানবীয় বিস্মৃতি তোমাকে কখনও আচ্ছন্ন করে, তাহলে আমার এই বর্তমান রূপের প্রতিমূর্তি গঠন কর এবং সুগন্ধি ও পুষ্পাদি দিয়ে তার অর্চনা কর। সে বিগ্রহকে আমার নিদর্শন মনে কর যাতে আমাকে কখনও বিস্মৃত না হও। দুঃখে আমাকে স্মরণ কর; বচনে আমার নাম উচ্চারণ কর; কর্ম আমারই উদ্দেশ্যে কর।"

রাজা পুনরায় বললে: 'আমার সাধারণ কর্তব্য এখন আমি বুঝেছি। কিন্তু আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আমায় অনুগৃহীত কর।'

ভগবান বললেন, 'তা আমি পূর্বেই করেছি, তোমার বিচারাধিকরণ বশিষ্টকে প্রয়োজন মত সব কিছু বোঝার প্রেরণা দিয়েছি। সকল জিজ্ঞাসার উত্তর তার কাছেই পাবে।' তারপরে সে মূর্তি অন্তর্হিত হোল। রাজা তখন গৃহে ফিরে গিয়ে আদিষ্ট কর্ম পালনে নিযুক্ত হোল।

৮৮ ভারতীয়রা বলে যে সেই সময় থেকেই প্রতিমা গঠন আরম্ভ হয়েছে। গল্পে বর্ণিত মূর্তির লক্ষণানুযায়ী কেউ উপরোক্ত চতুর্ভুজ বিগ্রহ নির্মাণ করে, কেউ বা দ্বিভুজ।

ওদের আর একটি গল্প এই: "এক ব্রাহ্মণের নারদ নামে এক সন্তান ছিল। ঈশ্বর দর্শন ব্যতীত তার অন্য কোনও কামনা ছিল না। ভ্রমণকালে সর্বদা তার হাতে একটি যষ্টি থাকত, সেটি মাটিতে নিক্ষেপ করলে সর্পে পরিণত হত এবং তার দ্বারা সে নানা রকম আশ্চর্য কাজ করতে পারত। একদিন সে

অদূরে এক জ্যোতি দেখে তার নিকটস্থ হবার চেষ্টা করল। তখন আকাশ বাণী এলো—'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে না, আমার এই রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপে তুমি আমার দর্শন পাবে না।' সে লক্ষ্য করে মানবাকৃতির এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখতে পেল। সেই থেকে বিগ্রহ রচনা আরম্ভ হয়েছে।

ওদের প্রধান বিগ্রহগুলোর মধ্যে সূর্যের নামে প্রতিষ্ঠিত মুলতানের মূর্তিটি অন্যতম। সেইজন্য তার নাম 'আদিত্ব'। এটি রক্তবর্ণের চর্মে আবৃত একটি কাষ্ঠ মূর্তি; চোখ দুটিতেও রক্ত বর্ণের চুনি বসান। ওদের বিশ্বাস, বিগ্রহ শেষ 'কৃত্য' যুগে নির্মিত হয়েছে। যদি কৃত্যযুগের শেষেও এটি নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে তখন থেকে আজ পর্যন্ত ২১৬-৪৩২ বছর অতীত হয়েছে। মুহম্মদ-বিন-কাসেম বিন কুনাবনুহ্ মুলতান জয় করার পর, শহরের ঐশ্বর্য ও ধনাগমের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারলেন যে এই বিগ্রহটিই তার মূল, কেননা নানাদিক থেকে তীর্থযাত্রী এটিকে দর্শন করতে আসত। বিগ্রহটিকে অক্ষত অবস্থায় থাকতে দেওয়া তাই তিনি উচিত মনে করেছিলেন। তবে উপহাস করার জন্য তার গলদেশে একখন্ড গোমাংস ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই স্থানে একটি জামে মসজিদও নির্মিত হয়েছিল। মুলতান 'কারামিতাদের' (Qarametah) আধিপত্য স্থাপিত হলে Shariban নামক রাজ্যাপহারক বিগ্রহটিকে ভেঙে ও তার পুরোহিতগণকে হত্যা করে পূর্বোক্ত জামে মসজিদের পরিবর্তে উচ্চ জমিতে ইষ্টকনির্মিত নিজ প্রাসাদকে মসজিদে পরিণত করে। ওমাইয়া বংশীয় খলীফাদের যাবতীয় কীর্তি নিশ্চিহ্ন করার জন্য সে পূর্বেকার মসজিদটির দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। আল্লাহর কৃপাসিঞ্চিত পূতকীর্তি আমীর মাহমুদ ঐ
৮৯ অঞ্চল থেকে যখন কারামিতাদের প্রভুত্ব লোপ করে দেন, তখন পূর্বতন মসজিদে আবার জুমুআর নামাজ হতে থাকে, আর দ্বিতীয় মসজিদটি অযত্নে পড়ে থাকে, বর্তমানে এই (দ্বিতীয়) ইমারতের মাত্র মেঝেটি অবশিষ্ট আছে, যার উপরে মেহেদীর শুষ্ক ডালপালা জমা করে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়।

"কারামিতাদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে একশত বৎসর গত হয়েছে। তার উপরোক্ত বর্ষ সংখ্যা থেকে শতক, দশক ও একক সংখ্যাবলীও (অর্থাৎ ৪৩২) যদি বাদ দিই তাহলেও কৃত্যযুগ থেকে হিজরী অব্দের প্রাক্কাল পর্যন্ত ২১৬০০০ বছর হয়। কিন্তু কাষ্ঠ খন্ড, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে, সেখানকার জলবায়ু আর্দ্র, এতকাল পর্যন্ত কেমন করে যে অবিনষ্ট থাকতে পারে, আল্লাহ্ই জানেন।

হিন্দুরা থানেশ্বর নগরীকে পুণ্যস্থান মনে করে। এখানকার বিগ্রহের নাম 'চক্রস্বামী'; অর্থাৎ যে অস্ত্রটির কথা পূর্বে বলেছি, তার মালিক। এটি ব্রোঞ্জের নির্মিত মানুষের দৈর্ঘ্যের সমান। বর্তমানে এটি গজনীর মাঠে 'সোমনাথে'র সঙ্গে পড়ে রয়েছে। 'সোমনাথ' বিগ্রহটি মহাদেবের পুরুষ অঙ্গের প্রতিরূপ। একে 'লিঙ্গ' বলা হয়। সোমনাথের বর্ণনা আমরা যথাস্থানে করব। 'চক্রস্বামী' সম্বন্ধে বলা হয় যে বিগ্রহটি ভারত যুদ্ধের স্মরণে নির্মিত হয়েছিল।

কাশ্মীরের ভিতরে, রাজধানী থেকে Balor পার্বত্য অঞ্চলের দিকে দুই-তিন দিবসের পথে 'শারদ' নামে একটি কাষ্ঠ নির্মিত বিগ্রহের মন্দির আছে। এটিও তীর্থক্ষেত্র।

এখন আমরা সংহিতা গ্রন্থ থেকে বিগ্রহের নির্মাণ রীতি সম্বন্ধে একটি অধ্যায় উদ্ধৃত করব, যাতে পাঠক আলোচ্য বিষয়টি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। বরাহ বলছেন: দশরথ পুত্র রাম বা বিরোচন পুত্র বলির প্রতিমূর্তি গঠন করতে হলে, মূর্তিটিকে ১২০ বিগ্রহ-অঙ্গুলি দীর্ঘ কর। সাধারণ অঙ্গুলি থেকে দশমাংশ কমিয়ে নিলেই বিগ্রহ-অঙ্গুলির মান পাওয়া যাবে, এক্ষেত্রে ১০৮ সাধারণ অঙ্গুলি হবে। বিষ্ণু মূর্তির আট, চার বা দুই হাত থাকলে তার বাম বক্ষের নীচে শ্রী বা শ্রীরূপ থাকবে। যদি আট হাত বিশিষ্ট বিষ্ণু মূর্তি
১০ নির্মাণ কর, তাহলে তার দক্ষিণ দিকের হাতগুলোতে প্রথমে অসি, দ্বিতীয় হাতে স্বর্ণ বা লোহের গদা, তৃতীয় হাতে বাণ স্থাপন করবে এবং চতুর্থ হাতে গণ্ডুষ, বাম দিকের হাতগুলো যথাক্রমে ঢাল, ধনুক, চক্র ও শংখ ধারণ করবে। আর যদি তাকে চতুর্ভুজ করতে চাও, তাহলে চক্র, বাণ (অসি ও ঢাল)* বাদ দাও। আর যদি সে মূর্তিটিকে দ্বিভুজ করতে চাও, তাহলে দক্ষিণ হাতে গণ্ডুষ আর বাম হাতে শংখ ধারণ করে থাকবে। নারায়ণ ভ্রাতা বলদেব মূর্তির কানে কুণ্ডল দেবে, নেত্রদ্বয় মদালস করবে। যদি নারায়ণ ও বলদেব উভয়ের মূর্তি একত্রিতভাবে নির্মাণ কর, তাহলে তাদের ভগ্নি ভগবতীর মূর্তিও সংলগ্ন করে দিতে হবে। তার বাম হাত কটিতে ন্যস্ত থাকবে, আর দক্ষিণ হাতে থাকবে কমল। চতুর্ভুজা ভগবতী গঠন করতে হলে, দক্ষিণের হাত দুটির একটিতে মালা ও অন্যটিতে গণ্ডুষ আর বাম হাত দুটিতে থাকবে পুঁথি ও কমল। অষ্টভুজা হলে বামের হাতগুলোতে কমণ্ডলু (অর্থাৎ পাত্র), কমল, ধনু ও পুঁথি থাকবে, আর দক্ষিণের হাতগুলোতে

* মুদ্রিত আরবী পাঠে এই দুইটি শব্দ নাই ; Sachau-এর ইংরেজী অনুবাদে আছে।

থাকবে মালা, মুকুর, বাণ ও গন্ডূষ। আর বিষ্ণুপুত্র সম্বের মূর্তির দক্ষিণ হাতে কেবল মাত্র গদা থাকবে আর বিষ্ণুপুত্র প্রদ্যুম্ন হলে তার দক্ষিণ হাতে বাণ, আর বাম হাতে ধনুক থাকবে। তার দুই স্ত্রীর মূর্তিও সঙ্গে দিতে হলে, তাদের ডান হাতে অসি, আর বাম হাতে ঢাল থাকতে হবে।

ব্রহ্মার মূর্তি পদ্মাসীন ও চতুর্মুখ হতে হবে, আর হাতে থাকবে ভান্ড। মহাদেবের পুত্র স্কন্দের জন্য ময়ূরারূঢ় বালকের মূর্তি গড়তে হবে, তার হাতে থাকবে 'শক্তি' নামক দুধারী তরবারির ন্যায় অস্ত্র, খলের নুড়ির ন্যায় যার
৯১ হাতলটি মধ্যখানে থাকে। ইন্দ্রের মূর্তির হাতে হীরকের বজ্র থাকে, এর হাতলটি শক্তির হাতলের মত, কিন্তু প্রত্যেক দিকে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত দুইটি তরবারি চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। তার ললাটে একটি তৃতীয় নেত্র হতে হবে, এবং তাকে চারি শুণ্ড বিশিষ্ট শ্বেত হস্তিতে আরূঢ় দেখাতে হবে। মহাদেব মূর্তিতেও এই রকম ললাট দেশের উপরিভাগে একটি তৃতীয় নেত্র দেখাতে হবে; মস্তকোপরে অর্ধচন্দ্র থাকবে, হাতে যষ্ঠির ন্যায় তিন শাখা বিশিষ্ট শূল ও তরবারি থাকবে, আর বাম বাহু দিয়ে তার স্ত্রী 'হিমাবন্ত'-কন্যা গৌরীকে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বক্ষলগ্ন করে রাখবে।

'জীন' অর্থাৎ 'বুদ্ধ' মূর্তির মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাসাধ্য কমনীয় করবে, তার হাত ও পায়ের রেখাগুলো পদ্মের মত হবে এবং তাকে পদ্মাসনে বসাবে। কেশ পিঙ্গল বর্ণের হতে হবে এবং মুখমন্ডল স্মিত ও প্রশান্ত, যেন সে সৃষ্টির জনক। বুদ্ধের অর্হন্ত অর্থাৎ তার অন্য প্রকারের মূর্তি গঠন করতে হলে, তাকে উলঙ্গ অনিন্দ্যমুখ প্রিয়দর্শন আজানুলম্বিত বালকের রূপ দাও এবং তার বাম বক্ষের নিম্নভাগে তার স্ত্রী শ্রী'র আকৃতি অংকন কর।

সূর্য পুত্র 'রেবন্তের' মূর্তি মৃগয়ারত অশ্বারোহীর মত হবে।

মৃত্যু দেবতা যমের মূর্তি মহিষারূঢ়, হাতে গদা, আর ধনরক্ষী কুবেরের মূর্তি স্ফীতোদর, স্থূলকটি, মনুষ্যারোহী।

সূর্য মূর্তির মুখ রক্ত কমলের মত লাল, হীরকের মত উজ্জ্বল ও দীর্ঘাঙ্গ হবে; তার কানে কুন্ডল, গলায় আবক্ষলম্বিত মুক্তাহার ও মস্তকে বহু গবাক্ষ-যুক্ত মুকুট থাকবে, দুই হাতে দুটি পদ্ম ধারণ করবে এবং উত্তরাপথের আগুলফলম্বিত পরিচ্ছদে ভূষিত থাকবে।

'সপ্ত মাতৃকা' মূর্তি গড়তে হলে বিভিন্ন মাতৃকাকে একত্রিত করে তা নির্মাণ
৯২ কর, যেমন চতুর্মুখী ব্রাহ্মণী, ষড়মুখী কুমারী, চতুর্ভূজা বৈষ্ণবী, শূকরমুখী বরাহী, বহুনেত্রী গদা ধারিণী ঐন্দ্রানী, মানবভঙ্গিতে উপবিষ্টা ভগবতী এবং

বিকট দর্শনা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা। এদের সঙ্গে মহাদেব পুত্রদের মূর্তিও যোগ করে দাও, যেমন বিরস-বদন, রুক্ষ কেশ, কুরূপ ক্ষেত্রপাল ও বিনায়ক, গজানন চতুর্ভুজ, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এইসব বিগ্রহের পূজায় ওরা কুঠার দ্বারা মেষ ও মহিষ বলি দেয়, যাতে রক্ত পান করে তারা পুষ্ট হতে পারে। বিগ্রহ-অঙ্গুলির মাপে প্রত্যেক মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করা হয়, তবে বিশেষ বিশেষ অঙ্গের মাপে কিছু কিছু মতভেদ আছে। বিগ্রহ নির্মাতা (কুম্ভকার) যদি শাস্ত্রসম্মত মাপ ঠিক রাখে এবং তার কোনও তারতম্য না করে, তাহলে মূর্তির দেবতা তার কোন অনিষ্ট করবে না। 'যদি সে বিগ্রহের উচ্চতা একহাত আর বেদীর উচ্চতা একহাত করে, তাহলে তার ধন ও শ্রীবৃদ্ধি হবে। আরও উচ্চ করলে তার সুখ্যাতি হবে। তবে, তার মনে রাখা উচিত যে বিগ্রহের, বিশেষ করে সূর্য মূর্তির আকারে আতিশয্য করলে রাজার অমঙ্গল হয়, আর অতি ক্ষুদ্র করলে মূর্তি নির্মাতার অমঙ্গল হয়। বিগ্রহের উদর ছোট করলে সে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়। আর কৃশ উদর হলে ধনক্ষয় হয়। মূর্তি নির্মাতার অসাবধানতার দরুন বিগ্রহের অঙ্গে যদি ক্ষত-চিহ্নের মত কোনও দাগ হয়, তাহলে তার নিজের দেহেও সেইরূপ ক্ষত হবে, আর তাতে তার মৃত্যু হবে। যদি বিগ্রহের দুটি স্কন্ধ সমান না থাকে তাহলে তার স্ত্রীর মৃত্যু হবে। বিগ্রহকে ঊর্ধ্বনেত্র করে দিলে মূর্তি নির্মাতা আজীবন অন্ধ হয়ে থাকবে। নতনেত্র করলে তার দুশ্চিন্তা ও শোকের পরিমাণ বাড়বে।"

রত্নের বিগ্রহ কাষ্ঠ বিগ্রহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর কাষ্ঠ মৃত্তিকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
১৩ কারণ, "রত্নের বিগ্রহ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজ্যের সকলেরই মঙ্গলের কারণ হয়। আর স্বর্ণ বিগ্রহ কেবল তার প্রতিষ্ঠাতারই শক্তি বৃদ্ধি করে, রৌপ্যমূর্তি তার খ্যাতি বাড়ায়, ব্রোঞ্জের বিগ্রহ তার রাজ্য বৃদ্ধি করে, আর প্রস্তর মূর্তি তার ভূমি সম্পদ বাড়ায়।"

প্রতিষ্ঠার জন্যই বিগ্রহের সম্মান, উপাদানের জন্য নয়। যেমন আমরা উপরে বলেছি, মুলতানের সূর্য মূর্তিটি কাষ্ঠ নির্মিত ছিল। তেমনই, রাক্ষস জয় করে রাম যে 'লিঙ্গ' প্রতিষ্ঠা করেন তা বালুকার ছিল, যা তিনি স্বহস্তে গড়েছিলেন। কিন্তু বালুকার বিগ্রহটি তৎক্ষণাৎ কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়ে যায়, কারণ তিনি যে প্রস্তর-লিঙ্গ গড়বার আদেশ দিয়েছিলেন তার নির্মাণ শেষ হবার পূর্বেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার লগ্ন উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল। মন্দির ও চত্বর নির্মাণ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার শুভক্ষণ নির্ধারণ এবং সে উপলক্ষে শাস্ত্রসম্মত অর্চনা ইত্যাদির বিষয়ে রাম বিস্তারিত ও দীর্ঘ নির্দেশ দিয়েছেন। পূজার জন্য পুরোহিত ও পরিচারকও তিনি বিভিন্ন শ্রেণী থেকে নিয়োগ করতে

আদেশ দিয়ে গিয়েছেন। "বিষ্ণুর সেবায় 'ভাগবত'রা থাকবে; সূর্য বিগ্রহের সেবায় থাকবে 'মগ'রা (Magian) মহাদেবের সেবা করবে একরকম সংসারত্যাগী জটাজুটধারী সন্ন্যাসী যারা ভস্ম মাখে, কন্ঠে অস্থি মেখলা পরে এবং নির্জনে আরাধনা করে। অষ্টমাতৃকার সেবা ব্রাহ্মণ করে; বুদ্ধের সেবার জন্য শ্রমণ, আর নগ্ন 'অরহনতে'র সেবা উলঙ্গ নামক সম্প্রদায়। মোট কথা, প্রত্যেক বিগ্রহের সেবার জন্য এক একটি সম্প্রদায় আছে, যারা সেটি প্রতিষ্ঠা করেছে, কারণ তার পূজার পদ্ধতি তারাই ভাল জানে।"

আমার এ সব বাতুলতার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য, যাতে কোন্‌টি কিসের বিগ্রহ পাঠক তা চিনতে পারে। আর এক উদ্দেশ্য আছে। আমরা পূর্বে বলেছি যে অশিক্ষিত, স্বল্পবুদ্ধি ইতর লোকদের জন্যই এইসব বিগ্রহ রচনা করা হয়। কেননা পরমেশ্বরের ত কথা-ই নাই কোনও অপ্রাকৃত সত্তার প্রতিমূর্তিও কথন নির্মিত হয় নি। এই মূর্খ লোকদিগকে প্রতারণার দ্বারা কেমন করে
৯৪ বশ করে রাখা হয় উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। এইজন্য 'গীতা'তে উক্ত হয়েছে: "মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য বহু লোক এমন সব বস্তু দিয়ে আমার সান্নিধ্য প্রার্থনা করে যা আমার নয়। অর্ঘোপচার, স্তবারাধনা দ্বারা তারা আমার অনুগ্রহ পেতে চায় তা করার সামর্থ্য আমি তাদিকে দিই এবং সে সবের দ্বারা তারা তাদের মনোবাসনা সিদ্ধ হবার সুযোগ-ও দিই; কেননা সে সবের (অর্ঘ্যোপচার, স্তবারাধনা) প্রয়োজন আমার নাই।"

বাসুদেব অর্জুনকে আবার বললেন: "তুমি কি দেখ নাই যে লোভীরা বিভিন্ন অশরীরী জীব ও সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদিকেও অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য দিয়ে কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে? ঈশ্বর যদি তাদের নিরাশ না করেন, তাদের পূজার প্রয়োজনাধীন না হয়েও তিনি যদি তাদের প্রার্থিত বস্তু আশাতিরিক্ত পরিমাণে এমনভাবে দান করেন যেন সেসব ঐ দেবতাদেরই দেওয়া, তাহলে তারা ঐ সিদ্ধিদাতা দেবতারই পূজা করতে থাকবে, কারণ ঈশ্বর-তত্ত্বলাভে অসমর্থ বলে তারা জানে না যে উপলক্ষের মাধ্যমেই তিনি তাদের সিদ্ধি দিয়ে থাকেন। কিন্তু লোভ ও উপলক্ষ দ্বারা যা পাওয়া যায়; তা স্থায়ী হয় না; কেননা কোনও একটি বিশেষ কর্মগুণেই তা পাওয়া যায়। আর যা ভগবানের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ-ভাবে পাওয়া যায়, জরামৃত্যুক্লিষ্ট জন্মের চক্রাবর্তনে কেবল তারই স্থিতি আছে।"

এই সব বাক্য বাসুদেবের উক্তিতে আছে। দৈবাৎ ঘটনাচক্রে, কিংবা সংকল্প ক্রমে এই সব মূর্খরা যদি কখনও সৌভাগ্য লাভ করে, আর এই

সৌভাগ্যলাভের সঙ্গে পূজারীদের চক্রান্তে ভেল্কির কিছুটা যোগ থাকে, তাহলে এই মূর্খদের বোধোদয় না হয়ে ভ্রান্তি আরও বেড়েই যায়। তারা তখন সে সব বিগ্রহের কাছে ছুটে গিয়ে তার সম্মুখে স্বেচ্ছায় নিজ দেহকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করতে থাকে।

পুরাকালে ইউনানীরা-ও বিগ্রহগুলোকে মানুষ ও আদিকারণের মধ্যস্থ শক্তি বলে বিশ্বাস করত এবং নক্ষত্র ও মহত্তম গুণাবলীর নামে তাদের পূজা করত, কারণ আদি কারণের সম্মানার্থে তারা অস্তিবাচক বিশেষ্য তাতে আরোপ না করে শুধু নেতিবাচক গুণ দিয়ে তার বর্ণনা করত, কেননা তাঁকে মানবীয় গুণের বহু উর্ধ্বে এবং সর্বদোষমুক্ত বলে তারা কল্পনা করত। কাজেই উপাসনায় এই নির্গুণকে কী নামে তারা সম্বোধন করতে পারত?

প্রাচীন আরবেরা যখন সিরিয়া (শাম) থেকে বিগ্রহ সমূহ দেশে নিয়ে এলো, ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে এই বিশ্বাসে তারা সেগুলোর উপাসনা করতে আরম্ভ করল।

৯৫ তাঁর 'বিধান' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে Plato বলেছেন: "ঈশ্বরকে যে পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তার উচিত দেবতা ও শিল্প-কাব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের (مكينات Muses ?) রহস্য বোঝার চেষ্টা করা এবং কোন নতুন দেবমূর্তিকে পূর্বপুরুষদের দেবতাদের উপর প্রাধান্য না দেওয়া। পিতামাতার জীবৎকালে তাদিকে যথাসাধ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করা তার সর্বপ্রধান কর্তব্য।"

এখানে Plato বিশেষ ধরনের ধ্যানের অর্থে 'রহস্য' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই অর্থে শব্দটি Herran-এর U. C. sabian দ্বৈতবাদী U. C manichacan ও আস্তিক্যবাদী হিন্দুদের মধ্যে প্রায়ই ব্যবহার হয়।

'জীব প্রকৃতি' (De Indole Animae) গ্রন্থে Galenus বলেছেন: Alexander-এর ৫১০ বছর পূর্বে, সম্রাট Commodus-এর সময়ে দুইটি লোক এক মূর্তিবিক্রেতার নিকট গিয়ে Hermes-এর একটি বিগ্রহের দাম দস্তুর করতে আরম্ভ করল। একজন মূর্তিটিকে Hermes-এর স্মরণে নির্মিত এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর অন্যজন একজনের সমাধিতে মৃতের স্মারক হিসাবে সেটি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মূর্তি বিক্রেতার সাথে মূল্য সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা না হওয়াতে পরদিনের জন্য বিক্রয় স্থগিত থাকল। সেই রাত্রে মূর্তিবিক্রেতা স্বপ্ন দেখল যেন বিগ্রহ তাকে বলছে: মহাশয়, আমি তোমার সৃষ্টি, তোমার হাতে আমি যে রূপ পেয়েছি, তা নক্ষত্রের রূপ বলে মনে করা হয়। মানুষ এতদিন আমাকে যে প্রস্তর মনে করে এসেছে, এখন

আমি আর তা নই; আমি এখন Murcury (বুধগ্রহ) নামে পরিচিত। এখন আমাকে অবিনশ্বর সত্তার স্মারক, না সদ্য জীর্ণতাপ্রাপ্ত বস্তুর স্মারক রূপে ব্যবহার করবে, তা তোমার ইচ্ছা।"

Aristotle-এর একটি রচনা পাওয়া যায় যাতে তিনি Alexander-প্রেরিত কয়েকজন ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তাতে আছে: "তোমরা বলে থাক যে ইউনানীদের কেউ কেউ মনে করে দেবমূর্তিগুলো কথা কয় এবং তাদিগকে আধ্যাত্মিক জীব বিশ্বাস করে ইউনানীরা তাদের পূজা করে। এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, এবং যা জানি না সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয়।" এই উক্তিতে Aristotle মূর্খ ও ইতর জন শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন এবং তিনি নিজে যে এ সব ব্যাপার নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন, না তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৯৬ তাহলে জানা গেল যে মূর্তি পূজার মত কুসংস্কারের আদি কারণ হল মৃতের স্মৃতিরক্ষা আর জীবিতকে সান্ত্বনা দেওয়া। তারপর এই কুসংস্কারটি বেড়ে বেড়ে এক সর্বনাশা রোগে পরিণত হয়েছে।

Sicily-এর বিগ্রহগুলো সম্বন্ধে মু'আবিয়ারও এই রকম মত ছিল। ৫৩ হিজরীর গ্রীষ্মকালে যখন সিসিলি বিজিত হয় তখন হীরা ও মুকুট শোভিত লুণ্ঠিত স্বর্ণ বিগ্রহগুলো সৈন্যেরা তাঁর কাছে পাঠালে, তিনি সেগুলোকে সিন্ধু-দেশের রাজাদের কাছে বিক্রয় করার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেগুলোকে তিনি দীনারের মূল্যে বিক্রয় করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। সেগুলো যে মূর্তি পূজার মত সর্বনাশা রোগের বীজাণু, সে চিন্তা করলেন না। তিনি ব্যাপারটিকে ধর্মের দিক দিয়ে বিচার না করে রাজনীতির দিক দিয়ে বিচার করেছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বেদ পুরাণাদির ধর্ম গ্রন্থসমূহ

১৭ বেদের অর্থ হচ্ছে অজ্ঞাতের জ্ঞান। বেদ ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ঐশ্বরিক বাণী। ব্রাহ্মণেরা অর্থ না বুঝেই বেদ পাঠ করে থাকে, আর এইভাবে একজন অপরের নিকটে বেদ শিক্ষা করে। অতি অল্প লোকেই এর অর্থ বোঝে। বেদের মর্ম-গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়ে শাস্ত্র বিচারে পারদর্শী হয়েছে, এমন লোকের সংখ্যা আরও অল্প। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বেদ শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কাউকে বেদশিক্ষা দেবার অধিকার নাই, এমন কি ব্রাহ্মণকেও নয়। বৈশ্য ও শূদ্রের বেদ মন্ত্র উচ্চারণ বা পাঠ করা ত' দূরের কথা, শ্রবণাধিকারও নাই। এদের কারুর বিরুদ্ধে যদি এমন কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে ব্রাহ্মণ তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে তার জিহ্বা ছেদন করে তাকে শাস্তি দেওয়াবে।

বেদে নানারূপ বিধিনিষেধ ও হিতকর্মে উৎসাহদান ও অহিত কর্ম থেকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে। তবে বেদের অধিকাংশই স্তোত্র ও অসংখ্য প্রকারের কঠিন যজ্ঞের বর্ণনাতে পূর্ণ। বেদ লিপিবদ্ধ করা নিষেধ, কারণ বেদমন্ত্র কতকগুলো বিশেষ সুরে গাওয়া নিয়ম। তাতে লেখনী স্পর্শ করা বারণ, যাতে তার পাঠে কোনও রূপ বিকৃতি বা তারতম্য না ঘটতে পারে।

এই নিয়মের ফলে হিন্দুরা অনেকবার বেদ হারিয়ে ফেলেছিল। ওদের বিশ্বাস যে সৃষ্টির সূচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বর ও ব্রহ্মার মধ্যে কথোপকথনের যে বিবরণ শুক্রগ্রহের মুখ থেকে সৌনক শুনেছিলেন তাতে এই কথাগুলো আছে, "মহা-প্লাবনে পৃথিবী নিমজ্জিত হবার সময়ে তুমি বেদ বিস্মৃত হবে, বেদ তখন পাতালে প্রবিষ্ট হবে এবং মৎস্য ব্যতীত অন্য কেহ তাকে উদ্ধার করে আনতে পারবে না। আমি তখন মৎস্য পাঠাব, সে বেদ তোমার হাতে এনে দেবে। আমি বরাহ পাঠাব, সে তার দন্তে ধারণ করে পৃথিবীকে জল থেকে উত্তোলন করবে।" ওরা আরও বলে থাকে যে বিগত দ্বাপর যুগে বেদোক্ত সকল শাস্ত্রীয় ও রাজসূয় ক্রিয়াকর্ম লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বাপর যুগের ব্যাখ্যা আমরা যথাস্থানে করব।

অবশেষে পরাশর পুত্র ব্যাস বেদকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হয়েছে, "প্রত্যেক মন্বন্তরের প্রারম্ভে যজ্ঞাংশভুক্ত দেবগণ, মানব ও দেবগণের অধীশ্বর, সসাগরা পৃথিবীর অধিকারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যুগপতি মানব ও প্রত্যেক যুগান্তে লুপ্ত বেদের পুনরুদ্ধারকারী সপ্তর্ষী মন্ডলের সৃষ্টি হয়।"

এই কারণেই, আমাদের অনতিকাল পূর্বে বাসুক্র নামে কাশ্মীরের এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পন্ডিত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বেদের ব্যাখ্যা ও অনুলিখনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অন্য কেহ এর গুরুদায়িত্ব নিতে সাহস করত না। কিন্তু তিনি এ কঠিন কর্ম সুসম্পন্ন করলেন, কারণ তাঁর আশংকা ছিল যে কালক্রমে মানুষ বেদ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যাবে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে মানুষের সদুদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সততা রক্ষায় ও কর্তব্যপালনে তাদের তেমন উৎসাহ বা স্পৃহা নাই।

হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদে এমন কতকগুলো মন্ত্র আছে, যা বাসগৃহে পাঠ করা অনুচিত, কারণ সে-সব মন্ত্র শ্রবণ মাত্র মানুষ ও পশুর গর্ভপাত হয়। সেইজন্য সে মন্ত্রগুলো পাঠ করার সময় ওরা উন্মুক্ত স্থানে চলে যায়। এরূপ ভীতিপ্রদ ভাব থেকে মুক্ত পদ বেদে অল্প-ই আছে।

১৮ আমরা পূর্বেই বলেছি, ভারতীয়দের পুস্তকাদি, আরবী rajaz-এর মত, ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচিত। তার বেশীর ভাগই 'শ্লোক' নামক একপ্রকার ছন্দে রচিত। ছন্দোবদ্ধ ভাষার প্রতি ভারতীয়দের অনুরাগের কারণ আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। Galenus ছন্দোবদ্ধ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। Kataganes নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেন : "ঔষধের পরিমাণ জ্ঞাপক একক সংখ্যাগুলো অনুলিখনে বিকৃত হতে পারে। সে হিসাবে, Democrates-এর ঔষধি গ্রন্থটির অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে সুখ্যাত ও জনপ্রিয় হবার সঙ্গত কারণ রয়েছে, কেননা, সম্পূর্ণ পুস্তকটি ইউনানী রীতির ছন্দে রচিত।" বাস্তবিক ই গদ্য রচনাতে পদ্যের চেয়ে বেশী বিকৃতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

সম্পূর্ণ বেদ কিন্তু উপরোক্ত শ্লোকে রচিত নয়, অন্য ছন্দও আছে। ভারতীয়দের অনেকে বলে থাকে যে কেউ-ই বেদে ব্যবহৃত ছন্দে পদ্য রচনা করতে পারে না। কিন্তু ওদের পন্ডিতদের মত ভিন্ন ; তারা মনে করে, সে ছন্দে পদ্য রচনা ওদের পক্ষে অসম্ভব নয়, তবে এ মহাগ্রন্থের সম্মান রক্ষার জন্য ওরা তার চেষ্টা করে না।

বেদকে ব্যাস চার খন্ডে ভাগ করেছেন : ঋগেবদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। ব্যাসের চারজন শিষ্য ছিল, তাদের প্রত্যোককে তিনি একটি করে

বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে তারা স্মৃতিতে ধারণ করতে অপারগ না হয়। চার বেদের উপরোক্ত ক্রমানুযায়ী সে চার শিষ্যের নাম পৈর, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত। চতুর্বেদের প্রত্যেকটির পাঠের বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। প্রথম বেদ হোল ঋগ্বেদ। ঋক ছন্দে রচিত পদের সমষ্টি বলে এর নাম ঋগ্বেদ। এতে যজ্ঞাদির কথা আছে। তিন প্রকারে ঋগ্বেদ পাঠ করা যায়। প্রথম অনাসব পুস্তক পাঠের মত, সমান সুরে। দ্বিতীয়, প্রত্যেক শব্দের পর বিরতি দিয়ে, আর তৃতীয় পদ্ধতি হোল প্রত্যেক শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে একটি পংক্তি বা পদাংশ পাঠ করে, সে অংশটিকে পরবর্তী অপঠিত পংক্তির একাংশের সাথে আবার পাঠ করা, তারপর কেবল এই নূতন পংক্তির অংশটিকে আবার স্পষ্ট-ভাবে আবৃত্তি করে তার পরবর্তী অপঠিত পংক্তির কিছু ভাগ তার সাথে যোগ করে আবার পাঠ করা। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে যেতে হবে যার ফলে
১১ প্রত্যেকটি শব্দ ও পংক্তি দু'বার পঠিত হবে। এই পাঠবিধিটিই শ্রেষ্ঠ' কেননা এতে পুণ্য সঞ্চয় হয় বেশী।

যজুর্বেদের মন্ত্রগুলো 'কানড়ী' ছন্দে রচিত। 'যজুর' শব্দের অর্থ 'কানড়ী' সমষ্টি। ঋগ্বেদ আর যজুর্বেদে পার্থক্য এই যে শেষোক্ত বেদের মন্ত্রগুলো সন্ধির নিয়মানুযায়ী পাঠ করা যায়, ঋগ্বেদের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ। এই দুইটি বেদে-ই যজ্ঞ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের বিবরণ আছে।

সন্ধির নিয়মানুযায়ী ঋগ্বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হবার কারণ সম্বন্ধে আমি এই গল্পটি শুনেছি। মুনি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর নিকট থাকা কালে তার গুরুর এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর বিদেশ যাবার প্রয়োজন হলো। বন্ধুটি গুরুকে অনুরোধ করে পাঠালেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর গৃহের হোমাগ্নি যাতে নিভে না যায়, তার দিকে যেন তিনি দৃষ্টি রাখেন, এবং অগ্নিতে আহুতি দেবার জন্য প্রত্যহ যেন কোনও শিষ্যকে তাঁর গৃহে পাঠান। গুরু তাঁর শিষ্যের মধ্য থেকে পালা-ক্রমে একজন করে তাঁর বন্ধুর গৃহে পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে সুদর্শন ও সুবেশী যাজ্ঞবল্ক্যের পালা এল। ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সম্মুখে তার গৃহে আহুতির নির্দিষ্ট ক্রিয়া আরম্ভ করতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য অনুভব করলেন যে তাঁর সুন্দর বেশভূষার জন্য ব্রাহ্মণীর মনে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা হয়েছে। আহুতি ও মন্ত্রপাঠ শেষ করে তিনি ব্রাহ্মণীর মস্তকে জল ছিটাতে গেলে (কারণ, মন্ত্রপাঠের পর ফুৎকার দেওয়া ওদের কাছে গর্হিত) ব্রাহ্মণী বললে, 'ঐ কাষ্ঠস্তম্ভে জল ছিটাও' জল ছিটানো মাত্রই স্তম্ভটি সবুজ পত্রে সুশোভিত হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে ব্রাহ্মণী অনুতপ্ত হোলো, এবং পরদিনও যাজ্ঞবল্ক্যকে পাঠাতে গুরুকে

অনুরোধ করতে এল। যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন ব্যতীত অন্য দিনে সেখানে যেতে সম্মত হোলেন না। গুরুর অনুরোধ ও তিরস্কারে কোনও ফল হোল না। তিরস্কৃত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য অবশেষে গুরুকে বললেন : 'আমাকে যা শিখিয়েছো তা সব প্রত্যাহার করে নাও। এই কথা বলা মাত্র, তিনি যা শিখে-ছিলেন তার সমস্ত ভুলে গেলেন। তিনি তখন সূর্যকে গিয়ে বললেন : 'আমাকে বেদ শিক্ষা দাও।' সূর্য বললেন : 'তা কেমন করে হবে ? আমি নিয়তই চলমান
১০০ আর তুমি আমার সাথে সাথে চলতে অক্ষম।' যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু সূর্যের রথের সাথে সংলগ্ন হয়ে থাকলেন এবং বেদ শিক্ষা করতে লাগলেন। চলমান রথের আন্দোলনের জন্য তাঁকে মধ্যে মধ্যে বেদোচ্চারণ রাখতে হোত।

সামবেদে যজ্ঞাদি ও বিধিনিষেধের বর্ণনা আছে। এর মন্ত্রগুলো গীতের মত সুর করে পাঠ করা হয় বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে। 'সাম' অর্থ শ্রুতিমধুর আবৃত্তি। এরূপ আবৃত্তি করার কারণ এই যে, একদা নারায়ণ বামনের রূপ ধরে বলি রাজার কাছে এসে নিজেকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করেন এবং সুমধুর সুরে সামবেদের মন্ত্র পাঠ করতে আরম্ভ করেন। সে সুরে বলি রাজা তন্ময় হয়ে যায় এবং সে তন্ময়াবস্থায় তার পুরাণে বর্ণিত দশা ঘটে।

অথর্ব বেদ কিন্তু সন্ধির নিয়মে রচিত। এর ছন্দ ঋক্ ও যজুর্বেদের মত নয়। (অর্থাৎ শ্লোক ও কানড়ী ছন্দ নয়।) অথর্ব বেদ 'ভর' নামক আর এক প্রকার ছন্দে রচিত, আনুনাসিক স্বরে পাঠ করতে হয়। অন্য সব বেদের তুলনায় অথর্ব বেদে লোকের অনুরাগ অল্প। এতেও যাগযজ্ঞের বর্ণনা ও ও তার সঙ্গে মৃতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ আছে।

তারপর 'পুরাণ'। পুরাণের অর্থ—প্রাথমিক, আদিম। পুরাণের সংখ্যা আঠার; তার অধিকাংশই মানুষ ও দেবতার নামাঙ্কিত। কারণ, হয় তাতে ঐ সব জীবের বৃত্তান্ত, নয়তো তাদের কোনও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ কিংবা তাদের মুখে উচ্চারিত প্রশ্নোত্তর আছে। পুরাণগুলো ঋষিদের রচনা।

যে সব পুরাণের নাম আমি হিন্দুদের মুখে শুনে লিখে নিয়েছিলাম তা এই :

১। আদি পুরাণ
২। মৎস্য পুরাণ
৩। কূর্ম পুরাণ
৪। বরাহ পুরাণ

৫। নরসিংহ পুরাণ (সিংহমুখ মানুষ)

৬। বামন পুরাণ (ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ)

৭। বায়ু পুরাণ

৮। নন্দ পুরাণ (নন্দ মহাদেবের অনুচর)

৯। স্কন্দ পুরাণ (স্কন্দ, মহাদেবের পুত্র)

১০। আদিত্য পুরাণ (অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র)

১১। সোম পুরাণ

১২। সাম্ব পুরাণ (সম্ব বিষ্ণুর পুত্র)

১৩। ব্রহ্মান্ড পুরাণ (ব্রহ্মান্ড আকাশ মন্ডল)

১৪। মার্কন্ডেয় পুরাণ (মার্কন্ডেয় ঋষির নাম)

১০১ ১৫। তরিক্ষ পুরাণ (এটি গরুড় পাখি)

১৬। বিষ্ণু পুরাণ (বিষ্ণু, নারায়ণ)

১৭। ব্রহ্ম পুরাণ (পৃথিবী পালনে নিযুক্ত প্রকৃতি)

১৮। ভবিষ্য পুরাণ (অনাগত সৃষ্টি)

এই পুরাণগুলোর মধ্যে আমি কেবল মৎস্য, আদিত্য ও বায়ুপুরাণের কিয়দংশ মাত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

পুরাণসমূহের আর একটি ঈষদ্ ভিন্ন তালিকা আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। সে তালিকাটিও আমি নকল করে দিচ্ছি, কেননা প্রদত্ত তথ্যের বিভিন্ন পাঠ (version) যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা-ই কর্তব্য।

ব্রহ্ম পুরাণ

পদ্ম পুরাণ—(পদ্ম—রক্তকমল)

বিষ্ণু পুরাণ

শিবপুরাণ—(শিব অর্থাৎ মহাদেব)

ভাগবৎ পুরাণ—(অর্থাৎ বাসুদেব)

মার্কন্ডেয় পুরাণ

অগ্নি পুরাণ

ভবিষ্য পুরাণ—(অর্থাৎ অনাগত)

ব্রহ্ম বৈবর্ত—(অর্থাৎ বায়ু)

লিঙ্গ পুরাণ—(মহাদেবের জননেন্দ্রিয়)

বরাহ পুরাণ

স্কন্দ পুরাণ

বামন পুরাণ

কূর্ম পুরাণ

মৎস্য পুরাণ

গরুড় পুরাণ—(গরুড়, বিষ্ণুর বাহন, পক্ষী বিশেষ)

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

এই তালিকাটি বিষ্ণুপুরাণে দেওয়া আছে।

'স্মৃতি' গ্রন্থ হচ্ছে বেদ থেকে উৎপন্ন। এটি বিধিনিষেধ সংক্রান্ত পুস্তক। ব্রহ্মার নিম্নলিখিত কুড়িটি পুত্র এ গ্রন্থ রচনা করে।

আপস্তম্ব	সম্বর্ত
পরাশর	দক্ষ
শাতাতপ	বশিষ্ঠ
সম্বর্ত	লিকিত
দক্ষ	সংখ
বশিষ্ট	গৌতম
অঙ্গিরা	বৃহস্পতি
যম	কাত্যায়ন
বিষ্ণু	ব্যাস
মনু	উশনস

এ ছাড়া শাস্ত্র, বিধান, ঈশ্বরতত্ত্ব, সন্ন্যাস, দেবত্বলাভ ও সংসার থেকে নিষ্কৃতি বিষয়ে ভারতীয়দের আরো অনেক গ্রন্থাদি আছে। যেমন, সন্ন্যাসী গৌরের রচিত তারই নামাঙ্কিত গ্রন্থ, কপিল প্রণীত 'সাংখ্য' নামক ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, মোক্ষলাভ ও ঈশ্বরের সাথে আত্মার যোগ বিষয়ক 'পাতনুস'' গ্রন্থ, ইত্যাদি। 'ন্যায় ভাষা' নামে কপিলের আর একটি পুস্তক আছে যাতে বেদের ব্যাখ্যাসহ বেদোক্ত অবশ্য কর্তব্য ও পরম্পরাগত রীতি পালনের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ একই বিষয়ে আর একটি পুস্তক জৈমিনি 'কৃত মীমাংসা'। বৃহস্পতি প্রণীত 'লোকায়ত' পুস্তকে গবেষণার ক্ষেত্রে কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করার সমর্থনে যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই রকম আর একটি পুস্তক আছে অগস্ত্যের রচনা, নাম 'অগস্ত্যমত'। তাতে গবেষণার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাথে শ্রুতির উপরও নির্ভর করার যুক্তিবত্তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর একটি পুস্তকের নাম 'বিষ্ণুধর্ম'। ধর্ম শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে পারিশ্রমিক বা প্রতিদান, কিন্তু

সাধারণতঃ শব্দটি উপাসনা-পদ্ধতি ও পরকাল-বিষয়ক নীতি ও তত্ত্বের অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। 'বিষ্ণুধর্মের' অর্থ তাহলে দাঁড়ায় ঈশ্বর-ধর্ম। এখানে ঈশ্বর হচ্ছেন নারায়ণ। এ ছাড়া, দেবল, শুক্র, ভার্গব, বৃহস্পতি, যাজ্ঞবল্ক ও মনু—ব্যাসের এই ছয় জন শিষ্যের ছয়টি পুস্তক আছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হিন্দুদের আরও বহু গ্রন্থ আছে। সমস্ত গ্রন্থের নাম জানা, বিশেষ করে আমার মত বিদেশীর পক্ষে, কি করে সম্ভব ?

ভারতীয়দের আর একটি মহাগ্রন্থ আছে, যার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা বশতঃ ওরা দৃঢ়ভাবে দাবী করে যে, অন্য সমস্ত পুস্তকে যা আছে তার সবই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু এ গ্রন্থে যাহা আছে তার সবটুকুই অন্য কোনও পুস্তকে নাই। গ্রন্থটির নাম 'ভারত'; পরাশরপুত্র ব্যাসদেব কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে এটি রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নামেও এই মহাযুদ্ধের ইঙ্গিত আছে। এর আঠার খন্ডে এক লক্ষ শ্লোক আছে। প্রত্যেক খণ্ডকে 'পর্ব' বলা হয়।

১। সভাপর্ব : অর্থাৎ রাজার আবাস।

১০৩ ২। অরণ্য : অর্থাৎ পাণ্ডবদের জনবিরল প্রান্তরে নির্বাসন।

৩। বিরাট : অজ্ঞাতবাসকালে যে রাজার রাজ্যে পাণ্ডবরা বাস করেছিল।

৪। উদ্যোগ : যুদ্ধায়োজন।

৫। ভীষ্ম :

৬। দ্রোণ : ব্রাহ্মণ
৭। কর্ণ : সূর্য পুত্র
৮। শল্য : দুর্যোধনের ভ্রাতা

} এ'রা সব বীর শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধ করে পরপর নিহত হয়েছিলেন।

৯। গদা

১০। সৌপ্তিক : ঘুমন্ত লোকদের হত্যা। দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থমা নিশীথে পাঞ্চাল নগরী আক্রমণ করে ঘুমন্ত নাগরিকগণকে হত্যা করেছিল।

১১। জলপ্রদানিক : আহার বিহার ও সব সংকার জনিত অশৌচ পালনের পর স্নান করে মৃতের উদ্দেশে জল অর্পণ করা।

১২। স্ত্রী : নারীদের বিলাপ।

১৩। শান্তি : হৃদয় থেকে ক্রোধ দূর করার বিষয়ে। এতে চার খন্ডে চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে।

ক) রাজধর্ম: রাজার সদাচরণ।

খ) দানধর্ম: দান করার পুণ্য।

গ) আপদ্ধর্ম: বিপন্নকে সাহায্য করা।

ঘ) মোক্ষধর্ম: ভব সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার পুরস্কার।

১৪। অশ্বমেধ: সৈন্যসহ একটি অশ্বকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে যাঁর অশ্ব, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর। যে তাঁর আধিপত্য অস্বীকার করবে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করা হয়। সঙ্গে ব্রাহ্মণরা থাকে; অশ্বটি যেখানে যেখানে মলত্যাগ করে তারা সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান করে।

১৫। মৌষল: বাসুদেবের স্বগোত্র যাদবদের অন্তর্দ্ধ।

১৬। আশ্রম বাস: অর্থাৎ নিজ গৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র বাস।

১৭। প্রস্থান: মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ।

১৮। স্বর্গারোহণ।

১০৪। এই আঠার খণ্ডের পরেও আর একখণ্ড আছে যার নাম 'হরিবংশ পুরাণ'। এতে বাসুদেবের জীবনবৃত্তান্ত আছে। এই ভারত গ্রন্থে এমন কতকগুলো বাক্য আছে হেঁয়ালির মত যার একাধিক অর্থ হয়। তার সম্বন্ধে ওরা বলে যে তার মুখ নিসৃত ভারত কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যাস ব্রহ্মাকে একজন লিপিকার সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর পুত্র গজানন বিনায়ককে এ কাজে নিযুক্ত করে আদেশ দিলেন যেন সে মুহূর্তের জন্যও লেখা বন্ধ না করে। ব্যাস তখন তাকে আদেশ দিলেন অর্থ না বুঝে যেন সে কোনও বাক্য না লেখে। ব্যাস তারপর এমন সব শ্লোক রচনা করতে লাগলেন যার অর্থ বোঝার জন্য বিনায়ককে লেখা বন্ধ রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হত। এই বিরতিতে ব্যাসও বিশ্রামের সুযোগ করে নিতেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হিন্দুদের ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র

ব্যাকরণ ও ছন্দবিজ্ঞান অন্যান্য বিদ্যাচর্চার সেতু স্বরূপ। এ দু'টির মধ্যে 'ব্যাকরণ' নামক শাস্ত্রটির প্রতি ভারতীয়রা বেশী গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ব্যাকরণ বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ ও শব্দের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞান, যার সাহায্যে বাচনে ও রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করা যায়। আমরা অবশ্য এ বিজ্ঞান শিখে তেমন লাভবান হতে পারব না, কারণ এ শাস্ত্র এমন এক মূল থেকে উৎপন্ন হয়েছে যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা।

এই শাস্ত্রের যে সব পুস্তকের নাম আমি শুনেছি তা এই :

১। স্বর্গরাজ ইন্দ্রের রচনা বলে কথিত 'ঐন্দ্রগ্রন্থ'।

২। চান্দ্র নামক রক্তাম্বরধারী এক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচনা 'চান্দ্র'।

৩। সাকতায়ন সম্প্রদায়ের 'সাক্ত' নামক এক ব্যক্তির রচিত 'সাকাত্'।

৪। পাণিনির গ্রন্থ।

৫। সর্ব বর্মণ প্রণীত 'কাতান্তর'

৬। শশীদেব কৃত 'শশীদেব বৃত্তি'

১০৫ ৭। 'দুর্গাবৃত্তি' (যবনদেবকৃত 'দুর্ঘত বৃত্তি' ?)

৮। উগ্রভূত রচিত 'শিষ্যাহিত বৃত্তি'

আমি শুনেছি যে এই শেষোক্ত লেখক আমাদেরই যুগের জয়পালপুত্র আনন্দ পালের শিক্ষক ছিলেন। রচনা শেষ করে উগ্রভূত পুস্তকটি কাশ্মীরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত অহংকারী ও পরিবর্তনবিমুখ বলে এই নতুন ব্যাকরণ পুস্তকটির তেমন আদর করলে না। লেখক তখন রাজার কাছে অনুযোগ করলেন। গুরুর প্রতি কর্তব্য পালনের ইচ্ছায় রাজা তাঁর অভিলাষ পূরণ করার আশ্বাস দিলেন এবং দুই লক্ষ দিরহাম ও উপযুক্ত উপঢৌকনাদি কাশ্মীরে পাঠিয়ে তিনি আদেশ দিলেন যে, 'শিষ্যাহিতবৃত্তি' যারা অধ্যয়ন করবে তাদের মধ্যেই এই ধন বিতরণ করা হবে। তখন অর্থের লোভে সবাই পুস্তকটির প্রতি আকৃষ্ট হলো, এমনকি ব্যাকরণের অন্য সব গ্রন্থ নকল করাও তারা ছেড়ে দিল। উগ্রভূতের রচনাটির এই ভাবে প্রচার ও খ্যাতি হয়।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুদের একটি গল্প আছে। 'সমল বাহন'—শুদ্ধ ভাষায় সাতবাহন—নামে ওদের এক রাজা একদিন তাঁর স্ত্রীদের সাথে জলক্রীড়া করছিলেন, এমন সময় তাঁদের একজনকে রাজা বললেন —'মোদক ম দেহি'—জল ছিটিও না। রমণীটি ভাবল, রাজা 'মোদকম দেহি'—আমাকে মিষ্টান্ন দাও—বলছেন। সে তখন মিষ্টান্ন এনে রাজাকে দিতে গেলে রাজা তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তাতে রমণীটি রাজার প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলে। রমণীর এই ব্যবহারে রাজা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে হিন্দুদের প্রথামত অন্নজল ত্যাগ করে নির্জনবাস করতে লাগলেন। অবশেষে একজন জ্ঞানী লোক রাজার কাছে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সকলকে ব্যাকরণ ও শব্দের ধাতুরূপ শিখিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। লোকটি তারপর অন্নজল ত্যাগ করে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। মহাদেব তখন তাঁকে দর্শন দিলেন এবং আবুল আসওয়াদ আলদুয়ালি আরবী ভাষার জন্য যেরকম প্রয়োগবিধি রচনা করেছিলেন সেই রকম কয়েকটি নিয়ম তাঁকে শিখিয়ে দিয়ে এই শাস্ত্রকে আরও উন্নতি করতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জ্ঞানী লোকটি তখন রাজার কাছে ফিরে গিয়ে মহাদেব রচিত বিধিগুলো তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূচনা এই ভাবে হয়।

ব্যাকরণের পরই ছন্দের স্থান। কাব্যের মাত্রানীতির নাম 'ছন্দ', আমাদের ওরুজ (عروض) এর মত। ছন্দ-জ্ঞান হিন্দুদের জন্য অপরিহার্য, কারণ ওদের সমস্ত পুস্তকই ছন্দোবদ্ধ কাব্যে রচিত, যাতে মুখস্থ করা সহজ হয় এবং যাতে একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাউকেই লিখিত পুস্তক দেখতে না হয়। এর
১০৬ কারণ, ওরা মনে করে যে মানুষের মন স্বভাবতঃই সামঞ্জস্য (symmetry) ও বিন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিশৃঙ্খলাকে বর্জন করতে চায়। সেজন্য দেখা যায়, অধিকাংশ হিন্দুই কাব্যে আসক্ত, অর্থ না বুঝলেও কবিতা আবৃত্তি করতে ভালবাসে, আনন্দে ও উৎসাহে করতালি দিতে থাকে। সহজবোধ্য হলেও গদ্যের প্রতি হিন্দুদের অনুরাগ নাই।

ওদের বেশীর ভাগ গ্রন্থই শ্লোকে রচিত। বর্তমানে আমিও এই শ্লোক রচনা অভ্যাস করছি, কারণ হিন্দুদের জন্য আমি Euclid ও Almagest পুস্তক দু'টির সংস্কৃত তর্জমার কাজ হাতে নিয়েছি। তাছাড়া Astrolabe নির্মাণ করার পদ্ধতিও আমি ওদের ভাষায় লিখে ওদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি। জ্ঞান প্রচারের আগ্রহে-ই আমি এসব কাজ করছি। যা ওদের নাই এমন কোনও নতুন বিদ্যা বা গ্রন্থ হিন্দুরা পেলে তৎক্ষণাৎ ওরা তাকে শ্লোকে রূপান্তরিত করতে

লেগে যায়। শ্লোক সহজবোধ্য নয়, কারণ ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা আয়াসসাধ্য, সেজন্য রচনা আড়ষ্ট হয়। তার দরুন কী যে গোলযোগ হয় তা ভারতীয়দের সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। শ্লোকগুলো যদি আবার গদ্যের মত সরল অনাড়ম্বর হয় তাহলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। ওদের সম্বন্ধে আমি এখানে যা বলছি তা সত্য না হলে আল্লা আমার বিচার করবেন।

ছন্দ বিজ্ঞানের উদ্ভাবক হচ্ছেন পিঙ্গল ও 'চলিত' (?)। ছন্দ সংক্রান্ত প্রচলিত পুস্তকের সংখ্যা বহু। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে, লেখকের নামানুসারে অভিহিত 'গায়সুত' (?) নামক পুস্তকটি। এটি এতই বিখ্যাত যে ছন্দ বিজ্ঞানও ঐ নামে উল্লেখিত হয়ে থাকে। আরও কয়েকটি পুস্তক আছে, 'মুগলাছু ন', 'পিঙ্গল' ও 'আওলিয়াপ্দের' (?) লেখা। আমি অবশ্য এ সব পুস্তকের কোনোটিই দেখিনি, আর ব্রহ্মসিদ্ধান্তের যে অধ্যায়ে ছন্দ ও মাত্রা নির্ধারণের কথা আছে, তারও বিশেষ কিছু আমি জানি না। কাজেই, ভারতীয় ছন্দ বিজ্ঞানের পূর্ণ জ্ঞান আমি দাবী করতে পারি না; আমার আরও অধ্যয়ন আবশ্যক। তবে, সেই ওজুহাতে বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাখা বা এড়িয়ে যাওয়াও আমি অনুচিত মনে করি।

অ-কারান্ত হস্-অন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনায় আমাদের খলীল বিন্ আহমদ ও অন্যান্য ছন্দতাত্ত্বিকরা যে চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, সিলেবল্ (অক্ষর) গণনায় ভারতীয়রাও সেই রূপ সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। সে চিহ্নগুলো এই : । ও প্রথম চিহ্নকে 'লঘু' ও দ্বিতীয় চিহ্নকে 'গুরু' বলা হয়। 'মাত্রা ছন্দে' এক 'গুরুকে' দুই 'লঘুর' সমান বলে ধরা হয়। ওদের আরও একটি সিলেবল্
১০৭ আছে যার নাম 'দীর্ঘ', এর মাত্রা বা পরিমাণ এক 'গুরু'র সমান। আমার মনে হয়, এটি আসলে ব্যঞ্জনবর্ণের দীর্ঘ অকারান্ত রূপ। এখন পর্যন্ত অবশ্য এই 'লঘু-গুরুর' আকৃতি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, সেজন্য আরবী থেকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতে পারছি না। তবে আমার যেন মনে হচ্ছে, 'লঘু' হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সিলেবল্ নয়, আর 'গুরু'ও অকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ নয়। বরং, 'লঘু' হ্রস্ব অকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সিলেবল, আর 'গুরু' হচ্ছে আরবী ছন্দ বিজ্ঞানের 'সাবব' নামক ব্যাকরণের মত হ্রস্ব অকারান্ত ও হস্-অন্ত ব্যঞ্জন বর্ণের সম্মিলিত সিলেবল। আমার এ সন্দেহের কারণ এই যে ভারতীয়রা ছেদ না দিয়ে একের পর এক ক্রমাগত লঘু সিলেবল ব্যবহার করে যায়। আরবীতে কিন্তু দুইটি হসন্ত বর্ণ পর পর উচ্চারণ করা যায় না, তবে অন্যান্য ভাষায় তা সম্ভব। পারস্যের ছন্দ বিজ্ঞানীরা এরূপ ব্যঞ্জনবর্ণকে 'লঘু' অকারান্ত বর্ণ

বলে থাকে। তবে একসাথে যদি এরূপ বর্ণ তিনটির অধিক থাকে তাহলে তার উচ্চারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথচ হ্রস্ব অকারান্ত বর্ণের অনেকগুলো সিলেবল পর পর উচ্চারণ করে যেতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। যেমন (আরবীতে) بد ذک کمثل صفقک و ذمک بسعة ثقتک তাছাড়া কোনও শব্দ হসন্ত বর্ণ দিয়ে আরম্ভ হলে তার উচ্চারণ কষ্টকর হয়ে পড়ে। কিন্তু হিন্দুদের বহু বিশেষ্য (noun) ঠিক হসন্ত দিয়ে না হলেও, হ্রস্ব–অকারান্ত হরফ দিয়ে আরম্ভ হয়। পদ্যের প্রথমে এরূপ ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে, সিলেবল গণনায় তাকে ধরা হয় না, কেননা 'গুরু' ধ্বনির নিয়ম হোল যে, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসবে, আগে নয়।

আমাদের মুসলমানেরা পদ্য গঠনের জন্য فعل শব্দের বিভিন্ন রূপকে ওজন বা পদভাগ (foot) হিসাবে ধরে নিয়ে তাকে নানাভাবে সাজিয়ে কতকগুলো ছাঁচ বা বিন্যাস তৈরী করে নিয়েছে এবং প্রত্যেক পদভাগের অন্তর্ভুক্ত স্বরান্ত ও হসন্ত অক্ষরের সংখ্যা নির্দেশ করার জন্য যেমন কতকগুলো চিহ্নের উদ্ভাবন করেছে, হিন্দুরাও তেমনই 'লঘু' ও 'গুরু' ধ্বনি দিয়ে গঠিত পদভাগ নির্দেশ করার জন্য কতকগুলো নাম ব্যবহার করে থাকে। এ নাম দিয়ে আসলে ওরা এক বিশেষ ধ্বনি সমষ্টি বা পরিমাণ বোঝাতে চায়। এরূপ নামকরণের উদ্দেশ্য ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করা, যাতে ঐ নামাঙ্কিত প্রত্যেক পদভাগগুলোতে সিলে-বল (অক্ষর) সংখ্যার তারতম্য হলেও এবং 'লঘু' 'গুরু' ধ্বনির পারম্পর্যে পার্থক্য থাকলেও পর্বের ধ্বনি সমষ্টির পরিমাণ বা ওজন একই থাকে। ওজন শব্দ দিয়ে আমি উচ্চারণ কাল বোঝাতে চাচ্ছি যার এককে (unit) ওরা 'মাত্রা'
১০৮ বলে। এই একক পরিমাণ অনুযায়ী লঘুতে থাকে একমাত্রা আর গুরুতে দুই মাত্রা। পদভাগের ছন্দলিপিকরণে ওরা অক্ষরে (syllable) সংখ্যা না ধরে কেবল তাদের মাত্রার উল্লেখ করে থাকে। আরবীতেও এই রকম করা হয়। যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বকে (تشديد) হসন্ত ও স্বরান্ত দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ বলে গণনা করা হয়, কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে (تنوين) থাকলে, গণনায় তাকে দুইটি স্বরান্ত ও হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ রূপেই দেখানো হয়ে থাকে।

'লঘু' ও 'গুরু' ধ্বনির নিজস্ব কতকগুলো নাম দেওয়া হয়েছে। লঘুর নাম যেমন 'ল' 'কলি' 'রূপ' 'চামর' ও 'গ্রহ'; 'গুরুর নাম 'গ' 'নিবুর' (নিদ্র ?) ও 'অর্ধাংশক। শেষোক্ত নাম থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে এক পর্বে 'অংশক' দুই 'গুরুর সমান হবে। ছন্দশাস্ত্রের পুস্তকগুলো পদ্যে রচনা করার জন্যই হিন্দুর

এই সব নামের উদ্ভাবন করেছে। সেজন্য ওরা এত সব নাম আবিষ্কার করেছে যে এর কোনও না কোনও একটা ছন্দের সাথে মিলে যাবেই যাবে।

'লঘু' ও 'গুরুর বিভিন্ন প্রকারের বিন্যাসে যে সব পদভাগ গঠিত হয় তা এই :

১। ।।=দ্বি আক্ষরিক ও দ্বি মাত্রিক ; অক্ষর ও মাত্রা, উভয়ের সংখ্যাই দুই।

২। ।< ও <।=কেবল অক্ষরে দুই সংখ্যক, মাত্রায় নয়। (এখানে দুইটি পদভাগে অক্ষর দুইটি, কিন্তু মাত্রা তিনটি করে।) দ্বিতীয় পদভাগকে (<।) 'কৃত্তিকা' বলা হয়।

৩। চার মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন পদভাগকে প্রত্যেক পুস্তকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন :

<<=পক্ষ (অর্থাৎ অর্ধমাস)

।।<=জ্বলন, অর্থাৎ অগ্নি

।<।=মধ্য

<।।=পর্বত, একে 'হর' ও 'রস'ও বলা হয়েছে

।।।।=ঘন

৪। পাঁচ মাত্রার পদভাগের নানারূপ আছে। যেগুলোর বিশেষ নাম আছে তা এই :

।<<=হস্তিন	<<।=(?)
<।<=কাম	।।।<=কুসুম।

৫। <<<।=ছয় মাত্রার পদভাগ।

কেউ কেউ আবার এই পদভাগগুলোকে দাবার ঘুটির নামে অভিহিত করে থাকে, যথা, জ্বলন গজ। মধ্য=রথ, পর্বত=পদাধিক, ঘন=অশ্ব।

১০৯ হরিয়ুদ্ধ (হরিভট্ট?) নামক এক ব্যক্তির রচনা বলে খ্যাত একটি আভিধানিক পুস্তকে তিন 'গুরু' বা তিন 'লঘু' ধ্বনির বিভিন্ন পদভাগকে এক একটি ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন :

ম=<<<=ষড়গুণাত্মক (ছয় মাত্রার পদভাগ)

য়=।<<=হস্তিন

র=<।<=কাম

ত=<<।

স=।।<=জ্বলন

ধ=।<।=মধ্য

ভ= < ।=পর্বত

ন=।।।=ত্রিগুণাত্মক, (তিন মাত্রার পদভাগ)

এই সব চিহ্ন দ্বারা গ্রন্থকার বীজগণিতের প্রক্রিয়াতে এই আট প্রকার পদভাগ গঠন শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। "গুরু বা লঘু যে কোনও একটি ধ্বনিকে অবিমিশ্র ভাবে প্রথম পংক্তিতে বসাও (< < <, অথবা ।।।), পরের পংক্তিতে অন্য ধ্বনিটি (গুরু বা লঘু) প্রথমে বসাও, বাকী দুটি প্রথম প্রকারের ধ্বনিই থাকবে। তৃতীয় পংক্তিতে এই সংমিশ্রিত ধ্বনিটিকে (গুরু বা লঘু) আবার মধ্যে এবং চতুর্থ পংক্তিতে, শেষে বসাও। তাহলে তোমার প্রথম চরণ গঠন সম্পূর্ণ হবে।"

"দ্বিতীয় চরণের জন্য সর্ব নিম্নের পংক্তিতে দ্বিতীয় প্রকারের ধ্বনি (গুরু বা লঘু) অবিমিশ্রভাবে বসাও, প্রথম প্রকারের ধ্বনির একটি তার উপরের পংক্তির অন্তে বসিয়ে শূন্যস্থানগুলো যথাযথ ভাবে প্রথম পংক্তিতে ব্যবহৃত ধ্বনি দিয়ে পূরণ কর। দ্বিতীয় চরণের গঠন তাহলে সম্পূর্ণ হবে এবং তিন মাত্রার সমস্ত সম্ভাব্য পদভাগ দেখানো শেষ হবে।"

'গুরু'-'লঘুর' চিহ্ন অনুযায়ী পদভাগের এই বিন্যাসগুলি তা হলে এইরূপ দেখাবে :—

প্রথম চরণ=	১ম পদভাগ:	< < <	কিম্বা	।।।
	২য়—	। < <	"	< ।।
	৩য়—	< । <	"	। < ।
	৪র্থ—	< । <	"	।। <
২য় চরণ—				
	৫ম পদভাগ :	।। <	অথবা	< < ।
	৬ষ্ঠ—	। < ।	"	< । <
	৭ম—	< ।।	"	। < <
	৮ম—	।।।		< < <

প্রকরণটি (Permutation) অবশ্য ঠিক, কিন্তু এই প্রকরণ-বিন্যাসে প্রত্যেক পদভাগের স্থান নির্ণয়নের যে পদ্ধতি দেখানো হয়েছে তা শুদ্ধ নয়। গ্রন্থকার বলছেন, "পদভাগের প্রত্যেক লঘু ও গুরু অক্ষরের সাংকেতিক সংখ্যা ২ ধরে নাও, তাতে প্রত্যেক পদভাগকে ২, ২, ২, এই সংকেতে প্রকাশ করা যাবে। এখন পদভাগের বামের সংখ্যাকে মধ্যকার সংখ্যা দিয়ে গুণ কর, গুণফলকে আবার দক্ষিণের সংখ্যা দিয়ে গুণ কর। এই দক্ষিণের সংখ্যাটি যদি গুরুধ্বনির সংকেত হয় তাহলে বাম ও মধ্যের সংখ্যার গুণফল থেকে এক বাদ দিয়ে তবে দক্ষিণের সংখ্যার সাথে গুণ করবে।"

গ্রন্থকার উপরের তালিকায় সন্নিবেশিত ষষ্ঠ অর্থাৎ 'মধ্য' নামিত (= । < ।) পদভাগ দিয়ে এ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ২ কে ২ দিয়ে গুণ করে
১১০ গুণফল থেকে এক বাদ দিয়ে তৃতীয় অংকের সাথে বিয়োগফলকে গুণ করে তিনি ৬ পেয়েছেন।

এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কিন্তু উপরের তালিকাভুক্ত পদভাগের অধিকাংশের ক্ষেত্রে অনুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। সেজন্য আমার সন্দেহ হয়, পুস্তকটির পাঠে কিছু বিকৃতি ঘটেছে। আমার মতে এই পদভাগগুলোর বিন্যাস এই নিয়মে হবে:

প্রথম চরণ:—	ক	খ	গ	দ্বিতীয় চরণ:—	ক	খ	গ
১।	<	<	<	৫।	<	<	।
২।	।	<	<	৬।	।	<	।
৩।	<	।	<	৭।	<	।	।
৪।	।	।	<	৮।	।	।	।

অর্থাৎ, ক সারিতে উপর থেকে নিচের দিকে ধ্বনিগুলো লঘু-গুরু-লঘু বা গুরু-লঘু-গুরু এই পর্যায়ে বসবে। খ সারিতে একপ্রকারের দুটি ধ্বনির পর অন্য প্রকারের দুটি ধ্বনি বসবে, এবং গ সারিতে একপ্রকারের চারটি ধ্বনির পর অন্য প্রকারের চারটি ধ্বনি বসবে।

এর পর উপরোক্ত গ্রন্থকার আরও বলেছেন: "পদভাগের প্রথম ধ্বনি যদি গুরু হয়, তাহলে মধ্যের সংখ্যা দিয়ে গুণ করার আগে তার থেকে এক কমিয়ে নাও। যদি গুণকও গুরু ধ্বনি হয়, তাহলে গুণফল থেকে এক কমিয়ে নাও। এইভাবে উপরোল্লিখিত পদভাগের বিন্যাসে প্রত্যেক পদভাগের স্থান নির্ণীত হবে।"

আরবী পদ্য যেমন 'ওরূজ' ও 'জব" (প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষ পদভাগ) দিয়ে ভাগ করা হয়, তেমনই ভারতীয়দের পদ্যও দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ভাগকে 'পদ' বা চরণ বলা হয়। গ্রীকরাও এই ভাগকে 'চরণ' বলে।

পদ্য তিন কিম্বা সাধারণতঃ চার পদে ভাগ করা হয়। কখনও কখনও একটি পঞ্চম পদ তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। পদগুলোর মধ্যে কোন মিল (rhyme) থাকে না, তবে আরবীতে কাফিয়ার (قافية) মত একপ্রকারের ছন্দ আছে যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের অন্তস্বরে মিল থাকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ বর্ণেও তেমনই মিল থাকে। এ ধরনের পদ্যকে 'আর্যা'

বলা হয়। চরণের শেষে 'লঘু' স্বর 'গুরু' স্বরে পরিণত হতে পারে, যদিও 'আর্যাকে' সাধারণত 'লঘু' অন্তক ছন্দ বলেই ধরা হয়।

১১১ ওদের কাব্যে অনেক প্রকারের ছন্দ আছে। পঞ্চপদী ছন্দে পঞ্চম পদটিকে তৃতীয় ও চতুর্থ পদের মাঝে বসান হয়। সিলেবল্ ও পদের সংখ্যানুযায়ী ছন্দের নামভেদ হয়। একটি দীর্ঘ কবিতার সমস্ত পদই একই ছন্দে হওয়া হিন্দুরা পছন্দ করে না। সেজন্য, একই কাব্যে ওরা নানা ধরনের ছন্দ ব্যবহার করে থাকে। কাব্যটি তখন রঙীন সুতার কাজ করা চীনাংশুকের মত দেখায়।

চৌপদী ছন্দে পদের গঠন এইরূপ হয়—

১ম পদঃ	< <	পক্ষ = ১ অংশক	২য় পদ ঃ	< <	পক্ষ
	< । ।	পর্বত		। । <	জ্বলন
	। । <	জ্বলন		। < ।	মধ্য
				< । ।	পর্বত
				< <	পক্ষ
৩য় পদ ঃ	< <	পক্ষ	৪র্থ পদ ঃ	< <	পক্ষ
	< । ।	পর্বত		। । <	জ্বলন
	< <	পক্ষ		। < ।	মধ্য
				< । ।	পর্বত
				। । <	জ্বলন

এটি হচ্ছে চৌপদী কবিতার 'স্কন্দ' নামক একটি ছন্দের উদাহরণ। এর দুই ভাগ; প্রত্যেক ভাগে আটটি করে 'অংশক' আছে। তার মধ্যে, প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম অংশক 'মধ্য' পদভাগ (অর্থাৎ । < ।) হওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু ষষ্ঠ অংশক 'মধ্য' 'নয়ত ঘন' এই দুই-এর যে কোনও একটি পদভাগ হতেই হবে।
১১২ এই নিয়ম পালন করার পর অন্য অংশগুলোতে কবির ইচ্ছা বা অভিরুচি অনুযায়ী যে কোনও প্রকারের পদভাগ বসান যেতে পারে তবে পদভাগের সংখ্যায় কমবেশী করা চলবে না।

পদ রচনায় অংশক গঠনের এই নিয়ম অনুসরণ করা হলে চৌপদী কবিতার পদগুলোর এইভাবে লিপিকরণ করা যাবে ঃ

১ম পদ—	< <	< । ।	। । <		
২য় পদ—	< <	। । <	। < ।	< । ।	< <
৩য় পদ—	< <	< । ।	। < <		
৪র্থ পদ—	< <	। । <	। < ।	< । ।	। । <

কবিতাটি এই প্রক্রিয়ায় রচনা করতে হবে।

এই সব চিহ্ন দিয়ে যদি আরবী ছন্দ প্রকাশ করা যায় তাহলে তার অন্য অর্থ দাঁড়াবে, কেননা আরবীতে এসব চিহ্ন দিয়ে হ্রস্ব স্বরান্ত ও হলন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বোঝান হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমি فعل ধাতুর ক্রিয়াপদ দিয়ে 'খফীফ' ছন্দের একটি সম্পূর্ণ পদের লিপিকরণ দেখাচ্ছি।

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

আরবী notaion এ : (ডান থেকে বাম দিকে পড়তে হবে)	।০।০০।০ ।০০।০।০ ।০।০০।০
হিন্দুদের চিহ্নে :	<<।< <।<< <<।<

(শেষের চিহ্নগুলো, ভারতীয়দের লিখন রীতি অনুযায়ী বাম থেকে ডান দিকে নয়, আরবী রীতিতে ডান থেকে বাম দিকে পড়তে হবে।)

আমি একবার আগেও বলেছি এখন আবার বলছি যে ভারতীয় ছন্দের জ্ঞান আমার এমন বেশী নয় যে পাঠককে এ শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব বোঝাতে পারি। তবে সাধ্যমত চেষ্টা করতে আমি ত্রুটি করব না।

যে চৌপদী কবিতার প্রতি পদের পদভাগ (food) ও সিলেবুল সংখ্যার চিহ্নগুলো এমন অবিকলভাবে অন্য পদের সমান যে একটি পদ জানা থাকলে অন্য পদগুলোর গঠন সহজেই অনুমান করা যায়, তাকে 'বৃত্ত' বলা হয়। ভারতীয়দের আর একটি নিয়ম আছে যে চার সিলেবুলের কম কোনও পদ হয়
১১৩ না, কারণ বেদে এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর পদ নাই। সেজন্য সবচেয়ে ছোট পদ হচ্ছে চার অক্ষরের, আর সবচেয়ে দীর্ঘ পদ ছাব্বিশ অক্ষরের।

'বৃত্ত'ও আবার ২৩ প্রকারের হয়। এই ২৩টি 'বৃত্তে'র গঠন নীচের বর্ণনানুযায়ী হবে।

১। প্রত্যেক পদে চারটি অক্ষর থাকবে কিন্তু একটি গুরুর পরিবর্তে দুইটি 'লঘু' অক্ষর (সিলেবুল) বসানো চলবে না।

২। (এই দ্বিতীয় প্রকারের চৌপদী 'বৃত্তে'র গঠনপ্রকৃতি আমার কাছে স্পষ্ট হয় নি তাই এর বর্ণনা বাদ দিচ্ছি।)

৩। এই 'বৃত্তে'র পদগুলোতে কেবল 'ঘন' ও 'পক্ষ' অংশক থাকবে (= ।।।। ও <<)

৪। দুই 'গুরু' দুই 'লঘু' ও তিন 'গুরু' দিয়ে 'বৃত্তে'র প্রত্যেক পদ তৈরী হবে। (<<+।।+<<<)। এই বৃত্তের বর্ণনা 'পক্ষ'+জ্বলন+'পক্ষ', এই ভাবে করলেই ভাল হয়। (বাকী 'বৃত্তগুলিকে সেই ভাবেই বর্ণনা করা গেল)।

৫। ২ 'কৃত্তিক'+জ্বলন+পক্ষ (=<।<।+<।।<+<<)

৬। 'ঘন'+'মধ্য'+পক্ষ' (=।।।।+।<।+<<)

৭। 'ঘন'+'পর্বত'+'জ্বলন' (=।।।।+<।।+।।<)

৮। 'কাম'+'কুসুম'+'জ্বলন'+'গুরু' (=<।<+।।।<+।।<+<

৯। 'পক্ষ'+'হস্তিন্'+জ্বলন'+'মধ'+'পক্ষ' (=<<+।<<+।।< +।<।+।<<)

১০। 'পক্ষ'+'পর্বত'+'জ্বলন'+'মধ্য'+'পক্ষ' (=<<+<।।+ ।।<+।<।+<<)

১১। 'পক্ষ'+'মধ'+২ 'জ্বলন'+'হস্তিন' (=<<+।<।+।।<+ ।।<+।<<)

১২। 'ঘন'+'জ্বলন'+'পক্ষ'+২ 'হস্তিন' (=।।।।+।।<+<<+।< +<।<<)

১৩। 'পর্বত'+'কাম'+'কুসুম'+'মধ্য'+'জ্বলন' (=<।।+<।<+ ।।।<+।<।+।।<)

১১৭ ১৪। 'হস্তিন'+'পক্ষ'+'পর্বত' + 'কুসুম' + 'পর্বত'+'লঘু'+'গুরু' (।<<+<<+<।।+।।।<+<।।+।+<)

১৫। ২ 'পক্ষ'+'পর্বত+'কুসুম'+২ 'কাম'+ গুরু (=<<+<< +<।।+।।।<+<।<+<।<+<)

১৬। পক্ষ+পর্বত+কাম+কুসুম+পক্ষ+লঘু+'গুরু (=<<+<।। +<।<+।।।<+<<+।+<)

১৭। ২ 'পক্ষ'+পর্বত+'ঘন'+'জ্বলন'+'পক্ষ'+'কুসুম (=<<+ <<+<।।+।।।।+।।<+<<+।।।<)

১৮। ২ পক্ষ+পর্বত+ঘন+জ্বলন+২ কাম+গুরু (=<<+<< +<।।+।।।।+।।<+<।<+<।<+<)

১৯। গুরু+২ পক্ষ+পর্বত+ঘন+জ্বলন+২ কাম+গুরু (=<+ +<<+<।।+।।।।+।।<+< <+<।<।+<)

২০। ৪ পঙ্ক+জ্বলন+মধ্য+পঙ্ক+২ মধ্য+গুরু (<<+<<+<<+<<+।।<+।<।+<<+।<।+।+<)

২১। ৪ পঙ্ক ৩ জ্বলন+২ মধ্য গুরু (=<<+<<+<<+<<+।।<+।।<+।।<+।<।+।<।+<)

২২। ৪ পঙ্ক+কুসুম+মধ্য+জ্বলন+২ মধ্য+গুরু (=<<+<<+<<+<<+।।।<+।<।+।।<+।<।+।<।+<)

২৩। ৮ গুরু+১০ লঘু+কাম+জ্বলন+লঘু+গুরু (<+<+<+<+<+<+<+<+।।।।।।।।।।+<।<+।।<+।+<)

১১৫ 'বৃত্তের' এ তালিকা জেনে তেমন কোনও উপকার না হলেও বিস্তারিতভাবে এটি এখানে দেওয়া হোল এই জন্য যে এতে 'লঘু' সিলেবলের বাহুল্য দেখে পাঠক বুঝতে পারবে যে 'লঘু'র অর্থ আসলে হলন্তবর্ণ নয়, হ্রস্ব স্বরান্ত বর্ণ। ভারতীয়রা কিভাবে ছন্দ বর্ণনা করে, কেমন করে পদ্যের ছন্দলিপিকরণ করে এর থেকে তাও বোঝা যাবে। পাঠক আরও বুঝতে পারবে যে খলীল বিন আহমদ নিজ প্রতিভা বলেই আরবী ছন্দ শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন, যদিও, হিন্দুদের ছন্দরীতির কথা তিনি শুনেছিলেন, এ অনুমানের মূলে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে। ভারতীয়দের ছন্দ-তত্ত্ব নিয়ে আমার এত পরিশ্রম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'শ্লোক' রচনার নিয়ম স্থির করা, কেননা ওদের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই এই শ্লোকে রচিত।

'শ্লোক' চৌপদী ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক চরণে আট অক্ষর (সিলেবল) থাকে, কিন্তু চরণ ভেদে তাদের বিন্যাস পৃথক হয়। চার পদের প্রতি পদের শেষ অক্ষরটি 'গুরু' হওয়া আবশ্যক, আবার প্রত্যেক পদের পঞ্চম অক্ষর 'গুরু' আর ষষ্ঠ অক্ষর 'লঘু' হতে হবে। সপ্তম অক্ষরটি দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে 'লঘু' আর প্রথম ও তৃতীয় পদে 'গুরু' হতে হবে। অন্যান্য অক্ষরগুলো কবির রুচি ও সুবিধানুযায়ী হতে পারে।

ছন্দ প্রকরণে ভারতীয়রা অঙ্কশাস্ত্র কিভাবে প্রয়োগ করে তা দেখাবার জন্য ব্রহ্মগুপ্তের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি। "কাব্যের আদি রূপ হোল গায়ত্রী, দুই পদের ছন্দ। এখন, আমরা যদি ধরে নিই যে এই ছন্দে অক্ষরের সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশ (২৪) আর সর্বনিম্ন সংখ্যা চার, তাহলে পদের সর্বনিম্ন অক্ষর সংখ্যানুযায়ী এই দুই পদকে ৪+৪, এই অঙ্কে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু যেহেতু অক্ষরের (সিলেবল) সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে ২৪, সেহেতু ২৪ থেকে ৪+৪, এর বিয়োগফল অর্থাৎ ১৬কে যদি দক্ষিণের অঙ্কের

(অর্থাৎ ৪) সাথে যোগ করি তা হলে আমরা ৪+২০ পাই। যদি ত্রিপদী ছন্দ হয় তা হলে এই নিয়মে ওর আঙ্কিক রূপ দাঁড়াবে ৪+৪+১৬। পদের যে
১১৬ অংকটি দক্ষিণে থাকে অন্যান্য পদগুলো থেকে তাকে স্বতন্ত্র ধরা হয়। আর সেজন্য তার বিশেষ নাম থাকে। আর তার বামে অবস্থিত পদের অংকগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত বলে সেগুলোর অন্য নাম থাকে। চৌপদী ছন্দের আঙ্কিকরূপ হবে ৪+৪+৪+১২।"

৪	২০
৫	১৯
৬	১৮
৭	১৭
৮	১৬
৯	১৫
১০	১৪
১১	১৩
১২	১২
১৩	১১
১৪	১০
১৫	৯
১৬	৮
১৭	৭
১৮	৬
১৯	৫
২০	৪

কিন্তু কবি যদি ন্যূনতম সংখ্যার অর্থাৎ চার অক্ষরের পদ ব্যবহার না করে এবং দ্বিপদী ছন্দে ২৪ অক্ষরের কতগুলো combination ব্যবহার হতে পারে, তা যদি আমরা জানতে চাই, তা হলে, প্রথমে আমরা বামে ৪ ও দক্ষিণে ২০ লিখবো। এবারে চারের সাথে এক যোগ ক'রে সে যোগফলের সাথে আবার এক যোগ করব। তারপর ২০ থেকে এক বিয়োগ করে, সে বিয়োগ ফল থেকে আবার এক বিয়োগ ক'রে যা থাকবে, তা প্রথমোক্ত দুটি সংখ্যার, অর্থাৎ ৪ ও ২০ নীচে বসাব। এই পদ্ধতিতে বামের সংখ্যাকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে আর দক্ষিণের সংখ্যাকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে থাকব যতক্ষণ না বামে ২০ ও দক্ষিণে ৪ সংখ্যা পাচ্ছি। পাশের উদাহরণ থেকে সংখ্যা-বিন্যাসটি বোঝা যাবে।

এই combination এর সংখ্যা হোল ১৭, অর্থাৎ ২০ আর ৪ এর বিয়োগ ফলের চেয়ে এক বেশী।"

"চব্বিশ অক্ষরের ত্রিপদীর যে আদি ছন্দরূপ তাতে প্রত্যেক পদের ন্যূনতম অক্ষর সংখ্যা ৪+৪+১৬ হবে। এই ছন্দে অক্ষরের সম্ভাব্য combination জানতে হলে, এই সংখ্যাত্রয়ের কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটি (৪+১৬) নিয়ে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বাড়িয়ে ও কমিয়ে নীচের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তার সঙ্গে প্রথম (৪) টিও আমরা বামে লিখবো কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি করব না। এর উদাহরণ এই :

৪	৪	১৬
৪	৫	১৫
৪	৬	১৪
৪	৭	১৩
৪	৮	১২
৪	৯	১
৪	১০	১০
৪	১১	৯
৪	১২	৮
৪	১৩	৭
৪	১৪	৬
৪	১৫	৫
৪	১৬	৪

১১৭ এই প্রক্রিয়ায় আমরা ১৩টি Permutation পাচ্ছি। নিম্নলিখিত লেখা প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগুলোর স্থান পরিবর্তন করে নিলে, Permutation এর সংখ্যা আরও ছয় গুণ অর্থাৎ ৭৮ দাঁড়াবে।

১। তৃতীয় সংখ্যাটিকে ১ সরিয়ে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার বিনিময় কর, এবং যে সংখ্যাটি দ্বিতীয় স্থানে এল, তাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি না করে শুধু অন্য দুটি সংখ্যায় উপরোক্ত রীতিতে ক্ষতি বৃদ্ধি করে যেতে থাক। যথা—

৪	৪	১৬
৫	৪	১৫
৬	৪	১৪
৭	৪	১৩
৮	৪	১২ --ইত্যাদি

২। দক্ষিণের, অর্থাৎ তৃতীয় স্থানের সংখ্যা (১৬)-কে মধ্যে বসাও, অন্য দু'টি সংখ্যা দুই দিকে রাখ। বামের সংখ্যাকে অপরিবর্তিত রেখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যাকে উপরোক্ত রীতিতে যোগ বিয়োগ করতে থাক।

৩। এটি দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় বর্ণিত বিন্যাসের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ, অর্থাৎ যে সংখ্যাটির কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না, তাকে বামে না বসিয়ে দক্ষিণে বসাতে হবে।

৪। গরিষ্ঠ সংখ্যাটিকে (১৬) বামে রেখে অপরিবর্তনীয় সংখ্যাকে মধ্যে বসাও।

৫। গরিষ্ঠ সংখ্যাকে বামে বসিয়ে অপরিবর্তনীয় সংখ্যাকে দক্ষিণে বসাও।

"তা ছাড়া পদের অক্ষর সংখ্যা যেহেতু দুই-এর বর্গ (square) অনুযায়ী বাড়তে থাকে (যেমন চার এর পরে আট) সেহেতু ৮+৮+৮ এই অঙ্ক দিয়েও আমরা ত্রিপদী ছন্দের অক্ষর সংখ্যা প্রকাশ করতে পারি। তবে পদের যে গাণিতিক বিশেষত্ব আছে তা অন্য নিয়মাধীন। চৌপদী ছন্দের প্রকরণ' (Permutation) সংখ্যাও উপরোক্ত আঙ্কিক বিন্যাসে প্রকাশ করা যেতে পারে।"

ব্রহ্মগুপ্ত রচিত এই পুস্তকের এই একটি পাতার বেশী পড়বার সুযোগ কিন্তু আমার হয়নি। তবে এ পুস্তকে যে গণিতের নানা সূত্র বর্ণিত আছে, তাতে সন্দেহ নাই। আল্লাহ তাঁর কৃপায় যদি আমাকে শক্তি ও সামর্থ্য দেন তাহলে পুস্তকে বর্ণিত তত্ত্বগুলো আয়ত্ত করতে পারব, এ আশা রাখি।

গ্রীকদের গ্রন্থাদি থেকে যতদূর আমি ধরতে পেরেছি তাতে মনে হয় তারাও কাব্য রচনায় হিন্দুদের মতই পদভাগ (feet) ব্যবহার করত। কারণ Galenus তাঁর Kataganes গ্রন্থে লিখেছেন, Manecrates নিষ্ঠীবন থেকে যে ঔষধ আবিষ্কার করেছিলেন, Democrates তিন পদের একটি পদ্যে তার বর্ণনা করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হিন্দুদের গ্রন্থ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংখ্যা বিপুল। জনসাধারণের উৎসাহে তার আরও প্রসার হয়, বিশেষ করে, যখন জ্ঞানের মান উন্নত থাকে, জনপ্রিয় হ এবং যখন লোকে
১১৮ জ্ঞানী ও বিদ্বানের সমাদর করে। এরূপ সমাদর রাজা ও রাজপুরুষদের দ্বারা হওয়াই শ্রেয়ঃ, কারণ জীবিকার দুশ্চিন্তা থেকে জ্ঞান সাধককে এরাই মুক্তি দিতে পারে এবং অধিকতর সুখ্যাতি ও সমাদর অর্জনে তার শক্তিকে নিযুক্ত রাখতে পারে। আদরের প্রত্যাশা ও অখ্যাতিকে ঘৃণা করার প্রকৃতি মনুষ্য স্বভাবের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে।

আমাদের বর্তমান যুগ কিন্তু তেমন নয়, বরঞ্চ তার বিপরীত। কোনও নতুন বিদ্যার উদ্ভব হবে, বা কোনও বিষয়ে নতুনভাবে গবেষণা হবে, এ যুগে তেমন সম্ভাবনা নাই। এখন যে সব বিদ্যা আছে তা ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাচীন যুগের সামান্য অবশিষ্ট মাত্র।

কোন ভাব বা তথ্য পৃথিবীতে সাধারণভাবে প্রসার পেলে, প্রত্যেক জাতি তার কোনও না কোনও অংশ নিয়ে চর্চা করতে থাকে। হিন্দুরাও তাই করেছে। কালের আবর্তন সম্বন্ধে ওদের যে বিশ্বাস তা ওদের কোনও নিজস্ব আবিষ্কার প্রসূত নয়, প্রত্যক্ষ অনুধাবনের ফল। বিদ্যার মধ্যে ওদের কাছে জ্যোতিষ সবচেয়ে বেশী সুখ্যাত। কারণ ওদের ধর্মকর্মের সঙ্গে এ শাস্ত্রটি নানাভাবে যুক্ত। ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) না জানলে, কেবল মাত্র গণিত জ্যোতিষের জ্ঞান নিয়ে কেউ জ্যোতিষী আখ্যা পেতে পারে না।

আমাদের মুসলমানদের মধ্যে যে গ্রন্থটি Sindhind নামে পরিচিত, ওরা তাকে 'সিদ্ধান্ত' বলে, অর্থাৎ ঋজু, যাতে বক্রতা বা পরিবর্তন নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে রচনাকে ওরা শ্রদ্ধা করে তাকেই ওরা এই নাম দিয়ে থাকে, এমন কি, যে পুস্তক আমাদের (Zij) গণিত জ্যোতিষীর পঞ্জিকারও সমান নয়, তাকেও হিন্দুরা সিদ্ধান্ত বলে। ওদের এই রকম পাঁচটি সিদ্ধান্ত আছে :

(১) 'লাত' কৃত সূর্য সিদ্ধান্ত।

(২) বিষ্ণুচন্দ্র কৃত, সপ্তর্ষিমন্ডলের একটি নক্ষত্রের নামাঙ্কিত 'বশিষ্ট সিদ্ধান্ত।'

(৩) 'শৈন্ত' (شيتتر) নামক নগরের অধিবাসী বলে কথিত, ইউনানী পৌলস (Paulus Alexandranus)-এর নামাঙ্কিত 'পৌলিশ সিদ্ধান্ত'। "শৈন্ত", আমার মনে হয়, Alexandria-র বিকৃতরূপ।

(৪) শ্রীসেন কৃত রোমানদের প্রতি আরোপিত 'রোমক সিদ্ধান্ত'।

(৫) 'ভিল্লমাল' নগরের 'যষ্ণ'-পুত্র ব্রহ্মগুপ্ত রচিত ও ব্রহ্মার নামাঙ্কিত "ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত"। ভিল্লমান মুলতান ও অনহিলওয়াড়ার মধ্যবর্তী, ষোল যোজন
১১৯ দূরে অবস্থিত। এই সব গ্রন্থের রচয়িতারা সবাই পৈতামহ অর্থাৎ আদি পিতা ব্রহ্মার প্রতি আরোপিত, গ্রন্থকে মূল উৎস বলে ধরে।

বরাহ মিহির-ও 'পঞ্চসিদ্ধান্তক' নামক একটি স্বল্প পরিসর জ্যোতিষ পঞ্জিকা (Zij) প্রণয়ন করেছেন। নাম থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটি উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের সার সংকলন। আসলে, কিন্তু তা নয়, এবং এটি অন্যগুলোর চেয়ে এত ভাল-ও নয় যে 'পঞ্চ সিদ্ধান্তের' নির্ভুলতম 'সিদ্ধান্ত' বলে একে ধরা যাবে। এই নামটি কেবল পঞ্চ সিদ্ধান্তের সংখ্যা নির্দেশ করে।

ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন : "সিদ্ধান্ত বহু। যেমন, সূর্য, ইন্দু, পৌলিস, রোমক, বশিষ্ট, যবন, অর্থাৎ ইউনানী (গ্রীক)। সিদ্ধান্তের সংখ্যা একাধিক হলেও, তাদের মধ্যে ভাষা ছাড়া, অর্থের কোনও প্রভেদ নাই। মনোযোগের সাথে সেগুলো পড়লেই তাদের অর্থগত ঐক্য ধরতে পারা যাবে।"

এখন পর্যন্ত 'পৌলিস' ও 'ব্রহ্মগুপ্তের' পুস্তকগুলো ছাড়া আর কোনও সিদ্ধান্ত আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। পুস্তক দুটির যে অনুবাদ আমি আরম্ভ করেছি—তাও এখনও শেষ হয়নি। তাই, আমি ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের অধ্যায়-সূচী এখানে উদ্ধৃত করছি ; তার থেকে গ্রন্থটির অন্ততঃ কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) ভূমন্ডলের প্রকৃতি, আকাশ ও পৃথিবীর আকৃতি

(২) গ্রহের আবর্তন, লগ্ন নির্ণয়, গ্রহপথের মধ্যক (mean) নির্ণয়, arc এর সাইন (sine) নির্ণয় পদ্ধতি

(৩) গ্রহাদির পারস্পরিক দূরত্ব ও অবস্থান

(৪) ছায়ার অবস্থান ও বিস্তৃতি, দিবস ও সূর্যের ঊর্ধ্বগতির ভাগ নির্ণয়ন এবং এই তথ্যদ্বয়ের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ প্রণালী

(৫) নক্ষত্রসমূহের দৃশ্যমান ও সূর্যকিরণে অদৃশ্য হওয়ার কারণ

(৬) চন্দ্রের উদয় ও তার শৃঙ্গাকৃতি পক্ষদ্বয়

(৭) চন্দ্রগ্রহণ

(৮) সূর্যগ্রহণ

(৯) চন্দ্রের ছায়াচ্ছন্ন অংশ

(১০) নক্ষত্রাদির যোগ ও সংযোগ

(১১) নক্ষত্রাদির দ্রাঘিমা

(১২) জ্যোতিষ-গ্রন্থ ও পঞ্জিকাদির বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ও শুদ্ধাশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়

(১৩) অংকশাস্ত্র, সমতল পরিমাণ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি

(১৪) গ্রহ-নক্ষত্রাদির মধ্যক (mean)' স্থান নির্ণয়নের বৈজ্ঞানিক প্রণালী

(১৫) নক্ষত্রাদির অবস্থান (corrected place) গণনার বৈজ্ঞানিক প্রণালী

(১৬) চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় তিনটির গণনা পদ্ধতি

(১৭) গ্রহণ-বিক্ষেপ (deflection of Eclipse)

১২০ (১৮) চন্দ্রোদয়ের লগ্ন ও তার 'পক্ষদ্বয়ের' কাল গণনার বৈজ্ঞানিক প্রণালী

(১৯) 'কুট্টক' অর্থাৎ, কোন কিছুকে কোটা (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানকে এখানে তৈলবীজের কুট্টন ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বীজগণিত ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা আছে। তা ছাড়া, এতে গণনা সংক্রান্ত অন্যান্য মূল্যবান তথ্যও আছে।)

(২০) ছায়া

(২১) কাব্যের মাত্রা গণনা ও ছন্দশাস্ত্র

(২২) চক্র ও পর্যবেক্ষণের যন্ত্রসমূহ

(২৩) সময় ও কাল গণনার চতুর্বিধ রীতি : সৌর, সাবনি (طالوعی) চান্দ্র ও নক্ষত্র (منازلی)

(২৪) এই বিষয়ের ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত অংক চিহ্ন সকল

ব্রহ্মগুপ্ত এই চব্বিশটি অধ্যায়ের নাম করেছেন। কিন্তু 'ধ্যান-গ্রহ অধ্যায়' নামে আরও একটি অধ্যায় আছে, যাতে গণনা না করে, কেবল চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা তিনি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তালিকায় আমি তার উল্লেখ করিনি এজন্য যে তাঁর কাল্পনিক সিদ্ধান্তগুলো গণিত বা অংক সিদ্ধ নয়। আমার মনে হয়, ব্রহ্মগুপ্ত আসলে গাণিতিক প্রক্রিয়ার যুক্তিবত্তার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, তা নইলে, গণনা ব্যতিরেকে এ বিদ্যা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের উত্তর কেমন করে পাওয়া যেতে পারে ?

যে সব গ্রন্থ সিদ্ধান্তের পর্যায়ের নয়, সেগুলোকে 'তন্ত্র' বা 'করণ' বলা হয়। তন্ত্রের অর্থ, শাসকের অধীনে থেকে কার্য পরিচালনা করা। আর 'করণের' অর্থ অনুসরণ, অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অনুসারী। 'শাসক' বলতে ওরা 'আচার্য' বোঝে। আচার্য হচ্ছে জ্ঞানী, তপস্বী, যারা ব্রহ্মাকে অনুসরণ করে। আর্যভট্ট ও বলভদ্র প্রণীত দুইটি বিখ্যাত 'তন্ত্র' আছে। 'ভানুর্যশ নামক আর একজন লেখকের একটি রসায়নতন্ত্রও আছে। রসায়নের ব্যাখ্যা অন্য অধ্যায়ে করা হবে।

'করণে'র মধ্যে··· *নামাঙ্কিত একটি গ্রন্থ আছে। ব্রহ্মগুপ্তের রচিত একটি 'করণ খণ্ড খাদ্যক' আছে। ওদের একপ্রকার মিষ্টান্নের নাম 'খণ্ড'। এরূপ নাম করণের হেতু সম্বন্ধে আমি শুনেছি যে সুগ্রীম নামক একজন বৌদ্ধ শ্রমণ
১২১ 'দধিসাগর' অর্থাৎ অম্লদুগ্ধের সাগর, নাম দিয়ে একটি জ্যোতিষ পঞ্জিকা রচনা করেছিল। তার জনৈক শিষ্য আর একটি ঐরূপ পঞ্জিকা রচনা করে। তার নাম দেয়, 'কুরাবাবায়া' (? کوربیبا) অর্থাৎ তন্ডুলগিরি। তারপর ইন্দু 'লবণ মুষ্টি' নামে আর একটি পঞ্জিকা রচনা করে। সেজন্য, ব্রহ্মগুপ্ত তার রচনাকে মিষ্টান্ন নাম দিয়েছেন যাতে এই বিদ্যার গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন স্বাদের ভোজ্য বস্তুর নাম থাকে।

এই গ্রন্থটিতে আর্যভট্টের মতামত অনুসরণ করা হয়েছে। সেজন্য ব্রহ্মগুপ্ত পরে 'উত্তর-খণ্ড খাদক' নাম দিয়ে আর একটি পুস্তক রচনা করেন। এটি প্রথমটির টীকা। এরপর আরও একটি পুস্তক লেখা হয়েছে। সেটি ব্রহ্মগুপ্তের বা অন্য কারো রচনা কিনা, আমি জানতে পারিনি। এর নাম 'খণ্ড খাদ্যক টিপ্পা' (টীকা ?)। এতে খণ্ড খাদ্যকে ব্যবহৃত গণনা পদ্ধতির হেতু ও নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার অনুমান, এটি বলভদ্রের রচনা।

এ ছাড়া বারানসীর টীকাকার বিজয় নন্দিনের একটি জ্যোতিষ পঞ্জিকা আছে, 'করণ তিলক' নাম, অর্থাৎ 'করণ'সমূহের ললাটে শ্বেত টীকা। নাগরপুরের মিহদত্তের (মহীদত্ত ?) পুত্র বিত্তেশ্বরেরও 'করণসার' নামে একটি পঞ্জিকা আছে। আর একটি ভানুযাস কৃত 'করণ-পর তিলক' শুনেছি এতে নক্ষত্রাদির অবস্থান থেকে তাদের দূরত্ব নির্ণয় করার প্রণালী দেখান হয়েছে। কাশ্মীরের উৎপল রচিত 'রাহুনরাকরণ' (?) অর্থাৎ করণভঞ্জক নামে একটি পুস্তক আছে। আর একটির নাম 'করণপাত', অর্থাৎ করণ হন্তা। 'করণ চূড়ামণি' নামে আরও একটি পুস্তক আছে, যার রচয়িতার নাম আমি জানি না।

* মূলপাঠে এখানে কয়েকটি শব্দ নেই।

এই বিষয়ে অন্য নামে আরও বহু পুস্তক আছে। যেমন, মনু রচিত 'বৃহৎ-মানস' উৎপলের টীকা, দাক্ষিণাত্যের পুঞ্জলকৃত (?) 'সংক্ষিপ্ত মানস' নামক 'বৃহৎমানসের' সার, আর্যভট্টের 'দশগীতিকা' ও 'আর্যষ্টশত' রচয়িতার নামে পরিচিত লোকানন্দের পুস্তক 'ভট্টিল' নামক ব্রাহ্মণের রচিত পঞ্জিকা প্রভৃতি। বস্তুতঃ এ জাতীয় রচনার ইয়ত্তা নাই।

ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে মস্তব্য, পরাশর, গর্গ ব্রহ্ম, বলভদ্র, "দিব্যতত্ত্ব" (?) ও বরাহমিহির এদের প্রত্যেকেরই রচিত একটি করে সংহিতা আছে। সংহিতার
১২২ অর্থ বিবিধার্থ সংগ্রহ, যেমন আবহিক ঘটনার সাহায্যে যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়, রাজ্যের ভবিষ্যৎ বর্ণনা, দ্রব্যের লক্ষণ জ্ঞান, হস্তরেখা বিচার, স্বপ্নফল নিরূপণ, ও শাকুন বিদ্যা ইত্যাদি। ভারতবর্ষের পণ্ডিতদের এসবের ওপর বিশ্বাস আছে। সংহিতাতে আবহবিদ্যা ও বিশ্বতত্ত্ব আলোচনা করা ওদের জ্যোতিষী-দের রীতি।

পরাশর, সত্য, মনিথ, জীবশর্মণ ও মাউও নামক ইউনানী, এরা প্রত্যেকে এক একটি জাতক বা 'জন্মকথা' নামক পুস্তক রচনা করেছে। বরাহমিহিরের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটি 'জাতক' আছে। বলভদ্র বড়টির ব্যাখ্যা করেছেন, আর ছোটটির আমি আরবী অনুবাদ করেছি। জাতক সম্বন্ধে ওদের আর একটি বৃহৎ গ্রন্থ আছে তার নাম 'সারাবলি': অর্থাৎ নির্বাচিত; এটি Pazidaj (البزيدج)-এর মত। 'সারাবলি' রাজা কল্যাণবর্মের রচনা। বিজ্ঞানে ইনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সারাবলির চেয়ে আরও একটি বৃহত্তর রচনা আছে, যা 'যবন' (যাবন ?) অর্থাৎ ইউনানীদের নামে পরিচিত। এতে ফলিত জ্যোতিষের সব কিছুই সংকলিত হয়েছে। বরাহমিহিরের আরও কয়েকটি ছোট ছোট রচনা আছে। একটির নাম 'ষটপঞ্চাশিকা। এতে ছাপ্পান্ন অধ্যায়ে জ্যোতিষ বিষয়ের প্রশ্নোত্তর আছে। এইরূপ আর একটি নাম "হোরপঞ্চ-হোত্রি" (?)।

যাত্রার শুভক্ষণ নির্ধারণের জন্য 'যোগযাত্রা' ও 'তিগুনি-যাত্রা' (تكنى ز اتر) (Tikani Jatra) নামক দুটি পুস্তক আছে। কন্যাদান ও বিবাহের লগ্নাদি নির্ণয়ের জন্য 'বিবাহপটল', গৃহ নির্মাণের জন্য…* নামিত পুস্তক আছে। শাকুন বিদ্যা ও ভবিষ্যৎ গণনার গ্রন্থ 'শ্রূধব'-এর তিনটি বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত আছে। একটি মহাদেবের রচনা বলে কথিত; দ্বিতীয়টি 'বিমলাবুদ্ধির' আর তৃতীয়টি 'বাঙ্গালে'র (بنگل) আর একটি গ্রন্থ রক্তাম্বরধারী শ্রবণধর্ম

* মূল গ্রন্থে এখানে শব্দটি পড়ে গেছে।

সম্প্রদায়ের গুরু বুদ্ধের রচিত গূঢ়ামন (?) অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান। ঐ বিষয়ে 'প্রশ্ন গূঢ়ামন' (?) দৈব জ্ঞানের প্রশ্নমালা নামক আর একটি পুস্তক আছে, উপল কৃত।

আরও কয়েকজন পণ্ডিত আছেন, যাঁদের গ্রন্থের নাম জানা নাই। যেমন, প্রদ্যুম্ন, সাঙ্গহিল (?) (সাঙ্খহিল ?) দিবাকর, পরেশ্বর, সারস্বত, পিরুবন
১২০ (? ٹٹرو ان), দেবকীর্তি ও পৃথূদক স্বামী।

চিকিৎসা বিদ্যাও জ্যোতিষের গোত্রভুক্ত; পার্থক্য এই যে জ্যোতিষের মত শাস্ত্রের সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। এ বিষয়ে চরকের নামাঙ্কিত একটি গ্রন্থ আছে যাকে ওরা চিকিৎসা বিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করে। ওদের বিশ্বাস যে চরক শেষ দ্বাপর যুগে ঋষি ছিলেন, তখন তাঁর আসল নাম ছিল 'অগ্নিবেশ', পরে 'সুত্রের' পুত্রদের নিকট থেকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করে তিনি 'চরক' অর্থাৎ 'ধীমান', এই নামে অভিহিত হন। সুত্রের পুত্রেরা ঋষি ছিলেন এবং ইন্দ্রের নিকট থেকে এ বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইন্দ্র, দেবগণের চিকিৎসক 'অশ্বিনী'র নিকট থেকে পেয়েছিলেন, এবং অশ্বিনী আবার প্রজাপতি অর্থাৎ আদিপিতা ব্রহ্মার নিকট থেকে এ বিদ্যা লাভ করেছিলেন। চরকের এই গ্রন্থটি Bermekidas-দের উদ্যোগে আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছে।

হিন্দুরা জ্ঞানের আরও নানা বিষয়ের চর্চা করে থাকে—এবং তার গ্রন্থও অজস্র। আমার জ্ঞানে তার পরিধি করা যায় না। 'পঞ্চতন্ত্র' পুস্তকের যদি আমি তর্জমা করতে পারতাম! পুস্তকটি আমাদের মধ্যে, Kalila wa Dimna নামে খ্যাত। ফার্সী, হিন্দী এবং আরবীতে তর্জমা হয়ে পুস্তকটি নানা ভাষায় প্রচারিত হয়েছে। এমন সব লোকের দ্বারা এই সব তর্জমা হয়েছে, পাঠ পরিবর্তন করার অপবাদ থেকে যারা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবদুল্লা বিন মুকাফ্ফার নাম করা যায়। শিথিল বিশ্বাসীদের মনে ধর্মীয় সংশয় জাগাতে ও Manichacan মতবাদ, প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য তাঁর পঞ্চতন্ত্রের আরবী অনুবাদে তিনি Barzaya-র অধ্যায়টি জুড়ে দিয়েছেন। যার উপর অন্তর্ক্ষেপণের (inter-polution) অভিযোগ করা চলে তার অনুবাদ কিছুতেই সন্দেহমুক্ত হতে পারে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতীয় পরিমাণ বিজ্ঞান (Metrology)

গণনা করা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। সমজাতীয় বস্তুর সাথে তুলনা করেই বস্তুর পরিমাণ বোঝা যায় এবং সেই বস্তুটিকে সাধারণ সম্মতিক্রমে একক
১২৪ বলে ধরা হয়। এইভাবে এই এককের (Unit) সাথে সমজাতীয় অন্য বস্তুগুলোর পার্থক্য বোঝা যায়। তুলাদণ্ডের উপরে তার কাঁটা ঠিক সমকোণ (right angle) হলে ওজন দ্বারা বস্তুটির গুরুত্বের পরিমাণ বোঝা যায়। হিন্দুরা কিন্তু তুলাদণ্ডের প্রয়োজনবোধ বড় একটা করে না, কারণ দিরহাম টাকাকড়ির পারস্পরিক মূল্য নিরূপণ ওরা ওজনে করে না, গণনার দ্বারা করে। মুদ্রার 'ফলুস' নামিত ভগ্নাংশও ওরা গণনা করে নির্ধারণ করে। নগর ও অঞ্চল ভেদে ওদের টাকাকড়ির মুদ্রায়ণ পৃথক হয়। স্বর্ণকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় কিম্বা অলংকার হিসাবেই ওরা ওজন করে। মুদ্রাঙ্কিত হলে আর ওজন করে না। স্বর্ণ ওজন করার জন্য 'সুবর্ণ' নামে ওদের পরিমাণজ্ঞাপক একক (unit) আছে যার ১/১৬ ভাগে এক তোলা হয়। আমরা যেমন 'মিথ্কাল' ওজনটি বেশী ব্যবহার করি, ওরা তেমনই 'তোলা' ব্যবহার করে। ওদের কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে, একতোলা আমাদের তিন দিরহামের সমান মনে হয়, যার দশটিতে সাত মিথ্কাল' ওজন হয়। আমাদের মিথ্কালের হিসাবে একতোলা তাহলে ২½. মিথ্কাল হবে। তোলার সর্বপ্রধান ভগ্নাংশ হচ্ছে ১/১২; তাকে 'মাসা' বলা হয়, সুবর্ণের ১/১৬ ভাগ।

১ মাস=৪ আন্দি অর্থাৎ "গৌর" নামের বৃক্ষের বীজ

১ আন্দি=যব

১ যব=৬ ১/৪ কল

১ কল=৪ পাদ

১ পাদ=৪ মদ্রি (? صدری)।

অন্যভাবে : ১ সুবর্ণ—১৬ মাসা—৬৪ আন্দি—২৫৬ যব—১৬০০ কল—৬৪০০ পাদ—২৫৬০০ 'মদ্রি' (?)

৬ 'মাসাকে দ্রক্ষম' বলা হয়। এর ওজন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে ওরা বলে যে ২ দ্রক্ষম ১ মিথ্‌ক্কালের সমান। কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ এক মিথ্‌ক্কালে ৫$\frac{১}{৪}$ মাসা হয়। 'দ্রক্ষম' ও মিথ্‌ক্কালের আনুপাতিক সম্পর্ক হচ্ছে ২০:২১; কাজেই ১ দ্রক্ষম ১$\frac{১}{২০}$ মিথ্‌ক্কালের সমান হবে। উপরোক্ত উত্তর দেবার সময় ওরা
১২৫ মিথ্‌ক্কালের ওজনকে দ্রক্ষমের প্রায় সমান মনে করে ঠিকই করে। কিন্তু মিথ্‌ক্কালের পরিমাণ দ্রক্ষমের দ্বিগুণ বলে আবার ওরাই এই সাদৃশ্যকে খণ্ডন করে।

যেহেতু পরিমাণের একক সংখ্যা (unit) কোনও স্বাভাবিক দ্রব্য নয়, সর্ব-সম্মত একটি ব্যবহারিক মান মাত্র, সেহেতু তাকে বাস্তব ও কাল্পনিক দুই ভাবেই ভাগ করা সম্ভব হয়। এই ভাগ বা ভগ্নাংশগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন-ভাবে করা হয়ে থাকে। স্থান ও কাল ভেদে এগুলোর পার্থক্য আছে। এরূপ পার্থক্য, হয় ভাষার বিবর্তন, নয়ত সাময়িক কারণের দরুন হয়ে থাকে।

সোমনাথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একজন লোক আমাকে বললে যে ওদের মিথ্‌ক্কাল আমাদের মিথ্‌ক্কালের সমান: এবং

১ মিথ্‌ক্কাল = ৮ রুভ (Ruva)
১ রুভ = ২ পালি
১ পালি = ১৬ যব

তাহলে ১ মিথ্‌ক্কাল—৮ রুভ—১৬ পালি—২৫৬ যবের সমান দাঁড়ায়। এর থেকে বোঝা যাবে যে ওদের আর আমাদের মিথ্‌ক্কালের পরিমাণ সমান বলায় লোকটির ভুল হয়েছে; যাকে সে মিথ্‌ক্কাল মনে করেছে তা আসলে তোলা: আর যাকে সে 'রুভ' বলেছে, তা আসলে মাসা।

এ বিষয়ে যখন ওরা আরও নিশ্চিত হতে চায়, তখন বরাহমিহির বর্ণিত মূর্তি শিল্পের পরিমাপের উল্লেখ করে। তা হচ্ছে এই:

১০ রেণু—১ রজ
৮ রজ—১ বালগ্র অর্থাৎ একটি কেশের অগ্রভাগ
৮ বালগ্র—১ লীখা, অর্থাৎ উকুনের ডিম্ব
৮ লীখা—১ যূক—অর্থাৎ, উকুন
৮ যূক—১ যব।

বরাহমিহির এর পর দূরত্বের মাপ বর্ণনা করেছেন। সে আমাদের পূর্বোল্লিখিত মাপই। তার মাপগুলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলো:

৪ যব=১ আন্দি

৪ আন্দি=১ মাসা

১৬ মাসা=১ সুবর্ণ, অর্থাৎ স্বর্ণ

৪ সুবর্ণ=১ পল

১২৬ শুষ্ক পদার্থের মাপ এই :

৪ পল=১ কুড়ব

৪ কুড়ব=১ প্রস্থ

৪ প্রস্থ=১ অড়হক

তরল পদার্থের মাপ :

৮ পল=১ কুড়ব

৮ কুড়ব=১ প্রস্থ

৪ প্রস্থ=১ অড়হক,

৪ অড়হক=১ দ্রোণ

'চরকের' গ্রন্থে নিম্নে বর্ণিত মাপের উল্লেখ আছে। আমি অবশ্য আরবী অক্ষরে লিখিত বর্ণনা থেকেই নামগুলো লিখছি, কেননা সেগুলো ওদের মুখ থেকে আমি শুনিনি। আমার জানা আরবীতে লেখা অন্যান্য পুস্তকের মত এটিতেও যে বিস্তর অশুদ্ধি আছে, তাতে সন্দেহ নাই। অক্ষরে অনুলিখিত পুস্তকে এরকম বিকৃতি হওয়া স্বাভাবিক. বিশেষ করে আমাদের যুগে যখন পাঠের শুদ্ধতা রক্ষণে অনুলেখনের যত্ন মোটেই নাই।

আত্রেয় বলেন :

৬ ধূলিকণা=১ মিরচ (মোরিচি ?)

৬ মিরচ=১ শরিষা বীজ

৮ শরিষা বীজ=১ রক্ত তণ্ডুল

২ রক্ত তণ্ডুল=১ চনক (মটর কলাই)

২ চনক=১ আন্দি='১/৪ দানক'

(৭ দানক, ১ দিরহামের সমান)

৪ আন্দি=১ মাসা

৮ মাসা=১ 'ঝন' (চানা ?)

২ 'ঝন (?)=১ কর্ষ (অথবা দুই দিরহাম ওজনের 'সুবর্ণ')

৪ সুবর্ণ=১ পল

৪ পল=১ কুড়ব

৪ কুড়ব=১ প্রস্থ

৪ প্রস্থ=১ অড়হক

৪ অড়হক=১ দ্রোণ

২ দ্রোণ=১ সূর্প

২ সূর্প=১ জনা (?)

ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে হিন্দুরা 'পলে'র ব্যবহার খুব বেশী করে। তবে বিভিন্ন দ্রব্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন প্রকারের 'পল' প্রচলিত আছে। কারও মতে ১ পল ১/১২ মণ ; কেউ বলে এক পল ১৪ মিথ্কালের সমান। কিন্তু মণ ২১০ মিথ্কালের সমান নয়। আবার কেউ বলে একপল ১৬ মিথ্কালের
১২৭ সমান কিন্তু ১ মণ ২৪০ মিথ্কালের সমানও নয়। আবার কারও মতে ১ পল =১৫ দিরহামের সমান কিন্তু তাহলেও ১ মণ ২২৫ দিরহামের সমান নয়। প্রকৃত পক্ষে, পল আর মণের আনুপাতিক সম্পর্ক অন্যরূপ।

আত্রেয় আরও বলছেন : '১ অড়হক–৬৪ পল—১২৮ দিরহাম—১ রত্তল।' কিন্তু ১ আন্দি যদি ১/৮ দানক হয় তাহলে এক সুবর্ণে ৬৪ আন্দি হবে, আর এক দিরহামে ৩২ আন্দি, অর্থাৎ (৮ আন্দি দানকের সমান হলে) ৪ দানক হবে।

এই ৪ দানকের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৮ দানক, কিন্তু ২ দিরহাম হয় না। মাত্র ১ ১/৩ দিরহাম হয়।

অনুবাদ করতে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিলে, এবং তাৎপর্য না বুঝে মতামতের ব্যাখ্যা করতে গেলে, এই রকম বিভ্রাট-ই হয়ে থাকে।

সুবর্ণ আমাদের তিন দিরহামের সমান, এই মতের ওপরে ভিত্তি করে যে প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে ওরা সবাই প্রায় একমত ; অর্থাৎ ওদের মতে—

১ সুবর্ণ=১/৪ পল

১ পল=১২ দিরহাম

১ পল=১/১২ মণ

১ মণ=১৪০ দিরহাম

এর থেকে আমার মনে হয় যে সুবর্ণ আসলে তিন দিরহাম নয়, আমাদের তিন মিথ্কালের সমান।

তাঁর সংহিতায় বরাহমিহির অন্যত্র বলছেন : 'এক গজ ব্যাস ও একগজ উচ্চতা বিশিষ্ট একটি কলস তৈরী করে, তাকে বৃষ্টির মধ্যে বর্ষণ ক্ষান্ত হওয়া

পর্যন্ত রেখে দাও। পাত্রে ২০০ দিরহাম পরিমাণ যত জল সঞ্চিত হবে, তাকে চারগুণ করলে এক অড়হক-এর সমান হবে।'

এ-ও মোটামুটি হিসাব হোল, কারণ বরাহমিহিরের নিজের উক্তি দিয়ে যেমন আমি দেখিয়েছি, এক অড়হক হয়, ওদের কথানুযায়ী, ৭৬৮ দিরহামের সমান, নয়ত, যেমন আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি, ৭৬৮ মিথ্‌কালের সমান হবে।

বরাহমিহিরকে সাক্ষ্য মেনে শ্রীপাল বলছেন যে, ৫০ পল ২৫৬ দিরহাম ও এক অড়হকের সমান হয়। আসলে, বরাহমিহিরের কথাব বুঝতে শ্রীপালের ভুল হয়েছে, কারণ, এই ২৫৬ সংখ্যাটি দিরহামের সংখ্যা নয়, অড়হকের
১২৮ 'সুবর্ণ' সংখ্যা। আর অড়হকের পলসংখ্যাও ৫০ নয়, ৬৪।

ওদের কাছে আমি শুনেছি যে জীবশর্মন এই পরিমাণগুলোর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন

৪ পল = ১ কুড়ব
৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ
৪ প্রস্থ = ১ অড়হক
৪ অড়হক = ১ দ্রোণ
২০ দ্রোণ = ১ খড়ি।

এখানে পাঠকের জানা কর্তব্য যে ১৬ মাসায় এক সুবর্ণ হয় বটে, কিন্তু যব বা গমের ওজনে ওরা চার সুবর্ণে এক পল, এবং জল বা তেলের ওজনে ৮ সুবর্ণে একপল ধরে।

যে যন্ত্রে ওরা দ্রব্যাদি ওজন করে, তা Karistiones (قرسطو نات) এর মত যন্ত্র। এর বাটখারাগুলো নড়ান যায় না; যাতে পাল্লাগুলো ঝোলানো থাকে, কেবল সেইটিই বিভিন্ন রেখা ও চিহ্নের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এই যন্ত্রকে তাই বলা হয়। প্রথম ছত্রে ওজনিক এককের (unit) ১ থেকে ৫ পর্যন্ত এবং তারপর দশের চিহ্ন দেওয়া আছে। দ্বিতীয় ছত্রে এককের দশমাংশ ও ২০, ৩০ ৪০ ইঃ দশ দশকের চিহ্ন দেওয়া আছে।

এরূপ চিহ্ন দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে ওরা বাসুদেবের এই বাক্য উদ্ধৃত করে থাকে: 'আমার পিতৃস্বসা পুত্র' শিশুপালকে বিনাদোষে বধ করব না। এবং তাকে দশ পর্যন্ত ক্ষমা করব। তারপর তার শাস্তি বিধান করব।' গল্পটি আমি পরে বলব।

আল-ফাজারী তার পঞ্জিকাতে পল শব্দটি দিবাদণ্ডের অর্থাৎ মিনিটের ৬০ অর্থে ব্যবহার করেছেন। হিন্দুদের গ্রন্থে কিন্তু আমি এই অর্থে শব্দটির উল্লেখ পাইনি; শব্দটি ওরা গাণিতিক শুদ্ধীকরণের (تعديل) জন্য ব্যবহার করে থাকে।

ওদের আর একটি ওজনের মান আছে, তার নাম 'ভার'। সিন্ধুর বিজয়াভিধানের বিবরণে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি ২০০০ পলের সমান, কেননা ওরা বলে যে এর ওজন পলের ২০×১০০ এবং একটি ষাঁড়ের সমান ভারী।

ওদের ওজন সম্বন্ধে আমি যা পেয়েছি তা এই। আর, শস্য ওজন করার পাত্র দিয়ে লোকে বস্তুর আয়তন ও আকার নির্ণয় করে, যখন পাত্রটি এমনভাবে পূর্ণ করা হবে যে তার বেশী আর তাতে ধরবে না। পাত্রটিও এমন হবে যে অনুরূপ কয়েকটি পাত্রকে শস্য দিয়ে পূর্ণ করলে, প্রত্যেকটি পাত্রেরই ব্যাস,
১২৯ উচ্চতা ও বিন্যাসে বিন্দুমাত্র প্রভেদ হবে না। যদি পাত্রস্থিত দ্রব্য দুটি একই জাতের হয়, তাহলে আয়তনের সমতার সাথে তাদের গুরুত্বের সমতাও এভাবে নির্ণয় করা যায়। আর যদি ভিন্ন জাতের হয় তাহলে কেবল তাদের আয়তনের সমতাই পাওয়া যায়।

ওদের এই রকম ওজন করার একটি পাত্রের নাম 'সিবি (বিসি ?)। এই নামটি আমি কান্যকুব্জ থেকে সোমনাথ পর্যন্ত সকলের মুখেই শুনেছি। কান্যকুব্জের লোক এর মাপের ধারা এইভাবে বলে :

৪ কুড়ব = ১ সিবি (?)

৪ সিবি (?) = ১ প্রস্থ

সোমনাথের লোক কিন্তু অন্যভাবে হিসাব করে :

১৬ সিবি = ১ পত্থ (? পন্তি ?)

১২ পত্থ = ১ মুরা

আবার অন্য আর একজনের মতে :

৪ মণ = ১ সিবি

১২ সিবি = ১ কলসি

এই লোকটির ইঙ্গিত মতে কিন্তু গমের ওজনে একমণ প্রায় পাঁচ মণের সমান হয়। তাহলে, এক সিবিতে ২০ মণ হয়। এই সিবি খারিজ্‌ম (Khwarizm)-এর পুরাতন 'সুখখ' মাপের ন্যায় এবং কলসীও তাহলে 'গুর' (Ghur) এর সমান দাঁড়ায়, কারণ ১২ 'গুর' এক 'সুখখ' হয়।

রেখার দ্বারা দূরত্ব ও উচ্চভূমির সাহায্যে সমতল নির্ণয় করাকে ক্ষেত্রমিতি বলে। সমতলকে (plane) খন্ডে খন্ডে মাপাই প্রশস্ত। কিন্তু রেখা (line) ধরে মাপলেও একই ফল পাওয়া যায়। কারণ রেখা দিয়ে সমতলের সীমা নির্দিষ্ট করা যায়। বরাহমিহিরের উক্তি অনুসরণ করে, আমি যবের ওজন প্রসঙ্গে এসে ওজনের মানের আলোচনায় চলে গিয়েছিলাম এবং দ্রব্যের গুরুত্ব নির্ধারণে প্রমাণ হিসাবে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করেছিলাম। এখন আবার আমি বরাহমিহিরের উক্তিতে ফিরে যাচ্ছি এবং দূরত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতামত উদ্ধৃত করছি।

বরাহমিহির বলছেন :

পাশাপাশি রক্ষিত ৮ যব=১ অঙ্গুলি

৪ অঙ্গুলি=১ রাম, অর্থাৎ মুষ্ঠি

২৪ অঙ্গুলি=১ হস্ত, অর্থাৎ গজ,

একে দন্তও বলা হয়।

৪ গজ=১ ধনু (arc)

৪০ ধনু=১ লম্ব

১৩০ ২৫ লম্ব=১ ক্রোশ

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১ ক্রোশ ৪০০০ গজের সমান। আমাদের মাইলও ঐ পরিমাণ গজের সমান; অতএব ১ মাইল—১ ক্রোশের সমান। ইউনানী পোলিশ তাঁর সিদ্ধান্তেও বলেছেন, ১ ক্রোশে ৪,০০০ গজ হয়।

১ গজ দুই মিক্কিয়াস (দূরত্ব পরিমাপের মান বিশেষ) বা ২৪ অঙ্গুলের সমান; কারণ হিন্দুরা 'শঙ্কু' নামক ওদের 'মিক্কিয়াস'-এর দৈর্ঘ্য বিরহ অঙ্গুলি দিয়ে প্রকাশ করে। আমরা যেমন মিক্কিয়াসের ১/২৪ ভাগকে অঙ্গুলি বলি, ওরা তেমন বলে না। ওদের মিক্কিয়াস' সব সময়েই এক বিঘত হয়। এই বিঘত, যাকে ওরা 'বিতস্তি' কিম্বা 'কিস্কু' বলে, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মধ্যবর্তী বিস্তারিত করতলের দৈর্ঘ্যের নাম। তেমনই, বিস্তারিত করতলের অঙ্গুষ্ঠ ও চতুর্থ অঙ্গুলির দূরত্বকে 'গোকর্ণ' বলা হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর এই রকম দূরত্বকে 'কুরভ' (কুম্ভ ?) বলা হয়, যা বিঘতের এক-তৃতীয়াংশ। মধ্যাঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠের দূরত্বকে 'তাল' বলা হয়। ওরা মনে করে যে মানুষ দীর্ঘকায় বা খর্বকায় যাই হোক না কেন, তার 'তালের' আটগুণের বেশী উঁচু সে হতে পারে না। যেমন অনেকে বলে থাকে যে মানুষের 'পা' তার দৈর্ঘের ১/৭ ভাগ হয়।

বিগ্রহ নির্মাণ সম্বন্ধে 'সংহিতায় বলা হয়েছে : "করতলের প্রস্থকে ৬, আর দৈর্ঘ্যকে ৭ ধরা হয়েছে, আর মধ্য ও চতুর্থ অংগুলির দৈর্ঘ্যকে ৫, তর্জনীর ৪$\frac{1}{2}$ আর কনিষ্ঠাঙ্গুলির ৩$\frac{1}{2}$ ধরা হয়েছে। অঙ্গুষ্ঠের দৈর্ঘ মধ্য অংগুলির দৈর্ঘের দুই তৃতীয়াংশ, ($\frac{2}{3}$ = ৩$\frac{1}{3}$), অর্থাৎ শেষের দুইটি অংগুলির দৈর্ঘের সমান হবে।"

১৩১ এখানে উল্লিখিত মাপ ও সংখ্যাগুলো অবশ্য বিগ্রহ অঙ্গুলির হিসাবে ধরা হয়েছে।

ক্রোশ যে আমাদের মাইলের সমান, তা বোঝার পর যোজন নামক দূরত্ব জ্ঞাপক ওদের আর একটি মাপের কথা পাঠকের জানা কর্তব্য। ১ যোজন, ৮ মাইল, বা ২০০০ গজের সমান। কেউ মনে করতে পারে যে এক ক্রোশ 'ফারসাখের' (Farsakh) এক চতুর্থাংশ, এবং হিন্দুদের Farsakh সে হিসাবে ১৬০০০ গজ। ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। কারণ ১৬০১০ গজে অর্ধ যোজন হয়। এই মাপ অনুসারেই, যাকে তিনি (Jun) 'জুন' বা বহুবচনে 'আজওয়ান বলেছেন, আল ফাজারী (Alfazari) তাঁর জ্যোতিষ পঞ্জিকাতে পৃথিবীর পরিধি নির্ধারণ করেছেন।

যে প্রাথমিক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে হিন্দুরা বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ে গাণিতিক প্রক্রিয়া স্থির করেছে তা হচ্ছে এই যে পরিধি বৃত্তের ব্যাসের তিনগুণ। সূর্য-চন্দ্রের ব্যাসের যেমন বর্ণনা করে মৎস্যপুরাণ বলেছে : "পরিধি ব্যাসের তিনগুণ।" সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ সমূহের প্রস্থের যোজন সংখ্যা উল্লেখ করে আদীত্য পুরাণেও বলা হয়েছে : 'পরিধি ব্যাসের তিনগুণ।' 'বায়ু পুরাণে'ও এই কথা আছে।

পরবর্তীকালে অবশ্য, পরিধি যে ব্যাসের তিনগুণের চেয়ে কিছু ভগ্নাংশ বেশী সে সম্বন্ধে হিন্দুরা অবহিত হয়েছে। ব্রহ্মগুপ্তের মতে, পরিধি ব্যাসের ৩$\frac{1}{6}$ গুণ। কিন্তু এই অংশটি তিনি এক ভিন্ন পদ্ধতিতে পেয়েছেন। "যেহেতু ১০ এর মূল (root) প্রায় $\frac{1}{6}$, সে হেতু ব্যাসের সাথে পরিধির সম্পর্কেও একের সাথে ১০ এর মূলের সম্পর্কের সমান।" সেজন্য তিনি ব্যাসের পরিমাণকে সেই পরিমাণের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে, গুণ ফলকে আবার ১০ দিয়ে গুণ করে এই শেষ গুণফলের মূল বের করেছেন। পরিধিটি তখন ঘন (Solid), অর্থাৎ দশের মূল সংখ্যার ন্যায় পূর্ণ সংখ্যক (integer) হয়।

এ পদ্ধতিতে কিন্তু ভগ্নাংকের (fraction) সংখ্যাটি অযথা বড় হয়ে যায়। Archimedes এই ভগ্নাংককে $\frac{1}{7}$ ও $\frac{10}{71}$ এর মাঝামাঝি স্থির করেছিলেন।

আর্যভট্টের সমালোচনা করে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন যে, আর্যভট্ট পরিধির পরিমাণ ৩৩৯৩ স্থির করেছেন; ব্যাসের পরিমাণ তিনি একবার ১০৮০, আর একবার ১০৫০ স্থির করেছেন। আর্যভট্টের প্রথম উক্তি অনুযায়ী ব্যাসের সঙ্গে পরিধির
১৩২ আনুপাতিক সম্বন্ধ (ratio) ১ : ৩$\frac{১৭৭}{১২৫০}$ র মত হয়। এই ($\frac{১৭৭}{১২৫০}$) ভগ্নাংশটি $\frac{১}{৭}$ থেকে $\frac{১}{৫৭}$ পরিমাণ কম। আর্যভট্টের দ্বিতীয় উক্তিটি যে ভুল তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ভুল লিপিকারের, গ্রন্থকারের নয়, কারণ তার গণনানুযায়ী, ব্যাস ও পরিধির সম্বন্ধ ১ : ৩ এর চেয়ে সামান্যই বেশী হয়।

পোলিসও তাঁর গণনায় এই সম্বন্ধ, ১ : ৩$\frac{১৭৭}{১২৫০}$, ব্যবহার করেছেন। আর্যভট্টের গণনাতে যেমন, এই ভগ্নাংক-ও $\frac{১}{৭}$ থেকে $\frac{১}{৫৭}$ পরিমাণ কম।

হিন্দু সংবাদদাতার কাছ থেকে শুনে, ইয়াকুব বিন তারিক তাঁর 'গ্রহ পরিচয়' নামক গ্রন্থে রাশিচক্রের যে প্রাচীন মতবাদ উল্লেখ করেছেন তার থেকেও এই অনুপাত (ratio) পাওয়া যায়, যথা রাশিচক্রের পরিধি ১২৫, ৬৬৪০০০০ আর ব্যাস ৪০,০০,০০,০০০ যোজন। এই সংখ্যা দুটির যে আনুপাতিক সম্বন্ধ দাঁড়ায় তা হচ্ছে ১ : ৩$\frac{৫৬৬৪০০০০}{৪০০০০০০০০}$। ৩২০,০০০'র ভাজক দিয়ে এই দুই সংখ্যাকে কমিয়ে আনলে আমরা লব (numerator) ও হর (denominator) যথাক্রমে ১৭৭ ও ১২৫০ পাই। পোলিস এই $\frac{১৭৭}{১২৫০}$ ভগ্নাংকই গ্রহ করেছেন।

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতীয়দের বর্ণমালা, সংখ্যা-চিহ্ন ও কতিপয় অদ্ভুত রীতি

জিহ্বা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেয়। জিহ্বার এ কাজের স্থিতি কিন্তু সাময়িক। মুখে মুখে অতীতের কাহিনী পরবর্তী যুগের লোকের কাছে পৌঁছান সম্ভব নয়—বিশেষ করে যদি এই দুই কালের মধ্যবর্তী ব্যবধান দীর্ঘ হয়। মানুষের উদ্ভাবিত লিখন পদ্ধতির সাহায্য ব্যতিরেকে তা কখনই সম্ভব নয়। এই পদ্ধতি দেশে দেশে ও কালে কালে বায়ুবেগে, মৃত আত্মার ব্যাপ্তির মত, সংবাদ প্রচার করে থাকে। সমস্ত প্রশংসা
১০৩ সেই সৃষ্টার ও মঙ্গলময় সর্বনিয়ন্তার।

হিন্দুরা, প্রাচীন গ্রীকদের মত চর্মে লিখতে অভ্যস্ত নয়। তিনি কেন পুস্তক লেখেন না জিজ্ঞাসিত হলে, Socrates উত্তর দিয়েছিলেন "মানুষের জীবন্ত মন থেকে, জ্ঞানকে মৃত পশুর চর্মে স্থানান্তরিত করার আমি পক্ষপাতী নই।" ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানেরাও চর্মে লিখত, যেমন খায়বরের ইহুদীদের সাথে হজরতের সন্ধি, কিংবা পারস্যের সম্রাটকে লিখিত তাঁর পত্র। কোরআনও সেকালে হরিণের চামড়ায় লেখা হত। এখনও এই চামড়ায় Torah লেখা হয়। কোরআনে আছে:—"ওরা তাকে 'করাতিসে' পরিণত করল"—অর্থাৎ কাগজের স্তূপে পরিণত করল। 'করাতিস' কিরতাস শব্দের বহুবচন। কিরতাস, মিসর দেশের Papyrus নামক উদ্ভিদের ভিতরের শাঁস ফেলে দিয়ে তার বাইরের ছাল থেকে তৈরী হয়। আমাদের যুগ পর্যন্ত খলীফাদের ঘোষণা ও নির্দেশাদি এই কিরতাসে লিখিত হয়েই জারি হত, কারণ Papyrus এ লিখিত অক্ষর বদলান বা মুছে ফেলা যায় না, তা করলে Papyrus নষ্ট হয়ে যায়। কাগজ চীনাদের আবিষ্কার। কয়েক জন চীনা বন্দী Samarkand-এ প্রথম কাগজ তৈরী করা আরম্ভ করে; পরে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মত কাগজ তৈরী হতে থাকে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে খর্জুর ও নারিকেলের মত খাদ্যোপযোগী ফলবান একপ্রকার গাছ হয়, যার পাতা প্রায় ১ গজ দীর্ঘ ও তিন অঙ্গুলি পরিমাণ প্রশস্ত। এই পাতাকে ওরা 'তাড়ি' (Toddy) বলে ও তাতেই ওরা

লেখে। এই 'তাড়ি'তে লেখা পুস্তকের মধ্যে ছিদ্র করে তাতে সুতো পরিয়ে ওরা পত্রগুলির পারম্পর্য রক্ষা করার জন্য বেঁধে রাখে। মধ্য ও উত্তর ভারতের লোকেরা 'তুয' (تُوز) নামক একরকম গাছের ছাল ব্যবহার করে। এই গাছেরই এক বিশেষ প্রকারের ছাল ওরা ধনুকের খাপের জন্যও ব্যবহার করে থাকে। এই গাছকে ওরা ভুচ (ভূর্জ) বলে। দুই হাত দীর্ঘ ও প্রায় এক বিঘৎ পরিমাণ চওড়া এক খণ্ড ছালকে ওরা তেল দিয়ে ঘসে দৃঢ় ও মসৃণ করে, তারপর তাতে লেখে। পাতাগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে বলে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে তাদের পারম্পর্য ঠিক রাখা হয়। সমস্ত পুস্তকটিকে তারপরে বস্ত্রখণ্ডে জড়িয়ে দুইটি কাষ্ঠ ফলকের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়। এই প্রকারের
১৩৪ পুস্তককে ওরা 'পুথি' বলে। চিঠিপত্র বা অন্য যা কিছু লেখার প্রয়োজন হয় সবই ওরা এই 'তুয'-এর ছালে লেখে।

ওদের বর্ণমালা সম্বন্ধে পূর্বেই আমি বলেছি যে একবার এইগুলি হারিয়ে যাওয়াতে লোকে সমস্ত ভুলে গিয়েছিল, এবং কেউ স্মরণ করার চেষ্টাও করেনি। তার ফলে সবাই নিরক্ষর হয়ে থাকে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ না থাকাতে তাদের মূর্খতা বেড়েই চলে। তখন পরাশর-পুত্র ব্যাস, ঈশ্বর প্রেরণায় পঞ্চাশ অক্ষরের একটি বর্ণমালা উদ্ভাবন করলেন। ওদের ভাষায় বর্ণের নাম 'অক্ষর'।

কেউ কেউ বলে, প্রথমে ওদের বর্ণের সংখ্যা অল্প ছিল, পরে বেড়েছে। তা হওয়া সম্ভব, বরঞ্চ উচিত। কেননা ইসরাইল বংশীয়রা যখন মিসরে রাজত্ব করছিল, Asidas (اسیدس) নামক একটি লোক বিজ্ঞানের তথ্যকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য ১৬ অক্ষরের একটি লিপিমালা উদ্ভাবন করে, পরে Kimush (قِيمُوش) ও Agenon (أغنون) সেই বর্ণমালাটি ইউনানীদের কাছে নিয়ে আসে। ইউনানীরা তাতে আরও চারটি বর্ণ জুড়ে ২০ অক্ষরের বর্ণমালা তৈরী করে। আরও কিছুকাল পরে Socrotes-কে বিষপান করাবার প্রায় কাছাকাছি সময়ে simonides তাতে আরও চারটি অক্ষর বাড়ায়। এইভাবে এথেনীয়দের ২৪ অক্ষরের বর্ণমালাটি সম্পূর্ণ হয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে, Cyrus-এর প্রপৌত্র Artaxerxes-এর রাজত্বকালে এথেনীয় বর্ণমালার এই সম্পূর্ণতা সাধিত হয়।

হিন্দুদের অক্ষরের সংখ্যা অনেক। তার কারণ, স্বর, হস্, বিসর্গ বা হ্রস্ব স্বর প্রকাশ করার জন্য ওরা ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ব্যবহার করে থাকে। আরও একটি

কারণ এই যে ওদের এমন সব ব্যঞ্জনবর্ণ আছে যার যুক্ত ধ্বনিরূপ আর অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় না, যদিও অন্যান্য ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে সেগুলি পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলি আবার এমন যে, অনভ্যাসের দরুন আমাদের জিহ্বা সেগুলিকে কচিৎ উচ্চারণ করতে পারে এবং আমাদের কানও সমজাতীয় এইরূপ দুটি ধ্বনির পার্থক্য ধরতে পারে না। ইউনানীদের মত ভারতীয়রাও বাম থেকে দক্ষিণে লেখে। আরবীর মত ওরা রেখার অনুসরণ করে লেখে না। আরবী লিপিতে যেমন এক কাল্পনিক রেখার অনুসরণ করা হয় অক্ষরের ঊর্ধ্বভাগ যার উপরে আর নিম্নভাগ যার নীচে থাকে, হিন্দুরা
১৩৫ তেমন কোন রেখার অনুসরণ করে না। ওদের রীতি ভিন্ন। মূল রেখাটি প্রত্যেক অক্ষরের উপরে সরলভাবে টানা থাকে; এই রেখা থেকে অক্ষরগুলি নীচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় লিখিত হয়। রেখার উপরে যদি কোন চিহ্ন দেওয়া হয় ত' সে চিহ্ন অক্ষরটির ব্যাকরণিক উচ্চারণ নির্দিষ্ট করার জন্য মাত্র।

ওদের সবচেয়ে প্রচলিত বর্ণমালার নাম হচ্ছে 'সিদ্ধ মাত্রিক'। একে সচরাচর কাশ্মীরী বলা হয়, কারণ এর ব্যবহার কাশ্মীরেই হয়ে থাকে। অবশ্য বারাণসীতেও এর প্রচলন আছে। বারাণসী ও কাশ্মীর হিন্দু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিশেষ। 'সিদ্ধ মাত্রিক' বর্ণমালা মধ্য দেশেও ব্যবহার হয়। 'মধ্য দেশ' কণৌজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, যার আর একনাম 'আর্যবর্ত'। মালব অঞ্চলে 'নাগর' নামে আর এক বর্ণমালা আছে। প্রথমোক্ত বর্ণমালার সাথে এর প্রভেদ কেবল আকৃতিগত। তারপর 'অর্ধনাগরী' লিপির উল্লেখ করতে হয়। 'সিদ্ধ মাত্রিক' ও 'নাগরের' মিশ্রণ বলে একে অর্ধনাগরী বলা হয়। 'ভাটিয়া' ও 'সিন্ধুর কয়েকটি অঞ্চলে এর ব্যবহার প্রচলিত আছে।

অন্যান্য লিপিমালার মধ্যে দক্ষিণ সিন্ধুর সমুদ্রোপকূলবর্তী 'মালকাসাও-এ' (? صاقشو) প্রচলিত 'মালক্কারী' (Malwari ?), 'বাহমানওয়া' (Bahmanabad) কিংবা আলমানসুরার সৈন্ধব, কর্ণাট দেশের, যেখান থেকে কন্নাড়া নামক সৈন্যরা আসে, 'কর্ণাট' লিপি, 'অন্তর দেশের' (অন্ধ্র দেশ) 'অন্দ্রি (? অন্ধ্রি), দিওয়ার' দেশে ব্যবহৃত 'দিরওয়ারি' (?), লাড় (লাট) দেশের 'লারি' (লাটি) পূর্ব দেশে প্রচলিত 'গৌড়ী' ও উদুনপুরে (উদন্তপুর) প্রচলিত 'বৈকসুক' (Baikshuki ?) প্রভৃতির নাম করা যায়। শেষোক্ত লিপিটি বৌদ্ধদের।

আমরা যেমন 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করি তেমনি হিন্দুদের গ্রন্থ সূচনা হয় 'ওম' অর্থাৎ সৃষ্টি-ধ্বনি দিয়ে। 'ওমের' রূপ এই ঌ। এটি

কোন অক্ষর নয় 'ওম' শব্দের নির্দিষ্ট সংকেত মাত্র, ভগবানের নিগুর্ণতার পুণ্যাত্মক স্মারকচিহ্ন। ইহুদীরা যেমন তাদের গ্রন্থ সূচনায় আল্লাহর নাম তিনটি হিব্রু 'ی' দিয়ে লেখে, এও তেমনি। Torah-তে আক্ষরিকভাবে চিহ্নটি
১০৬ লেখা হয় 'YHVH' (يهوه) কিন্তু উচ্চারণ করা হয় 'Adonai (ادونی),
কখনও বা শুধু 'YAH' (يه) পড়া হয়। যে 'Adonai' শব্দ ওরা উচ্চারণ করে, লিপিতে তা লেখা হয় না।

আমরা যেমন সংখ্যা লিখতে হিব্রু বর্ণমালার বিন্যাস অনুযায়ী আরবী অক্ষর ব্যবহার করে থাকি, হিন্দুরা তেমন করে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন আকৃতির অক্ষর প্রচলিত আছে, তেমনই 'অংক' নামিত সংখ্যাচিহ্নগুলিও বিভিন্ন প্রকারের আছে। আমরা যে সংখ্যাচিহ্নগুলি ব্যবহার করে থাকি তা হিন্দুদের শ্রেষ্ঠতম চিহ্ন থেকে গৃহীত। কিন্তু চিহ্নের অর্থ না জানা থাকলে তার ব্যবহারে কোন লাভ নাই। কাশ্মীরের লোকেরা তাদের পুস্তকের পত্রসংখ্যা একরকম চিহ্নে নির্দেশ করে যা ছবি কিংবা চীনা অক্ষরের মত দেখতে। অভ্যাস ও চর্চা না করলে তার অর্থ বোঝা যায় না। এরূপ চিহ্ন কিন্তু বালুতে গণনা করার জন্য ব্যবহার করা যায় না।

সমস্ত মানব জাতিই এ বিষয়ে একমত যে, অংকশাস্ত্র দশক সংখ্যাগুলির ক্রমবিন্যাস ১০-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (১০,১০০,১০০০ ইঃ), অর্থাৎ প্রত্যেকটি দশক তার পরবর্তী দশকের দশভাগের একভাগ, আর পূর্ববর্তীর দশগুণ। বিভিন্ন ভাষাভাষী যে সব লোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে, তাদের সঙ্গে সংখ্যাবিন্যাস আলোচনা করে জেনেছি যে আরবদের মত সহস্রের উর্ধ্বে কেহই যায় না। এ নিয়মটিই সবচেয়ে ঠিক ও স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধও রচনা করেছি।

হিন্দুদের কিন্তু সহস্রোর্ধ্ব সংখ্যাগুলির পৃথক নাম আছে। সে নামে কতকগুলি হয় স্বতন্ত্র শব্দরূপে উদ্ভাবিত, নয়তো ব্যাকরণ রীতিতে গঠিত, আর কতকগুলি এই দুই রীতির সংমিশ্রণে স্থিরীকৃত। অংকশাস্ত্রের প্রয়োজনে ওরা সংখ্যার দশক বিন্যাসকে আঠার পদ পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই কাজে বৈয়াকরণিকরা গাণিতিককে শব্দ ও ধাতুরূপের নানা তথ্য ও প্রক্রিয়া দিয়ে সাহায্য করে।

১০৭ অষ্টাদশ পদের নাম হচ্ছে পরার্ধ, অর্থাৎ আকাশের অর্ধেক। আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে তার অর্থ হয়, উর্ধ্বে যা আছে তার অর্ধেক। তার ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয় যে, যেহেতু ওরা 'কল্পের' অংশ দিয়ে সময়ের ভাগ

নির্ণয় করে, সেহেতু এক কল্পে ঈশ্বরের এক দিবস হয়। আকাশের উপরে আর কিছুই নাই, সেজন্য তার চেয়ে বড় আর কোন আকারই হয় না। এই আকাশের অর্ধেক তাহলে দীর্ঘতম দিবসেরও অর্ধেক হবে।

এই দিবসের সাথে রাত্রি যোগ করে, এই অর্ধেক আকাশকে দ্বিগুণ করলে তা দীর্ঘতম, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিবসের সমান হবে। এই যুক্তিতেই যে পরার্ধের অর্থ করা হয় তাতে সন্দেহ নাই। 'পরার্ধের' শব্দগত অর্থও হচ্ছে সমগ্র আকাশ।

দশকের অষ্টাদশ পদের নামগুলি এই :

১ একম্	১০ পদ্ম
২ দশম	১১ খর্ব
৩ শতম্	১২ নিখর্ব
৪ সহস্রম্	১৩ মহাপদ্ম
৫ অযুত	১৪ সংখ্যা
৬ লক্ষ	১৫ সমুদ্র
৭ প্রযুত	১৬ মধ্য
৮ কোটি	১৭ অন্ত্য
৯ নর্বদ	১৮ পরার্ধ

এই বিন্যাস নিয়ে মতভেদও আছে। কেউ কেউ বলেছে যে 'পরার্ধের' পরও 'ভূরী' নামে আর একটি উনিশতম পদ আছে এবং গণনায় এইটিই হচ্ছে শেষ সীমা। কিন্তু আসলে গণনার তো আর শেষ নাই; কেবল সংখ্যা বিন্যাসের সীমা আছে, তাও কেবল ক্রমিকতার (order) সর্বস্বীকৃত সীমা। এখানে ব্যবহৃত 'গণনা' শব্দের দ্বারা ওরা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যার নাম বোঝাতে চায়, অর্থাৎ ওরা বলতে চায় যে উনিশটি পদের চেয়ে বেশী বিস্তৃত কোন সংখ্যার নাম করা যায় না। জানা আছে যে এই উনবিংশতি পদ, অর্থাৎ 'ভূরী' হচ্ছে দীর্ঘতম দিবসের এক পঞ্চমাংশের সমান। তবে সে বিষয়ে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য শ্রুতি নাই। যা আছে তা শুধু কল্পদিবসকে ভাগ করার নিয়ম সম্বন্ধে, যা আমি পরে বর্ণনা করছি। কাজেই, এই উনবিংশতি পদটি কষ্টকল্পিত যোজনা বই আর কিছু নয়।

১৫৮ আবার অন্যদের মতে 'কোটি' হচ্ছে গণনার শেষসীমা। 'কোটি' থেকে আরম্ভ করলে দশকগুলির ক্রমবিন্যাস এরূপ হবে :—সহস্র, শত ও দশ। এর কারণ, দেবতাদের সংখ্যা 'কোটি' দিয়ে করা হয়। ওরা বলে দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি, ব্রহ্মা, নারায়ণ ও মহাদেব এদের প্রত্যেকের এগার কোটি করে দেবতা।

আমরা পূর্বেই বলেছি, আট পদের ঊর্ধ্বে যে নামগুলি আছে তা সবই বৈয়াকরণিকদের উদ্ভাবিত। পঞ্চম ও সপ্তম পদের সাধারণ নাম দশ সহস্র ও দশ লক্ষ। 'অযুত' ও 'প্রযুত' ক্বচিৎ ব্যবহার করা হয়।

কুসুমপুরের আর্যভট্ট দশ সহস্র থেকে কোটি পর্যন্ত পদগুলির এই নাম দিয়েছেন:—'অযুতম', 'নিযুতম', 'প্রযুতম', 'কোটিপদ্ম', 'প্রপদ্মম'। কেউ কেউ আবার নাম সাদৃশ্যের জন্য পদকে পর পর বসায়; যেমন, পঞ্চম পদের নাম 'অযুত' বলে ষষ্ঠ পদকে 'নিযুত' বলে, নবম পদ 'নর্বুদ', সেইজন্য অষ্টম পদ 'অর্বুদ'; একাদশ ও দ্বাদশ পদ 'খর্ব' ও 'নিখর্ব' এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পদ 'সংখ্য' ও 'মহাসংখ্যে'র মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্যগত পারম্পর্য আছে। এই রীতি অনুযায়ী 'মহাপদ্ম' 'পদ্মের' পরই বসান আছে।

এ সব মতভেদের যুক্তি বোঝা যায়। কিন্তু যার মধ্যে কোন যুক্তি নাই এমন অনেক মতানৈক্যও আছে, যা পারম্পর্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল নাম উল্লেখ করে যাওয়ার দরুন কিংবা 'আমি জানি না' বলতে অনিচ্ছার দরুন ঘটেছে। কোন বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করা ভারতীয়দের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন।

'পৌলিশ-সিদ্ধান্ত' সংখ্যার পদবিন্যাসের এই তালিকা দিয়েছে:—

৪। সহস্রন্	৮। কোটি
৫। অযুতন্	৯। অর্বুদন্
৬। নিযুতন্	১০। খর্ব
৭। প্রযুতন্	

১০৯ এরপর পদগুলির বিন্যাস পূর্বোক্ত পারম্পর্য অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

অঙ্কের চিহ্নগুলি (numerals) ওরা আমাদের মতই ব্যবহার করে। এ বিষয়ে ওরা আমাদের চেয়ে কত অগ্রবর্তী তা দেখানর জন্য আমি একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে হিন্দুরা ওদের সমস্ত গ্রন্থই শ্লোকে রচনা করে। পঞ্জিকা ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য ওরা যখন একাধিক পদের কোন সংখ্যা উল্লেখ করতে চায়, তখন এমন শব্দ বা বাক্য দিয়ে সে সংখ্যাগুলি প্রকাশ করে যা দশক বা শতক উভয় পদের সংখ্যাতেই প্রযোজ্য হতে পারে। প্রত্যেক সংখ্যার জন্য ওরা অনেকগুলি শব্দ বা বাক্য স্থির করে নিয়েছে। তার মধ্যে একটি যদি ছন্দের উপযোগী না হয় তাহলে অন্য একটি প্রতিশব্দ সহজেই সেখানে ব্যবহার করা চলে। ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন:—"এক লিখতে হ'লে এমন শব্দ দিয়ে তা প্রকাশ কর যা একক, যেমন পৃথিবী, চন্দ্র

ইত্যাদি। দুই সংখ্যা বোঝাতে হলে জোড়াবস্তুর উল্লেখ করে তা প্রকাশ কর; যেমন সাদা-কালো। তিন লিখতে হলে তিন সংখ্যক বস্তুর নাম দিয়ে তা প্রকাশ কর। শূন্যকে আকাশ, আর ১২কে সূর্যের নাম দিয়ে প্রকাশ কর।"

এই রকম নাম যা ওদের কাছে শুনেছি তার একটি তালিকা নীচে দিচ্ছি। ভারতীয়দের জ্যোতিষ পঞ্জিকাদি বুঝতে হলে সংখ্যাবাচক এই শব্দগুলি বোঝা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ আমি জানি না। আল্লাহর অনুগ্রহে সেগুলির অর্থ জানতে পারলে পরে লিখব।

১৪০

০—শূন্য (Zero)	০ ও খ—উভয় চিহ্নের অর্থ বিন্দু গগন—আকাশ 'বিয়াত'—,, অম্বর— ,, অভ্র— ,, আকাশ পুনর্বসু
১—এক	আদি— সূচনাকারী শশী—চন্দ্র ইন্দু—,, সীতা—উর্বর, ধরণী পিতামহ—আদিপিতা চন্দ্র শীতাংশু—চন্দ্র রূপা রশ্মি
২—দুই	যমু আশ্বিন লোচন—চক্ষুদ্বয় অক্ষ দস্র (?) যমল পক্ষ—মাসার্ধ নেত্র—চক্ষুদ্বয়

৩—তিন

ত্রিকাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান
ত্রিজগৎ
ত্রয়ম
'পাবক,' বৈশ্বানর, দহন, তপন, হুতাশন, জ্বলন, অগ্নি
ত্রিগুণ—(সত্য-রজঃ-তম)
লোক—স্বর্গ, মর্ত, পাতাল
ত্রিকূট

৪—চার

বেদ—চারি খণ্ডে বিভক্ত হিন্দুদের গ্রন্থ
সমুদ্র, সাগর
অবধি
দধি
দিস—চতুর্দিক
জলাশয়
কৃতা

১৪১

৫—পাঁচ

সর
অর্থ
ইন্দ্রিয়—পঞ্চেন্দ্রিয়
শায়ক
'এখুন' (اخون)
বাণ
ভূত
ইশু (?)
পাণ্ডু—পঞ্চপাণ্ডব
পবিত্র, মার্গন (?)

৬—ছয়

রস
অঙ্গ
ষট
"অলব্রম" (البرم ?)—বর্ষ
মাসার্ধম

৭—সাত	অগ (?) মহিধর পর্বত সপ্তম নাগ—পর্বত অদ্রি মুনি
৮—আট	বসু ধী গজ দন্তিন্ অষ্ট মঙ্গল নাগ
৯—নয়	গো নন্দ রন্ধ্র নবম—৯ ছিদ্র পবন অন্তর
১৪২ ১০—দশ	দিক আশা খেন্দু (?) রাবণ শির
১১—এগার	রুদ্র—সৃষ্টি ধ্বংসী মহাকাল ঈশ্বর মহাদেব—দেবরাজ অক্ষৌহিণী—কুরু সৈন্য

	১২—বার	সূর্য—কেননা সূর্যের সংখ্যা ১২ অর্ক—সূর্য ভানু আদিত্য—ঐ মাস সহস্রাংশু
	১৩—তের	বিশ্ব
	১৪—চৌদ্দ	মনু—চৌদ্দ মন্বন্তরের আদি পুরুষগণ
	১৫—পনের	তিথি—প্রতি মাসার্ধের চান্দ্র দিবস
	১৬—ষোল	অষ্টি নৃপ ভূপ
	১৭—সতের	অত্যি অষ্টি (অত্যষ্টি?)
১৪৩	১৮—আঠার	ধৃতি
	১৯—উনিশ	অতিধৃতি
	২০—কুড়ি	নখ কৃতি
	২১—একুশ	উৎকৃতি
	২২	
	২৩	
	২৪	
	২৫—পঁচিশ	তত্ত্ব—যে ২৫টি তত্ত্বের জ্ঞান হলে মোক্ষ লাভ হয়।

যতদূর আমি দেখেছি ও শুনেছি, শব্দ দিয়ে সংখ্যার প্রতীক রচনায় এরা ২৫ এর উর্ধ্বে যায় না।

১৪৪ ওদের কতগুলি অদ্ভুত রীতি এবারে বর্ণনা করব। তার আগে কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে কদাচিৎ ঘটে আর দেখার সুযোগ অল্প বলেই আমাদের চোখে এগুলি অদ্ভুত ঠেকে। এই বিরলতা আরও বেশী হলে সেগুলি

আশ্চর্য বা অনন্যসাধারণ, এমনকি চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত অবিশ্বাস্য ও উদ্ভট ঘটে বলে মনে হবে। আমাদের সঙ্গে এ যুগের হিন্দুদের অনেকগুলি প্রথার এত প্রভেদ আছে যে, আমাদের চোখে সেগুলি মানব রীতির বহির্ভূত বলে মনে হয়। আমাদের মনে হতে পারে যে, ওরা যেন ইচ্ছা করেই এইসব পৃথক রীতি অবলম্বন করেছে। কারণ, আমাদের অভ্যাস ও আচরণগুলি তো ওদের সঙ্গে মেলেই না বরং বহু ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত; আর যদিও বা এক-আধটা রীতি আমাদের মতন থেকে থাকে, তার কারণ, বা উদ্দেশ্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ওদের রীতির মধ্যে একটি হচ্ছে যে ওরা শরীরের কোন কেশ ছেদন করে না। অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য ওরা এককালে উলঙ্গ থাকত, তখন কেশ দিয়ে সূর্যের তাপ থেকে মস্তক রক্ষা করত। গুম্ফের শোভা বর্ধনের জন্য ওরা তাতে তাও দেয়। জননেন্দ্রিয়ের লোম ওরা পরিষ্কার করে না; কারণ ওদের বিশ্বাস যে তা করলে যৌন উত্তেজনা ও সঙ্গমেচ্ছা প্রবল হয়। সুতরাং যারা সঙ্গমেচ্ছা প্রবলভাবে অনুভব করে তারা সে ইচ্ছা হ্রাস করার জন্য জননেন্দ্রিয়ের লোম কর্তন করে না। ওরা নখ বড় রাখে আর তার অব্যবহারে গর্ব বোধ করে। নখ দিয়ে ওরা কোন কাজ করে না। কেবল আলস্যভরে মস্তক কুণ্ডয়ন করে, আর কেশের উকুন বাছে। ওরা প্রত্যেকে পৃথকভাবে গোময় লিপ্ত স্থানে বসে ভোজন করে; উচ্ছিষ্টের সদ্ব্যবহার করে না এবং ভোজন পাত্রগুলি মাটির হলে সেগুলিকে আহারের পরে ফেলে দেয়। ভোজনের পর পান ও চুনের সাথে গুবাক চর্বণ করে বলে ওদের দাঁত লাল। আহারের পূর্বে ওরা সুরা পান করে। হিন্দুরা গোমূত্র পান করে, কিন্তু গোমাংস খায় না। ওরা কাঠি দিয়ে করতাল বাজায়। পাগড়ীর বস্ত্রকে ওরা পাজামার মত ব্যবহার করে। যারা অল্প পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকে তারা দুই অঙ্গুলি পরিমাণ বস্ত্র দিয়ে শুধু তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে, আর যারা অধিক বস্ত্রের পক্ষপাতী তারা পাজামার (سراویل) জন্য এত বস্ত্র ব্যবহার করে যে তা দিয়ে অনেকগুলি উত্তরীয় ও ঘোড়ার জিনের অন্তর্বাস তৈরী করা চলে। এ পাজামার কোন ছিদ্র (opening) থাকে না। এবং এগুলি এত দীর্ঘ যে পায়ের পাতা দেখা যায় না। এর বন্ধনটি (ইজারবন্দ) পিছনে থাকে। উপরের জামাও পাজামার মত
১৪৫ পিঠের দিকে কাপড়ের বুটির সঙ্গে সুতা দিয়ে আটকান থাকে। স্ত্রীলোকের জামার (কুর্তক) নীচের দিকে, দক্ষিণে ও বামে চেরা থাকে। পায়ের সঙ্গে আটসাঁট করে ওরা পাদুকা পরে এবং তার অগ্রভাগ উপরের দিকে ঈষৎ উল্টান থাকে। স্নান করার সময় ওরা প্রথমে পা ধোয়, পরে মুখ। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে

ওরা স্নান করে। দণ্ডায়মান অবস্থায় দ্রাক্ষাশাখার মত পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ওরা সহবাস করে। হাল চালনা করার মত, স্ত্রী নীচে থেকে উপরের দিকে দেহ আন্দোলিত করতে থাকে, পুরুষ নিষ্ক্রিয় থাকে। পর্বদিতে সুগন্ধির পরিবর্তে ওরা গোময় দিয়ে দেহ অর্চনা করে। প্রসাধন, কর্ণকুন্ডল, হাতে ও পায়ে স্বর্ণাঙ্গুরীয় প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য অলংকারাদি দিয়ে পুরুষরা অঙ্গসজ্জা করে। ন-পুংশক ও স্ত্রী-সঙ্গমে অপারগ লোকদিগকে ওরা কৃপা করে। নপুংশককে 'পুষন্ডিল' বলা হয়। এরা পুরুষাঙ্গকে মুখের মধ্যে নিয়ে তার বীর্য গলাধঃকরণ করে। মলত্যাগের সময় হিন্দুরা কোন দেওয়াল বা বা প্রাচীরের দিকে মুখ করে বসে এবং পশ্চাৎদেশ পথচারীর দিকে খুলে রাখে। ওরা 'লিঙ্গ' অর্থাৎ মহাদেবের পুরুষাঙ্গকে পুজা করে। জিন্ ব্যতি-রেকে ওরা ঘোড়ায় চড়ে; জিন্ দেওয়া থাকলে ঘোড়ার ডান দিক থেকে তার পিঠে চড়ে। যাত্রাকালে ওদের পিছনে কোন অশ্বারোহী থাকা ওরা পছন্দ করে। 'কুঠার' নামক একপ্রকার ছোরা ওরা কোমরের ডানদিকে ঝুলিয়ে রাখে। বাম স্কন্ধ থেকে কটিদেশের দক্ষিণ দিবে ঘোরান 'যজ্ঞ' (যজ্ঞোপবিত) নামক এক-রকম সুতা ওরা পরিধান করে। সমস্ত কর্মে ও সিদ্ধান্তে ওরা স্ত্রীদের পরামর্শ নেয়। শিশুর জন্মকালে ওরা প্রসূতির চেয়ে শিশুর পিতাকে বেশী যত্ন করে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে বেশী আদর করা হয়। কারণ, ওদের বিশ্বাস যে প্রথম সন্তান প্রবল কামোত্তেজনার অনিচ্ছাকৃত ফল, কিন্তু কনিষ্ঠের জন্ম ঐকান্তিক অভিপ্রায় ও স্থিরসংকল্পের ফল। করমর্দন করতে ওরা করতল না ধরে করপৃষ্ঠ ধরে। গৃহে প্রবেশ করতে ওরা অনুমতি নেয় না, কিন্তু গৃহত্যাগ করার সময় অনুমতি চায়। ওরা পা মুড়ে চতুষ্কোণ হয়ে বসে। গুরুজনদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে ওরা থুথু ফেলে, নাক ঝাড়ে এবং সর্বসমক্ষে উকুন মারে। বায়ুত্যাগ করাতে ওরা সুলক্ষণ আর হাঁচিকে ওরা
১৪৬ কুলক্ষণ মনে করে। তাঁতিকে ওরা অস্পৃশ্য বলে কিন্তু ক্ষৌরকার বা যারা পারিশ্রমিক নিয়ে মুমূর্ষ পশুকে জলে ডুবিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে তাদিগকে ওরা স্পৃশ্য মনে করে। পাঠশালায় শিশুরা লেখার জন্য কালো রং-এর একপ্রকার ফলক ব্যবহার করে এবং প্রস্থের দিক না নিয়ে তার দৈর্ঘের দিকে একপ্রকার সাদা জিনিস দিয়ে বাম থেকে দক্ষিণে লেখে। নিম্নের কবিতাটিতে কবি যেন এই হিন্দুদের কথাই বলেছেন :

"কত লেখকই না আছে, যাদের কাগজ কয়লার ন্যায় কালো, যার উপরে সাদা কলম দিয়ে লিখে যায় তাঁতির মত, যেন রাত্রির অন্ধকারকে উজ্জ্বল দিবসের আলো দিয়ে বুনে যাচ্ছে, অথচ একটি পড়েনও তাতে বোনা হচ্ছে না।"

হিন্দুরা পুস্তকের নাম প্রথম পৃষ্ঠায় বা সূচনাতে না লেখে সর্বশেষে লেখে। আরবদের যেমন, বিশেষ্য পদের ক্ষুদ্রতর রূপ বোঝাতে হ'লে সেই পদকে দীর্ঘায়িত করতে হয়, হিন্দুদের ব্যাকরণে তেমনি সেই পদকে দীর্ঘায়িত করতে হয় স্ত্রী-লিঙ্গে পরিণত করে। কেউ কাউকে কোন দ্রব্য দিলে, কুকুরকে যেভাবে কোন জিনিস ছুঁড়ে দেওয়া হয়, গ্রহিতা দ্রব্যটিকে সেইভাবে পাওয়ার প্রত্যাশা করে দু'জন লোক যদি পাশা খেলতে বসে, তৃতীয় আর একজন তাদের মধ্যে বসে, পাশা চালে। কামোদ্দীপ্ত হাতীর গাল বেয়ে যে লালা বা রস পড়ে, ভয়ংকর দুর্গন্ধ সত্ত্বেও ওরা সে লালাকে উপকারী মনে করে।

সতরঞ্চ (দাবা) খেলায় ওরা গজকে পাশাপাশি না চেলে, বোড়ের মত সম্মুখের দিকে এবং মন্ত্রীর মত চারদিকে কেবল একঘর করে চালে। ওরা বলে এই পাঁচটি ঘরে গজের শুঁড় ও চারটি পা থাকে। হিন্দুরা একজোড়া পাশার সাহায্যে চারজন মিলে একসঙ্গে দাবা খেলে। দাবার ছকে ওদের ঘুঁটির বিন্যাস এইপ্রকার:

১৪৭

নৌ	অশ্ব	গজ	রাজা			বোড়ে	নৌ
বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে			বোড়ে	অশ্ব
						বোড়ে	গজ
						বোড়ে	রাজা
রাজা	বোড়ে						
গজ	বোড়ে						
অশ্ব	বোড়ে			বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে	বোড়ে
নৌ	বোড়ে			রাজা	গজ	অশ্ব	নৌ

যেহেতু এ ধরনের দাবা খেলা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই সেজন্য এর যতটুকু আমি জেনেছি তা এখানে বলছি।

ছকের চারদিকে চারজন বসে প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে পাশা দুটি চালে; পাশায় চিহ্নিত সংখ্যাগুলির মধ্যে ৫ ও ৬ এর কোন মূল্য নাই। সেজন্য

পাশার চালে যদি ঐ সংখ্যা দুটি পড়ে তাহলে খেলোয়াড় ৬-এর পরিবর্তে ৪ আর ৫-এর পরিবর্তে ১ ধরে; কেননা পাশার গায়ে ঐ সংখ্যাগুলি এই ভাবে আঁকা থাকে ঃ [illegible] Firzan (queen)-কে এদেশে রাজা বলা হয়। পাশার প্রত্যেক সংখ্যায়, ঘুটি এক ঘর চলতে পারে। ১ সংখ্যা পড়লে, রাজা কিংবা বোড়ে চলতে পারে। এদের চাল, সাধারণ দাবা খেলার চালের মত। রাজাকেও কাটা যায় কিন্তু ছক থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ২ সংখ্যা পড়লে নৌকা চলবে। এর গতি আমাদের দাবা খেলার গজের মত কোণাকুণি; একচালে তৃতীয় ঘরে যেতে পারে। ৩ পড়লে অশ্ব চলবে। ঘোড়া এক চালে, যেমন সবাই জানে, কোণাকুণি ভাবে তৃতীয় ঘরে পৌঁছাবে।

৪ পড়লে গজের চাল। আমাদের Rukh-এর মত, সম্মুখের দিকে সরল রেখায় চলে যতক্ষণ না বাধা পায়। বাধাপ্রাপ্ত হলে পাশাদ্বয়ের একটিকে চেলে, সে বাধা দূর করে, গজের চাল খুলে দেওয়া হয়। গজের ন্যূনতম চাল এক ঘর, আর সর্বাধিক পনের ঘর, কারণ পাশাতে কখনও কখনও দুইটি চার বা দুইটি ছয়, কিংবা একটি ছয় ও একটি চার পড়ে। এই সংখ্যা দুইটির একটির বলে গজ ছকের একপাশের সমস্ত ঘর এবং অন্য সংখ্যাটির বলে ছকের অন্য পাশের ঘরগুলি অতিক্রম করে যায়, অবশ্য যদি কোথাও বাধা না পায়। জোড়া সংখ্যার বলে গজ এইভাবে ছকের দুই পাশ অধিকার করে নেয়।

প্রত্যেক ঘুটির একটা নির্দিষ্ট মূল্য থাকে। এই মূল্যানুযায়ী খেলোয়াড়রা বাজির অংশ ভাগ করে নেয়। কারণ ঘুটিগুলি খেলার নিয়মানুসারে কাটা গেলে, বিজয়ী খেলোয়াড় নিজ হাতে সেগুলিকে ধরে রাখে। রাজার মূল্য ৫, গজের ৪, ঘোড়ার ৩, নৌকার ২ আর বোড়ের ১। যে
১৪৮ রাজা কাটে সে ৫ পায়, দুটি রাজা কাটতে পারলে ১০। আর নিজের রাজা হারিয়ে অন্য ৩টি রাজা নিতে পারলে সে পাবে ১৫; কিন্তু নিজের রাজা অক্ষত রেখে অন্য ৩টি রাজা কাটতে পারলে সে পাবে ৫৪। এই মোট সংখ্যাটি কোন গাণিতিক নিয়মে প্রাপ্ত নয়, সাধারণ সম্মতিক্রমে ধরে নেওয়া হয়েছে।

আমরা যেমন ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক হওয়ার দাবী করে থাকি, হিন্দুরা যদি তেমন আমাদের চেয়ে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী করে, তাহলে ওদের ছেলেদের নিয়ে একটি পরীক্ষা করে প্রশ্নটির মীমাংসা করা যেতে পারে। মুসলমান রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যেসব হিন্দু বালক দাসরূপে মুসলমান রাজ্যে সম্প্রতি এসেছে তাদের মধ্যে এমন একজনকেও আমি দেখিনি, যে প্রভুর সামনে, তাঁর পাদুকাজোড়া ঠিকভাবে রাখতে পেরেছে, অর্থাৎ বাম

পায়ের জন্য দক্ষিণ পায়ের জুতা না দিয়ে বাম পায়ের জুতা রাখতে পেরেছে, অথবা প্রভুর পরিচ্ছদ ভাজ করার সময়ে উল্টা না করে রেখেছে, কিংবা গালিচার নীচের দিকটা উপরে করে না বিছিয়েছে। এইরূপ আরও অনেক ব্যাপার আছে যা ওদের মানসিক বৈপরীত্য ও রুচি বিকৃতির ফল।

এই সব বিকৃতির জন্য আমি অবশ্য কেবল হিন্দুদিগকেই দোষ দিই না। আরবদেরও ঐ রকম বহু কদাচার ও কুরীতি ছিল। তারা রজঃস্বলা ও গর্ভিণী স্ত্রীগমন করত, ঋতু স্নানের পর স্ত্রীর সঙ্গে একাধিক পুরুষ সহবাস করত, নিজ স্ত্রীর বা কন্যার গর্ভে অন্য ব্যক্তির বা অতিথির ঔরসজাত সন্তানকে তারা নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করতো। তাদের পূজা পদ্ধতিতে, হাত ও মুখ দিয়ে শীষ দেওয়া এবং নোংরা ও মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করার মত কদর্যতার কথা না হয় বাদই দিলাম। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ইসলাম এসব কদর্যতার মূলোচ্ছেদ করেছে, এবং ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেখানেও এসব গর্হিত আচরণ রহিত করেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

হিন্দুদের যে সব বিদ্যা অজ্ঞতার দিগন্তে পক্ষবিস্তার করে

ভোজবাজি বা চাতুরির দ্বারা কোনও বস্তুর প্রকৃত রূপকে অন্য রূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করে উপস্থিত করার নাম ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা। এই অর্থে যাদুবিদ্যা
১৪৯ মানবসমাজে বহুল প্রচলিত। জনসাধারণ অবশ্য যাদু অর্থে অসম্ভবকে সম্ভব করানোই বোঝে। সে অর্থ নিলে বলতে হয় যে যাদুর কোনও অস্তিত্ব নাই। কারণ যা অসম্ভব, তা সম্ভব হতে পারে না এবং সেজন্য এটি নিছক ধাপ্পা বই আর কিছু হতে পারে না। এই বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও সংস্রবই থাকতে পারে না।

এই যাদুরই একটি প্রকার হচ্ছে 'কিমিয়া' (Alchemy)। 'কিমিয়া'কে অবশ্য কেউ যাদু বলে না, কিন্তু কেউ যদি একটু তুলা নিয়ে সোনার মত করে দেখায়, তাকে যাদু ছাড়া আর কি নামে অভিহিত করা যাবে ? রূপাকে সোনার মত করে দেখানোর সাথে কেবল গিল্টি করার সুবিদিত প্রক্রিয়া ছাড়া এর কোনও তফাৎ নাই।

হিন্দুরা অবশ্য কিমিয়াতে তেমন একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে না, কিন্তু কোন জাতিই এর মোহ থেকে মুক্ত নয়। কোনও কোনও জাতি আবার অন্যের তুলনায় এর প্রতি বেশী মনোযোগী। তার থেকে অবশ্য কোনও জাতির বুদ্ধি বা নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ হয় না। কারণ অনেক বুদ্ধিমান লোককেও কিমিয়া নিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে, আবার অনেক মূর্খ ব্যক্তিকে এ বিদ্যা ও তার চর্চা-কারীকে উপহাস করতে দেখা গেছে। কিমিয়া নিয়ে সময় ক্ষেপণ করে বলে এসব বুদ্ধিমানদের অবশ্য নিন্দা করা যায় না। কারণ, সৌভাগ্য অর্জন ও দুর্ভাগ্য এড়ানোর ঐকান্তিক লোভই তাদিগকে প্রলুব্ধ করে। এক ব্যক্তি একজন দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পন্ডিতরা ধনীদের দ্বারে কেন ভিড় করে ? ধনীরা তো কখনও পন্ডিতদের দ্বারে যায় না ?' দার্শনিক বলেছিল, 'তার কারণ পন্ডিতরা ধনের মূল্য বোঝে, কিন্তু ধনীরা জ্ঞানের মহাত্ম্য বোঝে না।' তেমনি কিমিয়াকে যারা পরিহার করে এবং সে সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে না তাদের বুদ্ধিরও তেমন প্রশংসা করা যায় না। কারণ তাদের আচরণের মূলে আছে জড়বুদ্ধি ও মূর্খতা, যা আসলে দোষণীয়।

যারা কিমিয়া চর্চা করে তারা একে গোপন রাখতে চেষ্টা করে এবং অন্য যারা এ বিদ্যা চর্চা করে তাদের সাথে মেলামেশাও করতে চায় না। এইজন্য, হিন্দুরা কিমিয়া চর্চার কোন্ পদ্ধতির অনুসরণ করে তা জানার সুযোগ আমার
১৫০ তেমন হয়নি। তবে ওদিগকে আমি ঊর্ধ্বপাতন (sublimation), ভস্মীকরণ (calcination), বিশ্লেষণ (analysis) ও অভ্রের দ্রবণ (যাকে ওরা 'তালক' বলে) পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে শুনেছি। তার থেকে অনুমান করি যে ওরা 'খনিজ' প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী।

কিমিয়া'রই মত হিন্দুদের নিজস্ব আর একটি বিদ্যা আছে, যার নাম 'রসায়ন'।

শব্দটি 'রস' অর্থাৎ 'স্বর্ণ' থেকে উদ্ভূত। কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া, ঔষধি প্রয়োগ ও মিশ্রণ করার বিদ্যাকে রসায়ন বলে। ঔষধগুলির বেশীর ভাগই উদ্ভিজ্জ বা বনজ। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে হতাশ্বাস রোগীদের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে নবীন যুবার তেজ ও ক্ষমতাদান, যাতে কেশ পুনরায় চিক্কন কৃষ্ণ হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ সবল হয় এবং যৌবনোচিত স্ফূর্তি ও স্ত্রী সম্ভোগের ক্ষমতা জন্মায় ও মানুষের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়। আর কেনই বা হবে না? আমরা পাতঞ্জলীর মত উদ্ধৃত করে আগেই বলেছি যে, মোক্ষলাভের এক পদ্ধতি হচ্ছে রসায়ন। কে এমন আছে, যে একথায় বিশ্বাস করে আনন্দে উল্লসিত হবে না; আর এ শাস্ত্রের গুরুর মুখে উত্তম খাদ্য তুলে দেবে না?

রাসায়নিকদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন নাগার্জুন, সোমনাথের নিকটস্থ 'দিহক' (Dihak) দুর্গের অধিবাসী। এ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তিনি একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন, যাতে রসায়নের যাবতীয় গ্রন্থের সার সংকলন করা হয়েছিল। পুস্তকটি এখন দুষ্প্রাপ্য। নাগার্জুনের জীবৎকাল আমাদের সময় থেকে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় (তাঁর সময়কাল আমরা পরে উল্লেখ করব) উজ্জয়িনী নগরে 'ব্যাদি (بیادی) নামে একটি লোক ছিল। লোকটি রসায়ন চর্চায় তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছিল এবং তাতে ধন ও জীবন দুই-ই নষ্ট করেছিল। এত চেষ্টা করেও কিন্তু সে রসায়ন দ্বারা সহজে প্রস্তুত হতে পারে, এমন বস্তু সে পেল না। তার ধনসম্পত্তি নিঃশেষপ্রায় হয়ে এলে এই শাস্ত্রের প্রতি তার অশ্রদ্ধা জন্মালো। অবশেষে মনোবেদনায় ও হতাশায় একদিন এক নদীর তীরে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। তার হাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের

১৫১ একটি পুস্তক ছিল, যার থেকে মিশ্রণ করার জন্য সে ঔষধাদি নির্বাচন করত। মনের খেদে সে ঐ পুস্তকের পাতাগুলি একটি একটি করে ছিঁড়ে জলে ফেলতে লাগল। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে নদীর তীরে একটু নীচের দিকে একটি গণিকা বসেছিল যার সম্মুখ দিয়ে ছেঁড়া পাতাগুলি ভেসে যাচ্ছিল। গণিকাটি এই পাতাগুলি তুলে নিয়ে বুঝতে পারল যে সেগুলি রসায়ন সংক্রান্ত। শেষ পাতাটি জলে ভাসান পর্যন্ত লোকটি তাকে দেখতে পায়নি। গণিকাটি তখন তার কাছে এসে পুস্তকটিকে এভাবে নষ্ট করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে লোকটি বললে 'আমি এর থেকে কোনও উপকার পাইনি। যে সমস্ত বস্তু আমার পাওয়া উচিত ছিল তাও আমি পাইনি, অথচ এই শাস্ত্রের অনুশীলনে আমার সমস্ত ঐশ্বর্য নষ্ট করে আমি কপর্দকহীন হয়ে পড়েছি।' গণিকা তখন বললে 'যে সাধনায় তুমি জীবনপাত করেছ তাকে ছেড়ো না, তোমার পূর্বে মনীষীরা যার সত্যতা প্রমাণ করে গেছেন, তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ো না। এমনও হতে পারে যে তোমার ও তোমার লক্ষ্যের মধ্যে যে বাধা দেখেছ তা আকস্মিক এবং আকস্মিকভাবে সে বাধা দূর হবে। আমার অনেক ধন আছে, এ সবই তুমি তোমার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয় করতে পার।' একথা শুনে লোকটি পুনরায় রসায়নের অনুশীলন করতে লাগল।

রসায়নের পুস্তকগুলি সাংকেতিক ভাষায় লেখা থাকে। সেজন্য লোকটি ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত একটি প্রয়োজনীয় ঔষধের নাম ভুল পড়েছিল। ঔষধটি তেল ও মানব রক্তের সংমিশ্রণ। ব্যবস্থাপত্রে লেখা ছিল : 'রক্তামল', লোকটি তার অর্থ করেছিল 'লাল আমলকি'। কাজেই সে ঔষধে কোন ফল হয়নি। তার ধারণামত ঔষধগুলি প্রস্তুত করার পর অগ্নির তাপে তার মস্তিষ্ক শুষ্ক বোধ হওয়াতে লোকটি মাথার তালুতে প্রচুর তেল ঢালল। তারপর কোন কার্যে চুল্লী থেকে নীচে নামার জন্য উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ তার মাথা ছাদের একটি কীলকে লেগে গেল এবং রক্ত পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় সে মাথা নীচু করলে তেল মিশ্রিত কয়েক ফোঁটা রক্ত, তালু থেকে গড়িয়ে চুল্লীর উপর রক্ষিত কড়াইয়ে গিয়ে পড়ল। ঔষধ মিশ্রণ শেষ হলে তা পরীক্ষা করার জন্য সে আর তার স্ত্রী ঔষধটি গায়ে মাখতেই তারা শূন্যে উঠে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য এ
১৫২ সংবাদ পেয়ে স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মাঠে তাদিগকে দেখতে এলেন। উপর থেকে লোকটি তখন চিৎকার করে রাজাকে বললে "আমার নিষ্ঠীবন গ্রহণ করার জন্য মুখ খোল।" ঘৃণায় রাজা তা করতে চাইলেন না। লোকটির নিষ্ঠীবন তখন একটি গৃহ-দ্বারের নিকটে পড়ল। তৎক্ষণাৎ দ্বারের

চৌকাঠটি সোনায় পরিণত হয়ে গেল। 'ব্যাদি' তারপর স্ত্রীর সঙ্গে যদৃচ্ছা উড়ে বেড়াতে লাগল। লোকটি রসায়নশাস্ত্রে কয়েকটি সুবিখ্যাত পুস্তকও রচনা করেছে। লোকে বলে, ওরা দুজন এখন পর্যন্ত জীবিত আছে।

এই ধরনের আর একটি গল্প এই। মালয়ের রাজধানী ধার নগরে, যেখানে এখন রাজা ভোজ রাজত্ব করছেন,--শাসন গৃহের দ্বারে রূপার একটি চতুষ্কোণ খন্ড পড়ে আছে, যাতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার স্পষ্ট বোঝা যায়। আসল ব্যাপার সম্বন্ধে বলা হয় যে, পুরাকালে ওদের এক রাজার কাছে একটি লোক রসায়নের একটা ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এসেছিল, যার ব্যবহারে রাজা অমর ও অজেয় হবে এবং ইচ্ছাপূরণ করবার ক্ষমতা লাভ করবে। রাজা নির্জনে তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে, তার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করার আদেশ দিল। লোকটি তখন কয়েকদিন ধরে আগুনে তেল ফুটাতে থাকল। এইভাবে তেল যখন এক বিশেষ ঘনত্বে পেঁছল তখন লোকটি রাজাকে বললে, "এই তেলের মধ্যে ঝাঁপ দাও, তাহলে তোমার জন্য এই প্রক্রিয়াটি শেষ করতে পারি।" ফুটন্ত তেল দেখে রাজা ভীত হোল, তাতে ঝাঁপ দেবার সাহস হোল না। রাজার ভীরুতা দেখে লোকটি বল্লে ঃ তোমার যখন সাহস হচ্ছে না, আর তুমি নিজের জন্য যখন এর ফল চাও না, তখন আমি নিজে সে কাজ করতে চাই, তাতে তোমার অনুমতি পাব কি? রাজা বল্লেঃ "তোমার যা খুশী তা-ই কর।" লোকটি তখন ঔষধের কয়েকটি মোড়ক বার করে রাজার হাতে দিয়ে কতকগুলি লক্ষণ বুঝিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলে যে একটির পর একটি লক্ষণ দেখা দিলে মোড়কের নির্দিষ্ট ঔষধগুলি পর পর যেন ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হয়। লোকটি তখন ফুটন্ত তেলে প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ গলে গিয়ে নরম মন্ডে পরিণত হোল। রাজা তখন নির্দেশ মত লক্ষণ দেখে দেখে ঔষধ নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু যখন মাত্র আর একটি মোড়কের ঔষধ নিক্ষেপ বাকী তখন রাজা ভাবল, এই লোকটি যদি সত্যই অমর সর্বজয়ী ও অজেয় হয়ে পনরুত্থিত হয়, তাহলে তার রাজ্যের কী হবে? এই সম্ভাবনার কথা তার মনে উদয় হওয়াতে রাজা শেষ ঔষধটি আর নিক্ষেপ করল না। পরে কড়াইটি শীতল হলে দেখা গেল লোকটি তার মধ্যে উপরোক্ত রৌপ্যখন্ডের ভিতর বসে আছে।

বালভির রাজা 'বল্লভ' সম্বন্ধে একটি গল্প বলে থাকে। বল্লভের সন তারিখ আমি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি।

'তুহর' (? তুহর—تُوهر) বলে যে একপ্রকার আঠাযুক্ত লতা আছে, যা
১৫৩ ভাঙ্গলে দুধের মতো, রস নির্গত হয়, তার সম্বন্ধে 'সিদ্ধার' স্তরপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি

এক রাখালকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এমন কোনও 'তুহর' লতা সে দেখেছে কি-না যা ভাঙলে দুধের পরিবর্তে রক্ত বাহির হয়। রাখালটি বললে 'হাঁ'। সিদ্ধা তখন তাকে পান করার জন্য কয়েকটি পয়সা দিয়ে লতাটি দেখিয়ে দিতে বললে। রাখাল লতাটি দেখিয়ে দিলে লোকটি তাতে আগুন ধরিয়ে রাখালের কুকুরটিকে সে আগুনে নিক্ষেপ করল। রাখাল তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সিদ্ধাকে কুকুরের মতই আগুনে নিক্ষেপ করল। আগুন নিভে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রাখাল দেখল যে, কুকুর এবং সেই লোকটি উভয়ের দেহই সোনায় রূপান্তরিত হয়ে ভস্মের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সে কুকুরের স্বর্ণদেহ নিয়ে লোকটির দেহ সেখানেই ফেলে রেখে চলে এলো। পরে একজন কৃষক সেই স্বর্ণদেহটি দেখতে পেয়ে তার একটি অঙ্গুলি কেটে এক সব্জি বিক্রেতার কাছে নিয়ে গেল। সব্জি বিক্রেতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। সেইজন্য তাকে 'রঙ্গক' অর্থাৎ দরিদ্র বলা হোত। স্বর্ণ অঙ্গুলির বিনিময়ে কৃষকটি তার আবশ্যক মত সব্জি কিনে নিয়ে আবার সেই স্বর্ণদেহের কাছে গিয়ে দেখল যে যেখান থেকে অঙ্গুলি কেটে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে আবার তেমনি অঙ্গুলি গজিয়েছে। সে অঙ্গুলিটাকেও সে কেটে নিয়ে আবার সব্জি বিক্রেতার কাছে গিয়ে আবশ্যক মত দ্রব্যাদি কিনল। সব্জি বিক্রেতা তখন তার কাছে স্বর্ণাঙ্গুলির রহস্য জানতে চাইলে কৃষকটি নির্বোধের মত সত্য ঘটনা বলে দিল। 'রঙ্গক' তখন সেই স্থানে গিয়ে সিদ্ধার স্বর্ণদেহটি শকটে করে নিজ গৃহে নিয়ে এলো। সে সেখানেই বাস করতে লাগল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এত ধনবান হলো যে, সমস্ত নগরটি সে কিনে নিল। রাজা বল্লভ অর্থের বিনিময়ে এই নগরটি ক্রয় করতে চাইলে লোকটি সম্মত হোল না। কিন্তু পরে রাজরোষের আশঙ্কা করে আলমানসুরা অধিপতির শরণাপন্ন হোল এবং অর্থ ও উপঢৌকন দিয়ে নৌবাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করল। আলমানসুরার অধিপতি তার অনুরোধক্রমে তাকে সাহায্য করল এবং রাত্রে অতর্কিত আক্রমণ করে রাজা বল্লভের লোকজন সহ তাকে হত্যা করল। লোকে বলে যে এখন পর্যন্ত বল্লভ নগরে এই আকস্মিক নৈশ-আক্রমণের ফলে ধ্বংস হওয়ার চিহ্ন বর্তমান আছে।

নির্বোধ হিন্দু রাজাদের স্বর্ণ তৈরী করার লোভ এত বেশী যে, সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে কেউ যদি রাজাকে অনেকগুলি শিশু হত্যা করার পরামর্শ দেয়, তাহলে সেরূপ নৃশংস কাজ করতেও সে কুণ্ঠিত হবে না, এবং তাদিগকে আগুনে নিক্ষেপ করতেও তার বাধবে না। এই মহামূল্য
১৫৪ 'রসায়ন' বিদ্যাটিকে যদি পৃথিবী থেকে এমন স্থানে নির্বাসিত করা হোত

যেখান থেকে কেউ তা সংগ্রহ করতে পারত না, তাহলে সব দিক দিয়ে মঙ্গল হোত।

ইরানের বিংবদন্তী অনুসারে মৃত্যুকালে Isfandiad বলেছিলেন: "কাউসকে শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত শক্তি ও দিব্য বস্তু সমূহ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে, জরাগ্রস্ত, ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ অবস্থায় সে কাফ্' পর্বতে গেল, এবং সেখান থেকে প্রফুল্ল, সুঠাম ও সবলদেহ হয়ে অল্লার আদেশমত মেঘে আরোহণ করে সে ফিরে এলো।"

মাদুলি ও মন্ত্রতন্ত্রে (সামুদ্রিক) হিন্দুদের গভীর বিশ্বাস। এসবে জনসাধারণের খুব আসক্তি আছে। এই বিষয়ে যে গ্রন্থ আছে সেটি নারায়ণের বাহন 'গরুড়ের' নিকট থেকে পাওয়া বলে এদের বিশ্বাস। অনেকে গরুড়ের যে বর্ণনা দেয়, তা Sifrid পক্ষীর গুণ ও আচরণের সঙ্গে মেলে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে পক্ষীটি মাছের শত্রু ও শিকারী। পশু-পক্ষীর প্রকৃতির এক বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের বিপরীত প্রকৃতির প্রাণীর প্রতি তাদের আক্রোশ এবং তাদিগকে শত্রুভাবে এড়িয়ে চলা। বর্ণনামতে পক্ষীটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, জলের উপর দিয়ে যখন সে ধীরে ধীরে উড়তে থাকে এবং কখনও কখনও জলের উপর ভাসতে থাকে, মাছগুলি তখন নীচে থেকে জলের উপরে ভেসে ওঠে। তার দরুন মাছ ধরা তার পক্ষে সহজ হয়, যেন মাছগুলিকে সে মন্ত্রে বশীভূত করেছে। অন্যেরা আবার গরুড়ের যে বর্ণনা দেয় তার থেকে মনে হয় পক্ষীটি বক জাতীয়। বায়ু পুরাণে তাকে হলুদ বর্ণ বলা হয়েছে। মনে হয় গরুড় পক্ষী Sifrid-এর চেয়ে বকেরই বেশী নিকটতর। কেননা বকও গরুড়ের ন্যায় সর্পহন্তা।

এদের মন্ত্রতন্ত্রের বেশীর ভাগই সর্পদষ্ট লোকের জন্য ব্যবহার করা হয়। সর্প দংশনে মন্ত্রতন্ত্রের ওপর এদের বিশ্বাসের আতিশয্যে অবাক হতে হয়। একজনের কাছে শুনেছি যে সে একটি লোককে দেখেছিল যার সর্পদংশনে মৃত্যু হবার পর মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত হয়েছিল এবং বেঁচে থেকে অন্যলোকের মত সমানভাবে চলাফেরা করত। আর একজনকে বলতে শুনেছি যে, সে একজন সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে মন্ত্রবলে উঠে বসে কথা বলতে এবং অন্তিম নির্দেশ (will) দিয়ে তার গচ্ছিত ধনের বিবরণ ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি দিতে দেখেছিল। কিন্তু পক্ক অন্নের ঘ্রাণ তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতেই প্রাণহীন হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার দেহে জীবনের আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

১৫৫ হিন্দুদের রীতি যে কাউকে সর্পাদি দর্শন করলে এবং ওঝা উপস্থিত না থাকলে দষ্ট ব্যক্তিকে সোনা বা নলের গুচ্ছের সঙ্গে বেঁধে, তার উপরে একটি পত্রে তার জন্য আশীর্বাদ লিখে রাখে যে মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে মন্ত্রের দ্বারা তাকে বিনাশ থেকে রক্ষা করবে।

এ-বিষয়ে আমি কী বলতে পারি জানি না, কারণ এসবে আমার মোটেই বিশ্বাস নাই। তুকতাক বা ভেল্কিতে যার বিশ্বাস নাই, এমনকি বাস্তব ঘটনাও যে অবিশ্বাস করে, এমন একজন সন্দিগ্ধমনা লোক আমাকে বলেছিল যে, একবার তার দেহে বিষের ক্রিয়া হয়েছিল। তখন লোকে তার কাছে কয়েকজন মন্ত্রজ্ঞ হিন্দুকে পাঠিয়ে দিল। তারা তার কাছে এসে সুর করে তাদের মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। তাতে তার অস্থিরতা কিঞ্চিৎ লাঘব হল। হিন্দুলোকগুলি তাদের হাত আর যষ্টি দিয়ে ক্রমাগত সংকেত করতে থাকলে লোকটিও ক্রমে ক্রমে সুস্থবোধ করতে লাগল।

আমি নিজে দেখেছি যে হরিণশিকার করার সময় হিন্দুরা পশুটি হাত দিয়ে ধরে ফেলে। একজন এমনও দাবী করল যে, গাত্র স্পর্শ না করে সে হরিণকে তাড়না করে সোজা রন্ধন-শালায় নিয়ে আসতে পারে। কিসের জোরে এরূপ দাবী করা হয় তা আমি অবশ্য বুঝেছি। নিরন্তর একই প্রকারের ধ্বনি শুনিয়ে পশুটিকে ক্রমশঃ অভ্যস্ত করা ছাড়া আর কোন চাতুরি এতে নাই। আমাদের লোকেরাও পাহাড়ি ছাগশিকারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই পশুগুলি হরিণের চেয়ে অনেক বেশী বন্য। পশুগুলি বসে আছে দেখতে পেয়ে শিকারীরা তাদের চতুর্দিকে একই স্বরে গান করতে করতে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না পশুগুলি সে স্বরকে স্বাভাবিক শব্দ ভেবে তাতে অভ্যস্ত না হয়ে যায়। তখন শিকারীরা তাদের বৃত্তকে ক্রমান্বয়ে ছোট করে আনতে থাকে যেখান থেকে নিশ্চিন্তভাবে পশুগুলিকে শরবিদ্ধ করা যায়। 'কাত'। (? Lhā-Kata) পক্ষী শিকারীরাও রাত্রিকালে একই তালে তামার পাত্র বাজাতে থাকে এবং অবশেষে হাত দিয়ে পক্ষীগুলিকে ধরে ফেলে। তালের এতটুকু ব্যতিক্রম হলেই কিন্তু পাখিরা সব উড়ে পালায়।

এসব অবশ্য বিশেষ প্রক্রিয়া, এতে মন্ত্রতন্ত্রের কোনও হাত নাই। প্রোথিত বাঁশের ও শক্ত করে বাঁধা দড়ির উপর খেলা দেখাতে পারে বলে ওদের ক্ষিপ্রতার জন্য কখনও কখনও হিন্দুদের যাদুগীর মনে করা হয়। কিন্তু ক্রীড়ানৈপুণ্য সব জাতির মধ্যেই পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতবর্ষের নদ নদী, সমুদ্র, নগরাদির পারস্পরিক দূরত্ব ও সীমানার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৫৬ পাঠকের মনে রাখা উচিত যে মানুষের বাসযোগ্যস্থান পৃথিবীর উত্তরার্ধের মধ্যেই আছে এবং তারও মাত্র অর্ধেক, অর্থাৎ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশে। তার চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে সমুদ্র, যার পশ্চিম ও পূর্বদিক 'মুহীত' অথবা বেষ্টনী বলা হয়। তার পশ্চিমের যে অংশ গ্রীসের পার্শ্বে আছে, তাকে গ্রীকরা Oukionous বলে। তার ওপারে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে যে সব মহাদেশ বা বসতিযোগ্য দ্বীপ থাকতে পারে, তার থেকে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীকে এই সমুদ্রই পৃথক করে রেখেছে; কারণ অন্ধকার বায়ুমণ্ডল ও জলের ঘনত্বের জন্য সে সমুদ্রে নৌ-চলাচল সম্ভব নয়; তাতে কোনও পথেরও সন্ধান নাই এবং বিপদই আছে, লাভ কিছু নাই। প্রাচীনেরা সেজন্য সমুদ্রমধ্যে ও তার কূলে চিহ্ন স্থাপন করে রেখেছে।

প্রচণ্ড হিমের জন্য ভূমণ্ডলের উত্তরভাগে মানুষের বসতি নাই। তবে কোথাও কোথাও জিহ্বা ও উপসাগরের মত বাসযোগ্য ভূমি উত্তর দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে। আর দক্ষিণে বাসযোগ্য ভূমি সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত, যা দুই দিকে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমে উপরোক্ত মহাসাগরের সাথে যুক্ত। এই সমুদ্রে নৌ-চলাচল সম্ভব। বাসযোগ্য ভূমি এই সমুদ্রের কূলেই শেষ হয়ে যায়নি, কারণ সমুদ্রটি ছোট-বড় বহু দ্বীপে পরিপূর্ণ। এখানে সমুদ্র যেন বিস্তৃতি নিয়ে ভূভাগের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত। ফলে একে অন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। পৃথিবীর পশ্চিমার্ধে ভূমি সাগরে প্রবেশ করেছে এবং তার ফলে দক্ষিণের দিকে উপকূল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই দক্ষিণে বিস্তৃত ভূভাগের (মহাদেশ) পশ্চিমে সুদান অবস্থিত, যেখান থেকে দাস সংগ্রহ করা হয় এবং চন্দ্র পর্বত (جبال القمر)-ও এই ভূভাগে অবস্থিত, যার মধ্যে নীল নদের উৎস আছে। তার উপকূলে ও দ্বীপসমূহে বিভিন্ন জাতির হাবসীদের বাস। পশ্চিমার্ধের এই দিকে আবার সমুদ্রও ভূভাগ প্রবেশ করে Barbar লোহিত ও পারস্য উপসাগরের সৃষ্টি করেছে। এই উপসাগরগুলির মধ্য দিয়ে মহাদেশটি আবার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে।

যেভাবে পশ্চিমার্ধে দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে ভূভাগ প্রবেশ করেছে, তেমনই পূর্বার্ধেও সমুদ্র আবার উত্তর ভূভাগের দিকে অনেকদূর প্রবেশ করেছে এবং
১৫৭ তার দরুন বহুস্থানে উপসাগর ও নদীর মোহনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রায়শঃ এর মধ্যে অবস্থিত দ্বীপ বা উপকূলবর্তী অঞ্চলের নামানুযায়ী এই সাগরের নামকরণ করা হয়। তবে এই সমুদ্রের যে অংশের কূলে ভারতবর্ষ অবস্থিত এবং যাকে ভারত সাগর বলা হয়, বর্তমানে তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

পাঠকের আরও মনে করা উচিত যে, এই বাসযোগ্য অংশে সুউচ্চ পর্বতমালা পাইন গাছের শীর্ষের মত পৃথিবীর মধ্যদ্রাঘিমা ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বহুদূরে পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালা চীন, তিব্বত, তুরস্কদেশ, কাবুল, বাদাখশান, তুখারিস্তান, বামিয়ান, ঘোর, খুরাসান, 'জিবাল', আজরবাইজান, আরমিনিয়া হয়ে রুম, ফিরঙ্গ এবং Gallicias (جليقية) দেশ পর্যন্ত চলে গেছে। দৈর্ঘের সঙ্গে তার প্রস্থও অনেক এবং পর্বতমালার অনেক বাঁক আছে যার বেষ্টনীর মধ্যে বহু দেশ ও জনপদ অবস্থিত এবং যার উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী বহু নদ-নদী প্রবাহিত। বাঁকের মধ্যকার এইরূপ একটি সমতল দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। তার দক্ষিণ দিক উপরোক্ত মহাসাগর বেষ্টন করে রয়েছে, আর অন্য তিনদিকে এই পর্বতমালা, যার থেকে জলধারা ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে এসে পড়ে।

কিন্তু যদি তুমি ভারতের মাটি স্বচক্ষে দেখ, আর ইতস্ততঃ খনন করে তার গভীরের যে সব গোলাকৃতি, বৃহদাকার প্রস্তরখন্ড পাওয়া যায় তার কথা চিন্তা কর তাহলে তুমি অনুমান করতে বাধ্য হবে যে, ভারত এককালে সমুদ্র ছিল যা নদীর স্রোতবাহিত পলিমাটি দ্বারা ক্রমশঃ ভরে গেছে। কারণ, পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চলে, যেখানে নদীর স্রোত অত্যন্ত বেগবান, সেখানে এই গোলাকার প্রস্তরগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, আর পর্বত থেকে দূরে যেখানে নদীর স্রোত অপেক্ষাকৃত মন্থর, সেখানে এগুলি ঈষৎ ক্ষুদ্রাকৃতি এবং সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে, মোহনার কাছে যেখানে নদীর স্রোত একেবারে নাই, সেখানে এই প্রস্তরগুলি চূর্ণ বালুকায় পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষের কেন্দ্রভূমি হচ্ছে কনৌজের পশ্চিমবর্তী অঞ্চল, যাকে ওরা মধ্য দেশ' বলে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এটি কেন্দ্রস্থল, কারণ পর্বত ও সমুদ্র থেকে এর দূরত্ব প্রায় সমান, শীত ও গ্রীষ্ম দুই-ই এখানে সমান এবং পূর্ব ও পশ্চিম সীমানারও প্রায় মাঝামাঝি এর অবস্থান। কনৌজ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রও বটে, কেননা এখানে অনেক ভারতীয় বীর রাজাদের বাস ছিল।

সিন্ধুদেশ, কনৌজের পশ্চিমে অবস্থিত। আমাদের দেশ থেকে সিন্ধুদেশে যেতে
১৫৮ হলে আমরা 'নীমরোজ' অর্থাৎ সিজিস্তান থেকে যাত্রা করি, আর 'হিন্দুস্তান' যেতে হলে আমাদিগকে কাবুলের দিক থেকে যাত্রা করতে হয়। অবশ্য অন্য পথ যে নাই, তা নয়। বাধাবিপত্তি দূর বা অতিক্রম করতে পারলে সব দিক থেকেই ভারতবর্ষে পৌঁছান যায়। ভারতের সীমান্তে পার্বত্য অঞ্চলে, হিন্দু বা হিন্দুর মত অনেক উপজাতি আছে, যারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও দস্যু প্রকৃতির। হিন্দু জাতির শেষ সীমানা পর্যন্ত এই পার্বত্য উপজাতিগুলি ছড়িয়ে রয়েছে।

কনৌজনগর গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। নগরটি বেশ বড়। কিন্তু বর্তমানে এর বেশীর ভাগ ভগ্নদশায়, গঙ্গার অপর পারে বারীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার দরুন কনৌজ এখন প্রায় জনশূন্য। উভয় শহরের মধ্যে ৩/৪ দিনের পথের দূরত্ব। কনৌজ যেমন পাণ্ডবদের জন্য বিখ্যাত, তেমনই মহুরা (মথুরা) বাসুদেবের জন্য বিখ্যাত হয়েছে। এ শহরটি যোনের (যমুনার) পশ্চিম তীরে অবস্থিত, কনৌজ থেকে এর দূরত্ব ২৮ ফারসাখ্। কনৌজ ও মথুরার উত্তরে এই দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে থানেশ্বর অবস্থিত; ইহা কনৌজ থেকে ৮০ ও মথুরা থেকে ৫০ ফারসাখ্ দূরে।

গঙ্গা নদী পূর্বোক্ত পর্বত থেকে প্রবাহিত। তার মুখকে 'গঙ্গাদ্বার' বলা হয়। এ-দেশের বেশীর ভাগ নদীই এই পর্বত থেকে নির্গত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগর ও জনপদের পারস্পরিক দূরত্ব প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখা উচিত যে, যে স্বচক্ষে সে সব স্থান দেখেনি, তার সংবাদ বা জনশ্রুতিতে ভরসা করা ছাড়া গতি নাই। কিন্তু এই জনশ্রুতি এমনই যে Ptolemy সাংবাদিকদের অত্যুক্তি ও গল্প রচনা-প্রবণতার অনুযোগ নিরন্তর করেছেন। ওদের বর্ণনাগুলি যে নিয়মে রচিত, তা আমি আবিষ্কার করেছি। একটি ষাড় যা মাল বহন করতে পারে, তার পরিমাণ হিন্দুরা প্রায়ই ২০০০/৩০০০ মণ বলে ধরে থাকে। কোন জন্তুই এত মাল একসঙ্গে বহন করতে পারে না। কিন্তু ষাঁড়ের বহন ক্ষমতার এই পরিমাণ ধরে নেওয়ার দরুন যাত্রীদলকে একই পথে অনেকদিন ধরে ক্রমাগত যাতায়াত করতে হয়, যতদিন না একটি ষাঁড় দ্বারা উপরোক্ত পরিমাণ মাল (২০০০/৩০০০ মণ) পথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বহন সম্পূর্ণ হচ্ছে। তখন এই দুই প্রান্তের দূরত্ব ওরা, উপরোক্ত পরিমাণ মাল বহন করতে যতদিন লেগেছে, ততদিনের যাত্রার দূরত্ব বলে ধরে নেয়। অত্যন্ত
১৫৯ যত্ন ও সাবধানতা ব্যতীত ওদের সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করার আমাদের অন্য উপায় নাই। যা জানি না তার জন্য যা জানি তাকে উল্লেখ না করা আমি অন্যায়

মনে করি। তবে ভুলভ্রান্তির জন্য আমি পাঠকের মার্জনা চাই। এখন আবার বর্ণনায় ফিরে আসছি।

কনৌজ থেকে দক্ষিণের দিকে যমুনা ও গঙ্গাকে দুই পাশে রেখে যাত্রা করলে এই সব সুবিখ্যাত স্থান ক্রমানবয়ে পথে পড়ে : প্রথমে জজমাউ, কনৌজ থেকে ১২ ফারসাখ্। (প্রত্যেক ফারসাখ্ চার মাইল বা এক ক্রোশের সমান)। তারপর আভাপুরী ৮ ফারসাখ্, তারপর 'কুরাহ', ৮ ফারসাখ্, বরহমশীল (برهمشل) ৮ ফারসাখ্, তারপরে প্রয়াগের বৃক্ষ (সঙ্গম) ১২ ফারসাখ্। এখানে গঙ্গাস্রোত যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হিন্দুরা এখানে তাদের শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মনির্যাতন করে থাকে। প্রয়াগ থেকে গঙ্গার সাগর সঙ্গম পর্যন্ত দূরত্ব ১২ ফারসাখ (?)।

প্রয়াগ সঙ্গম থেকে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে অন্যান্য শহর পড়ে, 'আরকুতীর্থ' প্রয়াগ থেকে ১২ ফারসাখ্; উরয়হার (? اوربهار—উড়িয়াধার ?) রাজ্য, ৪০ ফারসাখ্; সমুদ্রোপকূলে ওড্রবিশয় (? اوردبيشو) ৫০ ফারসাখ্।

এখান থেকে (ওড্রবিশয়) সমুদ্রকূল ধরে পূর্ব দিকে যে সব রাজ্য আছে সেগুলি বর্তমানে 'Jaur' (? جور = Chola) এর অধীন। প্রথমে পড়ে 'দরওর' (? درور Dharwar ?) ওড্রবিশয় থেকে ৪০ ফারসাখ্, কাঞ্চি ৩০ ফারসাখ, মালায়া (? ملاية Malaya ?) ৪০ ফারসাখ, এবং কুন্‌ক্' (? كونكى Kongu-desa ?) ৩০ ফারসাখ্, জোর (চোল) এর অধীনস্থ রাজ্যের এইটিই সীমানা।

'বারী' থেকে গঙ্গা ধরে পূর্ব মুখে গেলে প্রথমে ২৫ ফারসাখ্ দূরে অযোধ্যা পড়বে। সেখান থেকে ওদের পুণ্যস্থান 'বানারসী' ২০ ফারসাখ্, তারপর দক্ষিণে না গিয়ে পূর্ব দিকে গেলে 'বানারসী' থেকে ৩৫ ফারসাখ্ দূরে Sharwar (شرور) পাওয়া যাবে। সেখান থেকে পাটলিপুত্র ২০
১৬০ ফারসাখ্, তারপর মুঙ্গিরি ১৫ ফারসাখ, Janpa (? جنپة) ৩০ 'দুগমপুর' (دوگم پور) ৫০ এবং সেখান থেকে গঙ্গাসাগর ৩০ ফারসাখ্, যেখানে গঙ্গানদী সাগরে এসে পড়েছে।

'কনৌজ' থেকে পূর্বদিকে বারী ১০ ফারসাখ, সেখান থেকে Dugum ৪৫ ফারসাখ, তারপর 'সিলাহাত' রাজ্য ১০ ফারসাখ্ এবং তারপর 'বিহাত' (بهت) শহর, ১২ ফারসাখ্। এখান থেকে ডান দিকে এগিয়ে গেলে তিলওয়াত (تلوت ক্রিহুত) নামক দেশ পড়ে, সেখানকার অধিবাসীদের নাম তরু। এরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তুর্কীদের মত এদের নাক চাপটা। সেখান থেকে 'কামরু' পর্বতে যাওয়া যায়, যা সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত।

'তিলওয়াত'দের বাম দিকে আছে 'নেপাল' রাজ্য। যারা এই অঞ্চলে ভ্রমণ করেছে তাদের একজন বলেছে যে 'তিলওয়াত' থেকে সে পূর্ব দিকে না গিয়ে বাম দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ২০ ফারসাখ্ যাবার পর সে নেপালে পেঁছল; এ পথের সবটাই চড়াই। নেপাল থেকে যাত্রা করে ৩০ দিনে সে ভূতেশ্বর (Bhoteswar) পেঁছল। এই ৩০ দিনে সে প্রায় ৮০ ফারসাখ্ অতিক্রম করেছিল। সে পথে উৎরাই অপেক্ষা চড়াই বেশী। এই পথে বারবার একটি নদী ঝোলান সেতু দিয়ে পার হতে হয়। দুই তীরে পর্বতগাত্রের সাথে দুইটি বেত টান করে বেঁধে তার ওপরে অনেকগুলি তক্তা বিছিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। এইরূপ ঝোলানো পুলের উপর লোক কাঁধে করে মালপত্র পারাপার করে, আর প্রায় ১০০ গজ নীচে, তুষারের ন্যায় সফেন জলরাশি গর্জন করতে করতে বয়ে যায়, যেন পর্বতকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলবে। সেতুর অপর পারে পেঁছে মালপত্র মেষের পিঠে চাপান হয়। এই সংবাদদাতা আমাকে বলেছে যে, ঐ অঞ্চলে সে চার চক্ষুবিশিষ্ট হরিণ দেখেছে। সে আরও বলেছে যে এরূপ হরিণ প্রাকৃতিক ব্যতিক্রম নয়, সেখানকার সমস্ত হরিণই নাকি এই প্রকারের।

ভোতেশ্বর তিব্বতের নিকটতম সীমান্ত শহর। এখান থেকে ভাষা, রীতিনীতি ও মানুষের চেহারার পরিবর্তন হ'তে আরম্ভ করে। ভোতেশ্বর থেকে পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ার দূরত্ব ২০ ফারসাখ্। এই চূড়া থেকে ভারতবর্ষকে কুয়াশায় আবৃত একটি কালো বিস্তারের ন্যায় দেখায়। আর চূড়ার নীচে যে সব পর্বত আছে সেগুলিকে ছোট ছোট টিলার মত মনে হয় এবং তিব্বত ও
১৬১ চীনকে মনে হয় যেন লাল কুয়াশা। এই চূড়া থেকে তিব্বত ও চীনের দিকের উৎরাই এক ফারসাখের চেয়েও কম।

কনৌজ থেকে গঙ্গার পশ্চিম তীর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গেলে ৩০ ফারসাখ্ দূরে জেজাহূত (Jejakabhakti) রাজ্য পাওয়া যাবে, তার রাজধানী "কাজুরাহ" (Khajraho)। 'কাজুরাহ' ও কনৌজের মাঝে 'গওলিয়র' ও কালঞ্জর নামক দুইটি বিখ্যাত দুর্গ আছে। তারপর দাহাল (Dahala) রাজ্য, যার রাজধানী 'তিউরী' (ত্রিপুরী) এবং যার বর্তমান অধিপতির নাম গাঙ্গেয়। তার ২০ ফারসাখ্ দূরে 'কান্নগড়' (کنکره) তারপর "অপসূর" ও সমুদ্র-তীরে "বনবাস" (بنواس)।

কনৌজ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১৮ ফারসাখে "আসি" পড়ে; যেখান থেকে একাদিক্রমে ১৭ ফারসাখ্ দূরে সহনা (Sahanya) ১৮ ফারসাখ্ দূরে

জন্দ্রা (?), ১৫ ফারসাখ্ দূরে রাজোরী (?) এবং ২০ ফারসাখ্ দূরে গুজরাটের অন্যতম নগর Bazana (بزانه) পড়ে। আমাদের লোকেরা এ শহরকে 'নারায়ণ' বলে জানে। নগরটি নষ্ট হলে তার অধিবাসীরা 'জদুরা' (?) নামক অন্য একটি শহরে উঠে যায়।

কনৌজ ও 'মথুরার' দূরত্ব কনৌজ থেকে Bazana-র দূরত্বের সমান, অর্থাৎ ২৮ ফারসাখ্। কাউকে উজ্জয়ন (উজ্জয়িনি) থেকে 'মাহুরা' যেতে হলে যে সব গ্রামের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হবে তাদের পারস্পরিক দূরত্ব ৫ ফারসাখ্ বা তারও কম। ৩৫ ফারসাখের পর সে 'দুদহি' (دودہی) নামক এক বড় শহরে পৌঁছবে। তার ৭ ফারসাখ পর বামহূর (بامہور) এবং আরও ৫ ফারসাখ পরে ভাইলসান (ভিলসা) নামক হিন্দুদের সুপরিচিত শহর পাবে। সেখানকার বিগ্রহের নামানুসারে এ শহরের নাম হয়েছে। সেখান থেকে ৯ ফারসাখে অরদিন (? اردین উজ্জয়ন ?) পাওয়া যাবে। সেখানকার বিগ্রহের নাম 'মহাকাল'। সেখান থেকে 'ধার' ৭ ফারসাখ।

Bazana থেকে ২৫ ফারসাখ দক্ষিণের দিকে মেওয়াড় (Mewar) আছে। এই রাজ্যে "জওরুড়" (চিত্তোড় ?) নামক দুর্গ আছে। এই দুর্গ থেকে
১৬২ মালওয়া ও তার রাজধানী 'ধার' ২০ ফারসাখ! 'ধার'-এর সাত ফারসাখ পূর্বে
১৬৩ উজ্জয়ন। উজ্জয়ন থেকে মালওয়ার অন্তর্গত ভাইলসান ২০ ফারসাখ। ধার-এর ২০ ফারসাখ দক্ষিণে ভূমীহর। Kanduho (کندوھو) আরও ২০ ফারসাখ দূরে। সেখান থেকে নর্মদার তীরে Namaur (نماور) ২০ ফারসাখ, 'এলিচপুর' ২০ ফারসাখ, এবং সেখান থেকে গোদাবরী নদীর তীরে মন্দগের (منذ گر মানকের) ৬০ ফারসাখ।

আবার 'ধার' থেকে দক্ষিণমুখে গেলে (Namiya) উপত্যকা পর্যন্ত ৭ ফারসাখ হবে। সেখান থেকে মহরট্টদেশ (مہرٹ دیش) পর্যন্ত ১৮ ফারসাখ এবং 'কোরকন' ও সমুদ্রোপকূলস্থিত রাজধানী 'থানা' পর্যন্ত আরও ২৫ ফারসাখ। কথিত আছে যে, কোরকনের Danak নামক সমতল অঞ্চলে Sharav (শরভ) নামিত একপ্রকার পশু আছে যার চারটি পা আছে, কিন্তু পিঠেও চারটি পায়ের মত উপরের দিকে উত্থিত কয়েকটি অঙ্গ আছে। তার খুড়া ছোট, কিন্তু দুটি বিরাট শৃঙ্গ আছে যা দিয়ে সে হাতীকে আক্রমণ করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিতে পারে। এর আকৃতি মহিষের ন্যায় কিন্তু গণ্ডারের চেয়ে বড়। লোকে বলে যে, পশুটি কখনও যদি তার শৃঙ্গ দ্বারা বিদ্ধ করে অন্য কোনও পশু হত্যা করে তাহলে মৃত পশুর দেহ বা তার কোন অংশকে নিজের পিঠের উপর নিক্ষেপ করে। মৃত পশুর দেহ তখন তার উপরের পা গুলির

মধ্যে আটকে যায় এবং মধ্যে পচে গিয়ে তাতে কীট জন্মে তার পিঠের চামড়ায় দংশন করতে থাকে। পশুটি তখন ক্রমাগত গাছের সঙ্গে নিজের গা ঘষতে থাকে এবং এইভাবে অবশেষে মরে যায়। লোকে আরও গল্প করে যে, মেঘের গর্জনকে কখনও কখনও পশুটি অন্য পশুর গর্জন বলে মনে করে, এবং তাকে আক্রমণ করার জন্য পর্বতশৃঙ্গ পর্যন্ত ওঠে এবং সেখান থেকে কল্পিত শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য লাফ দেয় এবং নীচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

ভারতবর্ষে গণ্ডার অজস্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে গংগার আশেপাশে। এটি আকৃতিতে মহিষের ন্যায়, কালো মাছের আঁশের মত গায়ের চামড়া। থুতনির নীচে মাংস ঝুলে থাকে। প্রত্যেক পায়ে তিনটি করে হলুদ রঙের খুর আছে, সবচেয়ে বড়টি সামনে, অন্য দুটি পাশে। লেজ বেশী লম্বা নয়, চোখ দুটি অন্য পশুর চোখের চেয়ে কিছুটা নীচের দিকে। নাকের ঠিক পাশে উপরের দিকে মুখ করা একটি শৃঙ্গ আছে। গণ্ডারের মাংস ভক্ষণ করা ব্রাহ্মণের অধিকার। একটি গণ্ডারকে তার সম্মুখে পতিত হাতীকে আক্রমণ করতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শৃংগ দিয়ে সে হাতীর সামনের একটি পা জখম করে তাকে ভূপাতিত করে দিল।

আমি মনে করতাম যে, গণ্ডারই আমাদের Karkada (کرکدن) কিন্তু এক ব্যক্তি, যে হাবশী দেশের Sufala তে ভ্রমণ করেছিল, আমাকে সংবাদ দিল যে হাবশীরা যাকে Inpila (انبیلا) বলে, এবং যার শিং থেকে আমাদের ছুরির হাতল তৈরী হয়, গণ্ডারের চেয়ে সেই Kark (کرک)-ই উপরোক্ত Karkadan-এর বেশী নিকটবর্তী। এর রঙ নানা প্রকারের; মাথার উপরে শংকু (conical) আকৃতির ঈষদোচ্চ একটি শৃংগ আছে, তার নীচের দিক মোটা। শৃংগের ভিতর দিক কালো, বাকী সব সাদা। মুখের সম্মুখ ভাগে এর চেয়ে বড় ঐরূপ আর একটি শৃংগ আছে, যেটি আক্রমণ করার সময় খাড়া হয়ে উঠে। এই শৃংগকে জন্তুটি পাথরে ঘষে তীক্ষ্ণ করে রাখে, যার দরুন কাটা ও বিদ্ধ করার মত এতে ধার হয়। জন্তুটির পায়ে খুর আছে এবং গর্দভের মত এর লেজ প্রচুর লোমবিশিষ্ট।

নীলনদের মত ভারতবর্ষের নদীগুলিতেও কুমির পাওয়া যায়, কেবল এই তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং নদীর প্রবাহপথ ও সমুদ্রের আয়তন ও সীমানা না জানার দরুন সরলমতি আলজাহিজ মনে করেছিলেন যে 'Mibran' নদী (সিন্ধু নদের নিম্নভাগ) নীল নদেরই এক শাখা। ভারতবর্ষের নদীগুলিতে

আরও অনেক রকমের আশ্চর্য জন্তু পাওয়া যায়, যেমন কুমীর জাতীয় "মকর", নানা অদ্ভুত প্রকারের মাছ, চামড়ার থলির মত একরকম জন্তু, যা জাহাজের কাছে ভেসে উঠে খেলা করে। একে ওরা Burlu (بُرلو) বলে। আমার অনুমান, এটি Dolphin বা ঐ জাতের কিছু হবে। লোকে বলে যে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য 'বুরলু'র মাথায় Dolphin-এর মত একটি ছিদ্র আছে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিতে একপ্রকার জন্তু আছে, যাকে ওরা 'গ্রাহ' (گراه) বা
১৬৪ জলতন্তু (جَالَتَنْت) অথবা (تَنْدُوه) 'তন্দুয়া' বলে থাকে। এর আকৃতি সরু, কিন্তু খুব লম্বা। লোকে বলে, জন্তুটি মানুষ বা পশুর জলে প্রবেশ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই এসে আক্রমণ করে। জন্তুটি প্রথমে দূর থেকে প্রাণীটির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। নিজের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ঘোরার পর জন্তুটি নিজেকে সংকুচিত করে নিয়ে শিকারের পা জড়িয়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে যায় এবং তার ফলে প্রাণীটি মারা যায় এই জন্তুটিকে স্বচক্ষে দেখেছে, এমন একজন লোক আমায় বলেছে যে, এর মাথা কুকুরের ন্যায়, আর তার লেজের নানা শাখা-প্রশাখা আছে। শিকারের অসতর্ক মুহূর্তে এই শাখাগুলি দিয়ে সে তাকে জড়িয়ে বেঁধে ফেলে এবং লেজের দিকে টানতে থাকে। একবার লেজের বন্ধনের মধ্যে শক্ত করে বাঁধা পড়লে শিকারের আর নিস্তার নাই।

এখন আমার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। 'বাজানা' থেকে ৬০ ফারসাখ দক্ষিণ-পশ্চিমে অনহিলওয়াড়া আছে, যেখান থেকে সমুদ্রতীরে 'সোমনাথ' ৫০ ফারসাখ। অনহিলওয়াড়া থেকে দক্ষিণ দিকে ৪২ ফারসাখ দূরে লাড়দেশ (লাট)। তার রাজধানী Bhroach (Broach) ও Rahanjur (رهنجور) নগর দুটি 'থানার' পূর্বদিকে সমুদ্রতীরে। 'বাজানা' থেকে পশ্চিমে মুলতান, ৫০ ফারসাখ। সেখান থেকে Bhati (بهاتى) ১৫ ফারসাখ। Bhati-র দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৫ ফারসাখ দূরে "আরোর" (Alor)। এ শহরটি সিন্ধুনদের দুটি শাখার মধ্যখানে অবস্থিত। তারপর Bahmanawa (Babman bad) Almansura ২০ ফারসাখ। সেখান থেকে নদীর মোহনায় অবস্থিত Lohrani (لوهرانى) ৩০ ফারসাখ।

কনৌজের উত্তরে ঈষৎ পশ্চিম-মুখে গেলে ৫০ ফারসাখ Sirsharaba (? شرشاره) পড়বে। সেখান থেকে Pinjaur (? پنجور) ১৮ ফারসাখ। এ স্থানটি পাহাড়ের মধ্যে। তার সম্মুখেই সমতলভূমিতে থানেশ্বর। পাহাড়ের
১৬৫ সানুদেশে জলন্ধর রাজ্যের রাজধানী Dalamala ১৮ ফারসাখ। তারপরে Ballawar, ৭০ ফারসাখ। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে গেলে ১৬ ফারসাখে

Laddah (لدّه Laddakh ?) পড়বে। তারপর 'রাজাধারি দুর্গ' পর্যন্ত ৮ ফারসাখ। সেখান থেকে উত্তর দিকে 'কাশ্মীর' ১৫ ফারসাখ।

কনৌজের দশ ফারসাখ পশ্চিম দিকে Diamau (? دیامو)। তারপর কুটি (? کتّی পর্যন্ত ১০, "আহার" (? اهار) পর্যন্ত আরও দশ; এবং দশ ফারসাখ অন্তর যথাক্রমে মীরাট ও পানি পথ। এই শেষোক্ত দুই স্থানের মধ্য দিয়ে যমুনা প্রবাহিত। সেখান থেকে Koital (کوہتل Kaithal) ১০, ও 'সুনাম' পর্যন্ত আরও দশ ফারসাখ।

এই স্থানে থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলে আদিত্যহৌর (? ادتهور) পড়ে ৯ ফারসাখে। Jajisner (Hajner) পর্যন্ত ৬, আর সেখান থেকে 'ইরাওয়া নদীর পূর্ব তীরে "লুহাউর"-এর রাজধানী 'মানদাহুকুর' (? منڈ هوکور) পর্যন্ত ৮ ফারসাখ, তারপর Chandraha নদী ১২ ফারসাখ, আর বিয়ত্ত' (বিয়াহ) নদীর পশ্চিমে Jelum পর্যন্ত ৮ ফারসাখ। সেখান থেকে সিন্ধুর পশ্চিম তীরে Qandhar-এর নগর Waihind পর্যন্ত ২০ ফারসাখ। পুরসাওর পর্যন্ত ১৪ আর দুন্বুর (? দুন পুর) পর্যন্ত আরও ১৫ ফারসাখ। তারপরে যথাক্রমে ১২ ও ১৭ ফারসাখে কাবুল ও গজনা।

কাশ্মীর সুউচ্চ ও দুর্গম পর্বত বেষ্টিত সমতল ভূমি। এর দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চল ভারতীয়দের; পশ্চিম ভাগ নিকটস্থ রাজাদের; তাদের মধ্যে নিকটতম হচ্ছে 'বলওর' শাহ (Balaur Shah بلور شاه, তারপর সকুনান্' শাহ Sakann Shah) (شکانی شاه); আর বাদাখ্শানের সীমান্ত পর্যন্ত বাকী অঞ্চল 'ওয়াখান' শাহের (Wakhan Shah وخان شاه)। কাশ্মীরের উত্তর ভাগ ও পূর্ব ভাগের কিছু অংশ তিব্বত ও খোটানের তুর্কীদের। ভোটেশ্বরের পর্বতচূড়া থেকে তিব্বত হয়ে কাশ্মীর পর্যন্ত পথের দূরত্ব প্রায় ৩০০ ফারসাখ হবে।

কাশ্মীরের অধিবাসীরা পদযাত্রী, তাদের না আছে আরোহণযোগ্য পশু, না আছে হাতী। তাদের গণ্যমান্যরা কাট (Katt) নামের একরকম আসনে চড়ে ভ্রমণ করেন, যা লোকেরা কাঁধে করে নিয়ে যায়। নিজ দেশের সীমান্ত রক্ষা সম্বন্ধে কাশ্মীরীরা খুব সচেতন, সেজন্য প্রবেশ পথগুলি নিজ আয়ত্তে রাখার জন্য ওরা সদা সচেষ্ট থাকে। এই কারণে ওদের সঙ্গে মেলামেশা সহজ
১১৬ নয়। পূর্বে দু'এক জন বিদেশী, বিশেষ করে ইহুদী ওদের দেশে প্রবেশ করতে পারত। কিন্তু এখন ওরা কোনও অপরিচিত হিন্দুকেও ঢুকতে দেয় না অন্যদের তো কথাই নাই।

কাশ্মীরে প্রবেশ করার সবচেয়ে সুপরিচিত পথ হচ্ছে বাবরহান (Babarhan) নামক গ্রাম থেকে। গ্রামটি সিন্ধু ও 'জিলম' নদীর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। সেখান থেকে 'কুসনারী (کسناری) ও 'মাহবি' (مهوی) নদীর সংগমস্থলের সেতু পর্যন্ত ৮ ফারসাখ। এ নদী দুটি শামিলা পর্বত থেকে বেরিয়ে 'জিলমে' এসে পড়েছে। সেখান থেকে জিলমের নির্গমন মুখের গিরিসংকট পর্যন্ত ৫ দিনের পথ। এই গিরিসংকটের অপর প্রান্তে জিলমের উভয় তীরে 'দ্বার' নামক শহর। সেখান থেকে কাশ্মীর যাত্রী উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে, দুদিন পর 'আদিশতান' নামক কাশ্মীরের নগরে পৌঁছবে। পথে, উপত্যকার দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত 'উশকারা' ও 'বারামুলা' নামক দুটি শহর পড়বে।

কাশ্মীর নগরের বিস্তৃতি ৪ ফারসাখ, জিলমের দুই তীরে অবস্থিত সেতু ও নৌকার দ্বারা উভয় তীর সংযুক্ত। 'জিলম' 'হরমকেট' (هرمكوت) নামক পর্বত থেকে বেরিয়েছে যার থেকে গঙ্গা বেরিয়েছে। এ পর্বত সুউচ্চ, হিমাবৃত ও দুর্ভেদ্য, তার তুষার কখনও গলেও না, অপসৃতও হয় না। তার পিছনে আছে 'মহাচীন'; পর্বত থেকে নির্গত হয়ে দুদিনের পথ অতিক্রম করার পর 'জিলম' নদী 'আদিশ্তান্' পৌঁছয়। আরও চার ফারসাখ এসে জিলম এক ফারসাখ বিস্তৃত একটি জলাভূমিতে প্রবেশ করে। এই জলাভূমির পার্শ্বে কাশ্মীরীদের চাষ আবাদের ক্ষেত আছে; জলার কিছু অংশও ওরা উদ্ধার করে চাষোপযোগী করে নিয়েছে। এই জলা থেকে বেরিয়ে জিলম উশকারা নগরে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে উপরোক্ত গিরিসংকটে প্রবেশ করে।

সিন্দু নদ তুর্কীস্তানের 'উনং' (اونـنگ) পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। সেখানে যেতে হলে, কাশ্মীর প্রবেশের গিরিসংকট পার হয়ে সমতল ভূমিতে পড়ার পর আরও দুইদিন ধরে Balaur ও Shamilan পর্বতদ্বয়কে তোমার বামে রেখে ভ্রমণ করতে থাকলে তুমি 'ভট্টাবর' (بهتاور) নামক তুর্কী জাতির কাছে এসে পড়বে। এদের রাজা 'ভট্টশাহ' (Bhatt Shah بهتشاه) আর শহরগুলির নাম গিল্‌গিত্‌, অস্‌বিরা (اسوره) ও 'শিলতাস্‌' (شلتاس)।
১৬৭ ভাষা তুর্কী। এদের লুঠতরাজের ভয়ে কাশ্মীর সর্বদাই সন্ত্রস্ত। রাজধানী পর্যন্ত যাত্রীর বাম দিকে কর্ষিত ভূমি পড়বে, আর ডানদিকে রাজধানীর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রাম পড়বে। তারপর যাত্রী 'কুলারজক' (کلارجک) পর্বতে উপনীত হবে। 'দুনমবান্দ' (? Demavend) পাহাড়ের

ন্যায় এর চূড়াটি গম্বুজের মত। তার তুষার কখনও গলে না। 'তাকেশর' ও 'লুহাউর' অঞ্চল থেকে চূড়াটি সর্বদা দেখা যায়। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে এই পর্বতচূড়ার দূরত্ব দুই ফারসাখ। 'রাজাগিরি' দুর্গ তার দক্ষিণে, আর 'লহুর' (لهور) দুর্গ তার পশ্চিমে। এ দুটি দুর্গের চেয়ে দৃঢ়তর দুর্গ আমি আর দেখিনি।

এই চূড়া থেকে 'রাজাওরি' শহর তিন ফারসাখ। আমাদের বণিকরা এই শহর পর্যন্তই ব্যবসায় করতে আসে, তার আগে তারা যায় না। এই হোল ভারতবর্ষের উত্তর সীমা।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তের পর্বতগুলিতে বিভিন্ন আফগান উপজাতিরা বাস করে—এরা প্রায় সিন্ধুদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্র। তার উপকূল Tiz (تيز) থেকে আরম্ভ হয়, যা মাকরানের রাজধানী। সেখান থেকে দেবল এর সীমানা পর্যন্ত ৪০ ফারসাখ জুড়ে এই উপকূল দক্ষিণ-পূর্ব মুখে চলে গিয়েছে। তিজ ও দেবলের মধ্যে 'তুরান' উপসাগর। উপসাগর একটি কোণ (angle) বা সর্পিল রেখার ন্যায় জলবিস্তার, যা সমুদ্র থেকে ভূভাগে প্রবেশ করে। নৌ-চলাচলের পক্ষে স্থানটি বিপজ্জনক, বিশেষ করে জোয়ার-ভাটার জন্য। 'খাড়ি' (estuary) উপসাগরেরই মত, তবে ভূভাগে প্রবিষ্ট সমুদ্র নয়। 'খাড়ি' সমুদ্রাভিমুখী জলধারা থেকে গঠিত হয়, যা সমুদ্র সংগমে এসে নিশ্চল জলরাশিতে পরিণত হয়। এই খাড়িগুলিও নৌচালনার পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ তার জল মিষ্ট বলে ভারি বস্তু লোনা জলের মত সহজে ভাসিয়ে রাখতে পারে না।

উপরোক্ত উপসাগরের পর আছে ছোট মন্নাহ (? Munnah منه) তারপর বৃহৎ 'মন্নাহ'। তারপর Bawari নামিত জলদস্যুরা। কচ্ছ ও সোমনাথ এদের ঘাঁটি। এদিকে Bawari বলার কারণ, এরা 'বিরা' নামক নৌকায় চড়ে
১৬৮ ডাকাতি করে। দেবল থেকে Towalleshar (تو ليشر) ৫০ ফারসাখ। সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে, লোহরানি ১২, 'বঘ' (?) ১২, কচ্ছ, যেখানে মুকুল নামক ফলের গাছ হয়, ও 'বারোই' (بارى) ৬, সোমনাথ ১৪ ও 'কাম্বায়াত ৩০ ফারসাখ। সেখান থেকে 'আসাওল' দুইদিনের পথ। তারপর ভারোচ ৩০ ফারসাখ, 'সন্দান' ৫০, 'সোবারা' ৬, ও 'তানা' ৫ ফারসাখ।

এখান থেকে উপকূল দেখা 'লারান' (لاران)-এর দিকে চলে গেছে। 'লারানের' মধ্যে আছে 'জীমুর' (? جيمور) তারপর 'বলভ' তারপর 'কনিজ' তারপর Darued (درود)। তারপরে এক বিরাট উপসাগর পড়ে। তারই

মধ্যে আছে 'সিঙ্গল দ্বীপ' অর্থাৎ 'সরনদ্বীব'। এই উপসাগরের কূলে আছে 'পঞ্জয়াবর' (پنجیاور) শহর। শহরটি জীর্ণ হয়ে যাওয়াতে ওদের রাজা 'জোর' (جاور চোল) তার পরিবর্তে পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে আর একটি শহর নির্মাণ করে, তার নাম রাখে 'পদনার'।

ভারতের সমুদ্র তীরের রেখা ধরে চললে উপরোক্ত সিংহল দ্বীপের পরে আসবে Ummalnara উম্মুনারা (او ماناره) তারপর রামেশ্বর, সরনদ্বীবের ঠিক বিপরীতে। শহর দুইটির মধ্যে মাত্র ১২ ফারসাখ সমুদ্রের ব্যবধান। 'পঞ্জয়াবর থেকে রামেশ্বর' ৪০ ফারসাখ; আর 'রামেশ্বর' থেকে 'সেতু বন্ধ' অর্থাৎ সমুদ্রের সেতু ২ ফারসাখ। এটি দশরথ পুত্র রাম কর্তৃক নির্মিত লংকার দুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বাঁধ। এখন এটি খণ্ডিত পর্বতের মত দেখতে, যার মধ্যে দিয়ে সমুদ্র বিস্তৃত। সেতুবন্ধ থেকে ১৬ ফারসাখ পূর্বদিকে "কিহ্‌কিন্দ" (কিষ্কিন্ধ্যা)। এটি বানরদের পর্বত। প্রতিদিন তাদের রাজা অনুচরসহ বেরিয়ে এসে তাদের জন্য পাতা আসনে বসে। সেখানকার অধিবাসীরা তাদের জন্য চাউল রন্ধন করে পাতায় করে সাজিয়ে বানরদের কাছে নিয়ে আসে। সেগুলি আহার করে বানররা আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। তাদের প্রতি অবহেলা করলে সে অঞ্চল বিনষ্ট হবে। কেননা বানরগুলি সংখ্যায় বিপুল এবং স্বভাবে-ও ভয়ংকর দুর্দান্ত। ওদের ধারণা যে এগুলি আসলে মানুষ, রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে রামকে সাহায্য করার জন্য বানরে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ঐ পার্বত্য অঞ্চলটি রাম ওদেরকে দান করে গেছেন। কেউ যদি এই বানরদের মধ্যে গিয়ে পড়ে আর সে রামের কাব্য গান ও রামমন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহলে ওরা চুপ করে থাকে আর মনোযোগ দিয়ে শোনে, এমনকি পথভ্রষ্ট হলে তাকে পথ দেখিয়ে দেয় ও আহার্য ও পানীয়ও
১৬৯ দেয়। এ গল্পে যদি বাস্তবিকই কোনও সত্য থাকে তাহলে বানরদের এই আচরণ সুরের প্রভাবের দরুনই হবে, যেমন বল্গা হরিণ সম্বন্ধে আমি বলেছি।

ভারত সাগরের পূর্বদিকের দ্বীপগুলি ভারতবর্ষের চেয়ে চীনের নিকটতর। এ দ্বীপগুলি হচ্ছে যবজ Zabaj, (زبج)। ভারতীয়রা যাকে সুবর্ণদ্বীপ (سورندیب) অর্থাৎ স্বর্ণদ্বীপ বলে থাকে। সমুদ্রের পশ্চিম ভাগে যে দ্বীপগুলি আছে, তা হাবশীদের, আর পূর্ব ও পশ্চিমের এই দ্বীপগুলির মাঝামাঝি আছে 'রুম্ম'—(رم) ও Maldive—Laccadive-এর দ্বীপসমূহ। কুমারের (قمير) দ্বীপও এ সবের অন্তর্ভুক্ত। দ্বীপগুলির বিশেষত্ব এই যে এগুলি ধীরে ধীরে জলের উপরে জেগে ওঠে। প্রথমে সমুদ্রের ওপর একটি বালুর চর

দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে এটি উঁচু, প্রশস্ত এবং শক্ত হতে থাকে। আর সেই সময়ে নিকটস্থ অন্য একটি দ্বীপ ক্ষয় হতে থাকে, মাটি গলে গলে অবশেষে জলের তলে অদৃশ্য হয়ে যায়। অধিবাসীরা এ ব্যাপারে লক্ষ্য করা মাত্র অন্য একটি উর্বর দ্বীপের সন্ধান করতে থাকে এবং সেখানে তাদের নারিকেল, খেজুর, শস্য ও গৃহ সামগ্রী নিয়ে গিয়ে বাস করতে থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যানুযায়ী এই দ্বীপগুলি দুইভাগে বিভক্ত—কতকগুলি 'দিব্-কুড়া' (دیوه کوزه) অর্থাৎ কড়ির দ্বীপ, কারণ জল মধ্যে নারিকেলের শাখা রেখে তার থেকে কড়ি সংগ্রহ করা হয়। অন্যগুলি (دیوه کنبار) অর্থাৎ যে দ্বীপে নারিকেলের ছোবড়া পাকিয়ে দড়ি করা হয়; নৌকার তক্তাগুলিকে বেঁধে রাখার জন্য এই দড়ি ব্যবহার হয়।

'ওয়াক-ওয়াক' দ্বীপ কুমারের দ্বীপসমূহের অন্তর্গত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কুমায়ের একরকম গাছের নাম বাতে শব্দকারী মানবমুণ্ড ফলের মত ধরে থাকে। আসলে কিন্তু তা নয়। কুমায়ের সাদাটে বর্ণের একপ্রকার খর্বকায় জাতির নাম। দেখতে এরা অনেকটা তুর্কীদের মত, কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম পালন করে এবং কর্ণ ছেদন করে। 'ওয়াক-ওয়াক' দ্বীপের কতক অধিবাসীর রঙ কালো। আমাদের দেশগুলিতে দাস হিসাবে এদের অনেক চাহিদা আছে। এদেশ থেকে লোকে আবলুস কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আবলুস আসলে গাছের মধ্যভাগ, যার বহিরাংশ ফেলে দেওয়া হয়। 'মুলাম্মা' (صاىع) 'শওহত্ব' (شو حط) ও হলুদ রঙের চন্দন কাঠ অবশ্য হাবশী দেশ থেকে সংগৃহীত হয়। পূর্ব কালে সরন্দীব উপসাগরে মুক্তা পাওয়া যেত, এখন আর পাওয়া যায় না। এখান থেকে অদৃশ্য হবার পর হাবশী দেশের Supala-তে শুক্তি
১৭০ পাওয়া যেতে লাগল। সেজন্য লোকে বলে যে শুক্তিগুলি এখান থেকে Supala-তে চলে গেছে।

গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ সময়কে ওরা 'বর্ষাকাল' বলে। দেশ যত উত্তরে হবে এবং পর্বত প্রাচীর যে দেশে যত কম হবে বৃষ্টি সে দেশে তত বেশী ও দীর্ঘকাল ব্যাপী হবে। মুলতানের লোকেরা আমায় বলত—ওদের 'বর্ষাকাল' নাই, কিন্তু ওদের আরও উত্তরে পাহাড়ের নিকটবর্তী দেশে 'বর্ষাকাল' আছে। 'ভাতল' (بهاتل) ও ইন্দ্রাবেদে (اند ر بید) 'আষাঢ়' মাস থেকে বর্ষাকাল আরম্ভ হয় এবং অভিশ্রান্ত বর্ষণ হতে থাকে, যেন পূর্ণঘড়া থেকে জল পড়ছে। আরও উত্তরে 'দন্বুর' (دنبور) ও 'পুরাশাওর' (? পুরুষপুর-পেশাওর)-এর মধ্যবর্তী 'জোদরীর' (جودر) চূড়া পর্যন্ত কাশ্মীর। পাহাড়ের চতুর্দিকে শ্রাবণ মাস থেকে আরম্ভ করে আড়াই মাস ধরে

প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 'জোদরী'র চূড়ার পিছনে কিন্তু মোটেই বৃষ্টি হয় না। তার কারণ, সেখানকার মেঘগুলি ভারি, ভূমি থেকে বেশী ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। সেজন্য মেঘগুলি এখানে পৌঁছলে পাহাড়ের গায়ে লেগে বৃষ্টি হয়ে পেষা আঙুরের রসের মত তার থেকে জল গড়িয়ে পড়ে এবং মেঘগুলি এই পাহাড় অতিক্রম করে আর যেতে পারে না। সেজন্য কাশ্মীরে বর্ষাকাল হয় না। তবে 'মাঘ' থেকে আড়াই মাস ধরে অবিশ্রান্তভাবে তুষারপাত হতে থাকে। 'চৈত্র' মাসের শুক্ল পক্ষের পরই কয়েকদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকে। তাতে বরফ গলে ও মাটি ধুয়ে যায়। এই রীতির ব্যতিক্রম কদাচিৎ হয়ে থাকে; তবে, আবহাওয়ার ব্যতিক্রম ভারতের সব প্রদেশকেই কিছু কিছু সহ্য করতে হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়

গ্রহ-নক্ষত্রাদির নাম, চন্দ্রের কক্ষপথ ও অনুরূপ বিষয়

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে আমি উল্লেখ করেছি যে, মৌলিক ও ব্যুৎপন্ন (original & derivative) উভয় প্রকারের বিশেষ্য পদে ভারতীয়দের ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একটি বস্তুকে ওরা বহু নামে অভিহিত করে থাকে। আমি ওঁদিগকে বলতে শুনেছি যে ওদের ভাষায় সূর্যের সহস্র নাম আছে।
১৭১ প্রত্যেকটি নক্ষত্রের জন্য নিশ্চয় প্রায় অতগুলো নামই আছে কেননা অজস্র বিশেষ্য পদ না হলে ওদের চলে না। ওরা সপ্তাহের দিবসের নামকরণ করে সপ্তগ্রহের সবচেয়ে প্রচলিত নামের সাথে 'বার' শব্দ জুড়ে। ফারসীতে শুনবা (شنبه) শব্দটি যেমন সাপ্তাহিক দিবস (week days) সংখ্যার পরে বসে 'বার' শব্দটিও তেমনিই গ্রহের নামের পরে থাকে এইভাবে,

১। আদিত্যবার —সূর্য দিবস
২। সোমবার —চন্দ্রদিবস
৩। মঙ্গলবার —মঙ্গল গ্রহের দিবস
৪। বুধবার —বুধগ্রহের দিবস
৫। বৃহস্পতিবার —বৃহস্পতি গ্রহের দিবস
৬। শুক্রবার —শুক্রগ্রহের দিবস
৭। শনৈশ্চর বার —শনিগ্রহের দিবস

শনিগ্রহের দিবস পর্যন্ত এসে ওরা আবার সূর্য দিবসে ফিরে যায়।

আমাদের জ্যোতিষীরা গ্রহগুলিকে দিবাধিপতি বলে থাকে। দিবসের প্রহর গণনা করার জন্য তারা দিবাধিপতি থেকে আরম্ভ করে গ্রহগুলিকে উপর থেকে নীচের দিকে গণনা করে যায়। যেমন, সূর্য রবিবারের অধিপতি আর তার প্রথম প্রহরের অধিপতিও বটে। দ্বিতীয় প্রহর সৌরমন্ডলের নিকটতম গ্রহ অর্থাৎ, শুক্রগ্রহের অধীন। তৃতীয় প্রহর বুধ ও চতুর্থ প্রহর চন্দ্রের অধীন। ঈথরের দিকে সূর্যের আরোহণ এইখানেই শেষ হয়। সেজন্য প্রহর গণনার জন্য আবার শনিগ্রহে ফিরে যায়। এই রীতি অনুযায়ী দিবসের ২৫তম ভাগের প্রভু হয় চন্দ্র। এই ২৫তম ভাগ আবার সোমবারের প্রথম প্রহর

(شاه کَ), কাজেই কেবল চন্দ্র সোমবারের প্রথম প্রহরেরই অধিপতি নয়, সমস্ত দিবসেরও অধিপতি।

এই ব্যাপারে আমাদের ও ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র এক বিষয়ে পার্থক্য
১৭২ আছে। আমাদের জ্যোতিষীরা রাত্রি ও দিবসের প্রত্যেকটিকে সমানভাবে বার ভাগে ভাগ করার প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে। তার দরুন দিবারম্ভের ১০শ প্রহর বা ভাগ পরবর্তী রাত্রির প্রথম প্রহর হয়, কিন্তু অন্য দিক থেকে অর্থাৎ নিম্নের গ্রহমণ্ডলী থেকে ঊর্ধ্বের গ্রহমণ্ডলীর দিকে গণনা করলে এই প্রহরটি তৃতীয় গ্রহের ভাগে পড়ে। অপরপক্ষে, ভারতীয়রা দিবাধিপতিকে সমস্ত দিবা-রাত্রির অধিপতি বলে ধরে। তার জন্য রাত্রি দিবসের ভাগ্যের অনুসরণ করে, তাদের প্রত্যেকের কোনও পৃথক অধিপতি থাকে না।

ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশ এই রীতিই পালন করে।

ওদের সময় গণনা পদ্ধতি দেখে কখনও কখনও আবার এও মনে হয় যে দিবা ও রাত্রির সমান সমান বার ভাগে ভাগ করবার প্রাচীন রীতি ওদের একেবারে অজানা নয়। ঘণ্টাকে ওরা 'হর' বলে থাকে; আবার নিম্বহর (অর্ধহর) গণনা করতে সূর্যের দ্বাদশ রাশির অর্ধাংশকেও ওরা এই নামে অভিহিত করে। ওদের কোনও জ্যোতিষ পঞ্জিকায় প্রহরাধিপতি নির্ধারণের নিম্নলিখিত পদ্ধতি দেখেছিলাম: সমানভাগে বিভক্ত সূর্যের আরোহণ পথের (الطالع ascendens) ডিগ্রি থেকে সূর্যের অবস্থিতির দূরত্বকে ১৫ দিয়ে ভাগ কর, ভগ্নাংশ থাকলে তা উপেক্ষা করে ভাজকের সঙ্গে এক যোগ দাও। লব্ধ সংখ্যা দিয়ে দিবাধিপতি গ্রহ থেকে আরম্ভ করে তার পরবর্তী নীচের গ্রহগুলিকে ক্রমানুয়ে গুণে গেলে সর্বশেষে যে গ্রহটি পড়বে সেইটি হবে উদ্দীষ্ট প্রহরের অধিপতি। এই গণনা রীতি দিবারাত্রির প্রত্যেককেই সমান বার ভাগে ভাগ করার প্রাচীন রীতির নিকটতর।

সপ্তাহের দিবসগুলির পারম্পর্য বা ক্রম অনুযায়ী গ্রহগুলির নামোল্লেখ করা ভারতীয়দের অভ্যাস। পঞ্জিকা ও অন্যান্য পুস্তকে ওরা এই রীতিই পালন করে, শুদ্ধ হলেও অন্য কোনও বিন্যাস ব্যবহার করতে ওরা রাজী হয় না।

সহজভাবে astrolalbe-এ গ্রহগুলির সীমানা বা স্থান নির্দিষ্ট করার জন্য গ্রীকরা বিভিন্ন ছবি বা আকৃতি ব্যবহার করে। এ ছবিগুলি কোনও অক্ষর নয়। হিন্দুরাও এইরূপ সংক্ষেপণ চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে বটে, কিন্তু ওদের এ চিহ্নগুলি বিশেষভাবে উদ্ভাবিত কোনও আকৃতি বা ছবি নয়। এগুলি

বিভিন্ন গ্রহের নামের আদ্য অক্ষর মাত্র। যেমন, সূর্যের জন্য আদিত্য-এর প্রথম অক্ষর "আ", চন্দ্রের "চ", বুধের "ব"। নীচের সারণীতে আমরা সপ্তগ্রহের সবচেয়ে প্রচলিত নামের তালিকা দিচ্ছি।

১৭৩

গ্রহ	ভারতীয় ভাষায় তাদের নাম
সূর্য	আদিত্য, সূর্য, ভানু, অর্ক, দিবাকর, রবি বিবতা (? বিবস্বনিহ) বিভা, হিল
চন্দ্র	সোম, চন্দ্র, ইন্দু, হিমাগ, (? হিমাংশু) শীতরশ্মি, হিমরশ্মি, শীতাংশু, শীতাদিধতি, হিমময়ূখ।
মঙ্গল المريخ	মঙ্গল, ভৌম্য, গুজ (? কুজ ?), আর, বক্র, আগ্নেয়, মাহেয়, কুরাক্ষি, রক্ত।
বুধ عطارد	বুধ, সৌম্য, চান্দ্র, জ্ঞ, বোধনা, বিত (? বিত্ত ?), হেম্ন।
বৃহস্পতি المشتری	বৃহস্পতি, গুরু, জীব, দেবেজ্য, দেবপুরোহিত, দেবমন্ত্রী, অঙ্গিরা, সুর, দেবপিতা।
শুক্র الزهرة	শুক্র, ভৃগু, সীতা, ভার্গব, আসপতি (?), দানবগুরু ভৃগুপুত্র, আশ্বজ (?)
শনি زحل	শনৈশ্চর, মন্দ, অসিত, গুণ, আদিত্যপুত্র, সৌর, আর্কি, সূর্যপুত্র।

১৭৪ সূর্যের এইরূপ বহু নাম থাকাতে ওদের শাস্ত্রকারেরা বহু সূর্যের অস্তিত্ব কল্পনা করেছে, সেজন্য ওদের ধারণা মতে, ১২টি সূর্য আছে, প্রতি মাসে এক একটি করে উদয় হয়। বিষ্ণু ধর্মগ্রন্থে উক্ত হয়েছে : "বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ, যাঁর আদিঅন্ত কালাধীন নয়, দেবতাদের জন্য নিজেকে ১২ ভাগে ভাগ করলেন; এই ভাগগুলি কাস্যপের পুত্রে পরিণত হল। প্রত্যেক মাসে এরাই পর পর উদিত হয়।" নামের আধিক্যকে দ্বাদশ সূর্যের অস্তিত্ব কল্পনার কারণ বলে যারা বিশ্বাস করে না, তারা বলে থাকে যে অন্য গ্রহগুলিরও এরূপ একাধিক নাম আছে, অথচ তাদের প্রত্যেকের অবয়ব মাত্র একটি 'তাছাড়া, সূর্যের নামও' মাত্র ১২টি নয়, আরও বহু নাম আছে। এ নামগুলি সব অর্থবাচক শব্দ থেকে এসেছে, যেমন, আদিত্য, অর্থাৎ সূচনা, কারণ সূর্যই সকল বস্তুর আরম্ভ। আর একটি নাম 'সবিতা' এর অর্থ এমন জীব যার সন্তান সন্ততি জন্মায়। যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত বংশপরম্পরা সূর্য থেকেই আরম্ভ হয়েছে, সেজন্য তাকে সবিতা বলা হয়। সূর্যের আর এক নাম

রবি, কারণ সমস্ত আর্দ্র বস্তুকে শুখিয়ে দেয়। উদ্ভিদে যে জলীয় অংশ আছে তাকে রস বলা হয়; যে সেই রস শোষণ করে, তার নাম রবি।

চন্দ্র সূর্যের সহচর ও অনুবর্তী। তারও অনেক নাম আছে। তার মধ্যে একটি নাম সোম। কারণ চন্দ্র সাফল্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক। সৌভাগ্যকে 'সোমগ্রহ' বলা হয়, আর অকল্যাণ বা দুর্ভাগ্যকে বলা হয় 'পাপগ্রহ'। এমনই আরও কয়েকটি নাম: নিশেশ, অর্থাৎ রাত্রির অধিপতি, নক্ষত্রনাথ, অর্থাৎ চন্দ্রপত্নিগণের অধিপতি, দীজেশ্বর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রভু, শীতাংশু, অর্থাৎ যা সূর্য কিরণকে শীতল করে, কেননা চন্দ্রমণ্ডল জলময়, আর তা পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, চন্দ্রের উপর সূর্যকিরণ পড়লে চন্দ্রের মতই সে কিরণ শীতল হয়ে যায় এবং প্রতিবিম্বিত হয়ে অন্ধকারকে আলোকিত করে রাত্রিকে শীতল করে এবং সূর্যতাপের ক্ষতিকারক দহনকে প্রশমিত করে। নারায়ণের বাম চক্ষুর নামও 'চন্দ্র' যেমন সূর্য তার দক্ষিণ চক্ষু।

প্রতিমাসের সূর্যের যে সব পৃথক নাম আছে নীচের নির্ঘণ্টে তার তালিকা দিচ্ছি। বিভিন্ন পৃথিবীর সংখ্যানির্ণয় নিয়ে মতভেদের যে সব কারণ আমি অন্যত্র বলেছি, এই তালিকাভুক্ত সূর্যের নামের বিন্যাসে পার্থক্যের মূলেও সেই সব কারণ বিদ্যমান।

১৭৫

মাসের নাম	"বিষ্ণুধর্ম" অনুসারে মাসের নির্দিষ্ট সূর্যের নাম	বিষ্ণু ধর্ম অনুসারে নামের অর্থ	আদিত্য পুরাণেবর্ণিত সূর্যের নাম	লোকশ্রুতি অনুযায়ী নাম
চত্র	বিষ্ণু	নভমণ্ডলে অভিরাম চলমান	অংশুমান	রবি
বৈশাখ	আরযম	দুষ্টের দমনকারী ও শাস্তিদাতা, যার ভয়ে তারা তার বিরুদ্ধাচরণ করে না।	সবিতা	বিষ্ণু
জিরিৎ (জ্যৈষ্ঠ)	বিবস্বান্ত	খণ্ডিতভাবে না দেখে যে সমগ্রকে দেখে	ভানু	ধাতা (ধাত্রি ?)
আষাঢ়	অংশু	কিরণমালী	বিবস্বান্ত	বিধাতা
শ্রাবণ	পার্যণ্য	বৃষ্টি ধারার মত যে সাহায্য করে।	বিষ্ণু	আরযম

ভাদ্র	রজন	যে সমগ্রকে নির্মাণ করে	ইন্দ্র	ভগ
অশ্বযুজ	ইন্দ্র	অধিপতি ও প্রধান	ধাতা	সবিতা
কার্তিক	ধাতা	মানুষের কল্যাণ ও তাঁদিগকে নিয়ন্ত্রণ করে।	ভগ	পূশন
মন্ঘব (মার্গশীর্ষ)	মিত্র	জগতের প্রিয়	পূশন ڈوخ	ত্বষ্টা تُوشت
পৌষ	পূষণ	পুষ্টি, কারণ সে মানবকে পুষ্ট করে।	মিত্র	অর্ক
মাঘ	ভগ	শ্রী, যা জগতে ইপ্সিত	বরুণ	দিবাকর
ফাল্গুন	দুঅর্ত (?)	যে সকলের মঙ্গল বিধান করে।	আর্যম	অংশু

১৭৬ 'বিষ্ণুধর্ম' থেকে সূর্যের এই নামগুলির পারম্পর্য উদ্ধৃত করা হোল সে সম্বন্ধে লোকের ধারণা যে, এই বিন্যাস শুদ্ধ ও নিখুঁত। কারণ প্রত্যেক মাসের জন্য বাসুদেবের ভিন্ন নাম আছে; তাঁর উপাসকরা 'মনঘর' (মার্গশীর্ষ) থেকে যে মাস গণনা আরম্ভ করে, সেই মাসে বাসুদেবের নাম 'কেশব'। মাসানুযায়ী তাঁর নামগুলি গুণে গেলে তাঁর চৈত্র মাসের বিষ্ণু নাম বিষ্ণু ধর্মের তালিকার উক্তিমত পাওয়া যাবে।

গীতাতে বলা হয়েছে : 'আমি বসন্তের মত, অর্থাৎ ষড়ঋতুর মহাবিষুবের মত'। এর থেকে উপরোক্ত তালিকার প্রথম নামের শুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মাসের নামগুলি বিভিন্ন চন্দ্রকক্ষার (bunar stations) নামের সঙ্গে যুক্ত। প্রতি মাসে এইরূপ একাধিক কক্ষা থাকে, তার যে কোনও একটি থেকে সেই মাসের নাম গ্রহণ করা হয়। নীচের এই সারণিতে আমরা সেইরূপ নামগুলি বড় অক্ষরে লিখেছি, যাতে করে মাসের নামের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট হয়। আরও উল্লেখনীয় যে, এইরূপ কোনও কক্ষাতে যদি বৃহস্পতি আলোকপাত করে তাহলে এই কক্ষার যে মাস, সে মাসকে সেই বৎসরের অধিপতি (dominant) বলে ধরা হয় এবং সমস্ত বৎসরকে এই মাসের নামে অভিহিত করা হয়।

নীচে প্রদত্ত নামগুলির সঙ্গে যদি পূর্বোল্লিখিত মাসের প্রভেদ দেখা যায়, তাহলে তার কারণ হিসাবে মনে রাখা উচিত যে আমাদের পূর্বোল্লিখিত নামগুলি সাধারণ্যে চলিত নাম; নীচের নামগুলিই আসলে শুদ্ধ।

১৭৭

মাস	কক্ষার সংখ্যা	চন্দ্রকক্ষা	মাস	কক্ষার সংখ্যা	চন্দ্রকক্ষা
কার্তিক	৩	**কার্ত্তিক**	বৈশাখ	১৬	বিশাখা
	৪	রোহিণী		১৭	অনুরাধা
	৫	**মৃগশীর্ষ**	জিরুত্	১৮	**জ্যেষ্ঠ**
(মার্গশীর্ষ)	৬	আর্দ্র	(জৈষ্ঠ)	১৯	মূল
পৌষ	৭	পুনর্বসু		২০	**পূর্বাষাঢ়**
	৮	**পৌষ**	আষাঢ়	২১	**উত্তরাষাঢ়**
মাঘ	৯	আশ্লেষ	শ্রাবণ	২২	**শ্রাবণ**
	১০	**মঘ**		২৩	ধনিষ্ঠ
ফাল্গুন	১১	**পূর্বফাল্গুনী**	ভাদ্রপদ	২৪	(শতভিজ)
	১২	উত্তরফাল্গুনী		২৫	**পূর্বভাদ্রপদ**
	১৩	হস্ত		২৬	**উত্তরা ভাদ্রপদ**
চৈত্র	১৪	**চিত্রা**	অশ্বয়ুজ	২৭	রেবতি
	১৫	স্বাতি	—	১	**অশ্বিনী**
				২	ভরনি

১৭৮ অন্যসব জাতির মধ্যে যেমন, ভারতীয়দেরও রাশিচক্রের (Zodiac) প্রতীক চিহ্ন অনুযায়ী রাশিগুলির নাম আছে। তৃতীয় রাশির নাম 'মিথুন', অর্থাৎ বালক ও বালিকার যুগলমূর্তি', প্রকৃতপক্ষে এটি 'যমজ' রাশিচিহ্নের-ই অন্য নাম।

'বৃহৎ জাতক' গ্রন্থে বরাহমিহির বলেছেন যে মিথুন রাশির চিহ্ন গদা ও বীণাধারী মানব। এ উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি মিথুন রাশিকে কালপুরুষের চিহ্ন বলে ধরেছেন। জনসাধারণের মধ্যেও এই ধারণা এত বিস্তৃত যে, তার দরুন এই রাশিটির নামই al Jauzah দাঁড়িয়ে গেছে, যদিও এই চিহ্নের রাশি al Jauzah নয়।

ষষ্ঠরাশির চিহ্ন বরাহমিহির নৌকা ও তার হস্তে ধৃত যব শীর্ষ বলে বর্ণনা করেছেন। মনে হয় আমার ব্যবহৃত পুঁথির লিপিতে কিছু শব্দ বা অংশ বাদ গেছে, কেননা নৌকার ত হাত থাকে না। ভারতীয়রা এই রাশিকে 'কন্যা' বলে' অর্থাৎ কুমারী স্ত্রী। বোধ হয় বাক্যটিতে ছিল 'নৌকায় আসীন কুমারী, তার হাতে যবশীর্ষ'। এটি আমাদের (السمک الاعزل) (spica virginis)

রাশি। নৌকার উল্লেখ থেকে মনে হয়, গ্রন্থকার । لعز । (verginis) নামক চন্দ্রকক্ষার কথা বলছেন। কারণ এ তারাগুলির অবস্থান একটি সরল রেখার (line) ন্যায় যার দুই প্রান্তভাগ নৌকার মত বাঁকা।

বরাহমিহির বলেছেন ঃ অগ্নি সপ্তম রাশির চিহ্ন ও তার নাম 'তুলা'। তিনি আরও বলেছেন দশম রাশির মুখ অজের, আর দেহাংশ মকরের ন্যায়। মকর বলে বর্ণনা করার পর অজমুখের কথা আর না বললেও চলত। শুধু ইউনানীরাই এইরূপ বর্ণনার প্রয়োজন অনুভব করত, কারণ ওরা এই রাশিচিহ্নকে দুইটি জন্তুর সংমিশ্রণ বলে কল্পনা করত যার উর্ধ্বভাগ ছাগ এবং নিম্নভাগ মাছ। মকর নামে যে জলজন্তুর বর্ণনা লোকে দিয়ে থাকে, তাকে দুই জন্তুর সংমিশ্রণ বলে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন করে না।

একাদশ রাশি চিহ্নের বর্ণনায় বরাহমিহির বলেছেন যে এটি কলস; তার 'কুম্ভ' নাম এই বর্ণনার অনুযায়ী। তবে ওরা কখনও কখনও এই চিহ্ন বা তার অংশ বিশেষকে মানবাকৃতির মধ্যে গণ্য করে থাকে। তার থেকে প্রমাণ হয়
১৭১ যে ইউনানীদের মতানুসরণ করে ভারতীয়রাও এই চিহ্নকে জলসিঞ্চনরত মানব (Aquarius) রূপে কল্পনা করে। দ্বাদশরাশির চিহ্নকে (মীন) বরাহমিহির দুইটি মৎস্যের আকৃতি বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও সব ভাষাতেই এই নামদ্বারা একটি মৎস্যই বোঝায়।

রাশিচিহ্নের এ সব নাম ছাড়া, বরাহমিহির আরও কতকগুলি স্বল্প পরিচিত ভারতীয় নামের উল্লেখ করেছেন। নীচের নির্ঘণ্টে আমি এই দুই রকম নাম-ই অন্তর্ভুক্ত করেছি।

রাশি	সাধারণ নাম	অপ্রচলিত নাম	রাশি	সাধারণ নাম	অপ্রচলিত নাম
০	মেষ	ক্রিয়	৬	তুলা	যুগ
১	বৃষ	তাম্বির (?)	৭	বৃশ্চিক	কৌর্ব
২	মিথুন	জিতুম	৮	ধনু	তৌক্‌সিক্‌
৩	কর্কট	কুলির	৯	মকর	অগকিরা
৪	সিংহ	লিয়ায়	১০	কুম্ভ	উদ্রুতগ
৫	কন্যা	পার্তিন	১১	মীন	অন্ত, জীতু

রাশিচিহ্নের গণনাকালে আমাদের মত মেষরাশিকে শূন্য (o) ও বৃষরাশিকে এক ধরে আরম্ভ করা কিন্তু ওদের রীতি নয়। ওরা মেষ রাশিকে এক, বৃষকে দুই, এইভাবে গণনা আরম্ভ করে; এবং মৎস্য রাশিতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ হয়।

বিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ড

'ব্রহ্মান্ডের অর্থ' ব্রহ্মের ডিম্ব। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি সমস্ত "ইথর" বা গগনমণ্ডল সম্বন্ধে তার গোলাকৃতি ও গতির জন্য-ই প্রযুক্ত হয়। এমন কি
১৮০ ঊর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগে বিভক্ত থাকার জন্য পৃথিবীকেও ব্রহ্মান্ড বলা হয়। ভারতীয়রা আকাশের সংখ্যা গণনা করার সময় তার সমষ্টিকে 'ব্রহ্মান্ড' বলে। তার কারণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চায় ওদের তেমন অধ্যবসায় নাই এবং জ্যোতিষের সঠিক ধারণাও ওদের নাই। সেজন্য আকাশমন্ডলকে স্থির নিশ্চল বলে ওরা বিশ্বাস করে। বিশেষ করে স্বর্গের সুখকে পার্থিব সুখের মত বর্ণনা করে আকাশকে ওরা দেবতাদের বাসস্থান বলে কল্পনা করে বলে, যারা গমনাগমন ও নীচে নামার ক্ষমতা-সম্পন্ন।

ভারতীয় শ্রুতির রহস্যময় ভাষায় বলা হয়, 'আদিতে জল ছিল এবং তা পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপ্তিকে পূর্ণ করে রেখেছিল। এটি নিশ্চয়ই পুরুষ-হোরোরের প্রথম প্রহরের গঠন-মিশ্রণের প্রারম্ভিক ব্যাপার।' ওরা বলে : 'জলে তরঙ্গ ও ফেন হতে থাকলে তার থেকে একটি শ্বেতকায় বস্তুর আবির্ভাব হোল; সে বস্তু থেকে স্রষ্টা 'ব্রহ্মান্ড' সৃষ্টি করলেন'। ওদের কারও কারও মতে, সে অন্ডটি ভেঙে ফেলে তার থেকে ব্রহ্ম নির্গত হলেন অন্ডের অর্ধেক ভাগ আকাশ ও অন্য ভাগ পৃথিবী, আর দুইভাগের মধ্যকার চূর্ণগুলি বৃষ্টিতে পরিণত হোল। বৃষ্টি না বলে, ওরা যদি পর্বত বলত তাহলে ব্যাপারটি আরও আপাত সম্ভব মনে হোত। অন্য একদল বলে যে ঈশ্বর ব্রহ্মকে বললেন : 'আমি একটি অণ্ড সৃষ্টি করছি, তার মধ্যে তুমি বাস করবে বলে।' তিনি উপরোক্ত জলের ফেন থেকে সেই অন্ড সৃষ্টি করলেন। কিন্তু মৃত্তিকা যখন জলকে শুষে নিল, অন্ডটি তখন ভেঙে দুখন্ড হয়ে গেল।

চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কারক Ascelpius সম্বন্ধেও ইউনানীদের এই রকম ধারণা ছিল। Galenus যেমন বলেছেন : 'Ascelpius এর মূর্তি নির্মাণ করার সময় ওরা তার হাতে একটি ডিম্ব ধরিয়ে রাখে। তার দ্বারা ওরা ইঙ্গিত করে যে পৃথিবী গোল, ডিম্বটি পৃথিবীর আকার এবং সমস্ত পৃথিবীই

চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োজন বোধ করে'। ইউনানীদের বিশ্বাস Ascelpius এর যে স্থান হিন্দুদের বিশ্বাস ব্রহ্মার স্থান তার চেয়ে কিছুমাত্র হীন নয়। কারণ ইউনানীরা বলে, Ascelpius হচ্ছে ঐশী শক্তি, তার কর্ম থেকেই তার এরূপ নামকরণ হয়েছে, অর্থাৎ শুষ্কতা রোধ করা, কারণ শুষ্কতা ও শীত বৃদ্ধি হলেই মৃত্যু ঘটে। Ascelpius-এর প্রাকৃতিক উৎপত্তি সম্বন্ধে ওরা বলে যে তিনি Apollo-র পুত্র, Plaguares (ذلاغوارس)-এর পুত্র, এবং
১৮১ Kronos অর্থাৎ শনিগ্রহেরও পুত্র। এ ত্রিবিধ উৎপত্তি কল্পনা করে ওরা Ascelpius-এ ত্রিশক্তিসম্পন্ন দেবত্ব আরোপ করতে চায়।

হিন্দুরা সৃষ্টির আদিতে যে জলের অস্তিত্ব কল্পনা করে থাকে, তার কারণ, জল দ্বারাই সমস্ত অণু-পরমাণুর সংযুক্তি (تماسک) হয়, সমস্ত কিছুর বৃদ্ধি ঘটে এবং সমস্ত প্রাণীর জীবন টিকে থাকে। কাজেই, জল স্রষ্টার হাতে যন্ত্র বিশেষ, পদার্থ থেকে কিছু সৃষ্টি করার উপাদান। এইভাব কোরআনেও আল্লার এই বাণীতে ব্যক্ত করা হয়েছে : 'তাঁর 'আরশ' জলের উপর ছিল'। আরশ্ শব্দে তুমি বাহ্যিকভাবে ঐ নামে কোনও নির্দিষ্ট বস্তুই মনে কর, যাকে সম্মান করতে আদিষ্ট হয়েছ, কিম্বা আল্লাহ্‌র রাজ্য বা ঐরূপ কোন গূঢ় ভাবই ধরে নাও, এখানে অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত জল আর আরশ্ ছাড়া আর কিছু সেই সময়ে ছিল না। আমার এই পুস্তকটিকে যদি মাত্র একটি (হিন্দু) জাতির বিবরণে সীমাবদ্ধ না রাখতে হোত, তাহলে আমি 'বাবেল' (Babylon) ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জাতিদের বিশ্বাস থেকে, এই অণ্ডের ধারণার মত, কিম্বা তার চেয়েও বেশী মূঢ়তার পরিচায়ক ধারণার কথা উল্লেখ করতে পারতাম।

অণ্ডের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা ওরা যা বলে তার থেকে প্রমাণ হয় যে যে এই ধারণার প্রবর্তন করেছে, সে স্থূলবুদ্ধির অতি সাধারণ লোক। ডিম্বের কুসুম (Yoek) যেমন ব্রহ্মাণ্ডের খোসার অন্তর্ভুক্ত, পৃথিবীও যে তেমনই গগনমণ্ডল বা ঈথরের অন্তর্ভুক্ত, সে কথা সে বুঝতো না। সে মনে করেছে যে পৃথিবী নীচে, আর আকাশ ছয় দিকের মধ্যে মাত্র একদিকে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধের দিকে অবস্থিত। যদি সে প্রকৃত অবস্থা জানত, দ্বিখণ্ডিত অণ্ডের কল্পনা করা তার প্রয়োজন হোত না। তবে তার কথার উদ্দেশ্য ছিল, যে অণ্ডের অর্ধেক পৃথিবীরূপে বিস্তৃত ও অন্য অর্ধেক গম্বুজের ন্যায় তার উপর রক্ষিত আছে। এভাবে সমতল গোলকের (Planisphere) বর্ণনায় সে যেন Ptolemy-কেও ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি।

এই রকম উৎকট ধারণা সব যুগেই চলে আসছে। যার যেমন ধর্মবিশ্বাস, সেইভাবে সে তার ব্যাখ্যা করে থাকে। Timaes গ্রন্থে Plato 'ব্রহ্মাণ্ডের'
১৮২ মতই কথা বলেছেন : 'বিধাতা একটি সরল সুতাকে অর্ধেক করে দুভাগে কেটে নিলেন; প্রত্যেক অংশ দিয়ে তিনি একটি করে বৃত্ত রচনা করলেন এমনভাবে, যেন বৃত্ত দুইটি দুইটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে; একটি বৃত্তকে তিনি আবার সাতভাগে ভাগ করলেন'। তাঁর অভ্যাস মত, Plato একথা বলে, বিশ্বের বিষুববৃত্তিক (Equinoctial) ও আহ্নিক (diurnal) গতিদ্বয় ও গ্রহগোলকের প্রতি সাংকেতিক ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন।

'ব্রহ্মসিদ্ধান্তের' প্রথম অধ্যায়ে, যেখানে চন্দ্রকে প্রথম আকাশে ও শনি পর্যন্ত বাকী ছয়টি গ্রহের প্রত্যেকটিকে পরবর্তী এক একটি আকাশে রেখে তার সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন : "অষ্টম আকাশে স্থির নক্ষত্র আছে। চিরস্থির থাকার জন্য এই আকাশকে গোলাকার করা হয়েছে, যার মধ্যে শিষ্টকে পুরস্কার ও দুষ্টকে শাস্তি দেওয়া হয়, কারণ এ আকাশের পিছনে আর কিছুই নাই।" এই অধ্যায়ে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে, গ্রহগুলিই আকাশ। তবে, সে গ্রহগুলির যে ক্রমবিন্যাস তিনি দিয়েছেন, তা ওদের শ্রুতিশাস্ত্রে বর্ণিত বিন্যাসের বিপরীত। এর বর্ণনা আমি যথাস্থানে দেব। ব্রহ্মগুপ্ত অষ্টম আকাশের গোলাকৃতির উল্লেখ করে যেন আরও বলতে চান যে তাকে শুধু বাইরে থেকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করা যেতে পারে। গোলাকৃতি ও ঘূর্ণন সম্বন্ধে Aristotle-এর ধারণার সঙ্গে যেন তাঁর পরিচয় ছিল এবং গ্রহগুলির পিছনে আর কোনও বস্তু নাই, একথা বলে তিনি যেন Aristotle-এরই প্রতিধ্বনি করছেন।

ব্রহ্মাণ্ড যদি এইরূপই হয়, তাহলে স্পষ্টতঃ তাকে গ্রহের সমষ্টি, বা 'ঈশ্বর', বরঞ্চ বিশ্বজগৎ-ই মনে করতে হয়, কারণ হিন্দুদের মতে কর্মফল প্রাপ্তি পরজন্মে এই বিশ্বজগতের মধ্যেই হয়ে থাকে।

পলিশ তাঁর 'সিদ্ধান্তে' বলেছেন : 'বিশ্বজগৎ হচ্ছে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের সমষ্টি। আকাশ অন্ধকারের পিছনে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চোখে আকাশ নীল দেখায়, কারণ তাতে সূর্য কিরণ পৌঁছায় না, সেজন্য তা গ্রহ ও চন্দ্রের জলীয় আলোকহীন গোলকগুলির মত আলোকিত
১৮৩ হয় না। এগুলির উপর সূর্যকিরণ পড়লে এবং পৃথিবীর ছায়া তাকে আবৃত না করলে, তাদের অন্ধকার আবরণ দূরে হয়ে রাত্রিতে তাদের আকার দৃশ্যমান হয়। আসলে আলোকের একটি মাত্র উৎস আছে। অন্য সবাই তার থেকেই

আলো পায়।' এখানে পলিশ সর্বশেষ অধিগম্য সীমার কথা বলেছেন এবং তাকেই আকাশ নাম দিয়েছেন। এই আকাশকে তিনি অন্ধকারে স্থাপন করেছেন, যেহেতু তিনি বলেছেন যে সেখানে সূর্যের কিরণ পৌঁছয় না। আকাশের নীলাভ রঙের আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ বলে এখানে তার অবতারণা করা গেল না।

উপরোক্ত অধ্যায়ে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: 'চন্দ্রের আবর্তন সংখ্যা—অর্থাৎ ৫৭,৭৫,৩৩,০০,০০০-কে তার গোলকের যোজন সংখ্যা, অর্থাৎ ৩২৪০০০ দিয়ে গুণ কর; এর গুণফল অর্থাৎ ১৮,৭১,২০,৬ ,২০,০০ ০০,০০০, হচ্ছে রাশি চক্রের মোট যোজন সংখ্যা।' দূরত্বের পরিমাপক হিসাবে যোজনের পরিমাণ দূরত্বের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। ব্রহ্মগুপ্তের এই উক্তি আমি অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম মাত্র, কারণ এই পরিমাপ করার কোনও যুক্তি তিনি দেখান নি।

তবে, বশিষ্ট বলেন: 'গ্রহ ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, উপরোক্ত সংখ্যাগুলি তার বিস্তারের পরিমাণ জ্ঞাপক, কারণ রাশিচক্র ব্রহ্মাণ্ডের সাথে যুক্ত।' কিন্তু টীকাকার বলভদ্র মন্তব্য করেছেন: 'এই সংখ্যাগুলিকে আমি আকাশের পরিমাণ জ্ঞাপক মনে করি না। কেননা তার প্রসারের সীমা নির্ধারণ আমাদের শক্তির বাইরে। তবে আকাশকে মানুষের দৃষ্টির শেষ সীমা বলে মনে করি; তার ঊর্ধ্ব ইন্দ্রিয়াতীত। তবে অন্যান্য গ্রহগুলি পরস্পরের তুলনায় ছোট বড় বলে ভিন্ন রূপে দৃশ্যমান হয়।' আর্যভট্টের মতাবলম্বীরা বলে: 'যে পর্যন্ত সূর্য-কিরণ পেঁছায়, সেই পর্যন্ত জানতে পারাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে সে কিরণ পেঁছায় না, সে স্থানের প্রসার যত বিপুলই বা যথার্থই হোক না কেন, তার প্রয়োজন আমাদের নাই। কেননা, সূর্যকিরণ সেখানে পেঁছতে পারে না, তা মানবেন্দ্রিয়েরও অগম্য এবং যা ইন্দ্রিয়াতীত, তা জানা সম্ভব নয়।'

এঁদের উক্তির মর্মার্থ যা দাঁড়ায়, তা এই: 'বশিষ্টের মতে ব্রহ্মাণ্ড অষ্টম গ্রহ কিম্বা তথাকথিত রাশিচক্র সমেত একটি গোলক, যার মধ্যে স্থির নক্ষত্রগুলি অবস্থিত এবং ব্রহ্মাণ্ড ও রাশিচক্রের গোলক দুইটি, পরস্পরের সাথে সংলগ্ন।' অষ্টম গ্রহের কল্পনা করতে অবশ্য আমরা বাধ্য, কিন্তু তার উপরে একটি নবম গ্রহের অস্তিত্ব ধরে নেওয়ার কি আবশ্যক, বোঝা যায় না। এ বিষয়ে নানা লোকের নানা মত আছে। কেউ পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম গতির জন্য একটি নবম গ্রহের অস্তিত্ব প্রয়োজন মনে করে, যার নিজেরও গতি সেই মুখে এবং তার
১৮৪ অন্তর্গত অন্য সব কিছুকেও যে সেই মুখেই আবর্তিত করায়। ঐ একই

আবর্তনের কারণে অন্যেরা আবার নবম গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করে বটে, কিন্তু মনে করে যে তার নিজের কোন গতি নাই।

প্রথমোক্ত দলের বক্তব্য সুস্পষ্ট, তবে Aristotle দেখিয়েছেন যে গতিশীল বস্তুমাত্রই তার বাইরের আর একটি বস্তু থেকে গতিক্ষমতা লাভ করে। কাজেই, এই নবম গ্রহের জন্যও অন্য আর একটি চালকের অস্তিত্ব অনুমান করতে হয়। তাহলে কোনও নবম গ্রহের মাধ্যম ব্যতিরেকে এই চালকই অষ্ট গ্রহকে চালনা করছে, এরূপ অনুমান করতে কি বাধা ?

দ্বিতীয় দলের বক্তব্য থেকে মনে হয় যেন তারা Aristotle এর উপরোক্ত কথা শুনেছে, আর তারা জানে যে প্রথম চালক নিশ্চল থাকে। কারণ তারা নবম গ্রহকে গতিহীন বলে বর্ণনা করে, যার থেকে পশ্চিমমুখী আবর্তনের (motion) উৎপত্তি হয়। কিন্তু Aristotle আরও প্রমাণ করেছেন যে প্রথম চালক কোনও অবয়ব বা বস্তু (body) নয়। কিন্তু তাকে গোলাকৃতি, গ্রহরূপী পরিসরবিশিষ্ট ও নিশ্চলরূপে কল্পনা করলে, তার অবয়ব থাকতেই হবে। কাজেই প্রমাণ হয় যে নবম গ্রহের অস্তিত্ব অসম্ভব।

এ প্রশ্নে Almagest গ্রন্থের ভূমিকায় Ptolemy-র উক্তি আছে; 'শুধু গতিকেই যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের মতে বিশ্ব প্রকৃতির প্রথম গতির আদি কারণ হচ্ছে এক অদৃশ্য দেবতা, যে নিজে স্থির ও নিশ্চল। এই আদি কারণের আলোচনাকে-ই আমরা ঐশ্বরিক বিষয় বলি। জগতের সর্বোচ্চ স্তরে তার এই কর্মকে আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার কর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কর্ম রূপে।

নবম গ্রহের কোন ইংগিত না করে, আদি চালক (prime mover) সম্বন্ধে Ptolemy এই উক্তি করেছেন। তবে Proclus এর মত খন্ডন প্রসঙ্গে বৈয়াকরণিক ইয়াহিয়া (Johannes Grammaticus) এই নবম গ্রহের উল্লেখ এই বলে করেছেন যে Plato নক্ষত্রহীন নবম গ্রহের কথা জানতেন না। তাঁর মতে, উপরিধৃত উক্তি দ্বারা Ptolemy নবম গ্রহের অনস্তিত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন।

আবার আর এক দলের মত যে, গতিশীল বস্তুসমূহের শেষ সীমায় একটি স্থির বস্তু অথবা অনন্তশূন্যতা, কিম্বা এমন কিছু আছে যা শূন্য ও পূর্ণের মাঝামাঝি। এসব অনুমানের সাথে অবশ্য আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের কোনও যোগ নাই।

বলভদ্র মনে হয় তাদের সাথে একমত যারা মনে করে যে আকাশ বা আকাশ মণ্ডল একটি সুগঠিত নিরেট বস্তু, (جسم), যা সমস্ত ভারিবস্তুকে

সমানভাবে ধরে রাখে ও বহন করে এবং যা গ্রহাদির উপরে অবস্থিত। আমাদের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ অগ্রাহ্য করে সন্দেহকে গ্রহণ করা যেমন কঠিন, বলভদ্রের পক্ষে চাক্ষুষ সাক্ষ্য ছেড়ে শ্রুতিতে বিশ্বাস করা ঠিক তেমনই সহজ।

এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আর্যভট্টের অনুগামীদেরই আছে। মনে হয় এরা সত্যই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার অধিকারী। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে 'ব্রহ্মাণ্ড' তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু সমেত 'ঈশ্বরের' নামান্তর মাত্র।

একবিংশ অধ্যায়

স্মৃতি ও শ্রুতি অনুযায়ী স্বর্গ ও মর্তের বিবরণ

১৮৫ যে জাতীয় কথা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলেছি তারা মনে করে যে পৃথিবী সাতটি, পর্দার মত একটি আর একটির উপর বিন্যস্ত। সবচেয়ে উপরকার পর্দাকে আবার ওরা সাত ভাগে ভাগ করে। আমাদের জ্যোতিষীদের কিম্বা ইরানীদের রীতি এরূপ নয়, কারণ আমাদের জ্যোতিষীরা পৃথিবীকে Iqlim-এ এবং ইরানীরা Kishwar-এ ভাগ করে থাকে। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত ওদের নীতির ব্যাখ্যা আমরা পরে দিচ্ছি যাতে তার সুষ্ঠু বিচার সম্ভব হয়। এই বিবরণ প্রসঙ্গে হয়ত এমন কিছু এসে পড়বে যা আমাদের চোখে অদ্ভুত ঠেকবে কিম্বা অন্যদের ভ্রান্ত মতের সঙ্গে যার সাদৃশ্য দেখা যাবে তা হলেও মন্তব্য না করে আমি ব্যাপারটি কেবল পাঠকের সামনে ধরে দেব. হিন্দুদিগকে তিরস্কার বা দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে নয়. পাঠকের মনন শক্তি বাড়ানোর জন্য।

পৃথিবীর সংখ্যা বা ভূপৃষ্ঠের ভাগ নিয়ে ওদের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই! ওদের মতভেদ শুধু সাতটি পৃথিবীর নাম ও সে নামগুলির পারম্পর্য নিয়ে। আমার বিশ্বাস, ওদের ভাষায় শব্দ বহুলতা (বা বাগাড়ম্বর) থেকে এ মতভেদের উৎপত্তি হয়েছে; কারণ ওরা একটি বস্তুকে বহু নামে অভিহিত করে থাকে, যেমন, ওদের নিজের উক্তিমতে ওদের ভাষায় সূর্যের সহস্রটি পৃথক নাম আছে, ঠিক যেমন আরবরা সিংহকে প্রায় অতগুলি নামেই অভিহিত করে থাকে। এসব নামের কতকগুলি মৌলিক, আবার কতকগুলি সিংহের বিভিন্ন অবস্থা, তার কার্যপ্রণালী ও স্বভাব থেকে গঠিত। ভারতীয় এবং তাদের মত অন্য জাতিরাও শব্দ বহুলতার গর্ব করে থাকে বটে, কিন্তু আসলে
১৮৬ তাদের ভাষার এ এক প্রধান দোষ। কেননা, ভাষার কাজ হচ্ছে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ও তার কর্ম ও গুণকে এমন এক সর্বসম্মত নাম দিয়ে চিহ্নিত করা যার উচ্চারণ মাত্রই অন্য লোকে উদ্দিষ্ট বস্তুকে চিনতে পারে। যদি একই শব্দ বা নাম নানা বস্তুতে প্রযুজ্য হতে থাকে, তাহলে ভাষার সংকীর্ণতাই প্রমাণিত হয়, এবং শ্রোতাকে শব্দের উদ্দীষ্ট অর্থ বোঝার জন্য বক্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। তখন হয় সেই শব্দ বাদ দিয়ে অনুরূপ অর্থের আরও শব্দ ব্যবহার করতে হয়, নয়ত ব্যাখ্যা করে তার অর্থ বোঝাতে হয়। যে ক্ষেত্রে

একটি বস্তুর বহু নাম থাকে এবং তার প্রত্যেকটি বিভিন্ন সমাজ বা শ্রেণীর মধ্যে পৃথকভাবে ব্যবহৃত নাম না হয় এবং অর্থবোধের জন্য যদি তার একটি নামই সকলের জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে বাকী নামগুলি অনর্থক বাকচাতুরী ও কৌতুক বই আর কিছু নয়, যা দিয়ে বিষয়টিকে অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত করা হয় মাত্র এবং এই শব্দ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে যে ভাষাটিকে আয়ত্ত করতে চায়, তার আয়ুক্ষয় ছাড়া আর কোনও লাভ হয় না।

প্রায়ই আমার মনে হয়েছে যে হয় এদের গ্রন্থকার ও শ্রুতি লেখকরা শৃঙ্খলা বা বিন্যাস রক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু নামোল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছে, নয়তো লিপিকাররা পাঠ বিকৃত করেছে। কারণ, যারা আমাকে সে সব গ্রন্থ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছে তারা সবাই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অযথা প্রতারণা করার লোক নয়।

পৃথিবীর যে সব নাম আমি জানতে পেরেছি নীচের সারণিতে লিপিবদ্ধ করছি। আদিত্য পুরাণের বিবরণকেই আমি ভিত্তি করেছি, কারণ তাতে নামোল্লেখের একটি বিশেষ পদ্ধতি দেখা যায়, অর্থাৎ প্রত্যেকটি পৃথিবী ও আকাশকে সূর্যের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ ধরে আকাশকে মস্তিষ্ক থেকে উদর ও পৃথিবীকে নাভি থেকে পা পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গ হিসাবে সাজান হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অন্ততঃ নামগুলির বিন্যাসক্রমটি সুস্পষ্ট হয় ও বিশৃঙ্খলা দূর হয়।

১৮৭

পৃথিবীর ক্রমিক সংখ্যা	আদিত্যপুরাণ		বিষ্ণুপুরাণ	বায়ুপুরাণ		দেশজ নাম
	সূর্যের অঙ্গ	পৃথিবীর নাম		পৃথিবীর নাম	পৃথিবীর উপাধি	
১	নাভি	তল	অতল	অভ্যন্তল	কৃষ্ণভূমি	অংশু (?)
২	উরু	সুতল	বিতল	ইল (?)	শুক্লভূমি	অম্বরতল
৩	জঙ্ঘা	পাতাল	নিতল	নিতল	রক্তভূমি	সকর
৪	নিম্নজানু	আসাল(?	গভস্তিম (?)	গভস্থল	পীতভূমি	গভস্তিমান
৫	পায়ের ডিম (হাটুর নীচের মাংসপিন্ড)	বিসাল	মহাগ্য	মহাতল	পাষাণভূমি	মহাতল
৬	গোড়ালি	মুস্তাল	সুতল	সুতল	শীলাতল	সুতল
৭	পদ	রসাতল	জাগরণ(?)	পাতাল	সুবর্ণ বর্ণ	রসাতল

১৮৮ বায়ুপুরাণের উক্তি মতে সপ্ত পৃথিবীতে যে সব অশরীরী প্রেতাদি বাস করে :—

১। দানবদের মধ্যে নামুচি, শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধ, নিষ্কুবাধ, সুলদন্ত, লোহিত, কালিঙ্গ, শ্বাপদ; এবং সর্পরাজ ধনঞ্জয় ও কলীর।

২। দৈতদের মধ্যে সুরাক্ষম, মহাজম্ভ, হয়গ্রীব, কৃষ্ণ, জর্নাদ (?), সংখাক্ষা ও গোমুখ; এবং রাক্ষসের মধ্যে নীল, মেঘ, ক্রথনক, মহোষ্ণিষ, কম্বল, অশ্বতর ও দক্ষক।

৩। দানবদের মধ্যে রাধ, অনুরাধ (? অনুহলাদ ?) অগ্নিমুখ, তারকাক্ষ, ত্রিশীর ও শিশমার; এবং রাক্ষসের মধ্যে চ্যাবন, নন্দ ও বিশাল। এই পৃথিবীতে বহু নগর আছে।

৪। দৈত্যদের মধ্যে কালনেমী, গজকর্ণ ও উন্ধর, এবং রাক্ষসদের মধ্যে সুমালি, মুঞ্জ ও 'বৃকবক্ত্র', এবং গরুড় নামক প্রকাণ্ড পক্ষীসমূহ।

৫। দৈতদের মধ্যে বিরোচ, জয়ন্ত, অগ্নিজিহ্বা ও হিরণ্যাক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে বিদ্যুৎজিহ্ব ও মহামেঘ, 'কিরামির সর্প' ও স্বস্তিকজয়।

৬। দৈত্যদের মধ্যে কেশর এবং রাক্ষসদের মধ্যে উর্ধকুজ, শতশীর্ষ, (ইনি ইন্দ্রের সখা) এবং বাসুকী নামক একটি সর্প।

৭। বলিরাজা, এবং দৈত্যদের মধ্যে মুচুকুন্ড। এ পৃথিবীতে রাক্ষসদের জন্য বহু গৃহ আছে। এখানে বিষ্ণু বাস করেন এবং নাগরাজ 'শেষ'ও এখানে থাকেন।

১৮৯ পৃথিবীর পরে আকাশ। তারও সাতটি তল আছে, একের উপর আর একটি। এই আকাশগুলিকে 'লোক বলা হয়, অর্থাৎ সম গম স্থল। গ্রীকরাও আকাশগুলিকে সমাগম স্থল মনে করত। Proclus-এর মত খণ্ডন প্রসঙ্গে বৈয়াকরণিক ইয়াহিয়া (Johnnes Grammaticus) বলছেন : 'ধর্মতাত্ত্বিকদের একদল মনে করেছে যে galaxias দুগ্ধ নামক গ্রহটি একটি বাসস্থান বিশেষ, যেখানে বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মারা বাস করে। কবি হোমার বলেছেন 'পবিত্র আকাশকে তুমি দেবতাদের চিরন্তন আবাস করেছ, বাতাস তাকে দোলায় না, বৃষ্টি তাকে সিক্ত করে না, তুষার তাকে নষ্ট করে না, সেখানে শুধু নির্মেঘ জ্যোতির্ময় দীপ্ত বিরাজ করে।' 'Plato বলেছেন: ঈশ্বর সপ্ত গ্রহকে বললেন: 'তোমরা দেবতাদের দেবতা, আর আমি সমস্ত কর্মের জনক। তোমাদিগকে এমনভাবে গঠন করেছি যার ক্ষয় নাই। পরম্পরাবদ্ধ বস্তুর বিন্যাস বা শৃঙ্খলা যদি ভাল থাকে তাহলে বন্ধন শিথিল হলেও তাতে অনিষ্ট স্পর্শে না।' Alexander-কে

লিখিত পত্রে Aristotle বলেছেন: 'সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর শৃঙ্খলাই বিশ্বজগৎ; এই জগতের উপরে এবং চতুষ্পার্শ্বে যা আছে তা হচ্ছে দেবতাদের বাসস্থান। আকাশ এই দেবতাদের দেহ দিয়ে পূর্ণ, যাকে আমরা তারা বা নক্ষত্র নামে অভিহিত করে থাকি।' এই পত্রেরই আর এক স্থানে তিনি বলেছেন: "পৃথিবী জল বেষ্টিত, জল বায়ু বেষ্টিত, বায়ু অগ্নি বেষ্টিত এবং অগ্নি ঈশ্বর বেষ্টিত। এজন্য উর্ধ্বলোক দেবতাদের এবং সর্বনিম্নলোক (বা পাতাল) আনূপ বা জলজন্তুর আবাসস্থল।"

এই রকম উক্তি বায়ু পুরাণেও করা হয়েছে: জল পৃথিবীকে, অগ্নি জলকে, বায়ু অগ্নিকে, আকাশ বায়ুকে এবং তার প্রভু আকাশকে ধারণ করে আছে। Aristotle-এর সঙ্গে বায়ু পুরাণের এই বর্ণনায় কেবলমাত্র বিন্যাসক্রম বা পরম্পরার প্রভেদ।

১১০ পৃথিবী নাম নিয়ে যেমন মতানৈক্য দেখা গেল, 'লোক'সমূহের নামে তেমন পার্থক্য নাই। আমাদের প্রথম সারণির মত নীচে এই 'লোক'সমূহের নাম সাজাচ্ছি।

আকাশের ক্রমিক সংখ্যা	আদিত্য পুরাণানুযায়ী সূর্যের অঙ্গের নাম	আদিত্য, বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে তার নাম
১	উদর	ভুর্লোক
২	বক্ষ	ভুবর্লোক
৩	মুখ	স্বর্লোক
৪	ভ্রূ	মহর্লোক
৫	ললাট	জনলোক
৬	সীমন্ত	তপলোক
৭	করোটি	সত্যলোক

১১১ আকাশ ও পৃথিবীর এই বর্ণনায় ওরা সবাই একমত, শুধু পাতঞ্জলীর টীকাকার ছাড়া। তিনি শুনেছিলেন যে পিতর অর্থাৎ পিতৃগণের বাসস্থান চন্দ্রগ্রহে। এ ধারণা অবশ্য জ্যোতির্বিদদের উক্তি থেকে জন্মেছে। টীকাকার তাই চন্দ্রগ্রহকে প্রথম আকাশ ধরেছেন। তাঁর উচিত ছিল 'ভুর্লোক'কেই প্রথম আকাশ মনে করা, কিন্তু তা না করে, আকাশের সংখ্যা সাতের অধিক হয়ে যাওয়াতে তিনি 'ভুর্লোক' অর্থাৎ পুরস্কারের স্থানকে একেবারেই বাদ দিলেন। তিনি আরও একটি কান্ড করলেন; সপ্তম আকাশ, অর্থাৎ 'সত্যলোক'-কে পুরাণে 'ব্রহ্মলোক' বলা হয়েছে। সেজন্য তিনি ব্রহ্মলোককে সত্যলোকের

উপরে বসালেন, অথচ এই আকাশকে এই দুই নামে দেখানই বেশী সমীচীন হোত। তাঁর উচিত ছিল যে 'ব্রহ্মলোক'-এর স্থলে 'পিতৃলোক'কে প্রথম স্থান দেওয়া এবং 'স্বরলোক'কে বাদ না দেওয়া।

সপ্ত পৃথিবী ও সপ্ত আকাশের সম্বন্ধে এ-ই বিবরণ শেষ হোল। এবারে সর্বোচ্চ ভূপৃষ্ঠের বিভাগ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা করব।

ওদের ভাষায় 'জজীরা'কে দ্বীপ বলা হয়। যেমন, সিংহল দ্বীপ,—যাকে আমরা সরনদীব বলি—কারণ এটি আসলে একটি দ্বীপ। এই রকম 'দীব-জাত'ও। এও বহু দ্বীপের সমষ্টি, যার মধ্যে এক-আধটি মাঝে মাঝে ক্ষয় হয়ে গলে গিয়ে জলের নীচে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঐ সময় অন্যত্র ঐরূপ আর একটি দ্বীপ জলের উপর বালুরেখার ন্যায় ভেসে উঠে ক্রমাগত বিস্তৃত ও উচ্চ হতে থাকে। তখন প্রথমোক্ত দ্বীপ ছেড়ে অধিবাসীরা নতুন দ্বীপে এসে বসবাস করতে থাকে।

হিন্দুদের শ্রুতিশাস্ত্র অনুসারে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমরা বাস করি, তা গোলাকৃতি এবং সমুদ্র বেষ্টিত। এই সমুদ্রের উপর হাঁসুলির ন্যায় ভূমি আছে। আবার এই ভূমির উপরেও ঐরূপ হাঁসুলির মত সমুদ্র আছে। এই-ভাবে একটির মধ্যে আর একটি করে সাতটি ভূমি আর সাতটি সমুদ্রের বৃত্তা-
১৯২ কার হাঁসুলি আছে। এই শুষ্ক বা মৃত্তিকার কণ্ঠহারগুলিকে দ্বীপ বলা হয়। প্রতেকটি দ্বীপ বা সমুদ্রের পরিমাণ তার পূর্ববর্তী দ্বীপ বা সমুদ্রের দ্বিগুণ। অর্থাৎ কেন্দ্রবর্তী ভূমির পরিমাণ যদি এক ধরা হয় তাহলে তার সাতটি বৃত্তাকারের ভূমিবেষ্টনীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭; তেমনই, সেই কেন্দ্রবর্তী ভূমিকে যে সমুদ্রটি বেষ্টন করে আছে; তার পরিমাণ এক ধরলে, তার সাতটি সমুদ্রের পরিমাণ হয় ১২৭। সাতটি সমুদ্র ও সাতটি ভূমির মোট পরিমাণ হবে ২৫৬।

পাতঞ্জলির টীকাকার কিন্তু কেন্দ্রীয় ভূমিটির পরিমাণ ধরেছে লক্ষ যোজন। সে হিসাবে, সাতটি ভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭,০০,০০। এই কেন্দ্রভূমিকে যে সমুদ্র বেষ্টন করে আছে তার আয়তন সে ধরেছে 'দুই লক্ষ যোজন', সে হিসাবে সমস্ত সমুদ্রের আয়তন দাঁড়াবে ২,৫৪,০০,০০০ এবং ভূমি ও সমুদ্রের মোট পরিমাণ হবে ৩,৮১,০০,০০০ যোজন। টীকাকার অবশ্য নিজে এই অংক করেনি যে তার সঙ্গে আমাদের এই গণনা মিলিয়ে দেখতে পারি। তবে 'বায়ু পুরাণে' বলা হয়েছে যে সমস্ত দ্বীপ ও সমুদ্রের ব্যাস হচ্ছে ৩,৭৯,০০,০০০ যোজন। এই সংখ্যা কিন্তু আমাদের গণনার অর্থাৎ ৩,৮১,০০,০০০-র সঙ্গে

মেলে না। 'বায়ু পুরাণ'কার এই সংখ্যা কেমন করে পেল বোঝা যায় না; সমুদ্রের সংখ্যাকে ছয় ধরলে, এবং প্রত্যেক সমুদ্রের আয়তনকে তার পূর্বের সমুদ্রের দ্বিগুণ না ধরে চতুর্গুণ ধরলে তবেই এই সংখ্যা পাওয়া যাবে। সমুদ্রের সংখ্যা ছয়টি মনে করার একটা কারণ এই অনুমান করা যেতে পারে যে পুরাণকার ভূমিভাগগুলির আয়তন বের করতে চেয়েছিল বলে, সর্বশেষ সমুদ্রবেষ্টনীকে আর গণনার মধ্যে ধরে নি। কিন্তু ভূভাগগুলি ধরলে, তার চতুর্দিকস্থ সমুদ্রগুলিও তার ধরা উচিত ছিল। গণনার যে পদ্ধতি দেখা গেল তার কোনও সূত্র দিয়েই কিন্তু দ্বিগুণের স্থলে চতুর্গুণের হিসাব কেন করা হয়েছে তা বোঝা যায় না।

প্রত্যেক দ্বীপ ও ভূভাগের পৃথক নাম আছে। যতদূর বুঝেছি, সেগুলি নীচের রাশি (Table)-তে সাজাচ্ছি। পাঠক আমার এই অসম্পূর্ণতা ক্ষমা করবেন।

১৯০

দ্বীপ ও সমুদ্রের সংখ্যা	মৎস্য পুরাণ বর্ণিত নাম		পাতঞ্জলির ভাষ্যকার ও বিষ্ণু পুরাণ বর্ণিত নাম		লোকায়ত নাম	
	দ্বীপসমূহ	সমুদ্রসমূহ	দ্বীপ	সমুদ্র	দ্বীপ	সমুদ্র
১	জম্বুদ্বীপ	লবণ	জম্বু (বৃক্ষ বিশেষ)	ক্ষার	জম্বু	লবণসমুদ্র
২	সকদ্বীপ	ক্ষীরোদক	প্লক্ষ (বৃক্ষ)	ইক্ষু	সব	ইক্ষু
৩	কুশদ্বীপ	ঘৃতমণ্ড	শালমলী (বৃক্ষ)	সুরা	কুশ	সুরা
৪	ক্রৌঞ্চদ্বীপ	দধীমণ্ড	কুশ (লতা	সর্পি (মাখন)	ক্রৌঞ্চ	সর্পি
৫	শালমলি দ্বীপ	সুর	ক্রৌঞ্চ (বাহিনী)	দধী	শালমলি	দধি সাগর
৬	গোমেদ দ্বীপ	ইক্ষুরসোদ	সক (বৃক্ষ	ক্ষীর	গোমেদ	ক্ষীর
৭	পুষ্কর দ্বীপ	স্বাদোদক (মিষ্ট জল)	পুষ্কর (বৃক্ষ)	স্বাদোদক	পুষ্কর	পানীয়

১১৪ এই তালিকায় নামের যে পার্থক্য দেখা যায়, তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বোঝা যায় না। পরিগণনা (enumeration)-র যথেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে ? এর মধ্যে 'মৎস পুরাণের' তালিকাটিই উত্তম, কেননা কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে প্রান্ত পর্যন্ত প্রথমে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, তারপর দ্বীপ বেষ্টিত সমুদ্র, এইভাবে দ্বীপ ও সমুদ্রগুলিকে এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে (order) সাজান হয়েছে।

এখন কতকগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের এখানে উল্লেখ করব, যদিও সেগুলি পুস্তকের অন্যত্র উল্লেখ করলেই বোধ হয় ভাল হোত।

পাতঞ্জলির ভাষ্যকার জগতের আয়তন স্থির করতে গিয়ে সর্বনিম্নের জগৎ থেকে আরম্ভ করে বলছেন 'অন্ধকার'-এর আয়তন এক কোটি, ৮৫ লক্ষ যোজন, তার উপরে 'নরক' ১৩ কোটি, ১২ লক্ষ যোজন, তার উপরে আবার অন্ধকার লক্ষ যোজন, তার উপরে বজ্র নামক পৃথিবী ৬০,০০০ যোজন। কাঠিন্যের জন্য তার এই নাম, শব্দটির আসল অর্থ হীরক ও দ্রবীভূত বিদ্যুৎ। তার উপরে আছে গর্ভ নামক মধ্যম পৃথিবী, ৬০,০০০ যোজন। তার উপরে সুবর্ণ পৃথিবী ৩০,০০০ যোজন এবং তার উপর সাতটি ধরিত্রী, তার প্রত্যেকটি ১০,০০০ যোজন করে। মোট ৭০,০০০ যোজন। সর্বোপরের ধরিত্রীতে দ্বীপ ও সমুদ্রগুলি আছে। 'স্বাদোদক' বা মিষ্ট সমুদ্রের পেছনে আছে 'লোকালোক'। লোকালোকের অর্থ যেখানে জনসমাগম নাই, জনশূন্য পতিতভূমি। তারপর আছে সুবর্ণ পৃথিবী, এক কোটি যোজন। এর উপর 'পিতৃলোক, ৬১,৩৪,০০০ যোজন। এই সপ্তলোক, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়, তার মোট আয়তন ১৫ কোটি
১১৫ যোজন। তার উপর আছে পাতালের মত অন্ধকার 'তামস', তার আয়তন ১,৮৫,০০,০০০ যোজন।'

সাতটি সমুদ্র ও সাতটি পৃথিবীর নাম গণনার গন্ডগোলে এমনিতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত, তার উপরে আরও কয়েকটি পৃথিবীর উদ্ভাবন করে এই লোকটি যেন সে গন্ডগোল লাঘব করতে এসেছে।

অনুরূপ কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বিষ্ণু পুরাণ বলছে : 'সপ্ত পৃথিবীর নিম্নতম পৃথিবীর তলায় 'শেধাক্ষ' (শেষনাগ) নামক সর্প আছে অশরীরী জীবদের পূজ্য। তাকে 'অনন্ত (নাগ) বলা হয়। তার সহস্র মস্তক, সে অনায়াসে পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করে আছে। একের উপর আর একটি বিন্যস্ত এই পৃথিবীগুলি সব রকমের সখের সামগ্রী ও মণিমাণিক্যে পূর্ণ'। তার নিজস্ব জ্যোতিতে আলোকিত; সূর্য-চন্দ্র সেখানে উদয় হয় না। সেজন্য

সেখানকার তাপ সর্বদা নাতিশীতোষ্ণ (Temperate), তার সুগন্ধি ফুল ও ফলবান বৃক্ষগুলি চিরজীবী। কালপ্রবাহ তাদের অধিবাসীদের স্পর্শ করে না। কারণ গতিবেগের সচেতনতা তাদের নাই। এই পৃথিবীগুলির মোট আয়তন ৭০,০০০ যোজন, প্রত্যেকটির আয়তন ১০,০০০ যোজন। সে পৃথিবী-গুলি দেখতে এবং সেখানকার দৈত্য ও দানব নামক দুই প্রকার অধিবাসী-দিগকে পর্যবেক্ষণ করতে নারদ ঋষি সেখানে একবার নেমেছিলেন। তাদের সুখৈশ্বর্যের কাছে স্বর্গের সুখকে অকিঞ্চিৎকর দেখে তিনি দেবতাদের কাছে ফিরে গিয়ে তার বর্ণনা করে তাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন।'

ঐ পুরাণে আরও উক্ত হয়েছে ঃ 'মিষ্টজলে সমুদ্রের পিছনে সুবর্ণ পৃথিবী আছে, যার আয়তন সমস্ত দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ। কিন্তু সেখানে মানব বা ভূতপ্রেত কারও বাস নাই। তার পিছনে আছে 'লোকালোক' নামক ১০ হাজার যোজন উচ্চ এবং ততখানি প্রস্থ একটি পর্বত। তার মোট আয়তন ৫০ কোটি যোজন।'

এই সমস্তকে ভারতীয়দের ভাষায় কখনও 'ধাত্রী' আবার কখনও 'বিধাত্রী
১১৬ বলা হয়। কখনও আবার সর্বজীবের আবাস বা অনুরূপ অন্য নামও দেওয়া হয়। শূন্যতায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর এসব নামের পার্থক্য নির্ভর করে; যারা 'শূন্য'তায় বিশ্বাস করে তারা তাকেই সমস্ত বস্তুর শূন্যতার দিকে আকৃষ্ট হবার কারণ বলে ধরে, আর যারা তাতে বিশ্বাস করে না, তারা এই কারণটিও মানে না।

'বিষ্ণু পুরাণ'কার আবার 'লোক' প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলছে ঃ যাতে পদক্ষেপ করা যায় এবং যাতে নৌকা চলে, তা সবই 'ভূরলোক'। এ কথাটি যেন সর্বোচ্চ ভূপৃষ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করছে। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী যে বায়ুমন্ডল আছে, যেখানে সিদ্ধা, মুনী ও গন্ধর্বরা বিচরণ করে তা হচ্ছে 'ভুরলোক'। এই 'ত্রিলোককে' পৃথিবী বলা হয়। তার উপর যা আছে তা 'ব্যাসমন্ডল'। অর্থাৎ ব্যাসের রাজ্য। ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের দূরত্ব এক লক্ষ যোজন; সূর্য থেকে চন্দ্রের দূরত্বও ততখানি। চন্দ্র থেকে বুধগ্রহ পর্যন্ত দুই লক্ষ যোজন, এবং বুধ থেকে শুক্র ততখানি দূরে। শুক্র থেকে মঙ্গল, মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি থেকে শনির দূরত্ব একই প্রকার অর্থাৎ প্রত্যেকটি গ্রহ অন্যটি থেকে দুই লক্ষ যোজন দূরে। শনি থেকে 'সপ্তর্ষী' লক্ষ যোজন, এবং 'সপ্তর্ষী' থেকে ধ্রুবতারা সহস্রযোজন দূরে আছে। তার উপরে দুকোটি যোজন দূরে, 'মহরলোক', তার উপরে 'জীন লোক' আট কোটি যোজন দূরে, তার উপরে 'পিতৃলোক' ৪৮ কোটি যোজন দূরে; তারও উপরে 'সত্যলোক।'

পাতঞ্জলির ভাষ্যকারের উক্তি অবলম্বন করে আমরা যে সংখ্যার উল্লেখ পূর্বে করেছি, অর্থাৎ ১৫ লক্ষ যোজন, এই সংখ্যা কিন্তু তার তিনগুণের চেয়েও বেশী। এরকম গোল পাকানোর অভ্যাস কিন্তু সব ভাষার লিপিকারদেরই আছে, পুরাণকারদিগকেও আমি তার থেকে মুক্ত মনে করি না, কারণ নিখুঁত তথ্যের সন্ধানী তারা ছিল না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মেরু ও তৎসংক্রান্ত শ্রুতি

১৯৭ মেরুকে ওদের ভাষায় 'ধ্রুব' ও অক্ষকে 'শলাকা' বলে। এক জ্যোতিষরা ছাড়া হিন্দুদের সবাই মাত্র একটি মেরুর কথাই বলে থাকে। তাদের এরূপ বলার কারণ হচ্ছে আকাশের গম্বুজাকৃতিতে তাদের বিশ্বাস, যার উল্লেখ আমরা উপরে করেছি। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে কুমোরের চাকার মত মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আকাশ আবর্তিত হচ্ছে; স্থানচ্যুত না হয়ে মেরু নিজ শক্তিতেই ঘোরে। ৩০ মুহূর্তে অর্থাৎ এক দিবারাত্রে তার একটি আবর্তন শেষ হয়।

দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে ওদের কাছ থেকে আমি মাত্র এইটুকু শুনেছি যে, সোমদত্ত নামে ওদের এক রাজা ছিল—যে নিজ পুণ্যবলে স্বর্গবাসের অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু স্বর্গারোহণ কালে আত্মা থেকে তার দেহ বিচ্ছিন্ন হওয়া তার মনঃপূত না হওয়াতে সে বশিষ্ট ঋষির কাছে গিয়ে বলল যে সে তার দেহকে ভালবাসে, তার থেকে বিচ্যুত হতে চায় না। ঋষি বললেন যে পার্থিব দেহ নিয়ে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব। রাজা তখন বশিষ্টের পুত্রদের কাছে তার প্রার্থনা জানাল। তা শুনে এরা তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে ও মুখে থুথু দিয়ে কানে বালা ও স্ত্রীলোকের কুর্তক পরিয়ে থাকে চণ্ডালে রূপান্তরিত করে দেয়। এই অবস্থায় সে বিশ্বামিত্র ঋষির কাছে এলে ঋষি তার এ দুর্গতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বৃত্তান্ত শোনার পর বিশ্বামিত্র সোমদত্তের প্রতি দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ট পুত্রদের সমেত সমস্ত ব্রাহ্মণকে এক যজ্ঞে আহ্বান করে বললেন: 'আমি একটি নতুন জগৎ ও স্বর্গ রচনা করব যাতে এই পুণ্যবান রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।' এই বলে দক্ষিণদিকে তিনি মেরু ও সপ্তর্ষি সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। তা দেখে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা ভীত হয়ে সোমদত্তকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বামিত্রকে নিরস্ত হতে অনুনয় করতে লাগলেন। প্রতিশ্রুতি মত সোমদত্তকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হলে বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি থেকে নিরস্ত হোলেন, কিন্তু যতটুকু সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তা রয়ে গেল।

১৯৮ সবাই জানে যে উত্তর মেরুকে আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে بنات نعش (সপ্তর্ষি) ও দক্ষিণ মেরুকে سهيل (অগস্ত্য) বলা হয়। তবে আমাদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত জনসাধারণের সমগোত্র, তাদের ধারণা যে দক্ষিণ আকাশেও উত্তরের সপ্তর্ষির মত আর একটি সপ্তর্ষি (بنات نعش) আছে যা দক্ষিণ মেরুকে প্রদক্ষিণ করে। তা যে একেবারে অসম্ভব বা আশ্চর্য, তা নাও হতে পারে। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা করেছে এমন কোনও বিশ্বাসী লোকের কাছ থেকে যদি এ সংবাদ আমরা পেতাম! কারণ একথা নিশ্চিত যে দক্ষিণাকাশে এমন সব নক্ষত্র দেখা যায় যার নাম আমরা জানি না। তাই শ্রীপাল বলেছেন যে গ্রীষ্মকালে মুলতানের লোকেরা অগস্ত্যের মধ্যরেখার (Meridian) একটি লাল নক্ষত্র দেখতে পায় যাকে তারা 'শূল' বলে। হিন্দুরা তাকে কুলক্ষণ মনে করে। সেজন্য চন্দ্র যখন পূর্ব ভাদ্রপাদে থাকে, তখন ওরা দক্ষিণ মুখে যাত্রা করে না, কারণ এই তারাটি তখন দক্ষিণে থাকে।

'কিতাবুল মাসালিক' নামক গ্রন্থে আল্ জায়হানী বলেছেন যে 'লঙ্গাবালুস' দ্বীপে শীতকালের প্রত্যূষে সূর্যের উদয় পথে খেজুর গাছের সমান উঁচুতে একটি বৃহৎ নক্ষত্র দেখা যায় যা 'উষ্ণ তারকা' বলে সেখানে পরিচিত। শিশুমারের (Ursa Minor) লেজ ও পৃষ্ঠ এবং নিকটস্থ আরও কয়েকটি তারা সমন্বিত (rectangular) আয়তক্ষেত্রাকারের এই নক্ষত্রপুঞ্জটিকে জাঁতার অক্ষদণ্ড (فاس الرحا) বলা হয়। 'মৎস্য' প্রসঙ্গে ব্রহ্মগুপ্ত এর উল্লেখ করেছেন। এই নক্ষত্রপুঞ্জকে 'সাকুবর' কিম্বা 'শিশমার' নামের চতুষ্পদ জলজন্তু -রূপে চিত্রিত করতে গিয়ে হিন্দুরা নানা হাস্যকর গল্পের অবতারণা করে থাকে। আমার মনে হয়, 'শিশমার' আসলে বড় টিকটিকি, ফার্সিতে যার নাম 'সুশমার'। শিশমা'রের সঙ্গে ফার্সি শব্দটির ধ্বনিসাদৃশ্য আছে। একরকম জল টিকটিকিও আছে, কুম্ভীরের মত।

১৯৯ হিন্দুদের এই সব গল্পের একটি এই—ব্রহ্মা যখন মানব সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন নিজেকে তিনি দুইভাগে ভাগ করলেন। দক্ষিণ ভাগের নাম 'বিরাজ', আর বাম ভাগ 'মনু'। এই মনু থেকেই 'মন্বন্তর' বলে কালবাচক শব্দ এসেছে। মনুর দুই পুত্র হোল, প্রিয়ব্রত আর 'উত্তানপাদ'। উত্তান-পাদের ধ্রুব নামে এক পুত্র ছিল, যাকে তার পিতার আর এক স্ত্রী একদিন উপহাস করে। তার মনোবেদনার সান্ত্বনা স্বরূপ ধ্রুবকে ইচ্ছামত সমস্ত নক্ষত্রকে ঘোরাবার ক্ষমতা দেওয়া হোল। 'স্বয়ম্ভুব' নামক প্রথম মন্বন্তরে ধ্রুবের আবির্ভাব হয়। সেই থেকে সে স্বস্থানে চিরস্থির হয়ে রয়েছে।

বায়ুপুরাণে আছে : 'বায়ু নক্ষত্রগুলিকে মেরুর চতুর্দিকে আবর্তিত করে। নক্ষত্রগুলি মেরুর সঙ্গে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ যা মানব চক্ষুর অগোচর। সেগুলি ঘানির দণ্ডের মত, যার মূল কেন্দ্রটি স্থির থেকে শুধু অগ্রভাগ ঘুরতে থাকে।' বিষ্ণু ধর্মেও উক্ত হয়েছে : নারায়ণের ভ্রাতা, বলভদ্রের পুত্র বজ্র একবার মার্কণ্ডের ঋষিকে মেরুর কথা জিজ্ঞাসা করলে ঋষি উত্তর দিলেন : ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করলেন, তখন তা ভীষণ অন্ধকার ছিল। তিনি তখন সূর্যের গোলককে জ্যোতির্ময় ও নক্ষত্রগোলকগুলিকে জলময় করলেন, যাতে সূর্যের সম্মুখ দিক থেকে তারা আলো পেতে পারে। মেরুর চতুর্দিকে শিশুমারের আকৃতিতে তিনি চৌদ্দটি নক্ষত্র স্থাপন করলেন, যারা অন্য নক্ষত্রগুলিকে মেরুর চতুর্দিকে ঘোরায়। তাদের মধ্যে, মেরুর উত্তরে শিশুমারের উপরচিবুকে যে তারাটি, তার নাম উত্তানপাদ, নিম্নচিবুকে 'যজ্ঞ', মস্তকে 'ধর্ম', বক্ষে 'নারায়ণ', পূর্বদিকে, দুই হাতের নক্ষত্রদ্বয়, 'আশ্বিনি' নামক বৈদ্যদ্বয়; পশ্চিম দিকে, দুই পায়ে, 'বরুণ' ও 'আর্যমন', লিঙ্গে 'সম্বৎসর, পৃষ্ঠে 'মিত্র' আর লেজে 'অগ্নি' 'মহেন্দ্র' 'মারিচি' ও 'কাস্যপ'।"

বিষ্ণু ধর্মে আরও আছে : 'মেরুই বিষ্ণু, স্বর্গবাসীদের প্রভু। তিনিই আবার কাল, যা আরম্ভ হয়, দীর্ঘ হয়, প্রাচীন হয় আর ক্ষয় হয়।'

এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে : 'যে এসব কথা পাঠ করবে এবং নির্ভুলভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে, ঈশ্বর তার সেদিনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন এবং তার নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালে আরও চৌদ্দ বৎসর যোগ হবে।'

কী সরল মন এদের! আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে প্রায় ১০৩০টি নক্ষত্রের পরিচয় জানে। এই জ্ঞান আছে বলেই কি ঈশ্বর পরমায়ু দিয়ে তাকে জীবিত রেখেছেন ?

মেরুর অবস্থানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যাই হোক, সমস্ত নক্ষত্রই আবর্তন করে। হিন্দুদের মধ্যে এমন কাউকে যদি আমি পেতাম যে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে প্রতিটি নক্ষত্র দেখাতে পারত তাহলে ইউনানী ও আরবদের পরিচিত আকৃতির সাথে কিম্বা সে আকৃতির সাথে না মিললে তার নিকটস্থ তারার সাথে মিলিয়ে সে নক্ষত্রগুলির বর্ণনা দিতে পারতাম।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

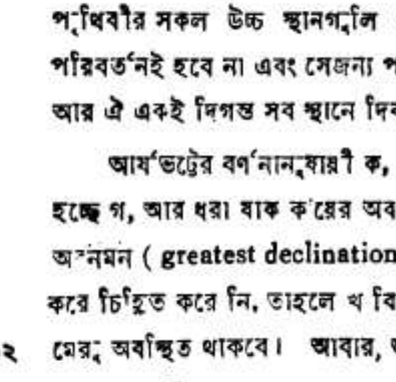
মেরু পর্বতের কথা

২০০ এই পর্বতের বর্ণনা দিয়েই আরম্ভ করছি, যেহেতু পর্বতটি দ্বীপ ও সমুদ্র সমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত, আর জম্বু দ্বীপেরও এটি কেন্দ্রস্থল। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন—'পৃথিবীতে মেরু পর্বতের আকৃতি ও অবস্থান নিয়ে বহু মতামত প্রচলিত আছে, বিশেষ করে যারা পুরাণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাদের মধ্যে। কেউ বলেন, 'এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে উত্থিত অতি উচ্চ পর্বত এবং মেরুর নীচে অবস্থিত; নক্ষত্রাদি এর পাদদেশে আবর্তিত হয় এবং এই পর্বতের কারণেই উদয়াস্ত হতে থাকে। এইরূপ শক্তি আছে বলেই এর নাম মেরু রাখা হয়েছে এবং এর শিখরের শক্তি প্রভাবেই চন্দ্র-সূর্য দৃশ্যমান হয়। মেরু পর্বতে যে
২০১ সব দেবতার বাস তাদের ছয় মাসে একদিন ও ছয় মাসে একরাত্রি হয়। তিনি আরও বলেছেন 'জিন (جن) অর্থাৎ বুদ্ধের গ্রন্থে লেখা আছে যে মেরু পর্বত চতুষ্কোণ, গোলাকার নয়। টীকাকার বলভদ্র বলেছেন: 'কেউ কেউ বলেন যে পৃথিবী সমতল আর মেরু পর্বত একটি আলোককেন্দ্র। তা যদি সত্যিই হয় তাহলে মেরু পর্বতের অধিবাসীদের দিগন্তে গ্রহাদি আবর্তিত হবে না। আর যদি মেরুর কোন জ্যোতি থাকে, তাহলে উচ্চে থাকার জন্য নিশ্চয়ই নীচে থেকে তা দেখা যাবে। যেমন উচ্চতার জন্য ধ্রুবতারা দেখা যায়। কেউ বলে যে মেরু পর্বত স্বর্ণময়, আবার কেউ বলে মণিমুক্তা দিয়ে তৈরী। আর্যভট্ট মনে করেন, এর কোনও বিশেষ উচ্চতা নাই, মাত্র এক যোজন উচ্চ,—চতুষ্কোণ নয়, গোলাকার; দেবতাদের জগৎ জ্যোতির্মণ্ডিত হলেও তা নীচে থেকে দৃশ্যমান নয়, কারণ সমস্ত লোকালয় থেকে বহু দূরে, সমস্ত কিছুর উত্তরে, হিমের দেশে 'নন্দনবন' নামক মরুভূমির মধ্যে এর অবস্থান। যদি এর উচ্চতা বেশী হয়ও তবুও ৬৬ অক্ষরেখা থেকে সম্পূর্ণ কর্কটক্রান্তি দৃশ্যমান হ'তে পারে না। আর একবারও অদৃশ্য না হয়ে মেরুতে সূর্যের আবর্তন করাও সম্ভব নয়"।

বাক্য ও অর্থ, সব দিক দিয়েও বলভদ্র নির্বোধের মত উক্তি করেছেন। আমি বুঝতে পারি না, টীকা করার ক্ষমতা যাঁর এই রকম, তিনি কেন টীকা লিখতে গিয়েছিলেন!

মেরু দিগন্তের চতুর্দিকে নক্ষত্রের আবর্তনের নজির দিয়ে যদি তিনি পৃথিবীর সমতল হওয়ার মত খণ্ডন করতে চেয়ে থাকেন, তাহলে তো তাঁর দেওয়া যুক্তি থেকে তার বিপরীতটাই প্রমাণিত হয়। কারণ, পৃথিবী সমতল হলে, আর মেরু পর্বতের লম্ব উচ্চতার (Perpendicular height) সঙ্গে পৃথিবীর সকল উচ্চ স্থানগুলি সমান্তরাল রেখায় থাকলে দিগন্তের কোন পরিবর্তনই হবে না এবং সেজন্য পৃথিবীর সব স্থানেই দিবারাত্রি সমান হবে। আর ঐ একই দিগন্ত সব স্থানে দিবারাত্রির সন্ধিরেখা হবে।

আর্যভট্টের বর্ণনানুযায়ী ক, ..-কে পৃথিবীর গোলক ধরা যাক, যার কেন্দ্র হচ্ছে গ, আর ধরা যাক ক'য়ের অবস্থান ৬৬ অক্ষরেখায়, এই গোলকের দীর্ঘতম অবনমন (greatest declination) হিসাবে আমরা ক, খ বৃত্তাংশকে আলাদা করে চিহ্নিত করে নি, তাহলে খ বিন্দুতে যে স্থান নির্ণীত হবে তার শীর্ষ দেশে
২০২ মেরু অবস্থিত থাকবে। আবার, আমরা যদি ক বিন্দুতে ভূগোলককে ছুঁয়ে ঘ পর্যন্ত রেখা টানি, তাহলে সেই রেখাটি দিগন্তের এমন এক সমতলে থাকবে যা পৃথিবীর চতুর্দিকে মানুষের দৃষ্টির শেষসীমা। আবার যদি ক ও গ-কে যুক্ত করে গ, খ-কে ছুঁয়ে এমনভাবে রেখা টেনে যাই যে রেখাটি ঘ বিন্দুতে এসে ক-ঘ রেখার সঙ্গে মিলিত হয় এবং গ-ঘ রেখার উপর ক-ঙ লম্বরেখা (Perpendicular) নামাই, তাহলে প্রমাণ হবে



(১) ক-ঙ রেখা দীর্ঘতম অবনমনের সাইন (Sine جيب) (২) ক, ঙ সেই sine এর মাবুল এবং (৩) ঙ-গ হচ্ছে দীর্ঘতম অবনমনের অনুপূরকের 'সাইন'।

যেহেতু আমরা আর্যভট্টের মত আলোচনা করছি সেহেতু আমরা 'সাইন'-গুলিকে তার প্রক্রিয়া অনুযায়ী Kardajat (كردجات)-এ পরিণত করব।

তাহলে ক ঙ=১৩৯৭

ঙ গ=৩১৪০

খ ঙ= ২৯৮

ক, গ, ঘ, সমকোণ হওয়াতে, ঙ ক ও গ-এর অনুপাত ঙ, ক ও ঘ-এর অনুপাতের (ratio) সমান। ক, ঙ-এর বর্গফল ১৯,৫১,৬০৯, এই সংখ্যাকে গ, ঙ

দিয়ে ভাগ করলে আমরা ভাগফল পাই ৬২২। ঙ-খ থেকে এ সংখ্যার পার্থক্য ৩২৪, অর্থাৎ খ-ঘ। এই খ, ঘ-এর সঙ্গে খ, গ-এর সম্বন্ধ (relation) খ, ঘ-এর যোজনের সঙ্গে খ, গ-এর যোজনের যা সম্বন্ধ তাই। আর্যভট্টের মতে এই শেষোক্ত সংখ্যা ৮০০। এই সংখ্যাকে পূর্বোক্ত পার্থক্য অর্থাৎ ৩২৪ দিয়ে গুণ করলে ২,৫৯, ২০০ হয়। এই গুণফলকে যদি আবার সর্বমোট অবনমন অর্থাৎ ৩,৮৩৪ (=খ, গ) দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে ভাগফল হয় ৭৫। এই ৭৫-ই হোল খ, ঘ-এর যোজন সংখ্যা, যা ৬০০ মাইল বা ২০০ ফরসাখ্-এর সমান।

পর্বতের লম্বরেখা ২০০ ফরসাখ্ হলে তার চড়াই-এর দৈর্ঘ্য প্রায় তার দ্বিগুণ হবে। মেরু পর্বতের এই পরিমাণ উচ্চতা থাক বা না থাক, ৬৬
২০০ অক্ষরেখাতে তার কিছুই দেখা যেতে পারে না এবং কর্কটরেখা (Tropic of cancer) কিছুই তার দরুন আড়াল হতে পারে না। এই অক্ষরেখাতে (৬৬) মেরু পর্বত যদি দিগন্তের নীচে অবস্থিত হয় তাহলে যে সব স্থানের অক্ষরেখা আরও কম, সে সব স্থানেও মেরু পর্বত দিগন্তের নীচেই হওয়ার কথা। না হয় ধরে নেওয়া যাক যে মেরু সূর্যের মত জ্যোতির্ময়। সূর্য যখন পৃথিবীর নীচে অস্তমিত হয়, তখন কি তা দেখা যায় ? বস্তুতঃ মেরু পর্বতের সাথে সূর্যের তুলনা করা যেতে পারে। বহু দূরে হিমাঞ্চলে থাকার জন্য এ পর্বত যে আমাদের কাছে অদৃশ্য হয়ে আছে, তা নয় ; আসলে দিগন্তের নীচে আছে বলে, আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কেননা পৃথিবী গোলাকার এবং ভারী। বস্তুমাত্রেরই নিজ কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষিত হওয়া নিয়ম।

তাছাড়া, যে সব স্থানের অক্ষরেখা দীর্ঘতম অবনমনের অনুপূরকের সমান, (Complement) সেখান থেকে (Tropic of Cancer) কর্কট ক্রান্তি দৃষ্টিগোচর হওয়ার যে যুক্তি দিয়ে আর্যভট্ট মেরু পর্বতের স্বল্প উচ্চতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে যুক্তি থেকে তা প্রমাণিত হয় না। কারণ সে দেশগুলির অক্ষরেখা ও অন্যান্য রেখার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, যুক্তি ও অনুমান চাক্ষুষ প্রমাণ বা সংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কারণ সে দেশগুলি জনমানব শূন্য এবং পথও দুর্গম। আর্যভট্টের কাছে কোনও লোক যদি এসে বলে থাকে যে, অক্ষরেখাতে কর্কট ক্রান্তি দেখা যায়, তাহলে আমরাও দাবী করতে পারি যে আমাদের কাছেও একজন সংবাদ দিয়েছে যে কর্কটক্রান্তির কতকাংশ সেখানে দেখা যায় না। এই মেরু পর্বত আড়াল না করলে তার সবটাই দৃষ্টিগোচর হোত্। দুটি বিপরীত সংবাদের কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তা স্থির করে দিতে কেউ পেরেছে কি ?

কুসুমপুরের আর্যভট্টের পুস্তকে আছে যে, মেরু পর্বত 'হিমাবন্ত' অর্থাৎ হিম অঞ্চলে অবস্থিত এবং এক যোজনের বেশী উচ্চ নয়। এই উক্তির অনুবাদ যেভাবে করা হয়েছে তার কিন্তু অর্থ দাঁড়ায় এই, যে মেরু পর্বতের উচ্চতা হিমাবন্তের উচ্চতার চেয়ে মাত্র এক যোজন বেশী। এই আর্যভট্ট অবশ্য বড় আর্যভট্ট নন, ইনি শেষোক্তের অনুগামী; কারণ তিনি বড় আর্যভট্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর মতামত অনুসরণও করেছেন। এঁদের মধ্যে কার টীকা বলভদ্র করেছেন, আমি জানি না।

মোটকথা, 'এই পর্বতের অবস্থান সম্বন্ধে যা আমরা জানি, তা সবই যুক্তি ও অনুমানের ফল। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত আছে, কেউ একে এক যোজন, কেউ আরও বেশী উচ্চ মনে করে; কেউ চতুষ্কোণ, কেউ গোলাকার মনে করে। এ সম্বন্ধে ঋষিরা কি বলেছেন, এবার আমরা তা বর্ণনা করব।

'মৎস পুরাণে' আছে : এই পর্বত স্বর্ণময়। নির্ধূম অগ্নির ন্যায় জ্যোতিষ্মান। তার চারিদিকের রং চার প্রকার, পূর্বদিকের রং ব্রাহ্মণদের মত শ্বেত, উত্তরের রং ক্ষত্রিয়ের মত লাল, দক্ষিণের রং বৈশ্যদের মত হরিৎ এবং পশ্চিম দিকের রং শূদ্রের মত কালো। তার মোট উচ্চতা ৮৬,০০০ যোজন, তার মধ্যে
২০৪ ভূগর্ভে আছে ১৬,০০০ যোজন। তার চারিদিকের প্রত্যেক দিকের বিস্তৃতি ৩৪,০০০ যোজন। এর মধ্যে মিষ্ট জলের বহু নদী ও প্রপাত আছে। এখানে বহু সুদৃশ্য স্বর্ণপ্রাসাদ আছে, যেখানে দেবতা ও তাদের গায়ক-গায়িকা, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের বাস; অসুর, দৈত্য ও রাক্ষসও সেখানে থাকে। মানস সরোবর এ পর্বতকে বেষ্টন করে আছে। তার চতুর্দিকে লোকপালেরা থাকে, যারা পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের প্রহরী। মেরু পর্বতের সাতটি গ্রন্থি বা বাঁক আছে; তার প্রত্যেকটিই এক একটি বিরাট পর্বত। সে পর্বতগুলির নাম মহেন্দ্র, মলয়, সাজ (? شبح) 'সুকদবাম' (?), রিক্ষবাম (?), বিন্ধ্য ও পরিজাত। আর ছোট ছোট পর্বতও আছে প্রায় অসংখ্য এবং এইগুলিতেই মানুষ বাস করে। মেরুর চতুষ্পার্শ্বে যে সব বড় বড় পর্বত আছে, তাদের নাম 'হিমাবন্ত', যা চিরকাল তুষারাবৃত থাকে এবং যেখানে রাক্ষস, পিশাচ ও যক্ষরা বাস করে; 'হিমকূট', স্বর্ণ নির্মিত, এখানে গন্ধর্ব ও অপ্সরা বাস করে; 'নিষাদ', এখানে নাগ বা সর্পদের আবাস। এই নাগদের সাতটি রাজা আছে, তাদের নাম 'অনন্ত', 'বাসুকি', 'দক্ষক'(তক্ষক), 'করকুটক', 'মহাপদ্ম', 'কম্বল' ও 'অশ্বতর'। আর একটি বড় পাহাড়ের নাম 'নীল', ময়ূরের মত বিচিত্র বর্ণ, সেখানে সিদ্ধা ও

ব্রহ্মর্ষীরা থাকেন। 'আশ্বেত' পর্বতে দৈত্য ও দানবদের বাস। 'শৃঙ্গবন্তে' পিতর, অর্থাৎ দেবতাদের পিতা-পিতামহদের বাস। এর নিকটেই উত্তর দিকে, কয়েকটি গিরিপথ আছে, যা মণিমুক্তায় পূর্ণ এবং সেখানে এমন সব বৃক্ষ আছে যা এক কল্পাব্দ ধরে বেঁচে থাকে। এইসব পর্বতের কেন্দ্রে আছে 'ইলাবৃত', যা
২০৫ সবার চেয়ে উঁচু। এই পর্বতমালাকে 'পুরুষ পর্বত' বলা হয়। হিমাবন্ত ও শৃঙ্গবন্তর মধ্যবর্তী স্থানকে 'কৈলাস' বলা হয়, এটি রাক্ষস ও অপ্সরাদের ক্রীড়াভূমি।

বিষ্ণু পুরাণে আছে, পৃথিবীর মধ্যবর্তী বড় পর্বতগুলির নাম 'শ্রী পর্বত', 'মলয় পর্বত', 'মাল্যবন্ত', 'ত্রিকুট', 'ত্রি-পুরান্তক' ও 'কৈলাস'। এ সব পর্বতের অধিবাসীরা নদীর জল পান করে এবং চির আনন্দে বিরাজ করে।

বায়ুপুরাণে মেরু পর্বতের চতুষ্পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার যে বর্ণনা আছে তা উপরোক্ত বর্ণনারই অনুরূপ। তাতে আরও বলা হয়েছে যে এর প্রত্যেক দিকে একটি করে চতুষ্কোণ পর্বত আছে; পূর্বদিকে আছে 'মালিয়ন' (মাল্যবন্ত ?), উত্তরে 'আনীল', পশ্চিমে 'গন্ধমাদন' আর দক্ষিণে 'নিষাধ'।

মেরুর চারিপার্শ্বের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্বন্ধে আদিত্য পুরাণেও এই রকমের কথা আছে; তবে উচ্চতা সম্বন্ধে আদিত্য পুরাণে কোন উক্তি আমি পাইনি। এই পুরাণে বলা হয়েছে যে, মেরুর পূর্বপার্শ্ব স্বর্ণময়, পশ্চিম রৌপ্যময়, দক্ষিণপার্শ্ব পদ্মরাগ মণিময় আর উত্তর পার্শ্ব বিবিধ মণিময়।

পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে ওদের অতিরঞ্জিত ধারণা না থাকলে, মেরুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে এমন অতিশয়োক্তি ওরা করতে পারত না। অনুমানের ক্ষেত্র যদি সীমাবদ্ধ না থাকে, তাহলে সে অনুমানের মিথ্যাভাষণে পরিণত হতে কোনও বাধা থাকে না। যেমন, পাতঞ্জলির টীকাকার মেরুর চতুষ্কোণকে বাড়িয়ে প্রায় আয়তক্ষেত্র (oblong) করে ফেলেছেন। তাঁর মতে মেরুর এক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ১৫ কোটি যোজন এবং অন্য তিন পার্শ্ব পাঁচ কোটি করে, অর্থাৎ প্রথমোক্ত পার্শ্বের এক তৃতীয়াংশ। এই চারি পার্শ্বের মধ্যে পূর্বদিকে আছে 'মলয়' পর্বত ও সমুদ্র এবং এরই মধ্যে আছে 'ভদ্রাশ্ব' নামক রাজ্য, উত্তর পার্শ্বে 'নীরা', 'শীত' ও 'শৃঙ্গাদি' নামক পর্বত ও সমুদ্র এবং তন্মধ্যে অবস্থিত
২০৬ 'রম্যক', 'হিরণ্ময়' ও 'কুরু' রাজ্যত্রয়; পশ্চিম দিকে 'গন্ধমাদন' পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যে 'কেতুমাল' রাজ্য অবস্থিত, দক্ষিণে মুত্রবর্ত (?) 'নিষাধ', 'হিমকুট' ও' হিমগিরি' পর্বত ও সমুদ্র, আর এগুলির মধ্যেই 'ভারতবর্ষ', কিম্পুরুষ' ও 'হরিবর্ষ' রাজ্য সমূহ।

মেরু সম্বন্ধে হিন্দুদের যেসব শ্রুতিকথা আমি পেয়েছি তা এই। 'শামানি-দের' (শ্রমণ) কোন পুস্তক আমি পাইনি, আর এমন কাউকেও পাইনি যার কাছ থেকে মেরু সম্বন্ধে তাদের (বৌদ্ধদের) মতামত জেনে নিতে পারি। সেজন্য শ্রমণদের যে সব উক্তি আমি এখন উদ্ধৃত করছি তা সবই ইরানশাহরীর রচনাকে ভিত্তি করে, যদিও আমার বিশ্বাস যে তাঁর বর্ণনা বিজ্ঞানসম্মত বা গবেষণালব্ধ নয়, আর কোনও গবেষক থেকেও তা প্রাপ্ত নয়।

যাই হোক ইরানশাহরীর রচনা মতে শ্রমণরা বলে যে মেরু চারি পৃথিবীর কেন্দ্রে চারি দিক-বিন্দুর উপরে অবস্থিত। তার নীচের নিম্নভাগ চতুষ্কোণাকৃতি, উপরের ভাগ গোলাকার. দৈর্ঘ্য ৮০ হাজার যোজন, তার অর্ধেক আকাশের দিকে উত্থিত আর অর্ধেক নীচের দিকে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট। তার যে দক্ষিণ পার্শ্ব আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে সংলগ্ন, তা নীলকান্তমণির তৈরী, সেইজন্য আকাশকে আমরা নীল দেখি। অন্য পার্শ্বগুলি রক্ত, পীত ও শ্বেত মণির তৈরী। তাহলে এই মেরু পর্বত হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র।

আমাদের সাধারণ লোকেরা যাকে 'কাফ' পর্বত বলে, হিন্দুরা তার নাম দিয়েছে 'লোকালোক'। ওরা মনে করে যে এই 'লোকালোক' থেকে মেরু পর্বত পর্যন্ত সূর্যের প্রদক্ষিণ পথ এবং 'লোকালোকে'র উত্তর পার্শ্বের ভিতরের দিক ব্যতীত অন্য কোন দিক সূর্যের দ্বারা আলোকিত হয় না।

Sogd-এর অগ্নি উপাসকরাও (জোরাবাস্ত্রিয়ান) কতকটা এই রকম ধারণা পোষণ করে, যেমন : 'আরদিয়া' পর্বত পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে, তার বাইরে আছে মানুষের চোখের তারার মত আকৃতিবিশিষ্ট 'খোম'; এই 'খোমের' মধ্যে প্রত্যেক বস্তুরই কিছু কিছু আছে; এর বাইরে শূন্য; পৃথিবীর কেন্দ্রে আছে 'গীরনগর' পর্বত; এটি দেবতাদের সিংহাসন এবং আমাদের ও অন্য ছয়টি ইক্লীমের (ভূভাগের) মধ্যভাগে অবস্থিত। প্রত্যেক দুটি 'ইক্‌লীমে'র মধ্যে জলন্ত বালুর প্রান্তর আছে; সেখানে পা রাখা অসম্ভব। গ্রহতারাগুলি এই 'ইক্‌লীম' সমূহে জাঁতার মত সমান্তরালভাবে আবর্তন করে, কিন্তু সবার উপরে অবস্থিত এবং মানুষের আবাসভূমি বলে আমাদের ইক্‌লীমে গ্রহগুলি ঈষৎ আনত রেখায় আবর্তিত হয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সপ্তদ্বীপ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ

২০৭ এই অধ্যায়ে যা বলতে যাচ্ছি তাতে এমন সব শব্দ ও ভাব আছে যার বৈসাদৃশ্য চোখে ঠেকবে; পাঠকের তা উপেক্ষা করা উচিত। শব্দের অভিনবত্ব যে ভাষার পার্থক্যের কারণ হয়ে থাকে, তা সহজেই বোঝা যায়। ভাবের অভিনবত্ব সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ত এই যে, তার মধ্যে বুদ্ধিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কিছু আছে, না তার সবটাই অযৌক্তিক, আলোচনা থেকেই তা বোঝা যাবে।

কেন্দ্রীয় দ্বীপের বর্ণনা তার কেন্দ্রস্থ পর্বতের প্রসংগে আলোচনা আমরা করেছি। এই দ্বীপে একরকম বৃক্ষ জন্মায় যার শাখাগুলি শত যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেই বৃক্ষের নাম থেকে দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ হয়েছে। জনপদ ও তার বিভিন্ন বিভাগের বর্ণনা প্রসংগে জম্বুদ্বীপের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া যাবে। এখন জম্বুদ্বীপের চতুর্দিকে অন্য যে সব দ্বীপ আছে তার উল্লেখ করব। তাদের নামের পরম্পরার জন্য আমি 'মৎস্য পুরাণকে' অনুসরণ করব; তার যুক্তি আমি উপরে উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার আগে 'বায়ু পরাণ' থেকে 'জম্বুদ্বীপ' সম্বন্ধে একটি তথ্য লিপিবদ্ধ করব। তাতে বলা হয়েছে যে মধ্যদেশে, অর্থাৎ জম্বুদ্বীপে, দুই প্রকারের জীব আছে। একটিকে 'কিমপুরুষ' বলা হয়; তাদের পুরুষরা হেমকান্তি, আর নারীরা 'সুরেনু'। তারা দীর্ঘজীবী ও নীরোগ, পাপ ও ঈর্ষার দোষমুক্ত, 'মধুপ' নামক বৃক্ষের ফলের রস তাদের খাদ্য। দ্বিতীয় প্রকারের জীবের নাম 'হরিপুরুষ'। তাদের বর্ণ রুপার ন্যায়, এগার হাজার বছর তারা বাঁচে। তাদের গুম্ফ-শমশ্রু হয় না; তাদের আহার্য ইক্ষু।

সোনা-রুপার রং ও শমশ্রুহীনতার উল্লেখ থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তুর্কীদের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু খাদ্যের কথা বিবেচনা করলে, তাল ও ইক্ষু ভোজী জাতিকে দক্ষিণেই খুঁজতে হয়। কিন্তু এই দুই বর্ণের লোক কোথায়
২০৮ পাওয়া যাবে? আমরা শুধু ভস্ম রুপার বর্ণের কথাই শুনেছি, যার কিছুটা হাবশীদের মধ্যে পাওয়া যায়। হাবশীদেরও দুঃখ ও ঈর্ষা নাই, কারণ তাদের কোনও বিত্তই নাই, যার দরুন এই আবেগের জন্ম হয়। তারা আমাদের চেয়ে

বেশীদিন বাঁচে নিশ্চয়ই, তবে খুব বেশীদিন নয় এবং দ্বিগুণ ত' নয়ই। তাদের মূঢ়তার কারণে হাবশীরা স্বাভাবিক মৃত্যু বোঝে না; অস্ত্রাঘাতে যে মৃত্যু ঘটেনি তাকে ওরা সন্দেহ করে বিষের ক্রিয়া বলে, যক্ষ্মা রোগীর নিশ্বাসকেও ওরা ঐরূপ সন্দেহ করে।

এখন আমি 'শাকদ্বীপের' বর্ণনা করছি। মৎস্য পুরাণের উক্তি মতে এতে সাতটি বিরাট নদী বা সাগর আছে, তার মধ্যে একটি গঙ্গার মতই পবিত্র। প্রথম সাগরে রত্নময় সাতটি পর্বত আছে, তার কোনটিতে দেব, কোনটিতে দানবরা বাস করে। তার একটি স্বর্ণনির্মিত ও সুউচ্চ, যাতে মেঘ জন্মায় যা আমাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে আসে। আর একটি পর্বত ওষধিতে পূর্ণ; ইন্দ্র তার থেকে বৃষ্টি সংগ্রহ করে। আর একটির নাম 'সোম'। এর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে: 'কাশ্যপের নাগমাতা কদ্রু ও পক্ষীমাতা বিনতা নামে দুই স্ত্রী ছিল। তারা একটি প্রান্তরে বাস করত যেখানে একটি শ্বেতঘোড়া ছিল। নাগমাতা তা দেখে বলল যে ঘোড়াটির রং বাদামি। তারা দুজনে তখন চুক্তি করল যে যার কথা মিথ্যা হবে সে অন্যের দাসী হয়ে থাকবে। তর্কের মীমাংসা পরদিন হবে এই স্থির হোল। সেই রাতে কদ্রু তার কৃষ্ণ পুত্রগণকে ঘোড়াটির দেহলগ্ন হয়ে থাকতে পাঠিয়ে দিল, যাতে তার আসল বর্ণ ঢাকা থাকে। এই চাতুরির ফলে বিনতা কিছুকাল কদ্রুর দাসী হয়ে থাকল। বিনতার দুই পুত্র ছিল। একটি 'আনুর' (? اُنور) সূর্যের অশ্ববাহিত রথের সারথী, আর দ্বিতীয়টি 'গরুড়'। গরুড় তার মাতাকে বলল, 'তোমার
২০৯ স্বপত্নীপুত্রদের জিজ্ঞাসা কর কি করে তোমার দাসীত্ব মোচন হতে পারে।' বিনতার প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল: 'দেবতাদের অমৃত এনে দিলে।' গরুড় তৎক্ষণাৎ উড়ে দেবতাদের কাছে গিয়ে অমৃত প্রার্থনা করল। দেবতারা বলল 'অমৃত দেবতাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অন্য কেউ তা পেলে সে দেবতাদের মতই অমর হবে।' গরুড় বহু অনুনয় করে মাতাকে মুক্ত করার জন্য সেটি ভিক্ষা চাইল এবং ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। তখন দেবতারা দয়াপরবশ হয়ে তাকে অমৃত দিল। সেটি নিয়ে সে সোম পর্বতে এল যেখানে কদ্রুর পুত্ররা ছিল। তাদেরকে অমৃত দিয়ে নিজ মাতাকে মুক্ত করার পর গরুড় তাদেরকে বলল, 'তোমরা গঙ্গায় স্নান না করা পর্যন্ত অমৃত স্পর্শ করো না।' তারা সেখানে অমৃত রেখে স্নান করতে গেলে, সেই অবসরে গরুড় সেটি নিয়ে গিয়ে দেবতাদের হাতে আবার ফিরিয়ে দিল। এই কর্মের জন্য সে দেবতাদের নিকট সম্মান পেল এবং পক্ষীরাজ ও 'বিষ্ণুর' বাহন হোল।

'মৎস্য পুরাণে' আরও বলা হয়েছে যে শাকদ্বীপের অধিবাসীরা সৎ, দীর্ঘজীবী এবং ঈর্ষা ও বিবাদ জানে না বলে রাজনীতির প্রয়োজনমুক্ত। সমস্ত ত্রেতাযুগ তাদের আয়ুষ্কাল, যা অপরিবর্তনীয়। তাদের মধ্যে 'চতুর্বর্ণ' অর্থাৎ চারি পৃথক শ্রেণী আছে যারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বা মেলামেশা করে না। এরা চিরসুখী, কখনও বিষন্ন হয় না। বিষ্ণু পুরাণানুযায়ী তাদের চারি শ্রেণীর উচ্চতম শ্রেণী হচ্ছে 'আর্যক' তারপর 'কুরু', 'বিবংশ' এবং 'বিহংস' জাতি (يها نشجت)। এরা বাসুদেবের উপাসনা করে।

তৃতীয়টি 'কুশদ্বীপ'। মৎস্য পুরাণানুযায়ী তাতে রত্ন, ফলফুল, সুগন্ধি লতা ও শস্যময় সাতটি পর্বত আছে। তার একটির নাম 'দ্রোণ'। তাতে দিব্য ঔষধি আছে, বিশেষতঃ বিশল্যকরণ, যা ক্ষতকে সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য করে এবং আরও আছে 'মৃতসঞ্জীবনী' যা মৃতকে বাঁচায়। আর একটি পর্বতের নাম 'হরি' কালো মেঘের ন্যায় তাতে 'মহিষ' নামক অগ্নি আছে যা জল থেকে
২১০ উঠেছে এবং যা জগৎ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। এই অগ্নি জগৎকে ধ্বংস করবে। এই দ্বীপে সাতটি রাজ্য ও অসংখ্য সাগরাভিমুখী নদী আছে; ইন্দ্র সেগুলি থেকে বারি বর্ষণের জন্য জল আহরণ করে। নদীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় নদী জোন (জহ্নু) যা সমস্ত পাপ ক্ষালন করে। এ দ্বীপের অধিবাসী সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে কিছুই বলা হয়নি, তবে 'বিষ্ণু পুরাণে' আছে যে তার অধিবাসীরা পুণ্যবান ও নিষ্পাপ এবং প্রত্যেকেই দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। তারা 'জনার্দনের' পুজা করে। তাদের চারি বর্ণের নাম 'দামিন', 'সুশ্মিন' 'স্নেহ' ও 'মন্দেহ'।

চতুর্থটি ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ। মৎস্য পুরাণের উক্তি অনুযায়ী তাতে রত্নময় বহু পর্বত ও গঙ্গার বহু শাখানদী আছে। তাতে অনেকগুলি রাজ্যও আছে যার অধিবাসীরা গৌরবর্ণ, সৎ ও শুচি। 'বিষ্ণু পুরাণে' বলা হয়েছে যে সেখানকার লোকেরা বর্ণ নির্বিশেষে একসংগে সবাই একই স্থানে বাস করে। কিন্তু তার পরে আবার তাদের চতুর্বর্ণের নামও দেওয়া হয়েছে: 'পুষ্কর', 'পুষ্কল', 'ধন্য' ও 'তিসাক্ষ'। এরাও 'জনার্দনের' উপাসক।

পঞ্চম দ্বীপের নাম 'শাল্মলী' দ্বীপ। মৎস্য পুরাণ মতে এই দ্বীপে বহু পর্বত ও নদনদী আছে, অধিবাসীরা পূতচরিত্র, দীর্ঘজীবী, ধীরস্বভাব ও ও নিষ্ক্রোধ। অনাবৃষ্টি বা অজন্মার দরুন তারা কখনও কষ্ট পায় না। বিনা আয়াসে ও বিনা কর্ষণে, ইচ্ছা মাত্রই তাদের খাদ্য আসে; বংশরক্ষার জন্য তাদের স্ত্রী সংসর্গের প্রয়োজন হয় না। রোগশোকেও তারা কখন ভোগে

না। সম্পদের লোভ তাদের নাই বলে রাজার প্রয়োজনও তারা বোধ করে না। তারা পরিতৃপ্ত নিরুপদ্রব জীবন যাপন করে এবং সর্বদা সৎকে শ্রেয় ও সততাকে প্রিয় জ্ঞান করে। উত্তাপ বা হিমের দরুন সে দ্বীপের আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় না এবং সেজন্য শীত ও গ্রীষ্ম থেকে নিজকে রক্ষা করার প্রয়োজনও তাদের হয় না। সেখানে বৃষ্টিপাত নাই, কিন্তু অধিবাসীদের জন্য
২১১ ভূমি থেকে জল উদ্গত হয় আর পর্বত থেকেও গড়িয়ে পড়ে। জলের এইরূপ ব্যবস্থা পরবর্তী দ্বীপগুলিতেও আছে। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই এক জাতীয়, কোনও বর্ণ বা শ্রেণীভেদ তাদের মধ্যে নাই। প্রত্যেকেই ৩ হাজার বৎসর করে বাঁচে। বিষ্ণু পুরাণের বর্ণনানুসারে তারা প্রিয় দর্শন ও ভাগবৎ উপাসক, হোম করে এবং প্রত্যেকে ১০ হাজার বৎসর বাঁচে এবং তাদের চতুর্বর্ণের নাম 'কপিল', 'অরুন', 'পীত' ও 'কৃষ্ণ'।

মৎস্যপুরাণের উক্তি মতে, ধর্ম অর্থাৎ 'গোমেধদ্বীপে' দুইটি বিরাট পর্বত আছে। একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নাম সুমনা, দ্বীপের অধিকাংশ বেষ্টন করে আছে। অন্যটি অতি উচ্চ, নাম 'কুমুদ', তার রঙ সোনালী, তাতে সমস্ত ঔষধি আছে। এই দ্বীপে দুইটি রাজ্য আছে।

বিষ্ণুপুরাণ মতে, এই দ্বীপের অধিবাসীরা সদাচারী, নিষ্পাপ, বিষ্ণুর উপাসক, তাদের চতুর্বর্ণের নাম 'মগ' 'মাগদ', 'মানস' ও 'মন্দগ', এখানকার আবহাওয়া এত স্নিগ্ধ যে স্বর্গের অধিবাসীরা মাঝে মাঝে সেখানে ভ্রমণ করতে আসে।

সপ্তম দ্বীপ হচ্ছে 'পুষ্কর'। মৎস্য পুরাণ মতে, তার পূর্ব দিকে চিত্রমান' নামক এক বিচিত্র পর্বত আছে, তার শৃঙ্গগুলি মণিময়, তার উচ্চতা ৩৪ হাজার যোজন আর পরিধি ২৫ হাজার যোজন। তার পশ্চিমে 'মানস' নামক পূর্ণ-চন্দ্রের মত উজ্জ্বল আর একটি পর্বত আছে যার উচ্চতা ৩৫০০ যোজন। এই পর্বতের এক পুত্র আছে যে পিতাকে পশ্চিম দিক থেকে প্রহরা দেয়। দ্বীপের পূর্ব দিকে দুইটি রাজ্য আছে যার অধিবাসীরা প্রত্যেকেই ১০ হাজার বৎসর করে বাঁচে। তাদের জন্য জল ভূমি থেকে উদ্গত হয় আর পর্বত থেকেও গড়িয়ে পড়ে। সেজন্য তাদের দেশে বারিপাত হয় না। কোনও নদীও প্রবাহিত হয় না। সেখানে গ্রীষ্মও নাই, শীতও নাই। তারা সকলে একই প্রকার, শ্রেণী বা বর্ণভেদ তাদের মধ্যে নাই। অপ্রাচুর্যে কখনও তারা ভোগে না। কখনও বৃদ্ধ হয় না। যা কিছু তারা কামনা করে সবই তাদের কাছে এসে যায়, তাই তারা
২১২ সর্বদা সুখ শান্তিতে থাকে, পুণ্য ছাড়া আর কিছু তারা জানে না। তারা যেন

স্বর্গের প্রান্তে বাস করছে, যেখানে সকল প্রকার সুখশান্তি ও দীর্ঘজীবন তাদিগকে দেওয়া হয়েছে এবং উন্নতির প্রয়োজন তাদের দূর হয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে জীবিকাবৃত্তি নাই, রাজা নাই, পাপ নাই, ঈর্ষা-বিদ্বেষ নাই, বাক্‌বিতন্ডাও নাই, কৃষিকার্যের জন্য পরিশ্রম নাই, বাণিজ্যের জন্য চেষ্টাও নাই।

বিষ্ণুপুরাণ মতে এক বিশাল বৃক্ষের নামানুসারে 'পুষ্কর' দ্বীপের নাম হয়েছে, বৃক্ষটিকে 'ন্যাগ্রোধ'ও বলা হয়। এই বৃক্ষতলে 'ব্রহ্ম-রূপ' অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতিমূর্তি আছে, যা দেবদানবরা পূজা করে। দ্বীপের অধিবাসীরা সবাই সমান, কেউ মহত্ত্বের দাবী করে না তা সে মানুষই হোক আর দেবতা সম্পর্কিত অন্য জীবই হোক। এই দ্বীপে 'মানসোত্তম' নামে মাত্র একটি পর্বত আছে, যা বৃত্তাকারের, দ্বীপের উপরে বৃত্তাকারে উপরে উঠে গেছে। তার চূড়া থেকে অন্য সমস্ত দ্বীপ দেখা যায়, কেননা তার উচ্চতা ১০ হাজার যোজন আর প্রস্থও তার সমান।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভারতবর্ষের নদ-নদী, তাদের উৎস ও প্রবাহপথ

যে সব বিখ্যাত পর্বতকে আমরা মেরু পর্বতের 'গ্রন্থি' (বা বাঁক) বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার থেকে যে সব নদনদী প্রবাহিত হয়েছে তাদের নামের একটি তালিকা 'বায়ুপুরাণে' দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপ করার জন্য তালিকাটি সারণির আকারে নীচে উদ্ধৃত করছি।

২১৩

গ্রন্থি	তার থেকে 'নাগর সমবৃত্তে' প্রবাহিত নদনদীর নাম
মহেন্দ্র	ত্রিসাগা (ত্রিসামা), ঋষিকুল্যা, ইক্ষুল, ত্রিদিব, অয়ন (?), লাঙ্গুলিনী, বংশধারা।
মলয়	কৃতমালা, তাম্রবর্ণ (তাম্রপর্ণী), পুষ্পজাতি, উৎপলবিন (উৎপলাবতী)
সেহ্য (? সহ্য)	গোদাবরি, ভীমারথি, কৃষ্ণ, বৈন্য (কৃষ্ণবেণী), সবঞ্জল, তুঙ্গাভদ্রা, সুপ্রযোগ, পয়, কাবেরী।
সুক্তিবাম (সুক্তিমান)	ঋসুকা (ঋষিক), বালুকা (মন্দগ), কমারী, মন্দ-বাহিনী, কূপ (কুপ), পলাসিনি।
ঋক্ষবাম (ঋক্ষপাদ)	সোন, মহানদ, নর্মদা, সুরস, কিরুব (?) মন্দাকিনি, দশার্ন, চিত্রকূট, তমসা, পিপ্পলা, শ্রোণী, করমোদ (? করতোয়া), পিসাবক (পিশাচিকা ?), চিত্রপল, মহাবেগ, পঞ্জুল (বঞ্জুল), বালুবাহিনী, শুক্তিমতী, শকনু (? মকরুণা), ত্রিদিব
বিন্ধ্য	তাপি, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, সিরুব (?), নিষাধ, বেনু, বৈতরণী, সিনিহাহু (? সিতিবাহু), কুমুদবতি, তোয়া, মহাগোরী, দুর্গা, অন্তঃশীলা।
পরিযাত্র	বেদস্মৃতি, বেদবতি, বিষয়ধ্বনি (? বৃত্রঘ্নি), বর্ণাশা, নন্দনা, সন্দনা (?), রামাদি (?), পার (?), চর্মন্বতি, লুপি (?) বিদিশা।

মৎস্য ও বায়ুপুরাণে বলে যে নদীগুলি জম্বুদ্বীপে প্রবাহিত এবং হিমবন্ত

২১৪ পর্বতে তাদের উৎপত্তি। এই তালিকায় আমি কোনও বিশেষ পারম্পর্য অনুসরণ

করিনি, কেবল নামোল্লেখ করেছি। আমাদের মনে করা উচিত যে পর্বতমালা ভারতবর্ষের সীমাকে বেষ্টন করে আছে। উত্তরে যে পর্বত আছে, তা তুষারাবৃত 'হিমাবন্ত', তার কেন্দ্রে আছে কাশ্মীর, তুর্কিস্তানের সাথে সংযুক্ত। মেরু পর্বতের দিকে মনুষ্য বসতির শেষসীমা পর্যন্ত এই পার্বত্য অঞ্চলের শৈত্য ক্রমশঃ বেড়ে গেছে। যেহেতু হিমাবন্তের বিস্তার দ্রাঘিমার দিকেই বেশী, সেজন্য তার থেকে উত্তর দিকে যেসব নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেগুলি তুর্কিস্তান তিব্বত khazar ও স্লাভ (Slav) দেশ হয়ে জুর্যান (Caspian) কিংবা Khwarizm (Aral) কিম্বা, Pontus (Black) অথবা উত্তর স্লাভদের (Baltic) সাগরে গিয়ে পড়েছে। আর, যেগুলি দক্ষিণ দিকে বেরিয়েছে সেগুলি ভারত ভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং পৃথকভাবে, নয়ত অন্য নদীর সাথে একত্র হয়ে ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের নদীগুলি হয় উত্তরের হিম পর্বতমালা থেকে, নয়ত পূর্বদিকের পর্বত সমূহ থেকে উৎসারিত। এই পর্বতমালা দুইটি আসলে একই, পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে আবার দক্ষিণে বেঁকে মহাসাগরের কাছে পৌঁছেছে। সেখানে তার কিছু অংশ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে, যাকে রামের বাঁধ বলা হয়। অবশ্য এইসব পর্বতে শীত ও তাপের বিস্তর প্রভেদ আছে। নীচের সারণিতে আমি এই সব নদীর নামগুলি সাজিয়েছি—

২১

সিন্ধু Vaihind এর নদী	বিয়ত্ত অথবা ঝিলম	চন্দ্রভাগা বা চন্দ্রাহা	বিয়াহ্ লাহোরের পশ্চিমে	ইরাবতি লাহোরের পূর্বদিকে	শতরুদ্র বা শতলদর
সরসত দেশে প্রবাহিত 'সরসত'	বতন যমুনা	গঙ্গা	সরযু বা সরূব্	দেবক	কুহু (?)
গোমতি	ধুতনাপ	বিশাল	বাহুদাস(?)	কোশিকী	নিশ্চর
গণ্ডকি	লোহিত	দুশদ্বতি	তাম্র, অরুণ	পর্ণাশা	বেদস্মৃতি
বিদক্ষ	চন্দন	কাওন ?	পরা	চর্মণ্দ (চর্মণ্বতি)	বিদিসু (বিদিশা)
বেণুমতি	সিপ্রা পরিযাত্রায় উৎপন্ন ও উজ্জয়িনী দিয়ে প্রবাহিত	করতোয়া	স্নাহিন		

'কপিশ' অর্থাৎ কাবুল রাজ্য সংলগ্ন পর্বত থেকে যে নদী প্রবাহিত তার নাম 'ঘোরওয়ানদ' (Ghorwand),কারণ তার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। অনেকগুলি উপনদী এতে এসে মিলিত হয়েছে : যেমন Gluzak pass-এর নদী; Barwan নগরের নীচে Panjhir (Panjshir) খাদের নদী, শরওয়ত, ও 'সাও' নদী, যা পরে 'লম্বগা' বা লমঘান শহরের মধ্য দিয়ে এসেছে, (এই দুইটি নদী 'দ্রোত' দুর্গের কাছে এসে Ghorwand নদীতে পড়েছে,) নূর ও কিরাত নদী। এইসব উপনদী জল নিয়ে Purshawar নগরের সম্মুখে Ghorwand নদী বিরাট আকার ধারণ করেছে। সেখানে পূর্বতীরে অবস্থিত মহনারা গ্রামের পায়ে হেটে পার হওয়ার স্থান থেকে নদীর নামও 'মাবার' হয়েছে। Gorwand নদী, আলকান্দার (গান্ধার) অর্থাৎ ওয়াইহিন্দের রাজধানীর নীচে, বিতুর দুর্গের কাছে এসে সিন্ধু নদে পড়েছে।

২১৬ পশ্চিম তীরে অবস্থিত ঝিলম নগরের নামে পরিচিত বিয়ত্ত নদী 'ঝরাওয়ার'-এর পঞ্চাশ মাইল উপরে 'চন্দ্রাহা' নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুলতানের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত এবং 'বিয়াস' নদী মুলতানের পূর্বদিক দিয়ে গিয়ে উক্ত নদীদ্বয়ের সাথে মিলিত হয়েছে। 'ইরাওয়া' (ইরাবতি) নদীর সঙ্গে নগরকোটের 'বাহাতুল' পর্বত থেকে প্রবাহিত 'গজ' নদী এসে মিশেছে। তারপর শতদ্রু (শতলদর)। এই পাঁচটি নদী মুলতানের নীচে পঞ্চনদ নামক স্থানে মিলিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে, বন্যার সময়ে তার জল এত স্ফীত হয় যে প্রায় দশ ফারসাখ ব্যাপী ভূখণ্ড জলপ্লাবিত হয়ে যায়, সমতল ভূমির গাছপালাও জলমগ্ন হয়, ফলে জলবাহিত আবর্জনাগুলি পাখীর বাসার মত গাছের উচ্চ শাখায় আটকে থাকতে দেখা যায়।

সিন্ধুদেশের 'আরোর' নগর পার হবার পর এই একত্রিত জলধারাকে আমাদের লোকেরা (মুসলমানেরা) Mihran নামে অভিহিত করে। এইভাবে, নদীটি ক্রমশঃ প্রশস্ত ও স্বচ্ছতর হতে থাকে এবং স্থানে স্থানে দ্বীপের ন্যায় ভূভাগকে বেষ্টন করে সরল রেখায় দক্ষিণাভিমুখী হয়ে তারই কয়েকটি শাখানদীর মধ্যে অবস্থিত আলমানসুরা নগর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে সিন্ধুর জলধারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে : একটির সঙ্গমস্থল লোহারানি শহরের নিকটে, অন্যটির আরও পূর্বদিকে, কচ্ছের অন্তর্গত' সিন্ধুসাগর' নামক স্থানে।

এখানে যেমন পাঁচটি নদীর একত্রিত নাম (পঞ্চনদ) আছে- তেমনই উপরোক্ত পর্বতের উত্তর দিকে প্রবাহিত কয়েকটি নদীরও নাম আছে,

যেমন তিরমিজ্-এর নিকটে এসে ঐ নদীগুলি একত্র হয়ে বল্খের সম্মুখে সে জলধারার নাম হয়েছে সম্তনদী। Sagdiana-র মজুসিরা (magian) এই দুটি পৃথক ব্যাপারকে গুলিয়ে ফেলেছে। তারা বলে ঃ 'সাতটি নদীর সমষ্টি হচ্ছে সিন্ধু এবং তার উপরের ভাগের নাম হচ্ছে 'বারিদিশ'; এই নদীর স্রোত ধরে নেমে আসতে আসতে পশ্চিম মুখে দাঁড়ালে ডান দিকে সূর্যাস্ত দেখা যাবে, যা এখানে আমাদের বামদিকে দেখতে পাই।

২১৭ 'সরস্সতি' নদী, সোমনাথের পূর্বদিকে শরক্ষেপ-পরিমাণ দূরে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। আর 'যওন'-এর (যমুনা) জল কনৌজের নীচে এসে গঙ্গায় মিশেছে। কনৌজ গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই সংযুক্ত জলধারা 'গঙ্গাসাগরের' কাছে এসে সমুদ্রে পড়েছে। গঙ্গা ও স্বরস্বতীর উৎসমুখের মাঝামাঝি স্থানে নর্মদার উৎসমুখ, যা পূর্বদিকের পর্বত থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে বহ্রোজের (ব্রোচ) নিকট এসে সাগরে পড়েছে। 'বহ্রোজ' সোমনাথ থেকে ৬০ যোজন পূর্বদিকে অবস্থিত। গঙ্গার পিছনে 'রাহব' ও 'কোয়নি' (کوینی) নদী বারী শহরের কাছে এসে সরবূনদীতে (সরযূ) মিশেছে।

হিন্দুদের বিশ্বাস যে পুরাকালে গঙ্গার প্রবাহ পথ স্বর্গে ছিল। কেমন করে সে গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হোল, সে কাহিনী আমি পরে বলব। মৎস্য পুরাণে আছে ঃ ধরা স্পর্শ করার পর গঙ্গা নিজ ধারাকে সাতটি শাখায় ভাগ করে দিল, যার কেন্দ্রস্থ ধারাটি প্রধানতঃ গঙ্গা নামে অভিহিত। তিনটি ধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হোল, তাদের নাম নলিনী, হ্লাদিনী ও 'পাবনি,; অন্য তিনটি ধারা পশ্চিমমুখী হোল। তাদের নাম 'সীতা', 'যক্ষ' (চক্ষু) ও 'সিন্ধু': 'সীতা' নদী 'হিমাবন্ত' থেকে উৎসারিত হয়ে 'সলিল (?' সিরিন্দ্র), 'করুফুব' (? کرشفب) 'চীন', 'বর্বর' 'যবর' (? যবশ', 'বহ' (? দ্রুহ), পুষ্কর, কুলত (?), মঙ্গল, 'কবর' (?) ও সঙ্গবন্ত (?) দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। 'সীতার' দক্ষিণে আছে 'যক্ষ' (চক্ষু) নদী, চীন, মরু, কালিকা (?) ধূলিকা (? মূলিকা), তুখার (তুষার), বর্বর, কচ্ছ, 'বলহব' (পহ্লব) ও 'বারওয়ানচত' (? بارو انچت) দেশগুলিকে জলদান করে। 'সিন্ধু' 'দরদ' 'যিন্দুতুন্দ' (? زندتند) গান্ধার- রুরস (?), 'ক্রুর'

২১৮ (?), 'সিবপুর, 'ইন্দ্র' 'মরু', বসাতি' (? বদাতি), 'সৈন্ধব', 'কুবত', 'ভীমরবর' (? ভ্রমরাভির), 'মর' (?) 'মরুন' (?) ও সুকর্দ (?) দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। আর, কেন্দ্রস্থ প্রধানতম নদী গঙ্গা যে সবের উপর দিয়ে প্রবাহিত তা হচ্ছে ঃ

গন্ধর্ব' (গায়ক); কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, উরগ (সরীসৃপ, অর্থাৎ সাপ) কলাপগ্রাম (পুণ্যবানদের গ্রাম), কিম্পুরুষ, 'কশন', (کشان পার্বত্য জীব), কিরাত, 'পুলিন্দ' (মরুভূমির শিকারী ও তস্কর), 'কুরু' 'বৈরুত' (ভরত), পঞ্চাল, 'কৌশক' (? কাশী), মাৎস্য, মগধ, 'ব্রহ্মোত্তর' ও তামলিপ্ত (তাম্রলিপ্তি)। এই সব সৎ ও দুষ্ট জীবদের আবাস ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা বিন্ধ্য গিরিমালায়—যেখানে হস্তীদের বিচরণ ভূমি আছে—প্রবেশ করেছে, এবং অবশেষে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। গঙ্গার পূর্ব শাখাগুলির মধ্যে 'হ্লাদিনী', নিষাধ, 'উপকান' (? উপভোগ), 'ধীবর' (ধীবর), প্রিশক্ (? ঋষক), নীলমুখ, 'কিকর', ওষ্ঠকর্ণ (উষ্ট্রকর্ণ, যাদের ওষ্ঠ কর্ণের ন্যায় বক্র বা ওলটানো), কিরাত, কালিদর (কালোদর), বিবর্ণ (ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার দরুন যাদিগকে বর্ণহীন বলা হয়), 'কুশীক' জাতি ও 'স্বর্গভূমের' (স্বর্গতুল্য ভূমি) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব সমুদ্রে পড়েছে। আর 'পাবনি' নদী, 'কুবত' (? পাপ রহিত) ইন্দ্রদ্যুম্নসরনি, (রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সরোবর) 'খরপথ' 'চিত্র' ও 'সংকুপথ'কে জল সিঞ্চিত ক'রে, 'উদ্যান মরুর' প্রান্তর দিয়ে কুশপ্রবরণ' দেশ (ব্রাহ্মণদের সহকারীরূপে যারা কুশের বস্ত্র পরিধান করে) ও
২১৯ 'ইন্দ্রদ্বীপ' হয়ে লবণ সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। আর 'নলিনী' নদী, 'তামর' (তোমর), 'হংসমার্গ', 'সমুহক' (সহুহুক) ও 'পূর্ণ' অতিক্রম করে প্রবাহিত। এসব জাতি পুণ্যবান, পাপমুক্ত। তার পরে, পর্বতের মধ্য দিয়ে এসে 'কর্ণপ্রবরণ' (যাদের দীর্ঘ কান কাঁধের উপর এসে পড়ে) ও 'অশ্বমুখ'দের দেশ হয়ে, 'পর্বতমরু' ও 'রুমীমণ্ডল' (নেমিমণ্ডল) অতিক্রম করে 'নলিনী' নদী সমুদ্রে পড়েছে। কিন্তু 'বিষ্ণুপুরাণ' বলেছে যে কেন্দ্রীয় পৃথিবীর যে সব মহানদী সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে তাদের নাম 'অনুতপত্', 'শিখি' 'দিপাশ' (বিপাশা), 'ত্রিদিব', 'ক্রমু' 'অমৃতন' ও 'সুকৃতা'।

ষড়বিংশ অধ্যায়

ভারতীয় জ্যোতিষী মতে আকাশ ও পৃথিবীর আকার

এই বিষয়ে হিন্দুদের যা ধারণা ও সিদ্ধান্ত তা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আসলে, এ বিষয়ে এবং মানুষের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয়ে কোরআনে যে বাণী আছে, তাতে এমন কিছু নাই যার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা না করলে শ্রোতার মনে তা নিশ্চিত প্রত্যয়ে পরিণত হয় না। কোরআনের পূর্বে প্রেরিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে কোরআনের বাক্যগুলির অন্যান্য প্রেরিত গ্রন্থের সঙ্গে হুবহু মিল আছে; এবং তার নির্দেশাবলীতে কোনও অস্পষ্টতা নাই। তা ছাড়া, কোরআনে এমন কোনও ব্যাপার নাই যা নিয়ে মতবিরোধ চলে আসছে, কিম্বা যার মীমাংসার আশা নাই, যেমন ইতিহাসের কোনও কোনও অস্পষ্ট তথ্য বা তারিখ। গোড়া থেকেই ইসলামকে এমন সব চক্রান্তকারীদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল যারা কায়মনোবাক্যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে এবং যারা সরল বিশ্বাসী লোকের কাছে কোরআনের বাণী বলে এমন সব কথা পড়ে শোনাত যার এক বর্ণও আল্লাহর সৃষ্ট বা প্রেরিত নয়, অথচ লোকে তাদিগকে বিশ্বাস করত এবং এই শঠতা না বুঝে এবং প্রকৃত গ্রন্থ (কোরআন) ত্যাগ করে প্রবঞ্চক
২২০ -দের মুখ থেকে শোনা এই মিথ্যা বাণী তারা নকল করে নিত। কেননা, ইতর-জনের মন যে কোনও তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। এই কারণে তাতে অসঙ্গতির সৃষ্টি হোল।

তারপর ইবনুল মুকাফ্‌ফা, আবদুল করিম বিন্ আবিল আওজা প্রমুখ জিন্দিক ও মানী মতাবলম্বী লোকদের হাতে ইসলাম আর একবার বিপদের সম্মুখীন হোল। ন্যায়-অন্যায়ের তর্কচ্ছলে এরা দুর্বলমতি লোকের মনে এক ও আদি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি করল এবং তাদিগকে দ্বৈতবাদের দিকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। মানীর জীবনচরিতকে তারা এমন পল্লবিত করে উপস্থাপিত করল যে লোকে তার প্রতি আস্থাভাজন হয়ে পড়ল। এই লোকটি (মানী) তার মিথ্যা ধর্মশাস্ত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, দেখা যায় বিশ্বজগতের রূপ সম্বন্ধেও সে বাকাড়ম্বর করেছে। তার এই মতবাদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে

প্রচারিত হোল, ইহুদীদের উপরোক্ত প্রবঞ্চনার সাথে এই মতবাদগুলি ইসলাম নামে পরিচিতি হতে লাগল। অথচ তার সাথে আল্লাহর কোনও সংশ্রবই নাই। যে এ চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচরণ করে কোরআনসম্মত সত্য ধর্মে অবিচলিত থাকত, তাকে ওরা কাফের ও মুলহিদ (ধর্মভ্রষ্ট) বলে শিরশ্ছেদের বিধান দিত এবং তাকে কোরআনের বাণী শোনার অনুমতিও দিত না। তাদের এরূপ আচরণ ফেরআউনের এই উক্তির চেয়েও গর্হিত 'আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রভু', 'তোমাদের পক্ষে আমার চেয়ে অন্য কোনও ঈশ্বরের কথা আমি জানি না।' এ ধরনের গোড়ামি বৃদ্ধি পেলে আমরা অচিরেই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা হারাব। যে আল্লাহর সম্মান করে ও যার সত্যানুসন্ধিৎসা অক্ষুন্ন আছে, আল্লাহ তাকেই সত্য পথে স্থির রাখেন।

হিন্দুদের শাস্ত্র ও পুরাণাদি স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে বিশ্বজগতের আকার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা ওদের জ্যোতিষীদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেরই বিপরীত। তবে এইসব গ্রন্থ অনুসরণ করে ওরা ওদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এবং তার দরুন জনসাধারণ জ্যোতিষ গণনা, শুভাশুভ নির্ণয় ও ফলাফল বিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই কারণে জনসাধারণ জ্যোতিষীদের প্রতি অনুরক্ত হয়, তাদের সততায় বিশ্বাস করে এবং তাদের সাক্ষাৎ পাওয়াকে মঙ্গলজনক মনে করে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে জ্যোতিষীরা সবাই স্বর্গের অধিকারী, কেউ নরকে পতিত হবে না। এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধার প্রতিদানে জ্যোতিষীরাও জনসাধারণের চলিত সংস্কার ও ধারণাকে সত্য বলে প্রচার করে, তাদের মত আচরণ করে এবং তাদের মনোমত অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করে,
২২১ তা সে সত্যের যত-ই বিপরীত হোকনা কেন। এই কারণেই জনসাধারণের সংস্কারের সাথে জ্যোতিষশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কালক্রমে ওতপ্রোত-ভাবে মিশে গেছে, যার ফলে জ্যোতিষীদের সিদ্ধান্তে ভ্রান্তি ও অস্থিরতা এসেছে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা গবেষণা না করে শ্রুতিকেই প্রামাণিক নীতিসূত্র ধরে নিয়ে কেবল অপরের অনুসরণ করে। এরাই সংখ্যায় বেশী।

এখন আমরা বিশ্বজগতের আকার সম্বন্ধে হিন্দুদের মতামত বর্ণনা করব। ওদের মতে ,আকাশ ও বিশ্বজগৎ বৃত্তাকার এবং পৃথিবীর আকৃতি গোলকের ন্যায়, তার উত্তরার্ধ শুষ্ক, দক্ষিণার্ধ জলমগ্ন। গ্রীকদের বিশ্বাস মতে ও বর্তমান পর্যবেক্ষণে নির্ণীত পৃথিবীর যা আয়তন, হিন্দুদের ধারণায় পৃথিবী তার চেয়েও বড়। এই আয়তন নির্ণয় করার সময় কিন্তু ওরা সমুদ্র ও দ্বীপ সমূহ এবং সেগুলির বিপুল যোজন সংখ্যার উল্লেখ পর্যন্ত করে না।

যেসব বিষয়ে তাদের নিজ শাস্ত্রের কোনও হানি হয় না সে সব বিষয়ে জ্যোতিষীরা ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ করে, যেমন উত্তর মেরুর নীচে মেরু পর্বতের এবং দক্ষিণ মেরুর নীচে 'বাড়বামুখ' দ্বীপের অবস্থান এরা মেনে নেয়। মেরু পর্বত বাস্তবিকই সেখানে আছে কিনা, সে কথা অবান্তর, কারণ যাঁতার ন্যায় আবর্তনের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যই তার অবতারণা করা হয়। কারণ ভূ-পৃষ্ঠের সমতল ভাগের প্রত্যেক অংশের সুবিন্দু (zenith) হিসাবে আকাশের প্রত্যেক অংশের সমতা (correspondence) আছে। দক্ষিণ মেরুর 'বাড়বামুখ' দ্বীপের ধারণাও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন ক্ষতি করে না, যদিও খুবই সম্ভব যে পৃথিবীর দুই-চতুর্থাংশ অবিচ্ছিন্ন ভূভাগ এবং অন্য দুই-চতুর্থাংশ অবিছিন্ন জলমগ্ন মহাসাগর। ওরা পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত মনে করে এবং যেহেতু সমস্ত ভারি বস্তু তার দিকে আকৃষ্ট হয় সেজন্য আকাশকেও গোলাকৃতি মনে করতে ওরা বাধ্য হয়েছে।

এখন আমরা এ সম্বন্ধে হিন্দু জ্যোতিষীদের উক্তির অনুবাদ করব। এই অনুবাদে যদি কোনও শব্দ আমাদের প্রচলিত অর্থের বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে পাঠক যেন তার আসল শব্দার্থই গ্রহণ করেন, আমাদের মধ্যে প্রচলিত অর্থে সে শব্দ ব্যবহার করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

'পলিশ' তাঁর সিদ্ধান্তে বলছেন, ইউনানী পৌলিশ এক স্থানে বলেছেন, পৃথিবী গোলকাকৃতি; আবার আর এক স্থানে বলছেন, পৃথিবীর আকার আবরণের ন্যায় চ্যাপটা, সমতল। দুইটি উক্তিই সত্য। কারণ, পৃথিবীর বহি-
২২২ র্ভাগ বা পৃষ্ঠ বৃত্তাকার, আর তার ব্যাস হচ্ছে সরলরেখা (Straight line)। পৌলিশের অন্যান্য উক্তি থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি পৃথিবীর গোলকাকৃতিতে বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়া, বরাহমিহির, আর্যভট্ট, দেব, শ্রীসেন, বিষ্ণুচন্দ্রের মত পণ্ডিতরাও এ বিষয়ে একমত। যদি পৃথিবী গোলাকাকৃতি না হোত তাহলে বিভিন্ন স্থানের অক্ষরেখা তাকে বেষ্টন করে থাকত না, শীত ও গ্রীষ্মে দিবারাত্রির দৈর্ঘ্যে কোনও পার্থক্য হোত না এবং গ্রহ নক্ষত্রের যে অবস্থান ও আবর্তন আমরা দেখি তা-ও হোত না। তবে পৃথিবীর অবস্থান কেন্দ্রানুগ; তার অর্ধেক মাটি, অর্ধেক জল। মেরু পর্বত, শুষ্ক (মাটি) ভাগে অবস্থিত, দেবতাদের আবাস; তার উপরে উত্তর মেরু। জলমগ্ন অন্য অংশে দক্ষিণ মেরুর নীচে 'বাড়বামুখ' দ্বীপের ন্যায় শুষ্ক; তাতে 'দৈত্য' ও 'নাগ' প্রভৃতি মেরুবাসী দেবতার সমগোত্রীয়রা বাস করে, সেজন্য তাকে 'দৈত্যান্তর' বলা হয়। আর্দ্র ও শুষ্ক ভাগকে যে রেখা বিভক্ত করে আছে তাকে

'নিরক্ষ' বলা হয়, অর্থাৎ যার অক্ষ রেখা (latitude) নাই। এটি আসলে বিষুব-রেখা। এই রেখার চারিকোণে চারিটি বৃহৎ নগর আছে; পূর্বে 'যমকোট', পশ্চিমে 'রোমক', দক্ষিণে 'লংকা', আর উত্তরে 'সিদ্ধপুর'। পৃথিবী দুই মেরুতে বাঁধা আছে এবং মেরুদণ্ড (axis) তাকে ধরে রেখেছে। 'লংকা' ও মেরুর রেখাতে সূর্য উদয় হোলে 'যমকোটে' দ্বিপ্রহর হয়, 'রোমে' মধ্যরাত্রি হয় এবং 'সিদ্ধপুরে' সন্ধ্যা হয়। আর্যভট্টও এই রূপ কথাই বলেছেন।

'ভিল্লমাল' নিবাসী 'জিষ্ণু' পুত্র ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তে' বলেছেন
২২০ 'পৃথিবীর আকার নিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলেছে, বিশেষ করে যারা পুরাণ ও শ্রুতিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে। কেউ বলে যে পৃথিবী দর্পণের ন্যায় সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্র বেষ্টিত; এ সমুদ্র আবার মৃত্তিকা বেষ্টিত; এই ভাবে পর্যায়-ক্রমে সমুদ্র ও মৃত্তিকা মালার ন্যায় পরস্পরকে বেষ্টন করে আছে। প্রত্যেকটি সমুদ্র ও ভুভাগের পরিমাণ তার বেষ্টিত ভাগের দ্বিগুণ, সর্বশেষ ভুভাগ কেন্দ্র-স্থিত ভুভাগের চৌষট্টি গুণ বড়, আর সর্বশেষ সমুদ্র কেন্দ্রস্থিত সমুদ্রেরও চৌষট্টি গুণ বড়। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে নক্ষত্রের উদয়-অস্ত বিভিন্ন সময়ে হওয়াতে আকাশ ও পৃথিবীকে বর্তুলাকার না হয়ে উপায় নাই; যেমন 'যমকোটের' লোক কোনও একটি নক্ষত্রকে যখন পশ্চিম দিগন্তে উঠতে দেখে ঠিক সেই সময়ে রোমের লোক সেই নক্ষত্রটিকে ঠিক পূর্বাকাশে উঠতে দেখে। তেমনই, মেরুর লোক যে নক্ষত্রকে লংকা বা রাক্ষস দেশের সমান্তরাল রেখায় দিগন্তে উঠতে দেখে, সেই একই নক্ষত্রকে 'লংকা'র লোক ঠিক সেই সময়ে তার মাথার উপরে দেখতে পায়। তাছাড়া আকাশ ও পৃথিবী বর্তুলাকার না মনে করলে জ্যোতিষের কোনও গণনাই শুদ্ধ হয় না। তাই, বাধ্য হয়েই আমরা বলি যে আকাশ বর্তুলাকার, কারণ গোলকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই আমরা তাতে দেখতে পাই এবং পৃথিবী গোলক না হলে, তার এই বৈশিষ্টের পর্যবেক্ষণও অশুদ্ধ হোত। অতএব দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে অন্য সব মতবাদই ভ্রান্ত।

পৃথিবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আর্যভট্ট বলছেন যে, পৃথিবী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সমষ্টি এবং এই প্রত্যেকটি পদার্থই গোলাকার। তেমনই 'বশিষ্ট' ও 'লাট'ও বলছেন যে পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, সমস্তই গোলাকার। বরাহমিহির বলেছেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই পৃথিবীর বর্তুলাকার হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং তার অন্যবিধ আকৃতি হওয়া অপ্রমাণ করে।

আর্যভট্ট, পলিশ, বশিষ্ট ও লাট—সবাই এ বিষয়ে একমত যে 'যমকোটে' ২২৪ যখন দ্বিপ্রহর, 'রোমে' তখন মধ্যরাত্রি, 'লংকা'তে প্রভাত, আর 'সিদ্ধপুরে' রাত্রির আরম্ভ। পৃথিবী গোল না হলে তা সম্ভব হোত না। পৃথিবী বর্তুলাকার না হলে, তেমনই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কালানুক্রম ব্যাখ্যাও করা যায় না। 'লাট' বলেছেন: ধরিত্রীর প্রত্যেক স্থান থেকে আকাশ-গোলকের অর্ধেক ভাগ মাত্র দেখা যায়। যত উত্তরে আমাদের অক্ষরেখা হয়, দিগন্তের তত উপরে মেরুপর্বত ক্রমশ দেখা দেয়; আর দিগন্তের যত নীচে সেগুলি নেমে যায়, আমাদের অক্ষরেখা তত দক্ষিণে থাকে এবং অক্ষরেখা এই দুই দিকের যত নিকটবর্তী হবে, সুবিন্দু থেকে বিষুবরেখাও তত নীচে নেমে থাকবে। যে বিষুব রেখার উত্তর বা দক্ষিণ আছে, সে তার দিকের মেরুই দেখতে পাবে, তার বিপরীত মেরু সে দেখতে পাবে না।'

আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের বর্তুলাকৃতি হওয়া সম্বন্ধে এই হচ্ছে ওদের উক্তি। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবী যে দৃশ্যমান আকাশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, সে সম্বন্ধেও ওদের উক্তি এ-ই রূপ। এসব ধারণা অবশ্য Ptolemy-র Almagest-এর প্রথম অধ্যায়ের ও এরূপ অন্যান্য গ্রন্থের অন্তর্গত পদার্থ বিদ্যার (Physics, علم الطبيعة) মূল সূত্র, তবে আমরা সেগুলিকে যেমন বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা করতে অভ্যস্ত, এরা সেরকম করে না। (পাঠচ্ছেদ[১])

তার কারণ যে মাটি জলের চেয়ে ভারী এবং জল বাতাসের মত তরল। যতক্ষণ না আল্লার ইচ্ছায় অন্য আকৃতি পাচ্ছে, ততদিন পৃথিবী বাহ্যিকভাবে বর্তুলাকৃতি হতে এই রকম বাধ্য। কাজেই পৃথিবীর উত্তর দিকে সরে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনই জলেরও দক্ষিণে সরে যাওয়া সম্ভব নয়, যার ফলে অর্ধেকটা শুষ্ক আর অর্ধেকটাতে জল দাঁড়ায়, কারণ তাহলে আমাদেরকে মনে করতে হবে যে পৃথিবীর শুষ্কার্ধ কলসের ন্যায় শূন্যগর্ভ। বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা যা পাচ্ছি তাতে পৃথিবীর শুষ্ক ভূমিভাগ উত্তরার্ধের দুই-চতুর্থাংশের একটিতে থাকতে বাধ্য। সেই কারণে আমরা অনুমান করি যে পার্শ্ববর্তী অন্য চতুর্থাংশটিও উত্তরার্ধই হবে। 'বাড়বামুখ' দ্বীপের অস্তিত্ব আমরা অসম্ভব মনে করি না তবে তার অস্তিত্ব যে আছেই এ কথাও বলতে পারি না। কেননা মেরু পর্বতের মত, এ দ্বীপ সম্বন্ধেও যা বলা হয় তার সবই শ্রুত সংবাদ।

১ মুদ্রিত পুস্তকে চিহ্নিত নাই, তবে অসংলগ্নতা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এখানে পাঠের কিয়দংশ ছেড়ে গেছে।

২২৫ পৃথিবীর যে চতুর্থাংশ আমাদের পরিচিত, তাতে বিষুবরেখা ভূমি ও জলভাগে সীমা নির্দেশ করে না। কারণ, অনেক স্থানে ভূমিভাগ সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিষুবরেখাকে অতিক্রম করে চলে গেছে। যেমন পশ্চিমে সুদানের সমতল ভূমি, যা সমুদ্রের দিকে এত দূর প্রসারিত যে 'চন্দ্রের পর্বতশ্রেণী' পার হয়ে নীলনদের উৎস ছাড়িয়ে এমন সব অঞ্চলের দিকে চলে গেছে যার সঠিক পরিচয়ও আমরা জানি না। ভূমি হিসাবে সুদানের সে অঞ্চল যেমন মরুময় ও দুর্গম, সমুদ্র হিসাবে হাব্‌শী দেশের সুফালার পিছনে যে সমুদ্র আছে সে-ও তেমনি দুরতিক্রম্য; সেদিকে যে জাহাজই গেছে নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য সে আর ফিরে আসেনি। তেমনই, সিন্ধু দেশের উপরে ভারতবর্ষেরও এক বিরাট অংশ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে এবং মনে হয় যেন বিষুবরেখা অতিক্রম করে চলে গেছে। উপরোক্ত এই দুই দেশের (ভারতবর্ষ ও সুদান) মাঝামাঝি আরব ও ইয়ামান অবস্থিত। কিন্তু সে দেশগুলি সমুদ্রের এত ভিতরে প্রবেশ করেনি যাতে বিষুবরেখা অতিক্রম করতে হয়।

ভূমি যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে, সমুদ্রও তেমনই ভূমির নানা অংশে প্রবেশ করে তাকে খণ্ডিত করে জলা ও উপসাগরের সৃষ্টি করেছে। যেমন আরবের পশ্চিম পার্শ্ব ধরে জিহ্বার মত সমুদ্রের একটি অংশ মধ্য সিরিয়া পর্যন্ত চলে গেছে। 'কুলজুমের' কাছে সে অংশটি সবচেয়ে সরু হয়ে গেছে বলে ঐ (কুলজুম) নামেই সে অংশটি পরিচিত। সমুদ্রের আর একটি বৃহৎ বাহু দক্ষিণে আছে, পারস্য সাগর বলে খ্যাত। চীন ও ভারতবর্ষের মাঝেও সমুদ্র উত্তরের দিকে এক বিরাট বাঁকের সৃষ্টি করেছে।

এসব উদাহরণ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে এই দেশগলির সমুদ্রোপকূল বিষুব রেখাকে অনুসরণ করে না, আবার তার থেকে সমান্তরাল দূরেও থাকে না।

(উপরোক্ত) চারটি নগরের আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে। সময়ের যে প্রভেদের উল্লেখ হয়েছে, তা পৃথিবী বর্তুলাকার হওয়ার ফল, আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে থাকার দরুন। সেই প্রসঙ্গে পৃথিবীর অধিবাসীদের উল্লেখ যদি করা হয়ে থাকে—আর নাগরিক ব্যতিরেকে নগর হয় না—তাহলে ভারি বস্তু মাত্রেরই কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের যে স্বাভাবিক নিয়ম আছে তা দিয়েই তার ব্যাখ্যা করা উচিত। বিশ্বের সে কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী।

২২৬ 'বায়ুপুরাণে' যা আছে তা প্রায় এইরূপ: 'অমরাবতীর' মধ্যাহ্ন, 'বৈবস্বতে'র প্রভাত, 'সুখে'র মধ্যরাত্রি—আর 'বিভা'র সূর্যাস্ত।'

মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে যে মেরু পর্বতের পূর্বে আছে 'অমরাবতিপুরি', ইন্দ্ররাজ ও তার স্ত্রীর বাসস্থান; দক্ষিণে আছে 'সঙমনপুর' তাতে সূর্যপুত্র যমের আবাস, যেখানে সে মানবকে শাস্তি ও পুরস্কার দান করে; পশ্চিমে 'সুখপুর', বরুণ, অর্থাৎ সলিলের আবাস; আর মেরুর উত্তরে আছে 'বিভাবন-পুর', চন্দ্রের নিজস্ব আবাস। সূর্য ও চন্দ্র মেরুর চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। 'অমরাবতীপুরে' সূর্য যখন মধ্যগগনে, 'সংগমনপুরে' তখন দিবারম্ভ, 'সুখপুরে' মধ্যরাত্রি, আর 'বিভানপুরে' তখন সায়ংকাল। 'সনগমনপুরে' সূর্য মধ্যদিবসে এলে, সুখপুরে তখন সে উদয় হয়, 'অমরাবতীপুরী'তে তখন সে অস্ত যায় আর, 'বিভাবনপুরে' মধ্যরাত্রিতে তখন সে অস্ত যায়, আর 'বিভাবনপুরে' মধ্যরাত্রিতে অবস্থান করে'।

মৎস্যপুরাণের লেখক মেরুর চতুর্দিকে সূর্যের যে আবর্তনের কথা বলেছেন, তা মেরুর অধিবাসীদের চতুর্দিকে চক্রবৎ আবর্তন, যার দরুন মেরু-বাসীদের পূর্ব বা পশ্চিম বলে কিছু নাই; তাদের দৃষ্টিতে সূর্য একই নির্দিষ্ট স্থানে উদয় না হয়ে বিভিন্ন স্থানে উদয় হয়। তবে, গ্রন্থকার একটি বিশেষ নগরের সূবিন্দুকে পূর্ব আর একটি বিশেষ নগরের সূবিন্দুকে পশ্চিম নাম দিয়েছেন। জ্যোতিষীরা যে চারিটি নগরের কথা বলেছে, উপরোক্ত নগর-গুলি সম্ভবতঃ তারই অন্য নাম। কিন্তু মেরু পর্বত থেকে নগরগুলি দূরত্ব কত, মৎস্য পুরাণকার তা বলেননি।

তাছাড়া ভারতীয়দের যেসব ধারণা আমি এখানে লিপিবদ্ধ করেছি তা সবই নির্ভুল ও প্রমাণসিদ্ধ। তবে, ওদের এক অভ্যাস যে মেরুর কথা বলতে গেলেই সেই সঙ্গে মেরু পর্বতেরও উল্লেখ না করে ওরা পারে না।

নিম্নের প্রকৃতি বা পাতাল (سفل) সম্বন্ধে আমাদের যা বিশ্বাস ভারতীয়দের তাই, অর্থাৎ পাতাল জগতের (বা ব্রহ্মাণ্ডের عالم) কেন্দ্র। তবে বিষয়টির
২২৭ ব্যাখ্যা ওরা অতি সংক্ষেপভাবে করে থাকে, আর প্রশ্নটিও এমন জটিল যে বড় বড় পণ্ডিত ছাড়া এতে কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন : 'পণ্ডিতেরা বলেন যে ভূগোলক আকাশের মধ্যস্থলে আছে, তাতে দেবতাদের বাসভূমি মেরুপর্বত আছে এবং দেবতাদের শত্রু দৈত্য ও দানবদের বাসভূমি বাড়বামুখ তার নীচে অবস্থিত'। তাদের এই নীচে শব্দটি কিন্তু তাঁরা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কারণ, আসলে সব দিকেই পৃথিবীর একই বিস্তৃতি (বিস্তার), তার উপরকার সব প্রাণীই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ভারযুক্ত সমস্ত বস্তু তার উপরে এসে পড়ে। কেননা তার স্বভাব

সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ ও ধারণ করা। যেমন জলের স্বভাব প্রবাহিত হওয়া, অগ্নির স্বভাব দহন করা, বাতাসের স্বভাব গতিশীল হওয়া। কোনও বস্তু পৃথিবী ছাড়িয়ে আরও নীচে যেতে পারে না, কারণ পৃথিবীই একমাত্র নিম্নস্থল, বীজকে যে দিকেই নিক্ষেপ কর পৃথিবীতেই ফিরে আসবে এবং তাকে ছাড়িয়ে উপরে কখনই উঠতে পারবে না।

বরাহমিহির বলছেন: 'পর্বত, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ, নগর মানব ও দেবতা, সব কিছুই ভূগোলকের চতুষ্পার্শ্বে আছে, 'যমকোট' আর 'রোম' যদি পরস্পরের সম্মুখে অবস্থিত হয়, তাহলে বলা চলে না যে একটি অন্যটির নীচে আছে। কারণ নীচে বলে কিছুই নাই। যে স্থানে সবদিক দিয়েই অন্য যে কোনও স্থানের সমান, তা'যে নীচেই আছে তা কেমন করে বলা যাবে? কোনও স্থানেরই নীচে পড়ে যাবার ক্ষমতা অন্য স্থানের চেয়ে বেশী নাই, বরং প্রত্যেকটি স্থান নিজের সম্বন্ধে নিজকে বলছে 'আমিই উপরে অন্যরা সব নীচে'। অথচ সবাই চতুর্দিক দিয়ে ভূগোলককে বেষ্টন করে রয়েছে যেমন কদম্ব বৃক্ষের ফুল ফুলগুলি বৃক্ষকে বেষ্টন করে রয়েছে, প্রত্যেকটি ফুলের অবস্থান একই প্রকার, কারুর নীচের দিকে মুখ, কারু উপরের দিকে মুখ, এমন নয়। ধরাপৃষ্ঠে সমস্ত কিছুকেই পৃথিবী আকর্ষণ করে। কারণ সবদিক থেকে পৃথিবীই সর্বনিম্নে এবং আকাশ সবদিক থেকেই উপরে'।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ বিষয়ে হিন্দুদের ধারণাগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে স্মৃতি ও শাস্ত্রকারদিগকে
২২৮ ওরা আবার কিছুটা প্রবঞ্চনাও করে থাকে। যেমন টীকাকার বলভদ্র বলছেন: 'মতামতের বাহুল্য ও প্রভেদ সত্ত্বেও, সবচেয়ে শুদ্ধমত এই যে ভূমন্ডল, মেরু ও রাশিচক্র সবই গোলাকার। আর 'আপ্ত পুরাণকার' অর্থাৎ পুরাণের বিশ্বাসী অনুসারীরা, বলছে: 'ধরিত্রী কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায়, তার নিম্নভাগ গোল নয়'। (বলভদ্র বলছেন) তারা ঠিক-ই বলছেন, কারণ পৃথিবী জলের মধ্যে অবস্থিত আর জলের উপরিভাগে যা দেখা যায় তা কূর্মপৃষ্ঠেরই আকার; এবং পৃথিবীকে যে মহাসমুদ্র বেষ্টন করে রয়েছে তাতে যাতায়াত অসম্ভব। আর গ্রহমন্ডলীর গোলাকৃতি ত' চোখেই দেখা যায়'।

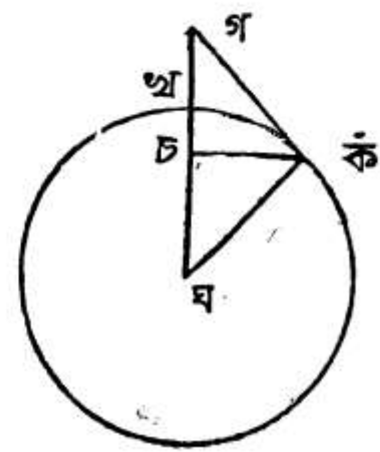
পাঠক আরও লক্ষ্য করবেন, বলভদ্র কেমন করে কূর্মপৃষ্ঠের সঙ্গে পৃথিবীর সাদৃশ্য স্বীকার করে নিয়ে শাস্ত্রকারদের উক্তিকে সমর্থন করলেন অথচ কূর্মের নীচের দিক সমতল বলে পৃথিবীর গোলকাকৃতি সম্বন্ধে তারা যে অজ্ঞতার পরিচয় দিল, সে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে একটি কথাও

তিনি বললেন না, উপরন্তু এমন এক প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন যা এখানে নিতান্তই অবান্তর।

বলভদ্র আবার বলছেন, 'মানব দৃষ্টি পৃথিবী থেকে তার ৫০০০ যোজন-ব্যাপী গোলকের ৯৬তম ভাগ অর্থাৎ ৫২ যোজনের অধিক দূরে যেতে পারে না, সেজন্য মানুষ তার বর্তুলাকৃতি দেখতে পায় না। এ কারণেই এ সম্পর্কে এত মতানৈক্য'।

(উপরোক্ত) পুরাণে বিশ্বাসী লোকেরা পৃথিবীর গোলাকৃতি হওয়া অস্বীকার করে না। বরঞ্চ কূর্মপৃষ্ঠের তুলনা দিয়ে তা সপ্রমাণই করতে চায়। বলভদ্রই কেবল তাদের এ স্বীকৃতি অগ্রাহ্য করতে চান, কেননা, কূর্ম সম্পর্কিত তাদের উক্তির তিনি অর্থ করেছেন 'জল দ্বারা বেষ্টিত থাকা'। আসল জলের উপরে যা দৃশ্যমান হয় তা'ত গোলাকারও হতে পারে; আবার, জলের উপরে উপুড় করা পিপে বা বেলুনাকৃতি (Cylidical) স্তম্ভের অংশ বিশেষের মত সমতলও দেখাতে পারে। তার ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য মানুষ পৃথিবীর বর্তুলাকার দেখতে পারে না, বলভদ্রের এ উক্তিটিও ঠিক নয়। কারণ উচ্চতম পর্বতের শিখরের সমান দীর্ঘ হয়েও মানুষ যদি একই স্থানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করে, এবং বিভিন্ন স্থানে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে একত্র করে বিচার-বিবেচনা না করে, তাহলে তার সে দৈর্ঘ্য কোন কাজেই আসবে না এবং সে পৃথিবীর আকৃতি ও সীমানা কখনই হৃদয়ঙ্গম পারবে না।

কিন্তু পুরাণানুসারী লোকদের বিশ্বাসের সাথে বলভদ্রের মানব দৃষ্টির
২২৯ সীমা সংক্রান্ত এ মন্তব্যের কি সম্বন্ধ আছে ? যদি উপমার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতেন যে, পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে, অর্থাৎ নীচের দিকও উপরের পৃষ্ঠের মত গোল; তারপর পৃথিবীর আকার নির্ণয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের অক্ষমতা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করতেন তাহলেও হোত।



তবে পৃথিবী থেকে কতদূরে মানব চক্ষু দিয়ে দেখা যেতে পারে, বলভদ্র তার যে সীমা নির্দেশ করেছেন; একটি বৃত্ত এঁকে তা পরীক্ষা করা যাক।

ভূমণ্ডলের কেন্দ্রকে ঘ ধরে, তার চতুর্দিকের বৃত্তের অংশ হোক ক খ; খ দর্শকের দাঁড়াবার স্থান, আর তার উচ্চতা খ-গ। গ থেকে রেখা টানতে হবে ঘ তে রেখাটি পৃথিবীর বৃত্তের সাথে ক বিন্দুতে এসে যুক্ত হয়। তাহলে দেখা যাবে যে খ-ক হচ্ছে দৃশ্যমান অংশ (Field of vision); সমগ্র বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করলে খ-ক কে তার ১/৯৬ ভাগ, বা ৩¾ ডিগ্রী মনে করতে হবে। মেরু পর্বতের আয়তন নির্ণয়ে পূর্ব পরিচ্ছেদে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল, সেই পদ্ধতি অনুযায়ী, আমরা চ-ক এর চতুষ্কোণকে চ-ঘ দিয়ে, অর্থাৎ ৫০, ৬২৫ কে৩৪৩১ দিয়ে ভাগ করলে, ভাগ ফল হবে চ-গ=১৪ মিঃ ৪৫″ সেঃ এবং দর্শকের উচ্চতা জ্ঞাপক খ-গ হচ্ছে ৭ মিঃ ৪½″ সেঃ। অবশ্য এ হিসাবের মৌলিক অনুমান হচ্ছে যে ঘ-খ অর্থাৎ সমগ্র (Sine)-এর পরিমাণ ৩৪৩৮ মিঃ, কিন্তু আমাদের উল্লেখিত বৃত্তের আয়তন অনুযায়ী, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ (Radius) হবে, ৭৯৫° : ২৭′ : ১৬″ যোজন। এই অনুপাতে যদি খ-গকে মাপি, তাহলে তার দৈর্ঘ্য হবে ১ যোজন, ৬ ক্রোশ ও ১০০৫ গজ (=৫৭০০৫ গজ)। খ-গকে যদি ৪ গজের সমান মনে করি, তাহলে সাইন (Sine) এর
২৩০ মাপ মতে ক-চ এর সঙ্গে তার যে আনুপাতিক সম্বন্ধ হবে তা ৫৭,০০৫ গজের (উপরে নির্ণিত দর্শকের উচ্চতা) সঙ্গে, সাইনের মাপ মতে চ-কয়ের আনুপাতিক সম্বন্ধের সমান, অর্থাৎ ২২৫। এখন সাইনকে যদি মাপি, তাহলে ০° ০′, ১″, ও ৩‴ পাব; তার ব্যাসার্ধের মাপও তাই হবে। তবে ভূগোলকের প্রত্যেক ডিগ্রি ১৩ যোজন, ৭ ক্রোশ, ৩৩৩⅓ গজের সমান। কাজেই, মানব দৃষ্টিতে ভূগোলকের দৃশ্যমান বৃত্তাংশের আয়তন হবে ২৯১⅔ গজ (!)।

বলভদ্রের যে গণনা রীতি উল্লেখ করা গেল, তার সূত্র 'পৌলিশ সিদ্ধান্তে' আছে। পলিশ বৃত্তের এক চতুর্থাংশের ব্যাসার্ধ (arc) কে ২৪ kardajat-এ ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কেউ এর হেতু জানতে চাইলে তার বোঝা উচিত যে, প্রত্যেকটি Kardajat হচ্ছে সমগ্র বৃত্তের ১/৯৬ ভাগ, অর্থাৎ ২২৫ মিনিট। তার সাইন (جيب) পরিমাপ করলেও আমরা ২২৫ মিনিট পাব। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যেখানে ব্যাসার্ধ (arc) এই Kardajat এর চেয়েও ছোট সেখানে তার sine-গুলি ব্যাসার্ধের সমান। পলিশ ও আর্যভট্টের মতে, সমগ্র সাইন ৩৬০ ডিগ্রির বৃত্তের সঙ্গে তার ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধের সমান, অঙ্কের এই সাদৃশ্য দেখে বলভদ্র ভেবে নিয়েছেন যে ব্যাসার্ধ আসলে লম্বরেখা (perpendicular) এবং এমন কোনও বিস্তার যাতে দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হবার মত কিছু উঁচু হয়ে নাই বলে তার সবটাই দৃশ্যমান হবে।

একথা কিন্তু প্রকাণ্ড ভুল। ব্যাসার্ধ (arc) কখনও লম্বরেখা নয় এবং যত ছোটই হোক না কেন সাইন (sine) কখনও ব্যাসার্ধের সমান হয় না। গণনার সুবিধার জন্য যে সব ডিগ্রি কল্পনা করে নেওয়া হয়, কেবল সেই ক্ষেত্রেই এরূপ হতে পারে, কিন্তু ভূগোলকের ডিগ্রি গণনায় কোনও কালেই এবং চীন
২০১ পর্যন্ত কোন দেশেই, তা সত্য বলে মনে করা হয় না।

পলিশ বলেছেন যে, পৃথিবীকে তার মেরুদণ্ড ধারণ করে রেখেছে। তার অর্থ এ নয় যে, তিনি বলতে চান মেরুদণ্ড না থাকলে পৃথিবী পড়ে যাবে। সে কথা কেমন করেই বা তিনি বলবেন ? তাঁর মতেও পৃথিবীর চারিদিকে চারিটি বসতিপূর্ণ নগর আছে। তাঁর এ উক্তির কারণ, প্রত্যেক ভারযুক্ত বস্তু সব দিক থেকে পৃথিবীতেই এসে পড়ে। পলিশের আসল বক্তব্য হচ্ছে যে, বৃত্তের পরিসীমার (periphery) গতি (motion) তার কেন্দ্রস্থিত অংশের স্থির (নিশ্চল) থাকার কারণে হয় এবং দুইটি মেরু ও তাদের সংযোগকারী রেখা না থাকলে কোনও গোলক চক্রাকারে ঘুরতে পারে না। এই ভাবনা বা তত্ত্বকেই মেরু বা অক্ষদণ্ড মনে করা হয়। পলিশের বলার উদ্দেশ্য যে আকাশের গতিই পৃথিবীকে তার স্বস্থানে এমন স্বাভাবিকভাবে ধরে রেখেছে যেন তার বাইরে পৃথিবীর অবস্থান সম্ভব নয়। এই অবস্থান হচ্ছে আবর্তনের কেন্দ্র। ভূগোলকের অন্য ব্যাসগুলিকেও অক্ষদণ্ড মনে করা সম্ভব, কারণ সেগুলি নিজ ক্ষমতাতেই অক্ষদণ্ড। আর, পৃথিবীর যদি আবর্তনের কেন্দ্র না থাকে, তাহলে সে আবর্তনের অক্ষদণ্ড তার বাইরে থাকতে হবে। সেইজন্য অনুমান করা হয় যে অক্ষদণ্ড পৃথিবীকে ধারণ করে আছে।

পৃথিবীর নিশ্চল থাকার প্রশ্ন পদার্থবিদ্যার এক প্রাথমিক সমস্যা, আর চূড়ান্ত সমাধান একরূপ দুঃসাধ্য। কিন্তু পৃথিবীর নিশ্চলতায় হিন্দুদের বিশ্বাস আছে। 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তে' ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন : 'অনেকের মত যে পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী যে প্রাথমিক গতি (الحركة الاولى) তা মধ্যরেখা (meridian) র গতি নয়—তা আসলে পৃথিবীর গতি। বরাহমিহির তাদের মত খণ্ডন করে বলেছেন, তাই যদি হোত তাহলে পাখী একবার উড়ে পশ্চিমের দিকে গেলে আবার তার বাসায় ফিরে আসতে পারত না।' বাস্তবিক পক্ষে বরাহমিহির যা বলেছেন তা-ই ঠিক।'

এই পুস্তকেরই অন্যত্রে ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন 'আর্যভট্টের অনুগামীরা বলেন যে পৃথিবী গতিশীল, আকাশ নিশ্চল। এ ধারণার জবাবে বলা হয়েছে যে তাহলে, পৃথিবী থেকে প্রস্তর ও বৃক্ষাদি পড়ে যেত।' ব্রহ্মগুপ্ত কিন্তু এই

জবাবের যাথার্থ মানতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, যে পাথর ও গাছপালা যে গতির দরুনে পড়ে যাবেই, এমন নয়। তার একথা বলার যুক্তি যেন এই যে সমস্ত ভারী বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন,
২০২ বরঞ্চ, তাহলে আকাশের মিনিট (মুহূর্ত) গুলি (পৃথিবীর) সময়ের 'প্রাণ'কে সমান তালে চালিয়ে নিয়ে যেত না।'

(ব্রহ্মসিদ্ধান্তের) এই অধ্যায়ে মনে হয় কিছু গণ্ডগোল আছে, অনুবাদকের দোষেই হয়তো বা। কেননা আকাশের মিনিট হচ্ছে ২১,৬০০! এই মিনিটকে 'প্রাণ', অর্থাৎ বিশ্বাস বলা হয়, এইজন্য যে, ওদের বিশ্বাস মতে, মধ্যরেখার (meridian) প্রতি মিনিটের (মুহূর্ত) দৈর্ঘ্য মানুষের এক নিশ্বাসের সমান। তাই যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং আকাশ পশ্চিম থেকে পূর্বের আবর্তন যতগুলি নিশ্বাসে সম্পন্ন করে, ব্রহ্মগুপ্তের মতানুসারে পৃথিবীও যদি ততগুলি নিঃশ্বাসেই তার আবর্তন সম্পূর্ণ করে, তাহলে আকাশের সঙ্গে গতির সমতা রক্ষা করা যেতে পৃথিবীর কি বাধা থাকতে পারে? তা ছাড়া পৃথিবীর আবর্তনের দরুন পদার্থবিদ্যার কিছুমাত্র হানি হয় না, কারণ এ বিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি আবর্তনবাদ দ্বারা যেমন ব্যাখ্যা সম্ভব, তেমনই অন্য সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায়। তবে আরও অন্যান্য দিক আছে যা দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর আবর্তন সম্ভব নয়। সেজন্য, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া খুবই দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীত ও বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক চিন্তা ও আলোচনা করেছেন এবং পৃথিবী আবর্তনের যুক্তিতে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। আমার ধারণা, 'মিফ্তাহ্ 'ইলমুল-হাইয়াৎ' (পদার্থবিদ্যা-কুঞ্জিকা) নামে এই বিষয়ে আমি যে পুস্তক রচনা করেছি তাতে, বাচনভঙ্গিতে না হোক, অন্ততঃ যুক্তি ও সারমর্মে উপরোক্ত পণ্ডিতদিগকে আমি ছাড়িয়ে গেছি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

পুরাণ ও জ্যোতিষীদের মতানুসারে বিশ্বপ্রকৃতির মৌলিক গতিদ্বয়

এ বিষয়ে হিন্দু জ্যোতিষীদের মত প্রায় আমাদের মত। ওদের উক্তি এখন আমি উদ্ধৃত করব, যদিও যা উদ্ধৃত করতে পারব তা অতি সামান্য। পলিশ বলেছেন : "(fixed) স্থির নক্ষত্রমণ্ডলকে বাতাস আবর্তিত করে, আর মেরুদ্বয় তাকে স্বস্থানে ধরে রাখে; মেরু পর্বতের অধিবাসীদের কাছে এ নক্ষত্র-মণ্ডলীর গতি বাম থেকে দক্ষিণের দিকে মনে হয়, এর 'বাড়বামুখের' অধিবাসীরা তাকে দক্ষিণ থেকে বামে যেতে দেখে।" অন্যত্রও তিনি বলেছেন : 'যে সব নক্ষত্রকে আমরা পূর্বে উদয় হয়ে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমের দিকে
২৩৩ সরে যেতে দেখি, তাদের অভিমুখীনতার (direction) কথা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তার জানা উচিত, যে গতিকে আমরা পশ্চিমমুখী দেখি, দর্শকের অবস্থান ভেদে সেই গতিই আবার অন্যমুখী দেখাবে। মেরু পর্বতের অধিবাসীরা যে গতিকে বাম থেকে দক্ষিণের দিকে দেখবে, বাড়বামুখের লোকেরা তাকে বিপরীত মুখে দেখবে এবং বিষুব রেখা থেকে সে গতি কেবলমাত্র পশ্চিমাভিমুখী দেখাবে। আর বিষুব রেখা ও দুই মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলের লোকেরা সে গতিকে দক্ষিণ বা উত্তরে, তার অক্ষরেখার (latitude) অবস্থানুযায়ী, নিম্নমুখী দেখবে। এই সমুদয় গতি বায়ুসৃষ্ট, যা নক্ষত্রকে আবর্তিত করে এবং নক্ষত্রাদিকে আপাতদৃষ্টিতে পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত যেতে বাধ্য করে। আসলে, কিন্তু জ্যোতিমণ্ডলীর গতি পূর্বাভিমুখী, Sharatan (অশ্বিনীদ্বয়)-এর পূর্বদিকে অবস্থিত Butain (ভরনী)-এর দিকে। আর প্রশ্নকারীর যদি চন্দ্রকক্ষাসমূহের (lunar station-চন্দ্রপত্নী) জ্ঞান না থাকে এবং সে তার সাহায্যে এই পূর্বাভিমুখী গতির সম্যক ধারণা না করতে পারে, তাহলে চন্দ্রকেই তার লক্ষ্য করা উচিত, কেমন করে সে সূর্য থেকে বারে বারে সরে যায়, আবার এমনভাবে নিকটবর্তী হয় যে সূর্যের সাথে একেবারে মিলে যায়। এ ব্যাপার থেকে প্রশ্নকর্তা দ্বিতীয় প্রকারের গতি বুঝতে পারবে।'

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন : 'আকাশ মণ্ডল এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে মেরুদ্বয়ের উপরে প্রবলবেগে অবিরত ঘুরছে, আর নক্ষত্র সমূহ এমন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে

যেখানে Batu-i-hut (মীনোদর) ও নাই আর sharatan (অশ্বিনীদ্বয়) নক্ষত্রদ্বয়ও নাই, অর্থাৎ এই নক্ষত্রদ্বয়ের সীমারেখা, যা আসলে মহাবিষুব (vernal equinox)।'

২০৪ টীকাকার বলভদ্র বলেছেন: "সমগ্র পৃথিবী দুই মেরুতে আটকানো এবং চক্রাকারে চলমান। এক 'কল্পে' সে গতির আরম্ভ অন্য কল্পে তা সমাপ্ত। তবে নিরবচ্ছিন্ন গতির জন্য পৃথিবীকে অনাদি অনন্ত বলা উচিত নয়।"

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: "৬০ ঘড়িতে (ঘটিকা) বিভক্ত 'নিরক্ষ'—যে স্থানের অক্ষরেখা নাই—হচ্ছে মেরুবাসীদের দিগন্ত। সেখানকার পূর্বদিক আসলে পশ্চিম; এ স্থানের (নিরক্ষ) পিছনে, দক্ষিণের দিকে 'বাড়বামুখ' ও তার চতুর্পার্শ্বে সমুদ্র। গ্রহনক্ষত্রাদি যখন আবর্তন করতে থাকে, 'মধ্যরেখা' (meridian) তখন উত্তরে অবস্থিতদের ও দক্ষিণে অবস্থিত দৈত্যদের দিগন্ত রূপে উভয়ের চোখে সমানভাবে প্রতিভাত হয়, তবে আবর্তনের অভিমুখ তাদের চোখে বিপরীত হয়ে দেখা দেয়; অর্থাৎ দেবগণ যে গতিকে দক্ষিণমুখী দেখে, দৈত্যরা তাকে বামমুখী দেখে। ঠিক যেমন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বস্তুকে লোকে জলের মধ্যে বাম দিকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে। গতিবেগের এই সমতা, যার কখনও হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, বায়ুর কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু এ বায়ু আমাদের পরিচিত বাতাস নয়, যার বেগ কখনও মন্দ, কখনও তীব্র, নানা প্রকারের হয়, কারণ সে বায়ু কখনই মন্থর হয় না।"

আর এক স্থানে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: "সমগ্র গ্রহনক্ষত্রকে বাতাস পশ্চিমের দিকে একই চক্রাকারে আবর্তিত করতে থাকে; গ্রহগুলি আবার পূর্বদিকে, কুমোরের চাকার ঘূর্ণিবেগে বিপরীত দিকে ধাবিত উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত মন্থর গতিতে চলতে থাকে। এই ধূলিকণার যে গতি পরিলক্ষিত হয় তা আসলে ঘূর্ণমান চাকারই গতি; তার নিজস্ব গতি তেমন ধরা যায় না। এই সিদ্ধান্তের সাথে 'লাট', আর্যভট্ট ও বশিষ্ট একমত। কিন্তু কতক লোক মনে করে যে পৃথিবী সচল, আর আকাশ স্থির হয়ে রয়েছে। মানুষ যাকে পূর্ব-পশ্চিমের গতি মনে করে, ফেরেস্তারা (দেবতা) তাকেই বাম থেকে দক্ষিণের দিকে আর দৈত্যরা দক্ষিণ থেকে বামের দিকে মনে করে।"

ভারতীয়দের গ্রন্থে এ বিষয়ে আমি যা পড়েছি তাই এই। বাতাসকে যে ওরা গতির কারণ বলে ইঙ্গিত করেছে, আমার ধারণায় ব্যাপারটিকে সহজ করে বোঝবার জন্যই তা করেছে। কেননা পক্ষযুক্ত যন্ত্র বা অনুরূপ খেলনা যে বাতাসের বেগে গতিশীল হয় তা ত' চোখেই দেখা যায়। কিন্তু যখনই আদি

চালকের (ঈশ্বর) প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তখনই প্রাকৃতিক বাতাসের দৃষ্টান্ত ওরা ত্যাগ করে, কেননা, কারণভেদে বাতাসের বেগে তারতম্য ঘটে। যদিও
২০৫ বাতাস অন্য বস্তুতে গতি সঞ্চার করে, তবুও গতি তার নিজস্ব গুণ নয়; অন্য বস্তুকে স্পর্শ না করলে তার গতিশক্তি আসে না, কারণ বাতাস নিজেই একটি দেহ, যার উপরে তার বাইরের শক্তি ক্রিয়া করে; এবং এই ক্রিয়ানুযায়ী তার গতিবেগের তারতম্য হয়।

বাতাস কখনও নিশ্চল থাকে না বলে যে ওরা উক্তি করেছে তার উদ্দেশ্য চালনার নিত্যতার দিকে ইঙ্গিত করা, শুধু গতি ও নিশ্চলতা বোঝান নয়, যা জড়দেহে স্বভাবতঃ ঘটে। তেমনই, গতিবেগ মন্থর না হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব রকমের আকস্মিকতা থেকে সে মুক্ত, কেননা গতিমান্দ্য বা গতিক্ষয় বিপরীত গুণসম্পন্ন পদার্থে সৃষ্ট বস্তুতেই হতে পারে।

মেরুদ্বয় স্থির নক্ষত্র-মণ্ডলীকে ধারণ করে আছে, এ কথার দ্বারা শৃঙ্খলা বিন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; তার অর্থ এ নয় যে মেরুদ্বয় না থাকলে নক্ষত্রমণ্ডলী নীচে পড়ে যেত। প্রাচীন উপন্যাসের একটি লোক সম্বন্ধে কথিত আছে যে সে মনে করত, ছায়াপথ কোনও এককালে সূর্যের গতিপথ ছিল, পরে সূর্য সে পথ ত্যাগ করে। এ ব্যাপারের অর্থ এই যে গতিসমূহ স্বাভাবিক নিয়ম থেকে ভ্রষ্ট। মেরুদ্বয় সংক্রান্ত ওদের উক্তিরও কতকটা এই অর্থ হতে পারে, (অর্থাৎ মেরুদ্বয় গতির স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করে)।

গতির সমাপ্তির যে কথা বলভদ্র বলেছেন তার অর্থ এই যে গণনার দ্বারা যা কিছু সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত, দুইটি কারণে তার শেষ হবেই হবে; প্রথম, তার আরম্ভ আছে, যেহেতু সংখ্যা মাত্রই এক ও একের বহুলীকরণেই সংখ্যা গঠিত হয়। অথচ সবার মূলে এক স্বাধীনভাবেই বর্তমান আছে। দ্বিতীয়, তার কিছু অংশ সময়ের বর্তমান মুহূর্তে আছে, কেননা শুধু অস্তিত্বকালের দৈর্ঘ্যের দরুন যদি দিবারাত্রির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহলে সে দিবারাত্রির একটা আরম্ভ থাকতেই হবে। কেউ যদি তর্ক তুলে বলে যে সূর্যমণ্ডলে (sphere) দিবা-রাত্রি নাই, দিবা-রাত্রির অস্তিত্ব আপেক্ষিক, কেবল পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কেই তার অস্তিত্ব থাকে এবং কল্পনায় পৃথিবীকে জগৎ থেকে সরিয়ে নিলে রাত্রি-দিনের অস্তিত্বও থাকবে না এবং দিবস গণনা করে কাল নির্ণয় করার উপায়ও থাকবে না, তা'হলে তার উত্তর দিতে বলভদ্রকে (মৌলিক)
২০৬ প্রথমগতি ছেড়ে দ্বিতীয় (প্রকারের) গতির কারণ দেখাতে হবে। এই দ্বিতীয় গতি হচ্ছে গ্রহের আবর্তন (cycle) যার সম্বন্ধ সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে,

পৃথিবীর সঙ্গে নয়। বলভদ্র এ আবর্তন কালকে 'কল্প' নাম দিয়েছেন। কারণ সবকিছুই সে আবর্তনের অন্তর্গত এবং তার সাথেই সবকিছুর আরম্ভ।

মধ্যরেখা ৬০ ভাগে বিভক্ত বলে ব্রহ্মগুপ্ত যে উক্তি করেছেন তা "মধ্যরেখা ২৪ ভাগে বিভক্ত," আমাদের মধ্যে কেউ এমন উক্তি করারই সমান। কারণ, মধ্যরেখাই সময় নির্ণয়ের গণনার পরিমাপক (کنل) তার পরিক্রমা (revolution) ২৭ ঘন্টা, বা হিন্দুদের রীতি অনুসারে ৬০ ঘড়িতে (ঘটিকা) সম্পূর্ণ হয়। এই কারণেই ওরা রাশিচিহ্নের উদয়কে মধ্যরেখার সময় (৩৬০) ডিগ্রি) দিয়ে হিসাব না করে 'ঘড়ি' (ঘটিকা) দিয়ে পরিমাপ করে।

'বাতাস গ্রহনক্ষত্রকে আবর্তিত করে' একথা বলার পরই ব্রহ্মগুপ্ত কেবলমাত্র গ্রহগুলি সম্বন্ধে বললেন যে তাদের পূর্বাভিমুখী একটি মন্থর গতি আছে। গ্রহগুলিকে এইভাবে বিশেষিত করার অর্থ, তাঁর মতে স্থির নক্ষত্রগুলির এরূপ কোনও গতি নাই। তা নইলে, তিনি নিশ্চই বলতেন যে গ্রহগুলির মত এদেরও এইরূপ গতি আছে, এবং আয়তন ও এই বিপরীতমুখী গতিবেগের প্রভেদ ছাড়া আর কোনও পার্থক্য তাদের মধ্যে নাই। কেউ কেউ বলে থাকে যে পুরাকালে লোকেরা স্থির-নক্ষত্র সমূহের গতি বুঝত না, অনেককাল পরে তারা বুঝতে পেরেছে। ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থে বিভিন্ন আবর্তনের বর্ণনায় স্থির-নক্ষত্রগুলির আবর্তনের অনুল্লেখ থেকে উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়, বিশেষ করে যখন তিনি এই নক্ষত্র সমূহের প্রকাশ-অপ্রকাশকে সূর্যের গতিপথের বিশেষ বিশেষ ডিগ্রির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, যার কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

বিষুবরেখার অধিবাসীদের চোখে প্রথম (মৌলিক) গতি দক্ষিণ-বামের গতি নয়, ব্রহ্মগুপ্তের এ উক্তি বুঝতে হলে পাঠককে মনে রাখতে হবে যে উত্তর দক্ষিণ মেরুর নীচে যে বাস করে, যেদিকেই সে মুখ ফেরাক না কেন, চলমান জ্যোতিষ্ককে সর্বদাই সম্মুখে দেখতে পাবে। যেহেতু তাদের গতি একদিকে, সেহেতু প্রথমে তারা দর্শকের এক হাতের সম্মুখে থাকবে এবং পরে অন্য
২৩৭ হাতের সম্মুখে থাকবে। দুই মেরুবাসীর চোখে এই ব্যাপারটি ঠিক বিপরীত দেখাবে, জল বা দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্তির মত, যা অন্য আর এক ব্যক্তির ন্যায় দর্শকের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখাবে; দর্শকের ডানদিক প্রতিবিম্বের বাম দিকে থাকে আর বাম দিকে তার ডান দিক থাকে। এই রকম, উত্তরের অক্ষাংশে যারা বাস করে তাদের সম্মুখে, ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্কমণ্ডল দক্ষিণের দিকে থাকবে, আর যারা দক্ষিণ অক্ষাংশে থাকে তারা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলকে

তাদের সম্মুখে উত্তরের দিকে দেখবে। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের চোখে জ্যোতিষ্কের আবর্তনগতি যেমন দেখাবে, মেরু ও বাড়বামুখের অধিবাসীরাও সেই রকম দেখবে। কিন্তু বিষুবরেখার অধিবাসীদের প্রায় মাথার উপরে জ্যোতিষ্কমন্ডলী ঘুরবে, সেজন্য কোনও দিক থেকেই জ্যোতিষ্কমন্ডলী তাদের সম্মুখে পড়বে না। তবে, আসলে জ্যোতিষ্কের গতিপথ বিষুবরেখা থেকে কিঞ্চিৎ দূরেই থাকে, সেজন্য সেখানকার অধিবাসীরা এই গতিকে দুই-দিক থেকে তাদের সম্মুখে দেখে; উত্তরের জ্যোতিষ্ককে দক্ষিণ থেকে বামে আর দক্ষিণের জ্যোতিষ্ককে বাম থেকে দক্ষিণে যেতে দেখে। তারা যেন দুই মেরুর অধিবাসীর বৈশিষ্ট্যই নিজেদের মধ্যে একত্রিত দেখতে পায় এবং জ্যোতিষ্কের গতি তারা বাম থেকে দক্ষিণে, না দক্ষিণ থেকে বাম দিকে দেখবে, তা একান্তভাবে তাদের নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

যে নিরক্ষকে ব্রহ্মগুপ্ত ঘটিকায় বিভক্ত বলেছেন, সে হচ্ছে বিষুব রেখায় দন্ডায়মান ব্যক্তির 'খ মধ্য' অথবা সুবিন্দু রেখা।

পুরাণকারদের উক্তি অনুযায়ী, আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর উপরে একটি নিশ্চল গম্বুজ এবং নক্ষত্র সমূহ পৃথক পৃথকভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলমান। দ্বিতীয় প্রকারের গতির খবর ওরা আর কেমন করে পাবে? আর পেলেও জ্যোতিষবিদ্যার বিপক্ষীয়রা একই বস্তুর আলাদাভাবে দুই বিভিন্ন দিকে গতিশীল হওয়া কি করে স্বীকার করে?

এখন এ বিষয়ে পুরাণের উক্তি যা আমি পেয়েছি তা উদ্ধৃত করব, যদিও তাতে কারুর বিশেষ কোন লাভ নাই।

'মৎস্যপুরাণে' বলা হয়েছে "সূর্য ও চন্দ্র দক্ষিণ দিক দিয়ে তীরবেগে মেরুর চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে। সূর্য একটি ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠখন্ডের ন্যায়, যার প্রান্তভাগ ঘূর্ণিবেগে প্রজ্বলিত। প্রকৃতপক্ষে সূর্য কখনই অদৃশ্য হয় না; মেরুর চারি কোণে অবস্থিত নগর চতুষ্টয়ের কেবলমাত্র একটি নগরের অধিবাসীদের দৃষ্টি থেকে সে অদৃশ্য হয়ে থাকে, অন্যগুলি থেকে অদৃশ্য
২৩৮ হয় না। 'লোকালোক' পর্বতের উত্তরদিক থেকে আরম্ভ করে সূর্য মেরুর চতুর্দিকে ঘোরে; 'লোকালোক'কে সে অতিক্রম করে না, আর তার দক্ষিণ পার্শ্বকে সে আলোকিতও করে না। রাত্রে সে অদৃশ্য হয়, কেবল দূরত্বের জন্য। সহস্র যোজন থেকেও মানুষ তাকে দেখতে পায় বটে, কিন্তু চোখের অতি নিকটবর্তী ক্ষুদ্র বস্তুও তাকে আড়াল করে দিতে পারে। সূর্য যখন 'পুষ্কর'

দ্বীপের মধ্যবিন্দুতে থাকে, তখন এক ঘণ্টার ১/২ সময়ের মধ্যে সে পৃথিবীর ১/৩০ ভাগ অতিক্রম করে যায়; অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে সূর্য ২১ লক্ষ ৫০ হাজার যোজন পার হয়ে যায়। তারপরে সূর্য উত্তরদিকে ঘোরে এবং উপরোক্ত দূরত্বের তিন গুণ দূর অতিক্রম করে। তার ফলে দিবাভাগ দীর্ঘ হয়। দক্ষিণাপথের ১ দিবসে সূর্য ৯ কোটি ১০ হাজার ৪৫ যোজন দূরত্ব অতিক্রম করে তারপরে আবার যখন উত্তরে প্রত্যাবর্তন ক'রে, 'ক্ষীর' অর্থাৎ ছায়াপথকে প্রদক্ষিণ করে। তখন সে দৈনিক ৩ কোটি ২১ লক্ষ যোজন পরিক্রমণ করে।"

এখন এই বর্ণনার অসঙ্গতি একবার বিবেচনা করুন। নক্ষত্রের তীরবেগে আবর্তন অবশ্য অতিশয়োক্তি। জনসাধারণকে বোঝানর জন্য করা হয়েছে। কিন্তু এই গতিবেগ যে শুধু দক্ষিণেই হয় উত্তরে হয় না, তা 'ত হতে পারে না। যেহেতু উত্তর ও দক্ষিণ, দুই দিকেই সূর্যের পরিক্রমার সীমা আছে যেখান থেকে সে প্রত্যাবর্তন করে এবং যেহেতু দক্ষিণ সীমা থেকে উত্তর সীমা পর্যন্ত যাওয়া ও আসার একই সময় লাগে, সেহেতু উত্তরাপথেও তার গতি তীরবেগে হ'তে বাধ্য। এখানে কিন্তু উত্তর মেরুর সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, যার মতে উত্তর মেরুর অবস্থান উপরে, আর দক্ষিণ মেরুর নীচে, সেজন্য ঢালু তক্তায় (see saw) ক্রীড়ারত শিশুদের মত নক্ষত্রগুলি দক্ষিণের দিকে গড়িয়ে পড়ে। যদি 'তীরবেগ' শব্দ দ্বিতীয় 'গতি' অর্থে প্রযুক্ত হয়ে
১০১ থাকে—যদিও এটি আসলে 'প্রথম' গতি—তাহলেও বলতে হয় যে দ্বিতীয় গতিতে নক্ষত্রাদি মেরুর চতুর্দিকে পরিক্রমা করে না এবং এই দ্বিতীয় গতির পথ মাত্র ১/২৪ বৃত্তাংশ পরিমাণ মেরু-দিগন্তের দিকে নত হয়ে আছে। প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে সূর্যের গতির উপমা কতদূর কষ্টকল্পিত তা-ও বিবেচনা করুন। আমরা যদি মনে করতাম যে সূর্য একটি সম্পূর্ণ বলয়ের আকারে চলমান, তাহলেও না হয়, সে ধারণাকে দূর করার জন্য কাষ্ঠখণ্ডের উপমা দেওয়ার মানে হত। কিন্তু আমরা ত' তা মনে করি না; বরঞ্চ আমরা সূর্যকে চলমান বস্তুখন্ড হিসাবে দেখি। এ উপমার তাহ'লে কী প্রয়োজন? আর আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে সূর্যের গতি একটি বৃত্ত রচনা করে, তাহলেও প্রজ্বলিত কাষ্ঠ-খণ্ডের দৃষ্টান্ত অর্থহীন। কারণ একটি সুতায় পাথর বেঁধে মাথার উপর ঘোরালেও ঐরূপ বৃত্ত রচিত হবে।

কোনও লোকালয়ে সূর্য উদয় হলে যে অন্য লোকালয়ে তা অদৃশ্য থাকে, এ কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাসের কথা উপরে বলেছি তার প্রভাব এখানেও বিদ্যমান! 'লোকালোক' পর্বতের উল্লেখই তার প্রমাণ, যার সম্বন্ধে

বলা হয়েছে যে তার উত্তর অথবা জনপদের দিক সূর্যালোকিত, আর দক্ষিণদিক অন্ধকার।

আর রাত্রিতে সূর্য অদৃশ্য থাকার হেতু দূরত্ব নয়। তার কারণ, অন্য একটি বস্তু তাকে আড়াল করে রাখে; আমাদের মতে সে বস্তু হচ্ছে পৃথিবী; আর 'মৎস্যপুরাণ'-কারের মতে, মেরু পর্বত। তবে গ্রন্থকারের ধারণা যে, সূর্যের প্রদক্ষিণ পথ মেরুর চতুর্দিকে আর আমরা (মানুষ) মেরুর একপার্শ্বে বাস করি, তার দরুন সূর্যের পথ থেকে আমাদের দূরত্ব অসমান। গ্রন্থকারের আসল ধারণা যে এইরূপ তা তাঁর পরবর্তী মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। রাত্রে সূর্য অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে তার দূরত্বের কোনও সম্পর্ক নাই।

মৎস্য পুরাণে দূরত্বনিরূপক যে সব সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা সবই অশুদ্ধ বলে আমি মনে করি, কারণ সেগুলি গণনাসিদ্ধ নয়। গ্রন্থকার সূর্যের উত্তরাপথকে দক্ষিণাপথের তিন গুণ বলে ধরেছেন, এবং এই ব্যাপারকেই দিবসের দৈর্ঘ্যে তারতম্য হওয়ার কারণ বলে মনে করেছেন অথচ, মোট দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ প্রকৃতপক্ষে সব সময়ে একই থাকে এবং সব সময়েই উত্তরাপথের রাত্রি দক্ষিণাপথের দিবস ও দক্ষিণাপথের রাত্রি উত্তরাপথের দিবসের সমান থাকে। গ্রন্থকারের উক্তি সত্য হতে হলে আমাদিগকে এমন এক অক্ষরেখার (latitude) কথা ভাবতে হবে যেখানে গ্রীষ্মকালে দিবস হবে ৪৫ ঘটিকার আর শীত কালে দিবস হবে মাত্র ১৫ ঘটিকার।

উত্তরাপথে সূর্যের গতি দ্রুততর হয় বলে গ্রন্থকার যে উক্তি করেছেন তাও প্রমাণ সাপেক্ষ। মেরু যত নিকটবর্তী হয় ভূমণ্ডলের উত্তরার্ধের মধ্যরেখাগুলির (meridian) পারস্পরিক দূরত্ব তত কমে আসে এবং দক্ষিণে
২৪০ বিষুবরেখার যত নিকটবর্তী হয় তাদের দূরত্ব তত বাড়ে। সূর্য যদি অল্প দূরত্ব দ্রুতগতিতে পার হয়, তাতে অধিক দূরত্ব পার হতে যে সময় লাগবে, নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম সময় লাগবে, বিশেষ করে অধিক দূরত্ব পার হতে যদি তার গতি মন্থর হতে থকে। ব্যাপারটি কিন্তু আসলে এর ঠিক বিপরীত।

'যখন পুষ্কর দ্বীপের উপরে সূর্য আবর্তন করে'—'মৎস্যপুরাণে'র এই উক্তি দ্বারা মকরক্রান্তি (winter solstice) রেখার ইঙ্গিত করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, সূর্য এই রেখায় এলে, দিবস কর্কট বা অন্য যে কোনও ক্রান্তির দিবসের চেয়ে দীর্ঘতর হবে। এ উক্তির কোন অর্থই বোঝা যায় না।

'বায়ু পুরাণে'ও এই রকম কথা আছে যে দক্ষিণায়নে দিবস ১২ মুহূর্ত দীর্ঘ হয়, উত্তরায়ণে হয় ১৮ মুহূর্ত এবং সূর্যের প্রদক্ষিণ পথ উত্তর ও

দক্ষিণের মধ্যে ১৮০ দিনে ১৭,২২১ যোজন, অর্থাৎ প্রতিদিনে ৯৪ যোজন মত হয়।

এক মুহূর্ত ঘণ্টার ⅘ ভাগ। যে অক্ষরেখায় দিবস ১৪⅖ ঘণ্টা দীর্ঘ, সেখানেই বায়ুপুরাণের এ বর্ণনা প্রযুক্ত হতে পারে। যোজন সংখ্যা যা দেওয়া হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে তা গগনমণ্ডলের (فلكى) দুই পার্শ্বের বিষুবলম্বের (declination) এক অংশমাত্র। তাঁর মতে, বিষুবলম্বের ২৪ ভাগ আছে। অতএব সমস্ত গগনমণ্ডলের যোজন সংখ্যা হয় ১২৯, ১৫৭⅕, এবং দুই পার্শ্বের বিষুব-লম্ব (double inclination) অতিক্রম করতে সূর্যের যত দিন লাগে, তা (ভগ্নাংশ অর্থাৎ ⅘ দিন না ধরলে) সৌরবৎসরের অর্ধেক।

বায়ু পুরাণে আরও বলা হয়েছে যে উত্তরাপথে সূর্যের গতি দিবসে মন্থর, আর রাত্রি ক্ষিপ্র হয়, আর দক্ষিণাপথে ঠিক তার বিপরীত। সেজন্য উত্তরে দিবাভাগ দীর্ঘতর হয়, প্রায় ১৮ মুহূর্তের মত। এসব এমন লোকের কথা সূর্যের পূর্বাভিমুখী গতির জ্ঞান যার মোটেই নাই এবং যে পর্যবেক্ষণ দ্বারা দিবসের চাপ (arc) পরিমাপ করতে জানে না।

'বিষ্ণু ধর্মে' আছে : 'মেরুর নীচে সপ্তর্ষির কক্ষপথ' তার নীচে শনির, তার নীচে বৃহস্পতির, তার নীচে মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্রের কক্ষপথ এবং এরা সব পূর্ব দিকে যাঁতার মত, প্রত্যেকটি গ্রহের নিজস্ব গতিতে
২৪২ অবিরাম ঘুরতে থাকে, কারও গতি ক্ষিপ্র, কারু বা মন্থর। অনন্তকাল ধরে তাদের উপরে জীবন ও মৃত্যুর সহস্রবার পুনরাবর্তন ঘটেছে।"

এই উক্তির বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য যাচাই করতে গেলে দেখা যাবে এতে অসঙ্গতি আছে। মেরুকে উচ্চতম এবং সপ্তর্ষিকে তার নীচে অবস্থিত ধরে নিলেও সপ্তর্ষি মেরুবাসীদের খ বিন্দুর (Zenith) নীচেই থাকবে। গ্রন্থকারের এ উক্তি অবশ্য সত্য, কিন্তু গ্রহ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি সত্য নয়, কারণ তিনি 'নীচে' শব্দ দিয়ে, যা বলতে চেয়েছেন তা আসলে পৃথিবী থেকে নৈকট্য ও দূরত্ব-জ্ঞাপক। সে অর্থে তাঁর উক্তি সত্য নয়, যদি না ধরে নেওয়া হয় যে শনিগ্রহের বিষুবলম্ব (declination) সর্বাপেক্ষা অধিক, তারপরে বৃহস্পতির এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে বাকী গ্রহগুলির, এবং সেই সঙ্গে একথাও ধরে নিতে হয় যে গ্রহগুলির এই বিষুবলম্ব চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়।

'বিষ্ণু ধর্মের' সম্পূর্ণ বক্তব্য বিচার করলে দেখা যাবে যে গ্রহের উপরে স্থির নক্ষত্র সমূহের অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি সত্য, কিন্তু মেরু নক্ষত্রের

উপরে আছে, একথা বলা তাঁর ভুল হয়েছে, কারণ আসলে মেরুর অবস্থান নক্ষত্রের নীচে। তা ছাড়া, গ্রহ সমূহের জাঁতার মতন আবর্তন পশ্চিমাভিমুখী 'প্রথম' গতির বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থকারের উক্ত দ্বিতীয় গতির নয়। তাঁর মতে, গ্রহ-সমূহ হচ্ছে পুণ্যবলে উন্নীত জীবাত্মা, মানব জন্মের শেষে যারা ঊর্ধ্বলোকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সহস্র সংখ্যা ব্যবহার করেছেন, আমার মনে হয় তার কারণ এই হতে পারে যে, গ্রন্থকার তাদের কর্মশক্তিহীন অস্তিত্বের কথা বোঝাতে চেয়েছেন—কিম্বা তাদের কারুর মোক্ষলাভ সম্পূর্ণ হয়েছে, কারুর এখনও হয়নি, সেজন্য তাদের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার সীমা নির্দিষ্ট থাকে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

দশ দিকের সংজ্ঞা

২৪২ শূন্যের মধ্যে প্রত্যেক বস্তু-দেহের তিনদিকে বিস্তার থাকে; প্রথম দৈর্ঘ্য, দ্বিতীয় প্রস্থ ও তৃতীয় গভীরতা, অথবা উচ্চতা। কাল্পনিক না হলে বস্তু মাত্রই এই তিন দিক দ্বারা সীমিত থাকে, কাজেই, তার তিন দিকের এই রেখাগুলির আরম্ভ ও শেষ থাকাতে তাদের ছয়টি কোণ বা প্রান্ত হয়। এই প্রান্তগুলিই দিক। যদি এই রেখাগুলির কেন্দ্রে, অর্থাৎ তাদের সংযোগ বিন্দুগুলির একটির দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান কোন প্রাণী কল্পনা করা হয়, তাহলে তার অবস্থানের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম, উপর ও নীচ এই ছয়টি দিক থাকবে।

এই দিকগুলি পৃথিবী সম্পর্কে প্রযুক্ত হলে তাদের অন্য নাম হয়। যেহেতু দিগন্তে জ্যোতিষ্কের উদয়াস্ত হয় এবং তাদের মৌলিক গতি দিগন্ত থেকেই বোঝা যায়, সেহেতু দিগন্ত দিয়ে দিক্ নির্ণয় করাই সবচেয়ে সহজ। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকগুলি সর্বপরিচিত। কিন্তু প্রত্যেক দুই দিকের মধ্যবর্তী যে আরও চার দিক আছে, সে দিকগুলি তেমন পরিচিত নয়। এই শেষোক্ত চারটি দিক যোগ করলে মোট আটটি দিক হয়; তার সাথে উপর ও নীচ—যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না—যোগ করলে দিকের সংখ্যা হয় দশ।

ইউনানীরা রাশি চিহ্নের আবির্ভাব-তিরোভাব স্থান দিয়ে দিক নির্ণয় করত। তার সঙ্গে বায়ুকে সম্পর্কযুক্ত করে, তাদের দিকের সংখ্যা হত ষোল। আরবরাও বায়ু প্রবাহের পথ দিয়ে দিক নির্ণয় করত; দিগ্‌বিন্দুর (جهات الاربع) মধ্য দিয়ে যে বায়ু প্রবাহিত হত তাকে দিক-নির্বিশেষে ওরা 'নক্‌বা' বল্‌ত; কদাচিৎ তাদের বিশেষ নাম-ও দেওয়া হত।

হিন্দুরা কিন্তু বায়ু প্রবাহ দিয়ে দিকের নামকরণ করেনি। প্রথমে ওরা চারিটি দিকের নামকরণ করেছে, তারপরে মধ্যবর্তী অন চারিটি দিকেরও পৃথক নামকরণ করেছে। তার ফলে আটটি অনুভূমিক (horizontal) দিক
২৪৩ হয়েছে, যেমন নীচে দেখান যাচ্ছে।



দিগন্তের দুই মেরুর আরও দুইটি দিক আছে—ঊর্ধ্ব ও নিম্ন, প্রথমটির নাম 'উপর', আর দ্বিতীয়টির নাম 'অধঃ' এবং 'তল'।

অন্য জাতির মধ্যে প্রচলিত দিকগুলির মত, এদের দিকগুলিও সাধারণ সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত। যেহেতু দিগন্তকে অসংখ্য বৃত্ত দিয়ে ভাগ করা যায়, সেহেতু তার কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত রেখাগুলির দিকও অসংখ্য। যতগুলি বৃত্ত রচনা সম্ভব, তার প্রত্যেকটির ব্যাসের-ই দুই প্রান্তকে 'সম্মুখ' ও 'পশ্চাৎ' কিম্বা 'পশ্চাৎ' ও 'সম্মুখ' মনে করা চলে; কাজেই, অন্য যে ব্যাস এই ব্যাসটিকে সমকোণিকভাবে অতিক্রম বা ভেদ করে তার দুই প্রান্তকে 'দক্ষিণ' ও 'বাম' মনে করা চলবে।

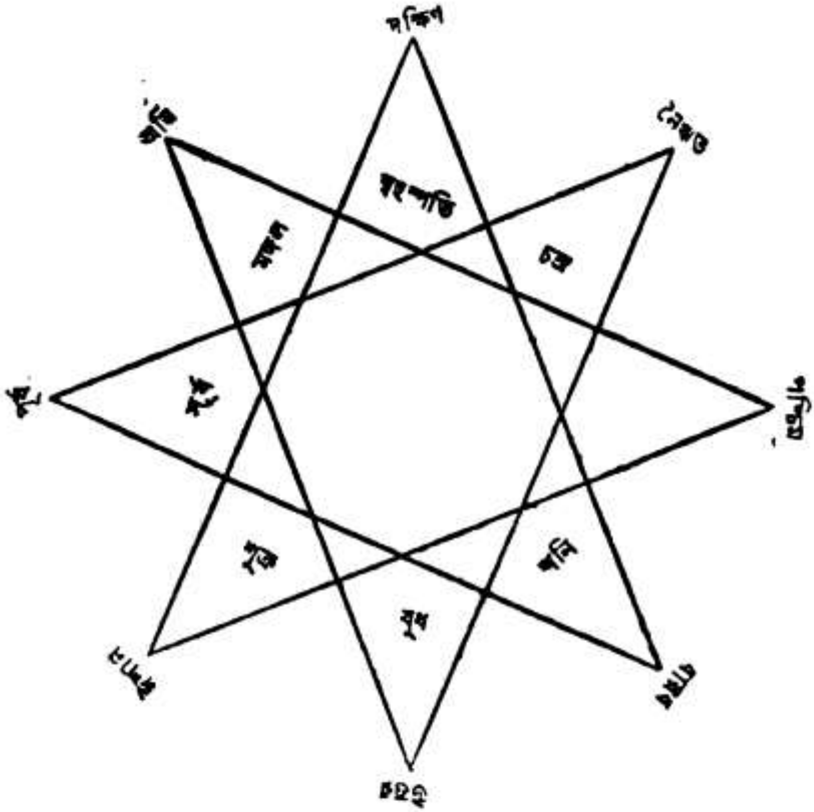
কাল্পনিক বা বুদ্ধিগ্রাহ্য যে কোনও বস্তু বা তথ্য-ই হোক না কেন, আলোচনা কালে হিন্দুরা তাতে ইন্দ্রিয়গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আরোপ না করে পারে না; এবং তৎক্ষণাৎ ওরা তার বিবাহ দিয়ে স্ত্রী সহবাস, স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার ও সন্তান ভূমিষ্ঠ করাবে। দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি কারণ, 'বিষ্ণু ধর্মে' বলা হয়েছে যে সপ্তর্ষির অধিনায়ক তারকা 'অত্রি', 'অষ্ট-দিক'কে বিবাহ করে এবং তার গর্ভে 'চন্দ্রের' জন্ম হয়। আর একজন লেখক বলেছেন: 'দক্ষ' অর্থাৎ 'প্রজাপতি' তাঁর দশ কন্যা অর্থাৎ দশদিককে 'ধর্ম' বা পুণ্যের সাথে বিবাহ দিলেন। তাদের মধ্যে একজন, যার নাম 'বসু', তার থেকে ধার্মের বহু পুত্র লাভ হল। সে পুত্ররা হচ্ছে 'বসুগণ' তাদের-ই একজন 'চন্দ্র'। চন্দ্রের জন্ম বৃত্তান্ত শুনে আমার বন্ধুরা (মুসলমানরা) অবশ্য হাসবে, তাদের হাসির খোরাক কিন্তু আমি আরও দেব। যথা, হিন্দুরা আরও বলে: সূর্য কশ্যপের পুত্র, তার মাতা আদিতি, ষষ্ঠ মন্বন্তরে, 'বিশাখা'

নক্ষত্রে তার জন্ম হয়েছে। চন্দ্র, ধর্মের পুত্র, 'কৃত্তিকা' নক্ষত্রে জন্মেছে। মঙ্গল প্রজাপতির পুত্র পূর্বাষাঢ় নক্ষত্রে তার জন্ম। চন্দ্রের পুত্র বুধ 'ধনিষ্ঠা' নক্ষত্রে জন্মেছে। 'অঙ্গিরা'র পুত্র 'বৃহস্পতি', তার জন্ম পূর্বফাল্গুনীতে। ভৃগুকন্যা শুক্র 'পুষ্যা' নক্ষত্রে এবং সূর্যের পুত্র শনি 'রেবতি'তে জন্মেছে। আর 'যম' অর্থাৎ মৃত্যুর রাজার পুত্র পুচ্ছবান (ذو الذنب = ধূমকেতু) 'আশ্লেষা' নক্ষত্রে জন্মেছে এবং তার মস্তক জন্মেছে 'রেবতিতে।'

ওদের অভ্যাসমত অনুভূমিক (horizontal) আট দিকেরও ওরা আট অধিপতি নিয়োগ করেছে, যা এই চিত্রে দেখান হয়েছে।

দিক	অধিপতি
পূর্ব	ইন্দ্র
পূর্ব দক্ষিণ	অগ্নি
পশ্চিম	যম
দক্ষিণ-পশ্চিম	পৃথু
পশ্চিম	বরুণ
উত্তর-পশ্চিম	বায়ু
উত্তর	কুর্ব (কুরু ?)
উত্তর-পূর্ব	মহাদেব

পাশা খেলার জয় পরাজয়ের লক্ষণ নির্ণয়ে ব্যবহারের জন্য অষ্টদিকের
২৪৫ একটি নকশাও হিন্দুরা তৈরি করেছে—যার নাম রাহুচক্র; (চক্রটি পরপৃষ্ঠায়) চক্র ব্যবহারের নিয়ম এই : প্রথমে তোমাকে সেই দিবাধিপতির নাম জানতে হবে (সোম, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি), এবং এই চক্রের মধ্যে তার স্থান কোথায় দেখে নিতে হবে। তারপর অষ্ট প্রহরের কোন বিশেষ প্রহরে তুমি আছ তা বের করতে হবে। সেই দিবসের অধিপতির নাম থেকে যে রেখা বেরিয়েছে সেই রেখা অনুসরণ ক'রে পূর্ব থেকে দক্ষিণ হয়ে পশ্চিমের দিকে ক্রমাগত যেতে থাকলে অষ্ট প্রহরের সেই বিশেষ প্রহরটি পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক যে তুমি বৃহস্পতিবারের পঞ্চম প্রহরের রাহুর অবস্থান জানতে চাইছ। চক্রে দেখা যাচ্ছে, বৃহস্পতি দক্ষিণে অবস্থিত এবং সে রেখা উত্তর পশ্চিমে (বায়ব) গিয়ে শনিতে শেষ হয়েছে। তাহলে প্রথম প্রহরের দেবতা হবে বৃহস্পতি, দ্বিতীয় প্রহরের শনি। রেখাটি আবার সেখানে থেকে পূর্বদিকে এসে শেষ হয়েছে; কাজেই তৃতীয় প্রহরের দেবতা



হবে সূর্য; রেখাটি আবার দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়ে চন্দ্রে শেষ হয়েছে, তাই চতুর্থ প্রহর হবে চন্দ্রের। এমনই করে পঞ্চম প্রহরের দেবতা হবে উত্তর দিকের বুধ। এইভাবে তুমি পরবর্তী দিবারম্ভ হওয়া পর্যন্ত রাত্রি ও দিনের আটটি
২৪৬ প্রহর গণনা করে যেতে থাক। তোমার বিশেষ প্রহরের যে দিক এইভাবে নির্ণয় করা হল, সেইদিকে তোমার রাহু অবস্থিত থাকে বলে ওরা মনে করে। সেজন্য কোনও খেলার (দাবা, পাশা ইঃ) জন্য বস্‌লে, সেইদিক তোমার পিছনে থাকা উচিত, তাহলেই ওদের বিশ্বাসমতে, তুমি খেলায় জয়ী হবে। এই লক্ষণের উপর ভরসা করে যে খেল্‌তে বসে এক চালে তার সমস্ত সম্পদ বাজী ধরে, তাকে অবজ্ঞা করা তোমার উচিত হবে না, কেননা ভাল খেলার দায়িত্ব একান্তপক্ষে খেলোয়াড়েরই, লক্ষণের নয়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ভারতীয়দের মতে পৃথিবীর জনপদগুলির নাম

'ভুবনকোষ' ঋষির গ্রন্থে লেখা আছে, পৃথিবীর যে মানব অধ্যুষিত ভূভাগ হিমাবন্ত থেকে দক্ষিণের দিকে বিস্তৃত তার নাম ভারতবর্ষ; 'ভরত' নামে একটি লোকের নাম থেকে সে অঞ্চলের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। লোকটি সেখানকার অধিবাসীদের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করত। একমাত্র এই দেশের অধিবাসীদের জন্যই পরজন্মে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে, অন্যদের জন্য নয়। এই জনপদের নয়টি ভাগ আছে, ভাগগুলিকে 'নবখণ্ড—প্রথম' অর্থাৎ প্রাথমিক নয় ভাগ বলা হয়। প্রত্যেক দুই ভাগের খণ্ডের মধ্যে একটি করে সাগর আছে, যা পার হয়ে অন্য খণ্ডে যেতে হয়। এই জনপদের উত্তর-দক্ষিণ বিস্তার সহস্র যোজন।

এখানে যাকে হিমাবন্ত বলা হয়েছে তা উত্তরের পর্বতমালা, শৈত্যের জন্য যেখানে মনুষ্য বসতি নাই। তাই জনপদ তার দক্ষিণেই হতে বাধ্য। সেই দেশের অধিবাসীরাই কেবল শাস্তি ও পুরস্কারের নিয়মাধীন, একথা বললে মানতে হবে যে এমন অধিবাসীও আছে যে সে নিয়মাধীন নয়। তা হতে হ'লে সে অধিবাসীদিগকে হয় মানব থেকে দেবতাদের পর্যায়ে উন্নীত মনে করতে হবে, যারা নির্মল সত্তা ও পবিত্র স্বভাবের দরুন কখনও ভগবানের অবাধ্য হয় না এবং নিরত তাঁর উপাসনা করে, নয়ত বুদ্ধি বিবেচনাহীন মনুষ্যেতর জীব মনে করতে হবে। কাজেই, এই জনপদ (ভারতবর্ষ) ব্যতীত অন্য জনপদ নাই, আর তার বাইরে কোথাও মানুষও নাই।

২৪৭ ভারতবর্ষ, কেবল হিন্দ (বা হিন্দুস্থান) নয়। হিন্দুরা অবশ্য তাই মনে করে। তাদের মতে, তাদের দেশটাই পৃথিবী এবং তারাই একমাত্র মানব জাতি। কারণ তাদের দেশে এমন সমুদ্র নাই যা একখণ্ড থেকে আর খণ্ডে যেতে হলে পার হতে হয়। 'খণ্ড' যে দ্বীপের সমার্থবাচকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাও নয়, কেননা উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে যে, লোকে এই সমুদ্র পারাপার করে। তাছাড়া পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী ও হিন্দুরা কর্মফলের নিয়মাধীন, একথা বলার এই অর্থ দাঁড়ায় যে তারা সবাই একই ধর্মের অনুসারী।

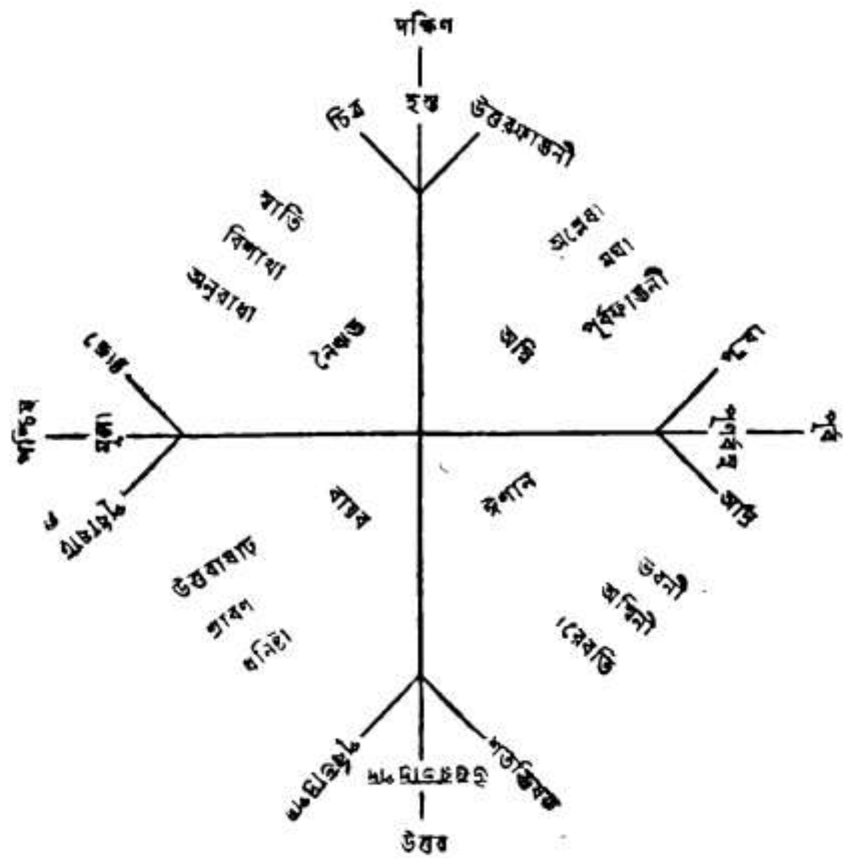
বিভাগগুলিকে 'প্রথম' বলা হয় এই জন্য যে ওরা হিন্দকে-ও নয় খণ্ডে ভাগ করে থাকে। সেজন্য পৃথিবীর লোকবসতির বিভক্তি হচ্ছে প্রাথমিক আর ভারতবর্ষের বিভক্তি হচ্ছে গৌণ। ওদের জ্যোতিষীরা আবার স্থান বিশেষের শুভাশুভ নির্ণয় করার জন্য প্রত্যেক দেশকে নয় ভাগে ভাগ করে থাকে; তার দরুন নয় খণ্ডের আর এক তৃতীয় বিভক্তির উদ্ভব হয়।

আমাদের এই বর্ণনার মত কথা বায়ু পুরাণে আছে। যথা "জম্বুদ্বীপের কেন্দ্র ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষের" অর্থ হচ্ছে যারা ঈশ্বরানুগত ও ধর্মনিষ্ঠ। তাদের চারিটি 'যুগ' আছে; তারা কর্মফলের নিয়মাধীন, 'হিমাবন্ত' তাদের উপরে অবস্থিত। ভারতবর্ষ নয় খণ্ডে বিভক্ত, খণ্ডগুলির মধ্যে দিয়ে নৌ চলাচল উপযোগী নদী প্রবাহিত। ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য ৯০০০ যোজন আর প্রস্থ ১০০০ যোজন। দেশের নামও 'সমনার' (? سمنار) ব'লে, যে রাজা হন, তাকেও সেই নামানুসারে 'সমনার' (?) বলা হয়। এই নয়টি ভাগ এইরূপ :

নাগদ্বীপ		দক্ষিণ গভস্তিমত	তাম্রবর্ণ	
পশ্চিম	সৌম	ইন্দ্রদ্বীপ বা মধ্যদেশ	ক্ষিরোম্য	পূর্ব
গান্ধর্ব		 উত্তর	নাগরসম্বৃত্ত	

২৪৮ তারপরে গ্রন্থকার (বায়ুপুরাণ) পূর্ব পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী খণ্ডের পর্বতমালা ও তার থেকে উৎসারিত নদনদীর বর্ণনা দিয়েছেন; কিন্তু তার বেশী আর তিনি অগ্রসর হননি। তা ক'রে তিনি হয়ত বুঝাতে চেয়েছেন যে মাত্র এই খণ্ডটিই মানব অধ্যুষিত। অন্য আর এক স্থানে কিন্তু তিনি বিপরীত উক্তি করে বলেছেন যে "জম্বুদ্বীপ হচ্ছে নবখণ্ড প্রথমের কেন্দ্রভূমি, অন্য খণ্ডগুলি তার অষ্টকোণে অবস্থিত, সে খণ্ডগুলিতে, দেবতা, মানুষ, পশু ও উদ্ভিদ আছে।" মনে হয়, এখানে তিনি দ্বীপসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পৃথিবীর মানব বাসযোগ্য অঞ্চলের প্রস্থ যদি ১০০০ যোজন হয়, তাহলে তার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ যোজন হবে। অতঃপর 'বায়ুপুরাণ' প্রত্যেক দিকে অবস্থিত নগরাদির উল্লেখ করেছে। নগরের নামগুলি আমি অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে, চিত্রাকারে দেখাব, কারণ এইভাবে বিষয়টি সহজবোধ্য হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে পৃথিবীর যে অংশে মানুষের বাস সেটি দেখতে কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায়, কারণ সে অংশ জলের উপরে জেগে রয়েছে, তার চতুর্দিকে জল বেষ্টিত এবং তার গোলকাকৃতি, উপরিভাগ উত্তল (convex)। তবে ওদের জ্যোতিষীরা দিকসমূহকে চন্দ্রের নক্ষত্র রাশি অনুযায়ী ভাগ করে ব'লে মনে হয় দেশের বিভাগও সম্ভবতঃ ঐ নিয়মেই করা হয়েছে। ভারতবর্ষের এই বিভাগ-গুলির আকৃতি অনেকটা কূর্মের মত। সেজন্য এ বিভক্তির নাম 'কূর্মচক্র'। নিম্নের এই চক্রটি বরাহমিহিরের সংহিতা অনুসরণে আঁকা হয়েছে।



২৪৯ নবখণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে বরাহ-মিহির 'বর্গ' নাম দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: ভারতবর্ষ, অর্থাৎ অর্ধেক পৃথিবী, এই বর্গ দ্বারা নয় খণ্ডে বিভক্ত: কেন্দ্রের বর্গটি তার প্রথম, পূর্বদিকের বর্গ "দ্বিতীয়", এইভাবে দক্ষিণদিক হ'য়ে দিগ্বলয়ের চতুর্দিকে বর্গগুলিকে তিনি সাজিয়েছেন। 'ভারতবর্ষ' বলতে

যে তিনি কেবল হিন্দ বুঝেছেন, তার প্রমাণ তাঁর এই উক্তি যে, প্রত্যেক বর্গে এমন একটি অঞ্চল আছে যার কোনও সংকট উপস্থিত হলে সে অঞ্চলের রাজা নিহত হয়। সে অঞ্চলগুলি এই ঃ—

১ম বর্গের	—	পাঞ্চাল
২য় ,,	—	মগধ
৩য় ,,	—	কলিঙ্গ
৪র্থ ,,	—	অবন্তি (উজ্জয়িনী)
৫ম ,,	—	অনন্ত
৬ষ্ঠ ,,	—	সিন্ধু ও সৌবির
৭ম ,,	—	হরহৌর
৮ম ,,	—	মদ্র
৯ম ,,	—	কুলিন্দ

২৫০ এ দেশগুলি সবই হিন্দের অন্তর্ভুক্ত। তবে দেশগুলির অধিকাংশ নাম-ই এখন আর প্রচলিত নয়। কাশ্মীরের উৎপল, তাঁর 'সংহিতা' নামক পুস্তকে এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "দেশ সমূহের নাম বিশেষ করে যুগে যুগে বদলায়। যেমন মুলতানের নাম প্রথমে ছিল 'কাশ্যপপুর' তারপরে হল 'হংসপুর'। তারপরে 'বকপুর'; তারপরে হল' সম্বপুর' এবং তারপরে হ'ল 'মুলস্থান', অর্থাৎ "আদিস্থান"।

যুগের অর্থ হচ্ছে দীর্ঘকাল। কিন্তু নামের পরিবর্তন আরও শীঘ্র হ'তে পারে বিশেষ করে যখন ভিন্ন ভাষাভাষী বিদেশী এসে কোনও দেশ অধিকার করে নেয়। তাদের জিহ্বা স্থানীয় শব্দকে বিকৃত করে নিজের ভাষার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যেমন ইউনানীরা স্বভাবতই করে থাকে। তারা নামের অর্থ ঠিক রেখে, নিজের ভাষায় সে অর্থকে প্রকাশ করে। যেমন ধর, Shash নগর, যাকে আসল তুর্কী ভাষার নাম 'তাস-কন্দ'—'পাথরের শহর'—অর্থে Geographia গ্রন্থে 'প্রস্তর দুর্গ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। এইভাবে অনুবাদকরূপে-ও নামের পার্থক্য দেখা দেয়। আর এক ভাবেও নাম পরিবর্তিত হতে পারে। আরবদের মত স্থানীয় নামের অক্ষর ও ধ্বনিকে নিজ ভাষায় উচ্চারণ করতে গিয়েও বিদেশীরা নামবিকৃতি ঘটায়। যেমন 'পুসনুগ'কে আরবরা বলে "ফুসঞ্জ" (Fusanj); 'সকিলন্দ' (Sakilkard)-কে তাদের হিসাবের খাতায় লেখে 'ফারফাজ' (Farfaz)। আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে কখনও কখনও একই ভাষাভাষী জাতির মুখেও সে ভাষার উচ্চারণ বদলে যায়;

ফলে শব্দের এমন অদ্ভুত সব রূপ দাঁড়িয়ে যায় যা সাধারণ লোকে কদাচিৎ ধরতে পারে। এবং এরূপ পরিবর্তন কয়েক বছরের মধ্যেই হতে পারে, এবং কোনও বাধ্যতামূলক কারণ ব্যতিরেকেই হয়। অবশ্য, ভারতীয়রা ভাষার অলঙ্কার ও কারুকার্যের জন্য নামের বাহুল্য পছন্দ করে, এবং তার জন্য ওরা গর্ববোধ করে থাকে।

'বায়ু পুরাণে' দেশসমূহের যে নাম দেওয়া হয়েছে তা কেবল চারি দিক অনুযায়ী সাজান হয়েছে, আর 'সংহিতায়' উল্লিখিত দেশের নামগুলি
২৫১ আট দিকে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এ নামগুলি অবশ্য উপরোক্ত প্রকারের ইদানীং অপ্রচলিত নাম। নীচের তালিকায় সেগুলি লেখা হচ্ছে।

বায়ুপুরাণাবায়ী কেন্দ্রীয় অঞ্চলের জনপদ সমূহ :

কুরু, পাঞ্চাল, সল্য, জঙ্গাল, সুরসেন, ভদ্রকাল (ভদ্রকার), সুতা (বোধা), পথেশ্বর, মচ্ছ (বৎস), কুসত (কিশষ্ট), কুল্য, কুন্তল, কাশী, কোশল, অর্থপ্রাশ্ব ([1]), ফুলিঙ্গ (তিলঙ্গ), মশক ও বৃক।

পূর্বদিকের জাতি সকল :

অন্ধ্র, বাকা, মুদারক (? সুজারক), প্রাগ্রগির (? অন্তর্গিরি), বহির্গির, প্রথঙ্গ (প্রবঙ্গ), বঙ্গেয়, মালব, (মালদা ?) মালবার্তিক, প্রাগজ্যোতির্ষ, মুণ্ড, অবিক (? বিদেহ ?), তাম্রলিপ্তিক, মাল, মগধ, গনিন্দ, (? গোবিন্দ)

দক্ষিণের জাতি সকল :

পাণ্ড্য, কেরল, চৌল, কুল্য, সেতুক, মুশিক, রুমণ (? কুমন), বনবাসিক, মহারাষ্ট্র, মাহিষ, কলিঙ্গ, আভীর, ইষিক, অটব্য, সবর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমুলি,
২৫২ বিদর্ভ, দণ্ডক, মুলিক (মৌনিক), অশ্মক, নৈতিক (?), ভোগবর্ধন, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভীর, নলক, অলিক, দাক্ষিণাত্য, বৈদেশ, সুরপরাক (সুরপাকারাঃ) কোলাবণ, দুর্গ, তিল্লিত (?), পুলের, ক্রাল, (সুরালা) রূপক, তামস (তাপস), তুরাপন (তুরাসিত ?)' করস্কর (পারস্করাঃ), নাসিক, উত্তর নর্মদ (অন্তর নর্মদা), ভারকচ্ছ—(ভানুকচ্ছ), মাহি, সারস্বত (? অশ্বাত ?) কচ্ছ, সুরাষ্ট্র, অনর্ত, হুদবুদ (? অর্বুদ ?)।

পশ্চিমের জাতি সকল :

মালদ (মালব), করুষ, মেকল, উৎকল, উত্তমর্ণ, বসার্ন (?দশার্ন), ভোজ, কিষ্কিন্ধা, কোশল, ত্রিপুর, বৈদেশ (বৈদিক) ধর্পুর (? তুমুর), তুম্বুর,

---

[1] সংস্কৃত ''অর্ধ পার্শ্বে তিলঙ্গশ্চ মগধশ্চ বৃকৈঃ সাহা।''

সত্তমান (? যটসুরা), পশা, কর্ণ প্রাবরণ (? কুশপ্রাবরণ) হূণ, দর্ব, হূহক
২৫৩ (? হূদক) ত্রিগর্ত, মালব, ক্রিরাত (কিরাত), তামর।

উত্তরের জাতি সকল :

বাহ্লীড় (বহ্লীক), বাঢ়, বাণ (? ধান ?) আভীর, কালতোয়ক, অবরান্ত, বহুর চর্মখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সোবীর (মুলতান ও যরাওয়ার) মদ্র (ভদ্র), সক্র (শক), দ্রিহাল (?), লিম্ব (? কুলিন্দ), মল্ল কোদর (?) আত্রেয়, ভারদ্ব (ভরদ্বজ), জাঙ্গল, দশেরগ (? কসেরুক), লম্পগ, তালকুন (?) সুলিক (চুলিক) জাগুর (?)।

বরাহমিহির রচিত সংহিতা থেকে উদ্ধৃত কুর্মচক্রের অন্তর্গত দেশাবলীর নাম :

২৫৪ ১। কেন্দ্রের দেশ ও অঞ্চলগুলির নাম :

ভদ্র, অরি, মেদ, মাণ্ডব্য শাল্য, পোজ্জিহান, মরু, বৎস, ঘোষ, যমুনা নদী, সরস্বত, মাৎস্য, মথুরা, কুপ, জ্যোতিষ, ধর্মারণ্য, সুরসেন্য, গৌরগ্রীম, বাজানার নিকটস্থ উদেহক, পান্ডু, কুরু=থানেশ্বর, অশ্বত্থ, পাঞ্চাল, সকেত, গংক, কালকোটি, কুকুর, পরিযাত্র, ঔদম্বর, কাবিস্থল, গজ।

২। পূর্বদিকের দেশসকল :

অঞ্জনা, বৃষবধ্বজ, পদ্মতুল্য; ব্যাঘ্রমুখ, সুহ্ম, কর্বট, চন্দ্রপুর, সুর্পকর্ণ, খাস, মগধ, শিবিরগিরি, মিথিলা, সমতট, ওড্র, অশ্ববদন, দন্তুর (দীর্ঘদন্ত বিশিষ্ট), প্রাগজ্যোতিষ, লোহিত্য, ক্রির-সমুদ্র (ক্ষীর-সমুদ্র), অর্থাৎ দুগ্ধ-সাগর, পুরুষাধ, উদয়গিরি, ভদ্র, কৌরক, পৌন্ড্র, উৎকল, কাশী, মেগল, অম্বষ্ঠ, একপদ, অর্থাৎ এক পা বিশিষ্ট মানুষ, তামলিপ্তিকা, কৌশলকা, বর্ধমান।

৩। অগ্নিকোণের দেশসকল :

২৫৫ কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, জঠর, অঙ্গ, সৌলিক, বিদর্ভ, বৎস, অন্ধ্র, চোলিক, উর্ধকর্ণ, অর্থাৎ যাদের কান উপরের দিকে ঘোরান, বৃষ, নালিখের, চর্মদ্বীপ, বিন্ধ্যপর্বত, ত্রিপুরা, শ্মশ্রুধর, হিমকুট, ব্যালগ্রীব, যেন তাদের বক্ষ-দেশে সর্প আছে (!), মহাগ্রীব, (যাদের বক্ষপট বিস্তৃত), কিষ্কিন্ধা, (বানরদের দেশ), কন্ডকস্থল, নিষাধ, রাষ্ট্র, দশার্ন, পুরিক, নগ্নপর্ণ, সবর, (? সবর)।

৪। দক্ষিণের দেশসকল :

লংকা, যা পৃথিবীর গম্বুজ কালজীন, সৈরঙ্গীর্ণ তালিকোট, গিরনগর, মলয়, দর্দুর, মহেন্দ্র, মালিন্দ্য, ভরুকচ্ছ, কংকট, তঙ্গন, বনবাস (উপকূলে অবস্থিত), শিবিকা, পরগার (? ফনিকার ?), কোংকন (সমুদ্রের সন্নিকট), আভীর, আকর বেন নদী, অবন্তি, (উজ্জয়িনীর নগর) দশপুর, গোনন্দ, কেরলক, কর্ণাট, মহাটবী, চিত্রকুট, নাসিক, কোল্লিগিরি, চোল, ক্রৌঞ্চদ্বীপ,
২৫৬ জটাধর, কাবীর্য (কোবেরী), ঋষ্যমুখ, বৈদূর্য, শংখ, মুক্তা, আদ্র, পার্জ্জর চর্মবত্তান, (?), দ্বীপ, গণরাজ্য, কৃষ্ণ বৈদূর্য শিবিকা, সূর্যাদ্রি, কুসুমনক, তুম্ববর্ণ, কার্মানেয়ক, যাম্যোদধি, তাপসাশ্রম, ঋষিক, কাঞ্চি, মরুচিপত্তন, দিবর্য (?), সিংহল, ঋষভ, বলদেবপত্তন, দণ্ডকবর্ণ, তিঙ্গলাসন (? তিমিঙ্গলাসন ?) ভদ্র, কচ্ছ, কুঞ্জরাদ্র, তাম্রবর্ণ।

৫। নৈঋত কোণের দেশসমূহ :

কাম্বোজ, সিন্ধু, সৌবির, অর্থাৎ মুলতান ও জরাওয়ার, বাড়বামুখ, অর্বাম্বষ্ট, কপিল, পারস অর্থাৎ পারসীকগণ, সূদ্র, বর্বর, কিরাত, খন্দ, ক্রব্য, আভীর, চঞ্চুক, হিমগীরি, সিন্ধু, কালক, রৈবতক, সুরাষ্ট্র, বাদর, দ্রমেড়, মহার্নব, নারীমুখ স্ত্রীলোকের মত মুখ যাদের অর্থাৎ তুরস্ক জাতি, অনন্ত, ফেনগীরি, যবন অর্থাৎ ইউনানীরা, মারগ, কর্ণপ্রাবরণ।

৬। পশ্চিমের দেশ সকল :

মরিমান্ (মনিমান), মেঘবান, বনোঘ, অস্তগীরি, অপরান্তক, শান্তিক, হৈহয়, প্রশতাদ্র (প্রশস্তাদ্রি), পুগান (বোকণ), পঞ্চনদ, মথর, পারত, তারচূত (?), জুঙ্গ, বৈশ্য, কনক, (ব কটক ?) শক, ম্লেচ্ছ অর্থাৎ আরব।

৭। বায়ব কোণের দেশসমূহ :

২৫৭ মাণ্ডব্য, তুখার, তালহল, মদ্র, অশ্মক, কুলুতহর (কুলুতলহাড়), স্ত্রীরাজ্য—অর্থাৎ নারীদের দেশ, যেখানে ছয় মাসের বেশী কোনও পুরুষ থাকে না, নৃসিংহবনা—যাদের মুখ সিংহের মত, কসুত—বৃক্ষ থেকে যাদের জন্ম, নাভী-সংলগ্ন হয়ে বৃক্ষ থেকে ঝোলে, বিমনমত, অর্থাৎ তিরমিজু, ফলগুলু, জহ, মরুকুচ্ছ, চর্মরঙ্গ—রঙ্গীন ত্বকবিশিষ্ট মানুষ, একবিলোচন,—অর্থাৎ একচক্ষু, বিশিষ্ট, সুলিক, দীর্ঘগ্রীব, দীর্ঘমুখ, দীর্ঘকেশ।

৮। উত্তরের দেশ ও জাতিসমূহ :

কৈলাশ, হিমাবন্ত, বসুমন্ত, গিরি, ধনুষম—অর্থাৎ ধনুকধারী মানবজাতি, ক্রৌঞ্চ মেরু, কুরব, উত্তর কুরু, ক্ষুদ্রমিন (?), কেকয়, বসাতি, যামুন—

ইউনানীদের একপ্রকার, ভোগপ্রস্থ, অর্জুনায়ন, অগ্নিত্য, আদর্শ, অন্তরদ্বীপ, ত্রিগর্ত, তুরগানন—তাদের অশ্বের মত মুখ, শ্বামুখ—অর্থাৎ তাদের মুখ কুকুরের মত, কেশধর, চাপিত নাসিক—অর্থাৎ খাঁদা, দশের কবন্ধান, নরধান, তক্ষশীলা—অর্থাৎ মারিকলা, পুস্কলাবতি—অর্থাৎ পুকল, কৈলাবত, কন্ঠধান,

২৫৮ অম্বর, মদ্রক, মালব, পৌরব, কচ্ছার, দন্ড, পিঙ্গলক, মণহল, হূন, দুর্গ, কুহল, শাতক, মান্ডব্য, ভূতপুর, গান্ধার, যশোবতি, হেমতাল, রাজন্য, খজর, যৌধেয়, দাসমেয়, শ্যামক, গ্রীবম্বূর্ত (?)।

৯। ঈশান কোণের দেশ ও জাতিসমূহ :

মেরু, কনষ্ঠরাজ্য, বসুপাল, কীর, কাশ্মীর, আভী, শারদ, তঙ্গন, কুলুত, সৈরন্ধ (সৈরন্ধ্র), রাষ্ট্র, ব্রহ্মপুর, দার্ব, দামর, বনরাজ্য, কিরাত, চীন' কৌনিন্দ, ভল্ল, পলোল, জটাসুর। কুনর্ত, খশ, ঘোক, কুচিক, একচরণ—একপাদ বিশিষ্ট মানুষ, অনুবিশ্ব, সুবর্ণভূমি, অর্বসদহন (?), নন্দাবিষ্ট, পৌরব, জীন নিবাসন, ত্রিনেত্র, পুঞ্জাদ্র, গন্ধর্ব।

২৫৯ ভারতীয় জ্যোতিষীরা লঙ্কা থেকে, পৃথিবীর জনপদ ভাগের দ্রাঘিমা নির্ণয় করে। লঙ্কা এই ভাগের কেন্দ্র, বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত; তার পূর্বদিকে 'যমকোট', পশ্চিমে 'রোমক এবং বিষুব রেখার অপর দিকে সিদ্ধপুর অবস্থিত। উদয় ও অস্ত সম্বন্ধে এই জ্যোতিষীদের উক্তি থেকে মনে হয় যে 'রুম' থেকে 'যমকোটে'র দূরত্ব অর্ধবৃত্ত মাত্র। মনে হয় একই (ভূমধ্য) সাগরের দুইপারে অবস্থিত বলে ওরা পশ্চিম দেশ (بلاد المغرب উত্তর আফ্রিকা)-কেও রুমের অংশ ধরেছে, কেননা রুম সাম্রাজ্য আসলে উত্তরের দিকে অনেকখানি বিস্তৃত এবং দক্ষিণের দিকে তার কোন অংশই বিষুবরেখা পর্যন্ত নয়, যেমন ভারতীয়রা মনে করেছে।

লঙ্কার প্রসংগ আমি এখানেই শেষ করছি। ওরা যাকে 'যমকোট' বলে, ইয়াকুব ও আলফাজারীর মতে, তা হচ্ছে সেই দেশ যেখানে সমুদ্রের মধ্যে 'তার' (تارا) নামক নগর আছে। তবে ভারতীয় গ্রন্থাদিতে এই নামের লেশমাত্র উল্লেখ আমি পাই নাই। 'কোট'-এর অর্থ দুর্গ, আর 'যম'-এর অর্থ মৃত্যুর দেবতা। এই নামটি থেকে যেন Gang-diz শহরের আভাষ পাওয়া যায়, যা ইরানীদের বিশ্বাস অনুযায়ী কায়কাউস কিম্বা জমশিদ পূর্বপ্রাচ্যের শেষ প্রান্তে, সমুদ্রের পশ্চাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং তুর্কী আফ্যাসিয়াবের অনুসন্ধান করতে করতে কায়খুসরু রাজ্য থেকে নির্বাসন ও তপস্যাকালে সমুদ্র পার হয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছেছিলেন। এই অনুমানের হেতু এই যে ফার্সিতে (دز)

দীজ শব্দের অর্থ দুর্গ। বলখের আবু ম'শর (Abu Ma'sher) এই Gangdiz-কে প্রথম মধ্যরেখা ধরে তার পঞ্জিকা (زيج) রচনা করেছেন। সিদ্ধপুর ওরা কোথা থেকে পেয়েছে আমি জানি না, কারণ আমাদের মত ওরাও বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর যে অর্ধবৃত্তে মানুষের বাস, তার পশ্চাতে যা আছে তা দুস্তর সমুদ্র।

ভারতীয়দের অক্ষাংশ (latitude) নির্ণয় পদ্ধতি আমি জানতে পারিনি। পৃথিবীর জনপদ ভাগের দ্রাঘিমা যে অর্ধবৃত্তাকার, এ বিশ্বাস হিন্দু বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে বহুল প্রচলিত, দ্রাঘিমার আরম্ভ কোথা থেকে ধরা হবে, কেবল তা নিয়েই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ওদের মতভেদ আছে। ভারতীয়দের মতামত সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান হয়েছে, তার থেকে মনে হয় ওদের
২৬০ দ্রাঘিমার সূচনা হচ্ছে উজ্জয়িনী, যাকে ওরা পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত মনে করে, আর দ্বিতীয় চতুর্থাংশের সীমা হচ্ছে পশ্চিমে, জনপদ শেষ হওয়ার কিছু দূরে। এই দুই স্থানের দ্রাঘিমার প্রভেদ নির্ণয় প্রসঙ্গে আমি আরও আলোচনা করব।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্য জ্যোতিষীদের মতামত দুই প্রকারের। কেউ অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলকে দ্রাঘিমার সূচনা বলে ধরে এবং সেখান থেকে আরম্ভ করে প্রথম চতুর্থাংশের বিস্তৃতি Balkh-এর সীমানা পর্যন্ত দেখায়। এই ধারণার ফলে কিন্তু পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নাই এমন দুইটি পৃথক স্থানকে একত্রিত করা হয়েছে। সেজন্য (Shaporqan) সপুরকান ও উজ্জয়িনীকে একই মধ্যরেখায় (Meridian) স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু হায়, এ সিদ্ধান্ত বাস্তব সম্মত নয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের মতাবলম্বীরা 'সুখী'-দের দ্বীপ সমূহ (جزائر السعداء)-কে দ্রাঘিমার আরম্ভ বলে ধরে এবং পৃথিবীর সে চতুর্থাংশকে জুর্জান ও নেশাপুরের নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেখায়। দুই প্রকারের সিদ্ধান্তই ভারতীয়দের মত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরবর্তী কোন অধ্যায়ে বিষয়টি আরোও বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে। আল্লাহ আমায় জীবিত রাখলে, নেশাপুরের দ্রাঘিমার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করার ইচ্ছা রাখি।

ত্রিংশ অধ্যায়

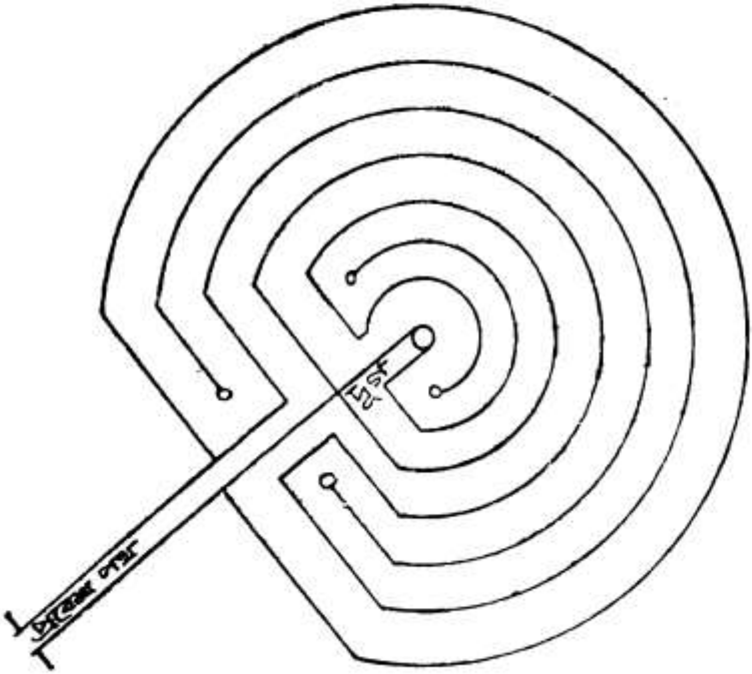
পৃথিবীর যে অংশে মানুষের বাস, বিষুবরেখার উপরের দ্রাঘিমা তাকে পূব-পশ্চিমে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে। জ্যোতিষীরা তাকে পৃথিবীর (قبة الارض) চূড়া আখ্যা দিয়ে থাকে, এবং মেরু ও এই কেন্দ্রকে স্পর্শ করে যে বিরাট বৃত্ত রচিত হয়, তাকে চূড়ার মধ্যরেখা বলা হয়। আমাদের অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত যে পৃথিবীর স্বাভাবিক আকার যেমনই হোক না কেন, তাতে এমন কোনও একটি স্থান থাকতে পারে না অন্য স্থানের তুলনায় যা শৃংগ আখ্যায়িত হবার একমাত্র যোগ্য হয়। এ নামটি শুধু উপমা হিসাবেই ব্যবহার করা হয়, যে স্থান থেকে জনপদ ভাগের পূর্ব-পশ্চিম সীমার দূরত্ব সমান; সেইরূপ কেন্দ্রের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, ঠিক গম্বুজ বা তাম্বুর চূড়ার মত, নীচের দিকে আলম্বিত সমস্ত কিছুই যার থেকে সমান দূরত্বে থাকে।

হিন্দুরা কিন্তু এই কেন্দ্রকে এমন কোনও শব্দে আখ্যায়িত করে না আমাদের ভাষায় যার অর্থ হয় চূড়া। ওরা শুধু বলে যে লংকা জনপদ ভাগের দুই প্রান্তের মধ্যভাগে অবস্থিত, তার কোনও অক্ষাংশ (Latitude) নাই।
২৬১ এই লংকাতেই রাক্ষস রাবণ দশরথপুত্র রামের স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে দুর্গের মধ্যে নিজকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। তার সে গোলকধাঁধার মত আকারে নির্মিত দুর্গের নাম ত্রিকুট পর্বত আমাদের দেশে তাকে বলা হয় 'যবনকোট' (جاونكت)। এই নাম সচরাচর রোমের প্রতি প্রযুক্ত হয়। (সে দুর্গের নকশা পর পাতায় দেখুন)

সিংহলের পূর্বদিকে সেতুবন্ধ নামক পর্বত থেকে শত যোজন ব্যাপী একটি বাঁধ তৈরী করে তার উপর দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে রাম রাবণকে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন—এবং রামের সহোদর রাবণের ভ্রাতাকে বধ করেছিলেন। এসব ঘটনার বিবরণ 'রাম ও রামায়ণের' উপাখ্যানে আছে। তারপর, শরাঘাত করে রাম সে বাঁধের দশটি স্থান ভেঙে দেন।

ভারতীয়দের বিশ্বাস লংকা রাক্ষসদের পুরী, পৃথিবীর সমতল ভাগ থেকে এর উচ্চতা ৩০ যোজন, অর্থাৎ ৮০ ফারসাখ; তার পূর্ব-পশ্চিমের

দৈর্ঘ্য ১০০ যোজন, এবং উত্তর-দক্ষিণের বিস্তৃতি তার উচ্চতার সমান (অর্থাৎ ৩০ যোজন)।



এই লংকা ও 'বাড়বামুখ' দ্বীপের জন্যই হিন্দুরা দক্ষিণ দিককে অশুভ মনে করে। দক্ষিণ মুখ করে ওরা কোনও শুভ কর্ম করে না। এবং দক্ষিণমুখী হয়ে ওরা যাত্রারম্ভও করে না কেবল দুষ্কর্ম প্রসঙ্গেই দক্ষিণ দিকের উল্লেখ দেখা যায়।

লংকা থেকে মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে সরল রেখা দিয়ে জ্যোতিষিক গণনা করা হয় (০° দ্রাঘিমা) সে রেখাতে এইগুলি পড়ে ঃ

(১) মালয়ের অন্তর্গত উজ্জয়িনী।

(২) মুলতানের অন্তর্গত রোহিতক দুর্গ ও তন্নিকটবর্তী স্থান; দুর্গটি বর্তমানে পরিত্যক্ত ও ভগ্ন।

(৩) কুরুক্ষেত্র, ওদের দেশের কেন্দ্রভূমি থানেশ্বরের প্রান্তর।

(৪) যমুনা নদী, যার তীরে মাহুরা (মথুরা) নগর অবস্থিত।—হিমাবন্ত পর্বত, যা চিরকাল তুষারবৃত থাকে এবং নদনদীর চিরন্তন উৎস। তার পশ্চাতে মেরু পর্বত।

উজ্জয়িনী নগর—পথনির্দেশক পুস্তিকাগুলিতে যাকে Uzani বলা হয় ও সমুদ্র তীরবর্তী বলে যাকে নির্দেশ করা হয়—আসলে সমুদ্র থেকে প্রায় ১০০ যোজন দূরে অবস্থিত। আমাদের মধ্যে কোনও জ্যোতিষী সূক্ষ্ম প্রভেদ নিরূপণ করতে পারে না, উজ্জয়িনীকে অল্-জুফ্-আনের বস্তুভুক্ত 'সবুরকানের' (شبورقان) মধ্যরেখায় (meridian) অবস্থিত বলেছে। সেকথাও ঠিক নয়, কারণ 'সবুরকান' অপেক্ষা উজ্জয়িনী বিষুব রেখার অনেক ডিগ্রি পূর্বে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে, জনপদভাগের দ্রাঘিমার পূর্ব ও পশ্চিমের সূচনা সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামতকে যারা গুলিয়ে ফেলে, তাদের মধ্যে উজ্জয়িনীর দ্রামিঘা নিয়ে গণ্ডগোল দেখা যায়।

যেখানে লংকার দুর্গের অবস্থান নির্দেশ করা হয় তার চতুর্দিকস্থ সমুদ্রে বা সেই দিকে ভ্রমণকারী কোনও নাবিক এমন কোনও বিবরণ দেয়নি যা হিন্দুদের লংকার বর্ণনার সঙ্গে মেলে, কিম্বা যার সাথে তার সাদৃশ্য আছে; তাহলেও না হয় শ্রুতির সাক্ষ্যে তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা বাড়ত। 'লংকা' নাম থেকে কিন্তু আমার অন্য একটি কথা মনে আসছে। কথাটি এই যে قرنفل (clove)-কেও 'লবঙ্গ' বলা হয়, কারণ 'লঙ্গ' নামক দেশ থেকে তার আমদানী হয়। সমস্ত নাবিকের বিবরণেই পাওয়া যায় যে, যে সব জাহাজ ঐ দেশে যায়, তার থেকে, পাশ্চাত্যের প্রাচীন স্বর্ণ দীনার, ডোরা কাটা বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য নৌকা করে নামান হয়। সমুদ্র তীরে চামড়া বিছিয়ে, তার প্রত্যেকটি মালিকের নাম তাতে লিখে পণ্যদ্রব্যগুলিকে তার উপর রেখে মালিকরা জাহাজে ফিরে যায়। পরদিন তারা দেখতে পায়, পণ্যের মূল্য হিসাবে চামড়াগুলি অধিবাসীদের সাধ্যানুযায়ী অল্পবিস্তর লবঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। কেউ বলে যাদের সঙ্গে এই বাণিজ্য হয়, তারা প্রেত, আবার কেউ বলে তারা অসভ্য, বন্য মানুষ।

লংকার নিকটে যারা বাস করে তাদের বিশ্বাস যে বসন্ত রোগ হচ্ছে আত্মা হরণ করার জন্য লংকা থেকে জনপদের দিকে প্রবাহিত একরূপ বাতাস। একটি বর্ণনায় প্রকাশ যে এমন কতক লোক আছে যারা এই বাতাস প্রবাহিত হবার পূর্বে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেয় এবং কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে সে বাতাস পৌঁছবে, তা সঠিক বলে দিতে পারে। বসন্ত দেখা দিলে কতকগুলি লক্ষণ দেখে ওরা বুঝতে পারে রোগটি মারাত্মক কি না। মারাত্মক বসন্তের চিকিৎসা ওরা এমনভাবে করে যাতে শুধু একটি অঙ্গের ক্ষতি হয়, কিন্তু প্রাণরক্ষা পায়। ঔষধ হিসাবে ওরা লবঙ্গ ব্যবহার করে; রোগীকে স্বর্ণভস্মের সাথে লবঙ্গ রস পান

করতে দেয়। আর পুরুষ রোগীরা খেজুরের আঁটির মত লবঙ্গ কাঁধে বেঁধে রাখে। তার ফলে দশজনের মধ্যে নয়জন বসন্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

এসব ব্যাপার থেকে আমার মনে হয় যে হিন্দুরা যাকে লংকা বলে তা আসলে এই লবঙ্গের দেশ, যদিও ওদের বর্ণনার সঙ্গে এর তেমন মিল নাই। তবে, এই লবঙ্গ-দেশ বা 'লঙ্গের' সাথে কোনও যোগাযোগ রাখা হয় না। কারণ, লোকে বলে থাকে যে কোনও বণিক যদি ঐ দেশে রয়ে যায়, পরে আর তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। আর একটি ব্যাপারের সাক্ষ্যে আমার এই অনুমান দৃঢ় হয়েছে। 'রাম ও রামায়ণ' গ্রন্থে উক্ত হয়েছে যে পূর্বোক্ত সিন্ধুর অপর পারে এক নরখাদক হাতী আছে। আবার, নাবিকদের মধ্যে একথাও সুবিদিত যে Langabalaus (لنگبالوس) দ্বীপের অধিবাসীদের বর্বরতা ও পশু প্রকৃতির কারণ হচ্ছে ওদের নরমাংস ভক্ষণ।

একত্রিংশ অধ্যায়

'দ্রাঘিমার দূরত্ব' নামক বিভিন্ন স্থানের পারস্পরিক দূরত্ব

বিষয়টিকে যে নিখুঁতভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চায়, তাকে কোনও দুইটি বিশেষ স্থানের মধ্যরেখাবৃত্তদ্বয়ের পারস্পরিক দূরত্ব জানতে হবে। আমাদের জ্যোতিষীরা (معدّل النار) নিরক্ষীয় সময়কে উপরোক্ত মধ্য রেখাদ্বয়ের পারস্পরিক দূরত্বের সমান বলে ধরে ঐ দুইটি স্থানের একটি থেকে গণনা আরম্ভ করে থাকে। এই নিরক্ষীয় সময়ের অথবা মিনিটের সমষ্টিকে দুই দ্রাঘিমার দূরত্ব বলা হয়। যে 'গুরুবৃত্ত' (دائرة العظمى ও Great Circle) বিষুব রেখার মেরুর উপর দিয়ে গিয়েছে আর যাকে মনুষ্য বসতির সীমা বলে ধরা হয়, তার থেকে প্রত্যেক স্থানের মধ্যেরেখার যে দূরত্ব তাকেই সে স্থানের দ্রাঘিমা বলে তারা ধরে। এবং মনষ্য বসতির পশ্চিমতম সীমা থেকে ওরা মধ্যরেখা গণনা করতে আরম্ভ করে। এখন, প্রত্যেক মধ্যরেখার ক্ষেত্রে একভাগ এই নিরক্ষীয় সময়ের সংখ্যা যতই হোক না কেন, তাকে বৃত্তের ৩৬০ ভাগের এক ভাগ, বা দিবসের মিনিট হিসাবে ৬০ ভাগের একভাগ, কিম্বা 'ফারসাখ্ বা যোজন' যে ভাবেই সে সময়কে গণনা করা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না।

এ বিষয়ে হিন্দুরা যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করে তা আমাদের নীতি অনুযায়ী নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং পৃথক হওয়া সত্ত্বেও সে পদ্ধতিগুলি যে সত্যভ্রষ্ট হয়েছে, তা স্পষ্ট। আমরা যেমন প্রত্যেক স্থানের দ্রাঘিমা লক্ষ্য করি, হিন্দুরা তেমন উজ্জয়িনীর মধ্যরেখা থেকে প্রত্যেক স্থানের যোজনিক দূরত্ব নিরূপণ করে। স্থানটি যত পশ্চিমে হয়, তার যোজন সংখ্যা তত বাড়ে, যত পূর্ব দিকে হয় যোজন সংখ্যা তত হ্রস্ব হয়। এই মাপকে ওরা 'দেশান্তর' বলে, অর্থাৎ স্থানের ব্যবধান। এই দেশান্তরকে ওরা সূর্যের আহ্নিক গতির মধ্যক (mean) সংখ্যা দিয়ে গুণ করে এবং গুণ-ফলকে আবার ৪৮০০ দিয়ে ভাগ করে। ভাগফল হবে সূর্যের গতির পরিমাণ, যা প্রয়োজনীয় যোজনের সমান হবে, অর্থাৎ আলোচ্য স্থানের দ্রাঘিমা বের করতে হলে যে ভাগফলকে উজ্জয়িনীর দিবস বা রাত্রির মধ্যরেখার (meridian) সাথে যোগ করতে হবে।

যে সংখ্যাকে ওরা ভাজকরূপে ব্যবহার করে (৪০০০) সে সংখ্যাটি হচ্ছে পৃথিবীর পরিধির যোজন সংখ্যা, কারণ দুইটি স্থানের মধ্যরেখার পারস্পরিক
২৬৬ যে সম্বন্ধ, তা এক স্থান থেকে আর এক স্থান পর্যন্ত সূর্যের গতির সঙ্গে পৃথিবীর চতুর্দিকে তার দৈনিক পরিক্রমার সম্বন্ধের সমান।

পৃথিবীর পরিধি যদি ৪৮০০ যোজন হয়, তার ব্যাস প্রায় ১৫২৭ যোজন হবে; কিন্তু পলিশের মতে ১৬০০ যোজন, আর ব্রহ্মগুপ্তের হিসাবে ১৫৮১ যোজন। প্রত্যেক যোজন আট মাইলের সমান। 'আর্কন্দ' নামক জ্যোতিষ পঞ্জিকাতে এই পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, ১০৫০ যোজন। ইব্নে তারিকের মতে কিন্তু এই শেষোক্ত সংখ্যাটি ব্যাসার্ধের (radius) পরিমাণ, এবং সম্পূর্ণ ব্যাসের পরিমাণ ২১০০ (এখানে প্রত্যেক যোজনকে ৪ মাইলের সমান ধরা হয়েছে) এবং সম্পূর্ণ পরিধি ৬৫৯৬$\frac{9}{25}$ যোজন।

তাঁর 'খণ্ড খাদ্যকে' ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর পরিধি ৪৮০০ যোজন বলেছেন, কিন্তু পরিবর্তিত সংস্করণে, তিনি পলিশের সঙ্গে একমত হয়ে তার পরিবর্তে গণনাসিদ্ধ (مقوم, corrected) পরিধি ব্যবহার করেছেন। তাঁর গণনাশুদ্ধির প্রকরণ এই : পৃথিবীর পরিধির যোজন সংখ্যাকে সেই স্থানের অক্ষাংশের (Latitude) অনুপূরক (Complement) সাইন (Sine) দিয়ে গুণ করে, গুণ ফলকে সাইন সমষ্টি দিয়ে ভাগ করলে, যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, সেই সংখ্যা হবে পৃথিবীর গণনাসিদ্ধ পরিধি, আবার সেই স্থানের মধ্যরেখাবৃত্তেরও যোজন সংখ্যা। এই সংখ্যাকে কখনও কখনও 'মধ্যরেখার গলবন্ধনী'ও বলা হয়। এর দ্বারা অনেক সময়ে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। লোকে মনে করে যে ৪৮০০ যোজন উজ্জয়িনীর গণনাসিদ্ধ পরিধি। ব্রহ্মগুপ্তের এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমরা দেখব যে উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ ১৬$\frac{1}{4}$ ডিগ্রি। আসলে কিন্তু উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ ২৪ ডিগ্রি।

'করণতিলক' নামক গ্রন্থকর্তা এই গণনা অন্য একভাবে করেছেন। পৃথিবীর পরিধিকে তিনি ১২ দিয়ে গুণ করে, গুণফলকে সেই স্থানের খ-বিষুব বৃত্তের (ظل الاستوا) ছায়া দিয়ে ভাগ করেছেন। এই ছায়ার সাথে ছায়া বাড়ির কাঁটার যে আনুপাতিক সম্বন্ধ, সেই স্থানের অক্ষাংশের সাইনের সাথে—সম্পূর্ণ সাইনের সাথে নয়—তার মধ্যরেখা বৃত্তের ('গলবন্ধনী') ব্যাসার্ধেরও সেই সম্বন্ধ। দেখা যাচ্ছে, পদ্ধতি রচয়িতা ধরে নিয়েছেন যে হিন্দুরা যাকে 'ব্যস্ত ত্রৈরাশিক' বলে এখানে সেই রকম সমীকরণ রীতির অনুসরণ করতে হবে। 'ব্যস্তত্রৈরাশিকর একটি উদাহরণ এই : ১৫ বছর

২৬৭ বয়স্কা একটি গণিকার মূল্য যদি ১০ দিরহাম হয়, তাহলে ৪০ বছর বয়সে তার মূল্য কত হবে? নিয়ম হচ্ছে যে, প্রথম সংখ্যাকে দ্বিতীয় সংখ্যা দিয়ে গুণ কর এবং গুণফলকে তৃতীয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ দাও (১৫ × ১০ ÷ ৪০ ÷ ৩$\frac{৩}{৪}$)। এই ভাগফল হবে ঐ গণিকার বৃদ্ধ বয়সের মূল্য।

'করণতিলকের' গ্রন্থকারও এই রকম করেছেন। তিনি যখন দেখলেন যে খ-বিষুববর্তের ছায়ার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে অক্ষাংশের সংখ্যা বাড়ে এবং ভূগোলকের ব্যাস সেই সঙ্গে হ্রস্ব হয়, তখন তিনি ভাবলেন যে ঐ হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্বন্ধ আছে। সেজন্য তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে ছায়া যত দীর্ঘ হবে, ভূগোলকের ব্যাস তত হ্রস্ব হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি গণনা সিদ্ধ ব্যাস থেকে পৃথিবীর গণনা-সিদ্ধ পরিধি নির্ধারণ করলেন।

অতঃপর, দুই স্থানের দ্রাঘিমার দূরত্ব এইভাবে নির্ণয় করে তিনি দিবসের মিনিট দিয়ে এই দুই স্থানের চন্দ্রগ্রহণের সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। পলিশ এই মিনিটকে পৃথিবীর পরিধি দিয়ে গুণ করেছেন এবং গুণফলকে ৬০, অর্থাৎ দৈনিক আবর্তনের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেছেন। সুতরাং এই ভাগফল উক্ত স্থানদ্বয়ের দূরত্বের যোজন সংখ্যা। গণনাটি অবশ্য শুদ্ধ, তবে যে 'গুরুবৃত্তের' মধ্যে লংকা অবস্থিত, কেবল মাত্র তার পক্ষেই এটি শুদ্ধ হবে। ব্রহ্মগুপ্তও এইভাবে গণনা করেছেন, তবে তিনি পৃথিবীর পরিধিকে ৪৮০০ যোজন ধরে গুণ করেছেন। একথা অবশ্য উপরে বলা হয়েছে।

তাদের পদ্ধতি ভুল বা শুদ্ধ যাই হোক না কেন, ভারতীয় জ্যোতিষীদের লক্ষ্য কি, এ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। Alfazari তাঁর জ্যোতিষ পঞ্জিকায় অক্ষাংশ দিয়ে দুই স্থানের 'দেশান্তর' নির্ধারণ করার ওদের যে পদ্ধতির বর্ণনা করেছেন তার সম্বন্ধে কিছু এ মন্তব্য করা যায় না।

দুইটি স্থানের অক্ষাংশের সাইনের বর্গফলকে যোগ করে যোগ ফলের বর্গমূল (root) বের কর। এই মূল সংখ্যা হবে ([illegible]) এক ভাগ। তারপরে, এই দুই সাইনের পার্থক্যের বর্গফলের সাথে উক্ত 'ভাগকে' যোগ কর। যোগফলকে ৮ দিয়ে গুণ করে তাকে ৩৭৭ দিয়ে ভাগ দাও। এই ভাগফল হবে স্থান দুইটির মোটামুটি দূরত্ব। আবার দুই অক্ষাংশের পার্থক্যকে পৃথিবীর পরিধির যোজন সংখ্যা দিয়ে গুণ কর এবং গুণফলকে
২৬৮ ৩৬০ দিয়ে ভাগ দাও। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি দুই অক্ষাংশের পার্থক্যকে ডিগ্রি ও মিনিট নাম না দিয়ে যোজন সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা বই আর কিছু নয়। 'এখন এই মোটামুটিভাবে নির্ণীত দূরত্বের বর্গফল (square) থেকে

উপরোক্ত ভাগফলের বর্গফল বিয়োগ কর; যা অবশিষ্ট থাকে তার বর্গমূল (root) সংখ্যা হবে সরল (مُتَقَاوِم) যোজন সংখ্যা।'

পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই শেষোক্ত সংখ্যাটি হচ্ছে অক্ষাংশ বৃত্তের উপরে স্থানদ্বয়ের মধ্যরেখার দূরত্ব জ্ঞাপক এবং মোটামুটি নির্ণীত বলে যে সংখ্যার উল্লেখ করা হল, তা হচ্ছে স্থান দুইটির দ্রাঘিমার দূরত্ব জ্ঞাপক।

হিন্দুদের পঞ্জিকাগুলিতে আল্-ফাযারীর এই বর্ণনা সম্মত পদ্ধতি অনসৃত হয়েছে, দেখা যায়; কেবল একটি বিষয়ে ব্যতিক্রম আছে। তিনি যাকে ভাগ বলেছেন তা আসলে দুই অক্ষাংশের সাইনের বর্গফলদ্বয়ের পার্থক্যের বর্গমূল, বর্গফলদ্বয়ের সমষ্টি নয়।

কিন্তু পদ্ধতি যেমনই হোক না কেন, তার দ্বারা লক্ষ্যসাধন হয়নি। বিশেষ করে এই প্রশ্ন নিয়ে রচিত আমার কয়েকটি রচনাতে আমি দেখিয়েছি যে কেবল অক্ষাংশ থেকে কোনও দুটি স্থানের দূরত্ব বা তাদের দ্রাঘিমার পার্থক্য জানা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই দুইটি তথ্যের একটি জানা গেলে তবেই দুইটি অক্ষাংশের সাহায্যে তৃতীয় তথ্যটি জানতে পারা যাবে।

এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির উদ্ভাবিত এইরূপ আর একটি গণনা প্রক্রিয়া এই: 'দুই স্থানের দূরত্বের যোজন সংখ্যাকে ৯ দিয়ে গুণ কর; এই সংখ্যার বর্গফলের সাথে দুই অক্ষাংশের প্রভেদের বর্গফলে যে পার্থক্য তার বর্গমূল (Squre root) দিয়ে উক্ত গুণ ফলকে ভাগ কর। ভাগফলকে আবার ৬ দিয়ে ভাগ কর। তার ফলে যে সংখ্যা পাবে তা হবে দুই দ্রাঘিমার পার্থক্যের দৈনিক মিনিট'।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে দুই স্থানের দূরত্বকে নিয়ে তাকে বৃত্ত পরিধির মাপে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এই গণনাবিধিটি উল্টে নিয়ে, এই বিধি অনুসারে 'গুরুবৃত্তের' অংশগুলিকে যোজনে পরিণত করি, তাহলে আমরা ৩২০০ পাই; 'আল-মারকন্দ' থেকে যে সংখ্যা আমরা উল্লেখ করেছি তার থেকে এ সংখ্যা ১০০ যোজন কম। তবে এ সংখ্যাকে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬৪০০ করলে ইবনে তারিক্ লিখিত সংখ্যার কাছাকাছি হয়, অর্থাৎ মাত্র ২০০ যোজন কম হয়।

এখন, যে সব স্থানের অক্ষাংশকে আমি শুদ্ধ বলে মনে করি তার উল্লেখ
২৬৯ করব। হিন্দুদের সমস্ত পঞ্জিকাই একমত যে লঙ্কাকে যে রেখা মেরুর সাথে যুক্ত করেছে সে রেখা পৃথিবীর মানব অধ্যুষিত অঞ্চলকে দুই সমান ভাগে ভাগ করেছে। এই রেখা উজ্জয়িনী, রোহিতক দুর্গ, যমুনা নদী, থানেশ্বর

প্রান্তর ও হিমালয়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। এই রেখার দূরত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়। এই ব্যাপারে হিন্দুদের কোন গ্রন্থেই আমি মতভেদ পাইনি, এক কুসুমপুরের আর্যভট্টের এই উক্তি ছাড়া: 'লোকে বলে, মেরু-লংকা রেখার উপর কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বর প্রান্তর অবস্থিত এবং সে রেখা উজ্জয়িনীর উপর দিয়ে গেছে। একথা তারা পলিশের উক্তি অনুযায়ী বলে থাকে। পলিশ এমন বোকা নন যে আসল ব্যাপার তিনি জানতেন না। কারণ, গ্রহণের সময় লক্ষ্য করলেই প্রমাণ হবে যে, লোকের এই উক্তি ভুল। আর 'পৃথুস্বামী' ত বলেন যে উজ্জয়িনী আর কুরুক্ষেত্রের দ্রাঘিমায় ১২০ যোজনের প্রভেদ আছে।' আর্যভট্ট যা বলেছেন তা এই।

ইয়াকুব ইবনে তারিক্, তাঁর 'গ্রহমণ্ডলীর প্রকৃতি' (ترکیب الافلاک) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ ৪$\frac{৩}{৫}$ ডিগ্রি, তার অবস্থান দক্ষিণে কি উত্তরে সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। আবার, আল-আরকন্দ'-এর মতানুসরণ করে তিনি বলেছেন যে উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ ৪$\frac{৩}{৫}$ ডিগ্রি। আমরা কিন্তু ইয়াকুবের গ্রন্থ থেকেই উজ্জয়িনীর একটি সম্পূর্ণ পৃথক অক্ষাংশের সন্ধান পেয়েছি। উজ্জয়িনী থেকে আলমানসুরার—যাকে ইয়াকুব ব্রহ্মনাবাদ, অর্থাৎ বমহনওয়া, বলেছেন:—দূরত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখা যায় যে উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি, ২৯ মিনিট, আর আলমানসুরার অক্ষাংশ ২৪ ডিগ্রি, ১ মিনিট ধরা হয়েছে। ঐ গ্রন্থে আরও লেখা আছে যে 'লোহানিয়া' (لوهانئه) অর্থাৎ লোহারণীতে —ঋজু (মধ্যাহ্ন) ছায়ার দৈর্ঘ্য হয় ৫$\frac{১}{৩}$ অঙ্গুলি।

সমস্ত পঞ্জিকাগুলিই কিন্তু একমত যে উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ (Latitude) ২৪ ডিগ্রি, এবং কর্কট ক্রান্তিতে উজ্জয়িনীর উপরেই সূর্যের মধ্যগমন (سمت, culmination) হয়।

২৭০ টীকাকার বলভদ্র কনৌজের অক্ষাংশ দিয়েছেন ২৬ ডিগ্রি, ৩৫ মিনিট, আর থানেশ্বরের ৩০ ডিগ্রি ১২ মিঃ। খত্লগ্তিগিনের পুত্র পণ্ডিত আবু আহমদ 'করলি' (?) নগরের অক্ষাংশ গণনা করে ২৮ ডিঃ পেয়েছিলেন এবং থানেশ্বরের পেয়েছিলেন ২৭ ডিগ্রি। স্থান দুইটির পারস্পরিক দূরত্ব মাত্র তিন দিনের পথ, অক্ষাংশের এই পার্থক্য কি কারণে হতে পারে, আমি জানি না। 'করণসার' পঞ্জিকার মতে কাশ্মীরের অক্ষাংশ ৩৪ ডিগ্রি ৯ মিঃ এবং সেখানকার মধ্যাহ্ন ছায়ার দৈর্ঘ্য হয় ৪$\frac{৩}{১০}$ অঙ্গুলি। আমি নিজে লোহার দুর্গের অক্ষাংশ পেয়েছি ৩৪ ডিঃ ১০ মিঃ। লোহোর থেকে কাশ্মীর নগরের দূরত্ব ৫৬ মাইল,

তার অর্ধেক পার্বত্য পথ, আর অর্ধেক সমতলভূমি। অন্য যে সব স্থানের অক্ষাংশ আমি নির্ণয় করতে পেরেছি তা এই :

গয্নাহ্ : ৩৩ ডিঃ ৩৫ মিঃ
কাবুল : ৩৩ ডিঃ ৪৭ মিঃ

কান্দি (ভ্রমণকালে আমীরের রাত্রি যাপনের জন্য সংরক্ষিত শিবির)—৩৩ ডিঃ ৫৫ মিঃ

দুনপুর (? دنبور)	: ৩৪ ডিঃ ২০ মিঃ
লমঘান	— ৩৪ ডিঃ ৪৩ মিঃ
পুরশাওয়ার	— ৩৪ ডিঃ ৪৪ মিঃ
ওয়াইহিন্দ	— ৩৪ ডিঃ ৩০ মিঃ
জয়লাম (ঝিলম)	— ৩৩ ডিঃ ২০ মিঃ
নন্দনা দুর্গ	— ৩২ ডিঃ ০ মিঃ

নন্দনা থেকে মুলতানের দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল।

সালকোট (সিয়ালকোট)	— ৩২ ডিঃ ৫৮ মিঃ
মন্দককোর (? مندكلور)	: ৩১ ডিঃ ৫০ মিঃ
মুলতান	— ২৯ ডিঃ ৪০ মিঃ

স্থানগুলির অক্ষাংশ যদি জানা থাকে, আর তাদের পারস্পরিক দূরত্বও পরিমিত হয়ে থাকে, তাহলে যে সব পুস্তকের কথা আমি উপরে বলেছি তাতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করলে স্থানগুলির দ্রাঘিমার পারস্পরিক দূরত্বও বের করা যাবে।

যে স্থানগুলির নাম করা হোল সেগুলি অতিক্রম করে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আমি যাইনি। হিন্দুদের গ্রন্থাদি থেকে অন্য কোনও স্থানের দ্রাঘিমা বা অক্ষাংশও আমি জানতে পারিনি। উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্ই একমাত্র সহায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

সাধারণ সময় ও কাল এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের ধারণা

মুহম্মদ বিন জাকারিয়া আল-রাজীর কথন মতে, প্রাচীন ইউনানীদের বিশ্বাস ছিল যে পাঁচটি বস্তু অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান আছে : স্রষ্টা, সর্বভূত-
২৭১ স্থিত আত্মা (نفس الكلية), অবিমিশ্র মূল পদার্থ (هيولى الازل), এবং
বস্তুনিরপেক্ষ দেশ ও কাল। এই পাঁচটি বস্তুর উপর আল-রাজী তাঁর সিদ্ধান্ত (Theory) প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা তাঁর সমস্ত দর্শনের মূল স্বরূপ। তারপর, সংখ্যার প্রয়োগ ভেঙ্গে তিনি সময় (زمان) ও কালের (مدة) মধ্যে প্রভেদ করেছেন। প্রথমটিতে সংখ্যা আরোপ করা যায়, দ্বিতীয়টিতে যায় না, কারণ সংখ্যা দিয়ে যা নির্ণয় করা যায় তা নির্দিষ্ট। যেমন দার্শনিকেরা সময়কে কালের নির্দিষ্ট অংশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন যার আরম্ভ ও শেষ আছে, আর কাল অনাদি ও অনন্ত। আল-রাজীর মতে, বাস্তব জগতের পক্ষে এই পাঁচটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বতঃস্বীকার্য। এই জগতে ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করা যায় তা অবিমিশ্র মূল পদার্থ, মিশ্রণের ফলে যা রূপ লাভ করে। এই পদার্থ আবার দেশ বা স্থান সাপেক্ষ, সেজন্য স্থানের (مكان) অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। ইন্দ্রিয় জগতে যে পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, তা সময়ের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের দরুন, কেননা কিছু পরিবর্তন পূর্বে আর কিছু পরে হয়ে থাকে। কোন্‌টি পূর্বে, কোন্‌টি পরে সর্বপ্রথমে, সর্বশেষে ও যুগপৎভাবে হয় সময়ের দ্বারাই তা জানা যায়, সেজন্য সময়ের ধারণাও অপরিহার্য। তাছাড়া বাস্তব জগতে প্রাণী আছে। সেজন্য আত্মার অস্তিত্বও মানতে হয়। এই প্রাণীদের মধ্যে আবার ধী-শক্তিসম্পন্ন জীব আছে, যাদের শিল্পকলাকে চরম উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে। কাজেই জ্ঞান ও বুদ্ধি স্বরূপ এক এমন স্রষ্টার অস্তিত্বও অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে, যিনি সবকিছুকে অত্যুৎকৃষ্ট ও সুবিন্যস্ত করেন এবং মুক্তির জন্য বিচারশক্তি দ্বারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন।

দার্শনিকদের মধ্যে আবার এমন লোক আছে যে নিত্যতা ও সময়কে একই মনে করে এবং যে গতির দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা যায়, কেবল সেই গতিকেই তারা সীমিত মনে করে। আবার আর একজন চক্রবৎ আবর্তনকেই

নিত্যতা মনে করে। আবর্তিত সত্তার সাথে এই গতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য সে সত্তাও মহিমময়। এরপর লোকটি আবর্তিত সত্তা থেকে তার চালক এবং চলমান চালক থেকে মূল স্থির চালকের দিকে তার যুক্তি এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এ অতি সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্ন। জটিল না হলে সিদ্ধান্তে এত প্রভেদ হত না যে একদলের মতে সময় বলে কিছুই নাই, আর অন্যদলের মতে সময় হচ্ছে পৃথক স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ একটি সত্তা। Aphrodisias-এর আলেকজান্দার বলেছেন যে Aristotle তাঁর 'প্রাকৃতিক সঙ্গীত' (السماع الطبيعى) নামক গ্রন্থে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে প্রত্যেক গতিশীল বস্তুই চালকের দ্বারা
২৭২ গতিসম্পন্ন হয়। ঐ বিষয়েই Galenus আবার বলেছেন : সময়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করা ত দূরের কথা, সময়ের ধারণা-ই তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে হিন্দুদের সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত দুর্বল ও অপরিণত। 'সংহিতার' সূচনাতে শাশ্বত -এর প্রসঙ্গে বরাহমিহির বলেছেন : 'প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উক্ত হয়েছে যে সবার আগে যে আদিম বস্তু ছিল তা হচ্ছে তমসা (ظلمة)—এ তমসা কিন্তু মসীবর্ণ নয়, অনস্তিত্ব, ঘুমন্ত প্রাণীর অবস্থার মত। তারপরে ঈশ্বর (الله) ব্রহ্মার জন্য 'গম্বুজ' রূপে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন। তাকে দুই অংশে, অর্থাৎ উর্ধ্ব ও অধঃলোকে ভাগ করলেন এবং তাতে চন্দ্র সূর্য স্থাপন করলেন'। কপিল বলেছেন : 'ঈশ্বর অনাদি ও অক্ষয়, সেই সঙ্গে বিবিধ সত্তা ও অবয়ব সহ বিশ্বও চিরন্তন। তবে ঈশ্বরই বিশ্বের কারণ; নিজ সূক্ষ্ম প্রকৃতির গুণে তিনি বিশ্বের স্থূলতার ঊর্ধ্বে উঠেছেন।' কুম্ভক বলেছেন : 'আদি সত্তা হচ্ছে মহাভূত, অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমষ্টি। কেউ সময়কে আদিমতম বস্তু বলে, কেউ প্রকৃতিকে আবার অন্যেরা বলে আসল বিধাতা হচ্ছে কর্ম।'

'বিষ্ণুধর্মে' আছে : বজ্র মার্কণ্ডেয়কে সময়ের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। মার্কণ্ডেয় বলেছেন, কাল (مدة Duration)-ই 'আত্মপুরুষ' অর্থাৎ নিশ্বাস আর পুরুষ হচ্ছে বিশ্বপতি। তারপর মার্কণ্ডেয় সময়ের ভাগসমূহ ও তাদের অধিপতির ব্যাখ্যা করেছেন, যার আমি যথাস্থানে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

হিন্দুরা কাল (مدة) কে দুই ভাগে ভাগ করেছে। একটি গতি, যাকে সময় (زمان) বলে নির্ণয় করা হয়েছে; অন্যটি বিশ্রাম (سكون) যা কাল্পনিকভাবে কেবল উপরোক্ত গতির সাদৃশ্যেই নির্ধারণ করা যায়। স্রষ্টার সৃষ্টির অর্থে এরা মূর্তিকাশিল্প বোঝে, যার মাধ্যমে নানাবিধ সংমিশ্রণ

২৭০ ও আকৃতি গঠন করা যায় এবং মাটির এমন বিন্যাস ও সংস্থাপনা যার দ্বারা তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও লক্ষ্যের দিকে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সেজন্য, ওরা দেবতা ও দানব, এমন কি মানুষের প্রতিও সৃজন ক্ষমতা আরোপ করে থাকে। সে সৃষ্টি, হয় মানবকল্যাণমূলক কোনও কর্তব্য পালনের জন্য, নয়ত হিংসা ও অহমিকা চরিতার্থ করার জন্য হয়ে থাকে। যেমন, ওদের মধ্যে কথিত আছে যে বিশ্বামিত্র মহর্ষি সৃষ্টি করলেন যাতে তার প্রসূতোৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারে। এ যেন Timaeus (طیماوس) গ্রন্থে উল্লেখিত নিত্যতাকে (دهر) থাকে হিন্দুরা নির্ধারণীয় (مقدر) বলে মনে করে, পরিমেয় মনে করে না, কারণ তার সীমা নাই। এখানে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যে বস্তু পরিমেয় নয়, অথচ নির্ধারিত, তা অতি কষ্টকল্পিত। এ বিষয়ে হিন্দুদের মতামত আমি যা জানি পাঠকের প্রয়োজন মত তা এখন উপস্থিত করব।

সৃষ্টি সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা জনসাধারণের ধারণা; কারণ, আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ওরা পদার্থকে চিরন্তন মনে করে। সেজন্য, শূন্য থেকে কিছু গঠন করাকে ওরা সৃষ্টির অর্থে ধরে না। যেমন প্লেটোর উক্তি : 'ত্বই' (طبی) অর্থাৎ দেবতারা তাদের পিতার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে যখন মানুষ সৃষ্টি কার্যে রত হলেন, তখন একটি অমর (غیر مائته) আত্মা নিয়ে তাকে ভিত্তি করলেন এবং তার উপরে কুমোরের রীতিতে একটি 'মর' দেহ গঠন করলেন।

এখানে একটি 'কালের' (مدة) ধারণা পাচ্ছি যাকে মুসলমানরা হিন্দুদিগকে অনুসরণ করে 'জগতের বয়স' বলে অভিহিত করেছে। এদের ধারণা যে, এই কালের দুই প্রান্তে নতুন গঠনের ন্যায় সৃষ্টি ও লয় হতে থাকে। এ ধারণা অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে নাই; তারা মনে করে, এই কাল ব্রহ্মার এক দিবস ও রাত্রি মাত্র, কারণ তিনিই সৃষ্টি কার্যের ভারপ্রাপ্ত দেবতা। যে বস্তু একটি পৃথক বস্তু থেকে উদ্ভূত, তাতে গতিস্পন্দন আসার নামই অস্তিত্ব, আর এই গতি স্পন্দনের সবচেয়ে স্পষ্টতম হেতু হচ্ছে উল্কা অর্থাৎ নক্ষত্রের গতিবেগ। তবে এই বেগ নিম্নের পৃথিবীকে সমানভাবে প্রভাবিত করবে না, যদি না গতির সাথে প্রত্যেক দিকে নক্ষত্রের আকৃতিও পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই, অস্তিত্ব-লাভ ব্রহ্মার দিবসের মধ্যেই হতে পারে, কেননা হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ব্রহ্মার দিবস-কালের মধ্যেই গ্রহনক্ষত্রাদি নিজ নিজ কক্ষসহ নির্দিষ্ট বিন্যাসানুযায়ী আবর্তিত হচ্ছে এবং তার দরুন ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্টিকর্ম অবিরত

চলছে। আর ব্রহ্মার রাত্রিকালে জ্যোতিষ্কপুঞ্জ গতিরহিত হয়ে বিশ্রাম করে, নিজ নিজ অপদুরক (اوج) ও পাত (جوزهر) সহ নক্ষত্রসমূহ এক স্থানে স্থির হয়ে থাকে এবং তার ফলে, পার্থিব সমস্ত ব্যাপারও একই অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। কাজেই সৃষ্টিকর্তার বিশ্রামের দরুন সৃষ্টিও বন্ধ
২৭৪ থাকে। কর্ম ও কৃত হওয়া, উভয় প্রক্রিয়াই তখন স্থগিত থাকে, পঞ্চভূতেরও তখন কোন রূপান্তর ও নতুন সংমিশ্রণ ঘটে না, কারণ তারা তখন 'রাত্রিতে' বিশ্রাম করে এবং পরদিবসে যে নতুন সত্তার উৎপত্তি হবে তার সাথে সংযুক্ত হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। এইভাবে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ব্যাপি সৃষ্টিচক্র ঘুরতে থাকে। বিষয়টির আমি যথাস্থানে আরও বিশদ আলোচনা করব।

দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের এই মতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টি ও প্রলয় কেবল ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাপার। কণামাত্র মৃত্তিকাও অস্তিত্ব লাভ করে না, যদি না পূর্বে তার অস্তিত্ব থেকে থাকে; আর যার অস্তিত্ব আছে, তার কণামাত্রও ধ্বংস হয় না। পদার্থের চিরন্তন অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে, সৃষ্টিতত্ত্বের শুদ্ধ ধারণা ওদের মনে কী করে জন্মাবে ?

ওরা জনসাধারণের কাছে এই দুই প্রকারের কাল (مدة) অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রিকে, ব্রহ্মার জাগরণ ও নিদ্রা বলে বর্ণনা করে। এরূপ নাম দেওয়াতে দোষ নাই, কেননা শব্দ দুটি কালের সূচনা ও অন্ত জ্ঞাপন করে। জগতে গতি ও বিশ্রামের পারম্পর্যের যে সমষ্টি নিয়ে 'ব্রহ্মার সম্পূর্ণ' আয়ুষ্কাল, তা কেবল অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়, অনস্তিত্বের ক্ষেত্রে নয়; কেননা, অনস্তিত্বের কালেও মৃত্তিকা তার আকৃতিসহ বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল আবার তার ঊর্ধ্বতন (পুরুষ) সত্তার একটি দিবস মাত্র। ব্রহ্মার মৃত্যু হলে, তার (পুরুষ) রাত্রিতে সমস্ত মিশ্রিত বস্তু বিযুক্ত হয়ে যায় এবং এ বিযুক্তির ফলে যা ব্রহ্মাকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে ধরে রেখেছিল, তারও সমাপ্তি ঘটে। এই সমাপ্তি হচ্ছে 'পুরুষের' ও তার বাহন সমূহের (অধীনস্থ সবকিছুর) বিশ্রাম।

ওদের জনসাধারণ এই ব্যাপারটির বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মার রাত্রিকে পুরুষের রাত্রির অনুবর্তী বলে ধরে থাকে এবং যেহেতু 'পুরুষ' শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেহেতু ওরা নিদ্রা ও জাগরণ তার প্রতি আরোপ করে এবং তার নাসিকা গর্জনকে প্রলয়ের হেতু বলে মনে করে, যার দরুন সমস্ত যুক্ত বস্তু খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় এবং সমস্ত দণ্ডায়মান বস্তু তার স্বেদজলে ডুবে যায়। এইরূপ

আরও অনেক কিছুই ওরা ধারণা করে বা বুদ্ধি গ্রহণ করতে চায় না এবং কখনও শুনতে অসম্মত হয়।

এইজন্যই শিক্ষিত হিন্দুরা জনসাধারণের এই বিশ্বাস সমর্থন করে না, কারণ নিদ্রার প্রকৃতি তারা জানে। তারা জানে, পরস্পরবিরোধী রসের (خلط, humour) সমষ্টি হওয়াতে জীব দেহের বিশ্রামের জন্য নিদ্রার আবশ্যক হয়। যাতে শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি ক্ষয় হবার পরে প্রয়োজন মত আবার পূরণ হয়। যেমন, অবিরাম ক্ষয় হওয়ার দরুণ খাদ্যের প্রয়োজন যার দ্বারা
২৭৫ ক্ষয়িত শক্তি পুনর্গঠিত হয়। তেমনই দেহ দ্বারা প্রজাতি রক্ষার জন্য মিথুনের প্রয়োজন। নইলে দেহ লোপ পাবে। তাছাড়া দেহ আরও অনেক মন্দ বস্তুরও আবশ্যকতা বোধ করে। সে সব থেকে কেবল নির্মল সত্তারাই মুক্ত থাকে এবং তাদের উপরের তিনিও সে সব থেকে মুক্ত, যাঁর তুলনা নাই।

হিন্দুরা মনে করে, যে দ্বাদশ সূর্য এখন প্রতি মাসে পর পর উদয় হচ্ছে তাদের সংযোগের ফলে জগতে লয় পাবে। দ্বাদশ সূর্য তখন ধরণীকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে এবং সমস্ত আর্দ্র বস্তুকে নীরস ও শুষ্ক করে ফেলবে। তাছাড়া, বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে এখন যে চারি প্রকারের বৃষ্টি পৃথকভাবে নামে তা একত্রিত হয়ে পৃথিবী নাশ করবে। তাতে পৃথিবী ভস্ম, শোষিতও দ্রবীভূত হবে; অবশেষে সমস্ত আলোক বিলুপ্ত হবে, অন্ধকার ও অনস্তিত্বে বিশ্বজগৎ ছেয়ে যাবে এবং রেণু রেণু হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

মৎস্য পুরাণে আছে: 'যে অগ্নি বিশ্বকে ধ্বংস করবে, তা সলিল থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রলয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত 'কুশ' দ্বীপের 'মহেশ' পর্বতে অবস্থান করবে'। এই পর্বতের নামেই অগ্নি অভিহিত হয়।

'বিষ্ণু পুরাণে' উক্ত হয়েছে: 'মহর্লোক' মেরুর ঊর্ধ্বে অবস্থিত; সেখানে অবস্থান কাল হচ্ছে এক'কল্প'। ত্রিলোক যখন পুড়তে থাকে, তখন মহর্লোকবাসীরা উত্তাপে ও ধূমে ক্লিষ্ট হয়। তারা তখন বাস উঠিয়ে 'জনলোকে' চলে যায়। 'জনলোক' ব্রহ্মার পুত্র (কুমার)গণের বাসস্থান, যারা সৃষ্টির আদিকল্পে জন্মেছিলেন। তাদের নাম সনক, সনন্দ, 'সনন্দানাদ' (সনাতন), অসুর, কপিল, বোঢ়ু (বঢ়ু?) ও পঞ্চশিখ।'

বাক্যপ্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে এই ধ্বংস এক কল্পান্তে হয়ে থাকে। আবু মা'শর্-এর সিদ্ধান্ত, যে নক্ষত্রাদির, সংযোগে মহাপ্লাবন হয়, ভারতীয়দের উপরোক্ত মতবাদ থেকেই উদ্ভূত মনে হয়, কেননা চতুর্যুগের শেষে এবং প্রত্যেক কলিযুগের প্রারম্ভেই গ্রহ নক্ষত্রাদির এরূপ সংযোগ হয়ে থাকে। স্পষ্টতঃ

সংযোগ যদি সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে প্লাবনে সর্বনাশা শক্তিও চরমে ওঠে না। বিষয়টির আলোচনায় আমরা যত অগ্রসর হব তত্ত্বগুলি ততই স্পষ্টতর হবে এবং এইসব শব্দ ও আখ্যাগুলি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হবে।

সামানি (বৌদ্ধ) দের বিশ্বাস সম্বন্ধে ইরানশাহ্‌রীও এই রকম আর একটি উদ্ভট কাহিনী বলেছেন। 'মেরুর চতুষ্পার্শ্বে চারিটি পৃথিবী আছে; সেইগুলি পর্যায়ক্রমে বাসযোগ্য ও জনশূন্য। তার কারণ এই যে সপ্তসূর্যের প্রত্যেকটি সূর্য পর পর উদয় হওয়ার ফলে পৃথিবীর সমস্ত জলধারা শুকিয়ে যায় এবং অগ্নির উত্তাপ তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে দগ্ধ করে দেয়। আর অগ্নি সে পৃথিবী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে সেই পৃথিবী আবার জনবহুল হয়। অগ্নি সরে গেলে, প্রবল বাতাস বয়ে, মেঘ উড়িয়ে নিয়ে আসে এবং বারি বর্ষণ করায়। পৃথিবী তখন সমুদ্রে পরিণত হয়। সমুদ্র ফেনা থেকে শক্তির জন্ম হয়। যার সাথে আত্মা যুক্ত হয়। তার থেকে, জল অপসৃত হলে মানুষের উদ্ভব হয়'। সামানিদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা মনে করে যে মানুষ আকস্মিকভাবে সেই জগৎ থেকে এসে পড়েছিল এবং নিজ একাকিত্বে ভীত হলে, তার কল্পনা থেকে স্ত্রীর উদ্ভব হোল। তার থেকেই মানব বংশ আরম্ভ হয়েছে।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

অহোরাত্রের প্রকারভেদ এবং সাধারণ রাত্রি ও দিবস

আমাদের, হিন্দু ও অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বৃহত্তর বৃত্তের অর্ধভাগ থেকে আরম্ভ করে একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করে বৃত্তের সেই অর্ধভাগে সূর্যের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানকে অহোরাত্র (يوم) বলা হয়। বাহ্যতঃ অহোরাত্র দুই ভাগে বিভক্ত; দিবা, অর্থাৎ পৃথিবীর কোনও একটি স্থান থেকে সূর্য যতক্ষণ দৃশ্যমান থাকে, এবং রাত্রি, সেই স্থান থেকে সূর্য অদৃশ্য থাকার কাল। সূর্যের দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হওয়া অবশ্য আপেক্ষিক ব্যাপার, কেননা তা আসলে দিগন্ত রেখার প্রভেদের উপর নির্ভর করে। সবাই জানে যে হিন্দুরা যাকে নিরক্ষ-দেশ বলে থাকে, সেই বিষুব বৃত্তের দিগন্ত মধ্যরেখার সমান্তরালবর্তী বৃত্তসমূহকে দুইভাগে ভাগ করে; সেজন্য সেখানে দিবস ও রাত্রি সমান হয়। কিন্তু যে সব দিগন্ত এই বৃত্তসমূহের
২৭৭ মেরুর উপর দিয়ে যায় না, সেই দিগন্ত এই বৃত্তগুলিকে দুই অসমান ভাগে ভাগ করে এবং সমান্তরালবর্তী বৃত্তগুলি যত ছোট হয়, ভাগগুলি ততই অসমান হয়। সেই কারণে সেখানে কেবল দুই বার্ষিক বিষুব ব্যতীত সর্বদা রাত্রি ও দিন অসমান হয়। এই দুই বিষুবের সময়ে কেবল 'মেরু' ও 'বাড়বামুখ' ছাড়া সমস্ত পৃথিবীতেই রাত্রি দিন সমান হয়। তখন বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণের সকল স্থান-ই বিষুব বৃত্তের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে; তার অন্য কোনও সময়ে তা হয় না। দিগন্তের ঊর্ধ্বে সূর্য উঠলে দিনমান আরম্ভ হয়, আর তার নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলে রাত্রি আরম্ভ হয়। ভারতীয়দের মতে, দিবস রাত্রির পূর্ববর্তী, এজন্য দিবাভাগকে ওরা 'সাবন' আখ্যা দিয়েছে, অর্থাৎ উদিত সূর্যের দিবস। তাকে ওরা 'মনুষ্যাহোরাত্র'-ও বলে থাকে, অর্থাৎ মানব-দিবস, কারণ কোনও অন্যবিধ দিবস জনসাধারণ জানে না।

'সাবন'-এর তাৎপর্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়েছে ধরে নিয়ে এখন শব্দটিকে আমি নীচের আলোচনায় মান হিসাবে ব্যবহার করব এবং তা দিয়ে অন্য প্রকারের দিবস নির্ধারণ করতে চেষ্টা করব।

মানব দিবসের' পরে আসে 'পিতৃনহোরাত্র', অর্থাৎ পূর্ব' পুরুষদের 'অহোরাত্র', হিন্দুদের বিশ্বাস মতে যাদের আত্মা চন্দ্রলোকে বাস করে। এই অহোরাত্রের দিনমান ও রাত্রি জ্যোতি ও তমসার উপর নির্ভর করে, কোনও বিশেষ দিগন্তে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের উপরে নয়। চন্দ্রের আলো যখন শীর্ষে পেঁাছে তাদিগকে আলোকিত করে, তখন তাদের দিবস হয়, আর যখন নীচে নেমে যায় তখন তাদের রাত্রি। স্পষ্টতঃ, তাদের দ্বিপ্রহর হচ্ছে সংযোগ (বা পূর্ণিমা) এবং মধ্যরাত্রি প্রতিযোগ (বা অমাবস্যা)। অতএব, 'পিতৃনহোরাত্র' হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ চান্দ্রমাস; তার দিবস আরম্ভ হয় শুক্লপক্ষে, যখন চন্দ্রালোক বাড়তে আরম্ভ করে, আর রাত্রি আরম্ভ হয় কৃষ্ণপক্ষে, যখন আলোক হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। সদা নির্ধারিত 'পিতৃনহোরাত্রের' দ্বিপ্রহর ও মধ্যরাত্রি থেকে এই সিদ্ধান্ত-ই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে যদি আমরা চন্দ্রের শুক্লপক্ষকে পৃথিবীর দিগন্তে দৃশ্যমান সূর্যের অর্ধেক ভাগের ন্যায়, আর কৃষ্ণপক্ষকে দিগন্তে অস্তমিত সূর্যের অপরার্ধের ন্যায় মনে
২৭৮ করি। এই অহোরাত্রের দিবস মাসের শেষ চতুর্থাংশ থেকে নিয়ে পরবর্তী মাসের প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত থাকে, আর রাত্রি ঐ একই মাসের প্রথম চতুর্থাংশ থেকে দ্বিতীয় চতুর্থাংশ পর্যন্ত। দুই ভাগের সমষ্টি হবে 'পিতৃনহোরাত্র'।

এইভাবে বিষয়টিকে, বিষ্ণুধর্মকার বিশদ ও পুংখানুপংখ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন বিষয়টিতে তিনি ফিরে গেছেন, তখন তিনি সমস্ত গুলিয়ে ফেলে পিতৃপুরুষদের দিবসকে প্রতিযোগ থেকে সংযোগ (অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা) পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষের সাথে এক করে ফেলেছেন, আর তাদের রাত্রিকে এক করেছেন শুক্লপক্ষের সাথে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার আমি উপরে যা বলেছি, তা-ই। ওরা যে সংযোগের দিনে পিতৃপুরুষের অন্নভোগ দেয় তার থেকেও আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়, কেননা ওরা দ্বিপ্রহরকেই আহারের সময় বলে বর্ণনা করে থাকে, সেজন্য নিজের অন্ন গ্রহণের সময়ে ওরা পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যেও অন্ন দান করে।

পিতৃপুরুষদের অহোরাত্রের পর আসে 'দিব্যাহোরাত্র', দেবতাদের 'অহোরাত্র'। আমরা জানি যে বৃহত্তর অক্ষাংশ (Latitude), অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রির দিগন্ত-ই হচ্ছে বিষুবরেখা, যার সূবিন্দুতে মেরু অবস্থিত। অবশ্য, খুঁটিয়ে দেখলে বিষুবরেখা ৯০ ডিগ্রির ঈষৎ নীচেই হবে, কারণ যে অঞ্চলে মেরু পর্বত অবস্থিত সেখানকার দৃশ্যমান দিগন্ত থেকে বিষুব রেখা কিঞ্চিৎ নীচে থাকে, তবে সে পর্বতের শিখরের পক্ষে দিগন্ত ও বিষুবরেখা অভিন্ন হতে

পারে, যদিও দৃশ্যমান দিগন্ত তার কিছু নীচে থাকার কথা। আমরা আরও দেখেছি যে রাশিচক্র বিষুবরেখার দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ তার উপরে, অন্য ভাগ তার নীচে। যতক্ষণ সূর্য উত্তরায়ণের রাশিতে থাকে ততক্ষণ সে জাঁতার চাকার ন্যায় ঘুরতে থাকে। কেননা তার আবর্তনের আহ্নিক অর্ক (Arc) ছায়াঘড়ির মত দিগন্তের সমান্তরাল হয়। যারা উত্তর মেরুর নীচে বাস করে তাদের চোখে সূর্য দিগন্তের উপরে দেখা দেয়, সেজন্য তাদের তখন দিনমান হয়; আর যারা দক্ষিণ মেরুতে বাস করে তাদের চোখে সূর্য দিগন্তের নীচে অদৃশ্য থাকে, সেজন্য তখন তাদের রাত্রি হয়। আবার সূর্য যখন দক্ষিণায়নে যায়, তখন সে দিগন্তের (বিষুব রেখার) নীচে জাঁতার চাকার ন্যায় আবর্তিত হতে থাকে। তখন উত্তর মেরুর নীচের অধিবাসীদের
২৭৯ রাত্রি আর দক্ষিণ মেরুর নীচের অধিবাসীদের দিনমান হয়। 'দেবক' অর্থাৎ অশরীরী আত্মাদের বাস উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নীচে। সেজন্য উপরে বর্ণিত দিবসকে তাদের নামে অভিহিত করা হয়।

কুসুমপুরের আর্যভট্ট বলেছেন: 'দেবতারা সৌর বৎসরের অর্ধেক দেখতে পান, দানবরা অপরার্ধ দেখে; পিতৃগণ চান্দ্র মাসের অর্ধেক দেখে, মানব অপরার্ধ দেখে। অতএব, রাশিচক্রে সূর্যের এক সম্পূর্ণ পরিক্রমাতে দেবতা ও দানব উভয়েরই রাত্রি ও দিন হয়—আর উভয়ের সমষ্টিতে হয় তাদের অহোরাত্র'। তার ফলে আমাদের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র হয়। তাতে কিন্তু দিবা ও রাত্র সমান হয় না। কারণ উত্তরায়ণের অপভূতে (اوج) সূর্যের গতি মন্দ হয়, যার ফলে দিবাভাগ বড় হয়। রাত্রি দিবসের এই প্রভেদ কিন্তু আপাতদৃষ্ট ও প্রকৃত দিগন্তের প্রভেদের সমান নয়, কারণ সূর্যগোলকে সে প্রভেদ ধরা যায় না। তাছাড়া হিন্দুদের মতে, মেরু পর্বতে বাস করার দরুন, সেখানকার অধিবাসীরা ভূপৃষ্ঠ থেকে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে রয়েছে। এই মত যারা পোষণ করে মেরু পর্বতের উচ্চতা সম্বন্ধে তারা পূর্বে বর্ণিত (২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মত পোষণ করে। মেরু পর্বতের উচ্চতা এই রকম হলে তার দিগন্তরেখা কিছুটা নীচে হবে এবং তার ফলে দিবাভাগের চেয়ে রাত্রির হ্রস্বতার অনুপাত কমে যাবে। মেরু সম্বন্ধে এই ধারণা যদি ধর্মীয় শ্রুতি—যা নিয়ে আবার ওদের মধ্যেও মতভেদ আছে—না হয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে গণনা দ্বারা বিষুব রেখা থেকে মেরু পর্বতের দিগন্ত কত নীচে, তা বের করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে চেষ্টায় কোন লাভ নাই, কারণ এতে কোনও বিজ্ঞান নাই।

কোনও অশিক্ষিত হিন্দু হয়ত শুনেছিল যে উক্ত প্রকারের অহোরাত্রের দিনমান হয় উত্তরে আর রাত্রি হয় দক্ষিণে। সে তখন মকরক্রান্তি থেকে উত্তরায়ণ ও কর্কটক্রান্তি থেকে দক্ষিণায়ন, রাশির এই উভয় 'অংশ দিয়ে বৎসরকে দুই ভাগে ভাগ করল। তারপরে, উপরোক্ত অহোরাত্রের দিনমানকে রাশিচক্রের আরোহণ ও রাত্রিকে অবরোহণ বলে ধরে নিয়ে এই সিদ্ধান্তটি তার পুস্তকে চিরকালের জন্য বিধৃত করে রাখল।

'বিষ্ণু ধর্ম''কার-ও প্রায় একই রকমই করেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিচক্রের যে অর্ধাংশ মকর থেকে আরম্ভ হয়, তা অসুর অর্থাৎ দানবদের দিবাভাগ; আর তাদের রাত্রি আরম্ভ হয় কর্কট রাশি থেকে। এর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, মেষরাশি থেকে যে অর্ধাংশ আরম্ভ হয়, তা দেবগণের দিবাভাগ।' এসব কথা বলে তিনি নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করেছেন, কারণ তিনি দুই মেরুর পারস্পরিক অবস্থান গুলিয়ে ফেলেছেন। যদি তিনি নিজ উক্তি বিচার করে দেখতেন, এবং জ্যোতির্বিদ্যা তাঁর জানা থাকত, তাহলে এরূপ সিদ্ধান্ত থেকে তিনি বিরত হতেন।

'দিব্যাহোরাত্রের' উপরে আছে 'ব্রহ্মহোরাত্র'। এ অহোরাত্র আলোক ও অন্ধকার থেকে উদ্ভূত নয়। কোনও জ্যোতিষ্কের উদয়-অস্ত দিয়েও তা নির্ধারিত হয় না। তার হেতু প্রকৃতিজ বস্তু সমূহের বাহ্য প্রকৃতি, যার দরুন তারা দিবাভাগে গতিশীল হয় ও রাত্রে বিশ্রাম করে। ব্রহ্মার অহোরাত্রের দৈর্ঘ্য আমাদের ৮৬৪০,০০০,০০০, বৎসরের সমান। তার অর্ধেকাংশ দিবাভাগ; সে ভাগে ঈথর তন্মধ্যস্থিত সমস্ত কিছু সহ গতিশীল থাকে, ধরিত্রী ফলবতী হয়, আর ভূ-পৃষ্ঠে অস্তিত্ব ও বিনাশের পরিবর্তন নিয়ত হতে থাকে। আর অপরার্ধে, অর্থাৎ রাত্রিতে দিবাভাগের ঠিক বিপরীত অবস্থা হয়, রাত্রিতে ও শীত ঋতুতে প্রকৃতি যেমন বিশ্রাম করে, তেমনই পরিবর্তনকারী সমস্ত কিছুই বিশ্রাম করে। ফলে সব রকমের গতি বন্ধ থাকে এবং পৃথিবী অপরিবর্তিত থেকে আগত দিন ও গ্রীষ্মকালের নতুন অস্তিত্বের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

ব্রহ্মার প্রত্যেকটি দিন এককল্প, প্রত্যেক রাত্রিও এককল্প। আমাদের মুসলমানেরা যাকে 'সিন্দহিন্দের বৎসর' বলে 'কল্প' হচ্ছে—তাই।

ব্রহ্মাহোরাত্রের উপরে আছে, 'পুরুষহোরাত্র', অর্থাৎ পরমাত্মার (نفس الكلية ; অহোরাত্র। তার নাম 'মহাকল্প'। হিন্দুরা একে দিবা ও রাত্রে ভাগ করে না; কেবল সময়ের মত কালের সাধারণ পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য এর ব্যবহার করে থাকে। মনে হয়, এই 'মহাকল্পের দিবাভাগ হচ্ছে আত্মার

সঙ্গে আদি পদার্থের সংযুক্তির কাল, আর রাত্রি তাদের বিচ্ছেদ ও আত্মার বিশ্রামের কাল এবং যে অবস্থা তাদের সংযুক্তি ও বিচ্ছেদকে অবশ্যম্ভাবী করে এই 'অহোরাত্রের' শেষে সে অবস্থার পুনরাবর্তন ঘটে।

'বিষ্ণু ধর্মে' আছে : ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল 'পুরুষের' একদিন; 'পুরুষের' এক রাত্রিও ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের সমান। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল যে তার কালপরিমাণে এক শত বছর তাতে হিন্দুরা একমত। ওদের মতে, আমাদের যে বৎসর-সংখ্যা
২৮১ দিয়ে ব্রহ্মার এক 'অহোরাত্রের' দৈর্ঘ্য উপরে দেওয়া হয়েছে (৮,৬৪০,০০০,০০০) সে সংখ্যাকে ৩৬০ গুণ করলে ব্রহ্মার এক বৎসরের দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, ব্রহ্মার এক বৎসরের কাল আমাদের (৩৬০×৮,৬৪০,০০০,০০০) ৩,১১০,৪০০,০০০,০০০ বৎসরের সমান। এইরূপ একশ বৎসর আমাদের বৎসরে উপরোক্ত সংখ্যার উপর আরও দুই দুইটি শূন্য বাড়িয়ে মোট দশটি শূন্য সম্বলিত সংখ্যা হবে। এই সংখ্যক মানব-বৎসর হবে পুরুষের এক দিবস। এর দ্বিগুণ, অর্থাৎ আমাদের ৬২২,০৮০,০০০,০০০,০০০ বৎসরে তার এক অহোরাত্র।

'পৌলিস-সিদ্ধান্তে' বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার 'আয়ুষ্কাল' পুরুষের একদিবস। তবে এ-ও বলা হয়েছে যে পুরুষের দিবস হচ্ছে 'পরার্ধকল্প'। আবার অন্য কেউ কেউ বলেছে যে পরার্ধকল্প' হচ্ছে 'কঃ' দিবস, অর্থাৎ বিন্দু; শব্দটি দিয়ে ওরা 'আদি কারণ' বোঝাতে চায় যা সমস্ত অস্তিত্বের হেতু। সংখ্যা গণনায় এই কল্পের স্থান হচ্ছে অষ্টাদশ রাশিতে; সেখানে তাকে বলা হয় 'পরার্ধ', অর্থাৎ আকাশের অর্ধেক। তার দ্বিগুণ হবে সমগ্র আকাশ; আর এই সমগ্র আকাশ-ই হবে সম্পূর্ণ অহোরাত্র। কাজেই, ৮৬৪ এর দক্ষিণে ২৪টা শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয় আমাদের বৎসরের হিসাবে 'ক' দিবস তত বৎসর।

এইসব সংজ্ঞা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অনন্তকাল প্রবাহের ভাবাত্মক অংশ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, সংখ্যা যোজনা করে কোনও বিশেষ আঙ্কিক মূল্য বোঝানো তার উদ্দেশ্য নয়, কারণ কালবিভাগের এই কল্পনা যে সংযুক্তি ও বিচ্ছেদ, সৃষ্টি ও বিনাশের প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত, তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

চৌত্রিশ অধ্যায়

অহোরাত্রের ক্ষুদ্রতর অংশসমূহ

সময়কে নানান সূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করতে হিন্দুরা অত্যন্ত অকারণ প্রয়াস করে থাকে বলে ওদের বিভাগগুলি নানাপ্রকারের এবং প্রকারেরও অন্ত নাই। ফলে, কোন দুইটি পুস্তকে, বা কোনও দুই ব্যক্তির উক্তিতে বিষয়টির এক-ই বর্ণনা কখনও তুমি পাবে না। প্রথমতঃ 'অহোরাত্রে'র ৬০ ভাগ, প্রত্যেক ভাগের নাম 'ঘড়ি'। কাশ্মীরের উৎপলকৃত শ্রুধব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে : একটি
২৮২ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে যদি বার অঙ্গুলি ব্যাস ও চার অঙ্গুলি দৈর্ঘ্যযুক্ত একটি গোলাকার ছিদ্র করা যায়, তাহলে তাতে তিন মণ জল ধরবে। এই কূপ সদৃশ ছিদ্রের তলদেশে যদি বৃদ্ধাও নয় বালিকাও নয়, এমন যুবতী রমণীর ছয়টি বিনুনী করা কেশ পরিমিত ব্যাসের আর একটি ছিদ্র করা যায়, তাহলে সে ছিদ্র দিয়ে এক ঘড়ি কালে এই তিন মণ জল বেরিয়ে যাবে।

তারপর, প্রত্যেকটি মিনিট আবার ৬০ সেকেণ্ডে ভাগ করা হয়; প্রত্যেকটির নাম 'চশক' (جشک) কিম্বা 'চথক', (جکک) তাকে বিঘটিকা'ও বলা হয়। প্রত্যেকটি সেকেণ্ডে আবার ছয় ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটির নাম 'প্রাণ', অর্থাৎ নিশ্বাস। উপরোক্ত শ্রুধব গ্রন্থে 'প্রাণের' ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ভাবে : 'প্রাণ' হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে নিদ্রিত সুস্থ লোকের নিশ্বাস, মূত্ররোগী বা ক্ষুধার্ত, যার পাকস্থলী ভুক্তদ্রব্যে পরিপূর্ণ, শোকগ্রস্ত বা আর্ত এমন লোকের নিশ্বাস নয়; কারণ আগ্রহ বা শঙ্কা, পাকস্থলীর শূন্যতা বা পরিপূর্ণতা এবং হিতকারী শারীরিক রসের হ্রাসবৃদ্ধিজনিত মানসিক ও দৈহিক বিপত্তি ভেদে নিদ্রিত লোকের নিশ্বাসের তারতম্য হয়।

আমরা হয় এইভাবে 'প্রাণে'র সময় নিরূপণ করি, কিম্বা প্রত্যেক 'ঘড়ি'কে ৬০ ভাগে ভাগ করি, কিম্বা আকাশ মণ্ডলের প্রত্যেক ডিগ্রিকে ৬০ ভাগে বিভক্ত মনে করি, যেভাবেই করি না কেন, ফল একই হবে।

এই পর্যন্ত হিন্দুরা সবাই একমত, যদিও সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন ব্রহ্মগুপ্ত chashaka নামক সেকেণ্ডের নাম দিয়েছেন 'বিনাড়ী'; কুসুমপুরের আর্যভট্টও তাই করেছেন; কেবল মিনিটকে তিনি বলেছেন

'নাড়ী'। দুজনের কেউ-ই 'প্রাণে'র চেয়ে ক্ষুদ্রতর আকাশ মণ্ডলের মিনিটের (ডিগ্রীর ষষ্ঠতম ভাগ) সমান কোনও কালপরিমাণ উদ্ভাবন করেন নি।
২৮৩ কারণ পলিস বলেছেন : আকাশ মণ্ডলের প্রত্যেক মিনিট, যার মোট সংখ্যা ২১,৬০০, মকর ও কর্কট ক্রান্তির সময়ে পূর্ণস্বাস্থ্যবান লোকের স্বাভাবিক নিশ্বাসের সমান। মানুষ যতক্ষণে একবার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ততক্ষণের মধ্যে আকাশ মণ্ডল এক মিনিট সরে যায়।

হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মিনিট ও সেকেণ্ডের মধ্যবর্তী 'ক্ষণ' নামে আর একটি কালপরিমাণ উদ্ভাবন করেছেন। 'ক্ষণ' মিনিটের এক চতুর্থাংশ। প্রত্যেক 'ক্ষণের' আবার ১৫টি ভাগ; প্রত্যেকটির নাম 'কল' (كل)। 'কল' মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ। আসলে এটি উপরোক্ত 'চশক' বই আর কিছু নয়; শুধু নাম পৃথক।

সময়ের এই সব বিভক্তির নীচের দিকে পরিমাণ জ্ঞাপক তিনটি শব্দ আছে যেগুলি সর্বদা একই পরম্পরায় ব্যবহার হতে দেখা যায়। শব্দ তিনটির উপরে আছে 'নিমেষ', স্বাভাবিক অবস্থায় দুইবার চোখের পলক ফেলার মধ্যবর্তী সময়। মধ্যের শব্দ 'লব', আর সর্বনিম্নে 'তুতি (ত্রুটি ? (تو تی)। শেষোক্ত শব্দটির অর্থ হচ্ছে তর্জনী দিয়ে অঙ্গুষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগ আঘাত করা (চুটকি দেওয়া)। হিন্দুদের মধ্যে এটি বিস্ময় বা প্রশংসাসূচক আচরণ।

এই তিনটি পরিমাণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে কিন্তু নানা মতান্তর দেখা যায়। কতক লোকের মতে :

২ তুতী = ১ 'লব', আর
২ লব = ১ 'নিমেষ'

এই নিমেষ আর তার উর্ধ্বতন সময়াংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়েও আবার মতভেদ আছে। কারুর মতে ১৫, কারুর মতে ৩০ 'নিমেষে' তার উর্ধ্বতন সমঃাংশ হয়। আবার অনেকে 'তুতী', 'লব' ও 'নিমেষ' এই তিনটি সময়াংশের প্রত্যেকটিকে আট ভাগে ভাগ করে থাকে। (৮ ত্রুটি = ১ লব। ৮ লব = এক নিমেষ, ৮ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা)। 'শ্রুধবে' এইরূপ করা হয়েছে। শাম্মি (? شمّی) নামক ওদের এক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ব্যক্তিও তাই করেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি আবার সময়ের এই বিভাগকে আরও সূক্ষ্মতর করে, 'তুতী'র নীচে 'অণু' নামে আর একটি পরিমাণ উদ্ভাবন করেছেন, যার আটগুণে এক 'তুতী' হয়।

'নিমেষের' উধর্বতন পরিমাণ হচ্ছে 'কাষ্ঠা' ও 'কল'। আমি আগেই বলেছি যে অনেকের মতে 'কল' 'চশকে'রই নামান্তর, আর ৩০ 'কাষ্ঠা'র সমান। প্রত্যেক কাষ্ঠা=১৫ নিমেষ। প্রত্যেক নিমেষ=২ লব। আর প্রত্যেক লব=২ 'তুতী'।

২৮৪ কেউ কেউ 'কল'কে আবার 'অহোরাত্রের' মিনিটের (ঘড়ি) ১৬ ভাগের এক ভাগ বলে ধরে, যার প্রত্যেকটি ৩০ 'কাষ্ঠা', ও প্রত্যেক 'কাষ্ঠা' ৩০ নিমেষের সমান। তন্নিম্নের পরিমাণগুলি আবার উপরোল্লিখিত পরিমাণের মত।

কেউ আবার 'চশক'কে ৬ নিমেষ ও প্রত্যেক নিমেষকে ৩ লবের সমান ধরে।

'ধ্রুব' থেকে সংকলিত বর্ণনা এখানেই শেষ হোল।

'বায়ু পুরাণে' লেখা আছে যে,

১ মুহূর্ত=৩০ কল

১ কল=৩০ কাষ্ঠা

১ কাষ্ঠা=১৫ নিমেষ।

ক্ষুদ্রতর ভাগগুলি আর বায়ু পুরাণে ধরা হয়নি।

এ সবের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তা নির্ণয় করার কোনও উপায় আমাদের নাই। কাজেই উৎপল ও শম্যি (?) র মত অনুসরণ করাই আমাদের পক্ষে সমীচীন, যাতে প্রত্যেক প্রাণকে ৮ নিমেষে, প্রত্যেক নিমেষকে ৮ লবে, প্রত্যেক লবকে ৮ 'তুতী'তে ও প্রত্যেক 'তুতী'কে ৮ 'অণু'তে ভাগ করা হয়েছে, যেমন নীচের সারণিতে দেখান হচ্ছে।

কাল পরিমাণের নাম	বৃহত্তর ভাগের মধ্যে তন্নিম্নতর ভাগের সংখ্যা	এক দিবসে তার মোট সংখ্যা
ঘড়ি, নাড়ী	৬০	৬০
ক্ষণ	৪	২৪০
চশক, বিনাড়ী, কল	১৫	৩,৬০০
প্রাণ	৬	২১,৬০০
নিমেষ	৮	১,৭২,৮০০
লব	৮	১৩,৮২,৪০০
তুতী	৮	১,১০,৫৯,২০০
অণু	৮	৮,৮৪,৭৩,৬০০

অহোরাত্রকে অষ্টপ্রহরের ভাগ করার একটা লৌকিক রীতিও হিন্দুদের
২৮৫ মধ্যে আছে। 'প্রহরের' অর্থ রক্ষী পরিবর্তন। ওদের দেশের কোথাও কোথাও 'ঘড়ি' অনুযায়ী ঘণ্টা ধ্বনি করে অষ্ট প্রহর নির্দেশ করা হয়। সাড়ে সাত 'ঘড়ি' ব্যাপী এক 'প্রহর।' শেষ হলে ওরা ঢোল বাজায় ও 'শঙ্খ' নামক পাক দেওয়া একপ্রকার ঝিনুককে ফুঁ দেয়। ফার্সীতে তাকে 'সপেদমুহ্রা' বলা হয়; আমি 'পুরুসাওর' (پرشور পুরুষপুর) শহরে এই রকম শঙ্খ দেখেছি। প্রহর ঘোষণা করার প্রতিষ্ঠান ও তার ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্পত্তিদান ও নিয়মিত আয়ের বরাদ্দ করা থাকে।

'অহোরাত্র'কে আবার ৩০ 'মুহূর্তে' ভাগ করার নিয়মও আছে। তবে এ বিভক্তির পদ্ধতি তেমন স্পষ্ট নয়। কখনও মনে হবে যে এ মুহূর্তগুলির দৈর্ঘ্য সমান, বিশেষ করে যখন ওরা 'ঘড়ির' সঙ্গে তার তুলনা ক'রে বলে যে দুই ঘড়িতে এক মুহূর্ত হয়, কিম্বা প্রহরের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলে যে, প্রহর ৩½ মুহূর্তের সমান। এর থেকে ধারণা হবে যে ওরা 'মুহূর্ত'কে দিবারাত্রের সমান দৈর্ঘ্য-সম্পন্ন এক একটি ভাগ বা ঘণ্টা মনে করে। অথচ, অক্ষরেখার ডিগ্রি ভেদে রাত্রি বা দিবসের এই সব ঘণ্টার সংখ্যায় তারতম্য হয়। সেজন্য মনে হয়, দিবসের মুহূর্ত রাত্রের মুহূর্ত থেকে পৃথক।

কিন্তু আবার ওদের মুহূর্তাধিপতি নির্ধারণের রীতি দেখলে বিপরীত ধারণা হবে, কেননা রাত্রি ও দিবস, প্রত্যেকটিতেই ওরা ১৫টি মুহূর্তাধিপতি গণনা করে থাকে। তা দেখে মনে হয়, যে সমান ১২ ভাগে বিভক্ত রাত্রি ও দিনের প্রত্যেক এমন ভাগকে ওরা 'মুহূর্ত' বলে দিবস ও রাত্রি ভেদে যার দৈর্ঘ্য তারতম্য হয়। (অর্থাৎ, সে মুহূর্তের দৈর্ঘ্য রাত্রিতে এক রকম আর দিবসে অন্যরকম হয়)।

এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তই যে ঠিক তার প্রমাণ পাওয়া যাবে হিন্দুদের একরূপ গণনা রীতি থেকে, যার দ্বারা মানুষের ছায়ার দৈর্ঘ্যকে অঙ্গুলি দিয়ে মেপে কোনও বিশেষ সময় পর্যন্ত অতীত মুহূর্তের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। ঐ অঙ্গুলি সংখ্যা থেকে মানুষটির মধ্যাহ্নিক ছায়ার অঙ্গুলি সংখ্যা বাদ দিলে যে সংখ্যা থাকবে তা নীচে আঁকা চিত্রের কেন্দ্রীয় পংক্তিতে লেখা সংখ্যাগুলির যেটির সাথে মিলবে, তার ঠিক উপরে বা নীচে লেখা সংখ্যাটি হবে সেই সময়কার 'মুহূর্ত'। আমি এটি ওদের শ্লোকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী এঁকেছি।

মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অতীত মুহূর্ত	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
দ্বিপ্রাহরিক ছায়া থেকে বিশেষ সময়ের ছায়া কত অঙ্গুলি বড়	৯	৬০	১২	৬	৫	৩	২	০
মধ্যাহ্নের পরবর্তী অতীত মুহূর্ত	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯	৮	

২৮৬ 'পোলিস' সিদ্ধান্তের টীকাকার এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে, যারা এক মুহূর্ত'কে দুই 'ঘড়ি'র সমান বলে তাদের নিন্দা করেছেন, এবং বলেছেন যে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অহোরাত্রের 'ঘড়ি'র সংখ্যার তারতম্য হয়, কিন্তু মুহূর্তসংখ্যায় কখনও পার্থক্য হয় না। কিন্তু অন্যত্র, যেখানে তিনি মুহূর্তের দৈর্ঘ্য নিয়ে তর্ক করেছেন, সেখানে তিনি নিজের উক্তিকেই 'খণ্ডন' করেছেন। এক মুহূর্ত'কে তিনি ৭২০ 'প্রাণ' বা নিশ্বাসের সমান বলে স্থির করেছেন, কারণ প্রত্যেক নিশ্বাসের দুইটি ভাগ আছে, অপান (اُپان) বা শ্বাস গ্রহণ ও 'প্রাণ' বা শ্বাস ত্যাগ। একই অর্থবাচক আরও দুটি শব্দ আছে ঃ 'নিশ্বাস' ও 'অবশ্বাস'। অবশ্য শব্দ দুটির একটি বললে অন্যটি স্বতঃই এসে যায়, যেমন 'বহুদিন' বললে তার মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই রাত্রি অন্তর্ভুক্ত কর। কাজেই এক মুহূর্তে ৩৬০ 'নিশ্বাস' ও ৩৬০ 'অবশ্বাস' আছে। 'ঘড়ির' দৈর্ঘ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়েও টীকাকার এইভাবে নিশ্বাসের বা 'প্রাণে'র একভাগ মাত্র উল্লেখ করেছেন, অথচ গণনার দুই ভাগ ধ'রে। 'ঘড়ি'কে ১৮০ নিশ্বাস ও ১৮০ 'অবশ্বাস' না বলে, ৩৬০ 'প্রাণ' বা 'নিঃশ্বাসের' সমান বলেছেন।

'মুহূর্ত''কে যদি 'নিঃশ্বাস' দিয়ে পরিমাপ করা যায় তাহলে নিঃশ্বাসের পরিমাপ দণ্ড (مقدار) নির্ণয়ের জন্য সে মুহূর্ত'কে 'ঘড়ি' ও বিষুবদ্বয়ের সময়ের উপর নির্ভর করতে হবে। অথচ পোলিসের যা বক্তব্য তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা যারা পৃথিবীর সর্বত্রই এক দিবসকে বিষুব কালে ১৫ মুহূর্তের সমান মাত্র বলে ধরে, তাদের বিরুদ্ধে পোলিস তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন এই বলে যে, যেহেতু 'অভিজিৎ' মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের প্রথম দিকেই পড়ে সেহেতু দিবসের মুহূর্ত-সংখ্যার তারতম্য হলে 'অভিজিৎ' নামক মধ্যাহ্ন-সূচক মুহূর্তের সংখ্যাও ভিন্ন হবে, অর্থাৎ, 'অভিজিৎ' বা মধ্যাহ্নকে সর্বদা অষ্টম মুহূর্ত বলা চলবে না।

যুধিষ্ঠিরের জন্ম সম্বন্ধে ব্যাস বলেছেন যে শুক্ল পক্ষের মধ্যাহ্নে অষ্টম প্রহরে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এর থেকে প্রতিপক্ষ যদি ধরে নিতে চায় যে সেটি বিষুব দিবস ছিল, তাহলে মার্কণ্ডেয়র উক্তি উদ্ধৃত করে তার জবাব

দিতে হয়. সেখানে বলা হয়েছে যে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় জ্যৈষ্ঠ (چرث) মাসের পূর্ণিমাতে। বিষুব থেকে এ মাস অনেক দূরে।

২৮৭ বাসুদেব সম্বন্ধেও ব্যাস বলেছেন যে তাঁর জন্ম হয় 'অভিজিৎ' নক্ষত্রে, ভাদ্র পাদের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টম মুহূর্তে, যখন রাত্রির যৌবন অতীত হয়ে মধ্যরাত্রি হয়েছিল। এ সময়টিও বিষুব কাল থেকে অনেক দূরে।

বশিষ্ট বলেছেন যে বাসুদেব কংসের ভাগিনেয় শিশুপালকে 'অভিজিতে' নিহত করেন। শিশুপালের কাহিনীতে ওরা বলে যে সে চতুর্ভুজ হয়ে জন্মেছিল। একদিন তার জননীকে আকাশ থেকে দৈববাণী হোলো "যে তাকে বধ করবে সে শিশুকে স্পর্শ করলে তৎক্ষণাৎ শিশুর অতিরিক্ত হস্তদ্বয় খসে পড়বে।' তারা তখন শিশুকে উপস্থিত সকলের ক্রোড়ে চাপাতে থাকল। বাসুদেব যেমনই তাকে স্পর্শ করল, দৈববাণী অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ শিশুর ঐ দুই হাত খসে পড়ে গেল। বাসুদেবের মাতৃস্বসা তখন তাকে বলল : 'তুমি একদিন নিশ্চয়ই আমার পুত্রকে হত্যা করবে'। বাসুদেব ত নও শিশু। সে উত্তর দিল : তা করব না, যতক্ষণ না সে স্বেচ্ছাকৃত কোনও অপরাধে অপরাধী হচ্ছে, এবং তার দুষ্কৃতি দশ সংখ্যা অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাকে আমি কিছু বলব না। কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির যজ্ঞের আয়োজন করেন, তাতে সমস্ত বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাগতদের মর্যাদা নির্ধারণ ও পাদ্য ও মাল্য দিয়ে শ্রেষ্ঠজনকে অর্চনা করা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির ব্যাসের পরামর্শ চাইলে ব্যাস বাসুদেবকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পরামর্শ দিলেন। সে সভায় বাসুদেবের মাতৃস্বসা পুত্র শিশুপালও উপস্থিত ছিল। সে তখন রোষভরে বলতে লাগলো যে বাসুদেবের চেয়ে সে-ই শ্রেষ্ঠ আসনের যোগ্য। তার আত্মম্ভরিতা এমনই বেড়েই চলল যে, বাসুদেবের পিতাকেও অপমান করতে সে কুণ্ঠিত হোল না। বাসুদেব তখন সকলকে শিশুপালের অশিষ্টাচরণে সাক্ষী হতে বললেন। কিন্তু তাকে বাধা দিলেন না। অবশেষে যখন তার দাম্ভিকতা বেড়েই চলল এবং দশ সংখ্যা অতিক্রম করে গেল, বাসুদেব অর্ঘপাত্র নিয়ে চক্র নিক্ষেপের মত শিশুপালের প্রতি নিক্ষেপ করে তার মস্তক ছেদন করলেন। এই হোল শিশুপালের গল্প।

মুহূর্ত সম্বন্ধে পৌলিস-সিদ্ধান্তের টীকাকারের উপরোল্লিত মতকে কেউ যদি প্রমাণ করতে চায়, তাকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে 'অভিজিৎ' একই সঙ্গে মধ্যাহ্ন ও অষ্টম মুহূর্তের অর্ধেকে পড়ে। যতক্ষণ সে এটি প্রমাণ করতে না পারবে ততক্ষণ রাত্রি ও দিবসের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী মুহূর্তের দৈর্ঘ্য হবে, যদিও ভারতবর্ষে সে প্রভেদের পরিমাণ সামান্য-ই; অসমান এবং

বিষুবকাল থেকে দূরবর্তী সময়ে মধ্যাহ্ন অষ্টম মুহূর্তের প্রারম্ভে, অন্তে, কিম্বা তার মধ্যে পড়া অসম্ভব নয়।

২৮৮ টীকাকারের শিথিলচিন্তার আর একটি প্রমাণ যে তিনি যুক্তি হিসাবে গর্গের একটি উক্তি নকল করে বলেছেন যে বিষুববৃত্তে 'অভিজিৎ এর সময়ে কোন ছায়া হয় না। প্রথমত :, দুই বিষুবকাল ছাড়া এ ঘটনা সত্য নয়; এবং দ্বিতীয়তঃ, সত্য হলেও তার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে এ ঘটনার কি সম্বন্ধ?

বিভিন্ন মুহূর্তের অধিপতিদের নাম নীচের তালিকায় দেওয়া গেল।

মুহূর্তের ক্রমিক সংখ্যা	দিবসের মুহূর্তাধিপতি	রাত্রির মুহূর্তাধিপতি
১	শিব=মহাদেব	রুদ্র=মহাদেব
২	ভুজগ=সর্প	অজ=ক্ষুর বিশিষ্ট চতুষ্পদের নায়ক
৩	মিত্র	আহিরাবুদনা (? অহির বুদ্নয ?) =উত্তরভাদ্র পদাধিপতি
৪	পিতৃ	পুষণ=রেবতির অধিপতি
৫	বসু	দস্র=অশ্বিনীর অধিপতি
৬	অপ্=জল	অন্তক=মৃত্যুদূত
৭	বিশ্ব	অগ্নি
৮	বিরিঞ্চি=ব্রহ্ম	ধাত্রী=জগৎপালক ব্রহ্মা
৯	কেশ্বর (? কেশব) মহাদেব	সোম=মৃকশীর্ষাধিপতি
১০	ইন্দ্রাগ্নি	গুরু=বৃহস্পতি
১১	ইন্দ্ররাজ	হরি=নারায়ণ
১২	নিশাকর=চন্দ্র	রবি=সূর্য
১৩	বরুণ=মেঘরাজ	যম=মৃত্যুর দেবতা
১৪	আর্যমন	ত্বষ্ঠী=চিত্রাধিপতি
১৫	ভার্গেয় (? بهگ کیو)	অনিল=বায়ু

২৮৯ ভারতবর্ষে 'ঘন্টার' (bour) ব্যবহার কেউ করে না; কেবল মাত্র জ্যোতিষীরা ঘন্টার অধিপতি এবং তার দরুন অহোরাত্রের অধিপতির-ও উল্লেখ করে। অহোরাত্রের অধিপতি একই সংগে রাত্রিরও অধিপতি, কারণ দিবা-ভাগের জন্য পৃথক করে ওরা অধিপতির নির্দেশ করে না। বস্তুতঃ এ প্রসঙ্গে পৃথকভাবে রাত্রির উল্লেখ-ই ওরা করে না। অধিপতিগুলিকে তারপরে সমান দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ঘন্টানুযায়ী সাজায়।

এই ঘণ্টার নাম 'হোর'। নাম থেকে মনে হয় যে ওরা এর দ্বারা এমন ঘণ্টা বোঝাতে চায় যার দৈর্ঘ্য রাত্রি ও দিনে সমান থাকে না। আমরা যাকে 'নিমবহর' (نیمبهر=media signorum, রাশিচিহ্নের কেন্দ্র) বলি ওরা তাকেই 'হোর' বলে। আমার এ কথা বলার কারণ এই যে প্রত্যেক দিনে ও প্রত্যেক রাত্রিতে সর্বদাই ছয়টি রাশিচিহ্ন উদয় হয়। এখন ঘণ্টাকে যদি রাশিচিহ্নের কেন্দ্রের নামে অভিহিত করি তাহলে রাত্রি ও দিনে মোট ১২ ঘণ্টা হয়। কাজেই হোরাধিপতি নামে যে ঘণ্টা ধরা হয়, তা উপরোক্ত অসমান ঘণ্টা, যা আমাদের দেশেও ব্যবহার হয়, এবং সেজন্য astrolabe-এর গায়ে চিহ্নিত করা থাকে।

'করণতিলক' অর্থাৎ প্রাথমিক পঞ্জিকা নামিত গ্রন্থে বিজয়ানন্দ যেখানে বৎসর ও মাসের অধিপতি নির্ণয় করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, সেখানে তাঁর উক্তি থেকে আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলছেন: 'হোরাধিপতি নির্ণয় করার জন্য, সূর্যোদয় থেকে যে সব রাশিচিহ্ন চক্রের উচ্চতম বিন্দুতে উঠেছে, তাদের মোট মিনিটের সংখ্যা যোগ দিয়ে, যোগফলকে ৯০০ দিয়ে ভাগ দাও। তারপর এই ভাগফলকে অহোরাত্রের অধিপতি থেকে গ্রহমণ্ডলীর উপর থেকে নীচের পরম্পরা অনুযায়ী বাদ দিয়ে যাও। তুমি শেষে যা পাবে, সেইটিই হোরাধিপতি।' বিজয়ানন্দের বলা উচিত ছিল 'ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করে মোট সংখ্যাকে অহোরাত্রের অধিপতি থেকে বাদ দাও।' আর যদি প্রথমেই রাশিচিহ্নগুলি কত বিষুবীয় ডিগ্রি পার হয়েছে তার সমষ্টি গণনা করতে বলতেন, তাহলে তার বর্ণিত পদ্ধতি থেকে সমান দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ঘণ্টা পাওয়া যেত।

২১০ ওরা এই অসমান ঘণ্টা বা হোরের কতকগুলি পৃথক নামকরণ করেছে। নীচে আমি সেগুলিকে একত্রিত করেছি। অনুমান করি, এ নামগুলি ধ্রুব গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

হোর সংখ্যা	দিবসের হোরের নাম	শুভাশুভ	রাত্রির হোরের নাম	শুভাশুভ
১	রৌদ্র	অশুভ	কালরাত্রি	অশুভ
২	সৌম্য	শুভ	রোধিনি	শুভ
৩	করাল	অশুভ	বৈরম্ম	শুভ
৪	স্থ	শুভ	ত্রাসিনি	অশুভ
৫	বেগ	শুভ	গুহনি (?)	শুভ
৬	বিশাল	শুভ	মায়া	অশুভ
৭	মৃত্যুসার	অশুভ	দয়রি	শুভ
৮	শুভ	শুভ	জীবহারিনি	অশুভ
৯	ক্রুর	শুভ	শুধনি	অশুভ
১০	চণ্ডাল	শুভ	বৃক্ষি	শুভ
১১	কৃত্তিক	শুভ	দংরি (?)	অশুভতম
১২	অমৃত	শুভ	চাণ্ডিম (?)	শুভ

'বিষ্ণুধর্মে' সর্পের বিবরণ প্রসঙ্গে 'নাগ কুলিক' নামের একপ্রকার সর্পের কথা বলা হয়েছে। গ্রহাদির ঘণ্টার কয়েকটি বিশেষ অংশ এই নাগের অধীন। সেই অংশগুলি অশুভ, সেই সময়ে ভুক্ত আহার্য ক্ষতিকর ও নিষ্ফল হয়। ঐ সময়ে বিষ দিয়ে রোগের চিকিৎসায় রোগ দূর হয় না, রোগীর প্রাণ বিয়োগ ঘটে, সর্প দংশনের কোনও মন্ত্র-ই তখন কার্যকরী হয় না, কারণ মন্ত্রে গরুড়ের নামোচ্চারণ করতে হয়, কিন্তু সে সময়ে তার নাম-মাহাত্ম্য ত দূরের কথা, গরুড় স্বয়ংও কিছু সাহায্য করতে পারে না।

২৯১ নীচের সারণিতে প্রত্যেক ঘণ্টাকে ১৫০ অংশে ভাগ করে সেই ভাগের মোট সংখ্যা দিয়ে অশুভ সময়গুলি দেওয়া হয়েছে।

হোরাধিপতি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
কুলিকের ঘণ্টারম্ভ হবার পূর্ববর্তী ভাগের সংখ্যা	৬৭	৭১	·	·	১৭	২৪৪	৮৬
কুলিক প্রভাবিত ঘণ্টার ভাগ সমূহের সংখ্যা	১৬	৮	৩৮	২	২ ১ ২	৬	৬৪

পঁয়ত্রিশ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের বর্ষ মাসাদি

প্রাকৃতিক মাস হচ্ছে চন্দ্রের এক সংযোগ (অমাবস্যা) থেকে অন্য সংযোগ পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ। এই মাসকে প্রাকৃতিক বলা হয় এজন্য যে এর অবস্থার সঙ্গে প্রাকৃতিক বস্তুর সাদৃশ্য আছে, অনস্তিত্বের মত অবস্থা থেকে যার আরম্ভ, প্রসার, ক্রমবৃদ্ধি ও সম্পূরণ হয়, পরিণতির শিখরে পৌঁছে নীচে নামতে থাকে এবং ক্ষয় ও হ্রাস পেতে পেতে যে আবার অনস্তিত্বে প্রত্যাবর্তন করে। চন্দ্রের আলোকও এই প্রকারে তার দেহে বিস্তৃত হয়ঃ অমানিশার পর চন্দ্র ক্ষীণ বক্ররেখার মত দৃশ্যমান হয়, পরে তৃতীয়া এবং অবশেষে পূর্ণ শশীরূপে প্রকাশ হয়; তৎপর ঐ সব অবস্থার মধ্য দিয়ে আবার শেষ (অমাবস্যার পূর্ব) রাত্রির অবস্থায় ফিরে যায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিচারে সে অবস্থা হচ্ছে অনস্তিত্বের মত। অমানিশাতেও যে চন্দ্র অবশিষ্ট থাকে, তা সকলেই জানে কিনা সন্দেহ। চাঁদের আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও সূর্যের বিশালতা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে চন্দ্রের আলোকিত ভাগ তার অন্ধকার ভাগের চেয়ে অনেক গুণ বড় এবং এই হচ্ছে পূর্ণিমা কিছুকাল স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ।

আর্দ্রবস্তুকে যে চন্দ্র প্রভাবিত করে এবং জোয়ার-ভাটার কালানুক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধি (periodical) যে চাঁদের নিজস্ব কালানুক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধির অধীন, এসব তথ্য সমুদ্রোপকূলবর্তী লোকদের জানা আছে। তেমনি, চিকিৎসাবিদরাও জানে যে রোগীদের ধাতের উপর চাঁদের প্রভাব আছে এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি চন্দ্রের দশান্তরকে 'অনুবর্তন' করে। পদার্থবিদরাও জানে যে জীবজন্তু ও গাছপালার জীবনও চন্দ্রের সংগে যুক্ত। অভিজ্ঞ লোকমাত্রই জানে যে চন্দ্র মস্তিষ্ক, মজ্জা ও ডিম্বকে প্রভাবিত করে, পানপাত্র ও কুম্ভে রক্ষিত মদ্যের তলানী ও গাদকে দুষ্ট করে। চন্দ্রালোকে নিদ্রিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা আনে এবং সুতী বস্ত্রকে নষ্ট করে। শশা, তরমুজ ও তুলার উপরে কি রকম প্রভাব, কৃষকেরা জানে, এমন কি, বীজ বপন, রোপণ, গাছের কলম কাটা, গবাদি পশুর জন্য গোসালা নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজের সময়ও ওরা

চন্দ্রের দশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে থাকে। আর, জ্যোতিষীরা ত' জানেই যে আবর্তন-পথে চন্দ্রের বিভিন্ন দশার উপর বায়ুমণ্ডলের ঘটনাবলী নির্ভর করে।

এই হোল মাস। এর বারটিতে এক বছর হয়, যাকে সাধারণতঃ চান্দ্রবৎসর বলা হয়।

আর প্রাকৃতিক বৎসর হোল ক্রান্তিবৃত্তে (فلک البروج) সূর্যের প্রত্যাবর্তনকাল। একেও 'প্রাকৃতিক বলা হয় এইজন্য যে ভূমি কর্ষণ থেকে নিয়ে শস্য কর্তন পর্যন্ত যে কৃষিকর্ম পুনঃপৌনিকভাবে চারি ঋতুর মধ্যে হ'তে থাকে, সে কর্মের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি এই বৎসরকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়। এই সময়ের মধ্যেই সূর্যগোলক থেকে বিচ্ছুরিত কিরণরশ্মি ও ছায়া-ঘড়ির ছায়া যে আকার, অবস্থা ও দিক থেকে পরিক্রমা আরম্ভ করে, ঠিক সেই-সব আকার, অবস্থা, ও দিকে আবার ফিরে যায়। চান্দ্রবৎসরের তুলনায় একেই বলে সৌরবৎসর। চান্দ্রমাস যেমন চান্দ্রবৎসরের ষড়াংশের অর্ধেক, তেমনই নীতিগতভাবে (in theory) সৌরবৎসরের বার ভাগের এক ভাগে এক সৌর-মাস হবে। এ ভাগ অবশ্য সূর্যায়নের মধ্যকগতি (mean) ধ'রে গণনা করা হয়। কিন্তু যদি আবর্তনের তারতম্য অনুযায়ী গণনা করা হয়, তাহলে এক একটি রাশিচিহ্নে সূর্যের অবস্থান কাল এক একটি সৌরমাস হবে।

২৯৩ এই দুই প্রকারের মাস ও বৎসর সর্বজনবিদিত। হিন্দুরা সংযোগকে 'অমাবস্যা' ও প্রতিযোগকে 'পূর্ণিমা' বলে, আর দুই চতুর্থাংশকে বলে আতবুহা (? اتوہ-atvh)। অনেকে চান্দ্রবৎসরের সাথে চান্দ্রমাস ও চান্দ্র দিবা-রাত্রিও গণনা করে, কিন্তু কেউ কেউ আবার চান্দ্রবৎসরের সাথে সৌরমাস ব্যবহার করে। সূর্যের রাশিচিহ্নে প্রবেশ করাকে ওরা সংক্রান্তি বলে। এই মিশ্রিত চান্দ্র ও সৌর কালের গণনা ওরা মোটামুটিভাবেই করে। কেননা সৌরকালের ব্যবহার যদি ওরা বরাবর করত, তাহলে চান্দ্রকালের ব্যবহার করতে ওদের আর আগ্রহ হোত না; তবে মিশ্রিত গণনাতে একটি সুবিধা এই যে তাতে অধিবর্ষ বা অধিদিবস নিবেশিত (intercalation) করার প্রয়োজন হয় না।

যারা চান্দ্রমাস ধরে গণনা করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংযোগ বা অমাবস্যা থেকে মাস আরম্ভ করে। তাই শাস্ত্রসম্মত। তবে কেউ কেউ আবার পূর্ণিমা বা প্রতিযোগ থেকে মাস গণনা আরম্ভ করে। আমি শুনেছি যে বরাহমিহিরও তাই করতেন, কিন্তু তাঁর কোনও পুস্তক থেকে একথার সত্যালতা যাচাই করতে আমি এখনও পারিনি। এই শেষোক্ত রীতি কিন্তু নিষিদ্ধ। তবে মনে হয়, এটি খুব প্রাচীন রীতি, কারণ বেদে আছে : 'লোকে বলে চন্দ্র

সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেহেতু মাসও সম্পূর্ণ হয়েছে। তারা আমাকে বা আমার তত্ত্ব জানে না বলেই একথা বলে, কারণ স্রষ্টা শুক্লপক্ষেই সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করেছিলেন, কৃষ্ণপক্ষে নয়'। সম্ভবতঃ একথাগুলি মানুষেরই উক্তি।

মাসের দিন গণনারম্ভ হয় অমাবস্যা থেকে। চান্দ্রমাসের প্রথম দিনকে ‘বরবুহ’ (? بربه-প্রতিপদ)* বলা হয়। প্রতিযোগ বা পূর্ণিমা থেকেও আবার ঐরূপ গণনারম্ভ হয়। মাসের দিনগুলি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা থেকে সমান দূরে থাকে, উভয় পক্ষের সেই দিনগুলির একই নাম হয় (তৃতীয়া, চতুর্থী, ইত্যাদি)। সেই দুই দিনে পক্ষ অনুযায়ী চাঁদের আলোক ও অন্ধকার হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ সমান থাকে এবং একপক্ষের সেই দিনে যে সময়ে চাঁদ ওঠে, অন্য পক্ষের ঐ দিনে ঠিক সেই সময়ে চাঁদ অস্তমিত হয়। এই সময় নির্ধারণ করার জন্য ওদের একটি নিয়ম আছে: মাসের যে কয়দিন অতীত হয়েছে তা যদি পনেরো অপেক্ষা কম হয়, তাহলে যে রাত্রির চন্দ্রের উদয়াস্তের সময় নির্ণয় করা উদ্দেশ্য সে রাত্রির ঘড়ির সংখ্যা দিয়ে তাকে গুণ কর। আর যদি অতীত দিনের সংখ্যা পনেরো অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে তার থেকে পনেরো বিয়োগ করে, বিয়োগ ফলকে উক্ত রাত্রির ঘড়ির সংখ্যা দিয়ে গুণ দাও। গুণফলে দুই যোগ কর এবং সমষ্টিকে ১৫ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল যা হবে তা ঐ মাসের প্রথম রাত্রির সংগে, উপরোক্ত রাত্রি শুক্লপক্ষের হলে,
২৯৪ চন্দ্র অস্তমিত হবার, আর কৃষ্ণপক্ষের হলে, চন্দ্রোদয় হবার ঘড়ি ও তার ভগ্নাংশের পার্থক্য।

এই গণনা পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রতিরাত্রে চন্দ্রের উদয় বা অস্তের সময়ে প্রথম রাত্রির সংগে দুই মিনিট করে তফাৎ হয় এবং রাত্রিগুলির দৈর্ঘ্যকালেও মোটামুটি প্রায় ৩০ মিনিটের পার্থক্য হয়। প্রত্যেক অহোরাত্রের জন্য ৩০ মিনিট ধরে তাকে তাঁর অর্ধেক অর্থাৎ ১৫ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেক অহোরাত্রের ভাগে ২ মিনিট করে পড়ে। তবে যেহেতু এই দুই মিনিট রাত্রির দৈর্ঘ্য পারস্পরিক পার্থক্যের সমান, সেহেতু অহোরাত্রের সংখ্যাকে রাত্রির পরিমাণ, অর্থাৎ ‘ঘড়ির অর্ধেককে ঐ বিশেষ রাত্রির ‘ঘড়ির’ মোট সংখ্যার অর্ধেক দিয়ে গুণ করলেই নিখুঁত হোত। এই দুই মিনিট তার সাথে যোগ করার কোনও লাভ নাই, কারণ এই দুই মিনিট কাল হচ্ছে চন্দ্রের প্রথম দৃশ্যমান হতে যে সময় লাগে তারই সমান। তবে, এই দুই মিনিট ধরে যদি মাসারম্ভ

* সিন্ধী ভাষায় পক্ষের প্রথম দিবসকে ‘বরথু’ বলে। আরবী প্রতিলিপিতে ‘বরথু’ برتو < ও بربه হওয়া-ও বিচিত্র নয়।

করা হয় তাহলে সে মিনিটকে সংযোগের (বা অমাবস্যার) সাথে যুক্ত করতে হয়।

যেহেতু বিভিন্ন দিবসের সমষ্টি দিয়ে মাস হয় সেহেতু দিবসের প্রকার ভেদে মাসেরও প্রকার ভেদ ঘটে। প্রত্যেক মাসে ৩০ দিন থাকে। কিন্তু সূর্যোদয়কে দিবসের প্রমাণজ্ঞাপক বলে ধরলে ওদের এক কল্পে চন্দ্রসূর্যের আবর্তনের হিসাব অনুযায়ী এক চান্দ্রমাস হয় ২৯$\frac{১৮২০০৫}{৫৫৬২২২}$ অহোরাত্রে। কল্পের মোট দিবসকে তার চান্দ্রমাসের সংখ্যা দিলে ঐ সংখ্যা পাওয়া যাবে। আর, কল্পের চান্দ্রমাসের সংখ্যা হচ্ছে চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তন সংখ্যার বিয়োগ ফল অর্থাৎ ৫৩,৪৩৩,৩০০,০০০। কিন্তু চান্দ্রদিনের হিসাব একমাস ৩০ দিনই ধরা হয়, কারণ ৩০ দিনে মাস গণনা করাই হচ্ছে রীতি, যেমন এক বৎসরে ৩৬০ দিন ধরা হয়।

সৌরমাস হয় ৩০$\frac{১৩,৬২৯৮৭}{৩১,১০,৪০০}$ 'সাবন' বা সৌরদিনে।

পিতৃগণের একমাস আমাদের ৩০ মাসের সমান; তাতে মোট সৌরদিবসের সংখ্যা হচ্ছে ৮৮৫$\frac{১৬·৪১০}{১৭৮,১১১}$

দেবগণের মাস ৩০ বৎসরের সমান; একমাসে ১০,৯৫৭$\frac{২৪১}{৩২০}$ 'সাবন' দিবস থাকে।

২৯৫ ৬০ কল্পে ব্রহ্মার একমাস হয়: তার মোট 'সাবন' দিবসের সংখ্যা হবে ৯৪, ৬৭৪,৯৮৭,০০০,০০০।

'পুরুষের' এক মাস হয় ২,১৬০,০০০ কল্পে। তাতে ৩৪০৮ ২৯৯, ৫৩২,০০০,০০০,০০০ 'সাবন' দিবস থাকে।

আর, 'ক'য়ের (K) মাসে থাকে ৯৪৯৭,৪৯৮,৭০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০ 'সাবন' দিবস।

বিভিন্ন প্রকারের এই সব মাসকে ১২ দিয়ে গুণ করলে তাদের মোট বাৎসরিক অহোরাত্রের সংখ্যা পাওয়া যাবে।

চান্দ্রবৎসরে ৩৫৪$\frac{৬৫৩৬৪}{১৭৪১১১}$ 'সাবন' দিবস থাকে। আর সৌরবৎসরে থাকে ৩৬৫$\frac{৮২৭}{৩২০০৯}$ দিবস।

পিতৃগণের বৎসরে থাকে ৩৬০ চান্দ্রমাস আর ১০৬৩১ $\frac{১৬৯১}{১৭৮১১১}$ 'সাবন' দিবস।

২৯৬
দেবগণের একবৎসর আমাদের ৩৬০ বৎসর কিংবা ১৩১৪৯৩ $\frac{৩}{৮০}$ 'সাবন' দিবসের সমান।

•

ব্রহ্মার একবৎসর হয় ৭২০ কল্প, কিম্বা ১,১৩৬,০৯৯,৮৪৪,০০০,০০০ 'সাবন' দিবসে।

আর পুরুষের এক বৎসরে থাকে ২৫,৯২০০০০ কল্প, কিম্বা ৪০,৮৯৯, ৫৯৪, ৩৮৪,০০০,০০০,০০০ 'সাবন' দিবস।

আর 'ক'য়ের বৎসরে থাকে ১১৩,৫০১,৯৮৪,৯০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০ 'সাবন' দিবস।

তবে ওদের গ্রন্থাদিতে লেখা আছে যে 'পুরুষের' অহোরাত্রের উপরে আর কোনও সংখ্যা যোগ করা যায় না, কেননা পুরুষই হচ্ছে আদি ও অন্ত, যার আদিমতার আদি নাই, নিত্যতার শেষ নাই। অন্য যে প্রকারের দিবসের সমষ্টি দিয়ে মাস ও বৎসর গণনা করা হয়, তা এমন সব জীব সম্বন্ধে প্রযোজ্য যাদের অবস্থান পুরুষের নীচে, এবং কালের দ্বারা যাদের সীমা নির্ধারিত। 'পুরুষের' দিবস ওদের একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশেষ, যা দিয়ে ওরা আত্মার উর্ধ্বে যা আছে তা বোঝাতে চায়। কারণ, কেবল বিন্যাসক্রম ছাড়া ওরা পুরুষ ও আত্মার মধ্যে আর কোনও প্রভেদ করে না। কতকটা সুফীদের উক্তি মত ওরা বলে যে 'পুরুষ' প্রথমতম নয়, কিন্তু আবার অন্য কিছুও নয়। বর্তমান মুহূর্ত থেকে সময়কে দুই দিকে লুপ্ত অতীত ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে কালের কল্পনা করা অবশ্য সম্ভব। এই কালের কোনও অংশকে যদি দিবস বলে নির্ধারিত করা সম্ভব হয়, তাহলে ঐ দিবসের সংখ্যা বাড়িয়ে সে কালের মাস ও বৎসর অনুমান করাও অসম্ভব নয়। তবে, হিন্দুদের এসব মাস-বৎসরাদি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য জীবনের বিশেষ কাল সম্বন্ধে তার প্রয়োগ করা, যার সূচনা হয় অস্তিত্ব থেকে এবং অবসান হয় ক্ষয় ও মৃত্যুর সংগে। পরম স্রষ্টা এই দুই অবস্থা থেকে মুক্ত। তেমনই ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি স্থূল
২৯৭ উপাদানগুলিরও কালানুক্রমিক অস্তিত্ব ও বিনাশ নাই। সেজন্য 'পুরুষের' দিবস অনুমান করেই আমরা ক্ষান্ত হই, তার চেয়ে দীর্ঘতর কালের কল্পনা আর করি না।

এখন আমার বক্তব্য, যে একান্ত অপরিহার্য নয় এমন বিষয় মাত্রেরই আলোচনায় ও শ্রেণীবিভাগে মতভেদ ও স্বেচ্ছাচারের অবকাশ থাকে এবং সিদ্ধান্তও দাঁড়ায় বহু প্রকারের। কতকগুলি সিদ্ধান্ত বিশেষ নিয়ম ও নীতির উপর দাঁড় করান হয়, আবার কতকগুলি কোনরূপ নীতির ধার-ই ধারে না। শেষোক্ত শ্রেণীতে এই উক্তিটি পড়ে, যার উৎস আমার স্মরণ নাই : '৩৩ হাজার মানব-বৎসরে সপ্তর্ষীর এক বৎসর হয়, ৩৬ হাজার মানবীয় বৎসরে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, আর ৯৯ হাজার মানবীয় বৎসরে মেরুর এক বৎসর হয়। ব্রহ্মার বৎসর সম্বন্ধে কিন্তু, আমি বলতে পারি যে দুই সৈন্য শ্রেণীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাসুদেব অর্জুনকে বলেছিলেন 'দুই কল্প ব্রহ্মার এক দিন হয়'। 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তে' উল্লিখিত পরাশর-পুত্র ব্যাসের উক্তি ও স্মৃতি গ্রন্থ মতে, এককল্পে 'দেবক' অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিন হয়, তার রাত্রির পরিমাণও এক কল্প। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ৩৬ হাজার মানবীয় বৎসরে ব্রহ্মার এক বৎসর হওয়ার উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি একেবারে ভ্রান্ত। তাছাড়া, ৩৬ হাজার বৎসরের নক্ষত্রপুঞ্জের এক আবর্তক সমাপ্ত হয়, কারণ তারা শত বৎসরে ক্রান্তিবৃত্তের মাত্র এক ডিগ্রি (১/১৬০) অতিক্রম করে। সপ্তর্ষীও এই নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত, তবে হিন্দুদের শ্রুতিশাস্ত্রে তাকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয় এবং পৃথিবী থেকে তার প্রকৃত দূরত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী দূরত্ব অনুমান করা হয়। সেজন্য সপ্তর্ষীতে যে সব গুণ ও অবস্থা আরোপ করা হয় তা তার প্রকৃত অবস্থা নয়। সপ্তর্ষীর বৎসর অর্থে যদি তার একটি সম্পূর্ণ আবর্তন ধরা হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায়, সপ্তর্ষীর গতি ক্ষিপ্রতর, কিন্তু কেনই বা তা হবে? এবং তার ক্ষেত্রে জ্যোতিষ্কমন্ডলীর নিয়মের ব্যতিক্রম-ই কেন হবে? আর মেরুর ত কোন আবর্তন-ই নাই যা তার বৎসর মনে করা যেতে পারে? এই সব প্রলাপ দেখে মনে হয় যে যিনি এ সিদ্ধান্ত (theory) করেছিলেন তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন নির্বোধকুল শিরোমণি, যিনি উপাসকদে ভক্তি উদ্রেক করানোর জন্যই এইসব বৎসর উদ্ভাবন করেছিলেন। বৎসরের সংখ্যাকে বিপুল করা ওাঁর আবশ্যক হয়েছিল, কেননা সংখ্যা যত বড় হবে শ্রদ্ধা-ও উদ্রেক করবে তত বেশী।

ছত্রিশ অধ্যায়

(সময়ের) 'মান' নামিত পরিমাপ চতুষ্টয়

'মান' বা 'প্রমাণের' অর্থ পরিমাণ। এই চার প্রকারের পরিমাণকে ইয়াকুব বিন্‌ তারিক্‌ তাঁর 'তরকীবুল আখ্‌লাক' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বিষয়টি ভাল করে বোঝেননি এবং নামেও কিছু ভুল করেছেন (অবশ্য লিপিকারের দোষে যদি তা না হয়ে থাকে)। এই চারটি 'মান' হচ্ছে:

'সৌরমান'=সূর্যের পরিমাণ,

'সাবন' মান=সূর্যোদয়ের পরিমাণ

'চান্দ্রমান'=

নক্ষত্রমান=চন্দ্রের নক্ষত্রে অবস্থানের (চন্দ্রপত্নী) মান।

প্রত্যেকটি মানের-ই পৃথক দিবস আছে, পরস্পরের সংগে তুলনা করলে তাদের প্রত্যেকের পরিমাণে পার্থক্য দেখা যাবে। অবশ্য সবেরই ৩৬০ দিনে বৎসর হয়। বর্তমান আলোচনায় 'সাবন' বা সূর্যোদয়ের দিবসকে অন্যান্য দিবসের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করছি।

আমরা জানি যে, এক সৌরবৎসরে ৩৬৫ $\frac{৮২৭}{৩২০০}$ সাবান' বা সূর্যোদয়ের দিন আছে। এই সংখ্যাকে ৩৬০ দিয়ে ভাগ করলে, কিম্বা ১০ সেকেন্ড

২৯৮ দিয়ে গুণ করলে এক সৌরদিনের পরিমাণ হয় ১ $\frac{৫৬০৯}{৫৮৪০০০}$ 'সাবান' দিবস।

'বিষ্ণুধর্ম' অনুসারে, এই সময়ের মধ্যে সূর্য তার 'ভুক্তি' (? بهكت Bhukti) অতিক্রম করে যায়।

'সাবন'মান অনুসারে যে সাধারণ বা মানব দিবস হয় তাকে-ই এখানে দিবসের একক (unit) হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে অন্যপ্রকারের দিবসের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

চান্দ্রমান অনুসারে নির্ধারিত যে দিবস হয় তাকে 'তিথি' বলে। চান্দ্রবৎসরকে ৩৬০ দিয়ে, কিম্বা চান্দ্রমাসকে ৩০ দিয়ে ভাগ দিলে এক চন্দ্রদিবসে $\frac{১০,৫১৯,৪৪০}{১০,৬৮৬,৬৬০}$ মানব দিবস হয়।

'বিষ্ণুধর্মে' আছে যে এই সময়ের মধ্যে সূর্য থেকে বহু দূরে থাকার দরুনে চন্দ্র দৃশ্যমান হয়।

আর 'নক্ষত্রমান' হোল তার সাতাশ নক্ষত্রের (পত্নী) মধ্য দিয়ে চন্দ্রের অতিক্রমণকাল অর্থাৎ $২৭\frac{১১,২৫৯}{৩৫,০০০}$ দিবস

এক কল্পের সর্বমোট দিবসকে চন্দ্রের মোট আবর্তন সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে এই সংখ্যা পাওয়া যাবে। এই কাল পরিমাণকে যদি আবার ২৭ দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় তাহলে চন্দ্রের একটি নক্ষত্র অতিক্রম করার সময় দাঁড়ায় $১\frac{৪১৭}{৩৫০২}$ 'সাবান' দিবস। চান্দ্র মাসের বেলায় যেমন আমরা করেছি তেমনই আবার এই সংখ্যাটিকে ১২ দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই $৩২৭\frac{১৫০৩১}{১৭,৫০১}$ সূর্যোদয় বা 'সাবন' দিবস (অর্থাৎ চন্দ্রের ১২ চন্দ্রপত্নীগণকে পরিক্রমণ করার সময় কাল)। আর প্রথমোক্ত একবার নক্ষত্র অতিক্রম করার সময় $\left(২৭\ \frac{১১২৫৯}{৫০০২}\right)$কে যদি ৩০ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে এক নাক্ষত্র দিনের পরিমাণ হয় $\frac{৩১৮৭৭১}{৩৫০,০২০}$ সূর্যোদয় ('সাবন') দিন। তবে, 'বিষ্ণুপুরাণ' মতে নাক্ষত্র মাস সাতাশ দিনের হয়, কিন্তু অন্যান্য 'মানের' মাসগুলি সব-ই তিরিশ দিনের। নাক্ষত্র মাসের এই হিসাব ধরলে নাক্ষত্র বৎসর হবে $৩২৭\frac{১৫,০৫১}{১৭৫০২}$ দিনের।

২১১ 'কল্প', চতুর্যুগের ও জন্মকালের বৎসর গণনায় এবং বিষুব, ক্রান্তিদ্বয় (استوائين و انقلابين Equinoxes and solstices) ঋতু ও অহোরাত্রের দিবা ও রাত্রি ভাগের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য সৌরমানের ব্যবহার হয়, কেননা এ সব-ই সৌর বৎসর মাস ও দিবস অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হয়। আর চান্দ্রমাসের ব্যবহার হয় একাদশ 'করণ', অধিমাস, (شهور الكبيسة) 'ঊনরাত্র' ও গ্রহণ কালের সংযোগ-প্রতিযোগ (অমাবস্যা-পূর্ণিমা) নির্ণয়ের জন্য। এই সব ব্যাপার চান্দ্র বৎসর ও মাস এবং 'তিথি' নামক চান্দ্র দিনের হিসাবে স্থির করা হয়।

যে সব ব্যাপার 'সাবন' মান অনুযায়ী নির্ণীত হয় তা এই: সপ্তাহের 'বার', অহর্গন অর্থাৎ অব্দের দিবস সংখ্যা (ايام التواريخ), বিবাহ ও উপবাসের দিবস, 'সূতক' (সূতিকা) (অর্থাৎ গর্ভস্রাবের কাল), মৃত ব্যক্তির

গৃহ ও তৈজস পত্রাদির অশৌচকাল, চিকিৎসা—অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী যে সব মাস ও বৎসরে বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়, 'প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপস্খালনের জন্য ব্রাহ্মণেরা যে সব দিবসে উপবাস পালন ও শরীরে ননী ও গোময় লেপনের বিধান দেয়।

এ সব ব্যাপারে 'সাবন' মান অনুসারে দিনক্ষণ স্থির করা হয়।

নাক্ষত্র মান দিয়ে কিন্তু ওরা কিছু-ই নির্ণয় করে না, কারণ এ 'চান্দ্রমানেই'এই অন্তর্ভুক্ত।

সময়ের যে কোনও অংশকে কোন জাতি বা সমাজ সর্বসম্মতিক্রমে দিবস নামে অভিহিত করা স্থির করলে সেই পরিমাণকে 'মান' বলা যেতে পারে। এই রকম আরও কতকগুলি দিবসের উল্লেখ পূর্বে (৩৩ পরিচ্ছেদ) করা হয়েছে। তবে যে চার প্রকার দিবসের বর্ণনা করে এ অধ্যায় শেষ করছি সেই কয়টি-ই হচ্ছে আসল 'মান'।

সাঁইত্রিশ অধ্যায়

মাস ও বৎসরের অংশাদি

ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের এক আবর্তনে বৎসর হয় সেজন্য বৎসরকেও বৃত্তের
৩০০ ভাগানুযায়ী ভাগ করা হয়। ক্রান্তি বিন্দু অনুযায়ী এই বৃত্তের দুইটি সমান ভাগ হয়; বৎসরেরও সেই রকম দুইটি সমান ভাগ হয়; প্রত্যেকটিকে 'অয়ন' বলা হয়। মকর ক্রান্তির বিন্দু অতিক্রম করলে পর সূর্য উত্তর মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সেজন্য বৎসরের এই প্রায় অর্ধেক ভাগকে উত্তর দিকের সঙ্গে যুক্ত করে 'উত্তরায়ণ' বলা হয়, অর্থাৎ সূর্যের মকর রাশি থেকে আরম্ভ করে ছয়টি রাশি অতিক্রম করার কাল। ক্রান্তিবৃত্তের এই অর্ধেক ভাগকে তাই 'মকরাদি'ও বলা হয়। আবার যখন সূর্য কর্কট ক্রান্তির বিন্দু অতিক্রম করে, তখন সে দক্ষিণ মেরুর দিকে যেতে থাকে, সেজন্য বৎসরের এই দ্বিতীয়ার্ধকে দক্ষিণের নামে 'দক্ষিণায়ন' বলা হয়, অর্থাৎ সূর্যের কর্কট রাশি থেকে আরম্ভ করে অন্য ছয়টি রাশি অতিক্রম করার কাল। এই অর্ধবৃত্তকে তাই 'কর্কটাদি' (ككر ان ককাদি) বলা হয়।

অশিক্ষিত জনেরা কেবল এই দুই বৎসরার্ধই ব্যবহার করে থাকে, কেননা এই ক্রান্তি দুইটি তাদের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ক্রান্তিবৃত্তকে আবার বিষুবলম্ব (Equatorial declination) অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এই বিভক্তি আরও বিজ্ঞানসম্মত। প্রথমোক্ত বিভক্তির তুলনায় এই দ্বিতীয়টি জনসাধারণের মধ্যে তেমন পরিচিত নয়, কারণ যুক্তি ও গণনার দ্বারা তার প্রমাণ হয়। এইরূপে নির্ধারিত প্রত্যেক বৃত্তার্ধকে 'কুল' বলা হয়। যার বিষুবলম্ব উত্তরের দিকে, তাকে উত্তর কুল, অথবা 'মেষাদি' আর যার বিষুবলম্ব দক্ষিণের দিকে তাকে দক্ষিণ কুল বা 'তুলাদি' বলা হয়।

এই দুই প্রকারের বিভক্তি অনুযায়ী, ক্রান্তিবৃত্তকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়; যে সময়ের মধ্যে সূর্য এই ভাগগুলি অতিক্রম করে, তাকে 'বাৎসরিক ঋতু' বলে। এই ঋতুগুলি হচ্ছে বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত। সূর্যের রাশিগুলিকেও এই চারি ঋতু অনুযায়ী ভাগ করে নেওয়া হয়। তবে, হিন্দুরা
৩০১ বৎসরকে চার ভাগ না করে ছয় ভাগে ভাগ করে থাকে; প্রত্যেক ভাগকে ওরা

'ঋতু' বলে; প্রত্যেক ঋতুতে দুই সৌরমাস থাকে, অর্থাৎ সূর্যের পরপর দুই-রাশি অতিক্রমণকাল। সবচেয়ে প্রচলিত তালিকানুসারে এই ঋতুগুলি ও তাদের অধিপতিদের যে নাম আমি পেয়েছি তা নীচে সন্নিবেশিত করা হোল। আমি শুনেছি, সোমনাথ অঞ্চলের লোক বৎসরকে তিন ভাগে ভাগ করে; প্রত্যেক চার মাসে এক ভাগ। প্রথম ভাগ 'বর্ষাকাল' যা আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ হয়, দ্বিতীয় 'শীতকাল' আর তৃতীয় 'উষ্ণকাল' অর্থাৎ গ্রীষ্ম।

উত্তরায়ণ (দেবগণের অধিকার)	ঋতুর রাশি	মকর ও কুম্ভ	মীন ও মেষ	বৃষ ও মিথুন
	নাম	শিশির	বসন্ত অথবা 'কুসুমাকর'	গ্রীষ্ম অথবা নিদাঘ
	অধিপতি	নারদ	অগ্নি	ইন্দ্ররাজ

বৃশ্চিক ও ধনু	কন্যা ও তুলা	কর্কট ও সিংহ	ঋতুর রাশি	দক্ষিণায়ন (পিতৃগণের অধিকার)
হেমন্ত	শরদ	বর্ষাকাল	নাম	
বৈষ্ণব	প্রজাপতি	বিশ্বদেব	অধিপতি	

আমার ধারণা যে ওরা ক্রান্তিবৃত্তের এমন এক কোণ ধরে ভাগ করতে আরম্ভ করে যার দ্বারা ক্রান্তিবিন্দুদ্বয় থেকে আরম্ভ করে বৃত্তের পরিধি ছয় সমান ভাগে বিভক্ত হয়; ভাগটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের (radius) সমান। এই-জন্য ওরা বৃত্তের ষষ্ঠাংশ ধরে বৎসরের ঋতুকাল নিরূপণ করে। আমার এ অনুমান সত্য হলে, আমাদের স্মরণ করা উচিত যে আমরাও মাঝে মাঝে বৃত্তকে এইভাবে ভাগ করে থাকি, কখনও দুই ক্রান্তিবিন্দু ধরে, আবার কখনও
৩০২ দুই বিষুব বিন্দু ধরে; তাছাড়া, আমরা চার ভাগের সাথে বৃত্তের বার ভাগও করে থাকি।

প্রত্যেক মাসও দুই ভাগে বিভক্ত, অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা, আর পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা। বিভিন্ন মাসের প্রত্যেক অর্ধভাগের (পক্ষ) অধিপতিদের নাম 'বিষ্ণু ধর্মে' দেওয়া হয়েছে; নামগুলি আমি নিম্নে তালিকাবদ্ধ করছি।

মাসের নাম	প্রত্যেক মাসের শুক্লার্ধের অধিপতি	প্রত্যেক মাসের কৃষ্ণার্ধের অধিপতি
চৈত্র	দ্বরতর (? তৃষ্টী ?)	যম্য
বৈশাখ	ইন্দ্রাগ্নি	আগ্নের
জ্যৈষ্ঠ	শুক্র	রৌদ্র
আষাঢ়	বিশ্বদেব	সর্প
শ্রাবণ	বিষ্ণু	পিতৃ
ভাদ্রপদ	অজ্ঞ	শাস্ত্র (শাস্ত)
অশ্বয়ুজ্য	আসন	মৈত্র
কার্তিক	অগ্নি	সক্র (?)
منكهر) মার্গশীর্ষ	সোম্য	নিঋতি
পৌষ	জীব	বিষ্ণু
মাঘ	পিতৃ	রজন
ফাল্গুন	ভগ	পুষন

আটত্রিশ অধ্যায়

দিবসের সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত ব্রহ্মার আয়ু ও অন্যান্য কালপরিমাণ

৩০৩ দিনকে 'দিমস' (دمس)—শুদ্ধ ভাষা 'দিবস'—বলা হয়; আর রাতকে বলা হয় 'রাত্রি'। দিবারাত্রের নাম 'অহোরাত্র'। ৩০ 'অহোরাত্র'কে মাস বলে এবং মাসার্ধের নাম পক্ষ। প্রথমার্ধকে শুক্লপক্ষ বলা হয়, কারণ সে সময়ে মানুষ নিদ্রিত হওয়া পর্যন্ত রাত্রিতে চন্দ্রালোক থাকে এবং চন্দ্রের আলোকিত কলেবর বৃদ্ধি পেতে আর অন্ধকার ভাগ ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধকে বলা হয় কৃষ্ণপক্ষ। কারণ সে সময়ে রাত্রির প্রথম ভাগ অন্ধকার থাকে, মানুষ নিদ্রিত হলে পর চন্দ্রালোক প্রকাশ পায়। তখন চন্দ্রের আলোকিত ভাগ কমে এবং অন্ধকার ভাগ বাড়তে থাকে।

দুই মাস কালকে 'ঋতু' বলা হয়। এ অবশ্য আনুমানিক বিভাগ। কারণ যে মাসের দুইপক্ষ ধরা হয় তা চান্দ্রমাস, অথচ যে দুই মাস কালকে ঋতু বলে তা হচ্ছে সৌরমাস। ছয় ঋতুতে মানুষের এক সৌরবৎসর হয়। এ বৎসরকে 'বরহ', (برہ) 'বর্‌খ্' ও 'বর্ষ' বলে। হিন্দুদের উচ্চারণে হ, খ, ও ষ, এই তিনটি অক্ষর প্রায়ই বদলে যায়।

৩৬০ মানবীয় বৎসরে দেবতাদের এক বৎসর হয়, তার নাম 'দিব্য-বরহ'। সবাই একমত যে ১২০০ 'দিব্যবর্ষে' এক 'চতুর্যুগ' হয়। কেবল চতুর্যুগের অন্তর্গত যুগ এবং 'মন্বন্তর' ও 'কল্প' নামক যুগ সমষ্টির যুগসংখ্যা নিয়ে কিছু মতানৈক্য আছে। বিষয়টি যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

দুই 'কল্পে' ব্রহ্মার একদিন। দুই 'কল্প' বলাও যা, আর ২৮ মন্বন্তর বলাও তাই, কারণ ৩৬০ ব্রাহ্ম দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, অর্থাৎ ৭২০ 'কল্প', কিম্বা ১০০৮০ 'মন্বন্তর'। ওরা বলে ব্রহ্মার আয়ু ১০০ 'ব্রাহ্ম' বৎসর, অর্থাৎ ৭২,০০০ 'কল্প', কিম্বা ১০০৮০০০ 'মন্বন্তর'।

৩০৪ বর্তমান অধ্যায়ে বিষয়টির আলোচনা এই পর্যন্তই করা গেল। 'বিষ্ণু ধর্মে' 'বজ্র' নামক এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয়র উক্তি লেখা আছে: 'কল্প হচ্ছে ব্রহ্মার দিবাভাগ, তাঁর রাত্রিও আর এক 'কল্প'। সেজন্য ৭২০

কল্পে তাঁর এক বৎসর হয় এবং এরূপ শত শত বৎসর তাঁর আয়ুষ্কাল। এই শত বৎসরে 'পুরুষে'র একদিবস হয়; তাঁর রাত্রিও আর একশত ব্রহ্ম বৎসর। 'পুরুষের' পূর্বে কত ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়েছে, তা কেউ জানে না, গংগার বালুকণা বা বৃষ্টির বারিবিন্দু গুণতে যে পারে, একমাত্র সেই তা জানতে পারে।'

ঊনচল্লিশ অধ্যায়

ব্রহ্মার পরমায়ু অপেক্ষা দীর্ঘতর কালের পরিমাণ

কোনও বিষয় শৃংখলারহিত, কিম্বা পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মের বিরোধী হলে তার আলোচনায় মন বীতরাগ হয় এবং শ্রুতিকটু ঠেকে। কিন্তু হিন্দুরা এমন এক জাতি যারা বহু নাম ব্যবহার করে থাকে, তার সবই, ওদের ধারণা মতে সেই এক ও আদির প্রতি প্রযুক্ত হয়, কিম্বা তার অধস্তন অন্য কোনও এক সত্তার প্রতি ইংগিত করে। বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়ের মত কোনও প্রসঙ্গ উপস্থিত হলে ওরা সেই সব নামকে বহুসংখ্যক সত্তা হিসাবে ধরে নিয়ে নামগুলির পুনরুক্তি করে থাকে, তাদের পরমায়ু নির্দিষ্ট করে এবং তা করতে গিয়ে বিরাট বিরাট সংখ্যার উদ্ভাবন করে। সংখ্যার বিপুলতাই ওদের আসল উদ্দেশ্য; ময়দান ত' উন্মুক্ত, আর সংখ্যাগুলিরও নিজস্ব স্থিতি নাই, যেমন ইচ্ছা বসালেই হোল। তাছাড়া এমন কোনও একটি বিষয় নাই যাতে হিন্দুরা সবাই একমত। সে কারণে আমরা যে তাদের অভ্রান্ত রীতিকে অনুসরণ করব, তাও সম্ভব নয়। বরঞ্চ, 'প্রাণের' চেয়ে ক্ষুদ্রতর দিবসের ভাগ সম্বন্ধে ওদের মধ্যে যে মতভেদ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান বিষয়েও সেইরূপ মতভেদ আছে।

উৎপলকৃত 'শ্রুধব' গ্রন্থে লেখা আছে: 'এক মন্বন্তর ইন্দ্ররাজের জীবৎ-কাল, ২৮ মন্বন্তরে পিতামহ, অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিন হয়। তাঁর আয়ুষ্কাল শত বৎসর, যা 'কেশবে'র একদিন। 'কেশবে'র আয়ু শত বৎসর যা মহাদেবের এক দিনের সমান। মহাদেবের পরমায়ুও শত বৎসর অর্থাৎ ঈশ্বরের একদিন; 'ঈশ্বর' ভগবানের নিকটতম সত্তা। ঈশ্বরের আয়ু শত বৎসর যা 'সদাশিবের' একদিন। সদাশিবের আয়ু শত বৎসর অর্থাৎ অনন্ত নিরঞ্জনের (نیرنجن) একদিন, প্রথমোক্ত পঞ্চসত্তা লোপ পাওয়ার পরও যিনি চিরকাল বিরাজ করবেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ৭২০০০ 'কল্প'। এখানে আমরা যে সংখ্যা উল্লেখ করব তা সবই 'কল্প' সংখ্যা।

ব্রহ্মার পরমায়ু যদি কেশবের একদিন হয়, তাহলে কেশবের ৩৬০ দিনের বৎসর ২৫,৯২০,০০০ কল্প হবে এবং তাঁর আয়ুষ্কালও সেই হিসাব মতে, ২৫৯২,০০০,০০০ কল্প হবে। শেষোক্ত কল্প-সমষ্টিতে মহাদেবের একদিন হয়। তাঁর পরমায়ু তাহলে ৯৩,৩১২,০০০,০০০ কল্প হবে। এই কল্প সংখ্যায় আবার 'ঈশ্বরের' একদিন হয়; তাহলে তাঁর আয়ুষ্কাল হবে ৩৩৫৯, ২৩২,০০০,০০০,০০০,০০০ কল্প, কিম্বা সদাশিবের একদিন। সেই হিসাবে সদাশিবের আয়ুষ্কাল হবে ১২০,৯৩২,৩৫২,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কল্প। এই কল্প সংখ্যায় আবার নিরঞ্জনের একদিন হয়, যার তুলনায় পরার্ধকল্প তার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

আসল ব্যাপার যাই হোক না কেন, এই গণনা পদ্ধতির আগাগোড়াই দিবস ও শতাব্দীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

অন্যেরা কিন্তু আমাদের পূর্বোল্লিখিত অহোরাত্রের ক্ষুদ্রাংশকে তাদের গণনার ভিত্তি করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, এরা গণিত বিষয়বস্তু নিয়েই মতভেদ পোষণ করে তাই নয়, যা দিয়ে গণনা করে সে সম্বন্ধেও এদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এই রকম একদলের রচিত কাল বিন্যাসের নমুনা এখানে দিচ্ছি, যারা নিম্নলিখিত পরিমাণবিধি অনুসরণ করে :

১ ঘড়ি=১৬ 'কল'
১ 'কল'=৩০ 'কাষ্ঠা'
১ কাষ্ঠা=৩০ নিমেষ'
১ নিমেষ=২ 'লব'
১ লব=২ 'ত্রুটি'

এইরূপ সময় বিভাগের কারণ হিসাবে ওরা বলে যে শিবের দিবস এইরূপ সময়াংশ নিয়েই সম্পূর্ণ হয়। যথা, ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল 'হরি' অর্থাৎ বাসুদেবের এক 'ঘড়ি'; বাসুদেবের আয়ুষ্কাল শত বৎসর, কিম্বা রুদ্র-মহাদেবের এক 'কল'; মহাদেবের আয়ু শত বৎসর, কিম্বা ঈশ্বরের এক 'কাষ্ঠা';
৩৬০ ঈশ্বরের পরমায়ু শত বৎসর, কিম্বা সদাশিবের এক 'নিমেষ'; সদাশিবের আয়ুষ্কাল শত বৎসর, অথবা শক্তির এক 'লব'; আর শক্তির আয়ুষ্কাল শত বৎসর, কিম্বা শিবের এক 'ত্রুটি'।

এখন, ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ৭২০০০ কল্প হলে নারায়ণের আয়ুষ্কাল হবে ১৫৫,৫২০,০০০,০০০ কল্প; রুদ্রের আয়ুষ্কাল হবে ৫,৩৭৪,৭৭১,২০০,০০০ ০০০,০০০; ঈশ্বরের আয়ুষ্কাল হবে ৪৫,৫৭২,৭৬২,৭৮০,৭৬০,০০০,০০০,০০০

০০০,০০০,০০০; সদাশিবের আয়ুষ্কাল হবে ১৭৩,৩২৮,৯৯২,৭১৪,০৯৬, ৬৪০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, আর শক্তির আয়ুষ্কাল হবে ১০,৭৮২, ৪৪৯,৯৭৮,৭৫৮,৫২৩,৭৮১, ১২০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০। এই শেষের অংকটি হচ্ছে এক বুটি।

এই পরিমাণ অনুযায়ী এক দিবস হিসাব করলে তাতে ৩৭২৬৭,১৪৭, ১২৬,৫৮৯, ৪৫৮, ১৮৭,৫৫০,৭২০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০ কল্প হবে। এই কল্প সংখ্যা শিবের একদিন, যাকে ওরা অনন্ত (জনন ও প্রজনন রহিত) সৃষ্ট বস্তুর সমুদয় গুণের ঊর্ধ্বে বলে বর্ণনা করে। শেষোক্ত সংখ্যায় ৪৬ সংখ্যা ক্রম বা পদ (order of number) আছে। এই বুদ্ধিমানরা যদি বর্ণনায় গঠিত অংকটি অনুধাবন করে দেখত, তাহলে সংখ্যায়নে এমন আতিশয্য করত না। তাদের প্রতিফলের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

চল্লিশ অধ্যায়

'সন্ধ্যা' অর্থাৎ দুই সময়াংশের সংযোগকারী ব্যবধান

প্রকৃত 'সন্ধ্যা' হচ্ছে দিবস ও রাত্রির মধ্যবর্তী কাল, অর্থাৎ উষা, যাকে ওরা 'সন্ধ্যোদয়' নামে অভিহিত করে, এবং সায়ংকাল (প্রদোষ), যার নাম 'সন্ধ্যা অস্তমান'। হিন্দুদের ধর্মাচরণের জন্য এই সন্ধ্যাদ্বয়ের প্রয়োজন হয়, ব্রাহ্মণদের তখন স্নান করতে হয়; দুই সন্ধ্যার অন্তর্বর্তী দ্বিপ্রহরে ও আহারের সময় স্নান করতে হয়। ব্যাপারটি যে জানে না একথা থেকে তার ধারণা হবে যে এটি আর এক তৃতীয় সন্ধ্যা, কিন্তু যে জানে সে মাত্র দুইটি সন্ধ্যাই ধরবে।

৩০৭ পুরাণাদিতে দৈত্যকুলের রাজা হিরণ্যকসিপুর কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে বহু তপস্যার ফলে বর লাভ করে হিরণ্যকসিপুর অমরত্ব চেয়েছিল। কিন্তু নিত্যতা পরম স্রষ্টার গুণ, সেজন্য তাকে কেবল দীর্ঘ জীবন দান করা হোল। প্রার্থিত বর না পেয়ে দৈত্যরাজ প্রার্থনা করল যেন তার মৃত্যু মানব, দেবতা বা দৈত্যের হাতে না ঘটে এবং স্বর্গ বা মর্তে, দিনমানে বা রাত্রিতে তার মৃত্যু না হয়। তার এরূপ শর্ত করার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুকে এড়ানো, যার থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নাই। তার এ ইচ্ছা পূরণ করা হোল। এ যেন ইব্লিসের (শয়তান) প্রার্থনা যে, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকতে দেওয়া হোক, কারণ সেই দিন সমস্ত প্রাণী পুনরুজ্জীবিত হবে। সেজন্য তাকে ঐ সুবিদিত দিন পর্যন্তই বেঁচে থাকবার অনুমতি দেওয়া হোল। ঐ দিন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সেটি দুঃখকষ্টের শেষ দিন।

হিরণ্যকসিপুর প্রহ্লাদ নামে একটি পুত্র ছিল। বয়োঃপ্রাপ্ত হলে তাকে শিক্ষকের হাতে দেওয়া হল। তার শিক্ষা কিরূপ হচ্ছে দেখার জন্য রাজা একদিন প্রহ্লাদকে ডেকে পাঠাল। বালক একটি গীত গেয়ে শোনাল যার অর্থ হচ্ছে, একমাত্র বিষ্ণুই সত্য আর সবকিছুই মায়া। একথা হিরণ্যকসিপুর মতের বিরোধী, কারণ সে বিষ্ণুকে শত্রু জ্ঞান করত। কাজেই সে প্রহ্লাদের শিক্ষক পরিবর্তনের আদেশ দিল, যাতে কে শত্রু কে মিত্র সে চিনতে পারে। কিছুদিন অতীত হবার পর প্রহ্লাদকে পুনরায় পরীক্ষা করা হলে বালক বললে : 'যা শিখতে আদেশ করেছিলে তা আমি শিখেছি, কিন্তু সে শিক্ষার আমার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা সমস্ত কিছুর সাথে আমার সমান মিত্রতা

আছে, কাউকে আমি শত্রু জ্ঞান করি না।' একথা শুনে তার পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বিষ পান করবার আদেশ দিল। আল্লাহর নাম নিয়ে সে বিষ পান করল ও বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগল। সেজন্য বিষে তার কোনও ক্ষতি হোল না। হিরণ্যকসিপু তখন বলল, 'তুমি কি যাদু বা মন্ত্রতন্ত্র জান?' বালক বলল, 'না, যে আল্লাহ্ তোমায় আমায় সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করেছেন।' রাজা তাতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার আদেশ দিল। কিন্তু সমুদ্র তাকে পুনরায় নিজ স্থানে ফিরিয়ে দিল। তাকে তখন রাজার সম্মুখে প্রকাণ্ড জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হোল। কিন্তু অগ্নি তাকে দগ্ধ করল না। অগ্নিশিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রহ্লাদ তার পিতার সংগে আল্লাহ (ঈশ্বর) ও তাঁর শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। আলোচনাক্রমে বালকের মুখ দিয়ে বেরুল যে, বিষ্ণু সকল স্থানেই আছেন। তার পিতা জিজ্ঞাসা করল, বিষ্ণু কি বারান্দার এই স্তম্ভের মধ্যেও আছেন? প্রহ্লাদ বলল, হাঁ। তার পিতা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে স্তম্ভে পদাঘাত করতে লাগল। তখন তার মধ্যে থেকে সিংহাসন নৃসিংহ আবির্ভূত হোল। তার আকৃতি মানুষের নয়, দেবতার নয়, দৈত্যেরও নয়। অনুচরসহ রাজা তখন নৃসিংহকে আক্রমণ
৩০৮ করে পরাভূত করার চেষ্টা করতে লাগল। তখনও দিনমান ছিল বলে নৃসিংহ তাকে প্রতি-আক্রমণ করল না। অবশেষে যখন দিবাবসান হয়ে এল এবং 'সন্ধ্যা' বা গোধূলিলগ্ন এল,—অর্থাৎ যখন দিন নয়, রাত্রিও নয়,—তখন নৃসিংহ হিরণ্যকসিপুকে ধরে শূন্যে নিক্ষেপ করে সেখানেই তাকে বধ করলে, অর্থাৎ স্বর্গেও নয়, মর্তেও নয়। প্রহ্লাদকে তারপর অগ্নি থেকে বের করা হোল এবং রাজ্য দেওয়া হোল।

হিন্দু জ্যোতিষীরাও এই দুই 'সন্ধ্যার' প্রয়োজন বোধ করে থাকে, কারণ ঐ সময়ে কতকগুলি রাশিচিহ্ন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। যথাস্থানে তার উল্লেখ আমি করব। তবে ওরা অত্যন্ত ভাসা-ভাসাভাবে 'সন্ধ্যা'র ব্যবহার করে, যেমন প্রত্যেক 'সন্ধ্যার' কালকে এক মুহূর্ত, অর্থাৎ দুই 'ঘড়ি' অথবা ৪৮ মিনিট বলে গণনা করে। জ্যোতিষশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান থাকার জন্য বরাহমিহির কিন্তু দিন ও রাত্রি ব্যতীত অন্য কোনও সময়বিভাগ ব্যবহার করেনি এবং 'সন্ধ্যার' ব্যাপারে জনসাধারণের মতানুসরণ করেনি। 'সন্ধ্যার' যা প্রকৃত অর্থ, তাই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ 'সন্ধ্যা' এমন এক মুহূর্তের নাম যখন সূর্যগোলকের কেন্দ্র পৃথিবীর দিগবলয়ের ঠিক উপরে অবস্থান করে। এই মুহূর্তকে বরাহমিহির কতক ঐসব রাশিচিহ্নের সর্বোচ্চ শক্তির সময় বলে ধরেছেন।

প্রাকৃতিক দিবসের এই 'সন্ধ্যাদ্বয়' ব্যতীত জ্যোতিষী ও অন্যান্য লোকেরা আরও কয়েকটি 'সন্ধ্যার' কল্পনা করেছে। এগুলি কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম বা পর্যবেক্ষণসম্ভূত নয়; কেবল অনুমানের (hypothesis) উপর এগুলি দণ্ডায়মান। যেমন, প্রত্যেক 'অয়নে' (অর্থাৎ) সূর্যের আরোহণ-অবরোহণের প্রত্যেক বৎসারার্ধ') একটি সন্ধি আরোপ করা হয়েছে: এ 'সন্ধ্যা'র কাল প্রত্যেক 'অয়নারম্ভের পূর্বের দিন। এ সম্বন্ধে আমার মনে একটা কথা উঠেছে যা নেহাৎ অসম্ভব নাও হতে পারে। কথাটি এই, যে সাতদিনের এই 'সন্ধ্যার' অনুমান খুব প্রাচীন নয় এবং সেকেন্দারব্দের ১৩শ শতাব্দীতে (৯৮৯ খৃঃ) এর ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, যখন ওরা বুঝতে পারল যে ক্রান্তির যে সময় ওরা হিসাব করে থাকে, আসলে ক্রান্তি তার পূর্বেই হয়ে থাকে। কেননা 'ক্ষুদ্র মানস' গ্রন্থ রচয়িতা পুঞ্জল বলেছেন যে, ৮৫৪ শককালে প্রকৃত ক্রান্তি তাঁর গণিত সময়ের ৬ ডিগ্রি ৫০ মিনিট পূর্বে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে গণিত সময়ের সাথে এই প্রভেদ প্রতি বৎসর এক মিনিট করে বাড়তে থাকবে। এটি এমন এক ব্যক্তির কথা যে, হয় নিজে পর্যবেক্ষণ করেছে নয়ত পূর্বসূরীদের পর্যবেক্ষণকে নিজে পুনঃ পরীক্ষা করে দেখেছে, যার ফলে এই বাৎসরিক প্রভেদ ধরতে পেরেছে।

৩০৯ অন্য লোকেও যে দ্বিপ্রাহরিক ছায়া ধরে এই প্রভেদ বা অনুরূপ হিসাবের গরমিল আবিষ্কার করেছে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই কাশ্মীরের উৎপল পুঞ্জলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

আমার এই অনুমানের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি এই যে, হিন্দুরা অয়নান্তের 'সন্ধ্যা'কে প্রত্যেকটি ঋতুর পূর্বে স্থাপন করে, যার ফলে প্রত্যেক ঋতুর আরম্ভ পূর্ববর্তী রাশিচিহ্নের ২০ ডিগ্রি থেকে ধরা হয়।

প্রত্যেক 'যুগ' ও প্রত্যেক মন্বন্তরের মাঝেও হিন্দুরা 'সন্ধ্যা'র কল্পনা করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ রীতি একান্তভাবে অনুমান-ভিত্তিক, সেহেতু এ নিয়ম থেকে যা কিছু প্রবর্তন করা যায়, তা-ও আনুমানিক। যথাস্থানে আমি এসব ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করব।

একচল্লিশ অধ্যায়

'কল্প' ও 'চতুর্যুগে'র (পারস্পরিক) ব্যাখ্যা

'দিব্যবৎসরের' দৈর্ঘ্য পূর্বেই বোঝান হয়েছে। বার হাজার দিব্যবৎসরে এক চতুর্যুগ হয় এবং এক হাজার চতুর্যুগে এক কল্প হয়। সময়ের এমন এক ভাগের নাম 'কল্প' যার আরম্ভে ও অন্তে মেষরাশির প্রথম ডিগ্রীতে সপ্তগ্রহ ও তাদের অপসূরক ও সম্পাতসমূহের সংযোগ হয়। কল্পের সমুদয় দিবসকে 'কল্প অহর্গণ' বলা হয়, কেননা 'অহ'-এর অর্থ দিবস, আর 'অরগণের' অর্থ সমুদয়। দিবসগুলি সূর্যোদয়ের বা 'সাবন' দিবস বলে 'পার্থিব দিবস'-ও বলা হয়, কারণ উদয় দিগন্ত থেকেই হয়ে থাকে এবং দিগন্ত হচ্ছে পৃথিবীর অপরিহার্য লক্ষণ। কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিগত দিবসসমূহকেও আবার ঐ নামে (কল্প অহার্গণ) অভিহিত করা হয়।

আমাদের মুসলমানদের মধ্যে 'কল্পের' ঐ দিবসগুলিকে 'সিন্দহিন্দের'
দিন বা 'জাগতিক দিন' নামে অভিহিত করা হয়। তার সংখ্যা হচ্ছে ১,৫৭৭,
৯১৬,৪৫০,০০০ 'সাবন' কিম্বা ৪,৩২০,০০০,০০০ সৌরবৎসর অথবা ৪,৪,৫২,
৭৭৫,০০০ চান্দ্র বৎসর, আর, ৩৬০ দিনের 'সাবন' বৎসর হিসাবে ৪,০৮৩,
৩১০ ১০১, ২৫০ বৎসর এবং 'দিব্য বৎসরের হিসাবে ১২,০০০,০০০ বৎসর হয়।

আদিত্যপুরাণে উক্ত হয়েছে : কল্পনা হচ্ছে, 'কল'—অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রজাতির অস্তিত্বকাল— আর 'পণ', যার অর্থ তাদের ক্ষয় ও বিনাশ—এই শব্দ-দ্বয়ের সমষ্টি থেকে উদ্ভূত। আর এই স্থিতি ও বিনাশের সমষ্টি হচ্ছে 'কল্প'।

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন : যেহেতু বিশ্বে গ্রহাদি ও মানুষের সৃষ্টি (অস্তিত্ব) হয় ব্রহ্মার দিবসের প্রথমভাগে এবং সেই দিবসের শেষভাগে তাদের বিনাশ হয়, সেহেতু ঐ দিবসকেই 'কল্প' হিসাবে ধরা কর্তব্য, অন্য কোন দিবসকে নয়। তিনি আরও বলেছেন, 'সহস্র চতুর্যুকে দেবকের অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিন হয়, তার এক রাত্রিও ঐরূপ দীর্ঘ। অতএব তার এক অহোরাত্র ২ হাজার চতুর্যুগের সমাণ।' পরাশর পুত্র ব্যাসও ঐরূপ উক্তি করেছেন। 'যে বিশ্বাস করে যে সহস্র চতুর্যুগে একদিন আর সহস্র চতুর্যুগে এক রাত্রি হয়, সে-ই ব্রহ্মাকে প্রকৃতরূপে চিনেছে।'

এক কল্পের ৭১ চতুর্যুগে এক 'মনু' অর্থাৎ 'মন্বন্তর' হয়। মন্বন্তর অর্থ মনুর আবির্ভাব ক্রম ১৪ মনুতে এক কল্প হয়। ৭১কে ১৪ দিয়ে গুণ করলে ১৪ মন্বন্তরে ৯৯৪ চতুর্যুগ হয় এবং কল্পের শেষ পর্যন্ত আরও ছয় চতুর্যুগ অবশিষ্ট থাকে। তবে এই ১৪ মন্বন্তরের প্রত্যেকটির আরম্ভে ও শেষের 'সন্ধি' নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে যদি অবশিষ্ট ছয় চতুর্যুগকে ১৫, অর্থাৎ মন্বন্তরের সংখ্যার চেয়ে এক সংখ্যা বেশী দিয়ে ভাগ দিই তাহলে ভাগফল হয় $\frac{2}{5}$। এখন, প্রথম মন্বন্তরের পূর্বে এই $\frac{2}{5}$ চতুর্যুগ যদি আমরা বসাই এবং পাশাপাশি প্রত্যেক দুই মন্বন্তরের মধ্যেও এইভাবে $\frac{2}{5}$ চতুর্যুগ বসিয়ে যাই, তাহলে ১৫ মন্বন্তরের পরে ১৫ ভাগে বিভক্ত উপরোক্ত ৬ চতুর্যুগের আর কোন ভগ্নাংশ বাকী থাকে না। এইভাবে কল্পের আরম্ভে ও শেষে যে ভগ্নাংশ থাকবে, তা হবে 'সন্ধ্যা' অর্থাৎ সংযোগকাল। যেমন উপরে বলা হয়েছে, 'সন্ধ্যা' সহ এক কল্পে এক হাজার চতুর্যুগ থাকে।

কল্পের প্রতিটি স্বতন্ত্র অংশ অন্য অংশের সাথে এক অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ, একটি অপরটিকে সপ্রমাণ করে। মহাবিষুব সংক্রান্তির রবি-
৩১১ বারে, রেবতিও নাই আশ্বিনিও নাই এমনস্থলে, অর্থাৎ তাদের মধ্যবর্তী ব্যবধানে সংঘটিত নক্ষত্রাদির অপদুরক ও সম্পাতের সংযোগকালে, চৈত্র মাসের প্রারম্ভে, যে মুহূর্তে সূর্য 'লংকার' উপরে উদিত হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে কল্পের আরম্ভ হয়। এই ঘটনা সমাবেশের কোন একটিরও ব্যতিক্রম হলে অন্য সবগুলি বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে কল্পারম্ভের লক্ষণ হিসাবে তাদের আর কোন মূল্য থাকে না।

কল্পের দিবস ও বর্ষসংখ্যা আমি উল্লেখ করেছি। তার থেকে দেখা যাবে কল্পের এক সহস্রাংশ হিসাবে এক চতুর্যুগে ১৫৭৭,৯১৬,৪৫০ দিবস এবং ৪,৩২০,০০০ বৎসর হয়। এই সংখ্যাগুলি থেকে কল্পের সংগে চতুর্যুগের সম্বন্ধ বোঝা যাবে এবং একটি দিয়ে অপরটি কেমন করে নির্ণয় করা যায় তা পরিষ্কার হবে।

অবশ্য এখানে যা বলা হোল, তা সবই ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত ও যুক্তিকে ভিত্তি করে। পুলিশ ও জ্যেষ্ঠ আর্যভট্ট ৭২ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর এবং ১৪ মন্বন্তরে এক কল্প গঠন করেছেন। কল্পের কোথাও তাঁরা 'সন্ধ্যা' যোগ করেননি। সুতরাং তাঁদের মতানুযায়ী এক কল্পে ১০০৮ চতুর্যুগ এবং ১২,০৯৬,০০০ দিব্যবর্ষ কিম্বা ৪,৩৫৪,৫৬০,০০০ মানব-বর্ষ থাকবে।

পলিশের মতে, এক চতুর্যুগে ১,৫৭৭,৯১৭,৮০০ সূর্যোদয়-দিবস আছে। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহলে, কল্পের মোট দিবস সংখ্যা হবে ১৫,৯০,৫৫১, ১৪২,৪০০। এই সংখ্যাই তিনি তাঁর গণনায় ব্যবহার করেছেন।

আর্যভট্টের রচনাবলীর কিছুই আমি পাইনি। তাঁর মতামত যতটুকু আমি জানতে পেরেছি তার সবই ব্রহ্মগুপ্তের উদ্ধৃতির মাধ্যমে। 'পঞ্জিকা-সমালোচনি' নামক তাঁর এক প্রবন্ধে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন যে, আর্যভট্টের মতে চতুর্যুগের মোট দিবসসংখ্যা ১,৫৭৭,৯১৭,৫,০০ অর্থাৎ পলিশের প্রদত্ত সংখ্যা থেকে ৩০০ দিবস কম। এই উক্তি অনুযায়ী আর্যভট্টের মতে এক কল্পে ১,৫৯০,৫৪০,৮৪০,০০০ দিবস হবে।

ব্রহ্মগুপ্তের মতানুযায়ী যে দিবসে কল্প ও চতুর্যুগ আরম্ভ হয়, আর্যভট্ট ও পলিশ উভয়েরই মতে তার পরবর্তী মধ্যরাত্রিতে তা আরম্ভ হয়।

৩১২ কুসুমপুরের আর্যভট্ট, যিনি জ্যেষ্ঠ আর্যভট্টেরই দলভুক্ত, তত্ত্ব সম্বন্ধীয় তাঁর এক পুস্তিকায় লিখেছেন যে ১০০৮ চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিনে হয়। তার প্রথমার্ধ অর্থাৎ প্রথম ৫০৪ চতুর্যুগ 'উৎসর্পিনি' নামে অভিহিত হয়। সেই সময়ের মধ্যে সূর্য উপরে উঠতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয় 'অবসর্পিনি'; তখন সূর্য অবরোহণ করতে থাকে। আর মধ্যকেন্দ্রকে বলা হয় 'সাম্য', কারণ তা দিবসের মধ্যভাগ, আর দুই প্রান্তকে বলা হয় 'দুরতম'।

দিবস ও কল্পের তুলনা হিসাবে যা বলা হয়েছে তা ঠিক, তবে সূর্যের আরোহণ-অবরোহণের কথাটি ঠিক নয়। সূর্য অর্থে যদি তিনি আমাদের দৃশ্যমান সূর্য বোঝাতে চেয়েছেন, তাহলে এই আরোহণ-অবরোহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল; আর যদি তিনি ব্রাহ্ম দিবসের বিশেষ সূর্যের কথা বলে থাকেন, তাহলে আমাদিগকে স্পষ্টভাবে তা বুঝিয়ে বলা বা ইংগিত করা উচিত ছিল। আমার যেন মনে হয়, এই দুটি শব্দ দিয়ে তিনি কল্পের প্রথমার্ধে বস্তুসমূহের বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি এবং দ্বিতীয়ার্ধে তাদের ক্রমাবনতি ও ক্ষয়ের কথা বলতে চেয়েছেন।

বিয়াল্লিশ অধ্যায়

চতুর্যুগের যুগ বিভাগ ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত

'বিষ্ণুধর্ম' গ্রন্থের লেখক বলেছেন : '১২০০ দিব্য বৎসরে এক যুগ হয়। তার নাম 'তিস্য'। তার দ্বিগুণে (২৪০০) হয় 'দ্বাপর' : তার তিনগুণে (৩৬০০ দিব্য বৎসরে) হয় 'ত্রেতা' এবং তার চতুর্গুণে হয় 'কৃত যুগ'। চারি যুগে মোট ২২০০০ দিব্য বৎসর হয়, যাকে চতুর্যুগ, অর্থাৎ চারিযুগের সমষ্টি
৩১৩ বলা হয়'।

গ্রন্থকার আরও বলেছেন : '৭১ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর, আর এক 'কৃত যুগের' সমান দীর্ঘ প্রত্যেক দুই মন্বন্তরের মধ্যবর্তী 'সন্ধ্যা'সহ ১৪ মন্বন্তরে এক 'কল্প' হয়। দুই কল্পে ব্রহ্মার এক 'অহোরাত্র' হয়। এইরূপ শত বর্ষে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। এই আয়ুষ্কাল আবার পুরুষের এক দিবস যার আদি বা অন্ত জানা নাই।'

ঐ গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে : 'আদ্যকালে সলিলাধিপতি বরুণ, যিনি এসব তত্ত্ব সম্যকরূপে জানতেন, দশরথ পুত্র রামকে যা বলেছিলেন, তা এই। ভার্গব ও, যাকে মার্কণ্ডেয় বলা হয়, এই তথ্য পরিবেশন করেছেন। সময়-তত্ত্বের জ্ঞান তাঁর এত গভীর ছিল যে সংখ্যা গণনায় কেউ তাঁকে কখনও পরাস্ত করতে পারেনি। হিন্দুদের চোখে মার্কণ্ডেয় মৃত্যু-দূতের মত, যে অপরিদৃশ্য তার ফলক দেখে দেখে সকলকে বিনাশ করে।

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন : স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত হয়েছে, ৪০০০ দিব্য বৎসরে এক কৃতযুগ' হয়, কিন্তু ৪০০ বৎসরের এক 'সন্ধ্যা' ও ৪০০ বৎসরের সন্ধ্যাংশসহ এক কৃতযুগে মোট ৪৮০০ 'দিব্য বৎসর' থাকে। ৩০০০ বৎসরে ত্রেতাযুগ হয়, কিন্তু ৩০০ বৎসর পরিমাণের এক 'সন্ধ্যা' ও এক সন্ধ্যাংশ সহ ত্রেতাযুগের মোট দৈর্ঘ্য হয় ৩৬০০ বৎসর। দ্বাপরযুগ ২০০০ বৎসরের হয়; ২০০ বৎসর করে এক 'সন্ধ্যা' ও এক সন্ধ্যাংশ তার সাথে যোগ করলে দ্বাপরযুগ মোট ৪০০ বৎসরের হয়। কলিযুগের দৈর্ঘ্য এক হাজার বৎসর : তার 'সন্ধ্যা' ও সন্ধ্যাংশ একশত বৎসর করে : কলিযুগের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য হয় ১২০০ বৎসর। 'ব্রহ্মগুপ্ত' স্মৃতিগ্রন্থ থেকে যে কথা উদ্ধৃত করেছেন তা এই।

'দিব্য' বৎসরকে পার্থিব বা মানব বৎসরে পরিণত করতে হলে ৩৬০ দিয়ে গুণ করতে হবে। সুতরাং পার্থিব বৎসরের হিসাবে চতুর্যুগের প্রত্যেক যুগের দৈর্ঘ্য এইরূপ দাঁড়াবে :

১।	কৃতযুগ :	১,৪৪০,০০০	বৎসর
	'সন্ধ্যা' :	১৪৪,০০০	,,
	সন্ধ্যাংশ :	১৪৪,০০০	,,
৩১৪	মোট :	১,৭২৮,০০০	বৎসর=১ কৃতযুগ।

২।	ত্রেতাযুগ :	১,০৮০,০০	মানব-বৎসর
	'সন্ধ্যা' :	১০৮,০০০	,,
	সন্ধ্যাংশ :	১০৮,০০০	,,
	সর্বমোট :	১,২৯৬,০০০	,,=১ ত্রেতা যুগ।

৩।	দ্বাপরযুগ :	৭২০,০০০	মানব-বৎসর
	সন্ধ্যা :	৭২,০০০	,,
	সন্ধ্যাংশ :	৭২,০০০	,,
	সর্বমোট :	৮৬৪,০০০	,,=১ দ্বাপর যুগ।

৪।	কলিযুগ :	৩৬০,০০০	মানব-বৎসর
	সন্ধ্যা :	৩৬,০০০	,,
	সন্ধ্যাংশ :	৩৬,০০০	,,
	সর্বমোট :	৪৩২,০০০	,,=১ কলিযুগ।

কৃত ও ত্রেতার সমষ্টি ৩,০২৪,০০০ বৎসর; আর কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপরের সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩,৮৮৮,০০০ বৎসর।

ব্রহ্মগুপ্ত আবার আর্যভাটের উল্লেখ করে বলেছেন যে, তার মতে যুগ হচ্ছে চতুর্যুগের চারটি সমান অংশ। অতএব স্মৃতিগ্রন্থ থেকে আমি যা উদ্ধৃত করলাম আর্যভাটের মত তা থেকে ভিন্ন এবং যে ভিন্ন মত পোষণ করে সে বিপক্ষ। ব্রহ্মগুপ্ত তারপর বলছেন : 'পলিশ কিন্তু প্রশংসাহ', কেননা তিনি স্মৃতিবিরুদ্ধ কথা বলেননি। তিনি (পলিশ) কৃতযুগের ৪৮০০ বৎসর থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রত্যেক যুগ থেকে এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে কমিয়ে এনেছেন, যার ফলে তাঁর যুগের বৎসর সংখ্যা স্মৃতিবর্ণিত বৎসর সংখ্যার সমান হয় কিন্তু "সন্ধ্যা" ও সন্ধ্যাংশ বাদ দিয়ে। তবে স্মৃতিশাস্ত্রের মত কোনও কিছু

রোমকদের ছিল না, সেজন্য যুগ, মন্বন্তর ও কল্প দিয়ে তারা সময়ের পরিমাপ করেনি'। ব্রহ্মগুপ্তের উদ্ধৃতি এখানে শেষ হোল।

সবাই জানে যে, সম্পূর্ণ চতুর্যুগের বৎসর সংখ্যা নিয়ে কোন মতান্তর নেই। সুতরাং আর্যভাটের নিকট প্রত্যেক যুগের পরিমাণ ৩০০০ 'দিব্য' বৎসর, আর মানব-বৎসরের হিসাবে ১,০৮০,০০০ বৎসর। প্রত্যেক দুই যুগে ছয় হাজার 'দিব্য'বৎসর অথবা ২,১৬০,০০০ মানব-বৎসর হবে; প্রত্যেক তিনটি
৩১৫ যুগে ৯০০০ 'দিব্য'বৎসর, অথবা ৩,২৪০,০০০ মানব-বৎসর হবে।

পলিশ সম্পর্কে কথিত আছে যে এইসব সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য তাঁর 'সিদ্ধান্তে' তিনি কতকগুলি নিয়মের প্রবর্তন করেছেন; তার কিছু কিছু ভাল, বাকী অন্যগুলি গ্রহণের যোগ্য নয়। যুগ নির্ণয়ের জন্য তিনি ৪৮-কে মূলসংখ্যা ধরে তার থেকে এক-চতুর্থাংশ বাদ দিয়েছেন; ৩৬ থেকে আবার তিনি ১২ বাদ দিয়েছেন, কেননা ১২-কেই তিনি মূল বিয়োগসংখ্যা ধরে নিয়েছেন। ২৪ থেকে ১২ বাদ দিয়ে তিনি ১২ পেয়েছেন। এই অবশিষ্ট ১২-কে 'একশ' দিয়ে গুণ করে যা পেয়েছেন তাই হচ্ছে যুগের দিব্যবৎসর সংখ্যা।

পলিশ যদি ৬০-কেও মৌল সংখ্যা ধরতেন—কেননা, অনেক ব্যাপারই এই সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় করা যায়-এবং তার এক-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ ১২কে বিয়োগের মূলসংখ্যা ধরতেন, কিংবা ৬০-কে ৫ ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ এই ভগ্নাংশগুলি প্রথম চার ভাগ থেকে একাদিক্রমে কমিয়ে আনতেন (যথা, প্রথমে $\frac{1}{5}$=১২, অবশিষ্ট থেকে $\frac{1}{4}$=১২, অবশিষ্ট থেকে $\frac{1}{3}$=১২ এবং অবশিষ্ট থেকে আবার $\frac{1}{2}$=১২) তাহলেও তিনি ঐ একই অঙ্কফল পেতেন।

পলিশ সম্ভবতঃ এটিকে নানা প্রক্রিয়ার একটি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে যে এই বিশেষ প্রক্রিয়াটিকে অবলম্বন করেছেন, তা নয়। পলিশের সম্পূর্ণ গ্রন্থের আরবী তর্জমায় এখনও হাত দেওয়া হয়নি এই কারণে যে, তাঁর গণনার উদ্দেশ্য ও সমাধানে ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

আমাদের বৎসরকাল হিসাবে বর্তমান কল্প পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের কত বর্ষ পূর্ণ হয়েছে তার নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর প্রবর্তিত নিয়ম থেকে পলিশ নিজেই সরে গেছেন। তার সময় পর্যন্ত ৬০৬৮ কল্প সম্পূর্ণ হবার পর ৮ বৎসর, ৫ মাস ও ৪ দিবস অতীত হয়েছিল। এই সংখ্যাকে প্রথমে তিনি চতুর্যুগে পরিণত করলেন ১০০৮ দিয়ে তাকে গুণ করে; কারণ তাঁর মতে এক কল্পে ১০০৮ চতুর্যুগ হয়। এইভাবে যে ৬,১১৬,৫৪৪ অতীত চতুর্যুগ

পাওয়া গেল, তাকে আবার ৪ দিয়ে গুণ করে তিনি ২৪,৪৪৬,১৭৬ যুগে পরিণত করেন। তাঁর হিসাবে প্রত্যেক যুগে ১'০ ০,০০০ বৎসর হয় বলে
১১৬ এই মোট সংখ্যা দিয়ে তিনি মোট যুগসংখ্যাকে গুণকরে ২৬,৪২৩,৭৭০,০৮০-০০০ পেয়েছেন, অর্থাৎ বর্তমান কল্প পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের এত বৎসর অতীত হয়েছে।

চতুর্যুগকে নির্দিষ্ট পরিমাণের চার যুগে পরিণত না করে পলিশ যে কেবল তাকে চার সমান ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে তার বর্ষ-সংখ্যা দিয়ে গুণ করেছেন তা ব্রহ্মগুপ্তের মতানুসারীদের কাছে হয়ত আশ্চর্য মনে হবে। চতুর্যুগকে এভাবে চার সমান ভাগে ভাগ করায় কি লাভ, বিশেষ করে সে ভাগে যখন এমন কোনও ভগ্নাংশ অবশিষ্ট থাকে না যাকে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করা দরকার, সে প্রশ্ন অবশ্য আমরা তুলছি না। এক চতুর্যুগের বর্ষসংখ্যা অর্থাৎ ৪,৩২০,০০০ দিয়ে কল্পের মোট চতুর্যুগকে গুণ দেওয়া এমনিতেই এক বিরাট ব্যাপার। আমরা কেবল এই বলতে চাই, পলিশের এই হিসাবে আপত্তিকর কিছুই ছিল না যদি তিনি তাঁর সমকালীন কল্পের অতীত বৎসরগুলিকে শেষোক্ত সংখ্যার (৪,৩২০,০০০) সাথে সামঞ্জস করার ইচ্ছার দ্বারা চালিত না হতেন এবং বিগত সম্পূর্ণ মন্বন্তরের মোট সংখ্যাকে তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী ৭২ দিয়ে গুণ করতে না যেতেন; অধিকন্তু, এই গুণফলকে আবার চতুর্যুগের বর্ষসংখ্যা দিয়ে গুণ ক'রে—যার ফল ১,৮৬১,২৪০,০০০ হয়—সমসাময়িক মন্বন্তরের বিগত সম্পূর্ণ চতুর্যুগের মোট সংখ্যাকে এক চতুর্যুগের বর্ষসংখ্যা দিয়ে গুণ না করতেন (যার গুণফল হয় ১১৬,৬৪০,০০০)।

চতুর্যুগের তিনটি যুগ অতীত হয়েছে; পলিশের মতে তার বর্ষসংখ্যা হবে ৩,২৪০,০০০। এই সংখ্যা চতুর্যুগের বর্ষসমষ্টির তিন-চতুর্থ ভাগ। সপ্তাহের কোন বিশেষ বার নির্ণয় করতেও পলিশ এই বর্ষসংখ্যাকে ভিত্তি করেই তদন্তর্গত দিবসের সংখ্যা গণনা করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রণালীর নির্ভুলতায় যদি তিনি সত্যই বিশ্বাসী হতেন তাহলে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন মত তিনি তা ব্যবহার করতেন এবং তা করলে তিন যুগকে তিনি এক চতুর্যুগের ¾ ভাগ বলে ধরতেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পলিশের উক্তি বলে ব্রহ্মগুপ্ত যা লিখেছেন এবং যার সঙ্গে ব্রহ্মগুপ্ত নিজেও একমত হয়েছেন, তার আসলে কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু আর্যভাটের প্রতি অন্ধ-আক্রোশবশতঃ ও তাঁকে অত্যধিক গালমন্দ করার জন্য ব্রহ্মগুপ্ত তা দেখতে পাননি। এ বিষয়ে তাঁর কাছে আর্যভাট ও পলিশের

মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি ব্রহ্মগুপ্তের রচনার একটি অংশ উপস্থিত করব। যেখানে তিনি বলেছেন যে আর্যভাট কেতুর আবর্তন ও চন্দ্রের অপদুরক থেকে কিছু বাদ দিয়েছেন, এবং আবর্তনে গণ্ডগোল করার ফলে গ্রহণকাল গণনায়ও গণ্ডগোল করে ফেলেছেন। চরম অসৌজন্য দেখিয়ে ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভাটকে কীটের সঙ্গে তুলনা করেছেন যা কাঠ কুরে খেতে খেতে কাঠের উপর কখনও কখনও অনিচ্ছাকৃতভাবে অক্ষরের ন্যায় রেখার সৃষ্টি
৩১৭ করে, যার তাৎপর্য সে জানে না। বিষয়টির পূর্ণজ্ঞান যার আছে সে আর্যভাট, শ্রীসেন ও বিষ্ণুচন্দ্রের সম্মুখে হরিণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান সিংহের মত; তার সম্মুখে ওরা দাঁড়াতে এবং মুখ দেখাতে সাহস করবে না'। এইরূপ রূঢ় ভাষায় ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভাটকে আক্রমণ ও তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন।

এই তিনজনের মতে এক চতুর্যুগে কত 'সাবন' বা সূর্যোদয় দিবস হয় তা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। পলিশের দিবস-সংখ্যা ব্রহ্মগুপ্তের চেয়ে ১৩৫০ বেশী, কিন্তু চতুর্যুগের বর্ষসংখ্যা উভয়েরই এক। অতএব সৌরবৎসরের দিবস-সংখ্যা ব্রহ্মগুপ্তের চেয়ে পলিশের বেশী হতে বাধ্য। ব্রহ্মগুপ্তের উক্তি মতে চতুর্যুগে আর্যভাট পলিশের চেয়ে ৩০০ দিবস কম এবং ব্রহ্মগুপ্তের চেয়ে ১০৫০ দিন বেশী ধরেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, আর্যভাট যে সৌরবৎসর ধরেছেন তা ব্রহ্মগুপ্তের চেয়ে দীর্ঘতর ও পলিশের চেয়ে হ্রস্বতর।

তেতাল্লিশ অধ্যায়

যুগ চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য ও চতুর্থ যুগান্তরে প্রতীক্ষিত ঘটনাবলী

পৃথিবী সম্পর্কে ইউনানীদের নানারূপ বিশ্বাস ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তার একটি উল্লেখ করা গেল। উপরে ও নীচে থেকে যে সব দুর্যোগ পৃথিবীতে আসে তার প্রকার ও পরিমাণ নানাবিধ। অনেক সময় পৃথিবী এমন দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে, পরিমাণে বা প্রকৃতিতে কিংবা দুই দিক দিয়েই যার তুলনা হয় না এবং যার থেকে কোন নিস্তার নাই এবং আত্মরক্ষা বা পলায়ন অসম্ভব। সর্বনাশা প্লাবন বা ভূমিকম্পের মত তা আসে কিংবা ধরণী বিদীর্ণ হয়ে কিংবা জলমগ্ন হয়ে; কিংবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জলন্ত পাথর ও তপ্ত বালুকায় দগ্ধ হয়ে পৃথিবীর জীব-জন্তু, গাছপালা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; আবার ঝড়ঝঞ্ঝা, মৃত্তিকা-বিচ্যুতি, ঘূর্ণিবাত্যা, কিংবা সংক্রামক রোগ ও মহামারীর মত আরও নানা রূপ নিয়ে পৃথিবীতে ধ্বংস আসে। তার ফলে ভূভাগে বিরাট অংশ জনশূন্য হয়ে
৩১৮ যায়; কিন্তু কিছু কাল পরে দুর্যোগ ও তার ক্ষয়ক্ষতি কেটে গেলে সেখানে আবার জীবনের চিহ্ন দেখা দেয় এবং বন্য পশুর মত যে সব লোক অরণ্যে পর্বতে লুকিয়ে ছিল তারা নানাদিক থেকে সেখানে জমা হতে থাকে। বন্য জন্তু ও অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করতে এবং নিরাপদ ও আনন্দময় জীবনযাপনের উদ্দেশে পরস্পরকে সাহায্য করে। এইভাবে তারা ক্রমে সভ্য হয় এবং সংখ্যায় বাড়তে থাকে। কিন্তু অহংকার ও আত্মম্ভরিতা তাদের উপর ক্রোধ ও হিংসার পাখা মেলে তাদের উপর উড়তে থাকে এবং তার দ্বারা তাদের নিরুপদ্রব জীবনকে অশান্ত করে তোলে।

এই রকম জাতি কখনও কখনও এমন এক ব্যক্তিকে তাদের বংশের জনক হিসাবে স্মরণ করে যে সর্বপ্রথমে ঐস্থানে বাস স্থাপন করেছিল কিংবা কোনও দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, যার দরুন তার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে পরবর্তী কালের লোক কেবল তাকেই মনে রাখে। প্লেটো তাঁর বিধান গ্রন্থে (كتلب النوايس) Zeus অর্থাৎ বৃহস্পতিকে ইউনানীদের পূর্ব-পুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন এবং গ্রন্থের সংযোজিত অধ্যায়ের শেষে তিনি

Hippocraties-এর বংশতালিকা Zeus পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন। তবে এ তালিকা খুবই সংক্ষিপ্ত, মাত্র ১৪ পুরুষ পর্যন্ত। তালিকাটি এই :

১। ক্রোনস্—অর্থাৎ শনি
২। জিউস (زوس)
৩। এপোলো
৪। এসকেল্‌পিওস্
৫। মাখাওন (ماخاون)
৬। পোদালিরস (بوذاليوس Podaleirious)
৭। হিপোলোকস্ (ابو لوخس Hippolochos)
৮। ফিলোসস্ (اماوسوس ? Philosos)
৯। সোস্‌ত্রাতস
১০। দরদানস্
১১। ক্রিসামিস্ (قرسامس)
১২। ক্লিওমিত্তাদিস্ (قليو مطادس Kleomyttades)
১৩। থিওডোরস্
১৪। সোস্‌ত্রাতস (Sostratos)
১৫। নিরস্
১৬। গ্নোসিডিকস্ (Gnosidikos)
১৭। হিপ্পোক্রেতিস্ (بقراط Hippocrates)

চতুর্যুগ সম্বন্ধে হিন্দুদের শ্রুতিও কতকটা এই রকম। চতুর্যুগের প্রথম ভাগে অর্থাৎ কৃতযুগে, ওরা সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, উর্বরতা ও প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য ও
৩১৯ শক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান ও বহু ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব কল্পনা করে। সে যুগে কল্যাণ ছিল সম্পূর্ণ চার ভাগের চার ভাগ এবং এই যুগে প্রত্যেক জীবই ৪০০০ বৎসর বাঁচত। তারপর এইসব গুণ হ্রাস পেতে থাকে এবং তার বিপরীত গুণের সাথে মিশ্রিত হতে থাকে, যার ফলে, ত্রেতাযুগের সূচনায় শুভ আক্রমণকারী অশুভের চেয়ে মাত্র তিনগুণ বেশী থাকে এবং কল্যাণও সেজন্য তিন-চতুর্থাংশ থাকে। তখন ব্রাহ্মণের চেয়ে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বেশী হয়। বিষ্ণু-ধর্মের মতে কিন্তু জীবের আয়ুষ্কাল কৃতযুগের সমান থাকে, যদিও যে পরিমাণে মঙ্গল হ্রাস পায় আয়ুষ্কালও সেই অনুপাতে হ্রাস পাওয়া উচিত। এই যুগে যজ্ঞকাল পশু-বলি ও কুশ-উৎপাটন প্রথা আরম্ভ হয়, যা পূর্ব-যুগে

অজ্ঞাত ছিল। এইভাবে কু-বৃদ্ধি হতে থাকে এবং দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে কু ও সু-এর পরিমাণ সমান হয়, আর মঙ্গলও অর্ধেক হয়ে যায়। দ্বাপর যুগে আবহাওয়ার প্রভেদ দেখা দেয়; জীব-হত্যা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্ম বিভিন্ন হতে থাকে। তখন জীবের আয়ুষ্কাল হ্রাস পেয়ে বিষ্ণুধর্মের মতে মাত্র ৪০০ বৎসর হয়। 'তিস্য', অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভে যতটুকু পুণ্য অবশিষ্ট থাকে তার তিনগুণ পাপ দেখা দেয়।

ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সংঘটিত বলে কথিত হিন্দুদের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন, রাবণ-হন্তা রামের কাহিনী, ব্রাহ্মণ পরশুরামের কাহিনী যে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রত্যেক ক্ষত্রিয়কে আয়ত্তে পাওয়ামাত্র হত্যা করেছিল। হিন্দুদের বিশ্বাস যে পরশুরাম স্বর্গলোকে জীবিত আছে; একুশবার পৃথিবীতে সে আবির্ভূত হয়েছে এবং আবার আভির্ভূত হবে। ঐরূপ আর একটি কাহিনী হচ্ছে কুরু ও পাণ্ডু বংশীয়দের যুদ্ধ।

৩২১ কলিযুগে পাপ এমন বৃদ্ধি পায় যে অবশেষে পুণ্য একেবারে লোপ পায়। সেই হচ্ছে মর্তবাসীদের ধ্বংস হবার সময়। এবং যারা দানব-প্রকৃতি ও মূর্তি-মান পাপস্বরূপ মনুষ্য জাতি থেকে পলায়ন ক'রে তপস্যার জন্য পর্বত ও গুহায় ছড়িয়ে পড়ে আত্মগোপন করেছিল তাদের মধ্যে থেকে আবার নতুন মানব জাতির উদ্ভব হবে। এইজন্য এযুগকে কৃতযুগ বলা হয়, অর্থাৎ 'কর্মশেষে প্রস্থান করার অবসর'।

বৃহস্পতি কর্তৃক ব্রহ্মার নিকট হ'তে প্রাপ্ত সৌনকের কাহিনীতে আছে যে, আল্লাহ্ (ঈশ্বর) বলছেন: 'কলিযুগের আরম্ভে আমি শুদ্ধোধনের পুত্র পুতস্বভাব বুদ্ধোধনকে বিশ্বে হিত প্রচারের জন্য পাঠাব। কিন্তু তারপর রক্তাম্বরধারীরা—যারা বুদ্ধোধন থেকে নিজেদের উৎপত্তি দাবী করে—তার প্রচারিত তত্ত্বের সমস্তই বিকৃত করে ফেলবে এবং ব্রাহ্মণদের মর্যাদা এমনভাবে লোপ পাবে যে তার শূদ্র দাস প্রভুর সাথে রূঢ় ব্যবহার করবে এবং চণ্ডাল ও শূদ্র ব্রাহ্মণের দানদক্ষিণায় ভাগ বসাবে। মানুষ নিয়ত দুষ্ট উপায়ে অর্থোপার্জন ও ধনসঞ্চয়ে রত থাকবে, জঘন্য পাপ ও কুকর্ম করতে কুণ্ঠিত হবে না। তার ফলে ছোটরা বড়র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে, ভৃত্য প্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, বর্ণে বর্ণে সংঘর্ষ হবে, গোত্রের বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে, চতুর্বর্ণ লোপ পাবে এবং নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে; বহু প্রকার শাস্ত্র গ্রন্থের প্রচার হবে এবং তার ফলে, পূর্বে যে সমাজ সংহত ও

একতাবদ্ধ ছিল তা খণ্ড খণ্ড হয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র সমাজে পরিণত হবে; দেউল ও শিক্ষালয়গুলি ধ্বংস হবে, ন্যায়বিচার অদৃশ্য হবে এবং অত্যাচার, লুণ্ঠন, উৎপীড়ন ও বিনাশ ভিন্ন রাজারা আর কিছু জানবে না। অলীক ও সুন্দর কল্পনায় মেতে যেন তারা জন-সমাজকে গ্রাস করতে চাইবে এবং ভুলে যাবে যে পাপের তুলনায় মানবজীবন কত স্বল্পায়ু। মানুষের অন্তঃকরণ যত কলুষিত হবে নানা প্রকারের মহামারী ততই তাদিগকে ঘিরে ফেলবে। লোকে বলে যে এ যুগে জ্যোতিষীর গণনায় নিরূপিত সমস্ত সিদ্ধান্তই মিথ্যা ও নিষ্ফল হবে।

শেষোক্ত এই ধারণা মানীও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'জ্ঞাত হও যে বিশ্বের ব্যাপার সমস্তই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সেই রকম আকাশের (اسفیرات spheres) অর্থাৎ গ্রহাদি পরিবর্তিত হওয়ার জন্য পৌরোহিত্যও বদলে গেছে। পুরোহিতরা আর তাদের পূর্বপুরুষদের মত গ্রহচক্রে নক্ষত্রের জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, কিন্তু তারা মানুষকে প্রতারণার দ্বারা বিভ্রান্ত করে। ওরা যা ভবিষ্যদ্বাণী করে তা দৈবাৎ ঘটতেও পারে, কিন্তু প্রায়ই তা ঘটে না।'

কলিযুগের যে বর্ণনা আমি দিলাম 'বিষ্ণুধর্মে' আরও বিস্তারিতভাবে তা দেওয়া হয়েছে। (তাতে বলা হয়েছে যে) মানুষ পাপ-পুণ্যের ফলাফল বিস্মৃত হবে এবং দেবতারা যে সত্য জ্ঞানের অধিকারী, তা মানুষ অস্বীকার করবে; তাদের পরমায়ুর দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হবে, কেউ তার পরিমাণ জানতে পারবে না; কারো ভ্রূণাবস্থাতে মৃত্যু হবে, কারো বা শৈশব বা যৌবনে জীবনাবসান হবে। পুণ্যবানরা দীর্ঘজীবী হবে না, তাদিগকে পৃথিবী থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, অথচ পাপী ও ধর্মদ্রোহীরা অনেকদিন ধরে পৃথিবীতে থাকবে; রাজদণ্ড শূদ্রদের হাতে যাবে এবং তারা তখন ক্ষুধার্ত বৃকবৎ যথেচ্ছ লুট-তরাজ করে বেড়াবে; ব্রাহ্মণীদের আচরণও এইরূপ হবে, তবে অধিকাংশই হবে শূদ্র ও তস্কর এবং ব্রাহ্মণদের সমস্ত অধিকারই অপহৃত হবে; কেউ দারিদ্র্য ও সংযম সাধন করলে আশ্চর্য জীব বলে লোকে তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবে এবং তাকে অবজ্ঞা করবে। সকলের প্রকৃতিই যখন এইরূপ হবে তখন কেউ বিষ্ণুর সেবা করলে লোকে আশ্চর্য হবে সেজন্য প্রার্থনা করলেই তা পূরণ হবে, অল্প পুণ্যে অধিক পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং সামান্য উপাসনা ও সেবার ফলে লোকে প্রভূত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করবে। অবশেষে যুগের অন্তে পাপের ভাগ যখন পরিপূর্ণ হবে তখন 'যশ্ব' (جسو) ব্রাহ্মণের পুত্র

'গগ'', অর্থাৎ কলির আবির্ভাব হবে। এরই নামে এই যুগের নামকরণ হয়েছে। তার শক্তি অপ্রতিরোধ্য এবং অস্ত্র প্রয়োগে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে। তার সময় পর্যন্ত যত পাপের উদ্ভব হয়েছে, তার প্রতিবিধান করতে সে তরবারি উন্মুক্ত করবে এবং সমস্ত কলুষ নাশ করে পাপী মানব সমাজ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবে। প্রজননের জন্য সে শুদ্ধচিত্ত পুণ্যবানদিগকে একত্রিত করবে। তখন কৃতযুগ তাদের বহু পিছনে পড়ে থাকবে এবং সময় ও পৃথিবী আবার পবিত্রতা, অবিমিশ্র কল্যাণ ও শান্তিতে ফিরে যাবে। চতুর্যুগে যেসব যুগ চক্রাকারে আসা-যাওয়া করে তাদের আসল প্রকৃতি এই। আলী ইবনে যয়ন আল্-ত্বাবারী চরকের গ্রন্থ থেকে যা নকল করেছেন তাতে আছে : আদিকালে ধরণী চিরশ্যামল ও রোগহীন ছিল এবং 'মহাভূত' সকলের মধ্যে সমতা ছিল। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও প্রেমে আবদ্ধ ছিল। লোভ, দ্বন্দ্ব, ক্রোধ ও হিংসা তাদের মধ্যে ছিল না এবং দেহ ও মনে পীড়াদায়ক কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তারপরে এল ঈর্ষা, এবং তার সঙ্গে লোভ। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ
৩২২ তখন সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে থাকল। এ সঞ্চয় কারুর পক্ষে কষ্টকর, কারুর পক্ষে সহজ হোল। ফলে নানাপ্রকার চিন্তা, প্রয়াস দুর্ভাবনা দেখা দিল এবং মানুষকে যুদ্ধ, শঠতা ও মিথ্যাচরণের দিকে নিয়ে গেল। তখন মানুষের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, স্বভাবে পরিবর্তন এল এবং তারা রোগের অধীন হয়ে পড়ল। তার দরুন আল্লাহ্‌র (ঈশ্বর) উপাসনায় ও জ্ঞানসাধনায় অবহেলা দেখা দিল। অজ্ঞতা বদ্ধমূল হোল এবং তার ফলে দুঃখ ও ক্লেশ বাড়তে থাকল। তখন পুণ্যবানরা তাদের তপস্বী 'আত্রেয়' পুত্র 'কৃশ' (?قُرس)-এর কাছে গিয়ে সমবেত হোল। তপস্বী তখন পর্বতারোহণ করে কাতরভাবে অনুনয় করতে থাকল। ঈশ্বর তখন তাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

ইউনানীদের কিম্বদন্তী থেকে আমি যা উদ্ধৃত করেছি তা এই রকমই। 'আরাতুস, রাশিচক্রের সপ্তম রাশির প্রকাশ্য ও সাংকেতিক বর্ণনায় বলেছেন : উত্তরদিকের আকৃতিগুলির মধ্যে Al-Awwa (الهک الهوا) অর্থাৎ মেষ পালকের (হস্ত নক্ষত্র) পায়ের নিম্নে লক্ষ্য কর ; তুমি দেখবে একটি কন্যা, (السمک الاعزل) (চিত্রা নক্ষত্র) যে একটি যবের শীষ হাতে করে আসছে। এই কন্যা হয় নক্ষত্রজাতীয়া, যে জাতিকে আদিম নক্ষত্রগুলির পূর্ব-পুরুষ মনে করা হয়, কিংবা কোনও অন্য জাতি সম্ভূতা, যার পরিচয় আমরা জানি না। কথিত আছে যে আদিকালে এই কন্যা মানুষের মধ্যে কেবল স্ত্রীদের সঙ্গে বাস করত, পুরুষদের চোখে অদৃশ্য হয়ে থাকত। মানুষের

মধ্যে তার নাম ছিল 'বিচার'। প্রবীণ লোক, ব্যবসায়ী ও পথচারীদিগকে একত্রিত করে তাদেরকে সে উচ্চৈস্বরে সত্যাচরণে উদ্বুদ্ধ করত। সে মানুষকে গণনাতীত ধন ও নানা প্রকারের অধিকার দান করেছিল। পৃথিবীকে তখন 'স্বর্ণময়' বলা হোত। মর্ত্যবাসীর কেউই তখন কথায় বা কার্যে মারাত্মক কপটতা জানত না, এবং তাদের মধ্যে সর্বনাশা বিভেদও ছিল না; তারা নিরুপদ্রব শান্তিময় জীবনযাপন করত; সমুদ্র নির্জন ছিল, তার উপর নৌচালনা তখনও আরম্ভ হয় নাই; গাভী তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দিত। তারপর স্বর্ণময় জাতি গত হয়ে 'রৌপ্যময়' জাতি এল, কন্যা তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল কিন্তু নিরানন্দভাবে, এবং পূর্বেকার মত স্ত্রীলোকদের সাথে, যোগাযোগ না রেখে সে পর্বতে গোপনভাবে বাস করতে থাকল। সেখান থেকে সে বড় বড় নগরে গিয়ে নাগরিকদিগকে সতর্ক করত, দুষ্কর্মের জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করত এবং যে জাতিকে তাদের 'স্বর্ণময়' পূর্বপুরুষরা রেখে গেছে তাকে নষ্ট করে ফেলার জন্য তাদেরকে তিরস্কার করত; তাদিগকে সতর্ক করে দিত যে তাদের পর আরও দুষ্ট প্রকৃতির মানব জাতি পৃথিবীতে আসবে এবং যুদ্ধ, রক্তপাত ও আরও নানাপ্রকারের দুর্যোগ হবে। সাবধান বাণী উচ্চারণ করা শেষ হলে সে কন্যা পর্বতে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর 'রৌপ্যময়' জাতি শেষ হল এবং মানুষ ব্রোঞ্জ জাতিতে পরিণত হল। তারা পাপের আকরস্বরূপ তরবারি উদ্ভাবন করল এবং গো মাংস আস্বাদন করল। তারাই সর্বপ্রথম এ কর্ম করে। তাতে "বিচার" নাম্নী কন্যা তাদের সান্নিধ্যকে ঘৃণা করে আকাশলোকে উড়ে চলে গেল'।

এই গ্রন্থের টীকাকার বলছে, এই কন্যা হচ্ছে Zeus-এর দুহিতা, যে জনসমাগমস্থানে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলত। মানুষ তখন শাসকদের বাধ্য ছিল, অন্যায় ও বিবাদ তারা জানত না, কলহ বা হিংসা তাদেরকে স্পর্শ করত না; কৃষিকর্মে তারা জীবিকা নির্বাহ করত এবং বাণিজ্যের জন্য বা লোভের বশবর্তী হয়ে তারা সমুদ্র-যাত্রা করত না। তাদের স্বভাব তখন স্বর্ণের ন্যায় পবিত্র ও বিশুদ্ধ ছিল। যখন তারা এই স্বভাবচ্যুত হয়ে সত্যরক্ষায় অবহেলা করল, 'বিচার' আর তাদের সঙ্গে বাস করল না। তবে পর্বতে বাস করেও সে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যখন সে মানব-সমাগমে আসত তখন তাদিগকে ভয় দেখাত, কারণ তাদের পূর্বপুরুষদের মত তারা নীরবে তার কথা শুনত। সেজন্য, যারা তাকে আহ্বান করত, তাদের সম্মুখে পূর্বের মত আর সে আবির্ভূত হোত না। অনন্তর, রৌপ্যজাতির পরে

ব্রোঞ্জ জাতি এলে, যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমাগত হতে থাকল এবং পৃথিবীতে পাপ ও দুষ্কৃতি ছড়িয়ে পড়ল। তাদের ঘৃণ্যসঙ্গ ত্যাগ করার সংকল্প করে 'কন্যা' তখন গ্রহলোকে প্রস্থান করল। এ সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক শ্রুতি পাওয়া যায়। কেউ বলে, এই কন্যা হচ্ছে 'দিমিত্তর', কেননা তার হাতে যবশীষ আছে। আবার কারুর উক্তি মতে, সে হচ্ছে সৌভাগ্য ও একতা'। এই হল আরাতুস-এর উক্তি।

প্লেটোর পূর্বোল্লিখিত বিধান গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে : এথেনীয় লোকটি বলল, পৃথিবীতে প্লাবন, মহামারী ও দুর্ঘটনা বহু ঘটেছে, তার থেকে মেষপাল ও পর্বতবাসীরা ব্যতীত কেউই নিস্তার পারনি। তাদের নিস্তার
৩২৪ পাওয়ার কারণ, তারা প্রতারণা ও প্রভুত্বলোলুপতার অনুশীলন করেনি। Knossos-এর লোকটি বলল : আদিযুগে মানুষ পরস্পরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসত, কারণ পৃথিবীর জন-বিরল নির্জনতাকে তারা ভয় করত এবং পৃথিবী তখন সকলের জন্যই প্রশস্ত ছিল, তার জন্য কোনও পরিশ্রম করতে হোত না। তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছিল না, আর কোনও বিত্তও ছিল না, বন্ধনও ছিল না। তাদের না ছিল সোনারূপা, না ছিল এসবের জন্য কোন লোলুপতা। সেজন্য তাদের মধ্যে ধন ও ছিল না, দরিদ্রও ছিল না। তাদের কোন পুস্তকাদি পেলে এর বহু প্রমাণ তার থেকে আমরা পেতে পারতাম'।

চুয়াল্লিশ অধ্যায়

মন্বন্তরসমূহ

যেমন ব্রহ্মার আয়ু ৭২,০০০ 'কল্প' ধরা হয়, তেমনই এক মন্বন্তর অর্থাৎ মনুর কালকে ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল বলে ধরা হয়। তার আধিপত্য মন্বন্তর সঙ্গেই শেষ হয়। তখন আর এক ইন্দ্র তার পদ প্রাপ্ত হয়ে, পরবর্তী মন্বন্তরে জগতে আধিপত্য করতে থাকে। ব্রহ্মগুপ্ত বলেন, 'কেউ যদি বলে যে দুই মন্বন্তরের মধ্যে কোন "সন্ধ্যা" নাই, এবং সেজন্য প্রত্যেক মন্বন্তরে সে ৭১ চতুর্যুগ গণনা করে, তাহলে সে দেখতে পাবে যে, প্রতি কল্পে ছয় চতুর্যুগ কম পড়ছে, এবং এক সহস্র (চতুর্যুগ) থেকে কম হওয়াও যেমন ঠিক নয় তেমনই তার থেকে বেশী হওয়াও ঠিক নয়, কারণ উভয় অবস্থাই 'স্মৃতিগ্রন্থ' বিরোধী।

ব্রহ্মগুপ্ত আরও বলেছেন: 'দশগীতিকা' ও 'আর্যাষ্টজাত' নামক তাঁর দু'টি পুস্তকে আর্যভাট লিখেছেন যে, প্রত্যেক মন্বন্তর ৭২ চতুর্যুগের সমান। সুতরাং তাঁর উক্তিমতে এক কল্পে ১০০৮ চতুর্যুগ হয়।

'বিষ্ণুধর্মে' বজ্রকে মার্কণ্ডেয় উত্তর দিচ্ছেন: 'পুরুষ' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। কিন্তু কল্পের অধিপতি হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি পৃথিবী পতি এবং মন্বন্তরের অধিপতি হচ্ছেন 'মনু'। মনুর সংখ্যা চতুর্দশ; প্রত্যেক মন্বন্তরের সূচনায় যাঁরা পৃথিবীর রাজা হয়েছেন তাঁরা সবাই এই মন্বাদির সন্তান। নিম্নের সারণীতে আমি তাদের নাম লিপিবদ্ধ করেছি।

মন্বন্তরের ক্রমিক সংখ্যা	বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী মন্বন্তরের নাম	বিষ্ণুধর্ম অনুযায়ী মন্বন্তরের নাম	অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত মন্বন্তরের নাম	বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী ইন্দ্রাদির নাম	বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী মনু পুত্রগণের নাম, যাঁরা প্রতি মন্বন্তরের প্রারম্ভে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছেন।
১	স্বায়ম্ভুব	স্বায়ম্ভুব	স্বায়ম্ভুব	মনু	প্রথম মন্বন্তরের অধীশ্বর যার সঙ্গে অন্য কোনও জীবের কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য নাই।
২	স্বরোচিষ	স্বরোষিজ	স্বরোচিষ	বিপশ্চিৎ	চৈত্রক, মনু পুত্রগণের প্রথম।
৩	ঔত্তমি	ঔত্তমি	ঔত্তমি	সুশান্তি	স্বদিব্য (? অজ, পরশু, দিব্য-ই)
৪	স্তামস (তামস)	স্তামস	স্তামস	শিখি (? শিখি)	নর, খ্যাতি, শান্ত হয়, জাদুযঙ্ঘা
৫	রৈবত	রৈবত	রৈবত	অবতত (?)	বলবন্ধু, সুসম্ভাব্য, সত্যক, সৈদ্ধন্বিব (?)
৬	চাক্ষুষ	চাক্ষুষ	চাক্ষুষ	মনোজীব	পুরু, মুরু (? উরু), শভদ্যুম্ন, প্রমুখ (?)
৭	বৈবস্বত	বৈবস্বত	বৈবস্বত	পুরন্দর	ইক্ষাকু, নাভাস, (? নাভাগ) ধৃষ্ণু, শর্যাতি ?
৮	সাবর্ণি	সাবর্ণি	সাবর্ণি	বন্দী বলিরাজা	বিরজা, আশ্চর্বরী, নির্মোঘ
৯	দক্ষ	বিষ্ণুধর্ম	ব্রহ্মাপুত্র	মহাবীর্য	ধৃতকেতু, নিরাময়, পঞ্চহস্ত
১০	ব্রহ্মসাবর্ণি	ধর্মপুত্র	বিষ্ণুপুত্র	শান্তি	সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরীসেন
১১	ধর্মসাবর্ণি	রুদ্রপুত্র	রুদ্রপুত্র	বৃষ	সর্বত্রগ, দেবানীক, সুধর্মাত্মক (সর্বধর্মা ?)
১২	রুদ্রপুত্র	দক্ষপুত্র	দক্ষপুত্র	ঋতধামা	দেবতাবান, উপদেবশ্চ (?), দেবশ্রেষ্ঠ
১৩	রৌচ্য (রৌব্য)	রৈব্য	রৈব্য	দিবস্পতি	চিত্রসেন, বিচিত্রাদি (?)
১৪	ভৌত্য	ভৌত্য	ভৌত্য	শুচি	উরু, গভীর, বুধ্ন

৩২৬ ভবিষ্যৎ মনুদের এই তালিকায় সপ্তম মনুর পর নামের প্রভেদ দেখা যাচ্ছে; যে কারণে মনুদের নামে প্রভেদ হয়, আমার মনে হয় সেই একই কারণ এখানেও কার্যকরী, অর্থাৎ এরা পরম্পরা রক্ষা অপেক্ষা নামোল্লেখেই বেশী আগ্রহশীল। এখানে আমরা বিষ্ণুপুরাণের উপর নির্ভর করতে পারি, কারণ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত তালিকায় মনুদের সংখ্যা, নাম ও বর্ণনা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তার থেকে মনে হয় যে তাদের নামোল্লেখের পরম্পরাও নির্ভরযোগ্য। তবে এখানে সে তথ্যাদির উল্লেখ থেকে আমি বিরত হচ্ছি, কারণ তাতে বিশেষ লাভ নেই।

বিষ্ণুপুরাণেই উক্ত হয়েছে যে ক্ষত্রিয় রাজা মৈত্রেয় ব্যাসের পিতা পরাশরকে অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে পরাশর আমার তালিকায় যে নাম দেওয়া হয়েছে, মনুদের সেই প্রচলিত নাম গুলি বললেন। এই গ্রন্থে আরও কথিত হয়েছে যে, প্রত্যেক মনুর সন্তানরা পৃথিবীর রাজা হবে। এই সন্তানদের প্রথমটির নামও গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যে নামগুলি আমি তালিকায় দিয়েছি। আরও বলা হয়েছে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্বন্তরের মনুরা 'প্রিয়ব্রত' নামক তপস্বীর বংশধর হবে। এই তপস্বী বিষ্ণুর এমনই প্রিয় হয়েছিলেন যে, ঐ মর্যাদা দিয়ে তাঁর বংশধরদিগকে বিষ্ণু সম্মানিত করেছিলেন।

পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়

সপ্তর্ষির বিবরণ

ভারতীয় ভাষায় এই নক্ষত্রপুঞ্জকে 'সপ্তর্ষি' অর্থাৎ সপ্ত ঋষি বলা হয়। কথিত আছে যে এঁরা ঋষি ছিলেন, সৎ উপায়ে আহার্য সংগ্রহ করতেন। তাঁদের সঙ্গে একটি সাধ্বী রমণী ছিল। এটি আসলে 'অম-সুহা' (Ursa major, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম নক্ষত্র)। খাদ্যের জন্য তারা পুষ্করিণী থেকে পদ্মমৃণাল উৎপাটন করত। তারপর 'ধর্ম' (دین) এল এবং এই রমণীকে তাদের নিকট থেকে লুকিয়ে রাখল। তখন ঋষিদের প্রত্যেকে অপরের কাছে লজ্জিত হল, তারা 'ধর্মে'র' অনুমোদিত শপথ গ্রহণ করল। তাদিগকে সম্মানিত করার জন্য এখন যেখানে তাদিগকে দেখা যায়, ধর্ম সেখানে তাদিগকে উন্নীত করে দিল।

৩২৭ আমরা আগেই বলেছিলাম যে হিন্দুদের সমস্ত গ্রন্থ ছন্দে লেখা, সেজন্য সর্বজনাদৃত উপমা ও অলংকৃত বাক্য প্রয়োগে ওরা বড় বেশী অভ্যস্ত। বরাহ মিহিরের 'সংহীতাতে', যেখানে সপ্তর্ষির জ্যোতিষিক গুণাগুণের বিবরণ আছে, সেখানে উপরোক্ত বর্ণনার মত আর একটি বর্ণনা আছে। আমার অনুবাদে সেটি এইরূপ দাঁড়ায়। 'সুন্দরী রমণীর কণ্ঠ যেমন মুক্তার হার ও শ্বেতপদ্মের সুগ্রথিত মালায় অলংকৃত থাকে, তার উত্তরাঞ্চলও ঠিক তেমনই এইসব নক্ষত্র দিয়ে সজ্জিত আছে। এরা যেন সুন্দরী নটী, মেরুর চতুর্দিকে তার ইশারায় ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে। আদি বৃদ্ধ গর্গের উক্তি অনুসরণ করে আমি বলি যে, যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবীর রাজা, তখন সপ্তর্ষি চন্দ্রকক্ষার দশম নক্ষত্র 'মঘাতে' অবস্থান করত। তার ২৫২৬ বৎসর পর 'শককাল' আরম্ভ হয়েছে। চন্দ্রকক্ষার প্রত্যেক নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ৬০০ বৎসরকাল থাকে। উত্তর-পূর্ব কোণে তার উদয় হয়। তখন যে ঋষি পূর্বদিকে আধিপত্য করেন তিনি মারিচি; তাঁর পশ্চিমে আছে বশিষ্ঠ, তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু; এবং বশিষ্ঠের নিকটে অরুন্ধতী নাম্নী সাধ্বী রমণী।

প্রায়ই এই নামগুলির স্বাতন্ত্র্য গুলিয়ে ফেলা হয় বলে (دب الاکبر) Great Bear-এর পরিচিত নক্ষত্রের সাথে আমি তাদের মেলাবার চেষ্টা করছি।

মারিচি	=	২৭তম নক্ষত্র
বশিষ্ঠ	=	২৬ ,, ,,
অঙ্গিরা	=	২৫ ,, ,,
অত্রি	=	১৮শ ,,
ক্রতু	=	১৬ ,, ,,
পুলহ	=	১৭ ,, ,,
পুলস্ত্য	=	১৯ ,, ,,

আমাদের কালে অর্থাৎ ৯৫২ 'শককালে' এইসব নক্ষত্রের অবস্থান সিংহ-রাশির ১$\frac{৫}{৬}$ ডিগ্রী থেকে কন্যারাশির ১৩$\frac{৫}{৬}$ ডিগ্রীর মধ্যে। স্থির নক্ষত্রদের যে
৩২৮ বিশেষ গতি আমরা ধরতে পারি, তার হিসাবে যুধিষ্ঠিরের সময়ে এই নক্ষত্রগুলি মিথুনরাশির ৮$\frac{২}{৩}$ ডিগ্রী ও কর্কটরাশির ২০$\frac{৫}{৬}$ ডিগ্রীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

Ptocemy ও অন্যান্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা স্থির নক্ষত্রের যে গতিবেগ ধরে গণনা করতেন, তার হিসাবে এই: (সপ্তর্ষির নক্ষত্রগুলির অবস্থান মিথুন রাশির ২৬$\frac{৫}{৬}$ ডিগ্রী ও সিংহরাশির ৮$\frac{২}{৩}$ ডিগ্রীর মধ্যে হবে, এবং 'মঘা' নক্ষত্রের অবস্থানও সিংহরাশির ০ থেকে ৮০০ মিনিটের মধ্যে থাকবে। অতএব মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির অবস্থান যুধিষ্ঠিরের সময়ের না ধরে আমাদের বর্তমানকালে ধরাই বেশী সমীচীন। আর ভারতীয়রা যদি সিংহরাশির বক্ষ বলে পরিচিত নক্ষত্রকেই মঘা নক্ষত্র মনে করে তাহলে বলতে হয় যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে এই নক্ষত্রটি কর্কটরাশির প্রথম ডিগ্রীতে ছিল।

গর্গ যা বলেছেন তার আসলে কোন ভিত্তি নাই। তাঁর উক্তি কেবল এ কথাই প্রমাণ করে যে, চাক্ষুসভাবে অথবা রাশিচক্রের ডিগ্রী গণনার দ্বারা নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করতে হলে কি করতে হয় তাঁর সে জ্ঞান অতি সামান্যই ছিল।

কাশ্মীরে প্রস্তুত ৯৫১ শতাব্দির এক পঞ্জিকাতে আমি দেখেছি যে, ৭৭ বৎসর থেকে সপ্তর্ষি 'অনুরাধা' নক্ষত্রে অবস্থান করছে। চন্দ্রের এই ক্ষেত্র বৃশ্চিক রাশির ৩$\frac{১}{৩}$ ও ১৬$\frac{২}{৩}$ ডিগ্রীর মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। অথচ সপ্তর্ষি এই স্থান থেকে প্রায় পূর্ণ একরাশি ও ২০ ডিগ্রী অগ্রে আছে। ভারতীয়দের মধ্যে বাস না করে ও দর অজস্র প্রকারের মতবাদ শিক্ষা করতে পারে এমন লোক কোথায় আছে!

না হয় ধরে নেওয়া যাক যে গর্গ ভুল করেন নি, এবং সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রের যে বিশেষ স্থানে অবস্থান করে সে স্থান তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। আরও

ধরে নেওয়া যাক যে এই বিশেষ স্থান হচেছ মঘা নক্ষত্রের ০. ডিগ্রী, যা আমাদের সিংহরাশির ০° ডিগ্রী হয়। যুধিষ্ঠির থেকে আমাদের বর্তমান বৎসর, অর্থাৎ আলেকজান্দ্রীয় ১৩৪০ সন পর্যন্ত ৩৪৭৯ বৎসরের ব্যবধান। এবং এ কথাও মেনে নেওয়া যাক যে, প্রত্যেক নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ৬০০ বৎসরকাল থাকে বলে বরাহমিহির যা বলেছেন তাও সত্য। তাহলে বর্তমান বৎসরে সপ্তর্ষির অবস্থান
৩২৯ তুলারাশির ১৭ ডিগ্রী, ১৮ মিনিটে হতে হবে, যা ওদের স্বাতী নক্ষত্রের ১০ ডিগ্রী, ৩৮ মিনিট-এর সাথে অভিন্ন। আর, যদি আমরা মঘা নক্ষত্রের কেন্দ্র সপ্তর্ষির অবস্থান বলে ধরে নেই তাহলে এখন তার অবস্থান হবে 'বিশাখা'র ৩ ডিগ্রী ৫৮ মিনিটে এবং যদি মঘার শেষে তার অবস্থান ধরে নিই তাহলে এখন 'বিশাখা'র ১০ ডিগ্রী ৩৮ মিনিটে তার অবস্থান হতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কাশ্মীরের পঞ্জিকাটিতে যা লেখা হয়েছে তা সংহীতা অনুযায়ী নয়। আবার ঐ পঞ্জিকায় ব্যবহৃত অংককেই যদি আমরা নিয়ামক বলে ধরে নেই এবং সেই নিয়মে আমরা পিছনের দিকে গণনা করতে থাকি তাহলেও আমরা কোনক্রমেই যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষির অবস্থানক্ষেত্র হিসাবে মঘা নক্ষত্রে পেঁছাব না।

আমরা মনে করতাম যে বর্তমান কালে স্থির নক্ষত্রদের আবর্তনগতি পূর্বকালের চেয়ে দ্রুততর হয়েছে, এবং আকাশমণ্ডলের আকৃতির বৈশিষ্ট্যে আমরা তার কারণে অনুসন্ধান করতাম। আমাদের অনুমানে ঐ নক্ষত্রদের গতি হচ্ছে ৬৬ সৌর বৎসরে এক ডিগ্রী মাত্র। অতএব, বরাহমিহিরের কথায় আমরা বিস্মিত হচ্ছি, কেননা তাঁর উক্তি অনুযায়ী তাদের গতি ৪৫ বৎসরে এক ডিগ্রী হয় (অর্থাৎ বর্তমান কালের গতি অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর) অথচ আমাদের সময় থেকে তিনি মাত্র ৫২৫ বৎসর পূর্ববর্তী ছিলেন।

'করণসার' পঞ্জিকাতে সপ্তর্ষির গতিবেগ ও বিশেষ সময়ে তার অবস্থান নির্ণয় করার জন্য গ্রন্থাকার শকাব্দ থেকে ৮২১ বিয়োগ করতে বলেছেন। যা অবশিষ্ট থাকবে তা হবে 'মূল' অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভ থেকে ৪,০০১ বৎসরের উপরের যত বৎসর অতীত হয়েছে তার সংখ্যা। এখন এই মূল সংখ্যাকে ৪৭ দিয়ে গুণ দিয়ে তার সঙ্গে ৬৮,০০০ যোগ দিতে হবে। যোগফলকে আবার ১০,০০০ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। এই ভাগফল হবে সূর্য-রাশির সংখ্যা ও তার ভগ্নাংশ, যে রাশিতে সপ্তর্ষি ঐ বিশেষ সময়ে অবস্থান করছে।

এখন যোগ দেবার জন্য যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে (৬৮,০০০) সে সংখ্যাটি হচ্ছে ঐ মূলের প্রারম্ভে সপ্তর্ষির অবস্থান জ্ঞাপক, যাকে ১০,০০০ দিয়ে গুণ

করা হয়েছে। ৬৮,০০০-কে ১০,০০০ দিয়ে ভাগ দিলে আমরা ভাগফল পাই
৩৫০ ৬⅘, অর্থাৎ ৬ রাশি এবং সপ্তমরাশির ২৪ ডিগ্রী। স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, ১০,০০০-কে ৪৭ দিয়ে ভাগ দিলে সূর্যের একরাশি পরিভ্রমণে সপ্তর্ষির সৌর-মানের ২১২ বৎসর ১ মাস ৬ দিন লাগবে এবং রাশির এক ডিগ্রী পার হতে তার লাগবে ৭ বৎসর ১ মাস ৩ দিন; আর একটি চন্দ্ররাশি অতিক্রম করতে সপ্তর্ষির লাগবে ১৪ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন।

বরাহমিহির ও বটেশ্বরের মধ্যে কত পার্থক্য! অবশ্য লিপিকারের দোষ যদি না থেকে থাকে। উদাহরণচ্ছলে, যদি আমরা উপরোক্ত পদ্ধতিতে আমাদের বর্তমান সনে সপ্তর্ষির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করি তাহলে সপ্তর্ষির অবস্থান অনুরাধা নক্ষত্রের ৯ ডিগ্রী ১৭ মিনিট পাওয়া যাবে।

কাশ্মীরের লোকেরা মনে করত যে প্রত্যেক চন্দ্রক্ষেত্র (পত্নী) পরিভ্রমণ করতে সপ্তর্ষির শত বৎসর লাগে। সেজন্য উপরোক্ত (কাশ্মীরী) পঞ্জিকাতে বলা হয়েছে যে বর্তমানে এই শত বৎসর পূর্ণ হতে এখনও ২৩ বৎসর বাকী আছে।

এই সব ভ্রান্তির উদ্ভব এজন্য যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এদের যথেষ্ট অনুশীলন নাই এবং বিজ্ঞানের সাথে এরা ধর্মমত মিশিয়ে ফেলে। ওদের ধর্মশাস্ত্রকারদের বিশ্বাস যে, সপ্তর্ষির স্থান সমস্ত স্থির নক্ষত্রের উর্ধ্বে, এবং প্রত্যেক মন্বন্তরে নতুন মনুর আবির্ভাব হবে, যার সন্তানরা পৃথিবীর রাজা হবে, নতুন ইন্দ্রের আধিপত্য হবে এবং এই রকম সমস্ত দেবতা ও সপ্তর্ষিরও নতুন করে উদ্ভব হবে। দেবতার আবশ্যক, কারণ মানুষ তাদের নামে যজ্ঞ করবে এবং তাদের প্রাপ্য ভাগ অগ্নিতে আহুতি দেবে; সপ্তর্ষির থাকাও প্রয়োজন, কেননা ওরাই বেদ সংস্কার করবে, যেহেতু প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে বেদ লুপ্ত হয়ে যায়।

এই অধ্যায়ে যা বলা হল তা বিষ্ণুপুরাণ থেকে সংকলিত। প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষির নামের যে তালিকা নিম্নে দিলাম তা-ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে নেওয়া।

মন্বন্তরের ক্রমিক সংখ্যা	মন্বন্তর অনুযায়ী সপ্তঋষিগণের নাম						
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১ ২	এই মন্বন্তরে উর্জস্তম্ভ (?)	মনু ব্যতীত প্রাণ	ইন্দ্র বা সপ্তর্ষি দত্ত	কেহই ছিল না নিশ্চযভ	নিশ্চর	শর্বরী (উর্বরী)	বানশ্চ (?)
৩ ৪	বশিষ্ঠ পুত্রগণ জ্যোতি (?)	ধাম (?)	পৃথু	কাবা	চিত্রাগ্নি (?)	বরক (বনক)	পীবর
৫	হিরণ্য রোমা	বেদশ্রী (?)	ঊর্ধ্ববাহু (উর্ধ্ববাহু)	অপরা	বেদবাহু	সুবাহু	পর্জন্য
৬ ৭ ৮	সুমেধা বশিষ্ঠ দীপ্তিমান	বিরাজ কাশ্যপ গালব	হবিষ্ম অত্রি কৃপ	মধু জমদগ্নি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা	অতিনামা গোতম পরাশর	সহিষ্ণু বিশ্বামিত্র পরাশর পুত্র ব্যাস	চর্ষ্য ভরদ্বাজ ঋষ্যশৃঙ্গ
৯	সবন (সবল)	দ্যুতিমান	হব্য	বসু	মেধাধৃতি	জ্যোতিষ্মান	সত্য
১০	হবিষ্মান	সুকৃতি	সত্য	অপাম্মূর্তি	পাত্তাগ	অপ্রতিমৌজ	সুক্ষেত্র
১১ ১২	নিশ্চর তপস্বী	অগ্নিধ্র সুতপ	বপুষ্মান তপোমূর্তি	বিষ্ণু তপোরিত	আরুণী তপোধৃতি	হবিষ্মান দ্যুতি	অনঘ ইশচন্য (? তপোধন
১৩ ১৪	নির্মোহ অগ্নিবাহু	তত্ত্বদর্শী শুচি	নিষ্প্রকম্প শুক্র	নিরুৎসুক মাগধ	ধৃতিমান অগ্নিধ্র	অব্যয় যুক্ত	সুতপা অজিত

ছেচল্লিশ অধ্যায়

নারায়ণ ও তার বিভিন্ন অবতারের নাম

৩৩২ হিন্দুদের মতে নারায়ণ এমন এক অপ্রাকৃত শক্তির নাম, সত্য দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা কিংবা কু দিয়ে কু প্রতিষ্ঠা করা যার লক্ষ্য নয়। সে অধর্ম ও পাপকে যে-কোনও উপায়ে রোধ করতে চায়। তার কাছে মংগল (অমংগলের) অগ্রবর্তী কিন্তু 'সু'-এর জয় যদি সুষ্ঠুভাবে না হয় তাহলে তদুদ্দেশ্যে মন্দ ব্যবহার না করে উপায় নাই। এই তত্ত্বটি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান যেতে পারে; একটি অশ্বারোহী শস্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে: তার ভুল বুঝতে পেরে, যাতে সে তার অপকর্ম রোধ করতে পারে, সেজন্য সে ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে যখন চাইল তখনও যে পথ দিয়ে ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল সেই পথ দিয়েই তার অশ্বকে পিছিয়ে আনতে হবে, যদিও তা করতে গিয়ে প্রবেশ করার সময় শস্যের যে ক্ষতি হয়েছিল ঠিক তত এমনকি তার চেয়েও অধিক, ক্ষতিই সে করবে, কিন্তু প্রতিকার করার তার আর অন্য উপায় নাই।

হিন্দুরা এই শক্তি ও 'আদি কারণের' মধ্যে কোন প্রভেদ করে না। পৃথিবীতে যখন সে রূপ পরিগ্রহ করে তখন আকৃতি, শরীর ও বর্ণে মর্ত্যবাসীদের সাথেতার সাদৃশ্য না রেখে তার আবির্ভাব সম্ভব নয়।

তার আবির্ভাব বহুবার হয়েছে। প্রথম মন্বন্তরের শেষে তার আবির্ভাব হয় (بالکل) বালখিল্যের হাত থেকে বিশ্বজগতের আধিপত্য হরণ করে স্বহস্তে নেওয়ার জন্য। বালখিল্যের নামেই এই মন্বন্তর প্রসিদ্ধ হয়েছে। নারায়ণ এসে শতযজ্ঞকারী 'শতক্রতুকে' ত্রিলোকের আধিপত্য দিয়ে তাকেই ইন্দ্ররূপে বরণ করলেন। আর একবার নারায়ণ ষষ্ঠ মন্বন্তরের শেষে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন তিনি বিরোচন পুত্র বলিরাজাকে বধ করেন। বলি পৃথিবীর অধিপতি ছিল এবং তার মন্ত্রী ছিল বৃহস্পতি। বলিরাজা জননীর মুখেই শুনেছিল যে তার পিতার কাল তার কালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কেননা সে কাল কৃতযুগের নিকটবর্তী ছিল এবং মানুষ তখন পরম সুখে ও শান্তিতে বাস করত এবং দুঃখ-ক্লেশ জানত না। সে তখন পিতার সমকক্ষ হবার চেষ্টায় মেতে উঠল; সৎকার্য,

দান-দক্ষিণা, ধন-বিতরণ ও এমন সব যজ্ঞ করতে লাগল, যার একশত সংখ্যা পূর্ণ হলে যজ্ঞকারী স্বর্গ ও মর্ত্যের রাজা হবার অধিকার অর্জন করে, এইরূপ নিরানব্বই যজ্ঞ প্রায় সম্পন্ন করেছে, এমন সময় দেবগণ তাদের মর্যাদা
৩৩৩ হানির আশংকায় চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বুঝতে পারল যে মানুষ দেবত্বপ্রাপ্ত হলে তাদের নিকট থেকে দেবতাদের আর কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। তারা তখন সমবেতভাবে নারায়ণের কাছে গিয়ে তার সাহায্য চাইল। নারায়ণ তাদের প্রার্থনা পূরণ করে 'বামন' হয়ে ধরায় অবতীর্ণ হলেন। বামন এমন মানুষকে বলা হয়, দেহের তুলনায় যার হস্তপদ খর্ব এবং খর্বতার জন্য যাকে বিসদৃশ্য মনে করা কয়। বামনরূপী নারায়ণ বলিরাজার যজ্ঞস্থলে এমন সময়ে এসে উপস্থিত হোল যখন ব্রাহ্মণরা অগ্নির চতুর্দিকে সমবেত হয়েছে, তার মন্ত্রী বৃহস্পতি তার সম্মুখে দণ্ডায়মান, ধনাগার উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং দান-দক্ষিণা ও উপঢৌকন দেওয়ার জন্য সমস্ত মণিমাণিক্য স্তূপাকারে জড় করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে বামন বেদের যে অংশের নাম এখন সামবেদ সে অংশ থেকে ব্রাহ্মণদের মত মর্মস্পর্শী সুরে পাঠ করে মুক্ত হস্তে তার প্রার্থনা ও ইচ্ছা পূরণ করার জন্য রাজার কাছে আবেদন করতে লাগল। বৃহস্পতি তখন রাজাকে জনান্তিকে বল্ল: 'এ লোকটি নারায়ণ। তোমার রাজ্য হরণ করতে এসেছে।' আনন্দের আতিশয্যে রাজা তার কথায় কর্ণপাত করল না এবং বামনকে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে বল্ল। বামন বলল্: 'তোমার রাজ্যের চার-পদ পরিমাণ ভূমি চাই, যেখানে আমি বাস করতে পারি।' 'তোমার যা ইচ্ছা, আর যেমনভাবে নিতে ইচ্ছা কর, তা নিয়ে যাও।' এই বলে, তাদের প্রথামত হাতে জল ঢেলে দান সম্পূর্ণ করার জন্য রাজা জল আন্তে আদেশ দিলেন। রাজার প্রতি অনুরাগের বশে বৃহস্পতি তখন নলযুক্ত একটি জলের ভাণ্ড নিয়ে এল, তার নলের ছিদ্র ছিপি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল যাতে জল গড়িয়ে আসতে না পারে। ছিপির ছিদ্রটি বন্ধ রাখার জন্য সে তার চতুর্থ অঙ্গুলি দিয়ে একটি কুশখণ্ড চেপে ধরে রেখেছিল। বৃহস্পতির এক চক্ষু অন্ধ ছিল, তার জন্য সে ছিদ্রটি ঠিক বন্ধ করতে পারল না, ফলে জল গড়িয়ে এল। বামন তখন পূর্বদিকে একপদ অগ্রসর হোল, পশ্চিম দিকে আর এক পদ এবং উপরের দিকে 'স্বরলোক' পর্যন্ত আর এক পদ বাড়াল। চতুর্থ পদের মত পৃথিবীতে আর স্থান ছিল না। সে তখন রাজাকে দাসে পরিণত করার জন্য তার চতুর্থ পদ রাজার দুই কাঁধের মাঝে স্থাপন করল। এইভাবে বামন রাজাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে পাতালে নামিয়ে নিয়ে গেল এবং ত্রিলোক তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পুরন্দরের হাতে আধিপত্য দিল।

বিষ্ণুপুরাণে আছে : 'রাজা মৈত্রেয় পরাশরকে যুগাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন
৩৩৪ করলেন। পরাশর উত্তর দিলেন : যুগের অস্তিত্ব এজন্য তার মধ্যে বিষ্ণু যেন কর্মে রত থাকেন। কৃতযুগে জ্ঞান বিস্তারের জন্য কেবল কপিলরূপে তিনি আবির্ভূত হন; ত্রেতাযুগে তিনি আসেন কেবল 'রাম' রূপে; সহিষ্ণুতা প্রচার, দুষ্টের দমন, তেজ ও সৎকর্মের দ্বারা ত্রিলোক রক্ষার জন্য। দ্বাপরযুগে তিনি আসেন ব্যাসরূপে, বেদকে চার ভাগে ভাগ করেও তার বিভিন্ন শাখা প্রসারণের জন্য; দ্বাপরের শেষে বিষ্ণু আসেন বাসুদেব রূপে, দৈত্যনাশ করতে; আর কলিযুগ 'যশু' (جسو) ব্রাহ্মণের পুত্র কলির দেহধারণ করে আবির্ভূত হবেন সমস্ত জীব ধ্বংস করতে এবং যুগচক্র পুনরায় আরম্ভ করতে। এই হচ্ছে বিষ্ণুর কর্ম।'

বিষ্ণুপুরাণেরই অন্যত্র আছে : বিষ্ণু নারায়ণের-ই অন্য নাম। প্রত্যেক দ্বাপরের শেষে ইনি বেদকে চতুর্বেদে ভাগ করতে ধরায় অবতীর্ণ হন; কেননা মানুষ দুর্বল, সম্পূর্ণ বেদ সে ধারণ করতে পারে না। ব্যাসের রূপ ধরে তিনি ধরায় আবির্ভূত হন।'

বর্তমান, সপ্তম মন্বন্তরের বিভিন্ন চতুর্যুগে আবির্ভূত এই ব্যাসের নাম নিয়ে মতভেদ আছে। তা সত্ত্বেও নিম্নের তালিকায় তাদের নাম আমি লিপিবদ্ধ করছি।

১। স্বয়ম্ভু
২। প্রজাপতি
৩। উষণ (উষানস)
৪। বৃহস্পতি
৫। সবিতা (সাবিত্রী)
৬। মৃত্যু
৭। ইন্দ্র
৮। বশিষ্ঠ
৯। সারস্বত
৩৩৫ ১০। ত্রিধাম
১১। ত্রিবৃশ
১২। ভরদ্বাজ
১৩। অন্তরীক্ষ
১৪। বপ্র
১৫। এয়্যারুন
১৬। ধনঞ্জয়
১৭। কৃতঞ্জয়
১৮। ঋণজ্যেষ্ঠ
১৯। ভরদ্বাজ
২০। গোতম
২১। উত্তম
২২। হর্যাত্তম
২৩। বেনব্যাস (বেদব্যাস)
২৪। রাজশ্রবস
২ । সোম সুষ্ম
২৬। ভার্গব
২৭। বাল্মিক
২৮। কৃষ্ণ
২৯। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হচ্ছেন পরাশরপুত্র ব্যাস। এর মধ্যে ২৯তম ব্যাস এখনও আবির্ভূত হয়নি, তবে অদূর ভবিষ্যতে হবে।

'বিষ্ণুধর্ম'' পুস্তকে আছে 'হরি' অর্থাৎ নারায়ণের নাম যুগে যুগে বদলায়। সে নামগুলি এই: বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।' আমার অনুমান, নামের এই তালিকায় কোনও নীতি বা পারম্পর্য পালিত হয়নি, কেননা বাসুদেব, চতুর্যুগের শেষ যুগের।

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র আছে: 'তার (হরির) বর্ণ-ও যুগে যুগে বদলায়। কৃতযুগে হয় শ্বেত, ত্রেতাযুগে রক্তিম, আর দ্বাপরে হয় পীত। এই পীতবর্ণ হচ্ছে মানবাকৃতি ধারণ করার প্রাথমিক স্তর। কলিযুগে তাঁর বর্ণ হয় কৃষ্ণ।

এই বর্ণত্রয় হিন্দুদের মৌলিক ত্রিগুণের মত। ওদের উক্তিমতে, সত্ত্বগুণ হচ্ছে স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ, রজঃগুণ রক্তবর্ণ, আর তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ। হরির শেষ আবির্ভাবের বর্ণনা আমি পরবর্তী অধ্যায়ে করব।

সাতচল্লিশ অধ্যায়

বাসুদেব ও ভারত 'সমর'

৩৩৬ রোপণ ও প্রজনন দ্বারা বিশ্বে জীবনের ধারা অব্যাহত থাকে। কালক্রমে এই দুই কর্ম বৃদ্ধি পায় আর সে বৃদ্ধির কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না; অথচ বিশ্বের আয়তন সীমাবদ্ধই থাকে।

কোন উদ্ভিদ বা জীবশ্রেণী নিজ গঠন বা আকৃতির বিকাশে যখন ক্ষান্ত হয়, এবং সেই আকৃতিতে ঐ শ্রেণী যখন এক বিশেষ প্রজাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সে শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র প্রাণী বা উদ্ভিদ একবার মাত্র জন্মেই লয়প্রাপ্ত হয় না, বরঞ্চ একাধিকবার নিজের মত আর একটি বা বহু প্রাণী বা উদ্ভিদের জন্ম দিয়ে যায়। প্রাণী বা উদ্ভিদের এই বিশেষ প্রজাতি তখন সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করে নেয় এবং যেখানে সুযোগ পায় সেখানেই নিজ প্রজাতি বিস্তার করতে থাকে। কৃষক তার শস্য নির্বাচন করে, তার প্রয়োজন মত শস্য রেখে, বাকী অংশ সে উপড়ে ফেলে। বৃক্ষের যে শাখাগুলি উত্তম মনে হয় উদ্যান রক্ষক সেগুলিকে রেখে অন্যগুলি ছেঁটে ফেলে। তেমনই, যে মৌমাছি কেবল খায়, মধুচক্রে কোনও কর্ম করে না, তাকে অন্য মৌমাছিরা মেরে ফেলে।

প্রকৃতিও তাই করে। তবে সে কোনও ভেদাভেদ করে না; কারণ সকল অবস্থাতেই তার কার্য এক প্রকারেরই হয়। বৃক্ষের ফল ও পাতাকে প্রকৃতি বিনষ্ট করে, যাতে তাদের স্বভাব-নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াতে তারা নিজকে বিস্তৃত না করতে পারে। সেজন্য প্রকৃতি তাদিগকে সরিয়ে অন্যের স্থান করে দেয়।

তেমনই, অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যখন পৃথিবী বিনষ্ট, কিংবা বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়, তখন তাঁর বিধাতা—প্রতিটি অণুপরমাণুতে যাঁর সামগ্রিক (كلية) প্রসাদ পরিব্যাপ্ত—এক দূত প্রেরণ করেন, যে এই সংখ্যাধিক্যকে হ্রাস এবং পাপের মূলোচ্ছেদ করে। হিন্দুদের বিশ্বাসমতে, বাসুদেব এইরূপ একজন দূত। ইনি শেষবারে বাসুদেব নামে মানবরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, যখন পৃথিবীতে বলদৃপ্ত নর-দানবের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং তাদের অত্যাচারে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছিল, বসুন্ধরা তাদের সংখ্যা ধারণে অক্ষম

এবং তাদের পদভারে কম্পিতা হচ্ছিল। তখন, মথুরা নগরের রাজা কংসের ভগ্নির গর্ভে বাসুদেবের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বাসুদেব ছিল জাট বংশীয় নীচ শূদ্র পশুপালক। কংস তার ভগ্নীর বিবাহ কালে দৈববাণী শুনে বুঝেছিল যে তার ভগ্নীর পুত্রের হাতে তার বিনাশ হবে। সেজন্য তার ভগ্নীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই তার কাছে নিয়ে আসতে সে লোক নিযুক্ত করেছিলো। এইভাবে সে তার ভগ্নীর প্রতিটি পুত্র-কন্যাকে হত্যা করত। অবশেষে
৩৩৭ বলভদ্র নামে তার ভগ্নীর এক পুত্রসন্তান জন্মাল। তাকে 'যশো' (যশোদা) নাম্নী গোপালক নন্দের স্ত্রী নিয়ে গিয়ে পালন করতে লাগল এবং তাকে কংসের অনুচরদের নিকট থেকে গোপন করে রাখল। তারপর, চন্দ্র যখন রোহিণীতে ঊর্ধ্বগামী, ভাদ্রপাদের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে, এক বর্ষারাত্রে, কংসের ভগ্নীর অষ্টম গর্ভে বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হোল। রক্ষীরা তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত, এই সুযোগে পিতা নবজাত শিশুকে চুরি করে যমুনার অপর পারে মথুরার নিকটবর্তী 'নন্দকুল' নামক যশোদার স্বামী নন্দের গোশালায় নিয়ে এল। বাসুদেব শিশুকে নন্দের সদ্যজাত কন্যা সন্তানের স্থলে সেখানে রেখে কন্যাকে রক্ষীদের কাছে নিয়ে এল। কংস সে কন্যা সন্তানকে হত্যা করতে চাইলে কন্যাটি শূন্যে উড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে বাসুদেব যশোর কাছে লালনপালন হ'তে থাকল। শিশু যে তার কন্যার সংগে পরিবর্তিত হয়েছে, সে কথা যশো বুঝতে পারল না। তবে কংস সে সংবাদ জানতে পারল। সে তখন নানা ছল চাতুরী করে শিশুকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টারই বিপরীত ফল হোল। অবশেষে, তার সম্মুখে এসে মল্লযুদ্ধ করতে বাসুদেবকে প্রেরণ করার জন্য কংস তার পিতামাতাকে আদেশ দিল। বাসুদেব তখন সকলের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে লাগল; পথে পুষ্করিণীর কমল রক্ষায় নিযুক্ত সর্পের নাসারন্ধ্রে রজ্জুবিদ্ধ করে তার মাতৃস্বসার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করল; মল্লযুদ্ধে পরিধান করার জন্য বস্ত্র দিতে অস্বীকার করায় রজককে বধ করল এবং মল্লযোদ্ধাদের প্রসাধনে নিযুক্ত পরিচারিকার হাত থেকে চন্দন কেড়ে নিল। তারপরে আবার তাকে হত্যা করার জন্য যে মত্তহস্তী সংগ্রহ করা হয়েছিল কংসের দ্বার সম্মুখে তাকেও বধ করল। বাসুদেবের এইসব আচরণে কংসের ক্রোধ এত উদ্দীপ্ত হোল যে উত্তেজনায় তার পিত্তকোষ ফেটে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হলো। তখন তার ভাগিনেয় বাসুদেব তার রাজ্যের অধিকার পেল।

প্রতি মাসে বাসুদেবের ভিন্ন নাম আছে। তাঁর ভক্তরা 'মার্গশীর্ষ' থেকে মাস গণনা আরম্ভ করে। প্রত্যেক মাস একাদশ দিবসে আরম্ভ হয়, কারণ ঐ দিনে বাসুদেবের আবির্ভাব হয়েছিল।

মাস	বাসুদেবের নাম	মাস	বাসুদেবের নাম
মার্গশীর্ষ	কেশব	জ্যৈষ্ঠ	ত্রিবিক্রম
পৌষ	নারায়ণ	আষাঢ়	বামন
মাঘ	মাধব	শ্রাবণ	শ্রীধর
ফাল্গুন	গোবিন্দ	ভাদ্রপদ	হৃষিকেশ
চৈত্র	বিষ্ণু	অশ্বযুজ	পদ্মনাভ
বৈশাখ	মধুসূদন	কার্তিক	দামোদর

৩৩৮ মৃত কংসের ভগ্নীপতি বাসুদেবের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মথুরায় ছুটে এসে রাজ্য অধিকার করে নিয়ে বাসুদেবকে সমুদ্রের দিকে নির্বাসিত করল। সমুদ্রতীরে তার জন্য দ্বারকায়[১] স্বর্ণ প্রাসাদ আবির্ভূত হোল। বাসুদেব তাতে বসবাস করতে থাকল।

কৌরব বংশীয়রা তাদের খুল্লতাত পুত্রদের অভিভাবক ছিল। তাদিগকে আতিথ্যে আপ্যায়িত করে কৌরব বংশীয়রা তাদের সংগে দ্যূতি ক্রীড়া করল এবং তাতে পাণ্ডুপুত্রদের সমস্ত সম্পত্তি বাজী রাখল। ক্রীড়ায় পাণ্ডবরা পরাজিত হ'তে হ'তে এমন অবস্থায় পৌঁছল যে দশ বৎসরাধিক কালের জন্য নির্বাসন ও দেশের প্রত্যন্তভাগে অজ্ঞাতবাসের অঙ্গীকারে তাদেরকে আবদ্ধ করা হোল। শেষোক্ত শর্ত পালন না করলে, দশ বৎসরাধিক কাল আবার তাদেরকে নির্বাসনে যেতে হবে। পাণ্ডুপুত্ররা তাই করল। অবশেষে তাদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার সময় উপস্থিত হোল। তখন দুই পক্ষই সৈন্য সমাবেশ ও মিত্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল। অবশেষে থানেশ্বরের প্রান্তরে অসংখ্য সৈন্য সমবেত হোল। সেখানে অষ্টাদশ 'অক্ষৌহিণী' সৈন্য ছিল। দুই পক্ষের প্রত্যেকেই বাসুদেবকে মিত্ররূপে পেতে চেষ্টা করতে লাগল। বাসুদেব তখন প্রত্যেক পক্ষকে হয় একাকী তাঁকে, নয়ত সৈন্যসহ তাঁর ভ্রাতা 'বলভদ্র'কে বেছে নিতে বলল। পাণ্ডুপুত্ররা বাসুদেবকেই মনোনীত করল। পাণ্ডুপুত্ররা ছিল পাঁচজন : যুধিষ্ঠীর (অধিনায়ক), বীর শ্রেষ্ঠ অর্জুন, সহদেব, ভীমসেন ও নকুল। এদের সৈন্য ছিল সাত অক্ষৌহিণী। সৈন্য বলে কিন্তু তাদের শত্রুরাই

১ আরবী অক্ষরে بارزی ; Sacha পড়েছেন Baradau। দ্বারকার আরবী প্রতিলিপি হবে ابازوی>باز و یہ کک ; بارد کک তার থেকে নকলক্রমে <دبارو کک

শ্রেষ্ঠ ছিল। বাসুদেবের শিক্ষা ও কূটবুদ্ধির সাহায্য না পেলে তাদের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব হতো না। কিন্তু অবশেষে (শত্রুপক্ষের) সে বিপুল বাহিনী সব ধ্বংস হয়ে গেল এবং পঞ্চভ্রাতা ব্যতীত আর কেউ-ই জীবিত থাকল না। বাসুদেব তারপরে নিজ বাসভূমিতে ফিরে গেল এবং কালক্রমে 'যাদব' নামিত তার গোষ্টীবর্গসহ তার মৃত্যু হোল। যুদ্ধান্তে পঞ্চভ্রাতাও বৎসরকাল অতীত হওয়ার পূর্বে-ই পরলোক গমন করল।

অর্জুনের সংগে বাসুদেবের ব্যবস্থা ছিল যে অর্জুনের বাম হাত বা বাম চক্ষু স্পন্দিত হলে তাকে বাসুদেবের আসন্ন অমংগলের সংকেত বলে মনে করতে হবে। সেই সময়ে দুর্বাসা নামে এক মহা তাপস ঋষি ছিল। বাসুদেবের
৩০৯ আত্মীয় ও গোষ্ঠীবর্গরা অত্যন্ত হঠকারী ও বাচাল প্রকৃতির লোক ছিল। তাদের একজন স্বীয় বস্ত্রের মধ্যে একটি লোহার কড়াই রেখে নিজকে গর্ভবতী বলে দুর্বাসাকে বিদ্রূপ করার জন্য তার গর্ভে কি জন্মাবে, জানতে চাইল। ঋষি বলল : 'যে বস্তু তোমার ও তোমার গোষ্ঠীবর্গের মৃত্যুর কারণ হবে, তোমার গর্ভে তাই আছে। বাসুদেব এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিমর্ষ হলো, কারণ ঋষিবাক্য সত্য হবে তা সে জানত। সেজন্য কড়াইটিকে উখা দিয়ে ঘষে ঘষে লোহার চূর্ণকে জলে নিক্ষেপ করার আদেশ দিল। তাই করা হোল; কিন্তু কড়াই এর সামান্য অংশ অবশিষ্ট থেকে গেলে, যে লোকটি ঘষছিল সে তা উপেক্ষণীয় মনে করে সেই অবস্থাতে-ই সেটিকে ফেলে দিল। একটি মাছ এসে কড়াই এর সেই খণ্ডকে গিলে ফেলল। এই মাছটি পরে ধরা পড়লে এক ধীবর তার উদরে লোহার সেই খণ্ডটি পেল। তা নিয়ে সে বাণের ফলা নির্মাণ করল।

বিধি-নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হোল, বাসুদেব তখন সমুদ্রতীরে বৃক্ষ-ছায়ায় এক পা অন্য পায়ের উপর রেখে নিদ্রিত ছিল। ধীবর তাকে হরিণ মনে করে তার দিকে বাণ নিক্ষেপ করল। বাণ বাসুদেবের দক্ষিণ পায়ে বিদ্ধ হোল। এই ক্ষত-ই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে অর্জুনের বাম অংগ স্পন্দিত হতে লাগল। পরে তার বাম হাতও কাঁপতে লাগল। তার ভ্রাতা সহদেব অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছিল যেন সে কারুর সাথে কখনই গলাগলি না করে, যাতে তার শক্তি ক্ষয় না হয়। অর্জুন বাসুদেবর কাছে এল, কিন্তু উপরোক্ত পরামর্শের জন্য তার সাথে গলাগলি করতে পারল না। বাসুদেব তার ধনুক এনে অর্জুনকে দিতে বলল; অর্জুন তাতে নিজ শক্তি পরীক্ষা করে দেখল। বাসুদেব মৃত্যুর পর তার ও তার আত্মীয়বর্গের শব দাহ করতে

এবং তার স্ত্রীগণকে দুর্গ থেকে নিয়ে আসতে অর্জুনকে অনুরোধ করল। তারপর সে দেহত্যাগ করল।

ঘর্ষণের সময়ে লোহার কড়াই-এর চূর্ণ যে মাটিতে পড়েছিল, তার থেকে একরূপ উদ্ভিদ জন্মেছিল। যাদবরা সেখানে এসে সেই উদ্ভিদের ডাল কেটে গুচ্ছ করে বেঁধে তাতে বসে সুরাপান করতে লাগল। পান করতে করতে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও কলহ আরম্ভ হোল। নেশায় মত্ত হয়ে তখন তারা সেই উদ্ভিদ গুচ্ছ দিয়ে পরস্পরকে প্রহার করতে লাগল এবং এইভাবে তারা পরস্পর কে হত্যা করল। এ ঘটনা সোমনাথের নিকট সরস্বতী নদী সমুদ্র-সংগমের কাছে ঘটেছিল।

বাসুদেব তাকে যা যা করতে বলেছিল, অর্জুন তার সবই করেছিল। যাদব নারীদিগকে নিয়ে আসার সময়ে সে অতর্কিতে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হোল। তখন তার ধনুকে জ্যা আরোপণ করতে না পেরে অর্জুন অনুভব করল যে তার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। তখন সে ধনুক নিয়ে নিজ মস্তকের উপরে চক্রাকারে ঘোরাতে লাগলো। যারা সে ধনুকের তলে ছিল তারা নিষ্কৃতি পেল, তার বাইরের সকলকেই দস্যুরা বন্দী করল। অর্জুন ও তার ভ্রাতারা বেঁচে থেকে
৩৪০ আর কোনও লাভ নাই দেখে উত্তরাঞ্চলে গিয়ে পর্বতমালায় প্রবেশ করল, যেখান থেকে তুষার কখনও বিগলিত হয় না। সেই প্রচণ্ড হিমে একে একে তাদের মৃত্যু হোল, কেবল যুধিষ্ঠীর অবশিষ্ট রইল। তাকে স্বর্গে প্রবেশ করার সম্মান দেওয়া হোল বটে কিন্তু তার পূর্বে কৃষ্ণ ও তার ভ্রাতাদের অনুরোধে পড়ে জীবনে একটি মাত্র মিথ্যাকথনের জন্য তাকে নরক অতিক্রম করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণ শরদ্রো কর্ণগোচর করে উচ্চারিত সে মিথ্যাবাক্যটি এই: 'অশ্বত্থামা হত, গজ'; অশ্বত্থামা' ও গজ শব্দদ্বয়ের মধ্যে যুধিষ্ঠীর বিরতি দিয়েছিল, যার থেকে দ্রোণ ধরে নিয়েছিল যে তার পুত্রই নিহত হয়েছে। যুধিষ্ঠীর দেবগণকে বলল: 'যদি তাই হতে হয়, এবং তার থেকে নিস্তার যদি না-ই থাকে, তাহলে নরকবাসীদের জন্য আমার সুপারিশ যেন মঞ্জুর করা হয় এবং তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়।' তার এই প্রার্থনা পূরণ করা হোল এবং তাদের সকলকে নিয়ে যুধিষ্ঠীর স্বর্গে চলে গেল।

আটচল্লিশ অধ্যায়

অক্ষৌহিণীর পরিমাণ ব্যাখ্যা

প্রত্যেক অক্ষৌহিণীতে	১০ অনিগনি থাকে
,, অনিগনিতে	৩ চমূ ,,
,, চমূতে	৩ পৃতন ,,
,, পৃতনে	৩ বাহিনী ,,
,, বাহিনীতে	৩ গন ,,
,, গন-এ	৩ গুল্ম ,,
,, গুল্মতে	৩ সেনামুখ ,,
,, সেনামুখে	৩ পত্তি ,,
,, পত্তিতে	১ রথ ,,

শতরঞ্জ খেলাতে এই রথকে রুখ' বলা হয় ঃ আয়োনীয়রা তাকে 'যুদ্ধযান বলত। Athens এর মনকালুস (Mangalus) সর্বপ্রথমে এটি আবিষ্কার করে। এথেন্সবাসীরা বলত যে সর্বপ্রথম তারাই যুদ্ধরথে আরোহণ করে। আসলে কিন্তু তার পূর্বেই ভারতীয় Aphrodisi কতৃক এর আবিষ্কার হয়েছিল যখন সে মহাপ্লাবনের প্রায় ৯০০ বৎসর পরে মিসরে রাজত্ব করছিল; তখন রথ টানার জন্য অশ্ব দুইটি যোজন করা হোত।

৩৪১ আয়োনীয়দের একটি কথিকায় আছে: Athene-এর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে Hephaestos তাকে হরণ করতে চাইলে Athene তার কৌমার্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করল। Hephaestos তখন Athens দেশে লুকিয়ে থেকে বল প্রয়োগ করে Athene-কে ধর্ষণ করার চেষ্টা করল। Athene কিন্তু তাকে বর্শার আঘাতে বিদ্ধ করে ফেলল। তখন Hephaestos তাকে ছেড়ে দিল। তার বীর্য মাটিতে পড়েছিল, তার থেকে Ericthonius-এর উদ্ভব হোল। সূর্যের রথের মত এক রথে আরোহণ করে Ericthonius এল এবং অশ্বের বল্গাধারী-ও রথের উপরে তার সাথে-ই ছিল। ময়দানে ঘোড়দৌড় ও গাড়ী চালনার প্রতিযোগিতার যে দস্তুর আমাদের যুগে আছে, তা অনেকটা ঐ প্রকারের।

এক রথে একটি গজ, ৩ জন অশ্বারোহী ও পাঁচটি পদাতিক-ও থাকে। উপরোক্ত বিভাগগুলি যুদ্ধায়োজন, শিবির সন্নিবেশ ও সৈন্য চালনার জন্য প্রয়োজন হয়।

অতএব, এক অক্ষৌহিণীতে ২১,৮৭০ রথ, ২১৮৭০ গজ, ৬৫৬১০ অশ্বারোহী ও ১,০৯,৩৫০ পদাতিক থাকে। কিন্তু প্রত্যেক রথে সহীস সহ চারজন অশ্বারোহী, ধনুর্বাণধারী রথী ও বর্শাধারী তার দুই সহচর, তার পিছনে একজন দেহরক্ষী এবং রথ সংস্কারক একজন করে কারিগর থাকে। তেমনই, প্রত্যেক গজের উপরে মাহুত ও তার সহকারী ব্যতীত ধনুর্বাণে সজ্জিত গজপতি ও বর্শাধারী তার দুইজন করে সহচর, তার বিদূষক এবং হোহর (? হৈ হের ?) থাকে, যে তার অগ্রে অগ্রে দৌড়ায়। অতএব, রথে ও গজপৃষ্ঠে যত লোক থাকে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২,৮৪,৩২০ (!); যারা অশ্ব-পৃষ্ঠে থাকে তাদের সংখ্যা ৮৭,৪৮০। এক অক্ষৌহিণীতে ২১,৮৭০টি গজ, এবং ২১,৮৭০টি রথ থাকে, আর অশ্ব থাকে ১,৫৩,০৯০, আর মানুষ ৪,৫৯, ২৮৩। এক অক্ষৌহিণীর অন্তর্গত গজ, অশ্ব ও মানুষ নিয়ে মোট প্রাণীর সংখ্যা ৬,৩৪,২৪৩। তাহলে, ১৮ অক্ষৌহিণীতে থাকবে মোট ১,১৪,১৬,৩৭৪ প্রাণী, অর্থাৎ ৩,৯৩,৬৬০ গজ, ২৭,৫৫,৬২০ অশ্ব, আর ৮২,৬৭,০৯৪ মানুষ।

এই হচ্ছে অক্ষৌহিণীর বিবরণ ও ব্যাখ্যা।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়

বিভিন্ন অব্দ

সময়ের কোনও বিশেষ কালকে অব্দের সাহায্যে চিহ্নিত করা যায়। যদিও
৩৪২ বিরাট সংখ্যা গণনা করতে হিন্দুরা ক্লান্তিবোধ করে না, বরন্তু তাতে আনন্দই পায়, তবুও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওরা সংখ্যাকে হ্রস্ব করতে বাধ্য হয়।

কাল গণনায় যে সব ঘটনাকে ওরা চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে তা এই :

(১) ব্রহ্মার অস্তিত্বের প্রারম্ভ।

(২) ব্রহ্মার বর্তমান অহোরাত্রির অর্থাৎ কল্পের আরম্ভ।

(৩) সপ্তম মন্বন্তরের আরম্ভকাল, যার মধ্যে আমরা আছি।

(৪) ২৮তম চতুর্যুগের প্রারম্ভকাল, যার মধ্যে আমরা আছি।

(৫) বর্তমান যুগের শেষ যুগ। এই যুগ 'কলি' নামে খ্যাত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার সময় এই যুগের শেষভাগে পড়ে। তা সত্ত্বেও 'কলিকাল' বলতে হিন্দুরা 'কলিযুগের' প্রারম্ভই বোঝে :

(৬) পান্ডবকাল, অর্থাৎ ভারত যুদ্ধের সময়।

প্রাচীনতার দিক দিয়ে এসব ঘটনা অত্যধিক পুরাতন, তার থেকে অব্দ গণনা করলে সে অব্দের বৎসর সংখ্যা শত সহস্র লক্ষ পেরিয়ে যাবে। অন্যদের ত' কথাই নাই, জ্যোতিষীদের পক্ষেও এরকম অব্দের ব্যবহার দুষ্কর।

এইসব অব্দের পরিচয় দেবার জন্য আমি, হিন্দুদের যে বৎসরের সর্বাধিক ভাগ Yazdgird অব্দের ৪০০ সালের মধ্যে পড়ে, তুলনার জন্য সেই বৎসরকে আমি প্রাথমিক মান-বৎসর হিসাবে ব্যবহার করব। এই বৎসরাঙ্কে শতকের সঙ্গে কোনও একক ও দশক সংখ্যা না থাকাতে অন্য বৎসরের তুলনায় সালটি আমাদের আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। তা ছাড়া এই সনটি অন্য কারণেও স্মরণীয়; তারই বৎসর–অনধিককাল পূর্বে জগৎসিংহ, যুগমানব, সুলতান মাহমুদের মত নৃপতি ও ধর্মের দৃঢ়তম স্তম্ভের লোকান্তর ঘটে।

৪০০ Yazdgird অব্দের নওরোজ হিন্দুদের বৎসরান্তের মাত্র ১২ দিন পরে হয় এবং উপরোক্ত দুর্ঘটনা ফার্সী মাসের হিসাব অনুযায়ী তারই পূর্ণ দশমাস পূর্বে ঘটেছিল।

আমাদের স্থিরীকৃত এই মান-বৎসর জানা থাকলে উপরোক্ত তারিখ থেকে আমরা বৎসর গণনা করতে থাকব, কেননা হিন্দুদের বৎসর ঐ তারিখে আরম্ভ হয় এবং ঐ তারিখেই প্রায় শেষ হয়, Yazdgird অব্দের প্রাগুক্ত ৪০০ সনের নওরোজ সেই তারিখের ১২ দিন পরে পড়ে।

৩৪৩ 'বিষ্ণুধর্মে' লিখিত আছে: 'বজ্র মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রহ্মার (ধাতার) আয়ুষ্কালের কতটা অতীত হয়েছে?' মার্কণ্ডেয় উত্তর দিলেন: 'তুমি যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছ, সেই সময় পর্যন্ত তার পরমায়ুর ১০ দিব্য বৎসর, ২৭ চতুর্যুগ, ৩ যুগ, ৭ সন্ধ্যা, ৬ মন্বন্তর, ৮ বৎসর, ৫ মাস ও ৪ দিবস অতীত হয়েছে।' তিনি আরও বললেন: 'এই উক্তি যে বিস্তারিত-ভাবে বুঝবে এবং যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে, সে হবে মহাজ্ঞানী এবং সেই, যে একক প্রভুর বন্দনা করে ও তারই সান্নিধ্য লাভের সাধনা করে যাঁকে "পরমাস্পদ" বলা হয়।'

কাল নিরূপণের পদ্ধতির যে ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে দিয়েছি পাঠক তা স্মরণ রেখেছে ধরে নিয়ে আমি মার্কণ্ডেয়র এই উক্তির বিশ্লেষণ এইভাবে করছি।

আমাদের স্থিরীকৃত মান-বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের ২৬২১৫,৭০, ২৯৪৮,১০২ বৎসর গত হয়েছে। ব্রহ্মার অহোরাত্র অর্থাৎ কল্পদিবসের ১৯৭২ ৯৪৮,১০২ এবং সপ্তম মন্বন্তরের ১২০,৫৩২,১০২ (বৎসর) অতীত হয়েছে। শেষোক্ত তারিখটি বলি রাজার বন্দী হওয়ার তারিখ, কারণ তা সপ্তম-মন্বন্তরের প্রথম চতুর্যুগে ঘটেছিল।

যে সব সন-তারিখ আমরা উল্লেখ করছি এবং ভবিষ্যতে করব, তা সবই সম্পূর্ণ বৎসর বলে ধরতে হবে, কেননা তারিখ নির্ণয়ে হিন্দুরা বৎসরের ভগ্নাংশকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না।

'বিষ্ণুধর্মে' উক্ত হয়েছে: বজ্রের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় বলেন: 'আমার জীবনের ৬ কল্প অতীত হয়েছে এবং সপ্তম কল্পের ৬ মন্বন্তর ও সপ্তম মন্বন্তরের ২৩ ত্রেতাযুগ অতীত হয়েছে। ২৪শ ত্রেতাযুগে রাম রাবণকে বধ করে এবং তার ভ্রাতা লক্ষ্মণ রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে বধ করে রাক্ষসগণকে পরাস্ত করে; সে সময়ে ঋষি বাল্মিকী রাম ও রামায়ণের কাহিনী রচনা করে
৩৪৪ গ্রন্থাকারে তাকে অমরত্ব দান করে। "কাম্যক বনে" পান্ডবপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আমিই সে কাহিনী শুনেছিলাম।'

বিষ্ণুধর্মকার খানে ত্রেতাযুগ দিয়ে কাল গণনা করেছেন, কারণ তার বর্ণিত ঘটনাগুলি কোনও এক ত্রেতাযুগে সংঘটিত হয়েছিল। তা ছাড়া,

অবিমিশ্র একক দিয়ে গণনা করাতে বেশী সুবিধা, অন্য কোনও প্রকার মিশ্র একক ব্যবহার করলে তার চতুর্থাংশগুলির উল্লেখ না করলে পরিমিত অংকটি স্পষ্ট হয় না। অধিকন্তু ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগ অপেক্ষা তার শেষভাগ উপরোক্ত ঘটনাগুলির জন্য বেশী উপযোগী, কেননা তা দুষ্কৃতি-যুগের বেশী নিকটবর্তী। হিন্দুরা অবশ্য রাম ও রামায়ণের তারিখ জানে। আমি কিন্তু তা নির্ণয় করতে পারিনি।

২৩ চতুর্যুগে ৯৯,৩৬০,০০০ বৎসর হয় এবং পরবর্তী চতুর্যুগের আরম্ভ থেকে তার ত্রেতাযুগের শেষ পর্যন্ত বৎসর সংখ্যা তার সংগে যোগ করলে মোট ১০২,৩৮৪,০০০ বৎসর হয়।

আমাদের মান-বৎসরে সপ্তম মন্বন্তরের যত বৎসর গত হয়েছে, তার থেকে যদি উপরোক্ত বৎসর সংখ্যা (১০২,৩৮৪,০০০) বিয়োগ করি, তাহলে ১৮, ১৪৮,১০২ বৎসর থাকে, অর্থাৎ রামের আনুমানিক তারিখ আমাদের মান-বৎসর থেকে ১৮,১৪৮,১০২ বৎসর পূর্বে হবে। কোনও নির্ভরযোগ্য শ্রুতি সমর্থন না করা পর্যন্ত এই তারিখটি আনুমানিক বলেই মানতে হবে। এই সনটি ২৮তম চতুর্যুগের ৩,৮৯২,১০২-তম বৎসর।

এই সমস্ত গণনা ব্রহ্মগুপ্তের অবলম্বিত পরিমাপ অনুযায়ী করা হয়েছে, পলিস ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়েই একমাত্র যে বর্তমান কল্পের পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুর ৬০৬৮ কল্প গত হয়েছে: তবে এই সংখ্যাকে চতুর্যুগে পরিণত করা নিয়ে এদের মতভেদ আছে। পলিসের মতে ৬০৬৮ কল্পে ৬১১৬৫৪৪ চতুর্যুগ হয়, আর ব্রহ্মগুপ্তের মতে ৪৮৫৪৪ কম, অর্থাৎ (৬১১৬৫৪৪—৪৮৫ ৪৪=) ৬০৬৮০০০ চতুর্যুগ হয়।

পলিসের মতানুসরণ করে আমরা যদি এক মন্বন্তরে 'সন্ধ্যা' ব্যতিরেকে ৭২ চতুর্যুগ, আর এককল্পে ১০০৮ চতুর্যুগ এবং প্রত্যেক যুগকে চতুর্যুগের এক-চতুর্থাংশ ধরি, তাহলে আমাদের উপরোক্ত মান বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুর ২৬,৪২৫,৪৫৬২০৪,১০২ বৎসর. কল্পের ১৯৮৬১২৪,১০২, মন্বন্তরের ১১৯,৮৮৪,১০২, আর চতুর্যুগের ৩২৫৪৪,১০২ বৎসর গত হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

কলিযুগের আরম্ভ থেকে কত সম্পূর্ণ বৎসর গত হয়েছে সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। পলিস ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়ের মতে, আমাদের মান বৎসর (৪০০ yazdgird অব্দ) পর্যন্ত কলিযুগের ৪১৩২ বৎসর অতীত হয়েছে: অর্থাৎ

এই সময়ের পরিমাণ হচ্ছে কলিকাল। এবং ভারত যুদ্ধ অর্থাৎ পাণ্ডব কাল থেকে উক্ত সনের ব্যবধান হচ্ছে ৩৪৭৯ বৎসরের।

হিন্দুদের আর একটি অব্দ আছে: তার নাম 'কাল যবন' (کل جمن) এই অব্দ সম্বন্ধে তেমন নিশ্চিত সংবাদ আমি পাইনি, তবে শুনেছি ওদের বিশ্বাস মতে এ অব্দের আরম্ভ দ্বাপরের শেষ ভাগে পড়ে। এই 'যমন' (جمن) ওদের দেশ অধিকার ও ধর্মের প্রভূত ক্ষতি করেছিল।

৩৪৫ এই সকল অব্দে সংখ্যার আধিক্য বড় বেশী, তাদের আরম্ভ কালও সুদূর অতীতে নিহিত। সেজন্য হিন্দুরা এসব অব্দের ব্যবহার আর করে না এবং তার পরিবর্তে শ্রীহর্ষ, বিক্রমাদিত্য, শক, 'বলভ' ও গুপ্ত অব্দ অবলম্বন করেছে। শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাস যে তিনি সপ্ততল পর্যন্ত মৃত্তিকা পরীক্ষা করে তার গর্ভে নিহিত ধন-রত্নের সন্ধান করতেন এবং তা আবিষ্কার করতেন; সেই ধন লাভ করার ফলে তাঁকে প্রজাদের উপর (কর) পীড়ন করতে হোত না। শ্রীহর্ষের অব্দ মথুরা ও কনৌজ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। ঐ অঞ্চলের কতক লোক আমাকে বলেছে যে, শ্রীহর্ষ ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ৪০০ বৎসরের ব্যবধান। তবে একটি কাশ্মিরী পঞ্জিকাতে দেখেছি যে শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্যের ৬৬৪ বৎসর পরবর্তীকালের লোক। এই দুই প্রকার সংবাদে আমার মনে গভীর সন্দেহ জন্মেছে; সে সন্দেহ দূর করার মত কোনও নিশ্চিত তথ্য এখনও পাইনি।

যারা বিক্রমাদিত্যের অব্দ ব্যবহার করে, তারা ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। তারা ৩৪২-কে ৩ দিয়ে গুণ করে, গুণফল স্বরূপ যে ১০২৬ সংখ্যা পায়, তাতে বর্তমান 'ষষ্ঠাব্দের' অর্থাৎ ৬০ সম্বৎসর-চক্রের যত বৎসর গত হয়েছে, তা যোগ করে। যে সংখ্যা পায়, তাই তারা বিক্রমাব্দের সন বলে ধরে নেয়। মহাদেবকৃত 'শ্রুবধ' নামক পুস্তকে বিক্রমাদিত্যের নাম আমি 'চন্দ্র-বীড়' 'চন্দ্রাপীড় ?' (جندر بیر) লেখা দেখেছি।

প্রথমতঃ, গণনার এই পদ্ধতি খুবই কৃত্রিম। ওরা যদি অকারণে ৩৪২ দিয়ে গণনা আরম্ভ করতে পারে, তাহলে অকারণে ১০২৬ দিয়ে গণনা করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি তারিখের মধ্যে একটিমাত্র ষষ্ঠাব্দ থাকে, সে ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ঠিক বলে না হয় ধরা যেতে পারে, কিন্তু যদি একাধিক 'ষষ্ঠাব্দ' থাকে, তাহলে কি হবে।

শকাব্দ অর্থাৎ 'শককাল' বিক্রমাদিত্যের কালের ১৩৫ বৎসর পরবর্তী। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত আর্যাবর্তে বাস স্থাপন করে এই শক

রাজা সে দেশের উপর প্রভুত্ব করেছিল এবং ভারতীয়দিগকে শক ভিন্ন অন্য কোনও জাতির সাথে নিজ সম্বন্ধের পরিচয় দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কেউ কেউ বলে, এই শক আলমানসূরার এক শূদ্র ছিল; আবার কারও কারও মতে, সে ভারতীয় নয়, পশ্চিমের কোনও দেশ থেকে সে ভারতে এসেছিল।
৩৪৬ ভারতীয়রা তার হাতে খুবই নির্যাতিত হয়েছিল। অবশেষে, পূর্বদেশ থেকে তাদের কাছে সাহায্য এসে পেঁছিল, তখন বিক্রমাদিত্য তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মুলতান ও Loni দুর্গের মধ্যবর্তী 'করূর' (کرور) অঞ্চলে তাকে পরাস্ত ও নিহত করেন। অত্যাচারীর নিহত হওয়ার তারিখ সেই থেকে লোকে আনন্দের সঙ্গে মনে রাখল এবং বিশেষ করে জ্যোতিষীরা এক নতুন অব্দের প্রারম্ভ হিসাবে সেই তারিখটি ব্যবহার করতে লাগল এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মানার্থে তার নামের সঙ্গে শ্রী ব্যবহার করতে লাগল। বিক্রমাদিত্যের উপরোল্লিখিত অব্দ থেকে শক-বধের সময়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান আছে বলে আমার মনে হয়, যে বিক্রমাদিত্যের নামে অব্দ প্রচলিত আছে, সে শক-হন্তা বিক্রমাদিত্য নয়, সেই নামের অন্য আর এক ব্যক্তি।

'বলভ' অব্দ 'বলভি' নগরের রাজার নামাঙ্কিত। এ নগর অন্‌হিল-ওয়াড়ার ৩০ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। এই অব্দের আরম্ভকাল শকাব্দ থেকে ২৪১ বৎসর পর। এর ব্যবহারকারীরা প্রথমে শককালের চলমান বৎসর সংখ্যা লিখে তার থেকে ৬-এর ঘনফল (Cube) ও ৫-এর বর্গফল (Square) (২১৬+২৫=২৪১) বিয়োগ করে। যা অবশিষ্ট থাকে তা বলভ অব্দের সাল। বলভের কাহিনী যথাস্থানে লেখা হয়েছে।

'গুপ্তকাল' সম্বন্ধে বলা হয় যে, 'গুপ্ত'রা দুষ্ট ও দুর্দান্ত জাতি ছিল। সেজন্য তাদের উচ্ছেদের তারিখ থেকে এক নতুন অব্দের সূচনা হয়। মনে হয় 'বলভ'-ই এসব অব্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক, কারণ তার আরম্ভ শকাব্দের ২৪১ বৎসর পরে হয়।

জ্যোতিষীদের অব্দ শককালের ৫৮৭ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ড খাদ্যক' নামক পঞ্জিকা এই অব্দ অনুসারে রচিত; আমাদের সমাজে এই পুস্তকটি অল্‌-অরকন্দ্‌ নামে পরিচিত। অতএব, আমরা যে মান-বৎসর (yazdgird অব্দের ৪০০ সাল) অবলম্বন করেছি, সে বৎসরটি ভারতীয় অব্দগুলির নিম্নলিখিত সালে পড়ে।

শ্রীহর্ষের অব্দের—১৪৮৮ সাল,
বিক্রমাব্দের—১০৮৮,
শককালের—৯৫৩,
বলভ ও গুপ্তকালের—৭১২,
খণ্ড খাদ্যক পঞ্জিকার অব্দানুযায়ী—৩৬৬,
৩৪৭ বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তকে' ব্যবহৃত অব্দের—৫২৬,
'করণসারের' অব্দের—১৩২,
'করণতিলকের' অব্দের—৬৫।

পঞ্জিকা সংক্রান্ত যে সব কথা এখানে বলা হল, মনে হয়, পঞ্জিকা রচয়িতারা সে অব্দগুলিকে গণনার অংকিক ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী মনে করেছিল। এমনও হোতে পারে যে, তাদের জীবনকালের সমসাময়িক অব্দকেই তারা গণনার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। আবার এও অসম্ভব নয় যে, তাদের জীবৎকালের পূর্ববর্তী কোনও অব্দের তারিখ তারা ব্যবহার করেছে।

ভারতের জনসাধারণ শত বৎসর ধরে কাল গণনা করে; শত বৎসরকালকে তারা 'সম্বৎসর' বলে। একশত বৎসর শেষ হলে, সে শতাব্দী ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী শতাব্দী ধরে তারা তারিখ নির্ধারণ করে। এই চলমান শতাব্দীকে ওরা বলে 'লোককাল' অর্থাৎ জনসাধারণের অব্দ। 'লোককাল' সম্বন্ধে এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ লোকে আমাকে দিয়েছে যে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমার সাধ্য নয়। বৎসরারম্ভ নিয়েও ওদের মধ্যে এই প্রকার মতানৈক্য আছে। এ বিষয়ে যা নিজে শুনেছি তা এখানে বলছি, হয়ত কোনদিন এ আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নীতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

যাঁরা শককাল ব্যবহার করেন অর্থাৎ জ্যোতিষীরা তাঁরা চৈত্র মাস থেকে বৎসর আরম্ভ করেন, কিন্তু কাশ্মীরের সীমান্তস্থিত 'কনির' (? کنیر) বাসীরা করে ভাদ্রপদে। এই শেষোক্ত লোকেরা আমাদের পূর্বোল্লিখিত (Yazdgird) আরম্ভ অব্দের ৪০০) সালকে ওদের অব্দের ৮৪ সাল বলে ধরে।

যারা বরদারী ও মারিকলার অন্তর্বর্তী ভূভাগে বাস করে, তারা কার্তিক মাস দিয়ে বর্ষ আরম্ভ করে। এবং উপরোক্ত সনে তাদের অব্দের ১১০ সাল হয়। কাশ্মীরী পঞ্জিকাকারের মতে, ঐ সনটি নূতন শতাব্দীর ষষ্ঠ সাল। কাশ্মীরীরা এই রীতি-ই পালন করে।

মারিকলার পিছন তাকেশ্বর (تاكشير) ও লোহাবর (لوهاور লাহোর)-এর সীমানা পর্যন্ত 'নীরহর' (نيرهر) অধিবাসীরা 'মার্গশীর্ষ' মাস থেকে বর্ষ আরম্ভ করে এবং পূর্বোক্ত সালকে তাদের অব্দের ১০৮তম সাল বলে ধরে। 'লম্বক' (لنبك) অর্থাৎ লমঘান-এর লোকেরাও এই রীতি অনুসরণ করে। মুলতানের মুখে শুনেছি যে সিন্ধু ও কনৌজবাসীদেরও এই রীতি ছিল; তারাও মার্গশীর্ষ দিয়ে বর্ষ আরম্ভ করত। তবে, মাত্র কয়েক বৎসর হোল মুলতানবাসীরা এ রীতি বর্জন করে কাশ্মীরী রীতি অবলম্বন করেছে এবং এখন চৈত্র মাস থেকেই তারা বর্ষ গণনা করে থাকে।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্যের অসম্পূর্ণতার জন্য আমি পূর্বেই মার্জনা চেয়েছি। ওদের অব্দসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া দুরূহ, কারণ তাতে এক শতাব্দীর চেয়ে অনেক দীর্ঘতম কাল সূচিত হয় যার নির্ধারণে কোনও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম নাই। আমি নিজে দেখেছি ৪১৬ হিজরী ও ৯৪৭ শককালের ঘটনা সোমনাথ ধ্বংসের তারিখ ওরা কিভাবে নিরূপণ করে। প্রথমে ২৪১ লিখে, তার নীচে ৬০৬ ও তার নীচে ৯৯ লিখে তিনটি সংখ্যাকে একত্র
৩৪৮ যোগ করে ঘটনাটির শককাল নির্ণয় করে। আমার মনে হয় ২৪২ হচ্ছে সম্বৎসর গণনার রীতি আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অতীত বৎসর সংখ্যা। গুপ্তকাল থেকেই ওরা শতাব্দী গণনার রীতি আরম্ভ করেছে। আর ৬০৬ হচ্ছে প্রত্যেক 'সম্বৎসর'-কে ১০১ বৎসর ধরে ছয় সম্বৎসরের মোট বৎসর সংখ্যা এবং ৯৯ হচ্ছে চলমান সম্বৎসরের অতীত বর্ষ সংখ্যা।

কোনও বিশেষ ঘটনার তারিখ নির্ণয় করার এইটিই যে অনুমোদিত নিয়ম তা ঘটনাক্রমে প্রাপ্ত মুলতানের দুর্লভকৃত পঞ্জিকার একটি পাতা থেকে আমি প্রমাণ পেয়েছি। তাতে লেখক বলেছেন: 'প্রথমে ৮৪৮ লেখ; তার সাথে 'লৌকিককাল' যোগ দাও। যোগফল হবে 'শককাল'।

আমাদের অবলম্বিত Yazdgird অব্দের ৪০০ সনের সমসাময়িক শককালের সন অর্থাৎ ৯৫৩ থেকে যদি ৮৪৮ বিয়োগ করি, অবশিষ্ট ১০৫ হবে 'লৌকিক কাল', এবং সে কালের ৯ তম বৎসরে সোমনাথ ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছিল।

দুর্লভ আরও বলছেন যে বর্ষ আরম্ভ হয় মার্গশীর্ষ থেকে, কিন্তু মুলতানের জ্যোতিষীরা চৈত্র মাস থেকে বর্ষ আরম্ভ করেন।

হিন্দুদের এক রাজবংশ ছিল যারা কাবুলে বাস করত। তারা জাতিতে তুর্কী। তারা আসলে তিব্বতী ছিল। এদের প্রথম রাজার নাম 'বরহ্‌তিগিন্'। প্রথমে সে কাবুলে এসে এক পর্বতগুহায় প্রবেশ করে। গুহাটি এত সংকীর্ণ

যে বুকে হাঁটা ছাড়া অন্য উপায়ে তাতে প্রবেশ করা যেত না। গুহার মধ্যে জল ছিল; সেখানে কয়েক দিবসের মত প্রয়োজনীয় খাদ্য সে জমা করে রাখল। গুহাটি এখনও কাবুলে 'বর' (? بَڤُر Var ?) নামে পরিচিত। গুহার অলৌকিক গুণে যে বিশ্বাস করে, সে তাতে প্রবেশ করে বহু কষ্টে সেই জল নিয়ে আসে। গুহার সম্মুখে এক দল কৃষক কর্মরত ছিল। কারও সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র ব্যতীত এ ধরনের কৌশল কখনই সফল ও প্রচার লাভ করে না। এ ক্ষেত্রে এই গোপন সহকারীরা একদল লোককে পালাক্রমে সেখানে দিবারাত্র কর্ম করার জন্য নিযুক্ত করল। যাতে স্থানটি কখনই জনশূন্য না হয়। গুহা
৩৪৯ প্রবেশের পর কিছুদিন গত হলে বরহ্‌তিগিন্ সকলের সমক্ষে গুহা থেকে নির্গত হতে আরম্ভ করল। মাতৃগর্ভ হতে যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে লোকে তাকে তেমনই কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল। লোকটি বুকখোলা তুর্কী কোট পরিহিত ছিল, মাথায় দীর্ঘ টুপি, পায়ে হাটু পর্যন্ত চামড়ার জুতা ও হাতে অস্ত্র। তার আবির্ভাবকে অলৌকিক বিশ্বাস করে লোকে তাকে সম্মান করতে লাগল, যেন রাজত্ব করার জন্যই তার সৃষ্টি হয়েছে। ঐ অঞ্চলসমূহকে সে স্বীয় কর্তৃত্বে এনে কাবুলে 'সাহিয়া' নামে তাদের উপর রাজত্ব করতে থাকল। দীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমে তার বংশধরেরা সে দেশে রাজত্ব করেছিল। শোনা যায়। শোনা যায়, তার বংশীয় রাজাদের সংখ্যা প্রায় ৬০।

হিন্দুরা শৃঙ্খলা রক্ষার বড়ই উদাসীন, রাজাদের ঐতিহাসিক বর্ণনায় কালানুক্রমিক পারম্পর্যে তারা মোটেই যত্ন নেয় না এবং সংবাদের জন্য পীড়াপীড়ি করলে উত্তর দেবার মত কিছু না পেয়ে ওরা গাল-গল্পের আশ্রয় নেয়। তা না হলে ওদের কতক লোকের নিকট থেকে আমি যা শুনেছি তা এখানে লিপিবদ্ধ করতাম। তবে আমি শুনেছি যে রেশমে লিখিত এই সাহিয়া রাজাদের একটি বংশতালিকা নগরকোট দুর্গে রক্ষিত আছে। আমার সেটি দেখার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি।

এই বংশের একজনের নাম 'কণিক' যাকে 'পুরুসাত্তর' বিহারের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়; তারই নামে এ বিহারকে বলা হয় 'কণিকচৈত্য'। কথিত আছে যে, কনৌজের রাজা তাকে অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে মহামূল্য অনন্যসাধারণ একখন্ড বস্ত্র পাঠিয়েছিল। কণিক সে বস্ত্র দিয়ে নিজের জন্য একটি জামা তৈরী করাতে চাইলেন, কিন্তু দর্জি তা করতে সাহস পেল না। সে বলল: বস্ত্রখণ্ডে মানুষের পায়ের ছবি আছে; যত চেষ্টাই করি না কেন, ছবিটি দুই কাঁধের মাঝখানেই পড়ে।' বলি রাজার গল্পে আমরা যা বলেছি এখানেও

তারই ইঙ্গিত ছিল। কণিক তখন বুঝতে পারল, কনৌজ রাজ এই বস্ত্র পাঠিয়ে তাকে অপমান ও উপহাস করতে চেয়েছে। তৎক্ষণাৎ সে সৈন্য নিয়ে কনৌজ অভিমুখে ধাবিত হোল। এ সংবাদ পেয়ে কনৌজ-রাজ উদ্বিগ্ন হোল, কারণ কনিককে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করাতে মন্ত্রী বলল : 'তুমি একজন শান্ত লোককে উত্তেজিত করে অনুচিত কর্ম করেছ। এখন আমার নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদন করে আমাকে বিকলাঙ্গ করে দাও। দেখি প্রতারণার দ্বারা কোনও উপায় করা যায় কিনা, কারণ সম্মুখ প্রতিরোধের কোনও সম্ভাবনা দেখি না।' রাজা তাকে তাই করল। রাজা মন্ত্রীকে সেখানে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে রাজ্যের সীমান্তে চলে গেল। অভিযানী সৈন্যদল মন্ত্রীকে সেই অবস্থায় পেয়ে তাকে চিনতে পেরে, কনিকের কাছে নিয়ে এল। কনিক তার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মন্ত্রী বলল : 'আমি কনৌজ রাজাকে তোমার বিরোধিতা করতে নিষেধ করতাম এবং তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে তাকে পরামর্শ দিতাম। তাতে সে আমাকে সন্দেহ ক'রে আমার এই অবস্থা করেছে। তারপরে
৩৫০ রাজা স্ব-ইচ্ছায় এমন এক দূরদেশে যাত্রা করেছে যেখানে পৌঁছবার পথ সরল কিন্তু দীর্ঘ, তবে মরুভূমির উপর দিয়ে যেতে পারলে আরও সংক্ষিপ্ত হয়, অবশ্য যদি এতদিনের মত প্রয়োজনীয় পানীয় জল কেউ বহন করে।' 'তা সহজেই করা যায়,' একথা বলে কনিক জল বহনের ব্যবস্থা করল এবং মন্ত্রীকে পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে নিল। আগে আগে গিয়ে মন্ত্রী কনিককে এক সীমাহীন মরুভূমিতে নিয়ে এলো। যতদিনে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার কথা ছিল, সে দিনগুলি গত হবার পরও যখন পথের শেষ দেখা গেল না, তখন কনিক মন্ত্রীকে কর্তব্য জিজ্ঞাসা করল। মন্ত্রী বলল : 'আমি আমার প্রভুকে রক্ষা করতে ও তাঁর শত্রুকে বিনাশ করার চেষ্টা করে কোনও অপরাধ করিনি। যে পথ দিয়ে এসেছ, মরুভূমি থেকে বেরুবার সেইটিই একমাত্র সংক্ষিপ্ত পথ। এখন তুমি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তা করতে পার, এখান থেকে কিন্তু উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একথা শুনে কনিক অশ্বারোহণ করে একটি নীচু ভূমির চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল। সে জমির মধ্যস্থলে তার বর্শা বিদ্ধ করতেই তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে এত জল নির্গত হোতে লাগল যে সৈন্যদের পান ও প্রত্যাবর্তনের পথে বহন করার জন্যও পর্যাপ্ত হোল। তা দেখে মন্ত্রী বলল : 'পরাক্রান্ত দেবতাদের সঙ্গে ছলনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; দুর্বল মানুষের বিরুদ্ধেই আমার কূটকৌশল প্রয়োগ করেছিলাম।

ব্যাপার যখন এইরূপ দাঁড়াল, তখন আমার প্রভু ও অন্নদাতার জন্য আমার আবেদন মঞ্জুর করে তাকে ক্ষমা কর।' কনিক বললে : 'আমরা এখান থেকে ফিরে যাব; তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলাম; তোমার প্রভু তার উচিত প্রাপ্যই পেয়েছেন'। কনিক স্বদেশে ফিরে গেল এবং মন্ত্রী তার কনৌজ-রাজের কাছে গিয়ে পৌঁছল। গিয়ে দেখল যেদিন কনিক মাটিতে তার বর্শা গেড়েছিল সেইদিনই কনৌজ-রাজের দেহ থেকে তার হাত পা খসে পড়ে গেছে।

এই বংশের শেষ রাজা ছিল 'লঘতুর্মান' (لگورمان) তার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর নাম ছিল 'কল্লর' (کلر)। এই মন্ত্রী ভাগ্যবান ছিল, কেননা ঘটনাক্রমে অনেক গুপ্ত ধনরত্ন সে পেয়েছিল যার বলে সে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠেছিল। এই কারণে এতদিন রাজদণ্ড ধারণ করার পর রাজবংশের হাত থেকে ক্ষমতা খসে পড়তে থাকল। লঘতুর্মানের স্বভাব ও আচরণও মন্দ হয়ে গেল এবং রাজার বিরুদ্ধে মন্ত্রীর কাছে বহু অভিযোগ আসতে লাগল। তখন মন্ত্রী তাকে বন্দী করে তার চরিত্র শুদ্ধির জন্য তাকে কারারুদ্ধ করে রাখল। কিন্তু অপ্রতিহত ক্ষমতা মন্ত্রীর ভাল লাগল; ক্ষমতা বিস্তৃত করার মত ধনও তার ছিল। সুতরাং সে নিজেই রাজা হয়ে বসল। কল্লরের পর এই ব্রাহ্মণ বংশে ক্রমান্বয়ে এরা রাজা হয়েছিল : সামন্দ (সামন্ত), কমলু, ভীম, জয়পাল
৩৫১ আনন্দপাল ও তিরোজনপাল (ত্রিলোচনপাল)। ৪১২ হিজরীতে ত্রিলোচনপাল, নিহত হয়। এবং তার পাঁচ বৎসর পরে তার পুত্র ভীমপালও নিহত হয়। সেই থেকে এই হিন্দু সাহিয়া বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে; সে বংশে বাতি দেবার মতও আর কেউ অবশিষ্ট নাই।

পরাক্রমশালী হয়েও এ বংশের রাজারা নিয়ত সদাচরণ ও হিতকর্মে রত থাকত, প্রতিশ্রুতি পালনে ও সত্যরক্ষায় অটল, উচ্চমনা ও দৃঢ়চেতা ছিল। আমীর মহমুদকে লিখিত আনন্দপালের এই পত্রটিকে আমি অতীব প্রশংসনীয় মনে করি; যখন এটি লেখা হয় তখন এই দুই রাজার পারস্পরিক বৈরীভাব চরমে পৌঁছেছিল। 'আমি শুনেছি তুর্কীরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযান করেছে ও খোরাসান প্রদেশে উপদ্রব আরম্ভ করেছে। তুমি যদি বল, আমি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী, দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ও একশত হাতী নিয়ে তোমার সাহায্য করতে আসতে পারি, অথবা তুমি যদি চাও, আমার পুত্রকে তার দ্বিগুণ সৈন্য

দিয়ে তোমার কাছে প্রেরণ করতে পারি। তা ক'রে তোমাকে চমৎকৃত বা প্রভাবিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তোমার দ্বারা বিজিত হয়েছি : তোমাকে আমি ব্যতীত অন্য কেউ পরাজিত করুক, তা আমি চাই না।'

যখন থেকে তার পুত্র মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তখন থেকে আনন্দপাল মুসলমানদের প্রতি অপরিসীম বিদ্বেষ পোষণ করত। এ বিষয়ে তার পুত্র ত্রিলোচনপাল কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

পঞ্চাশ অধ্যায়

প্রতি কল্প ও 'চতুর্যুগের' নাক্ষত্রাবর্ত

কল্পের একটি প্রধান শর্ত এই যে, তার মধ্যে মেষরাশির 0° ডিগ্রীতে অর্থাৎ মহাবিষুব ক্রান্তিতে তাদের অপদূরকে সম্পাতসহ বিভিন্ন গ্রহসমূহের যোগাযোগ হবে। সুতরাং কল্পকালের মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রহকে কতকগুলি আবর্তন সম্পূর্ণ করতেই হবে। আল্‌ফাজারী ও ইয়াকুব বিন্‌ তারিক-এর পঞ্জিকায় উক্ত হয়েছে যে, গ্রহাবর্তনের এই তথ্যটি ৪৫১ হিজরীতে খলীফা আল্‌-মনসুরের কাছে প্রেরিত, সিন্ধুদেশের একটি রাজনৈতিক দৌত্যের অন্তর্ভুক্ত একজন হিন্দুর নিকট হতে প্রাপ্ত। অপরের মুখে শোনা এই তথ্যটিকে হিন্দুদের নিজ মুখে বর্ণিত তথ্যের সাথে মিলালে কিন্তু আমরা দুটি তথ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই। তার কারণ আমি বুঝতে পারি না। পার্থক্য
৩৫২ কি উক্ত লেখকদ্বয়ের অনুবাদের দোষ হয়েছে, না ঐ হিন্দুটির বর্ণনার দোষে? নাকি, পরবর্তীকালে ব্রহ্মগুপ্ত ও অন্যেরা যে সংশোধিত গণনারীতি প্রবর্তন করেছিল তাই এই পার্থক্যের আসল কারণ? কেননা, যে-কোন সচেতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে যার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, জ্যোতিষিক গণনায় কোনও ভ্রান্তি দেখলেই তা সংশোধন করতে সচেষ্ট হবে, যেমন সরখস্‌এর মুহম্মদ বিন ইসহাক করেছিলেন। শনিগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে, প্রচলিত গণনা অনুযায়ী এ গ্রহের যে গতিবেগ পাওয়া যায় দৃশ্যতঃ শনি তদপেক্ষা দ্রুতগতিতে চলে। এ পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করার জন্য বহু গবেষণার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, গ্রহগুলির সমীকরণে বা মধ্যস্থান (Equation) নির্ণয়ে তাঁর কোনও ভুল হয়নি। তখন তিনি শনিগ্রহের আবর্তন সংখ্যার সাথে আর একটি আবর্তন যোগ করলেন এবং শনির বাস্তবগতির সঙ্গে তাঁর নিরূপিত আবর্তন সংখ্যা তুলনায় করে দেখলেন যে, গণনার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ মিলে যায়। এই সংশোধিত গণনা অনুযায়ী তিনি তাঁর পঞ্জিকা রচনা করেছেন।

আর্যভাটের মতানুসরণ করে ব্রহ্মগুপ্ত কিন্তু চন্দ্রের উচ্চ (অপদূরক) ও নিম্নপাতের আবর্তন সম্বন্ধে অনুরূপ কথা বলেছেন। আর্যভাটের আসল

গ্রন্থ পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। সেজন্য ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থের উদ্ধৃতি অবলম্বন করে তার বিবরণ দিচ্ছি। নীচের এই সারণীতে আবর্তন বিষয়ক সমস্ত মতামত একত্রিত করা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ্, বিষয়টি অনুধাবন করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

গ্রহগণ		কল্পকালে মোট আবর্তন সংখ্যা	অপদুরকের মোট আবর্তন	সম্পাতের মোট আবর্তন
সূর্য		৪৩২০,০০০,০০০	৪৮০	নিম্নপাত নাই
চন্দ্র	-ব্রহ্মগুপ্ত	৫৭,৭৫৩,৩০০,০০০		২৩২৩১১১৬৮
	-অল-ফজারীর অনুবাদ,		৪৮৮১০.৮৫৮	২৩২৩১২১৩৮
	-আর্যভট্ট			২৩২,৩১৬,০০
	-ব্রহ্মগুপ্তের মতে চন্দ্রাবর্তনের বিশেষ ব্যতিক্রম		৪৮৮২১৯,০০০ ৫৭,২৬৫,১৯৪১৪২	চন্দ্রের নিজস্ব আবর্তন ও তার উচ্চপাতের পার্থক্যকে ব্যতিক্রান্ত আবর্তন হিসাবে ধরা হয়েছে
মঙ্গল		২২৯৬,৮২৮৫২২		
৩৫৩ বুধ		১৭৯৩৬৯৯৮৯৮৪	২৯২	২৬৭
বৃহস্পতি		৩৬৪,২২৬,৪৫৫	৩৩২	৫২১
শুক্র		৭,০২২,৩৮৯,৪৯২	৮৫৫	৬৩
			৬৫৩	৮৯৩
শনি	-ব্রহ্মগুপ্ত	১৪৬,৫৬৭,২৯৮		
	-অল-ফজারী	১৪৬৫৬৯২৮৪		
	অল-সরখ্সীর সংশোধন	১৪৬,৫৬৯,২৩৮	৪১	৫৮৪
স্থির নক্ষত্র সকল		১২০,০০০	(অল্-ফজারীর অনুবাদানুযায়ী	

মধ্যকগতি (Mean motion) ধরেই গ্রহসমূহের এসব আবর্তনচক্র গণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মগুপ্তের মতে চতুর্যুগ যখন কল্পের এক-সহস্রাংশ, তখন সারণীর অন্তর্ভুক্ত আবর্তনচক্রের সংখ্যাগুলিকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করলেই আমরা চতুর্যুগের নাক্ষত্রাবর্তের সংখ্যা পাব। আবার ১০,০০০ দিয়ে ভাগ দিলে এক কলিযুগের আবর্তন সংখ্যা পাব, কেননা কলিযুগ চতুর্যুগের একদশমাংশ। ভাগফলে চতুর্যুগ বা কলিযুগের যে ভগ্নাংশ থেকে যাবে তাকে তার হরের

(Denominator) সমান সংখ্যা দিয়ে গুণ করে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করতে হবে। নীচের সারণীতে গ্রহসমূহের যে আবর্তন সংখ্যা দেওয়া যাচ্ছে, তা এক চতুর্যুগ ও এক কলিযুগের অন্তর্গত, এক মন্বন্তরের অন্তর্গত নয়। মন্বন্তর যদিও কয়েকটি পূর্ণ চতুর্যুগেরই সমষ্টি, তবুও তার আদি ও অন্তে একটি করে সন্ধ্যা যুক্ত হয় বলে তার হিসাব গোলযোগ বাধে।

গ্রহ সকল	এক চতুর্যুগের মোট আবর্তন	এক কলিযুগে মোট আবর্তন
রবি	৪৩২০০০০	৪৩২০০০
—সূর্যের অপদূরক	$০\frac{১২}{২৫}$	$০\frac{৬০}{১২৫০}$
	৫৭৭৫৩৩০০০০	৫৭৭৫৩০০
—অপদূরক: ব্রহ্মগুপ্ত	$৪৮৮১০৫\frac{৪২৯}{৫০০}$	$৪৮৮১০\frac{২৯২৯}{৫০০০}$
—অপদূরক: আর্যভাট	৪৮৮২১৯	$৪৮৮২১\frac{৯}{১০}$
—ব্যতিক্রম	$৫৭২৬৩১৯৬\frac{৭১}{৫০০}$	$৫৭২৬৫১৯\frac{২০৭১}{৫০০০}$
—সংপাত: ব্রহ্মগুপ্ত	$২৩২৩১১\frac{২১}{১২৫}$	$২৩২৩১\frac{২৯২}{২৫০০}$
—সংপাত: অল-ফজারী	$২৩২৩১২\frac{৬৯}{৫০০}$	$২৩৩১\frac{১০৬৯}{৫০০০}$
—সংপাত: আর্যভাট	২৩২৩১৬	$২৩২৩১\frac{৩}{৫}$
মঙ্গল	$২২৯৬৮২৪\frac{২৬১}{৫০০}$	$২২৯৬৮২\frac{৪২৬১}{৫০০০}$
—অপদূরক	$০\frac{৭৩}{২৫০}$	$০\frac{৭৩}{২৫০০}$
—সংপাত	$০\frac{২৬৬}{১০০০}$	$০\frac{২৬৭}{১০০০০}$
বুধ	$১৭৯৩৬৯৯৮\frac{১২৩}{১২৫}$	$১৭৯৩৬৯৯\frac{১১২৩}{১২৫০}$
—অপদূরক	$০\frac{৮৩}{২৫০}$	$০\frac{৮৩}{২৫০০}$
—সংপাত	$০\frac{৫২১}{১০০০}$	$০\frac{৫২১}{১০০০০}$
বৃহস্পতি	$৩৬৪২২৬\frac{৯১}{২০০}$	$৩৬৪২২\frac{১২৯১}{২০০০}$
—অপদূরক	$০\frac{১৭১}{২০০}$	$০\frac{১৭১}{২০০০}$
—সংপাত	$০\frac{৬৩}{১০০০}$	$০\frac{৬৩}{১০০০০}$
শুক্র	$৭০২২৩৮৯\frac{১২৩}{২৫০}$	$৭০২২৩৮\frac{২৩৭৩}{২৫০০}$

গ্রহ সকল	এক চতুর্যুগের মোট আবর্তন	এক কলিযুগে মোট আবর্তন
—অপদুরক	০ ৬৫৩/১০০০	০ ৬৫৩/১০০০
—সম্পাত	০ ৮৯৩/১০০০	০ ৮৯৩/১০০০০
শনি	১৪৬৫৬৭ ১৪৯/৫০০	১৪৬৫৬ ৩৬৪৯/৫০০০
{ অল-ফজারী—	১৪৬৫৬৯ ৭১/২৫০	১৪৬৫৬ ২০২১/২৫০০
{ অল-সরখ্সীর সংশোধন	১৪৬৫৬৯ ১১৯/৫০০	১৪৬৫৬ ৪৬১৯/৫০০০
—অপদুরক	০ ৪১/১০০০	০ ৪১/১০০০০
—সম্পাত	০ ৭৩/১২৫	০ ৭১/১২৫০
স্থির নক্ষত্র	১২০	১২

আমরা এতক্ষণ ব্রহ্মগুপ্তের অনুসরণ করে কল্পকালের মধ্যে গ্রহসমূহের
মোট আবর্তন সংখ্যাকে চতুর্যুগে ও কলিযুগে ভাগ করে দেখিয়েছি। এবার
৩৫৬ আমরা পলিশের মতানুযায়ী এক চতুর্যুগে নাক্ষত্রাবর্ত সংখ্যা ধরে এক কল্পের
আবর্তন সংখ্যা নির্ণয় করব। ১০০০ চতুর্যুগ এককল্প। কল্পের এই
দুই হিসাবমতেই আমি গণনা করছি। নীচের সারণীতে সংখ্যাগুলো দেখান
গেল।

গ্রহের নাম	চতুর্যুগে মোট আবর্তন সংখ্যা	১০০০ চতুর্যুগের কল্পে মোট আবর্তন সংখ্যা	১০০৮ চতুর্যুগের কল্পে মোট আবর্তন
রবি	৪৩২০০০০	৪৩২০০০০০০০	৪৩৫৪৫৬০০০০
চন্দ্র	৫৭৭৫৩৩৩৬	৫৭৭৫৩৩৩৬০০০	৫৮২১৫৩৩৬২৬৮৮
—অপদুরক	৪৮৮২১৯	৪৮৮২১৯০০০	৪৯২১২৪৭৫২
—সম্পাত	২৩২২২৬	২৩২২২৬০০০	২৩৪০৮৩৮০৮
মঙ্গল	২২৯৬৮২৪	২২৯৬৮২৪০০০	২৩১৫১৯৮৫৯২
বুধ	১৭৯৩৭০০০	১৭৯৩৭০০০০০০	১৮০৮০৪৯৬০০০
বৃহস্পতি	৩৬৪২২০	৩৬৪২২০০০০	৩৬৭১৩৩৭৬০
শুক্র	৭০২২৩৮৮	৭০২২৩৮৮০০০	৭০৭৮৫৬৭১০৪
শনি	১৪৬৫৬৪	১৪৬৫৬৪০০০	১৪৭৭৩০৫৫১৫

এখানে একটি কৌতুককর ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। Al-fazari ও ইয়াকুব হিন্দু পণ্ডিতকে নিশ্চয়ই বলতে শুনেছিলেন যে, গ্রহসমূহের আবর্তনের যে সংখ্যা তিনি বলছেন তা 'বৃহৎ' সিদ্ধান্তের' গণনা অনুযায়ী আর্যভাট কিন্তু তার এক সহস্রাংশ নিয়ে গণনা করতেন। আরব লেখকদ্বয় তাঁর এই উক্তি সম্পূর্ণ বুঝতে পারেননি। তাঁরা মনে করলেন আর্যভাট (আর্যভড) শব্দের অর্থই হচ্ছে এক সহস্রাংশ। হিন্দুরা দ ও র এর মাঝামাঝি ধ্বনি দিয়ে এই
৩৫৭ 'ড' (আর্যভড) অক্ষরটি উচ্চারণ করে; সেজন্য আরবদের মুখে এই অক্ষরটি 'র'-এ পরিণত হয়ে 'আর্যভর' লিখিত হতে থাকলে। পরে শব্দটি আরও বিকৃত হয়ে 'আর্যভরের' প্রথম 'র' অক্ষর জ (z)-এ পরিণত হল। (ازجبهر অয্‌ভর) এই শব্দটি যদি হিন্দুদের কাছে এখন ফিরে আসে ওরা তাকে আর চিনতে পারবে না।

আহওয়ায্‌ এর অধিবাসী আবুল হাসান ও 'আল আরযভরের বর্ষে'র' অর্থাৎ এক চতুর্যুগের গ্রহের আবর্তন সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। সে সংখ্যা তাঁর গ্রন্থে যেমন পেয়েছি তেমনি আমি এখানে লিখছি। আমার মনে হয় এ সংখ্যা-গুলি উক্ত হিন্দুর কাছ থেকেই নেওয়া এবং সম্ভবতঃ এগুলি আর্যভাটের মতানুসারী। সংখ্যাগুলির কতকাংশ ব্রহ্মগুপ্তের উক্তি অনুযায়ী উপরে বর্ণিত এক চতুর্যুগের গ্রহাবর্তন সংখ্যার সঙ্গে মেলে, কতকগুলি সংখ্যা তার সঙ্গে না মিলে পলিশের মতের সঙ্গে মেলে, আর কতকগুলি সংখ্যা এমন যা ব্রহ্মগুপ্ত বা পলিশ কারও সাথে মেলে না। নীচের এই সারণী থেকেই তা বোঝা যাবে।

গ্রহের নাম	আবুল হাসান অল-আহওয়াযার মতানুযায়ী চতুর্যুগের অংশ হিসাবে গ্রহের যুগসংখ্যা
রবি	৪০০০০০
চন্দ্র	৫৭৭৫০০০৬
—অপদুরক	৪৮৮২১৯
—সম্পাত	২৩২২২৬
মঙ্গল	২২৯৬৮২৮
বুধ	১৭৯৩৭০২০
বৃহস্পতি	৩৬৪২২৪
শুক্র	৭০২২৩৮৮
শনি	১৪৬৫৬৪

একান্ন অধ্যায়

'অধিমাস', 'উনরাত্র ও অহর্গন নামিত বিভিন্ন দিবস সমষ্টির বিবরণ

৩৫৮ হিন্দুদের মাস চান্দ্র আর বৎসর সৌর। সেজন্য, সৌর বৎসর থেকে চান্দ্র বৎসরের দিবস সংখ্যা যত কম, ওদের প্রত্যেক (চন্দ্র) বৎসরের প্রথম দিবস সৌর বৎসরানুযায়ী ঠিক তত দিবস এগিয়ে আসবে। এই পশ্চাদবর্তিতার পরিমাণ যখন সম্পূর্ণ একমাসে দাঁড়ায়, তখন ইহুদীদের মত, হিন্দুরাও সে বৎসরকে অধিবর্ষ' (Leap year) ধরে তাতে একটি ত্রয়োদশ মাস গণনা করে। ইহুদীরা Azar (اذار) মাসকে দুইবার গণনা করে, প্রাক্-ইসলামের আরবরাও 'বিস্মৃত বর্ষ' নামক বৎসরে নববর্ষ দিবসকে একমাস কাল স্থগিত রাখত, যার ফলে পূর্ববর্তী বৎসর তেরো মাসের হোত।

যে বৎসরের একটি মাসকে এইভাবে দুইবার ধরা হয় তাকে চলিত ভাষায় হিন্দুরা 'মলমাস' বলে। মলের অর্থ ময়লা, যা হাতে লাগে। ময়লা দূর করে ফেলে দেওয়া হয়, যেমন গণনা থেকে এই মাসটিকেও বাদ দেওয়া হয়—তার ফলে এক বৎসরে মাসের সংখ্যা বারই থাকে। তবে ওদের পুঁথিকাদিতে এই মাসকে 'অধিমাস' নাম দেওয়া হয়েছে। যে মাসে দুইটি চান্দ্র মাস সম্পূর্ণ হয়, সেই মাসকেই পুনরাগত বলে ধরা হয়। সৌর মাসের আরম্ভ ও চান্দ্র মাসের শেষ যদি একই সময়ে হয়, সৌর মাসের কোনও ভাগ অতীত হবার পূর্বেই যদি চান্দ্র মাস শেষ হয়, তাহলে সেই চান্দ্র মাসের পুনরাবৃত্তি করা হয়। কেননা নতুন সৌর মাসে প্রবিষ্ট না হলেও, চান্দ্র মাসের অন্তভাগ তার পূর্ববর্তী মাসের অংশ মোটেই নয়।

কোন মাস এইভাবে পুনরাবৃত্তি করা হলে, প্রথমবারে তার নিজস্ব নামেই তাকে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়বারে তার নামের পূর্বে 'দুর' এই শব্দ লাগান হয়—তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য। যেমন প্রথম বারে আষাঢ়, আর দ্বিতীয় বারে তার নাম হবে 'দুরাষাঢ়'; এর মধ্যে প্রথমটিকে হিসাবের বাইরে ফেলা হয় বলেই সেই মাসকে অশুভ মাস বলে মনে করা হয়। মাসিক ক্রিয়াকর্মের কোন কিছুই সে মাসে ওরা করে না। চান্দ্র মাস শেষ হবার ক্ষণটি সবচেয়ে অশুভ।

৩৫৯ 'বিষ্ণুধর্ম''কার বলেছেন : 'সাবন' অর্থাৎ লৌকিক বৎসরের চেয়ে চান্দ্র বৎসর ছয় দিবস, অর্থাৎ ছয় 'ঊনরাত্র' কম। 'ঊন' অর্থ ক্ষয়। চান্দ্রমানের চেয়ে সৌরমান ১১ দিবস পরিমাণ বেশী। দুই বৎসর সাত মাসে এই পার্থক্য এক 'অধিমাসে' দাঁড়ায়। অধিমাসের সবটাই অশুভ। তার মধ্যে কোনও ক্রিয়াকর্ম করা অনুচিত।

এই হোল এক মোটামুটি বিবরণ। তার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা এই রূপ : চান্দ্র বৎসর ৩৬০ দিনের। আর সৌর বৎসর ৩৭১ $\frac{৩১}{৪৮০}$ দিনের হয়। ৯৭৬ $\frac{৪১৭৬}{৪৭৭৯৯}$ চান্দ্রদিনে অর্থাৎ ৩২ মাস বা ২ বৎসর, ৮ মাস ও ১৬ $\frac{৪১৭৬}{৪৭৭৯৯}$ দিন পরে, এই পার্থক্য অধিমাসের ৩০ দিনে দাঁড়ায়। চান্দ্র দিনের উপরোক্ত ভগ্নাংশ প্রায় ৫ মিনিট, ১৫ সেকেণ্ডের সমান হয়।

এই মাস নিবেশের (intercalation) শাস্ত্রীয় বিধান হিসাবে ওরা বেদ থেকে একটি অংশ আমাকে পড়ে শুনিয়েছে, যার অর্থ হোল : সূর্য একরাশি থেকে অন্য রাশিতে না গিয়েই যদি অমাবস্যা, অর্থাৎ চান্দ্র মাসের প্রথম দিন গত হয়ে যায়, এবং সূর্যের রাশি সংক্রমণ যদি তার পরের দিন হয়, তাহলে পূর্ব-বর্তী মাসটি গণনায় বাইরে পড়ে যাবে।'

কথাগুলিতে অর্থের অসংগতি দেখা যাচ্ছে; যে আমাকে শ্লোকটি শুনিয়ে তর্জমা করেছিল, নিশ্চয়ই তারই দোষে অর্থের এই অশুদ্ধি ঘটেছে। আসলে এক চান্দ্র মাসে ৩০ দিন হয়ে থাকে এবং সৌর বৎসরের এক ষড়াধে ৩০ $\frac{৫০১১}{৫৭৬০}$ চান্দ্র দিবস থাকবে। দিবস-মিনিটের হিসাবে এই ভগ্নাংশ ৫৫′,১৯″,২২‴ ও ৩০⁗-এর সমান হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, যদি রাশির 0' ডিগ্রিতে অমাবস্যা হচ্ছে অনুমান করি, তাহলে তার সময়ের সাথে এই ভগ্নাংশ যোগ করে নিলে সূর্যের ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রাশি সংক্রমণের সময়ক্রম আমরা বের করতে পারব।

৩৬০ সৌর ও চান্দ্র দিবস যখন একদিনের ভগ্নাংশ মাত্র প্রভেদ, তখন কোনও মাসে সূর্যের নতুন রাশি সংক্রমণ হোল না, এমন হোতে পারে না। বরঞ্চ, এমনও হোতে পারে যে পরপর দুই মাসের একই দিনে সূর্য নতুন রাশিতে প্রবেশ করে। কোনও মাসের ৪′,৪০′,৩৭″,৩০‴ দিবস-মিনিট উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই যদি সূর্য অন্য রাশিতে প্রবেশ করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে ঐ রকমই হবে। কারণ, তার পরের রাশিতে প্রবেশ করার সময় আরও ৫৫″,১৯″,২০‴ ৩০⁗ দিবস-মিনিট পরে হবে। কিন্তু এই দুই ভগ্নাংশ এক সাথে যোগ দিলেও এক সম্পূর্ণ দিবস হয় না। কাজেই, বেদের এই উদ্ধৃতি শুদ্ধ হতে পারে না।

তবে ভেবে দেখলে মনে হয় বেদের এই উক্তির শব্দের অর্থ এইরূপ হবে: যদি এমন কোনও মাস উত্তীর্ণ হয়ে যায় যাতে সূর্যের রাশি সংক্রমণ হয়নি, তাহলে গণনাতে সে মাস উপেক্ষণীয়। মাসের ২৯ দিবসে যদি সূর্য নতুন রাশিতে প্রবেশ করে যখন সেদিনের অন্ততঃ ৪´,৪০´´,৩০´´´ দিবস-মিনিট গত হয়েছে, তাহলে মনে করতে হবে যে এই রাশি প্রবেশ পরবর্তী মাস আরম্ভ হবার আগেই হয়েছে। কাজেই, পরের মাসে সূর্যের নতুন রাশি-প্রবেশ আর হোল না, কেননা পরবর্তী রাশি প্রবেশ তারও পরের মাসে পড়বে। কোন রাশির ০° ডিগ্রীতে অমাবস্যা ধরে নিয়ে তার থেকে পর্যায়ক্রমে সূর্যের রাশি প্রবেশ যদি এইভাবে গণনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে তেত্রিশতম মাসের ২৯ তারিখের ৩০´,২০´´ দিবস-মিনিটে সূর্য নতুন রাশিতে প্রবেশ করছে এবং তার পরবর্তী রাশিতে প্রবেশ করছে ৩৫তম মাসের প্রথম দিনের ২৫´,৩৯´´,২২´´´,৩০´´´´ দিবস-মিনিট গতে।

গণনা থেকে যে মাসটি পরিত্যক্ত হয় তাকে কেন অশুভ মনে করা হয় তা সহজেই বোঝা যায়। পুণ্যার্জনের জন্য যে বিশেষ লগ্নটি প্রশস্ত, অর্থাৎ সূর্যের রাশি প্রবেশের সময়, ঐ মাসে সে লগ্ন আসে না।

অধিমাসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হোল প্রথম মাস, কেননা 'আদির' অর্থ সূচনা। ইয়াকুব ইবনে তারিক ও অল্-ফযারীর পুস্তক দুটিতে শব্দটি
৩৬১ 'পদমাস' লিখিত হয়েছে। "পদের অর্থ অন্ত। হিন্দুরা হয়ত এই উভয় নামই ব্যবহার করে। তবে ভারতীয় শব্দের অনুলেখনে এই লেখকদ্বয় তেমন সাবধান নন। সেজন্য তাঁদের পরিবেশিত সংবাদ খুব নির্ভরযোগ্য নয়। একথা বলছি এজন্য যে পলিশ একই নামে অভিহিত এই দুই মাসের দ্বিতীয় মাসকেই 'অধিক' বা উদ্‌বৃত্ত বলেছেন।

এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যা পর্যন্ত যে মাস তা ক্রান্তিবৃত্তে চন্দ্রের এক সম্পূর্ণ আবর্তন কাল। তার কক্ষ সূর্যের আবর্তন কক্ষ থেকে দূরে। এই হচ্ছে জ্যোতিষ্কদ্বয়ের গতিতে পার্থক্যের কারণ, যদিও তাদের গতি একই দিকে। সূর্যের আবর্তন সংখ্যাকে, অর্থাৎ এক কল্পের মোট সৌর আবর্তন চক্রকে এক কল্পের মোট চান্দ্র আবর্তন থেকে বিয়োগ করলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা হবে সৌর মাসের চেয়ে চান্দ্র মাসের আধিক্যের পরিমাণ।

যে সব মাস বা দিবসকে আমরা সম্পূর্ণ কল্পের অংশ বলে ধরি সেগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সামগ্রিক (كلية Universal) আর যে

সব মাস বা দিবসকে কল্পাংশের ভাগ (যেমন চতুর্যুগের অংশ) বলে ধরি, সে গুলিকে (جزء كسر partial) আংশিক বলে এখানে বিশেষিত করব।

এক বৎসরে বারটি সৌর মাস থাকে, তেমনই ১২টি চান্দ্র মাস থাকে। চান্দ্র বৎসর ১২ মাসেই সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু এই দুই প্রকার বৎসরের মধ্যে প্রভেদের কারণ, সৌর বৎসর 'অধিমাস' সহ ১৩ মাসে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং 'সামগ্রিক' সৌর ও সামগ্রিক চান্দ্র মাসের মধ্যে যে প্রভেদ তা এই 'উদ্বৃত্ত' বা 'অধিক' মাস, যার জন্য কোনও কোনও বৎসর ১৩ মাসে সমাপ্ত হয়। এই মাসগুলিই আসলে 'সামগ্রিক অধিমাস'।

এক কল্পে সামগ্রিক সৌর মাসের সংখ্যা হচ্ছে ৫১৮৪০,০০০,০০০ আর 'সামগ্রিক' চান্দ্র মাসের সংখ্যা ৫৩,৪৩৩,৩০০,০০০। এই দুই সংখ্যার বিয়োগ ফল, অর্থাৎ 'অধিমাসের' সংখ্যা হবে ১,৫৯৩,৩০০,০০০। এই সংখ্যাত্রয়ের প্রত্যেকটিকে ৩০ দিয়ে গুণ করলে আমরা কল্পের সৌর দিবস, চান্দ্র দিবস ও 'অধিমাস' দিবসের সংখ্যা পাব (যথাক্রমে ১,৫৫৫,২০০,০০০, ০০০; ১,৬০২,৯৯৯,০০০,০০০; ও ৪৭,৭৯৯,০০০,০০০)। এই সংখ্যা-গুলিকে ছোট করে নেওয়ার জন্য সাধারণ ভাজক হিসাবে ৯,০০০, ০০০ দিয়ে আবার ভাগ দেব, তখন মোট দিবস হিসাবে সৌর মাসসমূহের বেলায় আমরা পাচ্ছি ১৭২,৮০০,চান্দ্রমাসের বেলায় ১৭৮,১১১, আর অধিমাসসমূহের
৩৬২ বেলায় ৫৩১১।

কল্পের 'সামগ্রিক' সৌর, 'সাবন' ও চান্দ্র দিবসের এই সংখ্যাগুলিকে আবার যদি পৃথক পৃথক ভাবে 'সামগ্রিক' অধিমাস' সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিই, তাহলে ভাগফল হবে সেই সব দিবস সংখ্যা, যা উত্তীর্ণ হলে একটি 'অধিমাস' সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ ৯৭৬ $\frac{৪৬৪}{৫৩১১}$ সৌর দিবস, ১০০৬ $\frac{৩৬৪}{৫৩১১}$ চান্দ্র দিবস, আর ৯৯০ $\frac{৩৬৬৩}{১০৬২২}$ 'সাবন' অথবা লৌকিক দিবস।

এই হিসাব অবশ্য ব্রহ্মগুপ্ত প্রদত্ত 'কল্প' ও কল্পের নাক্ষত্রিক আবর্তন সংখ্যা অনুযায়ী। পলিশের মতানুযায়ী, কিন্তু এক চতুর্যুগে ৫১,৮৪০,০০০ সৌর মাস, ৫৩,৪৩৩,৩৩৬ চান্দ্র মাস, আর ১,৫৯৩,৩৩৬ 'অধিমাস' হয়। অতএব, এক চতুর্যুগে ১,২৫৫৫,২০০,০০০ সৌর দিবস, ১,৬০৩,০০০,০৮০ চান্দ্র দিবস, আর ৪৭,৮০০,০৮০ 'অধিমাস' দিবস হবে। মাসের সংখ্যা যদি আবার উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সাধারণ ভাজক অর্থাৎ ২৪ দিয়ে ভাগ দিয়ে কমিয়ে আনি, তাহলে আমরা ২,১৬০,০০০ সৌর মাস, ২,২২৬,৩৮৯ চান্দ্র মাস আর

৬৬৩৮৯ 'অধিমাস' পাই। দিবস সংখ্যাগুলিকেও আবার ৭২০ দিয়ে ভাগ দিলে আমরা ২,১৬০,০০০ সৌর, ২,২২৬,৩৮৯ চান্দ্র মাস আর ৬৬৩৮৯ অধিমাস দিবস পাই। পরিশেষে চতুর্যুগের সামগ্রিক 'সৌর ও সাবন দিবস' সংখ্যার প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে চতুর্যুগের সামগ্রিক অধিমাস সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল হবে সেই দিবসের মোট সংখ্যা যা গত হলে একটি 'অধিমাস' সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ $৯৭৬\frac{৪৩৫৬}{৬৬৩৮৯}$ সৌর দিবস, $১০০৬\frac{৪৩০৬}{৬৬৩৮৯}$ চান্দ্র দিবস, আর $৯৯০\frac{২১৪৬৫}{৬৬৩৮৯}$ 'সাবন' দিবস। এই হোল অধিমাস গণনা করার মূল রীতি
৩৬০ যা পরবর্তী আলোচনার জন্য এখানে দেখান গেল।

'ক্ষয়' দিবস বা 'উন' রাত্রের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যদি এক বা একাধিক বৎসরের প্রত্যেকটিতে আমরা বার মাস করে ধরে নেই তাহলে তদনুপাতে আমরা সৌরমাসের সংখ্যা পাব, এবং ১২কে ৩০ দিয়ে পূরণ করলে আমরা তার সৌর দিবসও পাব। ঐ সংখ্যাগুলির সঙ্গে কেবল এক বা একাধিক অধিমাস হতে যত সময়ের প্রয়োজন তা যোগ দিলেই ঐ কাল পরিমাণের (উপরোক্ত এক বা একাধিক বৎসর) চান্দ্র মাস ও দিবস পাওয়া যাবে। সামগ্রিক সৌর মাসের সঙ্গে সামগ্রিক অধিমাসের যে আনুপাতিক সম্বন্ধ, উপরোক্ত কাল-পরিমাণের অধিমাস গঠনকারী উদ্বৃত্ত সময়কে যদি আমরা সেই অনুপাতে সংখ্যায় পরিণত করি এবং এই সংখ্যাকে আবার আলোচ্য কালপরিমাণের মাস বা দিবসের সাথে যোগ দেই, তাহলে লব্ধ সংখ্যা হবে আংশিক চান্দ্র, অর্থাৎ এ আলোচ্য কালের চান্দ্রদিবস।

আমাদের অভিষ্ট, কিন্তু তা নয়। আমরা যা চাই তা হচ্ছে আলোচ্য কালের 'সাবন' দিবস-সংখ্যা, যা চান্দ্র দিবস অপেক্ষা কম, কেননা 'সাবন' দিবস চান্দ্র দিবসের চেয়ে দীর্ঘতর। কাজেই, সে সংখ্যা পেতে হলে চান্দ্রদিবসের সংখ্যা থেকে কিছু পরিমাণ বাদ দিতে হবে। যে পরিমাণ বাদ দিতে হবে তাকেই 'উনরাত্র' বলা হয়।

'সামগ্রিক, সাবন দিবস সামগ্রিক চান্দ্র দিবস অপেক্ষা যে পরিমাণ কম, সামগ্রিক চান্দ্র দিবসের সাথে 'আংশিক' চান্দ্র দিবসের 'উনরাত্রের'ও সেই সম্বন্ধ। এককল্পে 'সামগ্রিক' সাবন 'দিবসের সংখ্যা ১,৬০২,৯১৯,০০০,০০০। এ সংখ্যা সামগ্রিক 'সাবন' দিবস অপেক্ষা ২৫,০৮২,৫৫০,০০০ বেশী। শেষোক্ত সংখ্যাই হচ্ছে 'সামগ্রিক উনরাত্র'।

এই দুইটি সংখ্যাকেই সাধারণ ভাজক ৪৫০,০০০ দিয়ে কমিয়ে আনা যায়। তার ফলে আমরা ৩,৫৬২,২২০ সামগ্রিক চান্দ্র, আর ৫৫,৭৩৯ সামগ্রিক 'উনরাত্র' দিবস পাই।

পলিশের মতে, এক চতুর্যুগে ১৬০৩,০০০,০৮০ চান্দ্র দিবস, আর ২৫০৮ ২২৮০, 'উনরাত্র' দিবস থাকে। এদের 'সাধারণ ভাজক' হোল ৩৬০। ফলে, আমরা ৪৪৫২৭৭৮ চান্দ্র, আর ৬৯৬৭৪ 'উনরাত্র' দিবস পাচ্ছি।

'উনরাত্র' গণনার এই হচ্ছে নিয়ম। 'অহর্গন' গণনার সময়ে আমাদের এই নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। 'অহর্গনের' অর্থ দিবস-সমষ্টি (جملة الا يام) কারণ, 'অহ' = দিবস। অর্গন = সমষ্টি বা যোগফল।

সৌর দিবস গণনায় এয়াকুব বিন্ তারিক্ একটি ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, কল্পের অর্থাৎ মোট 'সামগ্রিক' সাবন দিবস থেকে সূর্যের অয়ন
৩৬৪ সংখ্যা বিয়োগ করলে কল্পের মোট সৌর দিবস পাওয়া যাবে। আসলে কিন্তু তা নয়। কল্প কালের সৌর চক্রের সংখ্যাকে ১২ দিয়ে গুণ দিয়ে মাসের সংখ্যা বের করতে হবে এবং সে মাসের সংখ্যাকে আবার ৩০ দিয়ে গুণ করলে, অথবা অয়ন সংখ্যাকে ৩৬০ দিয়ে গুণ দিলে তবেই কল্পের মোট সৌর দিবস পাওয়া যাবে।

চান্দ্র দিবস গণনায় কিন্তু এয়াকুব সে রকম ভুল করেন নি। কল্পের মোট চান্দ্র মাসকে ৩০ দিয়ে পূরণ করেছেন। কিন্তু মোট 'উনরাত্র' দিবস বের করতে গিয়ে আবার ভ্রমে পতিত হয়েছেন। কেননা তিনি বলছেন, মোট চান্দ্র দিবস থেকে সৌর দিবসগুলি বাদ দিলেই 'উনরাত্রের' মোট সংখ্যা পাওয়া যাবে। কিন্তু আসলে মোট চান্দ্র দিবস থেকে মোট 'সাবন' দিনের সংখ্যা বাদ দিতে হবে।

বায়াম্ন অধ্যায়

অহর্গন গণনার সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ বর্ষ ও মাসকে দিবসে ও দিবসকে মাস ও বর্ষে পরিণত করার প্রণালী :

প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে : সম্পূর্ণ বৎসরকে ১২ দিয়ে পূরণ কর, লব্ধাঙ্কের সঙ্গে চলতি বৎসরের অতীত মাস যোগ দাও; তার সাথে আবার চলতি মাসের বিগত দিবসগুলি যোগ দাও। অবশেষে যে সংখ্যা পাওয়া গেল তা হবে 'সৌরহর্গন' অর্থাৎ আংশিক সৌর দিবসের মোট সংখ্যা। এই সংখ্যাকে দুই স্থানে লিখতে হবে। প্রথম স্থানে এই সংখ্যাকে ৫৩৩৩৬, অর্থাৎ মোট 'সামগ্রিক'
৩৬৫ অধিমাস সংখ্যা দিয়ে গুণ দিতে হবে; গুণফলকে ১৭২৮০০, অর্থাৎ 'সামগ্রিক' সৌর মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে। ভাগ ফলে সম্পূর্ণ দিবসের যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তাকে দ্বিতীয় স্থানে লিখিত পূর্বোক্ত সংখ্যার সাথে যোগ করতে হবে। যোগফল হবে 'চন্দ্রহর্গন' অর্থাৎ আংশিক চান্দ্র দিবসের মোট সংখ্যা।

শেষোক্ত সংখ্যাকে আবার দুই স্থানে লিখতে হবে। এক স্থানে তাকে ৫৫৭০৯, অথবা সামগ্রিক 'উনরাত্রের' মোট সংখ্যা দিয়ে গুণ দিতে হবে এবং গুণফলকে ৩৫৬২,২২০ অর্থাৎ সামগ্রিক চান্দ্র দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে। ভাগফলের সম্পূর্ণ দিবস সংখ্যা দ্বিতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যা থেকে বিয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট সংখ্যা হবে 'সাবনহর্গন' অর্থাৎ মোট 'সাবন' দিবস যা বের করা এই গণনার উদ্দেশ্য।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই প্রক্রিয়া কেবল সেই সব তারিখেই প্রযুক্ত হবে যাতে অধিমাস ও উনরাত্রগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, কোনও ভগ্নাংশ থাকে না। কাজেই, আলোচ্য বর্ষগুলি যদি কল্প, চতুর্যুগ বা কলিযুগ থেকে আরম্ভ হয়, তাহলে এই গণনা শুদ্ধ হবে। কিন্তু তা না হয়ে যদি অন্য কোনও সময় থেকে সে বর্ষগুলি আরম্ভ হয় তাহলে দৈবাৎ এ গণনা শুদ্ধ হতেও পারে; কিন্তু এমনও হতে পারে যে গণনার ফলে কিছু 'অধিমাস' সময় (অর্থাৎ দিবসের ভগ্নাংশ) বের হোল। তাহলে কিন্তু এই গণনা শুদ্ধ হবে না। অবশ্য এই দুই অবস্থার বিপরীতও হতে পারে। তবে, কল্প, চতুর্যুগ বা কলিযুগের

কোন বিশেষ মুহূর্তে আলোচ্য বৎসরগুলি আরম্ভ হয়েছে তা যদি জানা থাকে তাহলে গণনার এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা তা বোঝা যাচ্ছে।

১৫০ ভারতীয় শকাব্দের আরম্ভ কাল দিয়ে আমরা এ পদ্ধতি দেখাব। এই সালকে গণনাতে আমরা মান-বৎসর বলে ব্যবহার করছি।

প্রথমে ব্রহ্মগুপ্তের হিসাব অনুযায়ী 'ব্রহ্মার' আয়ুর আরম্ভ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কাল নির্ণয় করতে হবে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বর্তমান কল্পের পূর্বে ৬০৬৮ কল্প অতীত হয়েছে। এই সংখ্যাকে কল্পের সুবিদিত দিবস সংখ্যা (অর্থাৎ, ১৫৭৭, ৯১৬, ৪৫০,০০০ সাবন দিবস) দিয়ে পূরণ করলে আমরা ৬০৬৮ কল্পের মোট দিবস সংখ্যা পাই ৯,৫৭৪,৭৯৭,
৩৬৬ ০১৮,৮০০,০০০। এই সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগশেষ থাকে ৫। পূর্ববর্তী কল্পের শেষ দিন, শনিবার থেকে ৫ দিন পিছিয়ে এলে আমরা পাই, মঙ্গলবার, ব্রহ্মার আয়ুর প্রথম দিন। চতুর্যুগের মোট দিবস সংখ্যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি (১,৫৭৭,৯১৬,৪১০) এবং দেখিয়েছি যে কৃত্যযুগ হচ্ছে চতুর্যুগের দশ ভাগের চার ভাগ (৬৩১,১৬৬,৫৮০ দিবস)। এক মন্বন্তরে কৃত্যযুগের ৭১ গুণ বেশী দিবস থাকে। ৬ মন্বন্তরে ও ৭ কৃত্য যুগে সম্পূর্ণ তাদের 'সন্ধিতে' মোট ৭৬,৬১০,৫৭৩,৭৬০ দিবস থাকে। এই সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগশেষ থাকে ২। অতএব ছয়টি মন্বন্তর শেষ হয় সোমবারে এবং সপ্তমটি আরম্ভ হয় মঙ্গলবারে। এই সপ্তম মন্বন্তরের ২৭টি চতুর্যুগ অতীত হয়েছে; তার মোট দিবস সংখ্যা হোল ৪২,৬০৩,৭৪৪,১৫০। এই সব সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে হাতে থাকে ২। অতএব অষ্টবিংশতি মন্বন্তরের আরম্ভ হবে বৃহস্পতিবারে। বর্তমান চতুর্যুগ থেকে যতগুলি যুগ গত হয়েছে তাদের মোট দিবস সংখ্যা হবে ১,৪২০,১২৪,৮০৫। ৭ দিয়ে ভাগ দিলে তারও ভাগশেষ হয় ১। অতএব কলিযুগের আরম্ভ হচ্ছে শুক্রবারে।

এখন আমাদের নির্দিষ্ট মান-বৎসরে ফিরে গিয়ে আমরা দেখছি যে সে পর্যন্ত বর্তমান কল্পের ১৯৭২,৯৪৮,১৩২ বৎসর অতীত হয়েছে। এ সংখ্যাকে ১২ দিয়ে গুণ করলে মোট মাস সংখ্যা পাই ২৩,৬৭৫,৩৭৭,৫৮৪। আমাদের অবলম্বিত তারিখে কোনও মাস নাই; কাজেই এই সংখ্যায় আর কিছু যোগ করবার নাই। তবে ৩০ দিয়ে গুণ করে এই মোট মাস সংখ্যাকে দিবসে পরিণত করতে হবে। দিবস সংখ্যা হবে—৭১০,২৬১,৩২৭,৫২০। আমাদের অবলম্বিত তারিখে কোন দিবস নাই বলে এ সংখ্যার সাথে আর কিছু যোগ

দেওয়ার নাই। সেজন্য, যদি কল্পের উপরোক্ত বৎসর-সংখ্যাকে আমরা ৩৬০ দিয়ে গুণ করতাম, তাহলেও ঐ একই ফল পেতাম, অর্থাৎ আংশিক সৌর দিবস-সংখ্যা পেতাম।

এখন এই সংখ্যাকে ৫৩১১ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ১৭২৮০০ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। তার ফলে আমরা ২১,৮২৯,৮৬৯,০১৮ $\frac{১০৩}{১২০}$ 'অধিমাস' দিবস পাব। এই গুণ ও ভাগ করার জন্য যদি আমরা দিবস ব্যবহার না করে মাস ব্যবহার করতাম, তাহলে ভাগফল থেকে আমরা 'অধিমাস' মাস পেতাম। সে মাস সংখ্যাকে ৩০ দিয়ে গুণ করলে কিন্তু আবার 'অধিমাস' দিবসের এই সংখ্যাই পেতাম।

এই 'অধিমাস' দিবস সংখ্যাকে যদি আবার আংশিক সৌর দিবস সংখ্যার
৩৬৭ সাথে যোগ দিই তাহলে ৭৩২,০৯১,১৭৬,৫৩৮ আংশিক চান্দ্র দিবস পাব। তাকে আবার ৫৫৭০৯ দিয়ে গুণ করে, লব্ধাংককে ৩১৬২,২২০ দিয়ে ভাগ দিলে আমরা ১১,৪৫৫,২২৪,৫৭৫ $\frac{১,৭৪৭,৫৪১}{১,৭৮১,১১০}$ 'আংশিক' 'ঊনরাত্র' দিবস পাব। ভগ্নাংশবিহীন এই সম্পূর্ণ দিবস-সংখ্যাকে আংশিক চান্দ্র দিবস থেকে বাদ দিতে হবে। যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই হবে আমাদের দৃষ্টান্তের জন্য অবলম্বিত শকাব্দ সাল পর্যন্ত বিগত মোট সাবন-দিবস সংখ্যা। তাকে আবার ৭ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগশেষ থাকে ৪, যার অর্থ হোল, এর শেষ দিবসটি হচ্ছে বুধবার। কাজেই, উক্ত সালটি বৃহস্পতিবারে আরম্ভ হয়েছে জানা গেল।

উক্ত সালের 'অধিমাস' সময় যদি জানতে চাই তাহলে আমরা মোট অধিমাস দিবসকে ৩০ দিয়ে ভাগ করব। ভাগফল হবে যে অধিমাস অতীত হয়েছে তার মোট সংখ্যা, অর্থাৎ ৭২৭,৬৬১,৬৩৩। অবশিষ্ট যে ২৮ দিন, ১৫ মিঃ ও ৩০ সেঃ থাকবে তা হবে চলতি বৎসর পর্যন্ত অধিমাস কাল, যা আর মাত্র ১ দিন, ৮ মিঃ ৩০ সেঃ পরে সম্পূর্ণ অধিমাসে পরিণত হবে।

এখানে আমরা কল্পের এক অতীত অংশবিশেষ সম্বন্ধে সৌর ও চান্দ্র অধিমাস ও ঊনরাত্র দিবসগুলি ব্যবহার করেছি। চতুর্যুগের অনুরূপ অংশের তথ্য বের করার জন্য আমরা ঐ দিবসগুলিই আবার ব্যবহার করব, কারণ উভয় প্রক্রিয়াই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অবশ্য যদি আমরা একই মতানুসরণ করি এবং ব্রহ্মগুপ্তের মতের সঙ্গে কাল গণনায় অন্যান্য মতবাদ মিশিয়ে

না ফেল। আরও একটি শর্ত এই যে উভয় প্রক্রিয়াতে প্রত্যেক গুণকার (گنکار), ও ভাগভার (بهاگ بهار) একই হতে হবে।

এই দুইটি শব্দ এখানে এক সাথেই উল্লেখ করা হোল। প্রথমটির অর্থ সব রকম গণনায় প্রযুক্ত গুণক। আরবী ও ফার্সী পঞ্জিকাদিতে শব্দটি 'গুণচার'
৩৬৮ (گنچار) রূপে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে, প্রত্যেক গণনায় ব্যবহৃত ভাজক। পঞ্জিকাদিতে এ শব্দটি কে 'বহুচার' (بهچار) রূপে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মগুপ্তের মতে চতুর্যুগ হচ্ছে কল্পের এক সহস্রাংশ। সে রূপ চতুর্যুগে আমাদের এই গণনা রীতি প্রয়োগ করা বৃথা, কেননা উপরোক্ত সংখ্যা-গুলি থেকে তিনটি শূন্য কমিয়ে দিলেই আমরা একই ফল পাব। সেজন্য পলিশের সিদ্ধান্তনুযায়ী যে চতুর্যুগ, তাতেই আমরা এই গণনা রীতি প্রয়োগ করব। আপাততঃ চতুর্যুগে প্রযুক্ত হলেও অনুরূপ গণনা কল্পের ক্ষেত্রেও শুদ্ধ হবে।

আমাদের নির্দিষ্ট মান-বৎসরের আরম্ভ মুহূর্ত পর্যন্ত পলিশের মতে চতুর্যুগের ৩২৪৪১৩২ বৎসর ও ১১৮৭৮৮৭৫২০ সৌর দিবস গত হয়েছে। এই দিবস-সমষ্টির মাস সংখ্যা যদি আমরা এক চতুর্যুগের 'অধিমাস' সংখ্যা কিম্বা সেইরূপ কোনও গুণক দিয়ে গুণ করি এবং এক চতুর্যুগের সৌর দিবস সংখ্যা বা ঐরূপ ভাজক দিয়ে গুণফলকে ভাগ করি, তাহলে মোট ১১৯৬,৫২৫ $\frac{৪৪৮\cdot৭}{৪৫০০০}$ অধিমাস পাচ্ছি, যা ঐ নির্দিষ্ট মান-বৎসরে প্রারম্ভ মুহূর্ত পর্যন্ত গত হয়েছে। এখন, চতুর্যুগের যে ৩৩২৪৪১৩২ বৎসর অতীত হয়েছে তার মোট চান্দ্র দিবস হচ্ছে ১২০৩,৭৮৩,২৭০। এই সংখ্যাকে এক চতু-র্যুগের 'ঊনরাত্র' দিবস সংখ্যা দিয়ে গুণ করে, গুণফলকে এক চতুর্যুগের মোট চান্দ্র দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে, আমরা মোট ১৮,৮৩১,৭০০ $\frac{৫৯৮০৫৫}{২,২২৬,৩৮৯}$ 'ঊনরাত্র' দিবস পাচ্ছি। অতএব বর্তমান চতুর্যুগে প্রারম্ভ থেকে যত 'সাবন' দিবস গত হয়েছে, তার মোট সংখ্যা হবে ১১৮৪,৯৪৭,৫৭০ যা আমাদের অভীষ্ট ছিল।

এখানে আমি পলিশ-সিদ্ধান্ত থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি যেখানে এই রকম গণনা পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে; তাতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে এবং মর্মোপলব্ধি গভীর হবে। পলিশ বলেছেন: প্রথমে আমরা বর্তমান কল্পের পূর্বে ব্রহ্মার আয়ুর যতগুলি কল্প গত হয়েছে তা লিখব; সে কল্প হচ্ছে ৬০৬৮। এক কল্পের অন্তর্গত চতুর্যুগের মোট সংখ্যা, অর্থাৎ ১০০৮

দিয়ে প্রথমোক্ত সংখ্যাকে গুণ করব। গুণফল পাচ্ছি ৬১১৬৬৫৪৪। এই
৩৬৯ সংখ্যাকে আবার এক চতুর্যুগের মোট যুগ সংখ্যা, অর্থাৎ ৪ দিয়ে গুণ করলে ২৪৪৬৬,১৭৬ গুণফল পাচ্ছি। এই সংখ্যাকে আবার একযুগের মোট বর্ষ-সংখ্যা', অর্থাৎ ১০৮০,০০০ দিয়ে গুণ করব। গুণফল হল ২৬৪২৩,৪৭০,০৮০, ০০০। এই হবে বর্তমান কল্প পূর্বের অতীত বৎসরের মোট সংখ্যা। একে আবার ১২ দিয়ে গুণ করে ৩১৭.০৮১,৬৪০,৯৬০,০০০ মাসে পরিণত করি। এই সংখ্যাকে এখন আমরা দুই স্থানে লিখে রাখব। প্রথম স্থানে লিখিত সংখ্যাকে চতুর্যুগের অন্তর্গত 'অধিমাস' মাসের মোট সংখ্যা ১৫৯৩,৩৪৬, কিম্বা পূর্বোল্লিখিত অনুরূপ সংখ্যা দিয়ে গুণ করব; গুণফলকে আবার চতুর্যুগের মোট সৌর দিবস সংখ্যা, অর্থাৎ ৫১,৮৪০,০০০ দিয়ে ভাগ করব। ভাগফল ৯৭৪৫,৭০৯,৭৫০,৭৮৪ হবে অতীত কল্পসমূহের 'অধিমাস' মাসের মোট সংখ্যা। এই সংখ্যাকে এখন দ্বিতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যাটির সাথে যোগ করে ফল পাব—৩২৬,৮২৭,৩৫০,৭১০,৭৮৪। এই অংককে আবার ৩০ দিয়ে গুণ করে ৯৮০৪,৮২০,৫২১,৩ ৩,৫২০ চান্দ্র দিবসে পরিণত করব।

এই অংককে আবার দুই স্থানে লিখব। এক জায়গায় তাকে এক চতুর্যুগের 'উনরাত্র' সংখ্যা, অর্থাৎ চান্দ্র ও 'সাবন' দিবসের পার্থক্য দিয়ে গুণ করব। গুণফলকে আবাব চতুর্যুগের মোট চান্দ্র দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব। ভাগফলে আমরা ১৫৫,৪১৬,৮৬১,২৪০,৩২০ 'উনরাত্র' দিবস পাচ্ছি।

'এই উনরাত্র সংখ্যাকে এখন দ্বিতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যা থেকে বিয়োগ করব। বিয়োগফল ৯৬ ১,৪০৩,৬৫২,০৮৩,২০০ হবে বর্তমান কল্পের প্রারম্ভ পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুর অতীত ৬০৬৮ কল্পের মোট দিবস সংখ্যা। অতএব প্রতি কল্পের মোট দিবস সংখ্যা হবে ১৫৯০,৫৭১,১৪২,৪০০। এই অংককে ৭ দিয়ে ভাগ করলে কোনও ভাগশেষ থাকে না। অতএব এই দিবস সমষ্টি শনিবারে শেষ হয়েছে এবং আরম্ভ হয়েছে রবিবারে। এর থেকে জানা যাচ্ছে যে ব্রহ্মার আয়ু আরম্ভও হয়েছে রবিবারে।

পলিশ আরও বলেছেন: 'বর্তমান কল্পের ছয় মন্বন্তর গত হয়েছে। প্রতি মন্বন্তরে ৭২ চতুর্যুগ থেকে এবং প্রত্যেক চতুর্যুগে থাকে ৪৩২০০০০ বৎসর।
৩৭০ ছয় মন্বন্তরে তাহলে ১৮৬৬,২৪০,০০০ বৎসর হয়। এই সংখ্যাকে আমরা উপরের প্রণালীতে দিবসে পরিণত করলে ছয় মন্বন্তরে ৬৮১,৬৬০,৪৮৯,৬০০ দিবস পাচ্ছি। এই দিবস-সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ৬। অতএব বোঝা যাচ্ছে, বর্তমান কল্পের যে ছয়টি মন্বন্তর সম্পূর্ণ হয়েছে তার

শেষ দিন ছিল শুক্রবার এবং বর্তমান, অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তর শনিবারে আরম্ভ হয়েছে।'

বর্তমান মন্বন্তরের আবার ২৭টি চতুর্যুগ গত হ'য়েছে। উপরের প্রণালীতে এই ২৭ চতুর্যুগের দিবস সংখ্যা পাওয়া যাবে ৪২,৬০৩,৭৮০,৬০০। তার শেষ দিন হচেছ সোমবার। অতএব পরবর্তী ২৮তম চতুর্যুগ মঙ্গলবারে আরম্ভ হয়েছে।

বর্তমান চতুর্যুগেরও তিনটি যুগ অতীত হয়েছে। তিন যুগের মোট বৎসর সংখ্যা হোল ৩২৪০০০০। উপরের প্রণালীতে গণনা করে এই তিন যুগের দিবস সংখ্যা পাওয়া যাচেছ—১,১৮৩,৪৩৮,৩৫০ এবং শেষ দিন পাওয়া যাচেছ বৃহস্পতিবার। অতএব কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে শুক্রবার।

তাহলে কল্পের মোট অতীত দিবস সংখ্যা পাওয়া গেল—৭২৫,৪৪৭, ৭০৮,৫৫০, আর ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের সূচনা থেকে কলিযুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত অতীত দিবস সংখ্যা পাওয়া গেল—৯,৬৫২,১২৯,০৯৯,৭৯৯,৭৫০।

আর্যভাটের পুস্তক আমি দেখিনি, তবে শ্রুত বর্ণনা থেকে মনে হয় তার গণনা পদ্ধতি কতটা এই রকম :

এক চতুর্যুগের সর্বমোট দিবস সংখ্যা হচ্ছে ১,৫৭৭,৯১৭,১০০, আর কল্পের প্রারম্ভ থেকে কলিযুগের আরম্ভ পর্যন্ত ৭২৫,৪৪৭,৫৭০,৬২৫ দিবস।

কল্পারম্ভ থেকে আমাদের মান-বৎসর পর্যন্ত হয় ৭২৫,৪৪৯,০৭১,৮৪৫ দিবস। আর আমাদের কল্পের আরম্ভ পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের ৯৬৫১,৪০১ ৮১৭,১২০,০০০ দিবস গত হয়েছে।

বৎসরকে দিবসে পরিণত করার এই হচ্ছে শুদ্ধ প্রণালী; সময়ের অন্যান্য পরিমাণ গণনা করতে হ'লে এই প্রণালীতেই করতে হবে।

'সামগ্রিক' সৌর দিবস ও 'উনরাত্রের' গণনায় ইয়াকুব বিন ত্বারিকের একটি ভ্রান্তির কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি ভারতীয় ভাষা থেকে একটি বিশেষ গণনারীতি নকল করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য তিনি বোঝেন নি। সে অবস্থায় তাঁর উচিত ছিল গণনাটি পরীক্ষা করে তার অংকগুলিকে পরস্পরের সাথে কষে দেখে নেওয়া। ইয়াকুব তাঁর পুস্তকে 'অহর্গন', অর্থাৎ
৩৭১ বৎসরকে অন্যান্য সময়-ভাগে পরিণত করার প্রণালী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনা শুদ্ধ নয়।

তিনি লিখেছেন: আলোচ্য বর্ষসমূহের মোট মাসকে অভীষ্ট সময় পর্যন্ত অতীত অধিমাসের সংখ্যা দিয়ে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী গুণ কর। গুণ-ফলকে সৌর মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দাও; ভাগফল হবে উদ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যতগুলি সম্পূর্ণ 'অধিমাস' ও তার ভগ্নাংশ অতীত হয়েছে তার মোট সংখ্যা।

এই বর্ণনার অশুদ্ধি এতই প্রকট যে, লিপিকারও তা ধরতে পারবে, গণিতজ্ঞের ত' কথাই নাই যে এই প্রণালীর শুদ্ধাশুদ্ধি গণনার দ্বারা পরীক্ষা করবে। স্পষ্টতঃ ইয়াকুব এখানে, 'সামগ্রিক' অধিমাস না ধরে 'আংশিক,' অধিমাস দিয়ে গুণ করেছেন।

তাঁর ঐ পুস্তকে তিনি যে আর একটি প্রণালীর উদাহরণ দিয়েছেন, তা অবশ্য শুদ্ধ। প্রণালীটি এই: বৎসরগুলির মোট মাস-সংখ্যা পাওয়া গেলে, সেই সংখ্যাকে মোট চান্দ্রমাস দিয়ে গুণ কর এবং গুণফলকে সৌর মাসের মোটসংখ্যা দিয়ে ভাগ দাও। যা ভাগফল হবে তা আলোচ্য বৎসরগুলির মোট 'অধিমাস' ও মাসের সংখ্যা হবে। এই ভাগফলকে আবার ৩০ দিয়ে গুণ করলে গুণফলের সঙ্গে চলতি মাসের অতীত দিবস সংখ্যা যদি যোগ দেওয়া যায় তাহলে চান্দ্র দিবসের মোট সংখ্যা পাওয়া যাবে। অন্য পক্ষে, সর্বপ্রথমে প্রাপ্ত মাসের সংখ্যাকে যদি ৩০ দিয়ে গুণ করা যায় এবং চলতি মাসের অতীত দিবস সংখ্যা তাতে যোগ দেওয়া হয় তাহলে 'আংশিক' সৌর দিবসের সংখ্যা পাওয়া যাবে। এই সংখ্যাকে যদি আবার উপরোক্ত প্রণালীতে গুণ ও ভাগ কর তাহলে সৌর দিবসের সঙ্গে আমরা অধিমাস দিবসের সংখ্যাও পাব।

এই গণনা বিধির যুক্তি এই: 'সামগ্রিক' অধিমাসের সংখ্যা দিয়ে যেমন আমরা গুণ করেছি তাই যদি করি, এবং গুণফলকে 'সামগ্রিক' সৌর দিবস দিয়ে ভাগ করি, তাহলে ভাগফল হবে অধিমাসের সেই অংশ যা দিয়ে আমরা গুণ করেছি। যেহেতু চান্দ্রমাস হচ্ছে সৌর ও অধিমাস মাসের সমষ্টি, সেহেতু এই দুই প্রকার মাসের মোট সংখ্যা দিয়ে তাকে গুণ ক'রে একই ভাজক দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে ঐ সংখ্যারই সমষ্টি যাকে গুণ করা হয়েছে এবং যা আমাদের উদ্দিষ্ট—অর্থাৎ চান্দ্র দিবস।

আগেই বলা হয়েছে যে 'সামগ্রিক 'উনরাত্র' দিবসের মোট সংখ্যা দিয়ে চান্দ্র দিবস-সমষ্টিকে গুণ দিয়ে এবং গুণফলকে সামগ্রিক চান্দ্র দিবস-সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা উনরাত্র দিবসের সেই সব অংশ পাব যা আলোচ্য চান্দ্র-দিবস সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কল্পের মোট চান্দ্র দিবসে যতগুলি উনরাত্র থাকে, কল্পের 'সাবন' দিবস থেকে ঠিক তত পরিমাণ কম। এক কল্পকালের মোট

চান্দ্র দিবসের সাথে তার 'উনরাত্র'-দিবস শূন্য মোট চান্দ্র দিবসের যে সম্বন্ধ, আমাদের লব্ধ চান্দ্র দিবসগুলির সাথে তার 'উনরাত্র'-শূন্য দিবসগুলিরও সেই
৩৭২ সম্বন্ধ, আর এই প্রকারের দিবসগুলিই হচ্ছে সামগ্রিক সাবন দিবস। অতএব আমাদের লব্ধ চান্দ্র দিবসকে যদি তার আনুপাতিক 'সামগ্রিক' সাবন দিবস সংখ্যা দিয়ে গুণ করি ও গুণফলকে সামগ্রিক চান্দ্র দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি, তাহলে ভাগফল দ্বারা আমরা আমাদের আলোচ্য সালের অনিরুষ্ট 'সাবন' দিবসের সংখ্যা পাব। কল্পের মোট 'সাবন' দিবস সংখ্যা দিয়ে গুণ না করে আমরা কেবল ৩,৫০৬,৪৮০ দিয়ে গুণ করব এবং কল্পের মোট চান্দ্র দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ না করে কেবল ৩,৫৬২,২২০ ভাগ করলেই আমাদের চলবে।

হিন্দুদের আরও একটি গণনারীতি আছে। কল্পের অতীত বৎসরগুলিকে তারা ১২ দিয়ে গুণ করে এবং গুণফলের সাথে বর্তমান বৎসরের অতীত মাসের সংখ্যা যোগ করে। এই অংককে ওরা ৬৯,১২০, এই সংখ্যার উপরে লেখে। ...*এবং বিয়োগফলকে ওরা দ্বিতীয় স্থানে লিখিত অংক থেকে বাদ দেয় ও যা বাকী থাকে তাকে ওরা দ্বিগুণ করে নিয়ে ৬৫ দিয়ে ভাগ দেয়। ভাগফল হবে 'আংশিক' অধিমাসের সংখ্যা। এই সংখ্যাকে আবার সর্বোপরে লিখিত অংকের সাথে যোগ দিয়ে তাকে ৩০ দিয়ে গুণ করে এবং যোগফলের সাথে চলতি মাসের অতীত দিবস সংখ্যা যোগ দেয়। যে অংক দাঁড়ায় তা হয় 'আংশিক' সৌর দিবসের সংখ্যা। এই সংখ্যাটিকে দুইবার উপরে নীচে করে লিখে রাখে। নিম্নলিখিত সংখ্যাকে ১১ দিয়ে গুণ করে, গুণফল তার নীচে লিখে রাখে। তারপর তাকে ৪০৩ ৯৬৩, এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এবং ভাগফলকে উপরে লিখিত সংখ্যার সাথে যোগ করে। এই যোগফলকে ৭০৩ দিয়ে আবার ভাগ করে। ভাগফল হয় আংশিক 'উনরাত্র' দিবস। এই সংখ্যাকে সর্বোপরে লিখিত সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে। যা অবশিষ্ট থাকে তাই হচ্ছে আমাদের গণনার লক্ষ্য, অর্থাৎ 'সাবন' দিবস সংখ্যা।

এ গণনার মূলে যুক্তি এই : 'সামগ্রিক' সৌর মাস সমূহকে 'সামগ্রিক' 'অধিমাস' সমূহ দিয়ে ভাগ করলে এক 'অধিমাসের' পরিমাণ হিসাবে আমরা $৩২\frac{৮৫৪৪}{১৫৯০০}$ সৌর মাস পাই। তার দ্বিগুণ হচ্ছে $৬৫\frac{১১৫৫}{১৫৯০০}$ সৌর মাস। এই সংখ্যা দিয়ে আলোচ্য বৎসর-সমূহের মাসের দ্বিগুণ সংখ্যাকে যদি ভাগ করি তাহলে ভাগফল হবে 'আংশিক' অধিমাসের সংখ্যা। তবে পূর্ণ সংখ্যা ও

* মূল আরবীতে এখানে কয়েকটি বাক্য ছেড়ে গেছে, মুদ্রিত সংস্করণে তার ইঙ্গিত নাই। কিন্তু অর্থের অসঙ্গতি স্পষ্ট।

এক ভগ্নাংশ দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি এবং বিভক্ত সংখ্যা থেকে এমন কিছুটা অংশ বিয়োগ করে নিই (যার দুইটি মিলে এক পূর্ণ সংখ্যা হয়)
৩৭৬ যাতে অবশিষ্ট সংখ্যাকে কেবল পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া যায়। তাহলে ভাজক ও তার ভগ্নাংশের যে সম্পর্ক হবে তা বিভক্ত সংখ্যাটির সাথে বিযুক্ত সংখ্যাটির সম্পর্কের মত।

আমাদের মান-বৎসরে যদি এই গণনা বিধি প্রয়োগ করি তাহলে আমরা $\frac{১১৫৫}{১০০৬৮০০}$ ভগ্নাংশ পাই; এই দুই ভগ্নাংশকে ১৫ দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই $\frac{৭৭}{৬৯১২০}$।

অবশ্য, এক্ষেত্রে দ্বিগুণ না করে একক অধিমাস দিয়ে গণনা করাও সম্ভব; সে অবস্থায় অবশিষ্ট সংখ্যাকে দ্বিগুণ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ গণনা রীতির প্রবর্তক যেন দ্বিগুণ করার পক্ষপাতি ছিলেন, যাতে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে। কারণ, যদি একক অধিমাস দিয়ে আমরা গণনা করি তাহলে $\frac{৮৫৪৪}{৫.৮৪০০}$ ভগ্নাংশ পাই; তার সাধারণ ভাজক হয় ৯৬। তার ফলে গুণক হিসাবে পাই ৮৯, আর ভাজক পাই ৫৪০০। দেখা যাচ্ছে, এ রীতির প্রবর্তক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, কেননা, তার গণনার উদ্দেশ্য হোল আংশিক চান্দ্র দিবসের সংখ্যা ও ক্ষুদ্রতর গুণক বের করা।

ব্রহ্মগুপ্তের 'উনরাত্র' গণনার পদ্ধতি হচ্ছে এই : সামগ্রিক দিবস সমূহকে সামগ্রিক 'উনরাত্র' দিবস দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় ৬০ ও কিছু ভগ্নাংশ; এই ভগ্নাংশকে আবার ৪৫০০০০, এই সাধারণ ভাজকে সরল করে নেওয়া যায়। এই ভাবে আমরা এক উনরাত্র সম্পূর্ণ হবার সময় হিসাবে ৬০ $\frac{৫০৬৬৩}{৫৫৭৩৯}$ চান্দ্র দিবস পাচ্ছি। এই ভগ্নাংশকে যদি ১১ ভাগে ভাগ করি, তাহলে $\frac{৯}{১১}$ ও $\frac{৫৫৬৪২}{৫৫৭৩৯}$ অবশিষ্ট পাই। এই অংককে মিনিটে প্রকাশ করতে গেলে দাঁড়ায় ০′ ৫৯′′ ৫৪′′′। যেহেতু এই ভগ্নাংশটি পূর্ণ সংখ্যার অতি নিকটবর্তী, সেহেতু লোকে সূক্ষ্ম ভাগগুলি উপেক্ষা করে মোটামুটি $\frac{১১}{১০}$ ই ধরে। অতএব হিন্দুদের মতে, এক 'উনরাত্র' ৬০ $\frac{১০}{১৬}$ অথবা $\frac{৭০৩}{১১}$ চান্দ্র দিবসে সম্পূর্ণ হয়।

এখন, চান্দ্রদিবসের উনরাত্র-সংখ্যাকে ৬৩ $\frac{৫০৯৬৩}{৫৫৭৩৯}$ দিয়ে গুণ করলে
৩৭৪ যে গুণফল হবে তা ৬৩ $\frac{১০}{১১}$ দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল হবে তার থেকে স্বভাবতঃই কম হবে। কাজেই, ভাগফল প্রথম সংখ্যার সমান হবে ধরে নিয়ে যদি চান্দ্রদিবস সমূহকে $\frac{৭০৩}{১১}$ দিয়ে আমরা ভাগ দিতে যাই, তাহলে চান্দ্র দিবসের সংখ্যায় কিছু অংশ যোগ দিতে হবে। গ্রন্থকার (পলিশ-সিদ্ধান্তকার) এই অংশটি সূক্ষ্মভাবে হিসাব করেন নি। মোটামুটিভাবে ধরে নিয়েছেন। কারণ, সামগ্রিক 'উনরাত্র' দিবস সমূহকে ৭০৩ দিয়ে গুণ দিলে গুণফল হয় ১৭,৬৩৩,০৩২,৬৫০,০০০; এ সংখ্যা 'সামগ্রিক' চান্দ্র দিবস-সংখ্যার এগার গুণের চেয়েও বেশী। যদি সামগ্রিক চান্দ্র দিবস সমূহকে ১১ দিয়ে গুণ করি, গুণফল হয় ১৭৬৩২,৯৮৯,০০০,০০০। এই দুই গুণফলের পার্থক্য হচ্ছে ৪৩,৬৫০,০০০। সামগ্রিক চান্দ্রদিবস সমূহের ১১ গুণকে এই শেষোক্ত সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল পাই ৪০৩,৯৬৩।

এই গণনা রীতির প্রবর্তক এই অংক কটি ব্যবহার করেছেন। শেষোক্ত ভাগফলে যদি একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ অবশিষ্ট না থাকত, তাহলে এ রীতি নির্ভুল হোত। কিন্তু $\frac{৪০৫}{৪০৬৫}$ বা $\frac{৯}{৯৭}$ এই একটি ভগ্নাংশ অবশিষ্ট থেকেই যায়। এই গণনারীতিতে এই ভগ্নাংশটুকু অগ্রাহ্য করা হ'য়েছে। ভাজক সংখ্যার এই ভগ্নাংশটুকু বাদ দিয়ে আংশিক চান্দ্র দিবস সমূহের এগার গুণ সংখ্যাকে ভাগ করলে বিভক্ত সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে ভাগফলও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এ গণনা রীতির অন্যান্য ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

যেহেতু বর্ষ গণনায় ভারতের জনসাধারণ 'অধিমাস' নির্ণয়ের প্রয়োজন বেশী বোধ করে, সেজন্য সদ্য বর্ণিত গণনা রীতিই তারা বেশী ব্যবহার করে থাকে এবং 'উনরাত্রে'র চেয়ে অধিমাস নির্ণয়ের প্রণালীটি তারা পুংখানুপুংখ রূপে বর্ণনা করে, এমনকি অহর্গন নির্ণয় প্রণালীও তারা উপেক্ষা করে, যেন তাতে ওদের কোনও প্রয়োজন নাই।

কল্প, চতুর্যুগ বা কলিযুগের বর্ষের অধিমাস নির্ধারণের যে সব প্রণালী ওদের মধ্যে প্রচলিত আছে তার একটি এই : বর্ষ-সংখ্যাকে পৃথকভাবে তিন স্থানে লিখতে হবে। একটিকে ১০ দিয়ে, অপরটিকে ২৪৮১ দিয়ে আর শেষেরটিকে ৭৭৩৯ দিয়ে গুণ দিতে হবে। তারপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়

গুণফলকে ৯৬০০ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। এই দুই ভাগফলের প্রথমটি হবে
৩৭৫ দিবস-সংখ্যা; দ্বিতীয়টি হবে 'অবম'। এই দুই ভাগফলের যুক্ত সংখ্যাকে প্রথম স্থানে লিখিত সংখ্যার সাথে যোগ দিতে হবে। লব্ধ অংকক হবে অতীত অধিমাসের সংখ্যা, আর অপর দুই স্থানে লিখিত সংখ্যা দুটির যে ভাগশেষ থাকবে তার যোগফল হবে চলতি অধিমাসের ভগ্নাংশ। দিবসগুলিকে ৩০ দিয়ে ভাগ দিয়ে মাসে পরিণত করা যাবে।

এই প্রক্রিয়াটি ইয়াকুব বিন্ তারিক্ শুদ্ধভাবেই বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের মান-বৎসরকে এই প্রক্রিয়ায় গণনা করা যেতে পারে। ঐ বৎসর পর্যন্ত কল্পের যত বৎসর অতীত হয়েছে তা হচ্ছে ১,৯৭২,৯৪৮,১৩২। এই সংখ্যাকে আমরা তিনবার পৃথকভাবে লিখে রাখবো। একটিকে ১০ দিয়ে গুণ করব, যার ফলে ঐ সংখ্যার দক্ষিণে কেবল একটি শূন্য বাড়বে। দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যাকে ২,৪৮১ দিয়ে গুণ দিয়ে পাব ৪৮৯৪, ৮৮৪, ৩১৫, ৪৯২। তৃতীয় সংখ্যাকে ৭৭৩৯ দিয়ে গুণ করে পাব ১৫, ২৬৮, ৬৪৫, ৫৯৩, ৫৪৮। শেষের দুটি সংখ্যার প্রত্যেকটিকে আবার ৯৬০০ দিয়ে ভাগ করব; একটির ভাগফল পাব ৫০৯,৮৮৩,৭৮২ আর ভাগ শেষ ৮২৯২, আর অপরটির ভাগফল পাব ১৫৯০,৪৮৩,৯১৫, আর তার ভাগশেষ থাকবে ৯৫৪৮। এই দুই ভাগশেষের যোগফল ১৭৮৪০। এই ভগ্নাংশ $\frac{১৭৮৪০}{৯৬০০}$ কে এক পূর্ণ সংখ্যা ধরা যাক। তাহলে শেষের দুই ভাগফল ও প্রথমে লিখিত গুণফল এই তিনটি অঙ্কের সমষ্টি হবে ২১,৮২৯,৮৪৯,০১৮। এই হবে মোট অধিমাস দিবসের সংখ্যা; তার সঙ্গে অধিমাসের $\frac{১০৩}{১২০}$ অসম্পূর্ণ দিবস যুক্ত হবে।

এই দিবসগুলিকে মাসে পরিণত করলে ৭২৭,৬৬১,৬০৩ মাস সম্পূর্ণ হয়ে ২৮ দিবস উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্তকে 'সন্দ' (? شند) বলা হয়। যে চৈত্রমাসকে গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয় না 'সন্দ' আসলে তারই আরম্ভ ও মহাবিষুবের (اعتدال الصيفى) অন্তবর্তীকাল।

এই প্রক্রিয়াটি আরও অনুসরণ করে, উপরোক্ত দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যার যে ভাগফল পাওয়া গেছে তাকে কল্পের বর্ষ-সংখ্যার সাথে যোগ দিয়ে আমরা ২,৪৮২, ৮৩১, ৯১৪ পাই। এ সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগশেষ থাকে ৩। অতএব জানা গেল যে আলোচ্য বৎসরে সূর্য মঙ্গলবারে মেষ রাশিতে প্রবেশ করেছে।

এখন উপরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যা দুটিকে গুণ করার জন্য কেন দুটি বিশেষ সংখ্যা গুণক হিসাবে অবলম্বন করা হ'ল। তার কারণ ব্যাখ্যা করা যাক।

এক কল্পের সাবন দিবস সমূহকে কল্পের অন্তর্গত সূর্যের আহ্নিক গতির
৩৭৬ সংখ্যা দিয়ে ভাগ ক'রলে ভাগফলে আমরা বৎসরের দৈনিক অংশ অর্থাৎ $৩৬৫\frac{১,১১৬,৪৫০,০০০}{৪৩২০,০০০,০০০}$ দিবস পাব। এই ভগ্নাংশকে ৪৫০,০০০ দিয়ে $৩৬৫\frac{২৪৮১}{৯৬০০}$ ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় পরিণত করা যায়। এই ভগ্নাংশকে আবার ৩ দিয়ে ভাগ করে আরও ক্ষুদ্রতর করা যায়; কিন্তু আমরা তা করতে চাই না, যাতে গণনার পরবর্তী স্তরে যে সব ভগ্নাংশ বের হবে তার সাথে এর একই হর (denominator) ব্যবহার করা যেতে পারে।

'সামগ্রিক' উনরাত্র দিবস সমূহকে কল্পের সৌর বৎসর দিয়ে ভাগ করলে ফল হবে এক সৌর বৎসরের উনরাত্র-দিবস-সংখ্যা অর্থাৎ $৫\frac{৩.৪৮২,৫৫০.০০০}{৪,৩২০,০০০,০০০}$ ৪৫০০০০ দিয়ে এই ভগ্নাংশকে-ও $৫\frac{৭৭৩৯}{৯৬০০}$ দিবসের ক্ষুদ্রতর সংখ্যায় পরিণত করা যায়।

সৌর ও চান্দ্র উভয় বৎসরেরই পরিমাণ হচেছ ৩৬০ দিন; সূর্য ও চন্দ্রের 'সাবন' বৎসরের পরিমাণও তাই একটির কিছু বেশী, অন্যটির কিছু কম। দুইটি পরিমাণের মধ্যে চান্দ্র বৎসরের পরিমাণ আমরা এই গণনায় ব্যবহার করছি; অন্য পরিমাণটি অর্থাৎ সৌর বৎসরের পরিমাণ নির্ণয় করাই আমাদের উদ্দেশ্য। উপরে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যায় দুইটি ভাগফল পাওয়া গেল, তাদের যোগফল হচেছ চান্দ্র ও সৌর বৎসরের পার্থক্যের পরিমাণ। প্রথম স্থানে লিখিত সংখ্যাকে সম্পূর্ণ দিবসের মোট সংখ্যা দিয়ে গুণ দিতে হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের সংখ্যা দুটিকে উপরোল্লিখিত ভগ্নাংশের $\frac{৭৭৩৯}{৯৬০০}$ দুটি সংখ্যার প্রত্যেকটি দিয়ে গুণ দিতে হবে।

যদি হিন্দুদের মত আমরা সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যম গতি (mean motion) নির্ণয় করতে সচেষ্ট না হই তাহলে এই গণনা প্রক্রিয়াকে আরও সংক্ষিপ্ত করা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যাদ্বয়ের দুটি গুণক সংখ্যাকে যোগ করেই তা করা যায়। এই যোগফল হবে ১০,২২০। প্রথম স্থানের সংখ্যার জন্য এই অংকের সাথে উক্ত ভগ্নাংশের ভাজক সংখ্যার (৯৬০০) দশ

গুণ যোগ দিলে আমরা $\frac{১০৬,২২০}{৬৯০০}$ পাব। এই অংককের আবার অর্ধেক করলে $\frac{৫০১১}{৪৫০}$ হবে। আগেই দেখান হয়েছে যে দিবস-সংখ্যাকে ৫০১১ দিয়ে গুণ করে লব্ধ সংখ্যাকে ১৭২৪০০ দিয়ে ভাগ দিলে অধিমাসের মোট সংখ্যা পাওয়া যাবে দিবসের পরিবর্তে যদি আমরা বৎসর-সংখ্যা দিয়ে গুণ করি,

৩৭৭ তাহলে যে অংক পাওয়া যাবে তা দিবস সংখ্যার গুণফলের $\frac{১}{৩৬০}$ ভাগ হবে। কাজেই, ভাগফলের যদি একই অংক পেতে চাই তাহলে প্রথমে যে ভাজক সংখ্যা (১৭২৪০০) ব্যবহার করেছি তার $\frac{১}{৩৬০}$ অর্থাৎ ৪৮০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

এক সঙ্গে পলিশের একটি গণনার সূত্র কতকটা মেলে। আংশিক দিবসের সংখ্যা দুই স্থানে পৃথকভাবে লেখ। তার একটিকে ১১১১ দিয়ে গুণ কর; ভাগফলকে ৬৭৫০০ দিয়ে ভাগ দাও; ভাগফলকে দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যা থেকে বিয়োগ কর ও অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৩২ দিয়ে গুণ কর। ভাগফল হবে অধিমাসের সংখ্যা। এবং যদি ভাগশেষে কিছু ভগ্নাংশ থাকে তাহলে তা হবে চলমান, বা অসম্পূর্ণ অধিমাসের অতিক্রান্ত অংশ। অতএব এই ভাগফলকে ৩০ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৩২ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তা হবে চলতি অধিমাসের অতীতে দিবস ও দিবসাংশ।

এই সূত্রের পশ্চাতে যে যুক্তি আছে তা এই : যে চতুর্যুগের সৌর মাসগুলিকে পলিশের সিদ্ধান্ত মতে গঠিত চতুর্যুগের মোট অধিমাসের দিয়ে ভাগ করা যায় তার ভাগফল হবে ৩২ $\frac{৩৫,৫৫২}{৬৬,৩৮৯}$। মাসগুলিকে আবার এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে চতুর্যুগ বা কল্পের অতীত ভাগের সম্পূর্ণ অধিমাসের সংখ্যা পাওয়া যাবে। পলিশ কিন্তু ভগ্নাংশ বর্জিত পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে চেয়েছেন, সেজন্য, যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, বিভাজ্য সংখ্যা থেকে কিছু অংশ তাঁকে কমিয়ে নিয়ে নিতে হয়েছে। আমাদের মান-বৎসরের ক্ষেত্রে এই গণনা-বিধি প্রয়োগ করে ভাজকের ভগ্নাংশরূপে আমরা $\frac{৩৫৫৫২}{২১৬০,০০০}$ পেয়েছি। ৩২দিয়ে ভাগ দিলে এই ভগ্নাংশটিকে $\frac{১১১১}{৬৭৫০০}$ তে কমিয়ে আনা যায়।

এক্ষেত্রে পলিশ-মাসের পরিবর্তে তারিখ নির্ণয় করতে যে সৌর দিবসের প্রয়োজন হয়, কেবল সেই সৌর দিবস ধরেই গণনা করেছেন। তিনি বলছেন : এই সংখ্যাকে দুটিকে পৃথক স্থানে স্থাপন করা হোক, একটিকে ২৭১ দিয়ে গুণ করে, গুণফলকে ৪০৫০,০০০ দিয়ে ভাগ করা হোক। তারপর ভাগফলকে দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে অবশিষ্ট সংখ্যাকে ১৭৬ দিয়ে ভাগ করা হোক। ভাগফল হবে অধিমাস, তার দিবস ও দিবসাংশের মোট সংখ্যা।

পলিশ আরও বলছেন : এর কারণ হচ্ছে যে চতুর্যুগের দিবসগুলিকে 'অধিমাস' সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল ৯৭৬ হয়ে ভাগশেষ থাকে ১০৪০৬৭। এই ভাগশেষ ও ভাজকের সাধারণ ভাজক হচ্ছে ৩৮৪। ভাগফলের
৩৭৮ ভগ্নাংশকে এই সংখ্যা দিয়ে কমিয়ে আনলে আমরা $\frac{২৭১}{২০৫০০০০}$ দিবস পাই। এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি আছে। তবে তার জন্য আমি লিপিকার বা অনুবাদককেই দায়ী করব। কেননা পলিশের মত পণ্ডিত এরকম ভুল করতে পারেন না।

আসলে ব্যাপারটি এই রকম হবে : যে দিবস সংখ্যাকে 'অধিমাস' দিয়ে ভাগ দেওয়া হবে সে দিবসগুলির সৌর দিবস না হয়ে উপায় নাই। উপরে দেখান হয়েছে, ভাগফলে পূর্ণ সংখ্যা ও ভগ্নাংশ দুই-ই আছে। হর ও লব, উভয় সংখ্যারই সাধারণ ভাজক হচ্ছে ২৪। এই সংখ্যা দিয়ে ভগ্নাংশকে কমিয়ে এনে আমরা তাহলে পাচ্ছি $\frac{৪৩৬৬}{৬৬৩৪৯}$। এই প্রণালীকে যদি মাস নির্ণয়ে প্রয়োগ করি এবং অধিমাস-সংখ্যাকে ভগ্নাংশে পরিণত করি, তাহলে আমাদের হর হবে ৪৭,৮০০,০০০। এই হর ও তার লবের সাধারণ ভাজক হবে ১৬। তা দিয়ে ভগ্নাংশকে কমিয়ে $\frac{২৭১}{২,৮০০,০০০}$ পাচ্ছি।

এখন পলিশ উপরোল্লিখিত যে সংখ্যাকে ভাজকরূপে নিয়েছেন, (৪০৫০০০০) তাকে যদি সদ্যোক্ত এই সাধারণ ভাজক ৩৮৪ দিয়ে গুণ দেওয়া যায়, তাহলে গুণফল হবে এক চতুর্যুগের অন্তর্গত ১৫৫৫,২০০,০০০ সৌর দিবস। কিন্তু সে সংখ্যাকে গণনার এই পর্যায়ে ভাজক হিসাবে ব্যবহার করা কখনই সম্ভব নয়। ব্রহ্মগুপ্তের নিয়ম অনুসরণ করে সামগ্রিক সৌর মাস সমূহকে 'অধিমাস' সমূহ দিয়ে ভাগ করে তাতে যদি আমরা এই প্রণালী প্রয়োগ করতে চাই তাহলে তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী ভাগফল হবে অধিমাসের দ্বিগুণ সংখ্যা।

'ঊনরাত্র' দিবস গণনা করতেও অনুরূপ সূত্র (formula) অবলম্বন করা চলে, যথা : আংশিক চান্দ্রদিবসের সংখ্যাকে দুই স্থানে স্থাপন কর। একটিকে ৫০,৬৮৩ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৩,৫৬২২২০ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফলকে দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যা থেকে বিয়োগ কর এবং বিয়োগফলকে ৬৩ দিয়ে ভাগ দাও, ভাগফলে কোন ভগ্নাংশ থাকলে তাকে উপেক্ষা কর।

ঊনরাত্রে গণনার এই প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত বাড়িয়ে আর তেমন লাভ নেই। বিশেষ করে যখন তাতে 'অবম', অর্থাৎ আংশিক ঊনরাত্রের অবশিষ্ট ভাগের প্রয়োজন হয় কেননা, দুইবার ভাগ করে যা অবশিষ্ট থাকে তার দুটি পৃথক হয় দাঁড়ায়।

উপরে বর্ণিত বর্ষ মাসাদি বিশ্লেষণ করার সূত্রগুলি যে ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছে সে কল্প বা চতুর্যুগের যে কোনও অতীত দিবস সংখ্যাকে বর্ষে পরিণত
৩৭৯ করতে সহজেই পারবে। তবু প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি আর একবার বলছি।

যদি দিবসের সংখ্যা দেওয়া থাকে এবং আমাদের উদ্দেশ্য হয় তার বর্ষ সংখ্যা বের করা তাহলে সে দিবসগুলি নিশ্চয়ই লৌকিক বা 'সাবন' দিবস হবে। 'সাবন' দিবস হচ্ছে চান্দ্র ও ঊনরাত্র দিবসের বিয়োগফল। সামগ্রিক 'ঊনরাত্র' দিবস থেকে 'সামগ্রিক' চান্দ্র দিবসের পার্থক্যের পরিমাণ ১৫৭৭৯১৬, ৪৫০, ০০০। 'সামগ্রিক' ঊনরাত্রের সাথে এই পরিমাণের যে সম্বন্ধ, সাবন দিবসের সাথে তার ঊনরাত্রেরও সেই একই সম্বন্ধ। ৩,৫০৬,৪৮১, সংখ্যা দিয়ে শেষোক্ত সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায়। এখন, দিবসের যে নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তাকে ৫৫৭৮৯ দিয়ে গুণ করে, গুণফলকে ৩,৫০৬,৪৮১ দিয়ে যদি ভাগ দেওয়া যায়, তাহলে ভাগফল আংশিক ঊনরাত্র দিবসের সংখ্যা প্রকাশ করবে। তার সাথে 'সাবন' বা লৌকিক দিবসের সংখ্যা যোগ করে আমরা চান্দ্র দিবসের সংখ্যা পাব যা আংশিক সৌর ও 'অধিমাস' দিবসের সমষ্টি। সামগ্রিক সৌর ও অধিমাস দিবসের যোগফলের, অর্থাৎ ১৬০, ২৯৯, ৯০০, ০০০ সাথে 'সামগ্রিক' অধিমাস দিবসের যে সম্বন্ধ, উল্লিখিত চান্দ্র দিবস গুলির সাথে তার অধিমাস দিবসেরও সেই একই সম্বন্ধ। এই সংখ্যাকে উপরের প্রক্রিয়াতে কমিয়ে এনে ১৭৮, ১১১, এই সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়।

এখন, আংশিক চান্দ্র দিবসের যে সংখ্যা পাওয়া গেছে, তাকে ৫০১১ দিয়ে গুণ করে, গুণফলকে ১৭৮১১১ দিয়ে ভাগ করলে, ভাগফল হবে মোট আংশিক অধিমাস দিবসের সংখ্যা। এই সংখ্যাকে চান্দ্র দিবস-সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে নিলে অবশিষ্ট সংখ্যা হবে মোট সৌর-দিবস। তারপর সৌর

দিবসের সে সংখ্যাকে ৩০ ও ১২ দিয়ে পর্যায়ক্রমে ভাগ করে আমাদের অভিষ্ট মাসে ও বৎসরে পরিণত করা যাবে।

এই প্রক্রিয়ায় আমাদের মান-বৎসরের দৃষ্টান্ত এইভাবে দেখান যেতে পারে :

ঐ বৎসরারম্ভ পর্যন্ত যত আংশিক 'সাবন' দিবস অতীত হ'য়েছে তার মোট সংখ্যা হ'ল ৭২০, ৬০৫, ৯৫১, ৯৬০! ধরে নেওয়া যাক, এই সংখ্যাটি আমাদিগকে দেওয়া হয়েছে এবং তত দিবসে ভারতীয় কত বৎসর ও মাস হয় তা আমাদের বের করতে হবে।

প্রথমে আমরা ৫৫৭৩৯ দিয়ে সংখ্যাটিকে গুণ করব; গুণফলকে তার পরে ৩৫০৬৪৮১ দিয়ে ভাগ দেব। ভাগফল হবে ১১৪৫৫, ২২৪, ৫৭৫ উনরাত্র দিবস। এই উনরাত্র সংখ্যাকে লৌকিক দিবস সংখ্যার সাথে যোগ করব। যোগফলে ৭৩২, ০৯১, ১৭৬, ৫৩৮ চান্দ্র দিবস পাওয়া যাবে। ঐ সংখ্যাকে আবার ৫৩১১ দিয়ে গুণ করে ১৭৮১১১ দিয়ে ভাগ করব। ভাগফল
৩৮০ হবে ২১, ৮২৯, ৮৪৯, ০১৮ অধিমাস দিবস। এই অধিমাস দিবস সংখ্যাকে চান্দ্র দিবসের সংখ্যা থেকে বিয়োগ করলে অবশিষ্ট পাব ৭১০, ২৬১, ৩২৭, ৫২০, অর্থাৎ আংশিক সৌর দিবস। একে এখন ৩০ দিয়ে ভাগ করে ২৩৬৭৫, ৩৭৭, ৫৮৪ সৌর মাসে পরিণত করব। তাকে আবার ১২ দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা ১৯৭২, ৯৪৮, ১৩২ ভারতীয় বৎসর পাব। এই সংখ্যাই যে আমাদের মান-বৎসরের বর্ষসংখ্যা তা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে ইয়াকুব্ লিখেছেন : 'লৌকিক (সাবন) দিবসের যে সংখ্যা দেওয়া আছে তাকে 'সামগ্রিক' চান্দ্র দিবসের সংখ্যা দিয়ে গুণ কর এবং গুণফলকে 'সামগ্রিক' লৌকিক দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ দাও। যা ভাগফল হবে তাকে দুই স্থানে স্থাপন কর। এক স্থানের সংখ্যাটিকে 'সামগ্রিক' অধিমাস সংখ্যা দিয়ে গুণ কর এবং তার ভাগফলকে 'সামগ্রিক' চান্দ্র দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল থেকে অধিমাসের মাস সংখ্যা পাওয়া যাবে। সে সংখ্যাকে আবার ৩০ দিয়ে গুণ ক'রে, গুণফলকে দ্বিতীয় স্থানে স্থাপিত সংখ্যা থেকে বিয়োগ কর। যা অবশিষ্ট থাকবে তা হবে 'আংশিক' সৌর দিবসের সংখ্যা। তাকে আবার মাস ও বৎসরে পরিণত করে নাও।

এ গণনার যুক্তি এই : আমরা পূর্বেই বলেছি, যে দিবসগুলি আমাদিগকে দেওয়া হ'য়েছে তা হচ্ছে চান্দ্র ও উনরাত্র দিবসসমূহের পার্থক্যের সমান, যেমন 'সামগ্রিক' 'সাবন দিবস' হচ্ছে তার 'সামগ্রিক' চান্দ্র ও 'সামগ্রিক' উনরাত্র দিবস-সংখ্যার পার্থক্যের সমান। এই দুই পরিমাণের আনুপাতিক সম্বন্ধ

অপরিবর্তনীয়। সেজন্যই যে 'আংশিক' চান্দ্র দিবস আমরা পাই, তাকে দুই স্থানে পৃথকভাবে লিখি। এই সংখ্যা হচ্ছে সৌর ও অধিমাস দিবস-সংখ্যার সমষ্টি, যেমন সামগ্রিক চান্দ্র-দিবস, সামগ্রিক সৌর ও অধিমাস দিবসের সমষ্টির সমান। কাজেই দুই স্থানে লিখিত সংখ্যা দুটির যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, আংশিক ও সামগ্রিক ও অধিমাস দিবসের পারস্পরিক সম্বন্ধও তাই; সংখ্যা দু'টি মাস বা বৎসর যার-ই হোক না কেন, তাদের আনুপাতিক সম্পর্কের তারতম্য হবে না।

'আংশিক' অধিমাস দিয়ে আংশিক 'উনরাত্র' নির্ণয়ের নিম্নলিখিত সূত্রটি ইয়াকুবের পুস্তকের প্রত্যেক পুথিতেই দেখা যায়।' চলতি অধিমাসের ভগ্নাংশ সহ অতীত অধিমাসকে সামগ্রিক' উনরাত্র দিয়ে ভাগ দিতে হবে; ভাগফলকে অধিমাস সংখ্যার সাথে যোগ দিতে হবে। যে অংক দাঁড়াবে তা হবে অতীত উনরাত্রের সংখ্যা।'

৩৮১ এই সূত্রটি দেখে আমার সন্দেহ হয় যে ইয়াকুব বিষয়টি সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন নি; নিজে পরীক্ষা করে সূত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করাতেও যেন তাঁর আস্থা ছিল না। কেননা, আমাদের মান-বৎসর পর্যন্ত চতুর্যুগের যতগুলি অধিমাস গত হয়েছে পলিশের সিদ্ধান্ত মতে তার সংখ্যা ১,১৯৬,৫২৫ $\frac{৪৪৮৩৭}{৪৫০০০}$। এই সংখ্যাকে চতুর্যুগের মোট 'উনরাত্র' সংখ্যা দিয়ে গুণ দিয়ে আমরা গুণফল পাচ্ছি ৩০,০১১,৬০০,০৬৮,৪২৬ $\frac{৫১}{১২৫}$। এ সংখ্যাকে আমরা সৌর মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল হয় ৫৭৮,৯২৭। 'অধিমাস' সংখ্যার সাথে তাকে যোগ দিলে আমরা মোট সংখ্যা পাচ্ছি ৭৭৫,৪৫২। আমাদের অভীষ্ট কিন্তু তা নয়। কারণ 'উনরাত্রের' মোট সংখ্যা আসলে হ'চ্ছে ১৮৮৩৫৭৫০। সে সংখ্যাকে ৩০ গুণ ক'রলে যে অংক হবে (অর্থাৎ ৭৭৫,৪৫২ × ৩০ = ২৩২৬৩৫৬০) তাও আমাদের অভীষ্ট নয়। এ দু'টি সংখ্যাই প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে আছে।

তিপ্পান্ন অধ্যায়

বিশেষ সনের দিবসমাসাদি নির্ণয় করার তদর্থক নিয়মাবলী

পঞ্জিকাদিতে যে সব অব্দকে দিবসে পরিণত করে দেখানো হ'য়েছে, তার কোনটির আরম্ভই এক 'অধিমাস' বা উনরাত্র' পূর্ণ হবার মুহূর্তে পড়ে না। সেজন্য পঞ্জিকাকারকে এমন কতকগুলি সংখ্যা বেছে নিতে হয় যা দিয়ে যোগ বা বিয়োগ করে গণনার শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়। ওদের পঞ্জিকাগুলি পরীক্ষা করে এইসব তদর্থক নিয়মাবলীর যা বুঝেছি তা এখন বলব।

প্রথমে 'খণ্ডখাদ্যকে' অবলম্বিত নিয়ম বর্ণনা করব, কারণ এই পঞ্জিকাটির খ্যাতি সবচেয়ে বেশী এবং এর উপরেই ভারতীয় জ্যোতিষীদের সবচেয়ে বেশী আস্থা। ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন: 'সককালের বৎসরটি লিখে তার থেকে ৫৮৭ বিয়োগ কর; অবশিষ্টকে ১২ দিয়ে গুণ কর; গুণফলের সঙ্গে চলতি বৎসরের অতীত মাস সংখ্যা যোগ কর। এই যোগফলকে আবার ৩০ দিয়ে পূরণ কর এবং গুণফলের সাথে চলতি মাসের অতীত দিবসসংখ্যা যোগ দাও। এই যোগফল হবে আংশিক সৌরদিবসের সংখ্যা।

৩৮২ এই সংখ্যাকে তিনটি স্থানে পৃথকভাবে লিখে রাখ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যা দুইটির প্রত্যেকের সাথে ৫ যোগ দাও এবং তৃতীয়টিকে ১৪,১৪৫ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফলকে দ্বিতীয় স্থানের মোট সংখ্যা থেকে বিয়োগ দাও। ভাগফলে ভগ্নাংশ থাকলে তাকে উপেক্ষা কর! তারপর দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যাকে ৯৭৬ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে সম্পূর্ণ 'অধিমাসে'র সংখ্যা, আর ভাগশেষ হবে চলতি অসম্পূর্ণ অধিমাসের ভগ্নাংশ। এই সম্পূর্ণ 'অধিমাস' সংখ্যাকে এবার ৩০ দিয়ে গুণ কর। গুণফলকে প্রথম স্থানের সংখ্যায় যোগ দাও। এখানে যে সংখ্যা পাওয়া গেল তা হবে 'আংশিক চান্দ্র' দিবস।

এই সংখ্যাকে প্রথম স্থানে রেখে নীচের কোন স্থানে সংখ্যাটি আবার লেখ। সেখানে তাকে ১১ দিয়ে গুণ করে গুণফলের সাথে ৪৯৮ যোগ কর। যা পাওয়া গেল তাকে নীচের আর এক স্থানে লেখ। এই সংখ্যাকে আবার ১১১,৬৭০ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফলকে দ্বিতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যা থেকে বিয়োগ কর বিয়োগের জন্য ভাগফলের ভগ্নাংশ ধোরে না। তারপর দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যাকে

আবার ৭০৩ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল হবে 'ঊনরাত্র' দিবসের সংখ্যা, আর ভাগশেষ হবে 'অব্‌ম'-সংখ্যা। এখন প্রথম স্থানের সংখ্যা থেকে এই 'ঊনরাত্র' দিবস সংখ্যা বিয়োগ করলে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হবে, সাবন বা 'লৌকিক দিবস সংখ্যা।'

এই হোল 'খণ্ডখাদক্যের' 'অহর্গণ'। এই 'সাবন' দিবস সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ দিলে, যা ভাগশেষ থাকবে তার থেকে তোমার অভিষ্ট তারিখের দিবসের নাম পাওয়া যাবে।

আমাদের পূর্বাবলম্বিত মান-বৎসর দিয়ে নিয়মটির দৃষ্টান্ত দেব। সে বৎসরটি 'সককালের' ৯৫৩ সাল। তার থেকে ৫৮৭ বিয়োগ করে অবশিষ্ট পাচ্ছি ৩৬৬। এই অবশিষ্টকে ১২×৩০ দিয়ে গুণ ক'রছি কেননা আমাদের অবলম্বিত এই তারিখে কোন দিন বা মাস নাই। তাহলে আমরা পাচ্ছি ১০১ ৭৬০ সৌরদিবস।

এই সংখ্যাকে আমরা তিন জায়গায় লিখলাম এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে সংখ্যাটির সাথে ৫ যোগ করে উভয় স্থানেই ১০১,৭৬৫ পেলাম। তৃতীয় স্থানে সংখ্যাটিকে ১৪,৯৪৫ দিয়ে ভাগ দিলাম। ভাগফল হোল ৮। এই ৮কে দ্বিতীয় স্থানের ১০১,৭৬৫ থেকে বাদ দিয়ে আমরা ১০১,৭৫৭ পেলাম। ভাগফলের ভগ্নাংশটুকু আমরা ধরিনি। এবার দ্বিতীয় স্থানের ১০১,৭৬৫ কে ৯৭৬ দিয়ে ভাগ দিলাম। ভাগফলে যে ১০৪ পূর্ণসংখ্যা পাওয়া গেল তা হোল মাসসংখ্যা।

ভাগশেষ অবশ্য $\frac{৯৭০}{৯৭৬}$ ভগ্নাংশও রইল। এই মাস-সংখ্যা (১০৪) কে ৩০ দিয়ে গুণ করে আমরা পাচ্ছি ৪০২০। তাকে প্রথম প্রাপ্ত সৌরদিবস—৩৮৩ সংখ্যার সাথে যোগ করলে আমরা যা পাচ্ছি তা হোল ১৩৫৭৮০ চান্দ্রদিবস। এই সংখ্যাকে এখন উপরোক্ত পৃথকভাবে স্থাপিত সংখ্যাত্রয়ের নীচে বসিয়ে তাকে ১১ দিয়ে গুণ করে গুণফলের সাথে ৪৯৭ যোগ দিলাম। মোট অঙ্ক হোল ১৪৯৪০৭৭। এই সংখ্যাকে আবার উপরের সংখ্যাত্রয়ের নীচে সদ্য স্থাপিত সংখ্যাটির নীচে বসালাম এবং তাকে ১১১,৫৭৩ দিয়ে ভাগ দিলাম। ভাগফল হোল ১৩। যে ৩০৬২৮ ভাগশেষ থাকে তা আমরা উপেক্ষা করলাম। এই ভাগফলকে উপরোল্লিখিত সংখ্যাত্রয়ের দ্বিতীয় স্থানে স্থাপিত সংখ্যা থেকে বিয়োগ দিয়ে বিয়োগফল পেলাম ১৪৯৭০৬৪। এই সংখ্যাকে আবার ৭০৩ দিয়ে ভাগ দিলাম। ভাগফল হোল ২১২৫ আর ভাগশেষ, অর্থাৎ 'অবম' হোল $\frac{১৮৯}{৭০৩}$। এই ভাগফলকে মোট চান্দ্র দিবসসংখ্যা থেকে বিয়োগ করে

আমরা ১৩৩৬৫৫ অবশিষ্ট পাই। এই সংখ্যা হোল মোট লৌকিক বা 'সাবন' দিবস যা নির্ণয় করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। এই সংখ্যাকে আবার ৭ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগশেষ থাকে ৪। অতএব, আমাদের মান বৎসরের চৈত্রমাস বুধ-বারে আরম্ভ হ'য়েছিল বোঝা গেল।

যে অব্দের ৪০০ সালকে আমাদের মান বৎসর বলে ধরেছি সে Yazdgird অব্দ খণ্ডখাদ্যকে ব্যবহৃত অব্দের পূর্বে, অর্থাৎ ১১,৯৬৮ দিন পূর্বে, আরম্ভ হ'য়েছে। কাজেই আমাদের উক্ত মানবৎসর পর্যন্ত Yazdgird অব্দের মোট ১৪৫, ৬২৩ দিন গত হয়েছে। পারসিকদের বৎসর ও মাস দিয়ে এই সংখ্যাকে ভাগ দিলে আমরা যে তারিখ পাই তা হ'চ্ছে Yazdgird অব্দের ৩৯৯ সালের **Isfandarmadh** মাসের অষ্টাদশ দিবস। 'অধিমাস' মাসের ৩০ দিন সম্পূর্ণ হ'তে তখনও পাঁচ ঘড়ি, অর্থাৎ ২ ঘণ্টা বাকী। অতএব সেটি 'অধিবর্ষ' **leap year**, এবং সেজন্য চৈত্রমাসকে দুইবার গণনা ক'রতে হবে।

'অল্‌ অরকন্দ' নামক পঞ্জিকার একটি অশুদ্ধ অনুলিপিতে যে গণনা-পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে তা এই : 'তুমি যদি অর্‌কন্দ্‌ অর্থাৎ 'অহর্গন', চাও জানতে তাহলে ৯০ লিখে, তাকে ৬ দিয়ে পূরণ কর। তার সঙ্গে ৮ এবং সিন্ধুদেশের প্রচলিত অব্দের সমকালীন সাল যোগ দাও। হিজরী ১১৭ সালের সফর মাস সিন্ধুদেশের অব্দের ১০৯ সালের চৈত্রমাসে পড়ে। মোট সংখ্যা থেকে ৫৮৭ বিয়োগ কর। যা অবশিষ্ট থাকবে তা হবে 'শখাব্দের সাল'।

আরও একটি সহজ নিয়ম এই : 'Yazdgid অব্দের সম্পূর্ণ বৎসর সংখ্যা নিয়ে তার থেকে ৩৩ বিয়োগ কর : যা বাকী থাকবে তা হবে 'শখাব্দ'। অথবা ৩৮৪ তুমি 'অর্‌কন্দের মূল ৯০ বৎসর নিয়ে তাকে ৬ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১৪ যোগ দিতে পার। যোগফলের সঙ্গে Yazdgird অব্দ যোগ দিয়ে তার থেকে ৫৮৭ বিয়োগ করলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা হবে 'শখ'-সাল।

আমার বিশ্বাস, এই 'শখ' ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে কিন্তু গণনার নিয়মে আমরা শকাব্দ পাই না, পাই 'গুপ্তকাল' যা এখানে দিবসে পরিণত করা হচ্ছে। অন্যপক্ষে, গ্রন্থকার ৯০ কে ৬ গুণ করে তার সাথে যদি ৮ যোগ দিতেন এবং যোগফলে যে ৫৪৮ পেলেম তাকে যদি বৎসরের সংখ্যা দিয়ে না বাড়াতেন তাহলেও অনায়াসে ঐ একই ফল পেতেন।

অল-অরকন্দের লিখক যে 'সফর' মাসের প্রথম দিনের উল্লেখ করেছেন, তা ১০৩ Yazdgird অব্দের ১৮ই Daimah মাসে পড়ে। সেজন্য তিনি চৈত্র

মাসকে Daimah মাসের প্রতিপদের সাথে যুক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তখন থেকে পারসিকদের মাসগুলি বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে, কেননা ৩৬৫ দিনের পর যে ¼ দিবস উদ্বৃত্ত থাকে তাকে ওরা বৎসরের মধ্যে আর নিবেশিত করে না। সিন্ধুদেশের যে অব্দ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন তা তাঁর হিসাব অনুযায় Yazdgird অব্দের সাত বৎসর পূর্ববর্তী হওয়া উচিত। সুতরাং আমাদের মান বৎসর (Yazdgird ৪০০) সিন্ধুদেশের অব্দে ৪০৫ সাল হবে। এই সংখ্যাকে 'অরুকন্দের' যে বৎসর সংখ্যা দিয়ে গ্রন্থকার আরম্ভ করেছেন, অর্থাৎ ৫৪৮, তার সাথে যোগ করে যে ৯৫৩ পাওয়া যাবে তা হবে 'শককাল'। কিন্তু গ্রন্থকার এ সংখ্যা থেকে যে অঙ্ক বিয়োগ করতে বলেছেন, তা করলে সংখ্যাটি গুপ্তকালে পরিণত হয়ে যায়।

অহর্গনের অন্যান্য যে সব পদ্ধতি আছে, তা 'খণ্ডখাদ্যকের' উপরে বর্ণিত পদ্ধতির সাথে অভিন্ন। তবে, কোন কোন পুঁথিতে দেখা যায় যে ভাজক সংখ্যা ৯৭৬-এর স্থলে ১০০০ লেখা আছে। নিশ্চয়ই লিপিকারের ভুল, কারণ ঐ সংখ্যার ভাজক হওয়ার কোনও যুক্তি নাই।

অতঃপর, আমরা বিজয়ানন্দের 'করণ-তিলক' নামক পঞ্জিকায় বর্ণিত পদ্ধতি উদ্ধৃত করব। 'শকাব্দের' সন লিখে তার থেকে ৮৮৮ বিয়োগ দাও। অবশিষ্ট সংখ্যাকে ১২ দিয়ে গুণ কর। গুণফলের সঙ্গে চলতি বৎসরের সম্পূর্ণ মাসের সংখ্যা যোগ দাও। এই মোট সংখ্যাকে পৃথকভাবে দুই জায়গায় লিখে রাখ। একটিকে ৯০০ দিয়ে গুণ কর ও গুণফলের সঙ্গে ৬৬১ যোগ দাও, তারপর মোট সংখ্যাকে ২৯২৮২ দিয়ে ভাগ কর। তাহলে মোট 'অধিমাস' মাসের সংখ্যা ৩৮৫ পাওয়া যাবে। এই মোট সংখ্যাকে এখন দ্বিতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যাটির সাথে যোগ কর এবং যুক্তসংখ্যাকে ৩০ দিয়ে গুণ কর। যে সংখ্যা পাওয়া গেল তার সঙ্গে বর্তমান মাসের অতীত দিবসের সংখ্যা যোগ কর। মোট অঙ্কটি হবে চান্দ্রদিবস সংখ্যা।

এই সংখ্যাকে আবার দুই জায়গায় লেখ; এক জায়গায় তাকে ৩০০০ দিয়ে গুণ করে গুণফলের সঙ্গে ৬৪১০৬ যোগ কর; যুক্ত সংখ্যাকে ২১০৯০২ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল হবে 'উনরাত্র-দিবস', আর ভাগশেষ হবে 'অবম'। এখন মোট চান্দ্র-দিবস থেকে এই 'উনরাত্র' দিবস বাদ দিতে হবে। অবশিষ্ট যে সংখ্যা থাকবে, তা হবে মধ্যরাত্রি থেকে আরম্ভ ধ'রে 'অহর্গনের সংখ্যা।

আমাদের মান-বৎসর দিয়ে এই পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে। শকাব্দের সন (অর্থাৎ ৯৫৩) থেকে ৮৮৮ বিয়োগ করলে অবশিষ্ট থাকে ৬৫;

তার মোট মাসের সংখ্যা হয় ৭৮০। এই সংখ্যাকে আমরা দুই জায়গায় লিখলাম। এক জায়গায় তাকে ৯০০০ দিয়ে গুণ ক'রলাম, এবং তার সাথে ৬৬১ যোগ দিয়ে যুক্ত সংখ্যাকে ২৯২৮২ দিয়ে ভাগ দিলাম। ভাগফল হোল ২৩ $\frac{২৯১৭৫}{২৯২৮২}$ 'অধিমাস' মাস। একে দিবসে পরিণত করতে হোলে ৩০ দিয়ে গুণ দিতে হ:ব। গুণফলকে কিন্তু আবার ৫০ গুণ করতে হবে। এই গুণফলকে যে ভাজক সংখ্যা দিয়ে ভাগ ক'রতে হবে তা হ'চ্ছে ৯৭৬ ও তার ভগ্নাংশের ৩০ গুণ। তাহলে দুই সংখ্যাই এক জাতের, অর্থাৎ দিবসের নির্দেশক হবে। এর থেকে যে মাসের সংখ্যা পাওয়া গেল তার সাথে উপরে প্রাপ্ত 'অধিমাস' মাসসংখ্যা যোগ ক'রব। একে আবার ৩০ দিয়ে গুণ করে আমরা ২৪০৬০ (শুদ্ধ হবে ২৪০৯০) চান্দ্র দিবস পাব।

এই দিবস সংখ্যাকে আবার দুই জায়গায় লিখলাম। এক জায়গায় সংখ্যাটিকে ৩৩০০ দিয়ে গুণ করে ৭৯০৮০০০ (শুদ্ধ ৭৯৪৯৮০০০) পেলাম। তার সাথে ৬৪১০৬ (শুদ্ধ ৬৯৬০১) যোগ করে আমরা ৭৯৪৬২১০৪ (শুদ্ধ ৭৯৫৬৬৬০১) পাচ্ছি। একে আবার ২১০৯০২ দিয়ে ভাগ করে ৩৭৬ (৩৭৭) ভাগফল, অর্থাৎ 'উনরাত্র-দিবস' পাচ্ছি। ভাগশেষ থাকছে $\frac{১৬১৯৫২}{২১০৯০২}$ (শুদ্ধ $\frac{৫৬৫৪৭}{২১০৯০২}$) 'অবম'। দ্বিতীয় জায়গায় লিখিত মোট চান্দ্রমাস থেকে এই 'উনরাত্র দিবসগুলি বিয়োগ করলে অবশিষ্ট থাকে ২০৬৮৪ 'সাবন' অর্থাৎ লৌকিক 'অহর্গন'।

বরাহমিহিরের 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা'তে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দেওয়া আছে। 'শককাল থেকে ৪২৭ বিয়োগ কর। যা অবশিষ্ট রইল তাকে ১২ দিয়ে গুণ করে মাসে পরিণত করে মাসের সংখ্যাকে দুই জায়গায় লিখে রাখ। এক ৩৮৬ জায়গায় সংখ্যাকে ৭ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ২২৮ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল হবে 'অধিমাস' মাস। এই সংখ্যাকে দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যাটি সাথে যোগ দাও। যোগফলকে ৩০ দিয়ে পূরণ কর এবং গুণফলের সাথে চলতি মাসের অতীত দিবসের সংখ্যা যোগ কর। এই সংখ্যাকে দুই স্থানে লেখ। একস্থানে তাকে ১১ দিয়ে গুণ করে গুণফলের সাথে ৫১৪ যোগ কর, এবং মোট সংখ্যাকে ৭০৩ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল যা হবে তাকে অন্যস্থানে লিখিত দিবসসংখ্যা থেকে বাদ দাও। যা অবশিষ্ট থাকবে তা হবে মোট 'সাবন' বা 'লৌকিক দিবসসংখ্যা'। বরাহমিহির বলেন যে, রোমকদের 'সিদ্ধান্ত' এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

আমাদের মান-বৎসর দিয়ে এ প্রণালীটিও পরীক্ষা করে দেখা যাক। শকাব্দ থেকে ৪২৭ বাদ দিলাম। অবশিষ্ট ৫২৬ বৎসরে ৬৩১২ মাস হয়। প্রণালী অনুসরণ করে যে 'অধিমাস' মাস পাওয়া গেল তার সংখ্যা ১৯৩$\frac{১৫}{১৯}$। এই মাসকে পূর্বলব্ধ ৬৩১২ মাসের সঙ্গে যোগ দিয়ে ৬৫০৫ মাস পাই। তার মোট চান্দ্রদিবস হবে ১৯৫,১৫০।

এই প্রণালীতে যেসব সংখ্যা যোগ করা হ'চ্ছে তা সময়ের ভগ্নাংশের দরুন, যা অনুমিত অব্দের প্রারম্ভে বাদ পড়ে গিয়েছিল। ৭ দিয়ে গুণ করার দরকার, সংখ্যাটির এক সপ্তমাংশ বের করার জন্য। আর ভাজকরূপে যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে এক 'অধিমাস' কালের সপ্তমাংশগুলির মোট সংখ্যা। এক সপ্তমাংশকে তিনি ৩২ মাস, ১৭ দিবস, ৮ 'ঘড়ি' ও প্রায় ৩৪ 'চষক' বলে ধরেছেন।

এরপর, মোট চান্দ্র দিবসের সংখ্যাটিকে আমরা দুই জায়গায় লিখে রাখলাম। এক জায়গায় তাকে ১১ দিয়ে গুণ করে গুণফলের সাথে ৫১৪ যোগ করলাম। যোগফল হোল ২১৪৭১৬৪। একে ৭০৩ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল পাই ৩০৫৪ 'উনরাত্র' দিবস; ভগ্নাংশ থাকে $\frac{২০২}{৭০৩}$। এই সংখ্যাকে এবার অন্য জায়গার সংখ্যা থেকে বিয়োগ করলাম। অবশিষ্ট থাকল ১৯২০৯৬। এই হোল এই পুস্তকে অবলম্বিত তারিখের মোট, 'সাবন' বা লৌকিক দিবস সংখ্যা।

বরাহমিহিরের 'অধিমাস' গণনার এই নীতি ব্রহ্মগুপ্তের নীতির সব চেয়ে বেশী নিকটবর্তী; কেননা বরাহমিহিরের পদ্ধতি অনুসারে আমাদের মান-বৎসর পর্যন্ত মোট অধিমাস দিবসের শেষ ভগ্নাংশ $\frac{১৫}{১৯}$। আর কল্পের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ব্রহ্মগুপ্তের যে মত অনুসরণ করে কল্পের সূচনা থেকে আমাদের মান-বৎসর পর্যন্ত আমরা মোট 'অধিমাস' দিবসের যে হিসাব পূর্বে ক'রেছি তাতে ভগ্নাংশ থাকে $\frac{১০৩}{১২০}$ বা প্রায় $\frac{১৫}{১৭}$ সমান।

'অল-হরকুন (الهرقن) নামিত একটি মুসলমান পঞ্জিকাতেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হ'য়েছে দেখা যায়। তবে সে পদ্ধতিটি অন্য এমন একটি অব্দে প্রয়োগ করা হ'য়েছে যা Yazdgird অব্দারম্ভের ৫০,০৮১ দিন পরে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। এই পঞ্জিকানুসারে এই ভারতীয় বৎসরটির আরম্ভ ১১০ Yazdgird অব্দের ২১শে Daimah, রবিবারে পড়ে। নিম্ন প্রক্রিয়ায় এই পদ্ধতিকে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৭২ বৎসর লেখ; তাকে ১২ দিয়ে গুণ করে মাসে পরিণত কর। মাসের মোট সংখ্যা পেলে ৮৬৪। তার সাথে ১৯৭ (হিজরী ?) সালের প্রথম 'সাবন' থেকে তোমার বর্তমান মাসের প্রথম তারিখ পর্যন্ত যতগুলি মাস হয় তা যোগ ক' এই অংককে এখন পৃথকভাবে দুই স্থানে লিখে রাখ; এক স্থানের সংখ্যাটিকে ৭ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ২২৮ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফলকে অন্যস্থানে লিখিত সংখ্যাটির সাথে যোগ দিয়ে যুক্ত সংখ্যাকে আবার ৩০ দিয়ে পূরণ কর। গুণফলের সঙ্গে এখন বর্তমান মাসের দিবসের সংখ্যা যোগ কর। এই অংকেও আবার দুইবার লিখতে হবে। একটির সঙ্গে ৩৮ যোগ দিয়ে যোগফলকে ১১ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণফলকে ৭০৩ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে অন্যস্থানে লিখিত সংখ্যা থেকে বিয়োগ দিতে হবে। এখানে যা অবশিষ্ট থাকবে তা হবে 'সাবন' দিবসের মোট সংখ্যা, আর ভাগ করার পর যে ভাগশেষ থাকবে তা হবে মোট 'অবম্' এর সংখ্যা। এবারে দিবসের সংখ্যাতে এক যোগ দিয়ে তাকে ৭ দিয়ে ভাগ কর। ভাগশেষে যে সংখ্যা থাকবে তার থেকে উদ্দীষ্ট তারিখটি সপ্তাহের কোন দিবসে প'ড়ছে তা বোঝা যাবে।'

যে ৭২ বৎসর ধরে এই গণনা আরম্ভ করা হয়েছে তার মাসগুলি যদি চান্দ্র মাস হয় তাহলে এই প্রক্রিয়াটি শুদ্ধ হবে। আসলে কিন্তু এগুলি সৌর-মাস, যার মধ্যে আরও প্রায় ২৭ মাস নিবেশিত করতে হবে তার দরুন এই ৭২ বৎসরে ৮৬৪-রও বেশী মাস হয়ে যায়।

আমাদের মান-বৎসর দিয়ে এই প্রক্রিয়াটিও পরীক্ষা করব। এই মান-বৎসরের আরম্ভ ৪২২ হিজরী, 'রবিউল আউওল' মাসের পহেলাতে পড়ে; উপরোক্ত হিজরী সনের (১৯৭) প্রথম 'সাবন' থেকে এই তারিখ পর্যন্ত ২৬৯৫ মাস অতীত হয়েছে। এই সংখ্যাকে গ্রন্থকার অবলম্বিত মাসের সংখ্যার সাথে (৮৬৪) যোগ দিলে আমরা ৩৫৫০ মাস পাই। এ সংখ্যাকে আমরা দুই স্থানে লিখলাম। এক স্থানে তাকে ৭ দিয়ে গুণ করে ২২৮ দিয়ে ভাগ দিলাম। তার ফলে ১০৯ 'অধিমাস' মাস পাওয়া গেল। এই 'অধিমাস' সংখ্যাকে অন্য-স্থানে লিখিত সংখ্যাটির সাথে যোগ দিয়ে ৩৬৬৮ পেলাম। এ সংখ্যাকে আবার ৩০ দিয়ে পূরণ করে ১০০৪০ পেলাম। এই অংকটিকেও আবার দুই স্থানে লিখে এক স্থানে তাতে ৩৮ যোগ ৩৮৮ করে ১১০০৭৮ পেলাম। একে আবার ১১ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৭০৩ দিয়ে ভাগ দিলাম। ভাগফল হোল ১৭২২ আর ভাগশেষ থাকল ২৯২, অর্থাৎ ২৯২ অবম'। ভাগফলকে প্রথম স্থানের

সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে যে ১০৮,৩১৮ অবশিষ্ট থাকল, তা হোল 'সাবন' দিবসের মোট সংখ্যা।

প্রণালীটিকে এইভাবে সংশোধন করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, আমরা যে অব্দ এখানে ব্যবহার করেছি তার সূচনা থেকে নির্দিষ্ট তারিখ হিসাবে যে প্রথম 'সাবন'কে ধরে নেওয়া হ'য়েছে, সে পর্যন্ত ২৫,৯১৮ দিন, অর্থাৎ ৮৭৬ আরবী মাস, অথবা ৭৩ বৎসর ও দুইমাস গত হয়েছে। তার সাথে আমাদের মান-বৎসরের 'রবিউল-আউয়াল'-এর পহেলা পর্যন্ত যত মাস গত হয়েছে তা যদি আমরা যোগ দিই, তাহলে মাসের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৭১। 'অধিমাস' মাস তার সাথে ধর'লে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৬৮০, অর্থাৎ ১১০,৪০০ দিবস। এর 'উনরাত্র' দিবস হবে ১৭২৭, আর 'অবম' থাকবে ৩১৯। এই 'উনরাত্র' দিবসগুলি বাদ দিলে আমাদের হাতে থাকে ১০৮৬৭২ দিবস। এখন যদি এর থেকে আমরা এক বিয়োগ করে অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ করি, তাহলে আমাদের গণনা শুদ্ধ হবে। কেননা, ভাগশেষ থাকবে ৪, (অর্থাৎ আমাদের মান-বৎসরের আলোচ্য তারিখটি ছিল বুধবার যেমন আমরা পূর্বের এক দৃষ্টান্ত পেয়েছি।

মুলতানের দুর্লভ যে প্রকরণ অবলম্বন করেছেন তা এই : '৮৪৮ বৎসর-এর সঙ্গে 'লৌকিককাল' যোগ করে তিনি 'শককাল' বের করেছেন। তার থেকে ৮০৪ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সংখ্যাকে তিনি মাসে পরিণত করেছেন। এই মাসের মোট সংখ্যার সাথে বর্তমান বৎসরের অতীত মাস যোগ করে তিনি তিন স্থানে পৃথকভাবে লিখে রেখেছেন। সর্বশেষে লেখা সংখ্যাটিকে ৭৭ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৬৯১২০ দিয়ে ভাগ করেছেন, ভাগফল যা হোল তাকে দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যা থেকে বাদ দিয়ে, অবশিষ্ট সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে তার সাথে ২৯ যোগ করেছেন। এই সংখ্যাকে আবার ৬৫ দিয়ে ভাগ করেছেন 'অধিমাস' মাসের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য। এই 'অধিমাস' সংখ্যাকে তারপরে তিনি প্রথমস্থানে লিখিত সংখ্যাতে যোগ করে যোগফলকে ৩০ দিয়ে ভাগ দিয়েছেন। এই ভাগ-ফলের সাথে বর্তমান মাসের অতীত দিবস সংখ্যা যোগ করে তিনি মোট সংখ্যাটিকে আবার দুই জায়গায় পৃথকভাবে লিখেছেন। তার একটিকে ১১ দিয়ে গুণ করে তার সাথে ৬৮৬ যোগ করেছেন। যা ফল পাওয়া গেল তাকে ৪০০৯৬৩ দিয়ে ভাগ দিয়ে ভাগফলকে উপরোক্ত তিন স্থানে লিখিত সংখ্যার দ্বিতীয়টির সাথে যোগ করেছেন। একে আবার ৭০০ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগ-ফল পেয়েছেন তা হচ্ছে 'উনরাত্র' দিবস। এই 'উনরাত্র' দিবসগুলিকে এখন

ঐ তিন জায়গায় লিখিত সংখ্যার প্রথমটি থেকে বিয়োগ করেছেন। অবশিষ্ট যা পাওয়া গেল তা হোল 'সাবন' অহর্গন'।

৩৮৯ এই প্রকরণের মোটামুটি একটা বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট তারিখের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার পর তার মূল কাঠামো ঠিক রেখে দুর্লভ প্রকরণটিকে কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছেন। 'করণসার' গ্রন্থে এরূপ করা নিষেধ করা হয়েছে, কেননা 'অহর্গন' এর ক্ষেত্রে তা করলে প্রকরণটি রূপান্তরিত হয়ে যায়। তবে (দুর্লভের) পুস্তকের যা আমি পেয়েছি তাতে অনুলিপির দোষ আছে। তার থেকে যতটুকু বর্ণনা দেওয়া যায় তা এই :

'শককাল' থেকে ৮২১ বাদ দেওয়ার পরে যা থাকছে তা হচ্ছে মূল সংখ্যা; আমাদের মান-বৎসরের ক্ষেত্রে সে মূল সংখ্যা হবে ১০২। এই সংখ্যাকে তিনি তিন জায়গায় লিখলেন। প্রথমস্থানে তাকে তিনি ১০২ ডিগ্রি দিয়ে গুণ করলেন। আমাদের মান-বৎসরের ক্ষেত্রে সে গুণফল হোল ১৭৪২৪। দ্বিতীয়-স্থানের সংখ্যাকে তিনি ৪৬ মিনিট দিয়ে গুণ দিয়ে ৬০৭২ পেলেন। আর তৃতীয়স্থানের সংখ্যাটিকে ৩৪ দিয়ে পূরণ করে গুণফল পেলেন ৪৪৮৮। তাকে আবার ৫০ দিয়ে গুণ করে ৮৯ মিনিট ৫৬" সেকেণ্ড পেলেন। তারপরে প্রথমস্থানের মোট ডিগ্রীর সংখ্যার সাথে ১১২ যোগ করে, তিনি সেকেণ্ডকে মিনিটে, মিনিটকে ডিগ্রীতে, আর ডিগ্রীকে বৃত্তে পরিণত করলেন। এইভাবে তিনি ৪৮ বৃত্ত ৩৫৮ ডিগ্রী, ৪১ মিনিট, ৪৬ সেকেণ্ড পেলেন। এই হচ্ছে সূর্য মেষরাশিতে প্রবিষ্ট হবার সময়ে চন্দ্রের মধ্যক অবস্থান (mean place)। চন্দ্রের এই মধ্যক অবস্থানের ডিগ্রীকেও তিনি আবার ১২ দিয়ে ভাগ করলেন। ভাগফলে দিবস-সংখ্যা পাওয়া গেল। ভাগশেষ যা থাকল তাকে ৬০ দিয়ে ভাগ দিয়ে ভাগফলের সংগে চন্দ্রের মধ্যক অবস্থানের মিনিট-সংখ্যা যোগ করলেন। এই মোট সংখ্যাকে আবার ১২ দিয়ে ভাগ দিয়ে যে ভাগফল পাওয়া গেল তা হোল 'ঘড়ি' ও অনুরূপ কালের সংখ্যা। এইভাবে আমরা ২৭° ২১′ ২৯″ 'অধিমাস' দিবস পাচ্ছি। এগুলি অবশ্যই চলতি অসম্পূর্ণ 'অধিমাসের' অতীত দিবসের সংখ্যা।

দেখা যাচ্ছে এই 'অধিমাসের' পরিমাণ নির্ধারণ এই ভাবে করা হয়েছে : আমাদের উপরোক্ত চান্দ্র সংখ্যাগুলি অর্থাৎ ১০২° ৪৬′ ৩৪″ কে ১২ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। তার ফলে বর্ষভাগে ১১° ০′ ৫″ ৫০‴, আর মাসভাগে ০° ৫৫′ ১৯″ ২৪‴ ১০⁗ পাওয়া গেল। শেষোক্ত ভাগ অনুযায়ী তিনি

৩৯০ ৩০ দিবস পূর্ণ হবার সময়কাল ধরেছেন ২ বৎসর, ৮ মাস, ১৬ দিন, ৪ ঘড়ি ও

৪৫ 'চণক'। তারপর পূর্বোক্ত 'মূল'সংখ্যাকে তিনি ২৯ দিয়ে গুণ করেছেন; ৩৮২৮ গুণফলের সঙ্গে ২০ যোগ দিয়ে মোট সংখ্যাকে আবার ৩৬ দিয়ে ভাগ দিয়েছেন। এই ভাগফলে যা পাওয়া গেল, অর্থাৎ ১০৬$\frac{৮}{৯}$, তা হোল উনরাত্রের মোট সংখ্যা।

এই প্রকরণের কোনও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আমি কোথাও পাই নি। সেজন্য, যেমন বুঝেছি তেমনই লিখে রাখলাম। কেবল এইটুকু বলা উচিত যে এক অধিমাসের সমপরিমাণ 'উনরাত্র' দিবসের সংখ্যা হবে ১৫$\frac{৭৮৮৭}{১০৬২২}$।

ছয়াত্ম অধ্যায়

গ্রহাদির মধ্যকস্থান (mean place) নির্ণয়

এক কল্প বা চতুর্যুগে গ্রহাবর্ত চক্রের সংখ্যা যদি আমরা জানতে পারি, আর কোনও বিশেষ সময় পর্যন্ত এইরূপ আবর্তন কতবার হয়েছে তাও যদি জানা যায়, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, সে কল্প বা চতুর্যুগের মোট দিবসের সাথে এই চক্রের মোট সংখ্যার যে সম্বন্ধ তা তার অতীত দিবসের সাথে এই চক্রাংশের আনুপাতিক সম্বন্ধের সমান। এই গণনায় সাধারণতঃ যে প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তা এই ঃ

কল্প বা চতুর্যুগের অতীত দিবসসংখ্যাকে গ্রহের বা তার অপদুরক বা সম্পাতের আবর্তন চক্রের সংখ্যা দিয়ে পূরণ করা হয়। গুণফলকে কল্প বা চতুর্যুগ যা ধরে গণনা করা হচেছ তার মোট দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া হয়। ভাগফল হবে সম্পূর্ণ আবর্তনচক্রের সংখ্যা। যেহেতু এই সম্পূর্ণ চক্রের সংখ্যা নির্ণয় আমাদের অভীষ্ট নয়, যেহেতু এই সংখ্যাটিকে ধরা হয় না।

অতএব, যা ভাগশেষ থাকে তাকে ১২ দিয়ে গুণ করা হয় এবং গুণফলকে কল্প বা চতুর্যুগের যেটি দিয়ে পূর্বে ভাগ করা হয়েছে তার দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া হয়। ভাগফল থেকে ক্রান্তিবৃত্তের রাশিগুলি পাওয়া যাবে। তার ভাগশেষকে আবার ৩০ দিয়ে গুণ করে, গুণফলকে উপরোক্ত ভাজক দিয়ে ভাগ করা হয়। এবার ভাগফল থেকে ডিগ্রী পাওয়া যাবে। এর যে ভাগশেষ থাকবে তাকে আবার ৩০ দিয়ে গুণ দিয়ে পূর্বোক্ত ভাজক দিয়ে ভাগ করে মিনিট পাওয়া গেল। আরও ক্ষুদ্রতর ভাগ পেতে হলে প্রক্রিয়াটিকে এইভাবে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ভাগফল থেকে গ্রহের মধ্য (وسط المسير) গতি অনুযায়ী তার অবস্থান বা তার অপদুরক বা সম্পাতের অবস্থান জানা
 যাবে। এই ব্যাপারটির উল্লেখ পুলিশও করেছেন, তবে তাঁর প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ঃ

'এক চতুর্যুগ বা কল্পে গ্রহের সম্পূর্ণ আবর্তন সংখ্যা বের করার পর অবশিষ্টকে (অসম্পূর্ণ আবর্তন) তিনি ১৩১,৪২৩,২৫০ দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন;

তার ফলে ক্রান্তিবৃত্তের মধ্যক রাশিগুলি (بروج الوسط mean signs of the Ecliptic) পাওয়া যাচ্ছে। ভাগশেষকে ৪,৩৮৩,১০৫ দিয়ে ভাগ দিয়ে ডিগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। এর ভাগশেষের চারগুণকে আবার ২৯২২০৭ দিয়ে ভাগ দিয়ে মিনিট পাওয়া যাচ্ছে। এরও ভাগশেষকে আবার ৬০ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৬০ দিয়ে ভাগ দিয়ে সেকেণ্ড পাওয়া গেল। ইচ্ছামত, এই গণনাকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যে ভাগফল পাওয়া যাবে তা হবে আমাদের অভীষ্ট গ্রহের মধ্যক স্থান।'

আসলে পলিশকে গ্রহের উপরোক্ত অসম্পূর্ণ আবর্তনকে ১২ দিয়ে গুণ দিয়ে গুণফলকে চতুর্যুগের দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হতো, কারণ তাঁর সমস্ত গণনাই চতুর্যুগ ধরে করা হয়েছে। তা না করে, চতুর্যুগের দিবস সংখ্যাকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় সেই ভাগফল দিয়ে তিনি ভাগ করেছেন। এই ভাগফলটি হচেছ উপরোক্ত তিনটি সংখ্যার প্রথম সংখ্যাটি (১৩১, ৪৯৩, ১৫০)। তাছাড়া, ক্রান্তিবৃত্তের মধ্যকরাশি পাওয়ার পর যে ভাগশেষ থেকে যাচ্ছে তাকেও ৩০ দিয়ে গুণ দিয়ে গুণফলকে প্রথমোক্ত ভাজক (অর্থাৎ ১৩:, ৪৯৩,১৫০) দিয়ে ভাগ দেওয়া তাঁর উচিত ছিল। তা করে তিনি এই সংখ্যাকে ৩০ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল থাকে, সেই ভাগফল দিয়ে তাকে ভাগ করেছেন। এই ভাগফল হচ্ছে উপরোক্ত সংখ্যাত্রয়ের দ্বিতীয় সংখ্যাটি।

এই রকম আরও দেখা যাবে যে ডিগ্রীর ভাগশেষকেও তিনি দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে ৬০ দিয়ে ভাগ করলে যা ভাগফল পাওয়া যায় সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ করার পরে তিনি ভাগফল ৭৩০৫১ পেয়ে দেখলেন যে ভাগশেষ থাকছে ¾। কাজেই, সমস্ত ভাজ্য ও ভাজক সংখ্যা দুটিকে তিনি ৪ দিয়ে গুণ দিলেন যাতে ভাগশেষে পূর্ণ সংখ্যা থাকে। কিন্তু তার পরের ভাগশেষকেও চারগুণ করে যখন তিনি ঐ রকম পূর্ণসংখ্যার ভাগশেষ পেলেন না, তখন অগত্যা তিনি ৬০ দিয়ে গুণ করাতে ফিরে গেলেন।

এখন যদি আমারা ব্রহ্মগুপ্ত বর্ণিত কল্প ধরে এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করি, তাহলে অসম্পূর্ণ গ্রহাবর্তকে প্রথমে যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে সে সংখ্যাটি হবে ১৩১,৪৯৩,০৩৭,৫০০, এবং ক্রান্তিবৃত্তের মধ্যকরাশি পাওয়ার পর যে ভাগশেষ, অর্থাৎ রাশির ভগ্নাংশ রয়ে গেল তাকে যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হবে সে দ্বিতীয় সংখ্যাটি হবে ৪৩৮৩,১০১,২৫০। আর ডিগ্রীর অবশিষ্ট ভগ্নাংশকে যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হবে সেই তৃতীয় সংখ্যাটি হবে

৭৩৭০৫১৬৮। শেষোক্ত ভাগের ভাগশেষ থাকে ½; অতএব পূর্ণসংখ্যার ভাগশেষ পাবার উদ্দেশ্যে আমরা ভাজক সংখ্যাটিকে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৪৬১০০-৩৭৫ ধরে নিয়ে এই ভাগশেষের দ্বিগুণ সংখ্যাকে আবার ভাগ করলাম।

৩১২ কল্প ও চতুর্যুগের দিবসের সংখ্যাগুলি অত্যন্ত বিরাট হয়ে দাঁড়ায় বলে গণনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মগুপ্ত কলিযুগ ধরে গণনা করেছেন। কলিযুগের নির্দিষ্ট তারিখে উপরোক্ত অহর্গনের নিয়ম প্রয়োগ করে যে দিবস সংখ্যা পাওয়া গেল তাকে এক কল্পের গ্রহাবর্তন সংখ্যা দিয়ে গুণ করা গেল এবং সে গুণফলের সাথে 'মূল' সংখ্যা অর্থাৎ কলিযুগের সূচনা পর্যন্ত গ্রহের সম্পূর্ণ আবর্তন সংখ্যা যোগ করা গেল। এই মোট সংখ্যাকে অবশেষে কলিযুগের 'সাবন' অথবা লৌকিক দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে যে ভাগফল পাওয়া গেল তা হোলো গ্রহের সম্পূর্ণ আবর্তন সংখ্যা। এই সম্পূর্ণ সংখ্যাকে উপেক্ষা করা হবে। ভাগশেষে যে সংখ্যা থাকবে তাকে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় গণনা করে আমরা গ্রহের মধ্যক অবস্থান পাব।

যে মূল সংখ্যার কথা উপরে বলা হোল (অর্থাৎ কলিযুগের সূচনা পর্যন্ত গ্রহের সম্পূর্ণ আবর্তন সংখ্যা) গ্রহ ভেদে তা এই :

মঙ্গল	৪৩০৮,৭৬৮,০০০
বুধ :	৪২৮৮,৮৯৬,০০০
বৃহস্পতি :	৪০১,৩৫২,০০০০
শুক্র :	৪৩০৪,৪৪৮,০০০
শনি :	৪,৩০৫,৩১২,০০০
সূর্যের অপদুরক :	৯৫৩১,২০,০০০
চন্দ্রের অপদুরক :	১৫০,৫৯৫,২০০০
রাহু (راس)	১৮৫৮৫৯২০০০

এবং কলিযুগের সূচনায় চন্দ্র ও সূর্য তাদের মধ্যক গতি ভেদে মেষরাশির 0° ডিগ্রিতে ছিল; তাদের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি, অর্থাৎ অধিমাস মাস বা উনরাত্র দিবস কোনটাই হয়নি।

উপরোল্লিখিত পঞ্জিকাগুলিতে দেখা যায় যে প্রত্যেক গ্রহের জন্য 'অহর্গন' অর্থাৎ নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত মোট দিবসের সংখ্যাকে পৃথক পৃথকভাবে একটি অনুমিত সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় এবং গুণফলকেও তেমনি আর একটি বিশেষ কাল্পনিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া হয়। তার ফলে গ্রহের মধ্যক গতি অনুযায়ী তার সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ আবর্তনের সংখ্যা পাওয়া যায়। এইরূপ

পূরণ ও ভাগ করার ফলে কখনও কখনও গণনা সম্পূর্ণ হয়ে যায়; কখনও আবার, গণনা, সম্পূর্ণ করার জন্য অন্য একটি অনুমানসিদ্ধ সংখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত মোট অহর্গনকে, কিংবা কোনও এক সংখ্যার সঙ্গে তার গুণফলকে ভাগ করতে হয়, এবং তখন এই ভাগফলকে প্রথমে প্রাপ্ত সংখ্যার সাথে মিলাতে হয়। কখনও আবার কতকগুলি সংখ্যা ধরে নেওয়া হয়, যেমন উপরোক্ত 'মূল' সংখ্যা, যাকে হয় বিয়োগ নয়ত যোগ করা হয় যাতে আলোচ্য অব্দের প্রারম্ভে গ্রহের মধ্যক গতি মেষরাশির 0° ডিগ্রী থেকে গণনা করা যেতে পারে। খণ্ডখাদ্যক ও করণতিলক পুস্তক দুইটিতে এই প্রণালী অবলম্বিত হয়েছে। 'করণসারের' গ্রন্থকার কিন্তু 'মহবিষুব' ক্রান্তিবিন্দু (الاستوا الر
بيعي) ধরে গ্রহের মধ্যকগতি গণনা করেন এবং সেই মুহূর্ত থেকে অহর্গনের হিসাব করেন। তবে এসব পদ্ধতি এত সূক্ষ্ম ও এত বেশী যে তার কোনটিই তেমন প্রাধান্য লাভ করে নি। সে সবের বিবরণ দিয়ে সময় নষ্ট করা ছাড়া
৩৯০ কোনও লাভ নাই। এতদ্ব্যতীত, গ্রহস্ফুট ও অন্যান্য গণনার যে সব পদ্ধতি আছে, সে সব আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর।

পঞ্চাশ অধ্যায়

গ্রহাদির কক্ষক্রম, দূরত্ব ও আয়তন

বিভিন্ন 'লোকের' বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমরা বিষ্ণুপুরাণ ও পাতঞ্জলীর টীকা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতে উক্ত হয়েছে যে গ্রহাদির বিন্যাসক্রমে সূর্যের স্থান চন্দ্রের নীচে। এই হচ্ছে হিন্দুদের চিরাচরিত বিশ্বাস। মৎস্যপুরাণে যেমন স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে :

'পৃথিবী থেকে আকাশের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান; গ্রহাদির মধ্যে সূর্য সর্বনিম্নে, তার উপরে চন্দ্র; তার উপরে আছে চন্দ্রের ক্ষেত্র ও তাদের নক্ষত্রসকল। তার উপরে বুধ এবং পর্যায়ক্রমে শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি, সপ্তর্ষি ও মেরু একটির উপর আর একটি বিন্যস্ত। মেরু আকাশের সাথে সংযুক্ত! নক্ষত্র গণনা মানুষের সাধ্যাতীত। যারা এ সিদ্ধান্তের যুক্তি-বত্তায় প্রশ্ন তোলে তারা বিশ্বাস করে যে প্রদীপের আলো যেমন সূর্যকিরণে অদৃশ্য হয়ে পড়ে, তেমনি সংযোগকালে চন্দ্র-ও সূর্যের সম্মুখে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং যতই সূর্য থেকে দূরে সরে যায় ততই সে দৃশ্যমান হয়।'

সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতাবলম্বী কয়েকটি লেখকের রচনা থেকে আমরা এমন কিছু উদ্ধৃত করব এবং তার সাথে কয়েক-জন জ্যোতির্বিদদের মতামতও উল্লেখ করব, যদিও শেষোক্তদের মতামত অল্পই আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি।

বায়ুপুরাণে উক্ত হয়েছে : 'সূর্য গোলাকার, অগ্নিময়, সহস্র কিরণমালী, যার দ্বারা সে জল আকর্ষণ করে; তন্মধ্যে ৪০০ কিরণ বৃষ্টির, ৩০০ তুষারের আর ৩০০ বায়ুর।'

অন্যত্র আছে : ('সূর্যের) কতকগুলি কিরণ এইজন্য যে দেবগণ পরম-শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে : অন্যগুলি মানুষের সুখময় জীবন যাপনের জন্য, আর অন্যগুলি পিতৃগণের জন্য।'

আর একস্থলে বায়ুপুরাণকার সূর্যকিরণ মালাকে ছয় ঋতু অনুযায়ী ভাগ করেছেন : "মীনরাশির 0° ডিগ্রীতে বৎসরের যে তৃতীয়াংশ আরম্ভ হয় তাতে সূর্য তার ৩০০ কিরণ রশ্মি দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে; পরবর্তী তৃতীয়াংশে ৪০০ কিরণরশ্মি দিয়ে সে হিম ও তুষার সৃষ্টি করে।'

এই গ্রন্থেরই আর একস্থানে আছে : 'সূর্যরশ্মি ও বাতাস জলকে সমুদ্র থেকে উত্তোলন করে; সূর্যের নিকট নিয়ে আসে; সেখান থেকে নিম্নে পতিত হলে জল অত্যন্ত উষ্ণ থাকবে বলে সূর্য সে জলকে আবার চন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেয়, যাতে শীতল হয়ে নীচে পড়ে এবং পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করে।'

আবার অন্যত্র : 'সূর্যের তাপ ও আলোক, অগ্নির তাপ ও আলোকের এক চতুর্থাংশ। উত্তরদিকে রাত্রিকালে সূর্য জলে নিপতিত হয়, সেজন্য তার বর্ণ হয় লাল।'

বায়ুপুরাণের আর এক অনুচ্ছেদে আছে : 'আদিতে কেবল ক্ষিতি, অপ, মরুৎ ও ব্যোম ছিল। তারপর ব্রহ্ম ভূমিগর্ভে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেলেন। সে স্ফুলিঙ্গকে তিনি বের করে এনে তিনভাগে ভাগ করলেন। একভাগ হোল সাধারণ অগ্নি যার প্রজ্বালনে কাষ্ঠের প্রয়োজন এবং যা জল দ্বারা নির্বাপিত হয়; দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে সূর্য এবং তৃতীয়ভাগ বিদ্যুৎ। জীবদেহেও অগ্নি আছে যা জল দ্বারা নির্বাপিত হয় না। রবি জলকে আকর্ষণ করে, বিদ্যুৎ বৃষ্টিধারার মধ্যেও চমকায়। কিন্তু যেসব আর্দ্র বস্তু দিয়ে জীব পুষ্টি সংগ্রহ করে, জীবদেহের অগ্নি তার মধ্যেই থাকে।'

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বাষ্প থেকে নিজের পুষ্টিসাধন করে, হিন্দুদের যেন এইরকম ধারণা। কোনও এক জাতির এইরূপ ধারণার উল্লেখ এরিস্টোটলও করেছেন। বিষ্ণুপুরাণকার ত' স্পষ্টই বলছেন যে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির পুষ্টিসাধন করে, সূর্য না থাকলে নক্ষত্র, দেবতা বা মানুষ কিছুই থাকত না।'

নক্ষত্রাদির আকৃতি সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাস যে এগুলি গোলাকার, এদের সত্তা জলীয় এবং এদের কোনও দীপ্তি নাই; আর এদের মধ্যে সূর্যের সত্তা আগ্নেয়, নিজ জ্যোতিতে দীপ্যমান যে সব নক্ষত্র ঘটনাক্রমে তার সম্মুখে এসে পড়ে তাদিকে সে আলোকিত করে।

মানবচক্ষুতে প্রতিভাত হয় বলে হিন্দুরা কতকগুলি উজ্জ্বল বস্তুকেও নক্ষত্রের মধ্যে গণ্য করে, যা প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্র নয়। সেগুলি আসলে এমনসব পুরুষের জ্যোতি যারা পুণ্যবলে ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল স্ফটিক সিংহাসনে বসার অধিকার লাভ করেছেন। 'বিষ্ণুধর্ম' বলেছে, 'নক্ষত্রসমূহ জলীয়, রাত্রিকালে
৩১৫ সূর্যকিরণ তাদিকে আলোকিত করে। সৎকর্মের প্রতিফল স্বরূপ যাঁরা ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছেন তাঁরা নিজ নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং দীপ্যমান অবস্থায় তাঁরা নক্ষত্রের মধ্যে পরিগণিত হন।'

সমস্ত নক্ষত্রকে 'তারা' বলা হয়। শব্দটি 'তরণ' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ পার হওয়া বা উত্তরণ। ভাবার্থ এই যে, এঁরা সংসারের পাপ-তাপ অতিক্রম

করে এসে মহাশান্তিতে উপনীত হয়েছেন আর নক্ষত্ররাও চক্রাকারে মহাকাশ উত্তীর্ণ হচ্ছে। 'নক্ষত্র' শব্দটি অবশ্য চন্দ্রক্ষেত্রের তারাগুলির (চন্দ্রপত্নী) জন্যই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এই তারাগুলিকে 'স্থির তারা' বলা হয়, সেজন্য সমস্ত স্থির তারা 'নক্ষত্র' নামে অভিহিত হয়, কারণ নক্ষত্রের বাচনিক অর্থ হোল ক্ষয় বা বৃদ্ধি না হওয়া। আমার অনুমান যে এই ক্ষতি বৃদ্ধি তাদের সংখ্যা ও পারস্পরিক দূরত্ব সম্পর্কিত, কিন্তু বিষ্ণু ধর্মকার তাদের জ্যোতির প্রতিও যেন এই ক্ষতিবৃদ্ধি আরোপ করতে চান, কেননা তিনি বলেছেন : 'চন্দ্র যেমন ক্ষয় ও বৃদ্ধি পেতে থাকে'।

এই পুস্তকেরই অন্য একস্থানে মার্কণ্ডেয়র উক্তিতে বলা হয়েছে : 'যেসব নক্ষত্র কল্পের শেষ পর্যন্ত লয় প্রাপ্ত হয় না তাদের সংখ্যা এক নিখর্ব', অর্থাৎ ১০০,০০০,০০০,০০০। কল্পের শেষ পর্যন্ত যেসব নক্ষত্র পড়ে যায়, তাদের সংখ্যা অজ্ঞাত। এক কল্পকাল ধরে যে উর্ধ্বে অবস্থান করে, কেবল সেই তাদের সংখ্যা জানতে পারে।

বজ্র বললে : 'হে মার্কণ্ডেয়, তুমি কল্পকাল জীবিত আছ; এখন তোমার সপ্তমকল্প, তুমি কেন জান না ?'

মার্কণ্ডেয় বললেন : 'তারাগুলি যদি পরিবর্তিত না হয়ে তাদের সমস্ত অস্তিত্বকাল ধরে একই অবস্থায় থাকত, তাহলে তাদের সংখ্যা আমার অজানা থাকত না। কিন্তু তারা অবিরত কোন পুণ্যশীল ব্যক্তিকে উর্ধ্বে নিয়ে আসছে আর অন্য কাউকে নীচে নামাচ্ছে। এজন্য তাদের সকলকে আমি মনে রাখতে পারি না।'

সূর্যচন্দ্রের ব্যাস ও তাদের ছায়া সম্পর্কে মৎস্যপুরাণ বলছে : 'সূর্যপিণ্ডের ব্যাস হচ্ছে ৯০০০ যোজন; চন্দ্রের ব্যাস তার দ্বিগুণ এবং রাহুর ব্যাস হচ্ছে প্রায় এই দুই যুক্ত ব্যাসের সমান।'

বায়ুপুরাণেও এইরকম কথা আছে, তবে রাহু (راس) সম্বন্ধে তাতে বলা হয়েছে যে, সূর্যের কাছে যখন থাকে তখন তার ব্যাস হয় সূর্যের সমান, আর চন্দ্রের কাছে যখন থাকে তখন তার ব্যাস হয় চন্দ্রের সমান।'

৩১৬ রাহুর ব্যাস সম্বন্ধে এক লেখক বলেছেন ৫০,০০০ যোজন।

আর গ্রহের ব্যাস সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে আছে : 'শুক্রের পরিধি চন্দ্রের পরিধির $\frac{১}{১৬}$ ভাগ, বৃহস্পতির পরিধি শুক্রের $\frac{৩}{৪}$ ভাগ, শনি কিম্বা মঙ্গলের পরিধি বৃহস্পতির $\frac{৩}{৪}$ ভাগ, আর বুধের পরিধি মঙ্গলের $\frac{৩}{৪}$ ভাগ।' এই বর্ণনাটি বায়ুপুরাণেও আছে।

এই দুই পুরাণে বৃহৎ স্থির নক্ষত্রগুলির পরিধি মঙ্গলগ্রহের পরিধির সমান বলে বলা হয়েছে। তার চেয়ে ঈষৎ ক্ষুদ্রায়তন নক্ষত্রের পরিধি ৫০০ যোজন এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলির পরিধি পর্যায়ক্রমে ১০০ যোজন করে কমে কমে ২০০ যোজন হয়। ১৫০ যোজনের কম পরিধিবিশিষ্ট কোনও স্থির নক্ষত্র নাই।

এই উক্তিটি বায়ুপুরাণের। কিন্তু 'মৎস্যপুরাণ' বলছে: 'পরবর্তী ক্ষুদ্রায়তন নক্ষত্রগুলির পরিধি পর্যায়ক্রমে ৪০০,৩০০,২০০ ও ১০০ যোজন। এমন কোনও স্থির নক্ষত্র নাই যার পরিধি অর্ধযোজনের কম।' শেষের এই কথাটি লিপিপ্রমাদ বলে সন্দেহ হয়।

মার্কণ্ডেয়র ভাষা উদ্ধৃত করে বিষ্ণুধর্মকার বলেছেন: 'অভিজিৎ' (নিম্নাভিমুখী ঈগল), আর্দ্রা (الشعرى اليمانية), রোহিনী (অল্‌-দবরান), পুনর্বসু (راس التوءمين), পুষ্যা, রেবতী, অগস্ত্য (سهيل) সপ্তর্ষি এবং বায়ু অহিরধ্নু ও বশিষ্ঠের অধিপতি, এই তারাগুলির প্রত্যেকের পরিধি পাঁচ যোজন করে। অবশিষ্ট তারাগুলির প্রত্যেকটির পরিধি চার যোজন করে। যেসব তারার দূরত্ব পরিমাপ করা যায় না সেগুলিকে আমি চিনি না। তাদের পরিধি দুই ক্রোশ অর্থাৎ দুই মাইল থেকে চারযোজনের মধ্যে। আর যেগুলির পরিধি দুই ক্রোশেরও কম সেগুলিকে মানুষের চোখ দেখতে পায় না। কেবল দেবতারা দেখতে পায়।'

নক্ষত্রগুলির আয়তন সম্বন্ধে ওদের একটি সিদ্ধান্ত আছে যা কোনও বিশেষ ব্যক্তির উদ্ভাবিত বলে প্রসিদ্ধ নয়। সিদ্ধান্তটি এই: 'রবি ও শশী প্রত্যেকের ব্যাস হচ্ছে ৬৭ যোজন: রাহুর ব্যাস ১০০ যোজন; শুক্রের ১০, বৃহস্পতির ৯, শনির ৮, আর মঙ্গল ও বুধ প্রত্যেকের ৭ করে।'

৩১৭ এই বিষয়ে ভারতীয়দের বিশৃঙ্খল ধারণার যা জানতে পেরেছি তা এই। এখন আমি ওদের জ্যোতির্বিদদের মতামত আলোচনা করব। গ্রহাদির ক্রমবিন্যাস তন্মধ্যে সূর্যের কেন্দ্রে শনি ও চন্দ্রের দুই পার্শ্বে ও স্থির নক্ষত্রগুলির উর্ধ্বে অবস্থান সম্বন্ধে ওদের মতের সঙ্গে আমাদের মতের তেমন পার্থক্য নাই। এসব কথা প্রসঙ্গতঃ পূর্বের পরিচ্ছেদগুলিতে কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে।

'সংহীতা' গ্রন্থে বরাহমিহির বলছেন: 'চন্দ্র সর্বদাই সূর্যের নিম্নে থাকে, তার উপরে রবি কিরণপাত ক'রে তার অর্ধভাগকে আলোকিত করে। অন্যভাগ তখন অন্ধকার, সূর্যালোকে স্থাপিত পাত্রের ন্যায় ছায়াচ্ছন্ন থাকে; যে অর্ধাংশ সূর্যের সম্মুখে থাকে সেভাগ আলোকিত হয় আর যে অংশ সূর্যের

সম্মুখে নাই সেভাগ অন্ধকার হয়ে থাকে। চন্দ্রের প্রকৃত সত্তা জলীয়, সেজন্য জল বা দর্পণ থেকে যেমন সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়ে ঘরের প্রাচীরে পড়ে, তেমনি চন্দ্র থেকেও সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়। সূর্যের সাথে সংযোগকালে চাঁদের শুক্লভাগ সূর্যের দিকে থাকে, আর কৃষ্ণভাগ থাকে আমাদের দিকে। তারপর সূর্য যেমন চন্দ্র থেকে সরে যেতে থাকে তেমন শুক্লভাগ ধীরে ধীরে আমাদের দিকে নামতে থাকে।'

হিন্দু শাস্ত্রবিদদের মধ্যে 'যারা যথার্থ পণ্ডিত, বিশেষ করে জ্যোতি-বিজ্ঞানীদের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে, চন্দ্র সূর্যের এমন কি সমস্ত গ্রহেরও নিম্নে আছে।

গ্রহাদির দূরত্ব সম্বন্ধে ওদের শ্রুতি যা আমি পেয়েছি তা ইয়াকুব b. Tariq এর 'জ্যোতির্মণ্ডলের প্রকৃতি' নামক পুস্তকে বিবৃত হয়েছে। ইয়াকুব সে তথ্যটি ১৬১ হিজরীতে ভারতীয় দৌত্যের সাথে যে পণ্ডিত বাগদাদে এসেছিল তার নিকটে সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথমে ইয়াকুব কতকগুলি মৌলিক মাপ নির্ধারণ করে নিয়েছেন। যথা: 'এক অঙ্গুলির পরিমাণ হোল ভূমিতে পাশাপাশি সজ্জিত ছয়টি যবের সমান; এক গজ হোল ২৪ অঙ্গুলী; এক ফারসাখ্ হোল ১৬ হাজার গজ।'

আসলে কিন্তু হিন্দুরা ফারসাখের পরিমাণ জানে না; কেননা, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ফারসাখ্ হচ্ছে অর্ধ যোজনের সমান।

ইয়াকুব তারপর লিখেছেন: 'পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে ২১০০ ফারসাখ্,
৩১৮ আর তার পরিধি ৬৫৯৬ ৯/২৫।' এই মাপ অনুযায়ী তিনি গ্রহাদির নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন।

আমার অবশ্য উল্লেখ করা উচিত যে, পৃথিবীর উপরোল্লিখিত আয়তন বা পরিধি সম্বন্ধে হিন্দুরা সবাই একমত নয়। যেমন, পুলিশের মতে পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন, আর পরিধি ৫০২৬ ৫/৯ যোজন, আর ব্রহ্মগুপ্তের মতে যথাক্রমে ১৫৮১ ও ৫০০০ যোজন। আমরা যদি এই সংখ্যাগুলিকে দ্বিগুণ করে নিই তাহলে সেগুলি ইয়াকুবের প্রদত্ত সংখ্যার সমান হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না। অথচ গজ ও মাইলের পরিমাণ নিয়ে আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যে কোনও মতানৈক্য নাই। আমাদের গণনামতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৩১৮৪ মাইল। আর, আমাদের দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে তিন মাইলে এক ফারসাখ্ ধরলে আমরা পাই ৬৭২৮ ফারসাখ্, আর ইয়াকুবের বর্ণনা মত ১৬০০০ গজের এক ফারসাখ্ ধরলে ৫০৪৬ ফারসাখ্ হবে, আর ৩২০০০ গজে এক যোজন ধরে হবে ২৫২৩ যোজন।

নিম্নের সারণিতে সন্নিবেশিত তথ্য ইয়াকুবের পুস্তকে আছে।

গ্রহাদি	পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ও ব্যাসার্ধ	দূরত্বের সাধারণ প্রচলিত পরিমাণ, স্থানকালভেদে যার সংজ্ঞার প্রভেদ আছে, ফারসাখে প্রদত্ত ১ ফারসাখ=১৬০০০ গজ	অপরিবর্তনীয় পরিমাণ অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ=১
	পৃথিবীর ব্যাসার্ধ	১০৫০	১
চন্দ্র	ন্যূনতম দূরত্ব	৩৭৫০০	৩৫ ৫/৭
	মাধ্যমিক দূরত্ব	৪৮৫০০	৪৬ ৪/২১
	সর্বাধিক দূরত্ব	৫৯০০০	৫৬ ৪/২১
	ব্যাস	৫০০০	৪ ১৬/২১
	ন্যূনতম দূরত্ব	৬৪০০০	৬০ ২০/২১
৩৯৯ বুধ	মাধ্যমিক দূরত্ব	১৬৪০০০	১৫৬ ৪/২১
	সর্বাধিক দূরত্ব	২৬৪০০০	২৫ ৩/৭
	ব্যাস	৫০০০	৪ ১৬/২১
	ন্যূনতম দূরত্ব	২৬৯০০০	২৫৬ ৪/২১
শুক্র	মাধ্যমিক দূরত্ব	৭০৯.৪০০০	৬৭৫ ৫/৭
	সর্বাধিক দূরত্ব	১১৪০,০০০	১০৯৫ ২/৭
	ব্যাস	২০,০০০	১৯ ১/২১
	ন্যূনতম দূরত্ব	১১৭০,০০০	১১১৪ ২/৭
সূর্য	মাধ্যমিক দূরত্ব	১৬৯০,০০০	১৬০৯ ১১/২১
	সর্বাধিক দূরত্ব	২২১০,০০০	২১০৪ ১৬/২১
	ব্যাস	২০,০০০	১৯ ১/২১
	ন্যূনতম দূরত্ব	২২৩০,০০০	২১২৩ ১৭/২১
মঙ্গল	মাধ্যমিক দূরত্ব	৪০৩১,০০০	৪০৬১ ১/২১
	সর্বাধিক দূরত্ব	৮৪০০,০০০	৮০০০
	ব্যাস	২০,০০০	১৯ ১/২১
৪০০	ন্যূনতম দূরত্ব	৮৪২০,০০০	৮০১৯ ১/২১
বৃহস্পতি	মাধ্যমিক দূরত্ব	১১৯১০,০০০	১০৮৬৬ ২/৩
	সর্বাধিক দূরত্ব	১৫৪০০,০০০	১০৭১৪ ২/৭
	ব্যাস	২০,০০০	১৯ ১/২১
	ন্যূনতম দূরত্ব	১৪৪২০,০০০	১০৭৩৩ ১/৩
শনি	মাধ্যমিক দূরত্ব	১৬২২০,০০০	১৫৪৪৭ ১৩/২১
	সর্বাধিক দূরত্ব	১৮০২০,০০০	১৭১৬২ ৬/২১
	ব্যাস	২০,০০০	১৯ ১/২১
	ব্যাসার্ধ (Radius)	২০,০০০,০০০	১৯০৪৭ ১৩/২১
রাশিচক্র	আভ্যন্তরিক ব্যাসার্ধ	১৯৯,৬২০০০	১৮৬৬৬ ২/৩ (?)
	বহির্দেশের পরিধি	১২০,৬ ৪,০০০	...

টলেমী তাঁর (كتاب المنشورات, পুস্তকে দূরত্ব নির্ধারণের যে নীতি অবলম্বন করেছেন, উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্ত তার থেকে আলাদা। টলেমীর অবলম্বিত নীতিকেই প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতির্বিদরা অনুসরণ করেছেন। তাঁদের মৌলিক নীতি হোল যে গ্রহের অধিকতম দূরত্ব তার অব্যবহিত উপরের গ্রহের ন্যূনতম দূরত্বের সমান এবং এই দুই গোলকের মধ্যে কর্মহীন কোনও শূন্যস্থান নাই।

উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিন্তু দুই গোলকের মাঝখানে একটি শূন্য ব্যবধান আছে, তাতে অক্ষদণ্ডের মত একটি বস্তুর চতুর্দিকে আবর্তন হতে থাকে। মনে হয়, ওরা (হিন্দুরা) ঈথর মণ্ডলকে ভারসম্পন্ন মনে
৪০১ করেছে। সেজন্য বৃহত্তর গোলক, অর্থাৎ ঈথর মণ্ডলের কেন্দ্রে আভ্যন্তরীণ গোলক (অর্থাৎ গ্রহকে) ধরে রাখার জন্য একটি ধারকের কল্পনা করতে হয়েছে।

জ্যোতির্বিদরা জানে যে দুইটি গ্রহের কোন্‌টি উপরে আর কোন্‌টি নীচে, তা জানার সমাবরণ (ستر occultation) অথবা লম্বন (اختلاف المنظر parallax) বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই। সমাবরণ কদাচিৎ ঘটে এবং লম্বনও কেবল চন্দ্রগ্রহেরই দেখা যেতে পারে। হিন্দুদের বিশ্বাস যে সমস্ত গ্রহের গতিবেগ সমান, কিন্তু তাদের কক্ষপথের দূরত্ব অসমান। তার কক্ষপথের অধিকতর বিস্তারের জন্যই উপরের গ্রহের গতিবেগ নীচের গ্রহ অপেক্ষা মন্থর, যেমন শনির গ্রহের এক মিনিট চন্দ্রগোলকের ২৬২ মিনিটের সমান। সুতরাং তাদের গতিবেগ সমান হলেও একই দূরত্ব অতিক্রম করতে শনি ও চন্দ্রের পৃথক পৃথক সময় লাগবে।

এ বিষয়ে আমি হিন্দুদের কোনও আলাদা পুস্তক বা প্রবন্ধ পাইনি। কেবল বিভিন্ন পুস্তকাদিতে প্রসঙ্গক্রমে বিক্ষিপ্ত সংখ্যাগুলি পেয়েছি; সে সংখ্যাগুলিও আবার বিকৃত। যেমন পলিশকে একজন প্রশ্ন করেছিল যে, তিনি প্রত্যেক গ্রহগোলকের পরিধি ২১৬০০ ও ব্যাসার্ধ ৩৪৩৮ ধরেছেন, কিন্তু বরাহমিহির পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ২৫৯৮৯০০ ও স্থির নক্ষত্রগুলির দূরত্ব ৩২১৩৬ ,৬৮৩ ধরেছেন। উত্তরে পলিশ বলেছিলেন যে, তাঁর নিজের ব্যবহৃত সংখ্যাগুলি মিনিটের, আর বরাহমিহির যোজনের সংখ্যা দিয়েছেন। অথচ, পলিশ অন্যত্র বলেছেন যে, পৃথিবী থেকে স্থির নক্ষত্রগুলির দূরত্ব সূর্যের দূরত্বের চেয়ে ৬০ গুণ বেশী। অতএব তাঁর নিজের গণনা মতে স্থির নক্ষত্রগুলির দূরত্ব ১৫৫,৯৩৪,০০০ হওয়া উচিত ছিল।

গ্রহগুলির উপরোল্লিখিত দূরত্ব নির্ণয়ে হিন্দুরা যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে তা এমন এক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা এ পর্যন্ত আমি পরিষ্কারভাবে ধরতে পারিনি এবং আমায় যতদিন না ওদের পুস্তকাদি তর্জমা করার সুবিধা আল্লাহ দেবেন ততদিন আমি ধরতে পারব না। নীতিটি হচেছ এই : চন্দ্র-
৪০২ গ্রহের কক্ষপথের এক মিনিটের বিস্তৃতি হচেছ ১৫ যোজন। এই নীতির মূলে কী, বলভদ্র বহু চেষ্টা করেও তা স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তিনি বলছেন : 'পর্যবেক্ষণ করে লোকেরা চন্দ্রের দিগন্ত অতিক্রম করার অর্থাৎ চন্দ্র গোলকের প্রথমাংশ দৃশ্যমান হওয়ার থেকে তার সম্পূর্ণ উদয়, কিংবা অস্তমিত হওয়ার প্রারম্ভ থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত সময় নির্ণয় করার চেষ্টা করেছে। তার থেকে তারা দেখেছে যে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে আকাশ গোলকের পরিধির ৩২ মিনিট লাগে।' কিন্তু চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করে ডিগ্রী নির্ণয় করাই যদি দুরূহ হয় তাহলে মিনিট নির্ণয় করা ত আরও কঠিন হবে।

হিন্দুরা চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করে চন্দ্রের ব্যাসের যোজন নির্ধারণ করতেও চেষ্টা করেছে; যোজনসংখ্যা পেয়েছে ৪৮০। এই সংখ্যাকে তার অবয়বের মিনিট দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল হবে ১৫ যোজন=এক মিনিটের সমান। তাকে আবার তার পরিধির মিনিট দিয়ে গুণ করলে ৩২৪০০০ পাওয়া যাবে, অর্থাৎ প্রত্যেক আবর্তনে চন্দ্র তার কক্ষপথের এই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে। এখন এক কল্প বা এক চতুর্যুগের মধ্যে চন্দ্রের পরিক্রমণ চক্রের সংখ্যা দিয়ে উপরের এই সংখ্যাকে যদি পূরণ করা যায় তাহলে ঐ সময়ের মধ্যে চন্দ্র কত দূরত্ব অতিক্রম করে গুণফল থেকে তা জানা যাবে। ব্রহ্মগুপ্তের মতে, এক কল্পে এই দূরত্বে হবে ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০ যোজন, যার তিনি নাম দিয়েছেন (ذنگ البروج) ক্রান্তিবৃত্তের যোজন।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক গ্রহের এক কল্পের পরিক্রমণ চক্র দিয়ে যদি এই সংখ্যাকে ভাগ দেওয়া যায় তাহলে ভাগফল থেকে প্রতি আবর্তনের যোজন সংখ্যা পাওয়া যাবে। কিন্তু যেমন আমি উপরে বলেছি, হিন্দুদের মতে বিভিন্ন দূরত্বসম্পন্ন সব কক্ষপথেই গ্রহাদির গতিবেগ সমান। সুতরাং উপরোক্ত ভাগফল থেকে আলোচ্য গ্রহের কক্ষপথের দূরত্ব পাওয়া যাবে।

আবার, যেহেতু ব্রহ্মগুপ্তের মতানুযায়ী ব্যাসের সঙ্গে পরিধির সম্পর্ক প্রায় ১২৯৫৯: ৪০৯৮০০, সেহেতু গ্রহগোলকের কক্ষপথের পরিমাণকে ১২৯ ৫৯ দিয়ে গুণ করে, গুণফলকে ৮১৯৬০ দিয়ে ভাগ দিলে ব্যাসার্ধ, অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে গ্রহের দূরত্ব পাওয়া যাবে।

ব্রহ্মগুপ্তের এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আমি সমস্ত গ্রহের পরিধি, ব্যাসার্ধ, দূরত্ব ইত্যাদি গণনা করে নীচের সারণিতে সাজিয়েছি।

৪০৩

গ্রহাদি	প্রত্যেক গ্রহগোলকের পরিধির যোজন সংখ্যা	ব্যাসার্ধের যোজন সংখ্যা যা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সমান
শশী	৩২৪০০০	৫১২২৯
বুধ	১০৪৩২১০ ১৫৬১২৫৭৬৭০/২২৪২১২৪৮৭৩	১৬৪৯৪৭
শুক্র	২৬৬৪৫২৯ ৬২৭৫৮০০৮৩/১৭৫৫৫৯৭০৭৩	৪২১৩১৫
রবি	৪৩৩১৪৯৭½	৬৮৪৮৬৯
মঙ্গল	৮১৪৬৯১৬ ৮২৪০০৯২৪/১১৪৮৪১৪২৬১	১২৮৮১৩৯
বৃহস্পতি	৫১৩৭৪৮২১ ৫৪১৮ ০৮৯/৭২৮৪৫২৯১	৮১২০০৬৪
শনি	১২৭৬৬৮৭৮৭ ২৫২৩৬৬০৭/৭৩২৮০৬৪৯	২০১৮৬১৮৬
স্থির নক্ষত্র সকল (পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এদের দূরত্ব সূর্যের দূরত্বের ৬০ গুণ	২৫৯৮৮৯,৮৫০	৪১,০৯২১৪০

৪০৪ যেহেতু পলিশ কল্প দিয়ে না করে চতুর্যুগ ধরে গণনা করেছেন, সেজন্য চন্দ্রের পরিক্রমণ পথের দূরত্বকে এক চতুর্যুগের পরিক্রমণ চক্রের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে ১৮৭১২,০৮০৮৬৪,০০০ যোজন পেয়েছেন। এই যোজনকে তিনি বলেছের 'আকাশ-যোজন'। প্রত্যেক চতুর্যুগে চন্দ্র এই দূরত্ব অতিক্রম করে। পলিশের মতে পরিধির সঙ্গে ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধ হচ্ছে ১২৫০ : ৩৯২৭ প্রত্যেক গ্রহগোলকের পরিধিকে যদি ৬২৫ দিয়ে পূরণ করে গুণফলকে ৩৯২৭ দিয়ে ভাগ করা যায়, তাহলে ভাগফল থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ঐ গ্রহের দূরত্ব পাওয়া যাবে। পলিশের এই মত অবলম্বন করে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় আমি বিভিন্ন দূরত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করেছি,—ফলাফল নীচের সারণিতে সন্নিবেশিত হোল। ব্যাসার্ধ গণনায় আমি ½ এর চেয়ে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে অগ্রাহ্য করেছি এবং ½ এর চেয়ে বড় ভগ্নাংশকে পূর্ণসংখ্যা করে নিয়েছি। তবে পরিধি পরিমাপ

করতে আমি সেরকম করিনি, সূক্ষ্ম ভাবেই গণনা করেছি, কেননা আবর্তনের পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য পরিধির সূক্ষ্ম গণনা প্রয়োজন। যেমন, 'আকাশ-যোজন'কে কল্প বা চতুর্যুগের লৌকিক দিবস সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলে ১১,৮৪৮-এর অতিরিক্ত কিছু ভগ্নাংশ পাওয়া যায়; ব্রহ্মগুপ্তের মতে সে ভগ্নাংশ হবে $\frac{২৪৪৯৮}{৩৫৪১৯}$ আর পলিশের মতে হবে $\frac{২০৯৫৫৪}{২৯২২০৭}$। এটি হচ্ছে চন্দ্রের প্রতিদিনে অতিক্রান্ত দূরত্বের পরিমাণ। আর, যেহেতু সমস্ত গ্রহের গতিবেগ সমান, সেহেতু ঐ দূরত্ব প্রত্যেক গ্রহও প্রতিদিন অতিক্রম করে। গ্রহগোলকের পরিধির সাথে তার গতিবেগের যে আনুপাতিক সম্বন্ধ, তার পরিধির যোজনসংখ্যার সাথে উপরোক্ত দূরত্বেরও সেই সম্বন্ধ। পরিধি ৩৬০টি সমান ভাগে বিভক্ত। কাজেই, গ্রহগণের সাধারণ কক্ষপথকে ৩৬০ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে আলোচ্য গ্রহবিশেষের পরিধির মোট যোজনসংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে
৪০৫ সেই গ্রহের দৈনিক গতির গড় পাওয়া যাবে।

গ্রহ	গ্রহগোলকের পরিধির যোজনসংখ্যা	পৃথিবীকেন্দ্র থেকে গ্রহে দূরত্বের যোজন পরিমাণ।
চন্দ্র	৩২৪০০০	৫১৫৬৬
বুধ	১০৪৩২১১ $\frac{৫৭৩}{১৯৯০}$	১৬৬০০৩৩
সূর্য-শুক্র	২৬৬৪৬৩২ $\frac{৯০২৩২}{৫৮৫১৯৯}$	৪২৪০৮৯
সূর্য	৪৩৩১৫০০$\frac{১}{২}$	৬৯০,২৯৫ (!)
মঙ্গল	৮১৪৬৯৩৭ $\frac{১৮১৬৩}{৯৫৭০১}$	১২৯৬৬২৪ (!)
বৃহস্পতি	৫১৩৭৫৭৬৪ $\frac{৪৯৯৬}{১৮২১১}$	৮১৭৬৬১৯ (!)
শনি	১২৭৬৭১৭৩৯ $\frac{২৭৩০১}{৩৬৬৪১}$	২০৩১১৫৪২ (!)
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব (যে সব নক্ষত্রের দূরত্ব ৬০ ভাগের একভাগ সেই স্থির নক্ষত্ররাজি।)	২৫৯৮৯০০১২	৪১৪৩১৭,৭০০ (!)

যেহেতু সমগ্র চন্দ্রগোলকের পরিধির মোট যোজন সংখ্যার সাথে (৪৮০)
৪০৬ তার ব্যাসের যোজন সংখ্যার যে আনুপাতিক সম্বন্ধ তার পরিধির মিনিটের সঙ্গে (২১৬০০) তার ব্যাসের মিনিটেরও সেই সম্বন্ধ, সেহেতু সূর্যগোলকের পরিধির মিনিট গণনা করতেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তার দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্মগুপ্তের মতে সে মিনিটের পরিমাণ হচ্ছে ৬৫২২ যোজন, আর পলিশের মতে ৬৫৮০ যোজন। পলিশ চন্দ্রগোলকের পরিধির মিনিট ৩২, অর্থাৎ ২ এর ঘাত (زوج زوج) সংখ্যা বলে ধরেছেন। সেজন্য গ্রহ গোলকের মিনিট নির্ণয় করতে তিনি এই ৩২কে ক্রমাগত অর্ধেক করে, অর্থাৎ ২ দিয়ে ভাগ করে করে ১ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। এইভাবে শুক্রের পরিধি তিনি ধরেছেন ৩২ মিনিটের অর্ধেক, অর্থাৎ ১৬; বৃহস্পতির $\frac{1}{4}$ অর্থাৎ ৮ মিনিট; বুধের $\frac{1}{8}$=৪ মিনিট, শনির $\frac{1}{16}$=২ মিনিট, আর মঙ্গলের পরিধি $\frac{1}{32}$ অর্থাৎ ১ মিনিট।

মনে হয় বিভক্তির এই বিন্যাসক্রম যেন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তা নইলে, পর্যবেক্ষণে শুক্রের ব্যাস যে চন্দ্রের ব্যাসার্ধের সমান নয়, কিম্বা মঙ্গল যে শুক্রের $\frac{1}{16}$ নয়, সেকথা তিনি ভুলে যেতেন না।

পৃথিবী থেকে দূরত্ব, অর্থাৎ সূর্যচন্দ্র-সংস্কৃত গণনায় (عمل تقويمها computation of corrections of Sun & Moon) প্রাপ্ত পৃথিবী থেকে দূরত্ব, অর্থাৎ পৃথিবী বিষুবরেখার প্রকৃত ব্যাস অনুযায়ী সকল সময়ের সূর্য ও চন্দ্রগোলকের আয়তন নির্ণয় করার প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত রূপ :

ক খ সূর্যগোলকের ব্যাস। গ ঘ পৃথিবীর ব্যাস, গ ঘ ছ ছায়ার শঙ্কু (مخروط ظل cone) এবং চ ছ তার পুরোদৈর্ঘ্য (سهم elevation)। এখন খ ঘ-এর সমান্তরাল করে গ ঝ রেখা টানলাম। ক ঝ ও গ ঘ-মধ্যেকার প্রভেদ এবং গ ত হবে সূর্যের মাধ্যমিক দূরত্ব, অর্থাৎ 'আকাশ যোজনে' নির্ধারিত তার কক্ষপক্ষের ব্যাসার্ধ। এর থেকে সূর্যের প্রকৃত দূরত্ব সর্বদাই ভিন্ন হয়, কখনও এর চেয়ে কম হয় আর কখনও বেশী। গ থ রেখা টানলাম; এটি অবশ্য সাইনের (جيب) ভাগ অনুযায়ী হবে। গ থ র যোজন সংখ্যার সাথে গ ত এর যোজনের যে সম্বন্ধ গ ত (যা আসলে ব্যাসার্ধ) এর সাথে গ থ-এরও সেই সম্বন্ধ। এখানে এসে ব্যাসার্ধের পরিমাণ যোজনে পরিণত হোল। ক খ-এর যোজনের সঙ্গে ত গ-এর যোজনের যে আনুপাতিক সম্বন্ধ, তাদের মিনিটের পারস্পরিক অনুপাতও তাই; ত গ এখানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ। পরিধি থেকে ব্যাসার্ধের (Radius) মাপ নির্ধারিত হয়, সেজন্য গ্রহগোলকের মিনিট ক খ-এর
৪০৭ মাপ ধরা যায়। পলিশ এইজন্য বলেছেন : 'সূর্য বা চন্দ্রের প্রকৃত দূরত্ব

দিয়ে তাদের ব্যাসার্ধের যোজন সংখ্যাকে গুণ কর এবং গুণফলকে সমগ্র সাইন (جيب كل Sinus Totus) দিয়ে ভাগ দাও। সূর্যের ক্ষেত্রে যে ভাগফল পাবে তা দিয়ে ২২,২৭৮,২৪০ কে ভাগ কর, আর চন্দ্রের ক্ষেত্রে যে ভাগফল পাবে তা দিয়ে ১৬৫০,২৪০ কে ভাগ কর। যে ভাগফল পাবে তা হবে সূর্য বা চন্দ্রগোলকের ব্যাসার্ধের মিনিট সংখ্যা।

শেষোক্ত সংখ্যা দুটি হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাসের যোজন সংখ্যার ৩৪, ৩৮ গুণফল; এ সংখ্যাটি হচ্ছে ত্রিজ্যার মিনিট-সমষ্টি।

এইরকম ব্রহ্মগুপ্তও বলেছেন: 'সূর্য বা চন্দ্রের যোজনকে ৩৪১৬ অর্থাৎ ত্রিজ্যার মিনিট দিয়ে পূরণ কর এবং গুণফলকে সূর্য বা চন্দ্রগোলকের ব্যাসার্ধের যোজন সংখ্যা দিয়ে ভাগ দাও।

ভাগ করার এই নিয়মটি কিন্তু শুদ্ধ নয়। কেননা তাহলে গ্রহের আয়-তনের পরিমাণ সবসময় একই থাকবে। এইজন্য, পলিশের মত টীকাকার বলভদ্রও বলেছেন যে, ব্যাসার্ধকে যে ভাজক দিয়ে ভাগ করতে হবে তা যোজনে পরিণত প্রকৃত দূরত্ব, বং—মন্দাকর্ণ।

যাকে আমাদের পঞ্জিকাতে فلك الجوزهر বলা হয় তার আয়তন অর্থাৎ ছায়ার ব্যাস নির্ণয় করার নিম্নলিখিত ব্রহ্মগুপ্ত লিখেছেন: 'পৃথিবীর ব্যাস এর যোজনিক পরিমাণ অর্থাৎ ১৫৮১ কে, সূর্যের ব্যাসের যোজনিক পরিমাণ, অর্থাৎ ৬৫২২ থেকে বিয়োগ কর। অবশিষ্ট থাকে ৪৯৪১। এই সংখ্যাকে, পরে ভাজক রূপে ব্যবহার করার জন্য 'হাতে' রেখে দিতে হবে। আমাদের নকশায় তাকে ক ঝ রূপে দেখানো হয়েছে। তারপর পৃথিবীর ব্যাস (যা ত্রিজ্যা বা তিন রাশিচিহ্নের ক্ষেত্র বা ৯০ ডিগ্রী বা ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ) কে সূর্যের মন্দাকর্ণ বা প্রকৃত দূরত্বের যোজনিক পরিমাণ দিয়ে গুণ কর; এই দূরত্ব, সূর্য সংস্কার (correction تقويم) দ্বারা পাওয়া যাবে। যা গুণফল হোল তাকে পূর্বোক্ত হাতের ভাজক দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফলের অংক হবে 'ছায়া-প্রান্তের' প্রকৃত দূরত্ব।

আমাদের নকশায় ক ঝ গ ও গ ঘ চ এই ত্রিকোণ দুটি যে পরস্পর সমান তা সুস্পষ্ট। তবে গ ত লম্বরেখার মাপে তারতম্য হয় না, কিন্তু (قطر المعدل) প্রকৃত স্ফুট দূরত্বের দরুন দুশ্যত: ক খ রেখার পরিবর্তন হয়, যদিও তার পরিমাণ সর্বদা একই থাকে। এই প্রকৃত দূরত্ব বা মন্দাকর্ণকে আমরা গ খ রেখার দেখাচ্ছি। সমান্তরাল করে ক দ ও ঝ ধ এই দুটি রেখা টান, আর ক খ এর সাথে সমান্তরাল করে দ থ ধ রেখা টান। শেষের রেখাটি হাতে রাখা ভাজকের সমান

হবে। আবার দ গ প রেখা টান। প হচ্ছে সেই বিশেষ সময়ে ছায়ার শংকুর ঊর্ধ্ব-ভাগ। দ ধ, অর্থাৎ হাতে রাখা ভাজক, আর থ গ (=প্রকৃত স্ফুট দূরত্ব) এর পারস্পরিক সম্পর্ক গ ঘ (=পৃথিবীর ব্যাস) আর প ছ এর আনুপাতিক সম্পর্কের সমান। 'প ছ' কে ব্রহ্মগুপ্ত ছায়াপ্রান্তের প্রকৃত দূরত্ব (قطر اظلوم) বলেছেন সাইনের (sine) মিনিট দ্বারা যা নির্ণীত হয়। কারণ থ গ...

আমার সন্দেহ হয় যে পুঁথিতে এর পর যা লেখা আছে তার থেকে লিপি-কালে কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে। কেননা তিনি (ব্রহ্মগুপ্ত) বলেছেন :
৫০৮ 'তারপর তাকে (হাতে রাখা ভাজক দ্বারা গ থকে ভাগ করার ভাগফল) পৃথিবীর ব্যাস দিয়ে পূরণ কর। গুণফল হবে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে 'ছায়া-প্রান্তের' দূরত্ব। চন্দ্রের স্ফুট দূরত্ব বা মন্দাকর্ণ তার থেকে বিয়োগ করে অবশিষ্ট সংখ্যাকে পৃথিবীর ব্যাস দিয়ে গুণ কর। গুণলব্ধ সংখ্যাকে আবার ছায়া-প্রান্তের প্রকৃত দূরত্ব দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে চন্দ্রগোলকে ছায়ার ব্যাস।'

'আরও মনে করা যাক ছ ব হচ্ছে চন্দ্রের প্রকৃত দূরত্ব আর ম ল হচ্ছে চন্দ্রগোলকের একাংশ যার ব্যাসার্ধ ছ ব। সাইনের মিনিট দ্বারা যখন আমরা ছ প নির্ণয় করেছি তখন গ ঘ (অর্থাৎ ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ) এর সঙ্গে তার সেই সম্বন্ধ, সাইনের (جيب) মিনিটে নির্ধারিত 'প ব' এর সাথে অনুরূপ মিনিটে নির্ধারিত হ ভ-এর যে সম্বন্ধ'।

আমি অনুমান করি, ব্রহ্মগুপ্ত এখানে ছ প, অর্থাৎ ছায়াপ্রান্তের প্রকৃত দূরত্বকে যোজনে পরিণত করতে চেয়েছেন। ছ প কে পৃথিবীর ব্যাসের যোজন-সংখ্যা দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ব্যাসার্ধের বা ত্রিজ্যার দ্বিগুণ ভাগ দিলেই সে যোজন পাওয়া যায়। পুঁথির লিপি থেকে এই ভাগ করার উল্লেখটুকু পড়ে গেছে, কারণ সে উদ্দেশ্য না থাকলে ছায়াপ্রান্তের প্রকৃত দূরত্বকে পৃথিবীর ব্যাস দিয়ে গুণ দেওয়া অবান্তর হবে, গণনার জন্য তার কোন প্রয়োজনই নাই।

ব্রহ্মগুপ্ত আরও বলেছেন : 'ছ প'-এর যোজন সংখ্যা যদি জানা থাকে, তাহলে ছ ব, অর্থাৎ প্রকৃত দূরত্বকেও যোজনে পরিণত করতে হবে, যেন যোজন দ্বারা প ব-ও নির্ণিত হতে পারে। ছায়ার ব্যাসের যে মাপ এইভাবে পাওয়া যাবে তা হবে যোজন। তিনি আরও বলছেন 'যে ছায়া পাওয়া গেল তাকে ব্যাসার্ধ বা ত্রিজ্যা দিয়ে গুণ দাও এবং গুণফলকে চন্দ্রের প্রকৃত বা স্ফুট দূরত্ব দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল হবে ছায়ার মিনিট যা আমাদের অভীষ্ট ছিল।'

কিন্তু যে ছায়া তিনি পেয়েছেন তাকে যদি যোজনে প্রকাশ করতে হয় তাহলে তাকে ব্যাসার্ধের (ত্রিজ্যা) দ্বিগুণ দিয়ে গুণ দেওয়া তাঁর উচিত ছিল

এবং ছায়ার মিনিট নির্ধারণ করার জন্য সে গুণফলকে পৃথিবীর ব্যাসের যোজন সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি যখন তা করেন নি তখন বোঝা যাচ্ছে যে, ছায়াপ্রান্তের প্রকৃত ব্যাসকে মিনিটে পরিণত করেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন, তাকে আর যোজনে পরিণত করতে যান নি। যোজনে পরিণত না হওয়া অবস্থাতেই গ্রন্থকার স্ফুট বা প্রকৃত ব্যাস ব্যবহার করেছেন। এইভাবে তিনি দেখেছেন যে বৃত্তের মধ্যাস্থিত যে ছায়া যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছ ব, সে ছায়াই হচ্ছে প্রকৃত স্ফুট ব্যাস (বা মন্দাবর্ণ), এবং যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৯০ ডিগ্রী
৪০৯ (অথবা ত্রিজ্যা), তার আয়তন নির্ণয়ের জন্য ঐ প্রকৃত বা স্ফুট ব্যাসের প্রয়োজন আছে। তিনি যে হ ভ নির্ধারণ করেছেন, তার সঙ্গে ব ছ বা স্ফুট ব্যাস যে সম্বন্ধযুক্ত, তা অভীষ্ট পরিমাপে হ ভ-এর সাথে ব ছ-এর (ব্যাসার্ধ ৯০ ডিগ্রী) সম্বন্ধের সমান। এই সমীকরণ অনুসারেই ছায়াপ্রান্তের প্রকৃত দূরত্বকে যোজনে পরিণত করতে হবে।

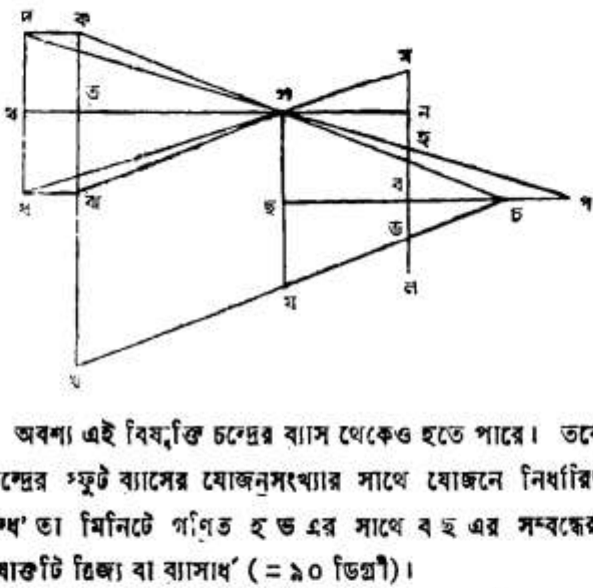
অন্য এক স্থলে ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন: 'পৃথিবীর ব্যাস ১৫৮১, চন্দ্রের ৪৮০, সূর্যের ৬৫২২, আর ছায়ার ব্যাস হচ্ছে ১৫৮১। পৃথিবীর যোজন সমষ্টিকে সূর্যের যোজন থেকে বিয়োগ করলে ৪৯৪১ অবশিষ্ট থাকবে। এই অবশিষ্টকে চন্দ্রের প্রকৃত দূরত্ব বা মন্দাবর্ণ দিয়ে গুণ কর, গুণফলকে আবার সূর্যের মন্দাবর্ণ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফলকে ১৫৮১ থেকে বিয়োগ দাও। অবশিষ্ট যা থাকবে তা হবে চন্দ্রগোলকে ছায়ার মাপ। তাকে ৩৪১৬ দিয়ে গুণ কর এবং গুণফলকে চন্দ্রগোলকের মধ্যম ব্যাসার্ধের যোজন-সংখ্যা দিয়ে ভাগ কর। ভাগলব্ধ অংক হবে ছায়ার ব্যাসের মিনিট।'

'স্পষ্টতঃ, পৃথিবীর ব্যাসের যোজন যদি সূর্যের ব্যাসের যোজন থেকে বিয়োগ করা হয়, তাহলে অবশিষ্ট হবে ক খ, অর্থাৎ দ ধ। ধ-গ-ম রেখা টান, যেন তার লম্বরেখা ধ গ ন এর উপর দিয়ে যায়; তাহলে উদ্বৃত্ত দ ধ এর সাথে ধ গ, অর্থাৎ সূর্যের মন্দাকর্ণের সম্বন্ধ হবে হ ম এর সাথে ন, গ অর্থাৎ চন্দ্রের মন্দাকর্ণের সম্বন্ধের মত। এই দুই মন্দাকর্ণকে যোজনে পরিণত করা হোক না হোক তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ এক্ষেত্রে হ ম যোজনের মাপেই নির্ণীত হবে।'

'ন ম এর সমান করে ভ' ল রেখা টান। দেখা যাবে ন ল অবশ্যম্ভাবীরূপে গ ঘ এর ব্যাসের সমান হবে; তার অন্বীষ্ট অংশ হবে হ ভ। এইভাবে যা পাওয়া যাবে তাকে পৃথিবীর ব্যাস থেকে বিয়োগ করতেই হবে, তাহলে হ ভ অবশিষ্ট থাকবে।

এইরূপ অশুদ্ধির জন্য গ্রন্থকারকে দোষী করা উচিত হবে না; দোষ লিপিদুষ্ট পুঁথির। আমাকে অবশ্য বর্তমান পুঁথির উপরই ভরসা করতে হবে কারণ শুদ্ধ পুঁথিতে কি আছে তাও' আমার জানা নাই।

ব্রহ্মগুপ্ত পাঠককে ছায়ার যে পরিমাণ বা আয়তন থেকে বিয়োগ করতে বলেছেন সে আয়তন মধ্যম (أوسط) হওয়া সম্ভব নয়। কেননা মধ্যম হচ্ছে
৪১০ অল্প ও বিস্তরের মধ্যবর্তী পরিমাণ। আর আমাদের এ মনে করাও সম্ভব নয় যে তা ছায়ার বৃহত্তম আয়তন, যার থেকে উদ্বৃত্তটুকু বাদ যাবে, কেননা হ ম, যা আসলে বিযুক্ত (نقصان) হচ্ছে এমন ত্রিভুজের ভূমিরেখা (قاعدة مثلث base of a triangle) যার এক বাহু ম গ, সূর্যের দিকে গিয়ে ব ছ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, ছায়ার প্রান্তের দিকে নয়। কাজেই, ছায়ার সঙ্গে হ ম-এর কোন সম্বন্ধ নাই। (?)



অবশ্য এই বিযুক্তি চন্দ্রের ব্যাস থেকেও হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ব ছ, বা চন্দ্রের স্ফুট ব্যাসের যোজনসংখ্যার সাথে যোজনে নির্ধারিত হ ড-এর যে সম্বন্ধ' তা মিনিটে গণিত হ ড এর সাথে ব ছ এর সম্বন্ধের মতই; তবে, শেষোক্তটি ত্রিজ্যা বা ব্যাসার্ধ' (= ৯০ ডিগ্রী)।

ব্রহ্মগুপ্ত যা চেয়েছিলেন, তা চন্দ্রগোলকের মাধ্যমিক ব্যাসার্ধ' (যা আকাশ যোজন' থেকে নির্ধারণ করতে হয়) দিয়ে ভাগ না করে এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই অভ্রান্তভাবে পাওয়া গেল।

'খণ্ড খাদ্যক' ও 'করণসার' এর মত হিন্দু পঞ্জিকাদিতে বর্ণিত সূর্য-চন্দ্রের ব্যাস গণনার প্রক্রিয়া আর অল্-খ্বারজ্মীর পঞ্জিকাতে অবলম্বিত প্রক্রিয়া একই। 'খণ্ডখাদ্যকে' ছায়ার ব্যাস গণনার যে প্রক্রিয়া দেওয়া হয়েছে তাও অল্-খারজ্মীর প্রক্রিয়ার মতই, কেবল 'করণসারের' প্রক্রিয়া একটু

ভিন্ন। 'চন্দ্রের 'ভুক্তি'কে ৪ দিয়ে গুণ কর। আর সূর্যের 'ভুক্তি'কে ১৩ দিয়ে গুণ কর। দুই গুণফলের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া যাবে তাকে ৩০ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে ছায়ার ব্যাস।"

৪১১ 'করণতিলকে' সূর্যের ব্যাস নির্ধারণের জন্য 'সূর্যের ভুক্তিকে' অর্ধেক করে দুই ভাগকে দুই স্থানে লিখে রাখতে বলা হয়েছে। তার এক ভাগকে ১০ দিয়ে ভাগ দিয়ে ভাগফলকে দ্বিতীয় স্থানে লিখিত ভাগের সাথে যোগ দিতে হবে। যোগলব্ধ অংক হবে সূর্যের ব্যাসের মিনিট সংখ্যা।

চন্দ্রের ব্যাস করণায় 'করণতিলকের' গ্রন্থকার প্রথমে চন্দ্রের 'ভুক্তি লিখে তার সাথে তার ১/৮ যোগ দিচ্ছেন এবং সে মোট সংখ্যাকে আবার ২৫ দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন। ভাগফলে চন্দ্রের ব্যাসের মিনিটসংখ্যা পাওয়া গেল।

আর ছায়ার ব্যাস গণনার জন্য এই গ্রন্থকার সূর্যের 'ভুক্তি'কে ৩ দিয়ে পূরণ করে লব্ধ অংক থেকে ভুক্তির ১/২৪ বিয়োগ করছেন। যা অবশিষ্ট থাকছে তাকে চন্দ্রের 'ভুক্তি' থেকে বিয়োগ করছেন এবং তার আবার যা অবশিষ্ট থাকছে তাকে দ্বিগুণ করে নিয়ে ১৫ দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন। যা ভাগফল হোল তা রাহুকেতু (? جوزهر Dragon s head and tail) গোলকের মিনিট সংখ্যা।

ওদের জ্যোতিষ পঞ্জিকাদি থেকে আমরা যদি ক্রমাগত উদ্ধৃত করে যেতে থাকি তাহলে এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে আমরা সরে যাব। আমার বর্তমান বিষয়ের সাথে যা সংশ্লিষ্ট এবং যা হয় নতুনত্বের জন্য উল্লেখনীয়, নয়ত আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কিম্বা আমাদের দেশে যা একেবারে অজ্ঞাত, কেবল সেইটুকুই আমি উদ্ধৃত করি।

ছাপ্পান্ন অধ্যায়

চন্দ্রের অবস্থান ক্ষেত্রসমূহ (চন্দ্র পত্নীগণ)

যেভাবে হিন্দুরা রাশিচক্র ব্যবহার করে, চন্দ্র ক্ষেত্রগুলিকেও (منا زل القمر Lunar Stations নক্ষত্র) ওরা সেইভাবে ব্যবহার করে। ক্রান্তিবৃত্ত যেমন রাশিচিহ্ন দ্বারা ১২টি সমান ভাগে বিভক্ত, চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্র বা চন্দ্রপত্নী দ্বারাও তেমনি ক্রান্তিবৃত্ত ২৭টি সমানভাগে বিভক্ত। প্রতিক্ষেত্রে ১৩$\frac{1}{3}$ ডিগ্রী অথবা ক্রান্তিবৃত্তের ৮০০ মিনিট জুড়ে বিস্তৃত। গ্রহগুলি যে সব ক্ষেত্রে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করে, তার উত্তর ও দক্ষিণের অক্ষাংশ ধরে চলাচল করে জ্যোতিষীরা রাশিচিহ্নের মত প্রতিটি নক্ষত্রেও বিশেষ বিশেষ চরিত্র, স্বভাব, শুভাশুভ নির্ণয় ক্ষমতা ও প্রকৃতি আরোপ করে থাকে।

ক্ষেত্রগুলির এই বিশেষ সংখ্যা অবলম্বন করার কারণ যে ২৭$\frac{1}{3}$ দিনে চন্দ্র সমস্ত ক্রান্তিবৃত্তটি অতিক্রম করে, $\frac{1}{3}$ ভগ্নাংশটি এখানে গ্রহণীয় নয়। আরবরা যেমন চন্দ্রের পশ্চিমে প্রথম দৃশ্যমান হওয়া থেকে নিয়ে পূর্বে অদৃশ্য হয়ে
৪১২ যাওয়া পর্যন্ত তার অবস্থান ক্ষেত্রের সংখ্যা ধার্য করে তার প্রক্রিয়া হোল : পরিধির সাথে এক চান্দ্রমাসে চন্দ্রের আবর্তন সংখ্যা যোগ দেওয়া হোক এবং যোগফল থেকে 'আল্‌মিহাক্‌ক' (ক্ষয়প্রাপ্ত চন্দ্রকলা) এর দুইটি বিশেষ দিনের (চন্দ্রোদয়ের ২৮ ও ২৯তম দিবস) আবর্তন সংখ্যা বিয়োগ করা হোক। অবশিষ্ট সংখ্যাকে চন্দ্রের প্রাত্যহিক আবর্তন সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেয়া হোক। তাহলে ২৭ ও $\frac{1}{3}$ এর সামান্য বেশী ভাগফল পাওয়া যাবে। এই ভগ্নাংশকে পূর্ণদিবস বলে ধরতে হবে।

আরবরা অবশ্য নিরক্ষর জাতি; লেখা বা হিসাব রাখার ক্ষমতা তাদের নাই। তারা কেবল সংখ্যা ও বাহ্য দৃশ্যের উপর নির্ভর করে। কারণ দর্শন ভিন্ন গবেষণার জন্য কোনও পদ্ধতি তাদের জানা নাই এবং তন্মধ্যস্থিত স্থির তারকা ব্যতিরেকে চন্দ্রের অবস্থান ক্ষেত্রগুলি নিরূপণ করতেও ওরা পারে না। চন্দ্রক্ষেত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করার সময়ে হিন্দুরা কতকগুলি তারকা সম্বন্ধে আরবদের সঙ্গে একমত, কিন্তু কতকগুলির সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করে। তবে আরবরা চান্দ্রকক্ষার খুব বেশী দূরে যায় না। আর তার

অবস্থিতিক্ষেত্র বর্ণনাকালে কেবল সেইসব স্থির নক্ষত্রেরই উল্লেখ করে যেগুলি হয় চন্দ্রের সঙ্গে সময় বিশেষে সংযোগ হয়, নয়ত তার সমীপবর্তী হয়।

হিন্দুরা এই নিয়ম আবশ্যিকভাবে পালন করে না, বরঞ্চ একটি তারকা অন্য তারকার সম্মুখবর্তী বা তার সুবিন্দুতে অবস্থিত কিনা তা বিবেচনা করে। তা ছাড়া 'অভিজিৎ' (পতনোন্মুখ শ্যেন نسر الواقع) নামক তারকাকেও ওরা একটি ক্ষেত্ররূপে গণ্য করে। তার ফলে ক্ষেত্রসংখ্যা হয় ২৮।

এরই জন্য আমাদের জ্যোতিষী ও নক্ষত্র পরিচায়ক পুস্তক রচয়িতারা বিভ্রান্ত হয়ে বলেছেন যে, হিন্দুদের মতে চন্দ্রের ক্ষেত্র হচ্ছে ২৮ এবং যে ক্ষেত্রটি সদা-সর্বদা সূর্যকিরণে আচ্ছন্ন থাকে সেটি ওরা গণনার মধ্যে ধরে না। মনে হয় যেন এইসব লেখকরা শুনেছিলেন যে, চন্দ্র যে ক্ষেত্রে অবস্থান করে তাকে হিন্দুরা 'জলন্ত' বলে। যে ক্ষেত্র সবেমাত্র অতিক্রম করেছে তাকে (مفترقا بعد العناق) 'আলিঙ্গনান্তে পরিত্যক্তক্ষেত্র' বলে আর সম্মুখস্থ ক্ষেত্রকে 'ধূমায়িত ক্ষেত্র' বলে থাকে। আমাদের মুসলমান লেখকদের কেউ কেউ বলে থাকেন যে হিন্দুরা অল্-জুবানা (الزبانى) নামক চন্দ্রের ১৬শ ক্ষেত্রটি গণ্য করে না, এবং এই বলে তার কৈফিয়ৎ দেয় যে চন্দ্রকক্ষার 'জলন্ত' ক্ষেত্র হচ্ছে তুলারাশির শেষে আর বৃশ্চিকরাশির গোড়ায়।

এই লেখকদের এইসব উক্তি তাদের একটি মৌলিক ধারণার ফল। সে ধারণাটি হোল এই যে হিন্দুদের মতে চন্দ্রের ২৮টি ক্ষেত্র (চন্দ্রপত্নী) আছে এবং বিশেষ অবস্থায় তার থেকে একটি ক্ষেত্র ওরা বাদ দিয়ে থাকে। আসলে ব্যাপার কিন্তু ঠিক তার বিপরীত; হিন্দুদের চন্দ্রক্ষেত্র আসলে ২৭টিই, এবং বিশেষ অবস্থায় তার সঙ্গে ওরা আর একটি ক্ষেত্র যোগ করে, বাদ দেয় না।

ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন যে 'বেদে' এক মেরু পর্বতবাসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে সে দুইটি সূর্য, দুইটি চন্দ্র ও ৫৪টি চন্দ্রক্ষেত্র দেখতে পায়, আর তার দিবসের সংখ্যাও আমাদের দিবস সংখ্যার দ্বিগুণ। এ সংবাদ দিয়ে ব্রহ্মগুপ্ত তাকে খণ্ডন করেছেন এই বলে, যে আমরা মেরুর 'মৎস' (? ধ্রুব ?) টিকে ত প্রত্যহ দুইবার আবর্তিত হতে দেখি না, একবারই আবর্তিত হতে দেখি।

ব্রহ্মগুপ্তের এই প্রলাপোক্তির অর্থভেদ বা যুক্তি নির্ণয় করার ক্ষমতা
৪১৩ আমার অন্তত নাই।

চন্দ্রক্ষেত্রে কোনও বিশেষ তারকার স্থান বা বিশেষ ডিগ্রী নির্ধারণ করার প্রকৃত নিয়ম হচ্ছে: 'মেষরাশি থেকে সে তারকাটির দূরত্ব মিনিটে নির্ধারণ

কর। পরে তাকে ৮০০ দিয়ে ভাগ কর। যে চন্দ্রক্ষেত্রে তারকাটি তখন অবস্থিত, তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের মিনিট সংখ্যা থেকে এই ভাগফল পাওয়া যাবে। সেই ক্ষেত্রের কত ভাগ সে তারকাটি অতিক্রম করেছে তা নির্ণয় করা কেবল বাকী থাকে। তা কয়েকভাগে ভাগ করা যায়; ক্ষেত্রের ৮০০ ভাগ অনুযায়ী তারকা বা ডিগ্রীর যথাযথ স্থান নির্ধারণ করে নিয়ে তাকে সাধারণ হর (denominator) দিয়ে ছোট করে নিয়ে কিম্বা কেবল ডিগ্রীকে মিনিটে পরিণত করে নিয়ে অথবা ডিগ্রীকে ৬০ দিয়ে পূরণ করে পূরণফলকে ৮০০ দিয়ে ভাগ দিয়ে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তা হবে ক্ষেত্রের সেই অংশটুকু যা চন্দ্র সেই মুহূর্তে পর্যন্ত অতিক্রম করে গেছে, অবশ্য ক্ষেত্রকে যদি ৬০ ভাগের একভাগ হিসাবে ধরা হয়।

তবে গণনায় এই পদ্ধতি চন্দ্রের জন্যও যেমন উপযোগী গ্রহ ও অন্যান্য তারকার জন্যও তেমনই উপযোগী। কিন্তু নিম্নের এই প্রক্রিয়াটি কেবল চন্দ্রের উপরই প্রযোজ্য : চন্দ্রক্ষেত্রের অনতিক্রান্ত অংশকে ৬০ দিয়ে গুণ করে যে অংক পাওয়া গেল তাকে চন্দ্রের 'ভুক্তি' দিয়ে ভাগ দিতে হবে। তাহলে চন্দ্রের ক্ষেত্রদিবসের কত অংশ গত হয়েছে ভাগফল থেকে তা জানা যাবে।

স্থির নক্ষত্রের ব্যাপারে হিন্দুদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। ওদের মধ্যে এমন কাউকে আমি পাইনি যে চন্দ্রক্ষেত্রের নক্ষত্রগুলিকে চাক্ষুষভাবে চেনে এবং অঙ্গুলি দিয়ে দেখাতে পারে। এ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি এবং নানা প্রকারের হিসাব ও বিচার করে নানাভাবে অধিকাংশ প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছি। আমার সেসব চেষ্টার ফল 'চন্দ্রের ক্ষেত্রনির্ধারণ' নামক একটি প্রবন্ধে আমি একত্রিত করেছি। এ প্রসঙ্গে হিন্দুদের মতামত ও উক্তির যথাযোগ্য উল্লেখ এখন করব। তার পূর্বে 'খণ্ডখাদ্যক' অনুসারে চন্দ্রক্ষেত্রগুলির দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা ও সংখ্যার বর্ণনা করব। পর পৃষ্ঠায় দেয়া সারণীতে তা সহজবোধ্য করে দেখাচ্ছি :

সারণী

	চন্দ্রক্ষেত্রের ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্রের (চন্দ্রপঙ্‌ক্তিগণের) নাম	তাদের তারকার সংখ্যা	দ্রাঘিমা: রাশি	দ্রাঘিমা: ডিগ্রী	দ্রাঘিমা: মিনিট	অক্ষাংশ: ভাগ	অক্ষাংশ: মিনিট	অক্ষাংশের দিক	মন্তব্য: মুসলমান জ্যোতিষ তালিকা মতে তাদের সম্ভাব্য নাম ও বর্ণনা
৪১৪	১	অশ্বিনী	২	০	৮	০	১০	০	উত্তর	অল্-শরত্বান الشرطان
৪১৫	২	ভরনী	৩	০	২০	০	১২	০	উত্তর	অল্-বুত্বয়ন البطين
	৩	কৃত্তিকা	৬	১	৭	২৮	৫	০	উত্তর	অল্ সুরাইয়া الثريا
	৪	রোহিনী	৫	১	১৯	২৮	৫	০	দক্ষিণ	বৃষের মস্তক সদৃশ তারকাসহ অল দব্রান الدبران
	৫	মৃগশীর্ষ	৩	২	৩	০	৫	০	দক্ষিণ	অল্ হক্ক্'আ الهقعة
	৬	আর্দ্রা	১	২	৭	০	১১	০	দক্ষিণ	অজ্ঞাত, খুব সম্ভব অল-শামিয়া
	৭	পুনর্বসু	২	৩	৫	০	৬	০	উত্তর	অল্-দিরা الذراع
	৮	পুষ্য	১	৩	১৬	০	০	০	নিরক্ষ	অল্-নথ্রা النثرة
	৯	আশ্লেষ	৬	৩	১৮	০	৬	০	দক্ষিণ	অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ কর্কটের মধ্যেকার দুই ও তার বাইরের চারটি তারকা।
	১০	মঘা	৬	৪	৯	০	০	০	নিরক্ষ	অল্-জব্হা ও অন্য দুইটি তারকা।
	১১	পূর্ব-ফালগুনী	২	৪	২৭	০	১২	০	উত্তর	অল্ জুব্রা
	১২	উত্তর ফালগুনী	২	৫	৫	০	১৩	০	উত্তর	অল্-যফীরার তৃতীয় তারকাসহ অল্-স্বর্ফা।
	১৩	হস্ত	৫	৫	১০	০	১১	০	দক্ষিণ	অল্-গুরাবের তারকা সকল
	১৪	চিত্রা	১	৬	৩	০	২	০	দক্ষিণ	অল্ সিমাকল্-আ'যল্
	১৫	স্বাতী	১	৬	১৯	০	৩৭	০	উত্তর	অল্-সিমাকির্রামেহ্
	১৬	বিশাখা	২	৭	২	৫	১	০	দক্ষিণ	অজ্ঞাত
	১৭	অনুরাধা	৪	৭	১৪	৫	৩	০	দক্ষিণ	'মুকুট' ও অন্য আর একটি তারকা।
	১৮	জেষ্ঠ	৩	৭	১৯	৫	৪	০	দক্ষিণ	কর্কটের বক্ষদেশ
	১৯	মূলা	২	৮	১	০	৯	৩০	দক্ষিণ	অল্ শৌলা الشولة
	২০	পূর্বাষাঢ়	৪	৮	১৪	০	০	২০	দক্ষিণ	অল্-নেয়ামুল আওয়ারিদ (النعام الاوارد)

চন্দ্রক্ষেত্রের ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্রের (চন্দ্রপঙ্‌ক্তিগণের) নাম	তাদের তারকার সংখ্যা	দ্রাঘিমা			অক্ষাংশ		অক্ষাংশের দিক	মন্তব্য ঃ মুসলমান জ্যোতিষ তালিকা মতে তাদের সম্ভাব্য নাম ও বর্ণনা
			রাশি	ডিগ্রী	মিনিট	ভাগ	মিনিট		
২১	উত্তরাষাঢ়	৪	৮	২০	০	৫	০	দক্ষিণ	অল্ নেআমুল স্বাদির
২২ } ০	অভিজিৎ	৩	৮	২৫	০	৬২	০	উত্তর	অল নসবাল্ ওয়াক্কি
২৩ } ২২	শ্রাবণ	৩	৯	৮	০	৩০	০	উত্তর	অল্ নসরালত্বাযির্
২৪ } ২৩	ধনিষ্ঠা	৫	৯	২০	০	৩৬	০	উত্তর	অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ Dalphin
২৫ } ২৪	শতভিষজ	১	১০	০	০	০	১৮	দক্ষিণ	অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ কুম্ভের জঙ্ঘা।
২৬ } ২৫	পূর্ব ভাদ্রপাদ	২	১০	২	০	২৬	০	উত্তর	অজ্ঞাত।
২৭ } ২৬	উত্তর ভাদ্রপাদ	২	১০	৬	০	২৬	০	উত্তর	সম্ভবতঃ অল ফারম্বল আজম
২৮ } ২৭	রেবতী	১	০	০	০	০	০	নিরক্ষ	অজ্ঞাত। খুব সম্ভব মীনের মধ্যবর্তী সূত্র। خيط الكان

৪১৬ নক্ষত্র সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা পরিষ্কার নয়। বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরিক্ষায় ওদের তেমন পারদর্শিতা নাই। স্থির তারকাগুলির গতিও ওরা বোঝে না। যেমন 'সংহিতা' পুস্তকে বরাহমিহির বলছেন ঃ রেবতী ও মৃগশীর্ষ যার প্রথমে ও শেষ আছে সেই ছয়টি ক্ষেত্রে গণনার পূর্বে পর্যবেক্ষণ বিধেয়। কেননা, দৃশ্যতঃ চন্দ্র তার প্রত্যেকটিতে গণিতাগত সময়ের পূর্বে প্রবেশ করে। আর্দ্র থেকে অনুরাধা পর্যন্ত যে বারটি ক্ষেত্র আছে তাতে চন্দ্রের প্রবেশ গণিতাগত সময়ের প্রায় অর্ধক্ষেত্র পূর্বে হয়। দৃশ্যতঃ চন্দ্র যখন ক্ষেত্রের কেন্দ্রে থাকে, গণনানুযায়ী তখন তার সে ক্ষেত্রের গোড়ায় থাকার কথা। আর জ্যেষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে উত্তরভাদ্রপদা পর্যন্ত যে নয়টি ক্ষেত্র তাতে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ গণনার চেয়ে বিলম্বিত হয়ে যায়; প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চন্দ্র যখন দৃশ্যতঃ প্রবেশ করে তখন গণনানুযায়ী পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য চন্দ্রের সে ক্ষেত্র ত্যাগ করার কথা।

নক্ষত্র সম্পর্কে হিন্দুদের অস্পষ্ট ধারণা সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য উপরে করেছি তা যে যথার্থ বরাহমিহিরের এই উক্তিতেই তা পাওয়া যাবে, যদিও হিন্দুরা নিজেসে অস্পষ্টতা সম্বন্ধে সচেতন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, (الشرطين) অল-শরতয়ন (অশ্বিনীদ্বয়) নামক উপরোক্ত ষড়ক্ষেত্রের একটির সম্বন্ধে বরাহ-মিহিরের উক্তি নেওয়া যেতে পারে। তিনি বলছেন, এই ক্ষেত্রটিতে চন্দ্রের প্রবেশ গণিতাগত সময়ের পূর্বে দেখা যায়। আমাদের কালে এই দুইটি নক্ষত্র মেষরাশির ⅔ ভাগে আছে অর্থাৎ মেষরাশির ১০°—২০° মধ্যে। আমাদের কাল থেকে বরাহমিহিরের কাল ৫২৬ বৎসর পূর্বে ছিল। সুতরাং যে নিয়ম ধরেই স্থির নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করা হোক না কেন বরাহমিহিরের কালে 'অশ্বিনীদ্বয়' মেষরাশির ⅓ এর চেয়ে বেশী অগ্রসর নিশ্চয় হয়নি।

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তাঁর সময়ে 'খণ্ডখাদ্যকে'র বর্ণনানুসারে অশ্বিনীদ্বয় মেষরাশির উপরোক্ত স্থানেই, ১০°—২০° ডিগ্রীর মধ্যে বা তার নিকটেই ছিল এবং তদনুযায়ী গণনা করে সূর্য চন্দ্রের অবস্থান ও শুদ্ধভাবেই নির্ধারণ করা গেল, তাহলেও একথা ত নিশ্চিত যে আমাদের কালে যা পরিজ্ঞাত হয়েছে সেকালে তা অজ্ঞাত ছিল, অর্থাৎ নক্ষত্রসমূহের ৮ ডিগ্রী পশ্চাদাবর্তন। তাহলে বরাহমিহিরের কালে কি করে দৃষ্ট সময় গণিত সময়ের অগ্রবর্তী হতে পারে, যখন অশ্বিনীদ্বয়ের সাথে সংযোগের পূর্বেই চন্দ্র প্রথম ক্ষেত্রটির প্রায় ⅓ ভাগ অতিক্রম করে এসেছিল? বরাহমিহিরের অন্য উক্তিগুলির মূল্যও এই রকম।

রাশিচিহ্নের আকৃতি অনুযায়ী চন্দ্র ক্ষেত্রগুলির অল্প বা অধিক আয়তন হয়, তাদের নিজেদের দৈর্ঘ বা ক্ষুদ্রতার জন্য নয়; কেননা, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রই ক্রান্তিবৃত্তের সমান স্থান অধিকার করে আছে। এই তথ্যটি হিন্দুরা যেন জানে
৪১৭ না, অবশ্য সপ্তর্ষি প্রসঙ্গে আমি এদের অনুরূপ ধারণার কথা পূর্বেও বলেছি।

'উত্তর খণ্ড খাদ্যক' নামক 'খণ্ডখাদ্যকে'র সংশোধন পুস্তকে ব্রহ্মগুপ্ত লিখেছেন: "কয়েকটি ক্ষেত্রের আয়তন চন্দ্রের প্রাত্যহিক মধ্য গতির প্রায় অর্ধেক বেশী। সে ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকের পরিমাণ ১৯° ৪৫′ ৫২″ ১৮‴। ক্ষেত্র-গুলি এই: রোহিনী, পুনর্বসু, উত্তরাফাল্গুনি, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরাভাদ্রপদা। তাদের সর্বমোট আয়তন হচ্ছে ১১৮° ৩৫′ ১৩″ ৪৮‴। আরও ছয়টি ক্ষেত্র আছে, স্বল্পায়তন, চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতির অর্ধপরিমাণ। তাদের আয়তন হচেছ ৬° ৩৫′ ১৭″ ২৬‴। এদের নাম ভরনী, আর্দ্রা, অশ্লেষা, স্বাতী, জ্যেষ্ঠা ও শতভিষজ, তাদের সর্বমোট আয়তন ৩৯° ৩১′ ৪৪″ ৩৬‴।

অবশিষ্ট পনেরোটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটির বিস্তার চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতির সমান। তদনুযায়ী তাদের প্রত্যেকের বিস্তার হবে ১৩° ১০′ ৩৪″ .৫‴ এবং তাদের সর্বমোট আয়তন হচ্ছে ১৯৭° ৩৮′ ৪৩″। তিনশ্রেণীর এই ক্ষেত্রগুলির সর্বমোট বিস্তার ৩৫৫° ৪৫′ ৪১″ ২৬‴ এবং সম্পূর্ণ বৃত্তের অবশিষ্ট বিস্তার হচ্ছে ৪° ১৪′ ১৮″ ৩৬‴। এইটি হচ্ছে অভিজিতের বিস্তার, যা গণনায় ধরা হয় না।" আমার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বিষয়টিকে সরলভাবে উপস্থাপিত করেছি

স্থির নক্ষত্রের গতি সম্বন্ধে হিন্দুদের অল্পজ্ঞানের দৃষ্টান্ত 'সংহীতা' পুস্তকে লিখিত বরাহমিহিরের এই উক্তিতেও পাওয়া যাবে। প্রাচীনদের পুস্তকাদিতে উল্লিখিত হয়েছে যে উত্তর অয়নান্ত অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্ধভাগে আর দক্ষিণ অয়নান্ত ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের প্রথমভাগে হয়েছে। তাঁদের কালে তাই-ই সত্য ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে উত্তর অয়নান্ত কর্কটরাশির প্রথমভাগে আর দক্ষিণ অয়নান্ত মকররাশির প্রথমভাগে হয়। কেউ যদি এতে সন্দেহ করে এবং আমার কথার চেয়ে প্রাচীনদের কথাই বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তাহলে সে
৪১৮ উত্তর অয়নান্ত আসন্ন হলে কোনও সমতল স্থানে গিয়ে ভূমিতে একটি বৃত্ত আঁকুক এবং সে বৃত্তের কেন্দ্রে কোনও লোককে দিগন্তের সাথে লম্বরেখায় (perpendicular) দাঁড় করাক। লোকটি ছায়াপ্রান্তকে চিহ্নিত করে রাখুক এবং সে চিহ্ন থেকে রেখা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে টেনে এনে বৃত্তের পরিধিতে যুক্ত করুক। পরদিনও ঠিক একই সময়ে আবার এইরূপ করুক এবং চিহ্নগুলি লক্ষ্য করুক। যদি সে দেখে যে ছায়াপ্রান্ত প্রথম দিনের চিহ্ন থেকে দক্ষিণের দিকে সরে যাচ্ছে তাহলে সে বুঝবে যে সূর্য উত্তরে সরে গেছে বটে; কিন্তু তখনও ক্রান্তিবিন্দু অতিক্রান্ত হয়নি। কিন্তু যদি সে দেখে যে ছায়াপ্রান্ত উত্তরের দিকে সরে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে সূর্য দক্ষিণঅয়ন আরম্ভ করেছে এবং তার ক্রান্তিবিন্দু অতিক্রম করে গেছে। এইভাবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে অয়নান্ত দিবস যদি কেউ বের করে, তাহলে সে দেখবে যে আমি যা বলছি তাই ঠিক।

এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে বরাহমিহির স্থির নক্ষত্রগুলির পূর্বাভিমুখী গতির সংবাদ মোটেই জানতেন না। তাদের নামানুসারে তিনি নক্ষত্রগুলিকে স্থির নিশ্চল বলে মনে করেছেন এবং অয়নান্তকে তিনি পশ্চিমাভিমুখী গতি বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি চন্দ্রক্ষেত্রের ব্যাপারে দুইটি জিনিসকে গুলিয়ে ফেলেছেন, যা আমরা

এখন পৃথক করার চেষ্টা করব যাতে সংশয় দূর হতে পারে এবং বক্তব্য সুসংবদ্ধ হয়।

রাশিচক্রের ক্রমগণনায় আমরা ক্রান্তিবৃত্তের সেই বিশেষ দ্বাদশতম ভাগটি দিয়ে আরম্ভ করি, যেটি বিষুবের পূর্বগামী গতি অনুযায়ী বিষুবরেখা ও ক্রান্তিবৃত্তের সংযোগবিন্দুর উত্তরে অবস্থিত। সেইজন্য উত্তর অয়নান্ত (منقلب الصيفى) সর্বদাই চতুর্থ রাশিচিহ্নের প্রথমভাগে, আর দক্ষিণ অয়নান্ত (منقلب اشاوى) দশম রাশি-চিহ্নের প্রথমভাগে হয়ে থাকে।

আর ক্রান্তিবৃত্তের যে ২৭তম ভাগ রাশিচক্রের প্রথমচিহ্নের প্রথমভাগে পড়ে তা দিয়ে আমরা চন্দ্রক্ষেত্রের ক্রমগণনা আরম্ভ করি। সেইজন্য উত্তর অয়নান্ত সর্বদাই সপ্তমক্ষেত্রের তিন-চতুর্থাংশে আর দক্ষিণ অয়নান্ত ২৭তম ক্ষেত্রের প্রথম চতুর্থাংশে পড়ে। জগৎ যতদিন থাকবে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

এখন, চন্দ্রক্ষেত্রগুলি যদি নক্ষত্র দ্বারা চিহ্নিত হয়, আর নক্ষত্রের বিশেষ নামানুযায়ী যদি তাদের নামকরণ হয়, তাহলে নক্ষত্রগুলির সঙ্গে সেই ক্ষেত্রগুলিরও স্থান পরিবর্তিত হতে থাকবে। প্রাচীনকালে রাশিচিহ্নের ও চন্দ্রক্ষেত্রের নক্ষত্রগুলি ক্রান্তিবৃত্তের প্রাথমিক (পশ্চিম, ভাগগুলিতে ছিল। পরে
৪১৯ ক্রমশঃ তাদের বর্তমান স্থানে তারা সরে এসেছে এবং ভবিষ্যতে তারা ক্রান্তিবৃত্তের অবশিষ্ট নয় ভাগের পরবর্তী তিন ভাগে অর্থাৎ আরও পূর্ববর্তী ভাগে সরে যাবে এবং কালক্রমে সম্পূর্ণ বৃত্তটি তারা এইভাবে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

হিন্দুদের ধারণা মতে 'অশ্লেষা' ক্ষেত্রের নক্ষত্রগুলি কর্কটরাশির ১৮ ডিগ্রীতে থাকে। অতএব, প্রাচীনদের অবলম্বিত বিষুবের পূর্বগামী গতির বেগ অনুসারে ২৮০০ বৎসর পূর্বে এই নক্ষত্রগুলি চতুর্থরাশির আদিতে ছিল আর কর্কটচিহ্ন ছিল তৃতীয়রাশিতে যাতে তখন অয়নান্ত ছিল। অয়নান্ত এখনও সেই একই স্থানে আছে, কিন্তু নক্ষত্রগুলি স্থান পরিবর্তন করেছে, অর্থাৎ বরাহমিহিরের কল্পিত সিদ্ধান্তের ঠিক বিপরীত।

সাতান্ন অধ্যায়

রবিকিরণান্তরালে নক্ষত্রের আবির্ভাব ও তৎকালীন পালনীয় ক্রিয়াকর্ম

হিন্দুরা নক্ষত্র ও নতুন চন্দ্রোদয়ের নির্ধারণের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, আমার মনে হয় তাই সিন্দহিন্দে বর্ণিত হয়েছে। দিবালোকে দৃশ্যমান হওয়ার জন্য সূর্য থেকে নক্ষত্রের যে দূরত্ব প্রয়োজন তার ডিগ্রীকে হিন্দুরা 'কালাংশক' বলে। গুররাতুল-যিজাত্ (غرةالزيجت) নামক পুস্তক লেখকের বর্ণনানুযায়ী সেগুলি হচ্ছে সুহাইল (অগস্ত্য) অল্-ওয়াকি্ (অভিজিৎ), অল-ইয়ামানিয়া (মৃগব্যাধ) অল-অয়য়ক (মকর) চিত্রা ও স্বাতী এবং জ্যেষ্ঠা। এগুলির কালাংশক ১৩ ডিগ্রী। আর ভরনী; মৃগশীর্ষ, পুষ্যা, অশ্লেষা, শতভিষজ এবং রেবতি; এইগুলির কালাংশক ২০° অন্যগুলির ১৪°।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নক্ষত্রগুলিকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অয়োনীয়রা যে সব নক্ষত্রকে আয়তন অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করত, সেগুলিকে এখানে প্রথমভাগে রাখা হয়েছে এবং অয়োনীয়দের তৃতীয় চতুর্থশ্রেণীর নক্ষত্রকে এখানে দ্বিতীয়ভাগে রাখা হয়েছে এবং তাদের পঞ্চম ও ষষ্ঠশ্রেণীকে তৃতীয়ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪২০ ব্রহ্মগুপ্ত খণ্ডখাদ্যকের শুদ্ধি পুস্তকে এই শ্রেনীবিভাগ উল্লেখ করলে ভাল হোত। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি মোটামুটিভাবে বলেছেন, দৃশ্যমান হওয়ার জন্য সূর্য থেকে সকল নক্ষত্রের দূরত্ব ১৪ ডিগ্রী হওয়া প্রয়োজন। বিজয়ানন্দ বলেছেন: কতকগুলি নক্ষত্র আছে যেগুলি সূর্যকিরণ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না, সূর্য তাদের জ্যোতিকে ম্লানও করে না। যেমন, অল-অয়য়ুক্ (মকর), স্বাতী, শ্রাবণ, অভিজিৎ, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদা। তার কারণ তাদের অক্ষাংশ উত্তরে বেশী এবং (পর্যবেক্ষকের) দেশের অক্ষাংশও বেশী। উত্তর অঞ্চলের দেশগুলিতে নক্ষত্রগুলি একই রাত্রির প্রথম ও শেষ যামে দেখা যায়, কখনও অদৃশ্য হয় না।

সুহায়ল্—অর্থাৎ 'অগস্ত্য'নক্ষত্রের উদয়কাল গণনার জন্য হিন্দুদের বিশেষ পদ্ধতি আছে। সূর্য যখন 'হস্ত' নক্ষত্রে প্রবেশ করে তখন ওরা অগস্ত্যকে প্রথম দেখে আর সূর্য রোহিণীতে প্রবেশ করলে তাকে আর দেখতে পায় না।

পলিশ বলছেন : 'সূর্যের অপদূরককে (اوج apsis) দ্বিগুণ কর, যদি তা সূর্যের সংস্কৃত অবস্থানের (مقوم الشمس corrected place) সমান হয় তাহলে বুঝতে হবে যে অগস্ত্যের অস্তমিত হবার সময় হয়েছে।'

পলিশের সিদ্ধান্তমতে সূর্যের অপদূরক হচ্ছে ২⅔ রাশি। তার দ্বিগুণ করলে কন্যারাশির ১০ ডিগ্রীতে পড়ে, যা 'হস্ত' নক্ষত্রের আরম্ভ। আর সূর্যের অর্ধেক অপদূরক বৃষের ১০ ডিগ্রীতে পড়ে, যা রোহিনী নক্ষত্রের আরম্ভ।

খণ্ড খাদ্যকের সংশোধন পুস্তকে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন : "অগস্ত্য এর অবস্থিতি হচ্ছে কালপুরুষের ২৭ ডিগ্রী তার দক্ষিণের অক্ষাংশ ৭১ ভাগ। দৃশ্যমান হওয়ার জন্য সূর্য থেকে তার দূরত্বের ডিগ্রী ১২ হতে হবে। (الشعر المالية) অথবা মৃগব্যাধের অবস্থিতি হচ্ছে কালপুরুষের ২৬ ডিগ্রী, তার দক্ষিণের অক্ষাংশ ৪০ ভাগ। তার দৃশ্যমান হওয়ার দূরত্বের ডিগ্রী১৩। তাদের উদয়ের সময় যদি তুমি জানতে চাও তাহলে সূর্য নক্ষত্রের স্থানে আছে বলে কল্পনা কর। দিবসের যতভাগ গত হয়েছে, নক্ষত্রটির দৃশ্যমান হওয়ার জন্য সূর্য থেকে তার দূরত্বের ডিগ্রীও তত হবে। ঐ স্থানে তার উধর্বগ (طالع-ascendeus) স্থির করে রাখ। সূর্য যখন এই উধর্বগের ডিগ্রীতে উপনীত হবে, নক্ষত্রটি তখন প্রথমবার দৃশ্যমান হবে। নক্ষত্রের অদৃশ্য হওয়ার সময় জানতে হলে, তার ডিগ্রীর সঙ্গে ছয়টি সম্পূর্ণ রাশি যোগ দাও। যোগফল থেকে দৃশ্যমান হওয়ার জন্য নক্ষত্রটির সূর্য থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্বের ডিগ্রী বাদ দাও। যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে তার উধর্বগ স্থির কর।
৪২১ সূর্য যখন এই উধর্বগের ডিগ্রীতে পেঁাছবে তখন নক্ষত্রটির অস্তমিত হওয়ার সময় হবে।"

'সংহীতা' পুস্তকে কতকগুলি যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া আছে, যা কয়েকটি বিশেষ নক্ষত্রের আবির্ভাব হলে করতে হয়। আমরা এখন সেগুলি বর্ণনা করব। নিরর্থক হলেও তার যথাযথ তর্জমা করব, কেননা তাই আমি কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছি।

বরাহমিহির বলেছেন, 'আদিতে যখন সূর্য উদিত হয়েছিল এবং নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে বিন্ধ্য পর্বতের সুবিন্দুতে এসে উপস্থিত হোল তখন বিন্ধ্য তার উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করল এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে সূর্যের পথরোধ করতে এগিয়ে এল, যাতে সূর্যের রথ তার উপর দিয়ে যেতে না পারে। বিন্ধ্য এত উঁচু হোল যে স্বর্গের নিকটবর্তী হোয়ে 'বিদ্যাধর' অর্থাৎ অশরীরি জীবদের আবাসের কাছাকাছি পেঁাছে গেল। তখন, রমণীয়

উদ্যান ও উপবন দেখে বিদ্যাধরেরা অবিলম্বে তথায় চলে গিয়ে পরম সুখে বাস করতে লাগল, তাদের স্ত্রীগণ সানন্দে ভ্রমণ করতে লাগল এবং তাদের সন্তানরা প্রফুল্লমনে ক্রীড়া করতে থাকল; তাদের কন্যাদের শ্বেতবস্ত্র বায়ু স্পর্শে পতাকার ন্যায় আন্দোলিত হতে লাগল। ভ্রমর নামক একপ্রকার জীবের আধিক্যবশতঃ (যারা পশুদের নখ দ্বারা গাত্র কুণ্ডয়নকালে উৎক্ষিপ্ত ধূলির লোভে তাদের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে থাকে) ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুরা বিন্ধ্যার গিরিকন্দরে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। ভ্রমরগুলি কামার্ত স্ত্রীহস্তিকে আক্রমণ করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বানর ও ভল্লুকসকল বিন্ধ্যার শিখরে ও চূড়ায় আরোহণ করতে দেখা যায় যেন উচ্চতার লোভে তারা আকাশগামী হচ্ছে। বিন্ধ্যায় প্রস্রবণ ও জলাশয়ে ফলমূল ভোজনতৃপ্ত তপস্বীদিগকে দেখা যায়। বিন্ধ্যার আরও যা (সৌন্দর্য) গরিমা আছে তা গণনার অতীত।

বরুণপুত্র অগস্ত্য বিন্ধ্যাগিরির এই সব আচরণ লক্ষ্য করে তার মনোবাঞ্ছা পূরণে স্বীয় সাহায্যের আশ্বাস দিল এবং ফিরে এসে তমসাবৃত অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করা পর্যন্ত নিজস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল। অগস্ত্য তারপর সমুদ্রে গিয়ে তার সমস্ত জল নিঃশেষে পান করে নিল। তার ফলে সমুদ্র অদৃশ্য হয়ে গেল এবং বিন্ধ্যাগিরির নিম্নভাগ বেরিয়ে পড়ল। তাতে 'মকর' ও জলজন্তুরা সংলগ্ন হয়েছিল। তারা পর্বতমূলে আঁচড়ে আঁচড়ে তার
৪২২ মধ্যে গহ্বর ও সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করল। সে সব গহ্বরে মণিমাণিক্য ও মুক্তা জমা হতে থাকল। এইসব রত্নাদির দ্বারা তার পর্বতের অভ্যন্তর ভাগ এবং পাদদেশে সমুৎপন্ন বৃক্ষাদি ও সর্পিলরেখায় ভ্রমণকারী উরগাদির দ্বারা তার উপরিভাগ সুসজ্জিত হোল। অগস্ত্যের হাতে এইভাবে উৎপীড়িত হওয়ায় ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিন্ধ্যা এইসব সম্পদ লাভ করল, যা দিয়ে দেবগণ তাদের মুকুট ও শিরস্ত্রাণ ভূষিত করেন তেমনই, সমুদ্র ও পাতালে তার জল অদৃশ্য হওয়ার ক্ষতিপূরণস্বরূপ ক্রীড়ারত ও মৎস্যের চাকচিক্য, তলদেশে মণিমুক্তার উৎপত্তি ও অবশিষ্ট জলে সর্প ও জলযানাদির ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ লাভ করল। যখন সে জলের উপরে মৎস্য, শঙ্খ ও শুক্তিরা ভাসে সমুদ্র তখন জলের শরৎ ও হেমন্তকালে শ্বেতকমলাবৃত সরোবরের ন্যায় মনে হবে; তখন জল ও নভোমণ্ডলের মধ্যে প্রভেদ করাও তোমার পক্ষে দুষ্কর হবে। কেননা আকাশ যেমন নক্ষত্রখচিত সমুদ্রও তেমনিই রত্নভূষিত, রবিকরজালের ন্যায় বহুশীর্ষ সর্পাদি সমুদ্রে আছে; চন্দ্রগোলকের ন্যায় স্ফটিক ও শুভ্র কুয়াশাও আছে, আকাশের মেঘ যার ঊর্ধ্বে থাকে। তাঁর স্তুতিপাঠ কেমন করে আমি না করি, যিনি এই

বিরাট কার্য করেছেন যিনি দেবগণকে মুকুটের ভূষণ শিখিয়েছেন, যিনি
সমুদ্র ও বিন্ধ্যাগিরিকে তাঁদের রক্ষাগার করেছেন। তিনি অগস্ত, যাঁর গুণে
সকল পার্থিব আবিলতা থেকে সলিল পবিত্র হয়, দুষ্ট লোকের সাহচর্যজনিত
মালিন্য থেকে সৎলোকের অন্তকরণ যেমন পবিত্র হয়। যখনই অগস্ত্য উদিত
হন এবং তাঁর আবির্ভূত থাকাকালে নদী ও উপত্যকার জল হ্রাস পায় তখনই
তুমি দেখ, নদীগুলি নানাপ্রকারের শ্বেত ও রক্ত কমল ও শালুক প্রভৃতি যা
কিছু তার জলের উপরে আছে, তা চন্দ্রকে নিবেদন করছে এবং তার জলে
সন্তরণশীল নানাবিধ হংস ও মরাল তাকে অর্ঘ্য দিচ্ছে, স্নানার্থিনী যুবতী
যেমন নদীতে নামার সময়ে ফুল ও নানাবিধ উপচার দিয়ে জল তর্পণ করে;
নদীর দুই তীরে উপবিষ্ট যুগল রক্তহংস ও নদীবক্ষে গীতরত শ্বেত
হংসগুলির ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, এই দুইটি দৃশ্যের উপমা আহ্লাদে হাস্যকালে
রূপসী নারীর ঈষদোন্মুক্ত ওষ্ঠধরাভ্যন্তরে দশনরাজি ব্যতীত আর কি হতে
পারে? বরঞ্চ শ্বেতপদ্মের বনে নীলোৎপল ও গন্ধলোভী ভ্রমরের তাতে ঝাঁপ
দেওয়াকে আমরা ঐ নারীর চোখের ভ্রূযুগলের রোমপরিবেষ্টিত শুভ্রতার
ভিতরে কৃষ্ণ তারকার সাথে তুলনা করব, যা চাপল্যে ও লাস্যে সতত চঞ্চল।
শুক্লতিথিতে সরোবরের অস্বচ্ছ জল যখন চন্দ্রকিরণে আলোকিত হয় এবং
ভ্রমরকে নিজ দেহে আবদ্ধ করার পর শ্বেতকমল আবার যখন উন্মিলিত হয়,
তখন তুমি সে দৃশ্যকে সুন্দরী রমণীর মুখ ভাববে, যে শুভ্র আঁখির কালো
৪২০ তারা দিয়ে তোমার দিকে চেয়ে আছে। বর্ষাকালের বৃষ্টিধারা যখন সর্প,
বিষ ও আবর্জনা সহ সে জলাশয়গুলিতে প্রবাহিত হয়, তখন ঊর্ধ্বে অগস্ত্যের
আবির্ভাব সমস্ত কলুষ ও দোষ থেকে তাকে মুক্ত করে। শাস্তিযোগ্য পাপীর
দ্বারে মুহূর্তকালের জন্য অগস্ত্যের নাম করলে যদি তার সমস্ত পাপ মুছে যায়
তাহলে পাপস্খলনে ও পুণ্য অর্জনে জিহ্বা দ্বারা তাঁর স্তুতিপাঠ আরও কত
বেশী সফল হবে? অগস্ত্যের উদয়কালে কি কি অর্ঘ্য দিতে হয় প্রাচীন ঋষিরা
তা উল্লেখ করেছেন। নৃপতিদের উপঢৌকন স্বরূপ আমি সে সবের বর্ণনা
করব এবং অগস্ত্যের উদ্দেশ্যে তাই হবে আমার অর্ঘ্য নিবেদন।'

তাই আমি বলছি: সূর্য্যালোক যখন পূর্বাকাশে ঈষৎ প্রকাশ পায় এবং
নিশার অন্ধকার পশ্চিমে জমা হতে থাকে, সেই মুহূর্তে অগস্ত্য উদিত হন।
তাঁর প্রথম আবির্ভাব বোঝা দুষ্কর; লক্ষ্য করলেও সকলে তা বুঝতে পারে না।
অতএব সে মুহূর্তে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা কর, কোন দিকে তিনি উদিত
হচ্ছেন। সেইদিকে তুমি অর্ঘ্য দাও। স্থানীয় বর্ণাঢ্য ও সুরভি ফুল যা তোমার

আছে তা মাটিতে বিছিয়ে দাও; তাতে তোমার সাধ্যমত স্বর্ণ, বস্ত্র, সামুদ্রিক রত্নাদি অর্পণ কর এবং ধূপ, কুংকুম, চন্দন, কস্তুরী ও কর্পূরসহ মহিষ, গাভী ও প্রচুর খাদ্য ও মিষ্ঠান্ন উৎসর্গ কর। জেনে রাখ, যে সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দৃঢ় বিশ্বাসে ও সত্যজ্ঞানে একাদিক্রমে সাত বৎসর এইরূপ করবে ক্ষত্রিয় হলে
৪২৪ সে অবশেষে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবে, ব্রাহ্মণ হলে তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, বেদজ্ঞ হবে ও সুন্দরী রমণী লাভ করবে এবং তার দ্বারা উন্নতমনা সন্তান পাবে, বৈশ্য হলে বহু সম্পত্তি লাভ করবে ও গ্রামপতির সম্মান পাবে, আর শূদ্র হলে সে ধন লাভ করবে। এরা সবাই স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অক্ষয় পুণ্যফল লাভ করবে।'

অগস্ত্যকে অর্ঘ্য দেওয়া সম্বন্ধে বরাহমিহির এই লিখেছেন। রোহিণী সম্পর্কিত বিধির বর্ণনাও উক্ত গ্রন্থে তিনি করেছেন। গর্গ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও পরাশর এঁরা তাঁদের শিষ্যবর্গকে বলেছেন যে, মেরু পর্বত সোনার পাতে নির্মিত। পাতগুলি থেকে নানা সুগন্ধি ফুল ও কলিযুক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছে। মধুর গুঞ্জন করে ভ্রমররা সর্বদা সে বৃক্ষগুলিকে ঘিরে রয়েছে এবং সে বৃক্ষরাজিতে দেবকন্যারা বাদ্যযন্ত্রসহ সুমধুর সুরে গান করতে করতে চিরানন্দে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। এই পর্বত নন্দনবন নামক স্বর্গের উদ্যানের সমতলভাগে অবস্থিত। তাঁরা (উক্ত ঋষিরা) বললেন, 'একদা বৃহস্পতি সেখানে ছিলেন; নারদ ঋষি তাঁকে রোহিণীর বর্ষফল বিচারের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করলেন। বৃহস্পতি তা বুঝিয়ে দিলেন।' আমি প্রয়োজনমত তা এখানে বর্ণনা করছি।

'আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের রোহিণীতে প্রবেশ লক্ষ্য করা হোক এবং নগরের উত্তরে বা দক্ষিণে কোনও উচ্চস্থান নির্বাচন করে নেওয়া হোক; রাজপুরীর ভারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ সে স্থানে গমন করুক এবং সেখানে অগ্নি জ্বালিয়ে তার চতুষ্পার্শ্বে রঙ দিয়ে গ্রহ ও নক্ষত্রের চিত্র অংকিত করুক; প্রত্যেক গ্রহনক্ষত্রের নির্দিষ্ট স্তোত্র পাঠ করুক এবং প্রত্যেকের প্রাপ্য ফুল, যব ও তৈল নিবেদন করে তাদের সন্তুষ্টির জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে থাকুক; অগ্নির
৪২৫ চতুষ্পার্শ্বে সাধ্যমত মণিমুক্তা, সুমিষ্ট জলপূর্ণ ঘট ও সে সময়ের ফল, ঔষধ, বৃক্ষপল্লব ও লতামূল থাকতে হবে; সেখানে গৃহাচ্ছাদনের জন্য কর্তিত ঘাসও বিছিয়ে রাখতে হবে। তারপর, নানাপ্রকারের বীজ ও শস্য একত্র করে জলে ধুয়ে তাতে একখন্ড স্বর্ণসহ একটি ঘটির মধ্যে রাখতে হবে। ঘটিকে একপার্শ্বে রেখে, 'হোম' অর্থাৎ দিক সম্পর্কিত বরুণমন্ত্র, 'বায়বমন্ত্র' সোমমন্ত্র নামক বেদের অংশ বিশেষ পাঠ করতে করতে অগ্নিতে যব ও ঘৃত আহুতি দিতে হবে;

একটি 'দণ্ড' অর্থাৎ দীর্ঘ ও উচ্চ বর্শা স্থাপন করতে হবে, যার মাথা থেকে দুইটি বস্ত্রের ফালি ঝুলানো থাকবে; একটির দৈর্ঘ্য 'দণ্ডের' সমান, অপরটির দৈর্ঘ্য তার তিনগুণ হবে। রোহিণীতে চন্দ্র প্রবেশ করার পূর্বেই এসব করে রাখতে হবে, যেন রোহিণীতে প্রবেশ করার মুহূর্তে বাতাসের বেগ ও গতি নির্ধারণ করার জন্য সে প্রস্তুত থাকে; বর্শাদণ্ডে ঝুলন্ত বস্ত্রের ফালি দ্বারা তা জানা যাবে। যদি সেদিন বাতাস দিকচতুষ্টয়ের ঠিক কেন্দ্র দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে তার ফল শুভ আর যদি তাদের কোণ থেকে প্রবাহিত হয় তার ফল অশুভ। যদি একই দিক থেকে প্রবলবেগে সমানভাবে বইতে থাকে তবে তার লক্ষণ শুভ। দিবসের আটভাগ দিয়ে এই বায়ুপ্রবাহের সময় পরিমাপ করা যায়; প্রত্যেক ভাগকে মাসার্ধ বা পক্ষকালের সমান ধরা হয়। তারপর চন্দ্র যখন রোহিণী থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে তখন এক পার্শ্বে রক্ষিত শস্যবীজগুলি লক্ষ্য করতে হবে। যে শস্যবীজটির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে, সে বৎসর ঐ শষ্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাবে। চন্দ্র যখন রোহিণীর নিকটবর্তী হবে তখনও লক্ষ করতে হবে। আকাশ স্বচ্ছ, কোনও দুর্যোগ নাই, বাতাস নির্মল, কোনও ক্ষতিকর আলোড়ন সৃষ্টি করে নি এবং পশুপক্ষীর রব শ্রুতিমধুর, এসব হলে সুলক্ষণ।

মেঘের লক্ষণ বিচার এইরূপ : উদরের নাড়ীর মত যদি মেঘ ভাসে, আর বিদ্যুৎ দৃষ্টিগোচর হয়, শ্বেতকমলের মত মেঘগুলি উন্মিলিত হতে থাকে ও সূর্যরশ্মির মত তা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে; মেঘ যদি অঞ্জন বর্ণ ধারণ
৪২৬ করে, ভ্রমর কিংবা কুঙ্কুমের ন্যায় তার বর্ণ হয়; যদি আকাশ মেঘে আবৃত হয়ে যায় এবং তার অন্তরাল থেকে স্বর্ণফলকের ন্যায় বিদ্যুৎ চমকায়; যদি অন্তরাগ ও নববধূর বস্ত্রের রঙে রঞ্জিত রামধনু দেখা দেয়; ময়ূরের কেকার ন্যায় অথবা (চাতক) পক্ষীর ন্যায়,—যে বৃষ্টিধারা ব্যতীত জলপান করতে পারে না আর যে তখন পূর্ণ জলাশয়ের উৎফুল্ল ভেকের মত মহোল্লাসে রব করতে থাকে—যদি মেঘ গর্জন করে; তুমি যদি দেখ যে আকাশ দাবানলে-দগ্ধ-উপবনে ক্ষিপ্ত হস্তী ও মহিষদের ন্যায় অশান্ত, মেঘের গতি যদি গজেন্দ্রের ন্যায় হয়; মুক্তা, শঙ্খ ও তুষার এমন কি চন্দ্রকিরণের মত যদি মেঘের আভা হয়, মনে হয় যেন চন্দ্র তার দীপ্তি ও ঐশ্বর্য মেঘকে ধার দিয়েছে; তাহলেই এসব প্রচুর বৃষ্টিপাত ও সুফলের লক্ষণ হবে।'

আরও বলা হয়েছে : 'ব্রাহ্মণ যে সময়ে জলের ঘড়াগুলির সমক্ষে উপবিষ্ট আছে, সে সময়ে নক্ষত্র পতন, বিদ্যুৎস্ফুরণ, বজ্রপাত, নভোমণ্ডলের রক্তিম

আভা ধারণ, অথবা ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি ও হিংস্র পশুর চিৎকার হলে কুলক্ষণ মনে করতে হবে।

যদি উত্তরদিকে স্থাপিত ঘটগুলির মধ্যে কোনটির জল নীচে ছিদ্র থাকার দরুন কিংবা ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে গিয়ে কমে যায়, তাহলে শ্রাবণমাসে বৃষ্টিপাত হবে না; পূর্বদিকের কোনও ঘড়ার জল যদি এইভাবে কমে যায়, তাহলে ভাদ্রপদ শুষ্ক থাকবে; জল যদি দক্ষিণের কোনও ঘড়া থেকে কমে, তাহলে 'অশ্বয়ুজ' মাসে বৃষ্টিপাত হবে না; আর যদি পশ্চিমের ঘড়ার জল কমে তাহলে কার্তিকে বৃষ্টিপাত হবে না। আর যদি কোনও ঘড়ার জল না কমে তাহলে গ্রীষ্মকালে সুবৃষ্টি হবে।

এই ঘটগুলি দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের বর্ষফলও ওরা গণনা করে থাকে। উত্তর দিকে রক্ষিত ঘট ব্রাহ্মণের, পূর্বদিকের ঘট ক্ষত্রিয়ের, দক্ষিণের ঘট বৈশ্যের আর পশ্চিমে রক্ষিত ঘটটি শূদ্রের। তেমনই, ঘড়ার গায়ে যদি বিভিন্ন জাতির নাম ও অবস্থাদি লেখা থাকে, ঐ গড়ার যে অবস্থা ঘটবে—যেমন ভেঙ্গে যাওয়া বা তার জল কমে যাওয়া—তা সেই জাতি বা বর্ণের আসন্ন অবস্থার লক্ষণ বলে ধরা হয়।

৪২৭ 'স্বাতি' ও 'শ্রাবণ' নক্ষত্রের লক্ষণ বিচারের নিয়ম 'রোহিণী'র মত। 'আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে, চন্দ্র যখন দুই আষাঢ় নক্ষত্রের (পূর্ব ও উত্তরাষাঢ়) একটিতে অবস্থান করছে, রোহিণী প্রসঙ্গে যেমন স্থান নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, তেমন একটি স্থান নির্বাচন করে নাও এবং স্বর্ণনির্মিত তুলাযন্ত্র সঙ্গে নাও। তুলাযন্ত্রটি স্বর্ণের হওয়াই উত্তম; রৌপ্যনির্মিত হলে মধ্যম; তাও যদি না হয় তাহলে 'খয়ের' নামিত কাষ্ঠ দিয়ে নির্মাণ করে নাও (খয়ের মনে হয় আসলে 'খদির'), অথবা যে বাণ দিয়ে কোন মানুষকে বধ করা হয়েছে সে বাণের ফলক দিয়েও তুলাযন্ত্রটি নির্মাণ করা যেতে পারে। তুলাদণ্ডটির ন্যূনতম দৈর্ঘ হবে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অন্তর্বর্তী দূরত্বের সমান; তার চেয়ে বড় হলে আরও ভাল, কিন্তু ছোট হওয়া অশুভ। তুলাযন্ত্রে চারিটি সূতা থাকবে, প্রত্যেকটি দশ অঙ্গুলি লম্বা। পাল্লা দুটি হবে ছয় অঙ্গুলী পরিমাণ সূতীবস্ত্রের। আর বাটখারা দুটি স্বর্ণের হতে হবে।

'এই যন্ত্র দিয়ে কূপের জল, পুষ্করিণীর জল, নদীর জল, গজদন্ত, অশ্বলোম, রাজনামাঙ্কিত স্বর্ণখণ্ড, অন্য কোনও ব্যক্তি বা পশু বা বর্ষদিবস, দিক বা দেশের নামোচ্চারিত অন্যান্য ধাতুখণ্ড, এই জিনিসগুলির প্রত্যেকটির সমান ভাগ ওজন করে নাও। ওজন করার সময়ে পূর্বদিকে মুখ কর; বাটখারাকে

দক্ষিণ পাল্লায়, আর তুল্যদ্রব্যকে বাম পাল্লায় রাখ; তার উপরে তুমি মন্ত্রপাঠ কর এবং তুলাযন্ত্রকে সম্বোধন করে বল : 'তুমি সূর্যম, তুমি দেব ও দেবপত্নী। তুমি ব্রহ্মাতনয়া সরস্বতী; তুমি ন্যায় ও সত্য প্রকাশ কর; ন্যায়ধর্মের চেয়েও তুমি নিরপেক্ষ, তুমি একই কক্ষপথে সূর্য-চন্দ্রের মত পূর্ব-পশ্চিমে পরিভ্রমণ-রত, তোমার দরুনই জগতের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, দেবতা ও ব্রাহ্মণে যে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা তার সব তোমারই মধ্যে একত্রিত, তুমি ব্রহ্মার দুহিতা, কাশ্যপ তোমার সগোত্র।'

'এই ওজন সন্ধ্যাকালে করতে হবে। ওজন করে দ্রব্যগুলি এক পার্শ্বে রেখে দিতে হবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে আবার ওজন করতে হবে। পরের বারে যে দ্রব্যটি ওজনে বেশী হবে, সে বৎসর ঐ দ্রব্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হবে; যে দ্রব্যের ওজন কমে যাবে তা শ্রীহীন ও নিষ্ফলা হবে। এই ওজন কেবল আষাঢ়ের নক্ষত্রদ্বয়ের জন্য করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না, 'রোহিণী' ও
৪২৮ 'স্বাতী' নক্ষত্রের জন্যও তা করতে হবে। আর যদি বৎসরটি 'অধিবৎসর' (**leap year**) হয়, আর, যে মাস দুইবার ধরা হয় সেই মাসে যদি ওজন করা হয়, তাহলে সেই বৎসরে দুইবার ওজন করতে হবে। দুইবারে যদি একই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহলে লক্ষণমত ঘটবে। আর যদি ভিন্ন হয়, তাহলে রোহিণীর লক্ষণ গ্রহণ কর, কেননা রোহিণীই প্রবলা।

আটাশ অধ্যায়

সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার পারম্পর্য

সমুদ্রের জল একই অবস্থায় থাকার কারণ মৎস্য পুরাণে উক্ত হয়েছে : 'আদিকালে ষোলটি পক্ষযুক্ত পর্বত ছিল, যারা তদ্দ্বারা বাতাসে উড়ে বেড়াতে পারত। 'ইন্দ্রের' তেজ তাদের পক্ষদগ্ধ করার দরুন পক্ষহীন হয়ে তারা নীচে সমুদ্রে পড়ে গেল। চারিদিকের প্রত্যেক দিকে চারিটি পর্বত পড়ল : পূর্বদিকে পড়ল 'ঋষভ', 'বলাহক', 'চক্র' ও 'মৈনাক', উত্তরে চন্দ্র, কঙ্ক, দ্রোণ ও সুহ্ম; পশ্চিমে বক্র, বধ্র, নারদ ও পর্বত; আর দক্ষিণে পড়ল জীমূত, দ্রাবণ, মৈনাক ও বহাশীর (? মহাশীর, মহাশৈল ?)। পূর্বদিকের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বতের মধ্যখানে 'সম্বর্তক' (? সম্বর্তক سم تک) নামক অগ্নি আছে যা সমুদ্রের জল পান করে। তা না হলে সমুদ্র ভরে যেত, কারণ সমস্ত নদ-নদী অবিরল ধারায় সমুদ্রেতেই গিয়ে পড়ে।

কথিত আছে, এই অগ্নি ঔরব নামে ওদেরই এক রাজার ছিল। সে তার পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিল; তার ভ্রূণাবস্থাতে তার পিতা নিহত হয়েছিল। ভূমিষ্ঠ হবার পর বড় হয়ে পিতার সংবাদ শুনে দেবতাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করার জন্য সে অসি উন্মুক্ত করল, কারণ মানুষের পূজা ও অর্ঘ্য পাওয়া সত্ত্বেও এবং জগতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও দেবতারা জগত রক্ষায় অবহেলা করেছিল। দেবতারা তখন সানুনয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে সে নিরস্ত হোল। সে তখন তাদেরকে বলল, আমার ক্রোধ বহ্নির কি করব ? দেবতারা সে বহ্নিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পরামর্শ দিল। এই অগ্নিই সমুদ্রের জল শোষণ করে। অন্যেরা বলেছে : নদ-নদীর জল-ধারায় সমুদ্রের জল বর্ধিত হয় না এইজন্য যে, ইন্দ্ররাজা সমুদ্রকে মেঘে পরিণত করে ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে বৃষ্টিধারারূপে নীচে প্রেরণ করে।'

মৎস্যপুরাণে আরও বলা হয়েছে : "চন্দ্রের যে অন্ধকারভাগকে 'শশলক্ষ্য' অর্থাৎ শশকরূপ বলা হয়, তা আসলে উপরোল্লিখিত ষোলটি পর্বতের চন্দ্রকিরণে প্রতিবিম্বিত ছায়া।"

'বিষ্ণুধর্মে' লিখিত আছে : চন্দ্রকে 'শশলক্ষ' বলা হয়, কারণ তার অবয়ব জলীয়, পৃথিবীর ছবি তাতে মুকুরের মত প্রতিবিম্বিত হয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন আকারের পর্বত ও বৃক্ষাদি আছে, যার ছায়া শশকাকৃতিতে চন্দ্রে পড়ে। চন্দ্রকে 'মৃগলাঞ্ছন'ও বলা হয়—হরিণসদৃশ, কারণ অনেকে তার অন্ধকার ভাগকে হরিণের আকারের সঙ্গে তুলনা করে থাকে।"

চন্দ্রের ক্ষেত্র (নক্ষত্র)-গুলিকে ওরা প্রজাপতির কন্যা বলে থাকে, তারা চন্দ্রের বিবাহিতা পত্নী। এদের মধ্যে রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের সমধিক অনুরাগ ও পক্ষপাত ছিল। সেজন্য তার ভগ্নীরা ঈর্ষাপরবশ হয়ে তাদের পিতা প্রজাপতির কাছে অভিযোগ করল। চন্দ্র যাতে তার সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করে, প্রজাপতি তার চেষ্টা করতে তাকে উপদেশ দিল, কিন্তু তার কোনও ফল হোল না। অবশেষে প্রজাপতি চন্দ্রকে অভিশাপ দিল যার ফলে তার মুখ শ্বেতকুষ্ঠে ভরে গেল। তখন নিজ আচরণে অনুতপ্ত হয়ে চন্দ্র প্রজাপতির কাছে এল। প্রজাপতি তাকে বলল : 'আমার এককথা, তা খণ্ডন হবে না। তবে প্রতিমাসে পক্ষকাল আমি তোমার কলঙ্ক ঢেকে রাখব।' চন্দ্র তখন বলল : 'আমার পূর্বপাপের চিহ্ন কেমন করে আমার দেহ থেকে দূর হবে ?' প্রজাপতি বলল : 'পূজ্য দেবতারূপে মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলে।' চন্দ্র তাই করল। চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গই সোমনাথের প্রস্তর। সোম—অর্থ চন্দ্র, আর নাথ—অর্থ প্রভু; সোমনাথের অর্থ হোল চন্দ্রপ্রভু। হিজরী ৪১৬ সালে এই বিগ্রহকে আমীর মাহমুদ ধ্বংস করেন—আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! বিগ্রহের উধর্বভাগ ভেঙ্গে ফেলে তার স্বর্ণ ও রত্ন খচিত সাজসজ্জাসহ তাকে তাঁর বাসস্থান গজনীতে নিয়ে গেলেন। তার কিয়দংশ থানেশ্বর থেকে আনীত 'চক্রস্বামী' নামক ব্রোঞ্জের বিগ্রহ সহ গজনীর ময়দানে ফেলে রাখা হয়েছে, আর কিছুভাগ জুমা মসজিদের দ্বারসম্মুখে পড়ে আছে, তাতে পা ঘসে লোকেরা পায়ের কাদা ছাড়ায়।

'লিঙ্গ' হচ্ছে মহাদেবের জননেন্দ্রিয়ের প্রতিকৃতি। তার হেতু সম্বন্ধে আমি এই গল্পটি শুনেছি : একজন ঋষি মহাদেবকে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে দেখতে পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে শাপ দিল যেন মহাদেবের লিঙ্গ লোপ পায়। তৎক্ষণাৎ লিঙ্গটি দেহচ্যুত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পরে কিন্তু ঋষি মহাদেবের নির্দোষিতা সাব্যস্ত
৪৩০ করার মত সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছিল; তার দরুন তার মনের উদ্বেগ দূর হয়েছিল। ঋষি তখন তাকে বলল : 'তোমার ক্ষতিপূরণ আমি এইভাবে করব যে, যে অঙ্গ তুমি হারিয়েছ তাকে মানবের শ্রদ্ধেয় বস্তু করে দেব, যাকে তারা ইষ্টলাভের উপায় বলে জানবে এবং উপাচারাদি নিবেদন করবে।'

'লিঙ্গ' গঠন সম্বন্ধে বরাহমিহির বলেছেন : 'একটি নিখুঁত প্রস্তরখন্ড নির্বাচন করে নিয়ে লিঙ্গের মনোমত দৈর্ঘ্য তার থেকে কেটে নাও। তাকে তিনভাগে ভাগ কর; নিম্নতম ভাগ হবে চতুষ্কোণ, ঘনক্ষেত্র (cube مکعب) বা চতুষ্কোণ স্তম্ভের মত। মধ্যম ভাগ চারিপার্শ্বে চারিটি অর্ধস্তম্ভ নিয়ে হবে অষ্টকোণ; আর উপরের ভাগ হবে নিম্নমুণ্ডের মত নিষ্কোণ গোল। প্রতিষ্ঠা করার সময় চতুষ্কোণবিশিষ্ট ভাগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করতে হবে, আর অষ্টকোণ ভাগের জন্য 'পিন্ড' নামক একটি আবরণ তৈরি করতে হবে, যার বহির্ভাগ হবে মৃত্তিকায় প্রোথিত ভাগের সাথে সামঞ্জস হবার মত চতুষ্কোণ; তার অভ্যন্তর হবে অষ্টকোণ, যাতে মৃত্তিকার উপরে উত্থিত অষ্টকোণাকৃতি মধ্যম ভাগকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করার উপযোগী হতে পারে। কেবল নিষ্কোণ গোলাকৃতি তৃতীয় ভাগটি অনাবৃত থাকবে।'

তিনি আরও বলেছেন : "এই ভাগটিকে ক্ষুদ্রকায় অথবা ক্ষীণাঙ্গ করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর; যে অঞ্চলের লোক তেমন লিঙ্গ তৈরী করে তাদের মধ্যে পাপ দেখা দেবে। লিঙ্গ যদি মৃত্তিকায় যথেষ্ট গভীরভাবে প্রোথিত না হয়, কিম্বা তার উপরে সামান্য মাত্র উত্থিত থাকে, তাহলে রোগ দেখা দেবে; নির্মাণকালে যদি কোনও কীলক তাতে আঘাত করে, 'তাহলে পরিবারবর্গসহ রাজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; বহনকালে যদি তাতে কোনও কিছুর আঘাত লাগে এবং তার ফলে বিগ্রহে কোনও দাগ থেকে যায় তাহলে শিল্পীর মৃত্যু হবে এবং সেদেশে দুর্যোগ ও মহামারী ছড়াবে।"

সিন্ধুদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দুদের উপাসনাগৃহে প্রায়ই এই বিগ্রহটি দেখা যায় তবে এসবের মধ্যে সোমনাথই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সেখানে প্রতিদিন ওরা গঙ্গার এক কলস জল ও কাশ্মীরের এক ঝুড়ি ফল আনত। ওদের বিশ্বাস ছিল যে, সোমনাথ প্রত্যেক দুরারোগ্য রোগ ও চিকিৎসার অতীত রোগীকে আরোগ্য করতে পারে।

সোমনাথের খ্যাতির কারণ হোল, এটি সমুদ্রগামী নাবিকদের একটি
৪১৩ প্রধান বন্দর : হাবশী (زنج) দেশের সুফালা থেকে চীন পর্যন্ত যার যাতায়াত করে, তাদের জন্য সোমনাথ এক অন্যতম ঘাট (منزل)।

এই সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাকে ওদের ভাষায় 'ভর্ণ' (بهرن) ও 'বুহর' (و بهر) বলে। হিন্দু জনসাধারণের ধারণা যে, সমুদ্রে 'বাড়বানল' নামে এক প্রকার অগ্নি আছে, যা সর্বদাই শ্বাস ফেলেছে। শ্বাসগ্রহণ করে বাতাসে তা

ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হয়, আর শ্বাস ত্যাগ করার দরুন বাতাসে ছড়ান বন্ধ হয় বলে সমুদ্রে ভাটা আসে।

মানীরও এইরকম বিশ্বাস জন্মেছিল, যখন তিনি ভারতীয়দের কাছে শুনলেন যে সমুদ্রে এক দৈত্য আছে যার শ্বাস-প্রশ্বাসে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়।

শিক্ষিত হিন্দুরা কিন্তু চন্দ্রের উদয় ও অস্ত থেকে দৈনিক জোয়ার-ভাটা নির্ণয় করে, আর মাসিক জোয়ার-ভাটা চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি থেকে নির্ণয় করে। তবে এই দুটি ব্যাপারের প্রাকৃতিক কারণ ওরা ভাল করে বুঝতে পারে নি।

জোয়ার-ভাটার জন্যই সোমনাথের এই নামকরণ হয়েছে, যা আসলে চন্দ্রেরই নাম। কারণ, এই প্রস্তর (লিঙ্গ)টি প্রথমে সরস্বতী নদীর মোহনার কিশ্তিনান তিন মাইল পশ্চিমে, 'বারোই' (باروى) নামক স্বর্ণদুর্গের পূর্বে সমুদ্র সৈকতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দুর্গটি এককালে বাসুদেবের আবাসরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। যেস্থানে বাসুদেব ও তাঁর আত্মীয়বর্গ হত ও দাহ হয়েছিলেন, সোমনাথের আদিস্থান তার নিকটেই ছিল। যখনই চন্দ্র উদিত ও অস্তমিত হয়, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এসে স্থানটিকে ডুবিয়ে দেয়। আর চন্দ্র দিন ও রাত্রির মধ্যরেখায় পৌঁছলে ভাটার টানে জল নেমে যায় এবং স্থানটি আবার দৃশ্যমান হয়; যেন চন্দ্র নিরত বিগ্রহটির পরিচর্যা ও স্নান করাতে রত আছে। এইজন্যই স্থানটি চন্দ্রের নামাঙ্কিত হয়েছে। তবে যে দুর্গে বিগ্রহ ও তার ধনরত্ন ছিল তা খুব প্রাচীন নয়, মাত্র শতেক বৎসর পূর্বে নির্মিত।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখিত হয়েছে যে, জোয়ারে জলোচ্ছ্বাসের সর্বাধিক উচ্চতা হচ্ছে ১৫০০ অঙ্গুলি। এ অনেক বেশী হোল, কারণ তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যাক উচ্চতা যদি ৬০।৭০ গজ উঠে তাহলে উপকূল উপসাগরগুলি এতদিন যা দেখা গেছে তার চেয়ে অনেক বেশী জলপ্লাবিত হয়ে যাবে। তবে তা হওয়া যে একেবারে অসম্ভব, তাও নয়।

সমুদ্র থেকে উপরোক্ত দুর্গটির আবির্ভূত হওয়ার যে কাহিনী প্রচলিত
৪০২ আছে, তা ঐ সমুদ্রের পক্ষে খুব আশ্চর্য নয়। কেননা দ্বীপমালার (ديبجات) (মালদ্বীপ-লক্ষাদ্বীপ) দ্বীপগুলিও ঐভাবে বালুকাস্তূপের মত সমুদ্র থেকে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে সেগুলির উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বৃদ্ধি পায় এবং তারপরে কিছুকাল ধরে একই অবস্থায় থাকে। তারপর আবার সেগুলি জীর্ণবৃদ্ধা

প্রাপ্ত হয়, তখন তাদের স্বতন্ত্র উপাদানগুলিকে একত্রে ধরে রাখার আর ক্ষমতা থাকে না, ফলে উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে জলে গলে যাওয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যায়। দ্বীপের অধিবাসীরা তখন জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু দ্বীপ ছেড়ে কোনও নবীন, সদ্যদৃষ্ট দ্বীপে চলে যায়, সমুদ্রোপরে যার উত্থান আসন্ন হয়েছে; তারা নারিকেল সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সেই দ্বীপ আবাদ করে তথায় বসতি স্থাপন করে।

এই দুর্গকে যে 'সুবর্ণ' বলা হয়, তা হয়ত বর্ণনার সাধারণ একটা রীতি মাত্র। তবে এও সম্ভব যে, দুর্গের এই বর্ণনা যথার্থ, কেননা 'জাবজ' (زابج) যব, জাভা) দ্বীপসমূহকে 'সুবর্ণ ভূমি' বলা হয়, কারণ সেখানকার সামান্য মাটি নিয়ে জলে ধৌত করলেই প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যায়।

উনষাট অধ্যায়

সূর্য-চন্দ্রের গ্রহণ

পৃথিবীর ছায়াপাত যে চন্দ্র গ্রহণের আর চন্দ্রের ছায়াপাত সূর্য গ্রহণের কারণ, ভারতীয় জ্যোতিষীরা তা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করেছে এবং এই তথ্যের উপরেই ওদের গণনা বিধি ও পঞ্জিকাদি রচিত। সংহিতা গ্রন্থে বরাহমিহির লিখেছেন: 'কয়েকজন পণ্ডিত মনে করেন যে রাহু (الرأس) 'দৈত্য'দের একজন ছিল: তার মাতার নাম সিংহীকা। দেবতারা সমুদ্র থেকে অমৃত উত্তোলন করার পর বিষ্ণুকে তাদের মধ্যে সে অমৃত ভাগ করে দিতে বললেন। বিষ্ণু যখন তা করছিলেন, তখন দেবতার রূপ ধরে রাহু এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। বিষ্ণু তাকেও অমৃতের ভাগ দিলে, সে নিয়ে পান করে ফেললে। তার সত্য পরিচয় জেনে বিষ্ণু চক্রাঘাত করে দৈত্যের মুণ্ড ছেদন করলেন। মুখে তখনও অমৃত থাকার দরুন তার মস্তকটি জীবিত থাকল, কিন্তু তা গলাধঃকরণ দ্বারা দেহে তার শক্তি সঞ্চারিত হয়নি বলে দেহের মৃত্যু হোল। ছিন্নমুণ্ডটি তখন কেঁদে বলল, কি দোষে আমাকে এরূপ করা হোল? তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তখন তাকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে আকাশবাসীদের একজন করে দেওয়া হোল।'

'অন্যেরা বলেছেন যে রাহুরও সূর্য-চন্দ্রের মত অবয়ব আছে, তবে অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ, সেজন্য আকাশে তাকে দেখা যায় না। আদি পিতা ব্রহ্মা তাকে আদেশ করেছিলেন, গ্রহণকাল ব্যতীত কখনও যেন সে আবির্ভূত না হয়।'

'আর এক দল বলেছেন, তার মস্তক ও পুচ্ছ সর্পের ন্যায়। আবার অন্যেরা বলে, যে কালো রঙ দেখা যায় তা ছাড়া রাহুর আর কোনও অবয়ব নাই।

এইসব উদ্ভট ধারণার উল্লেখ শেষ করে বরাহমিহির বলছেন: 'রাহুর যদি কোনও অবয়ব থাকত তাহলে তার ক্রিয়া স্পর্শসাপেক্ষ হোত, অথচ আমরা দেখছি যে সে দূর থেকেই গ্রহণ ঘটায়, যদিও আমরা জানি যে চন্দ্র ও তার মধ্যে ছয় রাশিচিহ্নের ব্যবধান আছে। তা ছাড়া তার গতির হ্রাসবৃদ্ধিও হয় না, যার থেকে অনুমান করা যেত যে, তার অবয়ব চন্দ্রক্ষেত্রে পৌঁছানর দরুনই গ্রহণ হয়ে থাকে। আর কেউ যদি ঐ অনুমানকে ধরে রাখতে চায়, তাহলে

তাকে বোঝাতে হবে রাহুর আবর্তন কী উদ্দেশ্যে গণনা করা হয়েছে এবং তার আবর্তনবেগ সমান হওয়ার দরুন গণনা শুদ্ধ হবার তাৎপর্যই বা কি? আর রাহুকে যদি মস্তক ও লেজবিশিষ্ট সর্প মনে করা হয় তাহলে, ছয় রাশিচিহ্নের কমই হোক বা বেশীই হোক, দূর থেকে সে গ্রহণ ঘটায় না কেন? মস্তক ও লেজের মধ্যে ত তার দেহ আছে যা এই অঙ্গ দু'টিকে যুক্ত করে রেখেছে। তবু সূর্য, চন্দ্র বা চন্দ্রক্ষেত্রের নক্ষত্র, কাউকেই সে গ্রাস করে না, কেবল দুইটি অবয়ব পরস্পরের সম্মুখীন হলেই গ্রহণ হয়। যদি তা হোত এবং উদিত চন্দ্র তার একটির দ্বারা গ্রস্ত হোত তাহলে অন্যটির দ্বারা সূর্যও গ্রস্ত হতে বাধ্য হবে; তেমনই, অস্তমিত চন্দ্র যদি গ্রস্ত হয় তাহলে সূর্য গ্রহণাবস্থায় উদিত হবে। এর কোনটাই কিন্তু হয় না।'

'প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরানুগ্রহিত পণ্ডিতরা যেমন বলেছেন, পৃথিবীর ছায়া-মণ্ডলে প্রবেশ করলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়, আর সূর্যগ্রহণ হয় এইজন্য যে চন্দ্র তাকে
৪৩৪ আমাদের চোখ থেকে আড়াল করে দেয়, আর এইজন্য চন্দ্রগ্রহণের আবর্তন কখনও পশ্চিমদিক থেকে হয় না, সূর্য গ্রহণও কখনও পূর্বদিক থেকে হয় না। বৃক্ষ-ছায়ার মত পৃথিবী থেকে একটি দীর্ঘ ছায়া উপরের দিকে বিস্তৃত হয়। চন্দ্রের উচ্চতা যখন অল্প থাকে এবং সূর্য থেকে তার সাত রাশিচিহ্ন পরিমাণ ব্যবধান থাকে, আর উত্তর বা দক্ষিণে খুব বেশী সরে না গিয়ে থাকে, তাহলে সে অবস্থায় চন্দ্র পৃথিবীর এই ছায়াতে প্রবেশ করবে এবং তদ্দ্বারা সে আবৃত হবে। এই ছায়ার সাথে প্রথম সংযোগ হবে পূর্বদিক থেকে। আর, চন্দ্র যখন পশ্চিমদিক থেকে এসে সূর্যের কাছে পৌঁছায় তখন সে মেঘের মত সূর্যকে আবৃত করে ফেলে। স্থানভেদে এই আবরণের পরিমাণে পার্থক্য হয়। চন্দ্র যে বস্তুর দ্বারা আবৃত হয় যেহেতু তার আয়তন বড়, সেজন্য অর্ধেক আবৃত হলেই চন্দ্রের জ্যোতি অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু সূর্যকে যে আড়াল করে, তার আয়তন তেমন বড় নয়, তাই গ্রহণ হলেও তার আলোকের তেজ অবশিষ্ট থাকে। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণে রাহুর প্রকৃতির কোনও হাত নাই, এ বিষয়ে সকল পণ্ডিতের রচনাই একমত।'

গ্রহণের প্রকৃত ব্যাপার তিনি যা বুঝেছিলেন তা বর্ণনা করার পর যারা এ ব্যাপার জানে না, তাদের সম্বন্ধে অভিযোগ করে বরাহমিহির বলেছেন: 'তবুও সাধারণ লোকেরা রাহুকেই গ্রহণের একমাত্র কারণ বলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে যায়। তারা এমনও বলে যে, রাহু আবির্ভাব ও তজ্জন্য গ্রহণ যদি না হোত, তাহলে সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে আবশ্যিক স্নান করতে হোত না।'

বরাহমিহির বলেছেন : 'তার কারণ এই যে, ছিন্ন হবার পর রাহুর মুণ্ড যখন অনুনয় করতে লাগল ব্রহ্ম তখন গ্রহণকালে ব্রাহ্মণদের আহুতির একভাগ তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেজন্য গ্রহণক্ষেত্রের কাছেই সে থাকে তার প্রাপ্যভাগ নেওয়ার উদ্দেশ্যে। লোকে সেইসময়ে তারই নাম সেজন্য বেশী উল্লেখ করতে থাকে এবং তারই প্রতি গ্রহণ আরোপ করতে থাকে, যদিও গ্রহণের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নাই, কারণ চন্দ্রকক্ষার সরলতার ও বক্রতার উপরই গ্রহণ নির্ভর করে।'

যে বরাহমিহির পূর্বোক্ত আলোচনায় বিশ্ব পরিচয়ের এমন সুষ্ঠু জ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁরই মুখ থেকে এই শেষের কথাগুলি অদ্ভূত শোনায়। নিজে ব্রাহ্মণ বলেই বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মণদের সমাজ থেকে নিজকে পৃথক করতে
৪০৫ পারেন নি, তাঁদেরই পক্ষ সমর্থন করেছেন। অবশ্য তাঁকে দোষী করা উচিত হবে না, কারণ তিনি সত্যের উপরই দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান এবং তিনি সত্য কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সন্ধ্যা' সম্বন্ধে তার পূর্বোক্ত উক্তি লক্ষ্য করা যেতে পারে। হায়, পণ্ডিতরা সবাই যদি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত !

কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তকে দেখুন, ভারতীয় জ্যোতিষীদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রাহ্মণ এবং তাদেরই একজন যারা তাদের পুরাণাদিতে পড়ে যে সূর্য চন্দ্রের নীচে থাকে এবং সেজন্য যারা সূর্যকে গ্রাস করার জন্য একটি রাহুর প্রয়োজনবোধ করে। সেইজন্য তিনি সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে প্রতারণার সমর্থক হয়েছেন। যদিও এও সম্ভব যে, হয় ঘৃণাভরে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বিদ্রূপ করার জন্যই এমন কথা বলেছেন, অথবা চিন্তাশক্তি রহিত মুমূর্ষুর মত কোনও মানসিক অক্ষমতার দরুন বলেছেন। তাঁর এই কথাগুলি 'ব্রহ্মসিদ্ধান্তের' প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যাবে :

কেউ কেউ মনে করে, গ্রহণ রাহুর দ্বারা হয় না। এমন ধারণা করা বাতুলতার শামিল; কারণ রাহুই আসলে গ্রাস করে এবং জগতের অধিকাংশ লোকও তাই বলে থাকে। ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ঈশ্বরের বাণী, বেদগ্রন্থেও উক্ত হয়েছে যে রাহু গ্রাস করে; মনু রচিত স্মৃতি ও ব্রহ্মার পুত্র গর্গ রচিত সংহিতা গ্রন্থদ্বয়ও ঐ কথা বলে। অথচ বরাহমিহির, শ্রীসেন, আর্যভট্ট ও বিষ্ণুচন্দ্র এইসব জনমত ও শাস্ত্রবাক্যের বিরোধিতা করে বলতে চান যে, গ্রহণ রাহুর দ্বারা হয় না। যদি তা না হবে তবে গ্রহণকালে ব্রাহ্মণরা উক্ত তৈল দ্বারা গাত্রমর্দনের মত পূজায় যেসব ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে তা সবই বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। এসব কৃত্যাদিকে অযথা বলার

অর্থ সনাতন বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসা, যা নিষিদ্ধ। স্মৃতিগ্রন্থে মনু বলেছেন : 'রাহু যখন সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে তখন পৃথিবীর সমস্ত জল
৪০৬ গঙ্গাজলের মত পবিত্র হয়ে যায়।' বেদে উক্ত হয়েছে : 'রাহু সৈনিক' (? সিংহীকা) নাম্নী দৈত্যকন্যার পুত্র। এইজন্য লোকেরা এসব পুণ্যকর্ম করে থাকে। কাজেই জনসাধারণের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হওয়া উক্ত লেখকদের কর্তব্য, কেননা 'বেদ', স্মৃতি ও সংহিতা গ্রন্থে যা কিছু লেখা আছে তার সবই সত্য।'

'দুষ্টামি ও অহঙ্কারবশে তাহারা আমাদের প্রমাণ অস্বীকার করিয়াছে, যদিও তাহাদের অন্তঃকরণ সে সত্যকে স্পষ্টভাবেই জানে', কোরআনের এই বাণী যে রকম লোকদের সম্বন্ধে উচ্চারিত হয়েছে ব্রহ্মগুপ্ত যদি এই আলোচনায় তাদেরই মত হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। কেবল কানে কানে তাঁকে বলব : শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিরস্ত হওয়াই যদি লোকের কর্তব্য হয়, তুমি অন্যকে পুণ্যার্জন করতে বলে নিজের বেলা তা বিস্মৃত হয়েছ কেন? এই উপদেশ দেওয়ার পরই তুমি সূর্যগ্রহণ ব্যাখ্যা করার জন্য চন্দ্রের এবং চন্দ্র গ্রহণ ব্যাখ্যা করার জন্য পৃথিবীর ছায়ার ব্যাস পরিমাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে কেন? যাদের মতানুসরণ করা তুমি কর্তব্য মনে কর তাদের মতানুসরণ না করে, সেই শাস্ত্রবিরোধীদলের মতানুযায়ী সূর্য-চন্দ্রের গ্রহণ গণনা করেছ কেন? ব্রাহ্মণরা যদি গ্রহণকালে কোনও পূজা বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করতে আদিষ্ট হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে 'গ্রহণ' হবে সেসব ক্রিয়াকর্মের সময়মাত্র, গ্রহণের জন্যই যে সে ক্রিয়া এমন নয়। যেমন, আমাদের (মুসলমান)-কে নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সূর্যের আবর্তনের ও কিরণের কয়েকটি বিশেষ সময়ে নামাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এখানে সূর্যের অবস্থান্তরকে সময়জ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে ধরা হয়েছে মাত্র, আমাদের উপাসনার সঙ্গে সূর্যের কোনও সংস্রব নাই।

(উপরে) ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন, 'লোকসাধারণও তাই বিশ্বাস করে'। লোকসাধারণ বলতে যদি তিনি মানব অধ্যুষিত ভূভাগের সমস্ত অধিবাসীদের কথা বলে থাকেন, তাহলে আমাকে বলতে হয়, তাদের মতামতের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান বা গবেষণা তাঁর শক্তি-বহির্ভূত। সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় ভারতবর্ষ নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং চিন্তারীতি ও ধর্মমতে যারা হিন্দুদের মত, তাদের চেয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশী। অবশ্য, ব্রহ্মগুপ্ত যদি হিন্দু জনসাধারণের কথা বলে থাকেন, তাহলে আমি স্বীকার করি যে, শিষ্টজনের

চেয়ে সাধারণ লোকের সংখ্যা ওদের মধ্য বেশী তবে আমাদের সমস্ত ঐশ্বরিক গ্রন্থেই সাধারণ জনতাকে মূর্খতা, সন্দেহ ও অকৃতজ্ঞতার জন্য বরাবরই নিন্দা করা হয়েছে।

৪০৭ আমার নিজের ধারণা যে নবীন বয়স, গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মগুপ্ত (উপরে) যা বলেছেন তা সক্রেতিসের মত কোনও বিপদে পড়েই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ তিনি যখন ব্রহ্মসিদ্ধান্ত রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ৩০ বৎসর মাত্র। এই যদি তাঁর কৈফিয়ৎ হয় তাহলে আমি তা মেনে নিলাম এবং তাঁর উক্তির সমালোচনা এইখানেই শেষ করলাম।

যে শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধাচরণ করা অনুচিত বলে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন, তারা চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করার জ্যোতির্বিক ব্যাখ্যা কি করে বুঝতে পারবে, যখন তারা তাদের পুরাণে চন্দ্রকে সূর্যের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে এবং উপরের বস্তু নিম্নের বস্তুকে আবৃত করতে পারে না, বিশেষ করে তাদের চোখে, যারা উভয় বস্তুরই নীচে আছে। তাই, তারা এমন একটি জীবনের প্রয়োজন বোধ করে যা মাছের টোপ গেলার মত সূর্য-চন্দ্রকে গিলে নেয় এবং রাহুগ্রস্ত ভাগগুলির আপাতদৃশ্যমান আকৃতিতে চন্দ্র সূর্যকে প্রতিভাত করায়। মূর্খ লোক সব জাতিতেই আছে এবং ততোধিক ও মূর্খ সমাজপতি সব জাতিতেই পাওয়া যায়, যারা, কোরআনের ভাষায়, নিজেদের ও অন্যদের বোঝা বহন করে বেড়ায় এবং মনে করে জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলে তাদের নিজেদের ধীশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে!'

আরও একটি অত্যাশ্চর্য সংবাদ বরাহমিহির প্রাচীনদের সম্বন্ধে দিয়েছেন। সংবাদটি উল্লেখ করা উচিত, যদিও তার প্রতিবাদ অনাবশ্যক। সংবাদটি এই : 'অষ্টমী তিথিতে সামান্য জল ও তেল সমানভাগে একটি সমতল পাত্রে ঢেলে তার থেকে তারা গ্রহণ যোগ নির্ণয় করত। তেল ও জলের মিশ্রণস্থলগুলি লক্ষ্য করে মিশ্রিতভাগ গ্রহণারম্ভ ও অমিশ্রিত ভাগ গ্রহণান্তের লক্ষণ বলে তারা ধরত।'

বরাহমিহির আর একজনের সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে মনে করত কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের যোগাযোগেই গ্রহণ হয়ে থাকে। আবার আর একদল উল্কাপাত, ধূমকেতু, হেজজ্বিলক (ऽJlg-balo), অন্ধকার, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূবিদারণ, ভূমিকম্প প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনাকেও গ্রহণের লক্ষণ বলত। বরাহমিহির মন্তব্য করেছেন : 'এসব দুর্ঘটনা যে সর্বদাই গ্রহণের সঙ্গে ঘটে, তা নয়, এসব তার কারণও নয়।

৪০৮ গ্রহণের সঙ্গে এসব ঘটনার যে যোগ তা কেবল তাদের অশুভ প্রকৃতির। তার বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এসব উদ্ভট তথ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।'

এই বরাহমিহিরই—যিনি তাঁর দেশবাসীর ছোলার সঙ্গে মাসকলাই, মুস্তার সঙ্গে গোময় মিশিয়ে ফেলার অভ্যাস সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন—কোনও প্রমাণ উল্লেখ না করেই বলছেন: 'গ্রহণকালে যদি বাতাস খরবেগে বয়, তাহলে পরবর্তী গ্রহণ ছয় মাস পরে হবে, যদি উল্কাপতন হয় তাহলে বারমাস পরে আবার গ্রহণ হবে; বায়ুমণ্ডল যদি ধূলায় আচ্ছন্ন হয় তাহলে আঠার মাস পরে হবে; যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে দুই বৎসর পরে. দিঙ্মণ্ডল যদি অন্ধকারাবৃত হয় তাহলে ৩০ মাস পরে, আর যদি শিলাবৃষ্টি হয়, তাহলে ৩৬ মাস পরে পুনর্বার গ্রহণ হবে।

মৌনাবলম্বনই এই উক্তির একমাত্র জবাব!

আমার অবশ্য বলে রাখা উচিত যে, অল্-খরারিজ্মীর পঞ্জিকাতে গ্রহণের বিভিন্ন প্রকারের রঙের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, সুসংবদ্ধ হলেও তা বাস্তব দৃশ্যের সঙ্গে মেলে না। বরঞ্চ সে প্রসঙ্গে হিন্দুরা যা বলে তাই বেশী শুদ্ধ। চন্দ্রের অর্ধেকের চেয়ে কমভাগ রাহুগ্রস্ত হলে তার বর্ণ হয় ধূমের মত; অর্ধভাগ সম্পূর্ণ গ্রস্ত হলে তার বর্ণ হয় ঘোর কৃষ্ণ; অর্ধেকের চেয়ে বেশীর ভাগ গ্রস্ত হলে তার বর্ণ হয় লালচে কালো, আর পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণহলে সে মেটে হলুদবর্ণ ধারণ করে।

ষাট অধ্যায়

পর্ব

সময়ের যে ব্যবধানের মধ্যে গ্রহণ হতে পারে এবং সে ব্যবধানের চান্দ্রমাস কত, অল্-মাজেস্ত (Almagest)-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে তা বিশদরূপে প্রমাণাদি সহ বর্ণনা করা হয়েছে। এইরূপ কালের ব্যবধানকে, যার আদি ও অন্তে চন্দ্রগ্রহণ হয়, হিন্দুরা 'পর্ব' বলে। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি 'সংহিতা' থেকে উদ্ধৃত। বরাহমিহির বলেছেন : 'প্রতি ছয়মাসকালকে পর্ব বলা হয়, যার মধ্যে গ্রহণ হতে পারে। এইরূপ সাতটি গ্রহণ নিয়ে এক একটি চক্র হয়। প্রত্যেক চক্রের বিশেষ অধিপতি ও ফলাফল আছে। এই চিত্রে তা দেখানো গেল :

পার্বণ সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পার্বণাধিপতি	ব্রহ্মা	শশী (চন্দ্র)	ইন্দ্র (রাজা)	কুবের (উত্তরের অধিকারী)	বরুণ (জলাধিপতি)	অগ্নি (মিত্রাক্ষ)	যম (মৃত্যু দূত)
ফলাফল	ব্রাহ্মণের জন্য শুভ, গোমেধাদির বৃদ্ধি হবে, ফসল সতেজ হবে এবং সর্ববিধ কুশল ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে।	প্রথম পর্বের মতই হবে, তবে বৃষ্টি কম হবে এবং পণ্ডিতরা রোগে ভুগবে।	রাজাদের কেউ কেউ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষী হবে, শান্তি লাঘব হবে ও রবিশস্য নষ্ট হবে।	প্রাচুর্য ও ধন বাড়বে, বিত্তশালী তাদের ধন নষ্ট করবে।	রাজাদের জন্য অশুভ। কিন্তু অনেকের জন্য শুভ, শরীরের শ্রীবৃদ্ধি হবে।	প্রচুর জল, সুফল, সর্বাধিক মঙ্গল ও শান্তি; মহামারী ও মৃত্যু হ্রাস পাবে।	বৃষ্টি কম হবে, ফসল নষ্ট হবে এবং তার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

খণ্ডখাদ্যকানুযায়ী, তোমার সমকালীন 'পর্ব' নির্ণয় করার পদ্ধতি : 'এই পত্রিকায় বর্ণিত শংহার অহর্গন গণনা করে দুই স্থানে লিখে রাখ; একস্থানে তাকে ৫০ দিয়ে গুণ দিয়ে গুণলব্ধ অংককে ১২৯৬ দিয়ে ভাগ দাও; অর্ধেকের চেয়ে বড় ভগ্নাংশ হলে তাকে পূর্ণ সংখ্যা ধরতে হবে। ভাগফলে ১০৬৩ যোগ কর এবং মোট সংখ্যা দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যার সাথে যোগ দিয়ে তাকে
৪৪০ ১৮০ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফলে যে পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাবে তা সম্পূর্ণ পর্বের সংখ্যা। তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করে, ভাগশেষে ৭ এর চেয়ে যে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা থেকে যাবে, তা হবে প্রথম পর্ব, অর্থাৎ ব্রহ্মার পর্ব থেকে বর্তমান পর্বের দূরত্ব জ্ঞাপক। আর ১৮০ দিয়ে ভাগ দেওয়ার ফলে তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংখ্যার যে ভাগশেষ থেকে যাচ্ছে, তা হবে তোমার বর্তমান পর্বের অতীত ভাগ। তাকে ১৮০ থেকে বিয়োগ কর। অবশিষ্ট সংখ্যা যদি ১৫ অপেক্ষা কম হয় তাহলে চন্দ্র গ্রহণ সম্ভব, এমনকি অবশ্যম্ভাবী; আর যদি তদপেক্ষা বড় সংখ্যা হয় তাহলে অসম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান পর্বের অতীতকাল গণনা করা যাবে।'

এই পুস্তকের অন্যত্র আমরা পাচ্ছি : 'কল্প-অহর্গন, অর্থাৎ কল্প-দিবসের অতীত ভাগ থেকে ১৬০০১ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সংখ্যাকে দুই স্থানে লিখে রাখ। দ্বিতীয়স্থানে তার থেকে ৮৪ বিয়োগ করে বিয়োগফলকে ৫৬১ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফলকে প্রথম স্থানে নিয়ে গিয়ে ঐ সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে অবশিষ্ট সংখ্যাকে ১৭৩ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল উপেক্ষা করে ভাগশেষকে ৭ দিয়ে ভাগ দাও। এর ভাগফল থেকে 'পর্ব' পাওয়া যাবে 'ব্রহ্মাদি' (? ১৬০৪ ? ব্রহ্মাব্দ ?) যার আরম্ভ।

এই প্রক্রিয়া দু'টি কিন্তু একটি আর একটির সঙ্গে মেলে না। মনে হয়; শেষোক্ত প্রক্রিয়ার বর্ণনা থেকে কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে, কিংবা পুঁথির লিপিতে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে।

পর্বের জ্যোতিষিক ফলাফল সম্বন্ধে বরাহমিহির যা বলেছেন তা তাঁর মত সুপণ্ডিতের যোগ্য নয়। তিনি বলেছেন : 'কোনও বিশেষ পর্বে যদি গ্রহণ না হয়, কিন্তু পরবর্তী পর্বে হয়, তাহলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও লোকক্ষয় হবে।' এখানে অনুবাদক যদি কোনও ভুল না করে থাকেন, তাহলে আমাদের মনে করতে হবে যে, এই বর্ণনাটি প্রত্যেক এমন পর্বে প্রযোজ্য, যার পরবর্তী পর্বে গ্রহণ হবে।

তাঁর এই উক্তিটি আরও আশ্চর্যজনক : 'গণিতাগত সময়ের পূর্বে যদি কখনও গ্রহণ হয়, তাহলে অনাবৃষ্টি ও লোকহত্যা হবে। আর গ্রহণ যদি

নির্ধারিত সময়ের পরে হয়, তাহলে মহামারী, মড়ক, শস্যহানি, ফল ও ফুল নষ্ট হবে।' বরাহমিহির কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যে, 'প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আমি এই মতই পেয়েছি, তাই এখানে উদ্ধৃত করলাম। তবে যে গণনাতে সিদ্ধহস্ত,
৪৪১ তার গণনাতে সময়ের পূর্বাপর ঘটবে না। সূর্য যদি কখনও পর্বের বাইরে অদৃশ্য ও অন্ধকারাবৃত হয় তাহলে বুঝতে হবে 'ত্বশ্ঠী' নামক দেবতা তাকে গ্রাস করেছে।'

বরাহমিহিরের এই কথা অন্যত্র লিখিত তাঁর আর একটি উক্তির সমান। 'মকর রাশিতে প্রবেশ করার আগেই যদি সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয় তাহলে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক বিনষ্ট হবে; কর্কট রাশিতে প্রবিষ্ট হবার আগে যদি সূর্যের দক্ষিণ গতি আরম্ভ হয়, তাহলে পূর্ব ও উত্তর দিক বিনষ্ট হবে। আর উত্তর বা দক্ষিণায়নের আরম্ভ যদি এই দুই রাশির প্রথম ডিগ্রীতে সূর্য উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা তার অব্যবহিত পরে হয়, তাহলে চতুর্দিকেই শান্তি বিরাজ করবে, আর কল্যাণ বৃদ্ধি হবে।'

আপাতশ্রবণে এ ধরনের কথা পাগলের প্রলাপ বলে মনে হয়, যদি না এর মধ্যে এমন কোন নিগূঢ় অর্থ নিহিত থাকে, যা আমরা জানি না।

অতঃপর, আমাদেব বিভিন্ন কালাধিপতির (اصحاب الازمنة Domini teueparum) বিবরণ দেওয়া উচিত, কেননা এগুলিও চক্রাকারে আবর্তিত হয়। তার প্রাসঙ্গিক ব্যাপারও আমরা সেই সঙ্গে উল্লেখ করব।

একষট্টি অধ্যায়

শাস্ত্র ও জ্যোতিষ মতে বিভিন্ন কালাধিপতি ও অনুরূপ বিষয়াদি

অনন্ত, সীমা-নিরপেক্ষ কাল কেবলমাত্র স্রষ্টার প্রতি আরোপিত হয়; কেননা কাল হচ্ছে তাঁর ব্যাপ্তি যার আদি-অন্ত অনির্দেশ্য; কাল-ই তাঁর নিত্যতা। সচরাচর হিন্দুরা যে কালকে আত্মা বা 'পুরুষ' নামে অভিহিত করে থাকে। গতি দ্বারা যে কাল নির্দেশ করা যায়, সে কালের অংশগুলি স্রষ্টা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাদের প্রতি ও আত্মার বহিরস্থ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর প্রতি আরোপ করা হয়। যেমন, 'কল্প' ব্রহ্মার প্রতি আরোপিত, কারণ 'কল্প' ব্রহ্মার অহোরাত্র, তার দ্বারা তাঁর আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট।

প্রত্যেক মন্বন্তরের একটি করে অধিপতি আছে; তার নাম 'মনু' যে বিশেষ গুণ দ্বারা পরিচিত, পূর্বের এক অধ্যায়ে সে সব গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্যুগ বা যুগের এরূপ কোন অধিপতির কথা আমি শুনিনি।

বৃহজ্জাতক-গ্রন্থে বরাহমিহির লিখেছেন: 'অব্দ' অর্থাৎ বৎসর, শনির 'অয়ন', অর্থাৎ অর্ধ বৎসর, সূর্যের 'ঋতু', অর্থাৎ বৎসরের অর্ধাংশ বুধগ্রহের মাস বৃহস্পতির 'পক্ষ', অর্থাৎ মাসার্ধ শুক্রগ্রহের 'বাসর' অর্থাৎ দিবস মংগলগ্রহের, আর 'মুহূর্ত' চন্দ্রের। গ্রন্থের অন্যত্রে তিনি বৎসরের ষষ্ঠ ভাগ এইভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। 'মকর ক্রান্তি (দক্ষিণ অয়নান্ত) থেকে যে প্রথম ভাগ আরম্ভ হবে সে ভাগ শনির, দ্বিতীয় ভাগ শুক্রের, তৃতীয় ভাগ মংগলের, চতুর্থ চন্দ্রের, পঞ্চম বুধের, আর ষষ্ঠ ভাগ বৃহস্পতির।'

এই পুস্তকের পূর্বেই অধ্যায়গুলিতে আমরা 'ঘড়ি', মুহূর্ত, অর্ধ চান্দ্র দিবস, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের তিথি গ্রহণ-পর্ব আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলির প্রত্যেকের অধিপতির উল্লেখ করেছি। যা বাকী রয়ে গেছে তা এখানে বলছি।

'বর্ষাধিপতি' নির্ণয়ে পাশ্চাত্য লোকেরা যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, হিন্দুরা তা করে না। পাশ্চাত্য কয়েকটি সুবিদিত নিয়মানুযায়ী উদয় রাশি থেকে অধিপতি গণনা করা হয়। বর্ষ ও মাসের অধিপতিরাই পর্যায়ক্রমে পুনরাবর্তিত সময়াংশ বিশেষেরও অধিপতি, যাকে এক নির্দিষ্ট বিশেষ গণনার দ্বারা হোরা ও দিবাধিপতি থেকে বের করতে হয়।

তুমি যদি বর্ষের অধিপতি নির্ণয় করতে চাও, তাহলে 'খণ্ডখাদ্যকে' বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আলোচ্য তারিখের দিবস সংখ্যা বের কর। (এই পুস্তকটিই হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়)। তার থেকে ২২০১ বিয়োগ করে, অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৩৬০ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফলকে ৩ দিয়ে পূরণ করে তার সঙ্গে সর্বদাই ৩ যোগ করতে থাক। মোট অংক থেকে এখন সমস্ত ৭ গুলি বাদ দাও; ৭-এর কম যে সংখ্যা থাকবে তাকে রবিবার থেকে আরম্ভ করে সপ্তাহের দিবস ধরে গুণে যাও। সপ্তাহের যে বারে তুমি উপনীত হবে, সেই বারের অধিপতি সেই বৎসরেরও অধিপতি হবে। ভাগ করার পর যে ভাগশেষ পাওয়া যাচ্ছে, সে হচ্ছে তার আধিপত্যের অতীত দিবস-সংখ্যা। এই অতীত দিবসের সঙ্গে তার আধিপত্যের অনাগত দিবস-সংখ্যা যুক্ত হয়ে ৩৬০ হবে। উপরোক্ত দিবস-সংখ্যা থেকে বিয়োগ না করে তার সংগে ৩১৯ যোগ করলেও ঐ একই ফল পাওয়া যাবে।

আর 'মাসাধিপতি' নির্ণয় করতে হলে বর্তমান তারিখ পর্যন্ত অতীত মোট দিবস-সংখ্যা থেকে ৭১ বিয়োগ করে নিয়ে অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৩০ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফলকে দ্বিগুণ করে তাতে ১ যোগ কর। এই সংখ্যা থেকে আবার ৭ গুলি বাদ দিয়ে যাও; যে সংখ্যা হাতে রয়ে গেল তা দিয়ে রবিবার থেকে আরম্ভ করে সপ্তাহের দিবসগুলি পর পর গুণে যাও। যে বারে তুমি সে সংখ্যা শেষ করবে, সে বারের অধিপতি সেই মাসেরও অধিপতি। ভাগ করে যা ভাগশেষ থাকছে তা তার আধিপত্যের অতীত দিবস-সংখ্যা; তার সংগে আধিপত্যের অনাগত দিবস যোগ করে ৩০ দিন হবে। এখানেও উপরোক্ত মোট দিবস-সংখ্যা থেকে বিয়োগ না করে তার সাথে ১৯ যোগ করলে এবং দ্বিগুণিত ভাগফলে একের পরিবর্তে ২ বৃদ্ধি করলেও ঐ একই ফল পাওয়া যাবে।

'দিবাধিপতির' আলোচনা করে লাভ নাই, কেননা আলোচ্য তারিখ পর্যন্ত মোট দিবস-সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ দিলেই তা পাওয়া যাবে। তেমনই 'ঘড়ি'র অধিপতিও নভোমণ্ডলীয় বৃত্তকে ১৫ দিয়ে ভাগ দিলেই পাওয়া যাবে। তবে যারা, বৃত্ত অংকন যন্ত্র ব্যবহারের পক্ষপাতি, তারা সূর্যের ও তার উদয় রাশির ডিগ্রীর ব্যবধানকে ১৫টি সমান ডিগ্রী দিয়ে ভাগ করে করে নেয়।

'মহাদেব' কৃত 'স্রুধব' নামক গ্রন্থে উক্ত হয়েছে : 'দিবা-রাত্রির প্রত্যেক তৃতীয়াংশের একটি করে অধিপতি আছে। দিবা-রাত্রির প্রথম তৃতীয়াংশের অধিপতি ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ের বিষ্ণু, আর তৃতীয়ের রুদ্র। সত্ত্ব, রজঃ, তম এই মৌলিক ত্রিগুণের পারম্পর্য অনুসারে এ বিভক্তি অনুমিত হয়েছে।

হিন্দুদের আর একটি রীতি আছে; বর্ষাধিপতির সঙ্গে ওরা কোনও এক নাগেরও নামোল্লেখ করে থাকে। নাগ অর্থ সর্প। বিভিন্ন গ্রহ-তারকার নামের সাথেও কোনও না কোন নাগের নাম কল্পিত হয়ে থাকে। এই সারণীতে সেই নামগুলিকে আমি একত্রিত করে দেখাচ্ছি।

বর্ষাধিপতি	বর্ষাধিপতির সহচর নাগসকলের দুই প্রকার নাম	
সূর্য	সুক (? বাসুকি ?)	নন্দ
চন্দ্র	শঙ্কর	চিত্রাঙ্গদ
মঙ্গল	পিণ্ডারক ভর্ম (?) (پهرم)	তক্ষক
বুধ	জরহস্ত (?) (خبرو هست)	কর্কোট
বৃহস্পতি	ইলাপুত্র	পদ্ম
শুক্র	কর্কোটক	মহাপদ্ম
শনি	যক্ষভদ্র	সংখ

হিন্দুরা গ্রহাদিকে সূর্যের সাথে যুক্ত করে এইজন্য যে, তাদের সমস্ত কিছু সূর্যের উপর নির্ভরশীল, আর স্থির নক্ষত্ররাজিকে চন্দ্রের সাথে যুক্ত করে, কারণ চন্দ্রক্ষেত্রগুলি তাদের মধ্যে আছে। হিন্দু ও মুসলমান জ্যোতিষী, উভয় দলেরই জানা আছে যে গ্রহসমূহ রাশিচিহ্নের আধিপত্য অনুসরণ করে। সেজন্য ঐ জ্যোতিষীরা গ্রহাদির অধিপতিরূপে কতকগুলি নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক জীব বা দেবতা কল্পনা করে নিয়েছে। বিষ্ণুধর্মানুযায়ী যার তালিকা নীচের সারণীতে সন্নিবেশ করা হোল।

গ্রহ ও তাদের পাতদ্বয়	অধিপতি
সূর্য	অগ্নি
চন্দ্র	ব্যান (? Vyana ?)
মঙ্গল	কলমার
বুধ	বিষ্ণু
বৃহস্পতি	শুক্র
শুক্র	গৌরী
শনি	প্রজাপতি
রাহু	গণপতি (?)
কেতু	বিশ্বকর্মা

গ্রহাদির মত, চন্দ্রক্ষেত্র (চন্দ্রপত্নী)-গুলির অধিপতির তালিকাও বিষ্ণুধর্মে দেওয়া আছে; তাও আমি নীচের সারণীতে দেখাচ্ছি।

চন্দ্রক্ষেত্র	অধিপতি	চন্দ্রক্ষেত্র	অধিপতি
কৃত্তিকা	অগ্নি		
রোহিণী	কেশ্বর(?কেশব?)	অভিজিৎ	ব্রহ্ম
মৃগশীর্ষ	ইন্দু (চন্দ্র)	শ্রবণা	বিষ্ণু
আর্দ্রা	রুদ্র	ধনিষ্ঠা	বাসব (বসু)
পুনর্বসু	অদিতি	শতভিষজ	বরুণ
পুষ্যা	গুরু-বৃহস্পতি	পূর্বভদ্রপদা	(?অজপাদ)
অশ্লেষা	সর্প	উত্তর ভাদ্রপদা	অহর্বদ
মঘা	পিতৃগণ		(অহির্বুধ্ন)
পূর্বফাল্গুনী	ভগ	রেবতী	পুষা
উত্তর ফাল্গুনী	অর্যমা	অশ্বিনী	অশ্বিনীকুমার(?)
হস্তা	সাবিত্রি-সবিতা	ভরণী	যম
চিত্রা	ত্বষ্ঠা		
স্বাতী	বায়ু		
বিশাখা	ইন্দ্রাগ্নি		
অনুরাধা	মিত্র		
জ্যেষ্ঠা	শত্রু		
মূলা	নির্ঋতি		
পূর্বাষাঢ়া	অপ্		
উত্তরাষাঢ়া	বিশ্ব (দেব)		

বাষট্টি অধ্যায়

সম্বৎসরের ষাট বছর, ষষ্ঠাব্দও বলা হয়ে থাকে

'সম্বৎসরের' শব্দার্থ বর্ষ, কিন্তু শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূর্যরশ্মির অন্তরালে বৃহস্পতি দৃশ্যমান হওয়ার সময় থেকে আরম্ভ করে সূর্যের ও তার কক্ষপথ পরিক্রমণ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যে বর্ষচক্র হয় তারই নাম 'সম্বৎসর'। এই চক্র ষাট বৎসরে সম্পূর্ণ হয়, সেজন্য তাকে 'ষষ্ঠাব্দ' বলা হয়।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, চন্দ্র ক্ষেত্রগুলির নাম মাসের নামানুযায়ী বিভক্ত; প্রত্যেক মাসেরই একটি করে স্বনামাঙ্কিত চন্দ্র ক্ষেত্র আছে। সহজ-বোধ্য করার জন্য সে নাম ও শ্রেণীগুলি আমরা পূর্বের একটি অধ্যায়ে তালিকাবদ্ধ করে দেখিয়েছি। যে ক্ষেত্রে বৃহস্পতি সূর্যকিরণান্তরালে দৃশ্যমান হয় সে ক্ষেত্রটি যদি জানা থাকে তাহলে আমাদের ঐ তালিকায় সেই ক্ষেত্রটি খুঁজে নিয়ে তার বামপার্শ্বে মাসের নাম লেখা দেখতে পাবে, যে মাস ঐ আলোচ্য বৎসরের অধিপতি। তুমি মাসকে তখন ঐ বৎসরের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করে বলবে, 'চৈত্রের বৎসর', 'বৈশাখের বৎসর' ইত্যাদি। এইরকম প্রতিটি বৎসরের ফলাফল ও বিধান হিন্দু জ্যোতিষ পুস্তকাদিতে সুপরিজ্ঞাত।

যে চন্দ্রক্ষেত্রে বৃহস্পতি সূর্যালোকে উদয় হয়, তা নির্ণয় করার নিম্ন-লিখিত নিয়মটি বরাহমিহির তাঁর সংহিতায় উল্লেখ করেছেন। "তোমার সময়ের 'সকাল' নিয়ে তাকে ১১ দিয়ে গুণ কর, গুণফলকে আবার ৪ দিয়ে গুণ কর কিম্বা 'সকালকেই' ৪৪ দিয়ে গুণ করতে পার। গুণফলের সঙ্গে ৮৫৮৯ যোগ কর। মোট সংখ্যাকে ৩৭৫০ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে বৎসর, মাস, দিন ইত্যাদির সংখ্যা। সেগুলিকে 'সকালের' সাথে যোগ কর, এবং মোট সংখ্যাকে ৬০ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে ৬০ বৎসরের যুগ অর্থাৎ ষষ্ঠাব্দের সংখ্যা। আমাদের তাতে প্রয়োজন নাই বলে তাকে উপেক্ষা করা গেল। যা ভাগশেষ রইল তাকে ৫ দিয়ে ভাগ কর, তাহলে সম্পূর্ণ ৫ বৎসরের ক্ষুদ্র যুগ পাওয়া যাবে। তারও ছোট যে ভাগশেষ থেকে যাবে তার নাম 'সম্বৎসর' অর্থাৎ বৎসর। এই 'সম্বৎসর'কে আবার দুই জায়গায় লিখে এক জায়গার সংখ্যাকে ৯ দিয়ে

	১ অংকের সংখ্যা	৬ অংকের সংখ্যা	২ অংকের সংখ্যা	৭ অংকের সংখ্যা	৩ অংকের সংখ্যা	৮ অংকের সংখ্যা	৪ অংকের সংখ্যা	৯ অংকের সংখ্যা	৫ অংকের সংখ্যা	একক বিহীন সংখ্যা
ষষ্ঠাব্দের প্রতি বৎসরের সংখ্যা	১ ১১ ২১ ৩১ ৪১ ৫১	৬ ১৬ ২৬ ৩৬ ৪৬ ৫৬	২ ১২ ২২ ৩২ ৪২ ৫২	৭ ১৭ ২৭ ৩৭ ৪৭ ৫৭	৩ ১৩ ২৩ ৩৩ ৪৩ ৫৩	৮ ১৮ ২৮ ৩৮ ৪৮ ৫৮	৪ ১৪ ২৪ ৩৪ ৪৪ ৫৪	৯ ১৯ ২৯ ৩৯ ৪৯ ৫৯	৫ ১৫ ২৫ ৩৫ ৪৫ ৫৫	১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০
প্রতি বার বৎসরের প্রত্যেক বৎসরের সাধারণ নাম	সম্বৎসর		পরিবৎসর		ইদাবৎসর		অনুবৎসর		উদ্বৎসর	
অধিপতি	অগ্নি		অর্ক, অর্থাৎ সূর্য		শীতময়ূখমালি অর্থাৎ শীতল-কিরণময় = চন্দ্র		প্রজাপতি চন্দ্রপত্নিগণের জনক		শৈলসুতপতি, অর্থাৎ গিরী কন্যার পতি=মহাদেব।	

গুণ কর, আর গুণফলের সঙ্গে অন্যত্র লিখিত সংখ্যাটি যোগ কর। মোট অংকের একচতুর্থাংশ বের করে নাও। এই সংখ্যাটি হবে সম্পূর্ণ চন্দ্রক্ষেত্র। তার ভগ্নাংশ হবে পরবর্তী ক্ষেত্রের অংশ। ধনিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে ঐ লব্ধ সংখ্যার ক্রম অনুযায়ী পরবর্তী ক্ষেত্রগুলি গুণে যেতে থাক; যে ক্ষেত্রে তোমার সংখ্যাগুলি শেষ হবে, সেইটাই হবে সূর্যালোকে বৃহস্পতি উদয়ের ক্ষেত্র। তার থেকে তুমি উপরে বর্ণিত নিয়মে 'বৎসরের মাস' ধরতে পারবে।"

মাঘ মাসের প্রথমে ধনিষ্ঠা ক্ষেত্রে বৃহস্পতির দিবালোকে উদয় থেকে এই 'ষষ্ঠাব্দ' যুগগুলি আরম্ভ হয়। তার অন্তর্গত ক্ষুদ্র যুগগুলিরও এক বিশেষ বিন্যাস আছে; বৎসরের বিশেষ সংখ্যানুযায়ী কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে সেগুলি বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করে পৃথক অধিপতি আছে। নীচের এই সারণীতে তা দেখান যাচ্ছে। ষষ্ঠাব্দের কোন সংখ্যায় তোমার আলোচ্য বৎসর পড়ে, তা জানা থাকলে, সারণীর উপরের ভাগে সন্নিবেশিত সে সংখ্যার ঠিক নীচের ঘরে তুমি সে বৎসর ও তার অধিপতির নাম লেখা দেখতে পাবে।

৪৪৯ তেমনই, ষষ্ঠাব্দের প্রত্যেক বৎসরেরও নাম আছে; যুগেরও আলাদা নাম আছে, যা তাদের অধিপতির নাম। নীচের সারণীতে সেগুলি সন্নিবেশ করেছি। এটিও উপরের সারণীর মত ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ ষষ্ঠাব্দের অন্তর্গত প্রত্যেক বৎসরের নামগুলি থেকে তোমার অভিপ্সিত বৎসরটি খুঁজে নিতে হবে। প্রত্যেকটি নাম ও তার বিধানাধি ব্যাখ্যা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বে। এই তথ্য সংহীতাতে দেওয়া আছে।

এই হল ওদের পুস্তকাদিতে বর্ণিত বর্ষ নির্ণয় পদ্ধতি। তবে আমি কোনও হিন্দুকে বিক্রমাদিত্য-অব্দ থেকে ৩ বিয়োগ করে অবশিষ্টকে ৬০ দ্বারা হরণ করতেও দেখেছি; তারপরে ভাগশেষকে তারা বৃহৎ (ষষ্ঠাব্দ) যুগের প্রারম্ভ থেকে গুণে যেতে থাকে। এ পদ্ধতিটি কোন কাজের নয়। তুমি এ ভাবে কর, কিম্বা সকালের সঙ্গে ১২ যোগ দিয়ে কর, গণনা যেভাবেই কর না কেন, ফল একই হবে।

সারণী

পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ও তদন্তগত প্রতি বৎসরের নাম ও অধিপতি

যুগ					
প্রথম যুগ শুভ। অধিপতি মনু=নারায়ণ।	১ প্রভাব	২ বিভব	৩ শুক্ল	৪ প্রমোদ	৫ প্রজাপতি
২য় যুগ শুভ। অধিপতি সুরেয্য=বৃহস্পতি	৬ অঙ্গিরা	৭ শ্রীমুখ	৮ ভাব	৯ যুব	১০ ধাত্রী
৩য় যুগ শুভ। অধিপতি বলভি .=ইন্দ্র।	১১ ঈশ্বর	১২ বহুধন্য	১৩ পশ্রমাথি	১৪ বিক্রম	১৫ বিষ ? (বৃশ ?)
৪র্থ যুগ শুভ। অধিপতি হুতাশ=অগ্নি।	১৬ চিত্রভানু	১৭ সুভানু	১৮ পার্থিব	১৯ তারণ	২০ বায়
৫ম যুগ মধ্যম। অধিপতি 'দূর্ত' (? ত্রী)=চিত্রা নক্ষত্রের অধিপতি।	২১ সর্বজীৎ	২২ সর্বধারী	২৩ বিরোধ	২৪ বিকৃত	২৫ খর
৬ষ্ঠ যুগ মধ্যম। অধিপতি, প্রোষ্ঠাপদ=উত্তরা ভাদ্রপদা নক্ষত্র অধিপতি।	২৬ নন্দন	২৭ বিজয়	২৮ জয়	২৯ মন্মথ	৩০ চতুর (? দুর্মুখ?)
৭ম যুগ মধ্যম। অধিপতি পিতৃগণ।	৩১ হেমলম্ব	৩২ বিলম্ব	৩৩ বিকার	৩৪ সর্বরী ?)	৩৫ প্লব
৮ম যুগ মধ্যম। অধিপতি শিব=স্থষ্টজীবসমূহ।	৩৬ শোককৃত	৩৭ শুভকৃত	৩৮ ক্রোধ	৩৯ বিশ্বাবসু	৪০ পরাবসু
৯ম যুগ অশুভ। অধিপতি সোম=চন্দ্র।	৪১ প্রবঙ্গ	৪২ কীলক	৪৩ সৌম	৪৪ সাধারণ	৪৫ রোধকৃত
১০ম যুগ অশুভ। অধিপতি সক্রানল=সংযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নি।	৪৬ পরিধাবি	৪৭ প্রসাদিন	৪৮ বিক্রম	৪৯ রাক্ষস	৫০ অনল
১১শ যুগ অশুভ। অধিপতি অশ্বি=অশ্বিনী নক্ষত্রাধিপতি।	৫১ পিঙ্গল	৫২ কালযুক্ত	৫৩ সিদ্ধার্থ	৫৫ রৌদ্র	৫৫ দুর্মদ
১২শ যুগ অশুভ। অধিপতি ভগ=পূর্ব ফল্গুনী নক্ষত্রাধিপতি।	৫৬ দুন্দুভী	৫৭ অঙ্গার	৫৮ রক্তাক্ষ	৫৯ ক্রোধ	৬০ ক্ষয়

কণৌজ অঞ্চলের কয়েকটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল যারা বলেছিল, ওদের দেশে 'সম্বৎসর' চক্রে ১২৪৮ বর্ষ থাকে, তাতে ১০৪ বৎসর করে বারটি 'সম্বৎসর' থাকে। এই সংবাদ অনুসারে 'সক্কাল' থেকে ৫৫৪ বাদ দিতে হবে; যা বাকী থাকবে তা নীচের সারণীভুক্ত সংখ্যার সঙ্গে ব্যবহার করলে কোন্ 'সম্বৎসরে' আলোচ্য বৎসর পড়ছে আর সে সম্বৎসরের কত ভাগ গত হয়েছে, তা ধরা যাবে।

সারণী

বৎসর	১	১০৫	২০৯	৩১৩	৪১৭	৫২১
নাম	রুক্মাক্ষ ?	বৈলবস্ত	কদর	কালবৃন্ত	নওমন্দ্	মেরু
বৎসর	৬২৫	৭২৯	৮৩৩	৯৩৭	১০৪১	১১৪৫
নাম	বর্বর	জম্বু	কৃতি	শর্প	হিন্দু	সিন্ধু

সদ্যোল্লিখিত 'সম্বৎসরের' এইসব নামের মধ্যে জাতি, বৃক্ষ ও পর্বতের নাম শুনে সংবাদদাতাদের উপর আমার সন্দেহ জন্মাল, বিশেষ করে অভিনয় ও ভাঁড়ামি দ্বারা চমৎকৃত করাই যখন তাদের প্রধান কাজ, যেমন মেহদী রাঙানো দাড়ী মাত্র-ই মিথ্যাবাদী হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ। আমি সেজন্য খুব সাবধান হয়ে ওদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং একই প্রশ্ন বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু কী পরস্পরবিরোধী উত্তরই না তারা দিল। একমাত্র আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞানী!

তেষট্টি অধ্যায়

ব্রাহ্মণ ও তার যাবজ্জীবন পালনীয় কর্তব্য

৪৫২ সাত বৎসর বয়ঃক্রমের উর্ধ্বে ব্রাহ্মণের জীবনকাল চার ভাগে বা আশ্রমে বিভক্ত। প্রথম ভাগ অষ্টম বৎসরে আরম্ভ হয়, যখন ব্রাহ্মণেরা উপদেশ ও কর্তব্য শিক্ষা দেবার জন্য তার কাছে আসে এবং সে কর্তব্য পালনে আজীবন নিষ্ঠাবান থাকতে উপদেশ দেয়। তারপর একখণ্ড সুতা তার কটিদেশে বেঁধে দেয় ও 'যজ্ঞোপবীত' নামক একত্রে পাকান নয়টি সুতার দুইটি গুচ্ছ তার গলায় পরিয়ে দেয় এবং কাপড়ের আর একটি উপবীতও সেই সঙ্গে তাকে পরিয়ে দেয়। এই সুতার গুচ্ছগুলি বামস্কন্ধ থেকে দক্ষিণ নিতম্বের উপরে এসে পড়ে। ব্রাহ্মণ বালককে একটি যষ্টিও ধারণ করতে দেওয়া হয়, 'দূর্বা' নামক একপ্রকার ঘাসের তৈরী অঙ্গুরীয় তার দক্ষিণ হাতের অনামিকায় পরতে
৪৫৩ দেওয়া হয়। এই অঙ্গুরীয়কে 'পবিত্র' বলা হয়। এভাবে অঙ্গুরীয় ধারণের উদ্দেশ্য হল, সে হাত দিয়ে সে যা দান করবে তা সুলক্ষণ ও কল্যাণযুক্ত হবে। তবে 'যজ্ঞোপবীত' ধারণ সম্পর্কে যেমন কঠোরতা, অঙ্গুরীয় ধারণের বেলায় তেমন নয়, কেননা কোনও অবস্থাতেই দেহ থেকে সে উপবীত পৃথক করতে পারবে না। ভোজনকালে উপবীত খুলে রাখলে কিম্বা উপবীতহীন অবস্থায় মলমূত্র-ত্যাগ করলে সে পাপগ্রস্ত হবে, উপবাস বা দান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত না করলে যার মোচন হবে না।

ব্রাহ্মণের জীবনের এই প্রথম ভাগ (আশ্রম) তার ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত থাকবে, বিষ্ণুপুরাণে ২৫-এর স্থলে আমি ৪৮ পেয়েছি। এই আশ্রমে তার অবশ্য কর্তব্য হবে, ব্রহ্মচর্য পালন, ভূমিতে শয়ন ও দিবারাত্র গুরুর সেবা করে তার কাছে বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করা, বেদের ভাষ্য, ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করা। দিনে তিনবার সে স্নান করবে ও প্রাতঃ সন্ধ্যায় হোম করে গুরুকে প্রণাম করবে এবং একদিন অন্তর উপবাস করবে। যে-কোন মাংস তার জন্য নিষিদ্ধ। গুরুগৃহে সে বাস করবে এবং দিনের মধ্যে মাত্র একবার, মধ্যাহ্নে কিম্বা সায়াহ্নে, দান যাচঞা করবে, কিম্বা মাত্র পাঁচটি গৃহে ভিক্ষার জন্য বেরুতে পারে। ভিক্ষায় সে যা পাবে তা সবই গুরুকে নিবেদন করবে। তিনি

তার থেকে ইচ্ছামত দ্রব্য তুলে নেওয়ার পর, অবশিষ্ট ভাগ শিষ্যকে নিতে অনুমতি দেবেন। এইভাবে গুরুর উদ্বৃত্ত অন্নে সে জীবন ধারণ করবে। ব্রাহ্মণ, তাছাড়া হোমাগ্নির জন্য পলাশ ও 'দর্ব'বৃক্ষের কাঠ সংগ্রহ করে আনবে, কারণ, অগ্নি হিন্দুদের পূজনীয়, তাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। সব জাতির মধ্যেই এই রকম রীতি আছে; তারা মনে করত, অগ্নি যদি নৈবেদ্য স্পর্শ করে তাহলে দেবতা তা গ্রহণ করে। বিগ্রহ, নক্ষত্র, গাভী, গাধা বা প্রতিকৃতি, কোন কিছুর পূজাই তাদিগকে এ বিশ্বাস থেকে টলাতে পারে নি, সেইজন বশ্শার ইবনে বুরুদ একটি কবিতাংশে বলেছেন : 'অগ্নির কারণেই অগ্নি পূজ্য।'

ব্রাহ্মণের জীবনের দ্বিতীয় ভাগ ২৫ থেকে ৫০ বৎসর, বিষ্ণুপুরাণমতে
৪৫৪ ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই ভাগে গুরু তাকে দার পরিগ্রহণ করার অনুমতি দেবেন। সে তখন বিবাহ করে গৃহসংসার পাতবে এবং বংশরক্ষার সংকল্প করবে, কিন্তু মাসে মাত্র একবার স্ত্রীর ঋতুস্নানের পর সঙ্গম করবে। দ্বাদশ বৎসরোর্দ্ধা কন্যা বিবাহ ব্রাহ্মণের জন্য নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপনা করে, পারিশ্রমিক হিসাবে নয়, দক্ষিণা ও উপঢৌকন স্বরূপ যা পাবে তাই দিয়ে, কিম্বা অন্যের যজ্ঞে পৌরহিত্যের দক্ষিণাতে, অথবা রাজা ও শ্রেষ্ঠীদের দেওয়া ধন, যার প্রার্থনায় দীন অনুনয় নাই, আর যার দানে দাতার অনিচ্ছা নাই, সেই ধনে ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করবে। এইসব লোকের গৃহে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও পুণ্য কর্মের জন্য একজন করে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকে, তাকে 'পুরোহিত' বলা হয়। ভূমি বা বৃক্ষ থেকে সংগৃহীত দ্রব্যেও ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। বস্ত্র ও গুবাকের বাণিজ্যে ব্রাহ্মণ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারে, তবে নিজে না করে 'বৈশ্য' তার হয়ে ব্যবসা করাই উত্তম। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যবসা নীতিগতরূপে বারণ এইজন্য যে তাতে প্রতারণা ও মিথ্যাচারের যোগ থাকে। জীবিকার যখন অন্য আর কোন উপায় না থাকে কেবল তখনই ব্রাহ্মণ ব্যবসা করতে পারে। অন্যান্য বর্ণের মত, ব্রাহ্মণের রাজাকে কোনও কর দিতে বা বেগার খাটতে হয় না। অশ্ব, গাভী ও অন্যান্য গবাদী পশুর পরিচর্যায় নিরত থাকা ও সুদী কারবার করাও ব্রাহ্মণের জন্য নিষিদ্ধ। নীল রং তার জন্য অশুচি, সে রঙ তার শরীরে লাগলে স্নান করা বিধেয়। ব্রাহ্মণকে সর্বদা অগ্নির সমক্ষে খঞ্জনী বাদন ও শাস্ত্রসম্মত মন্ত্রপাঠে রত থাকতে হবে।

তার জীবনের তৃতীয় ভাগ ৫০ থেকে ৭৫, বিষ্ণুপুরাণমতে ৯০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত। জীবনের এই পর্যায়ে সে ব্রহ্মচারী হবে, স্ত্রী তার সাথে বনে যেতে সম্মত না হলে তাকে পুত্রের হাতে সমর্পণ করে গৃহসংসার ত্যাগ

করবে এবং জনপদের বাইরে গিয়ে প্রথম ভাগের মত জীবনযাপন করবে। ছাদের নীচে কখনও বাস করবে না, কেবল লজ্জা নিবারণের জন্য যতটুকু
৪৫৫ 'বল্কল' প্রয়োজন, তাছাড়া আর কিছু পরিধান করবে না, অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করবে, ফল, পাতা ও মূল ছাড়া আর কিছু আহার করবে না, কেশবর্ধন ও জটা ধারণ করবে আর কখনও তৈল মর্দন করবে না।

আর, আয়ুর শেষ অবধি চতুর্থ পর্যায়। সে পর্যায়ে ব্রাহ্মণ রক্ত বস্ত্র পরিধাণ করবে, হাতে যষ্টি ধারণ করবে, সর্বদা ধ্যান করবে এবং অন্তঃকরণকে সর্বপ্রকার মৈত্রী ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখবে। মন থেকে কাম, লোভ ও ক্রোধ সম্পূর্ণ নির্মূল করবে, একান্ত নিঃসঙ্গে বাস করবে, পুণ্যার্জনের জন্য তীর্থক্ষেত্রে যাবার পথে কোনও গ্রামে একদিন ও নগরে ৫ দিনের বেশী অবস্থান করবে না, কেউ কোনও খাদ্যদ্রব্য দান করলে পরদিনের জন্য তার অবশিষ্ট সঞ্চয় করে রাখবে না, পরিত্রাণের পথ সন্ধান ব্যতীত তার অন্য কোনও চিন্তা থাকবে না এবং মোক্ষ ছাড়া তার অন্য কোনও কাম্য থাকবে না, যে অবস্থা থেকে আর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন হবে।

ব্রাহ্মণের আজীবন সাধারণ কর্তব্য হচ্ছে পুণ্যকর্ম, দান ও দানগ্রহণ। কারণ, ব্রাহ্মণকে যা দান করা হয় তা পিতৃদের কাছেই যায়। তার কর্তব্য সর্বদা মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নি পরিগ্রহণ, তার পূজা ও আহুতি প্রদান এবং যাতে হোমাগ্নি নিভে না যায় তার যত্ন নেওয়া, যেন সে অগ্নি মৃত্যুর পর তাকে দগ্ধ করে। অগ্নির এইরূপ পরিচর্যা করাকে 'হোম' বলে। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় সে স্নান করবে; উদয়সন্ধ্যায়, অর্থাৎ উষায়, অস্তসন্ধ্যায়, অর্থাৎ গোধূলিতে, আর এই দুই সন্ধ্যার মাঝে মধ্যাহ্নে। প্রাতঃস্নানের কারণ, রাত্রির নিদ্রাকালে দেহের রন্ধ্রগুলি শিথিল হয়ে যায়। স্নান শরীরের সাময়িক মালিন্য দূর করে পূজার (صلاة) যোগ্যতা দান করে।

জপ, স্তোত্রপাঠ ও বিধিমত প্রণাম, এই হল ওদের পূজা। যুক্তকরে সূর্যের দিকে মুখ করে দুই অঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা ওদের নিয়ম। সূর্য যেদিকে থাকে সেই দিকেই ওদের 'কিবলা', কেবল দক্ষিণদিক ছাড়া; ওরা সেদিকে মুখ করে, কেবল অহিত ও নিষ্ফলা কর্ম ছাড়া কোনও
৪৫৬ পুণ্যকার্য করে না; মধ্যাহ্নের পর সূর্যের নিম্নগতির কালই (অপরাহ্ণ) হচ্ছে পরকালে সুপ্রতিফল পাওয়ার প্রশস্ত সময়, সেজন্য ব্রাহ্মণকে সে সময়ে শুচি ও পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তব্য। সায়ংকাল আহার ও পূজার সময়, স্নান না করেও এ দুটি কর্ম করার অনুমতি আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও

দ্বিতীয় বারের স্নানের মত তৃতীয় বার স্নানের বিধান তেমন কঠোর নয়। তবে, গ্রহণকালে রাত্রে স্নান ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য, যাতে শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান ও কৃত্যাদি সম্পন্ন করতে পারে। আজীবন ব্রাহ্মণ দৈনিক মাত্র দুই বার ভোজন করে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে। ভোজনেচ্ছা হলে, সে প্রথমে একটি বা দুইটি লোকের উপযুক্ত অন্ন দান করার জন্য আলাদা করে রেখে দেবে, বিশেষ করে সন্ধ্যাকালে আগন্তুক অপরিচিত ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের জন্য। কারণ, অতিথিসৎকারে অবহেলা করা মহাপাপ। তারপর, অন্নের কিয়দংশ পশুপক্ষী ও অগ্নির উদ্দেশে রেখে দেবে। অবশিষ্ট ভাগ সে ভগবানের নামোচ্চারণ করে আহার করবে। যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা গৃহের বাইরে রেখে দেবে, তার নিকটে আর যাবে না, কারণ তাতে আর তার অধিকার নাই, উদ্বৃত্ত অন্নটুকু ক্ষুধার্ত পথচারীর ভাগ, সে মানুষ, পক্ষী, কুকুর বা যা-ই হোক না কেন। নিজ ব্যবহারের জন্য ব্রাহ্মণের একটি পৃথক জলপাত্র থাকতে হবে; নিজস্ব না হলে তাকে ভেঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ভোজনপাত্রগুলি সম্বন্ধেও তাই নিয়ম। একজন ব্রাহ্মণকে দেখেছিলাম যে তার আত্মীয়-পরিজনকে নিজের ভোজনপাত্রে খেতে দিয়েছিল, কিন্তু তার জন্য অন্য ব্রাহ্মণরা একবাক্যে তার নিন্দা করেছিল।

উত্তরে সিন্ধু নদী, আর দক্ষিণে 'চরমন্মতি' (چر منوة চর্ম্মাত ?) নদী, আর পূর্ব ও পশ্চিমের সাগর, এই সীমানার মধ্যবর্তী ভূভাগে ব্রাহ্মণ বাস করতে বাধ্য; এই ভূভাগ অতিক্রম করে তুরস্ক দেশে বা 'কর্ণাটে' প্রবেশ করা তার জন্য নিষিদ্ধ। লোকে বলে, যেদেশে অনামিকাতে অঙ্গুরীয় রূপে পরিধেয় ঘাস (কুশ বা দূর্বা) জন্মায় না, কিম্বা কৃষ্ণবর্ণের হরিণ যে দেশে নাই, সেদেশে ব্রাহ্মণের বাস করা অবিধেয়। এটি আসলে উপরোক্ত সীমান্তর্গত ভূভাগের বর্ণনা। সে সীমানা অতিক্রম করলে ব্রাহ্মণ পাতকি হবে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

৪৫৭ যে দেশে সম্পূর্ণ রন্ধনশালা মৃত্তিকালিপ্ত নয় এবং সেজন্য যেখানে প্রত্যেক ভোজনার্থীর জন্য জল ঢেলে গোময়লিপ্ত করে পৃথক পৃথক আসন তৈরী করতে হয়, সেখানে ব্রাহ্মণের আসন চতুষ্কোণ হওয়া উচিত। যারা এই আসন প্রস্তুত করে, ব্রাহ্মণের আসন চতুষ্কোণ হওয়ার হেতু সম্বন্ধে তারা

বলে : আহারের দরুন স্থানটি অশুচি হয়ে যায়, শুচিতা ফিরিয়ে আনার জন্য আহারান্তে স্থানটি ধুয়ে মৃত্তিকা দিয়ে লেপন করতে হয়। অতএব, অশুচি স্থানটি যদি নির্দিষ্ট করে না নেওয়া হয় তাহলে অন্যসব স্থানও ঐরকম অশুচি বলে সন্দেহ হবে। পাঁচ প্রকারের উদ্ভিদ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য : পেঁয়াজ, রশুন, একপ্রকার লাউ (ছত্রাক) 'গৃঞ্জন' নামক গাজরের মত একপ্রকার লতামূল এবং ওদের পুষ্করিণীর ধারে উৎপন্ন একপ্রকার শাক, যাকে ওরা 'নালী' (নালিতা) বলে।

চৌষট্টি অধ্যায়

অব্রাহ্মণদের আজীবন পালনীয় কর্তব্যকর্মাদি

ক্ষত্রিয় বেদ পাঠ ও অধ্যয়ন করবে, কিন্তু শিক্ষা দেবে না; অগ্নিতে অর্ঘ্য দেবে ও পুরাণোক্ত কৃত্যাদি করবে; যেখানে আহারের আসন তৈরী করতে হবে, সেখানে ক্ষত্রিয়ের আসন হবে ত্রিকোণাকৃতি। সে জনতাকে শাসন করবে এবং তাদের রক্ষা করবে, কারণ এই কর্মের জন্যই সে সৃষ্ট হয়েছে। তিনি ক্ষের যজ্ঞোপবীতের একটি সুতা সে উপবীতের মত ধারণ করবে, তার সঙ্গে তুলোজাত আর একটি সুতা থাকবে। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হলে তার উপনয়ন হবে।

বৈশ্যের কর্তব্য কৃষিকর্ম, ভূমিকর্ষণ, পশুপালন ও ব্রাহ্মণের অভাব মোচন। দুই সুতার একটি মাত্র উপবীত সে ধারণ করতে পারে।

আর, শূদ্র ব্রাহ্মণের দাসস্বরূপ, ব্রাহ্মণের গৃহকর্ম ও সেবাতে নিরত থাকাই তার ধর্ম। নীচ কুলোদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যজ্ঞোপবীত শূন্য হয়ে থাকতে না চায়, তাহলে কেবল সুতার একটি উপবীত সে ধারণ করতে পারে। পূজা, বেদপাঠ, হোম প্রভৃতি যে সব কর্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার সে সব শূদ্রের জন্য এত কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ যে, বৈশ্য বা শূদ্র বেদোচ্চারণ করেছে, এমন অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ তাকে রাজার কাছে
৪৫৮ ধরে নিয়ে যাবে এবং রাজা তার জিহ্বা ছেদন করবে। তবে ঈশ্বরের নাম জপা, পুণ্য কর্ম, দান-দক্ষিণা শূদ্রের জন্য নিষিদ্ধ নয়। যে বর্ণের জন্য যে জীবিকা নিষেধ—যেমন ব্রাহ্মণের জন্য বাণিজ্য, শূদ্রের জন্য কৃষি—সে ঐ জীবিকা গ্রহণ করলে পাপাচারী হবে, যদিও পরস্বাপহরণ থেকে তা ঈষৎ লঘুতর পাপ।

হিন্দুদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, রামরাজার যুগে, মানুষ দীর্ঘায়ু হোত, পরমায়ু নির্দিষ্ট ও সুবিদিত থাকতো। সেজন্য পিতার পূর্বে কখনও পুত্রের মৃত্যু হোত না। ঘটনাক্রমে এক ব্রাহ্মণের জীবৎকালে তার পুত্রের মৃত্যু হোল। ব্রাহ্মণ মৃত পুত্রের শব রাজদ্বারে নিয়ে এসে রাজাকে বলল, 'দেশে ঘোর পাপ না হলে তোমার রাজ্যকালে এমন দুর্ঘটনা হতো না, নিশ্চয়

কোনও মন্ত্রী তোমার রাজ্যে অধর্ম করেছে'। রাম তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে জানতে পারলেন যে, এক 'চণ্ডাল' কঠিন তপস্যায় ও আত্মনিগ্রহে রত রয়েছে। রাম তখন অশ্বারোহণে গিয়ে তাকে গঙ্গাতীরে অধোমুখে লম্ববান অবস্থায় দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ ধনুকের জ্যাকর্ষণ করে রাম শরাঘাতে লোকটির উদর বিদীর্ণ করলেন। তারপর বললেন: 'ঠিক হয়েছে। যে সৎ-কর্মে তোমার অধিকার নাই তার কারণেই তোমাকে বধ করলাম।' রাজ-প্রাসাদেহ ফিরে এসে রাম দেখলেন যে তার দ্বারে রক্ষিত ব্রাহ্মণপুত্র জীবিত হয়েছে।

'চণ্ডাল' ব্যতীত অন্য আর সবাই হিন্দু না হলে, ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়। ম্লেচ্ছ অর্থ কলুষিত, যারা প্রাণী হত্যা, পশু বধ ও গোমাংস ভক্ষণ করে।

এসব বিধান কেবল শ্রেণী বা বর্ণের পার্থক্য রক্ষা করার জন্য রচিত হয়েছে, যার বলে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর বেগার মজুরে পরিণত হয়েছে। তা নইলে ত' সব মানুষই সমান। যেমন বাসুদেব মোক্ষপ্রার্থী সম্বন্ধে বলেছেন: 'বুদ্ধিমান লোকের কাছে ব্রাহ্মণ, চন্ডাল, শত্রুমিত্র, বিশ্বস্ত ও শঠ, এমনকি অহি ও নকুল সবই সমান। কেননা, বুদ্ধিই সকলকে সমান করে আর অজ্ঞান সকলকে পৃথক ও ভিন্ন করে।'

অর্জুনকে বাসুদেব বলছেন: 'সৃষ্টি রক্ষা করাই যদি আমাদের অভীষ্ট হয়, আর বিনা যুদ্ধে যদি পাপ নাশ করা সম্ভব না হয় তাহলে আমাদের মত
৪৫৯ বুদ্ধিমানদের কর্তব্য বিহিত কর্ম ও যুদ্ধ করা। আমাদের নিজস্ব কোনও অপূর্ণতা দূর করার জন্য আমরা এ কর্ম করব, তা নয়, রোগের চিকিৎসা ও অনিষ্ট দূর করার জন্যই তা করা আবশ্যক। বয়স্কদের কার্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য না বুঝেই শিশুরা যেমন তাদের অনুকরণ করে থাকে মূর্খরা তেমনই আমাদের অনুকরণ করবে; কেননা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে তাদের স্বভাব অনুৎসাহী; কেবল কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হয়েই তারা বল প্রয়োগ করে। পণ্ডিত ও জ্ঞানীব্যক্তিরা এসব বিষয়ে তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত'।

পঁয়ষট্টি অধ্যায়

যজ্ঞ

বেদের অধিকাংশ শ্লোকেই নানাবিধ যজ্ঞের বিবরণ আছে। অনুষ্ঠান ভেদে সেগুলি নানা প্রকারের। কতকগুলি এমন যা রাজচক্রবর্তী ছাড়া কেউ করতে পারে না। যেমন 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ : একটি অশ্বীকে পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে যথেচ্ছা চরে বেড়ায়, কেউ তাকে বাধা দেয় না। তার পশ্চাতে সৈন্যরা থেকে তাকে চালনা করে নিয়ে যায় এবং তার অগ্রে ঘোষণা করতে থাকে—'এ অশ্বী মহীপতির; যে তা অস্বীকার করবে যুদ্ধার্থে সে এগিয়ে আসুক।' ব্রাহ্মণরা তার অনুসরণ করে; যেখানে অশ্বী মলত্যাগ করে সেখানে তারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে। এইভাবে অশ্বী যখন পৃথিবীর সব দিক পরিভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসে তখন সে ব্রাহ্মণ ও তার অধিকারীর ভক্ষ্য হয়।

তাছাড়া, যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক দৈর্ঘ্যেও পার্থক্য আছে। কতকগুলি এমন যা কেবল অতি দীর্ঘায়ু লোকই করতে পারে। আমাদের একালে তেমন দীর্ঘ-জীবন মানুষের হয় না, সে জন্য অনেক যজ্ঞই এখন পরিত্যক্ত হয়েছে; মাত্র কয়েকটি অবশিষ্ট আছে যা এখনও অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দুদের বিশ্বাসমতে, অগ্নি সর্বভুক, কোনও মলিন বস্তু প্রবেশ করলে, জলের মত, অগ্নিও কলুষিত হয়ে যায়। অহিন্দুর হাতের জল ও অগ্নি সম্বন্ধে, তাই ওরা অত্যন্ত সতর্ক, কারণ তাদের স্পর্শে সেগুলি অশুচি হয়ে যায়।

যজ্ঞের যেভাগ অগ্নি ভক্ষণ করে, তা দেবতাদের কাছে যায়, কারণ অগ্নি দেবতাদের মুখ থেকে নির্গত হয়। অগ্নিকে ব্রাহ্মণ যে ভোগ দেয়, তা তৈল ও নানাবিধ শস্যবীজ, যেমন গম, যব, ধান্য ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ এসব অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এবং নিজের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে সেই সঙ্গে বেদের নির্দিষ্ট
৪৬০ শ্লোক পাঠ করে। অন্যের নামে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে কিছু পাঠ করতে হবে না।

'বিষ্ণুধর্মে' উল্লেখ আছে : পুরাকালে 'হিরণ্যাক্ষ' নামে একজন পরাক্রান্ত মহাবলশালী দৈত্য এক বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি ছিল। 'দকিস্' (دکیش দক্ষি ? দাক্ষায়নি ? = দক্ষকন্যা সতী) নামে তার এক কন্যা ছিল, যে সর্বদা

নিষ্ঠার সাথে পূজার্চনায় রত থাকত এবং ভোগবিলাস, ত্যাগ ও উপবাস করে আত্মশুদ্ধির সাধনা করত। তার প্রতিফলস্বরূপ কন্যা ঊর্ধ্বলোকে স্থান পেল এবং 'মহাদেবের' সঙ্গে তার বিবাহ হোল। নির্জনে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাদেব যখন দেবতাদের রীতি অনুযায়ী বিলম্বিত বীর্যপাত ও দীর্ঘসহবাসে রত হলেন, তখন অগ্নি তা জানতে পেরে এই আশংকায় ভীত হোল যে হয়ত মহাদেব ও তাঁর স্ত্রী তাঁদেরই মত আর একটি অগ্নিতুল্য পুত্রের জন্মের দেবেন। অগ্নি তাই তাঁদের সহবাসকে কলুষিত ও বিনষ্ট করতে কৃতসংকল্প হোল। মহাদেব যখন অগ্নিকে দেখতে পেলেন তখন ক্রোধানলে তাঁর ললাট স্বেদযুক্ত হোল এবং কয়েক বিন্দু স্বেদ ভূমিতে পতিত হোল। ভূমি তা পান করে নিল এবং তার ফলে 'মঙ্গল', অর্থাৎ দেব সেনাপতি 'স্কন্ধ'কে গর্ভে ধারণ করল। সৃষ্টিনাশকারী 'রুদ্র' মহাদেবের বীর্য নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করল। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ হয়ে সে শুক্র ভূমিগর্ভে ছড়িয়ে পড়ল। অগ্নি কিন্তু লজ্জায় ও দুশ্চিন্তায় শ্বেতকুষ্ঠের বর্ণ ধারণ করে 'পাতালে', অর্থাৎ ভূমির নিম্নতম তলে নেমে গেল। অগ্নিকে তখন দেখতে না পেয়ে দেবতারা তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোল। তখন এক মন্ডূক অগ্নির গোপন আশ্রয়স্থলটির প্রকাশ করে দিল। দেবতাদিকে দেখতে পেয়েই অগ্নি সেস্থান ত্যাগ করে 'অশ্বত্থ' বৃক্ষে আত্মগোপন করল এবং মন্ডূককে অভিশাপ দিল, যেন তার স্বর কর্কশ হয় এবং সকলের মনে সে ঘৃণার উদ্রেক করে। তারপর আবার শুকপক্ষী দেবগণকে অগ্নির গুপ্ত স্থান দেখিয়ে দিল। তাতে অগ্নি তাকে শাপ দিল,—তার জিহ্বা উল্টে গিয়ে অগ্রভাগে জিহ্বামূল থাকবে। কিন্তু দেবগণ সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বলল: 'তোমার জিহ্বা উল্টে গেলে তোমরা মনুষ্যগৃহে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে ও উত্তম খাদ্য খাবে।' অশ্বত্থ বৃক্ষ থেকে পলায়ন করে অগ্নি তখন 'শামি' (شمی ?) বৃক্ষে আশ্রয় নিল। সেখানে কিন্তু হস্তি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। তাতে অগ্নি তাকেও জিহ্বা উল্টে যাবার অভিশাপ দিল। দেবতা তখন তাকে বলল: তোমার জিহ্বা যদি উল্টে যায়, তাহলে তুমি মানুষের আহার্যের
৪৬১ ভাগ পাবে, তাদের কথা বুঝতে পারবে'। অবশেষে দেবগণ অগ্নিকে ধরে ফেলল। কিন্তু তার কুষ্ঠ হওয়ার জন্য অগ্নি তাদের সঙ্গে বাস করতে অস্বীকার করল। দেবতারা তখন তাকে নিরাময় করে তার শ্বেতী দূর করে দিল এবং সসম্মানে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তারপর দেবগণ অগ্নিকে মানুষ ও দেবতার মধ্যেকার উপলক্ষ করে দিল যে, মানুষের হাত থেকে দেবতাদের ভাগ গ্রহণ করে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।

ছেষট্টি অধ্যায়

তীর্থ দর্শন ও পুণ্যক্ষেত্র ভ্রমণ

তীর্থ করা হিন্দুদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গন্য নয়, তবে ধর্মানুগ ও পুণ্যকর্ম। ওদের তীর্থকৃত্য এইরূপ ঃ তীর্থকামী কোনও পীঠস্থান, বহু-পূজা বিগ্রহ, কিম্বা পূতসলীলা নদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নদীতে স্নান করে সে বিগ্রহ পূজা করে, অর্ঘ্য দেয়, নানা প্রকার স্তব ও মন্ত্র পাঠ করে, উপবাস করে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও অন্যান্য লোককে দান-দক্ষিণা দেয় এবং সবশেষে মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

পবিত্র ও কীর্তিত-মহাত্ম্য কুণ্ডগুলি মেরুর চতুর্দিগে হিমপর্বতে অবস্থিত। বিষ্ণু ও বায়ু উভয় পুরাণেই সেগুলি সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ

মেরুপর্বতের পাদদেশে 'অরহত' নামক এক বিশাল সরোবর আছে, যার প্রভা চন্দ্রের মত বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মহা পবিত্র স্বর্ণপ্রবাহিনী 'জম্বু' নদী তার থেকে উৎসারিত হয়েছে।

'শ্বেতা' (?شو بت) পর্বতের সন্নিকটে আছে 'উত্তরামানস' হ্রদ; তার চতুর্দিকে আরও বারটি সরোবর আছে, তার প্রত্যেকটি এক একটি হ্রদের সমান। সরোবরগুলি থেকে 'সান্দি' (?) ও 'মধ্বী' (مدی) নদীদ্বয় 'কিম্পুরুষের' দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

নীলাগিরীর কাছে 'পয়োধি' নামক কমলাস্তীর্ণ পুষ্করিণী আছে। 'নিষাধ' পর্বতের কাছে আছে 'বিষ্ণুপদ' কুণ্ড যার থেকে 'স্বরস্বতী' অর্থাৎ 'সরসুত', নদী প্রবাহিত। তাছাড়া 'গন্ধর্ব' নদীও তার থেকে উৎসারিত। 'কৈলাস' পর্বতে আছে সমুদ্রতুল্য বৃহৎ 'মন্দ' হ্রদ, যার থেকে 'মন্দাকিনী' নদী প্রবাহিত। 'কৈলাসে'র উত্তর-পূবে 'চন্দ্রপর্বত', তার সানুদেশে আছে 'আযুদ' সায়র, যার থেকে 'আযুদ' নদী প্রবাহিত। কৈলাসের দক্ষিণ-পূর্বে লোহিত পর্বত, তার পাদদেশে লোহিত সরোবর, তার থেকে 'লোহিত নদী' উৎসারিত। কৈলাসের দক্ষিণে আছে সরযুসতি (?) পর্বত, তার পাদমূলে মানস সরোবর; তার থেকে সরযু নদী প্রবাহিত। কৈলাসের পশ্চিমে চির-তুষারাবৃত দুরারোহ 'অরুণ' পর্বত; তার পাদদেশে 'শৈলোদ' সরোবর, যার

থেকে 'শৈলোদ নদী' উৎসারিত হয়েছে। কৈলাসের উত্তরে আছে গৌরপর্বত, তার পাদদেশে আছে 'বন্দশহর' (بندسر) অর্থাৎ স্বর্ণবালুকা। এই সরোবরের নিকটে রাজা ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন।

তাঁর ইতিহাস এই : 'সগর নামে ওদের এক রাজার ৬০ হাজার পুত্র ছিল; সবাই দুষ্ট ও নীচমনা। একবার তাদের একটি অশ্ব হারিয়ে যায়। অশ্ব অন্বেষণ করতে গিয়ে পৃথিবীর উপরে তারা এমন প্রচন্ড ভাবে ছুটোছুটি করতে থাকল যে তার আঘাতে ভূমি ধসে গেল। তারা ভূমিগর্ভে অশ্বটিকে এমন এক ব্যক্তির সম্মুখে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেল যে কোটরগত চক্ষু থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। তারা নিকটবর্তী হলে, লোকটি নেত্রাগ্নি দিয়ে তাদিগকে আঘাত করল। তৎক্ষণাৎ তারা ভস্মীভূত হয়ে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য নরকে নিপতিত হোল। পৃথিবীর যে অংশ ধসে গিয়েছিল, সেখানে এক বিরাট সাগরের সৃষ্টি হোল। অনন্তর এই রাজার বংশে আর একজন রাজা হোল। তার নাম রাজা ভগীরথ। তার পূর্বপুরুষদের দশা শুনে সে দুঃখিত হোল। উপরোক্ত সরোবরে, যার তলদেশ মসৃণ স্বর্ণে মণ্ডিত ছিল, গিয়ে সে তাদের জন্য দিবসে অনশন ও রাত্রিতে তপস্যা করতে লাগল। অব-
৪৬৩ শেষে মহাদেব তার মনস্কামনা জানতে চাইলেন, সে বলল, আমি স্বর্গে প্রবাহিত গঙ্গার জলধারা প্রার্থনা করি, কারণ আমি জানি, গঙ্গার জলধারা যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে তার পাপ মোচন হবে। মহাদেব তার সে ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। কিন্তু আকাশের ছায়াপথ ছিল গঙ্গার খাত, আর গঙ্গাও ছিল অত্যন্ত অহংকরী, কেননা কেউ তার বেগ ধারণ করতে পারত না। সেজন্য মহাদেব তাকে নিজ মস্তকে ধারণ করলেন। এই অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে গঙ্গা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচন্ড তরঙ্গ সৃষ্টি করল ও বিপুল গর্জন করতে থাকল। মহাদেব কিন্তু তাকে এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রইলেন যে, নীচে পতিত হওয়া তার অসাধ্য হোল। মহাদেব তখন গঙ্গার কিয়দংশ নিয়ে ভগীরথকে দিলেন। ভগীরথ তার সপ্তধারার কেন্দ্রধারাকে তার পূর্বপুরুষের অস্থির উপর দিয়ে প্রবাহিত করল, তার ফলে নরকযন্ত্রণা থেকে তারা পরিত্রাণ পেল। এইজন্য হিন্দুরা মৃতের অস্থিভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। রাজা তাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেছিল বলে এই ভগীরথের নামেও গঙ্গা অভিহিত হয়ে থাকবে।

হিন্দুদের শ্রুতি থেকে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, দ্বীপসমূহে গঙ্গার মতই পুণ্যতোয়া আরও নদী আছে। যে সব স্থানে বিশেষ মাহাত্ম্য আরোপ করা হয়, সেখানে ওরা স্নানের জন্য কুন্ড বা জলাশয় নির্মাণ করে।

এই নির্মাণকার্যে ওরা এমন দক্ষতা অর্জন করেছে যে, আমাদের মুসলমানরা সেসব দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। সেরূপ কিছু নির্মাণ করা ত দূরের কথা, তার বর্ণনা পর্যন্ত করতেও পারে না। বিরাট বিরাট প্রস্তরখন্ড দিয়ে ওরা এসব পুষ্করিণী নির্মাণ করে, তীক্ষ্ণ ও মজবুত লৌহ-বন্ধনী দিয়ে পরস্পরাবদ্ধ প্রস্তর খন্ড পুষ্করিণীর চতুর্দিকে একটির উপর আর একটি সন্নিবেশ করে প্রশস্ত তাক বা চত্বর শ্রেণী নির্মাণ করে। এক একটি তাকের উচ্চতা মানুষের সমান হয়। এইরূপ দুইটি তাকের মধ্যেকার প্রস্তরগাত্রে শৃঙ্গমালার ন্যায় উর্ধ্বগামী সোপান নির্মাণ করে। প্রথমোক্ত তাকগুলি পুষ্করিণীর চতুর্দিকের পথ বা মার্গ, আর দ্বিতীয়গুলি হয় সোপান। যথেষ্ট সংখ্যক সোপান থাকায় বহু লোকের একই সময়ে নামা-ওঠা করতে কেউ কারও সম্মুখে পড়ে না বা পথরোধ করে না; অবতরণকারীকে সহজেই পথ ছেড়ে উত্তরণকারী ঈষৎ ঘুরে সেই ধাপের অন্যত্র দিয়ে উঠে যেতে পারে। এই ভাবে ভিড়ের অসুবিধা এড়ান যায়।

৪৮৪ মুলতানে একটি পুষ্করিণী আছে যাতে বাধা না দিলে হিন্দুরা পুণ্যস্নান করে। বরাহমিহিরের সংহীতায় উল্লিখিত হয়েছে যে থানেশ্বরে একটি সরোবর আছে, যার জলে অবগাহন করতে দূর দূরান্ত থেকে হিন্দুরা আসে। তার হেতু সম্বন্ধে ওরা বলে যে, গ্রহণকালে অন্য সমস্ত পুণ্য সরোবরের জল এই সরোবরে আসে, সেজন্য, সেই সময়ে এই সরোবরে স্নান করলে অন্যান্য কুন্ডের প্রত্যেকটিতে স্নানের মতই সুফলপ্রদ। তৎপরে বরাহমিহির মন্তব্য করেছেন: 'লোকে বলে, রাহু যদি সূর্য-চন্দ্র গ্রাস না করত, অন্য পুষ্করিণীগুলি এই সরোবর দর্শনে আসত না।'

কুন্ডগুলির মাহাত্ম্যের কারণ, হয় তাতে কোনও বড় ঘটনা ঘটেছে, নয়ত শাস্ত্রগ্রন্থে বা শ্রুতিতে তার প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। সৌনকের উক্তি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি, যা ঈশ্বর কর্তৃক ব্রহ্মাকে বলা হয়েছিল বলে শুক্রাচার্য ব্রহ্মার মুখ থেকে শুনে সৌনককে বলেছিলেন। এই ঐশ্বরিক বাণীতে বলি রাজার উল্লেখ করা হয়েছে, নারায়ণ যাকে পাতালে নিপতিত করা পর্যন্ত সে কি কি করবে তা বলা হয়েছে। সৌনকের এই উক্তিতেই আছে 'তার সঙ্গে আমার এই কার্যের উদ্দেশ্য হোল যে, মানুষের মধ্যে যে সাম্য সে স্থাপন করতে চেয়েছিল তা দূর হবে, মানুষের মধ্যে জীবনযাত্রার পার্থক্য থাক্‌বে এবং এই প্রভেদের উপর বিশ্বের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বে। অধিকন্তু, তার উপাসনা ছেড়ে মানুষ আমাকে উপাসনা করবে আর আমাতে বিশ্বাস করবে।'

নাগরিকদের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য যেমন তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকা দরকার, যার দরুন একজন আর একজনের প্রয়োজন বোধ করে, তেমনই ঈশ্বর নানা প্রভেদ সম্পন্ন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। দেশে দেশে প্রভেদ আছে; কোনও দেশ শীতল, কোনটি উষ্ণ. কোনও দেশের মাটি জল-বায়ু উত্তম, আর কোনও দেশের মাটি লবণাক্ত, জল দুর্গন্ধ ও দূষিত, বায়ু অস্বাস্থ্য-কর। এইরকম আরও নানাধরনের প্রভেদ রয়েছে; যেমন কোনও ক্ষেত্রে সম্পদের আধিক্য বা স্বল্পতা, দুর্যোগের পৌনঃপুনিকতা বা তার অভাব, নগর স্থাপন করার সময়ে যে সব তথ্য সাবধানে বিবেচনা করে স্থান নির্বাচন করতে মানুষকে প্রবৃত্ত করে।

মানুষ এসব করে চিরাচরিত প্রথা বশে। শাস্ত্রবিধান প্রথার চেয়ে ঢের বেশী প্রবল, প্রথাও অভ্যাস অপেক্ষা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির উপর আরও
৪৬৫ বেশী প্রভাবশালী। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই, প্রথা ও রীতির মূল কারণ অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে এবং তদনুযায়ী প্রথা রক্ষিত অথবা বর্জিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রবিধানের হেতু কেউ অনুসন্ধান করে না। প্রশ্ন না তুলে অধিকাংশ লোক অনুকরণ করার জন্য তা আঁকড়ে ধরে রাখে। সে-সব বিধান নিয়ে তারা কোনও তর্ক করে না, যেমন অনুর্বর দেশের অধিবাসীরা নিজ দেশ সম্বন্ধে কখনও তর্ক তোলে না, কারণ সে দেশেই তারা জন্মেছে, নিজ জন্মভূমিকে ভালবাসে বলে অন্যদেশ তারা দেখেনি এবং আপন বাস পরিবর্তন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর। প্রাকৃতিক প্রভেদ ছাড়া দেশগুলির মধ্যে যদি আবার ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতিরও পার্থক্য থাকে তাহলে সে বিশ্বাস ও রীতিতে অভ্যস্ত লোক-দের অন্তরে সেগুলির প্রতি এমন মমতা জন্মায় যে, কখনও তা উচ্ছেদ করা যায় না।

হিন্দুদের এমন কতকগুলি স্থান আছে, ধর্মকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে যার ভক্তি করা হয়, যেমন 'বারাণসী' নগর। হিন্দু সন্ন্যাসীরা বারাণসী গিয়ে সেখানেই আজীবন বাস করে, যেমন কাবাগৃহের খাদেমরা মক্কাতেই সারাজীবন অতিবাহিত করে। তাদের ঐকান্তিক বাসনা, বারাণসী ক্ষেত্রেই যেন তাদের দেহান্ত হয়, যাতে পরকালে তাদের মঙ্গল হয়। কথিত আছে যে, হত্যাকারী দোষী সাব্যস্ত হলে সমুচিত দণ্ড পাবে, যদি না সে বারাণসী নগরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, কারণ সেখানে সে মার্জনা ও ক্ষমা লাভ করবে।

বারাণসীর এই মাহাত্ম্যের কারণ ওরা বলে: ব্রহ্মার আকৃতি ছিল চতুর্মস্তক। একবার তাঁর ও 'শঙ্কর' অর্থাৎ মহাদেবের মধ্যে বিবাদ বাধে। তার

দরুন তাঁদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তার ফলে ব্রহ্মার একটি শির ছিন্ন হয়ে যায়। সে সময়ে রীতি ছিল যে জয় চিহ্নস্বরূপ বিজয়ী বিজিতের ছিন্নমুণ্ডের মুখে ঘোড়ার লাগাম পরিয়ে হাতে ঝুলিয়ে রাখত। মহাদেবের হাতে এইভাবে ব্রহ্মার মুণ্ড লাঞ্ছিত হোল, মহাদেব যেখানেই যান, যে কর্মই করুন, মুণ্ডটি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত, নগরে প্রবেশ করার সময়েও তিনি মুণ্ডটি হস্তচ্যুত করতেন না। অবশেষে যখন তিনি বারাণসীতে এলেন তখন নগরে প্রবেশ করার সময়ে মুণ্ডটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইরকম আর একটি স্থান হচ্ছে 'পুকর' (পুষ্কর), তার কাহিনী এই : ব্রহ্মা একবার সেখানে যজ্ঞ করছিলেন, এমন সময় যজ্ঞাগ্নি থেকে একটি বরাহ উত্থিত হোল। সেজন্য 'পুকুরে' হিন্দুরা ব্রহ্মার বরাহ-মূর্তি নির্মাণ করেছে। নগরের বাইরে তিন জায়গায় তারা সরোবর খনন করেছে, তপস্যার স্থান বলে সেগুলিকে অত্যন্ত ভক্তি করা হয়।

৪৬৬ আর একটি পুণ্য ক্ষেত্র হচ্ছে থানেশ্বর; তাকে 'কুরুক্ষেত্র' অর্থাৎ 'কুরু' ভূমি-ও বলা হয়। 'কুরু' একজন ধার্মিক, সাধু-স্বভাব কৃষক ছিল, যে ঐশী শক্তির বলে অলৌকিক কার্য করতে পারত। দেশটি তারই নামে অভিহিত হয়েছে এবং তারই জন্য এর মাহাত্ম্য। তাছাড়া, থানেশ্বর 'ভারত' যুদ্ধে সম্পাদিত বাসুদেবের কীর্তি ও দুরাচারীর বিনাশক্ষেত্রও বটে। এই কারণে লোক সেখানে তীর্থ করতে যায়।

এইরকম ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত মাহুরানগর (ماهوره=মথুরা)। সে নগরকে ভক্তি করার কারণ, সেখানে বাসুদেবের জন্ম হয়েছিল এবং নিকটস্থ 'নন্দকুলে' তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

বর্তমান কালে লোকে তীর্থ করতে কাশ্মীরে যায়। একালে, সেখানকার দেবমন্দিরটি বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্বে, তারা মুলতানে যেত।

সাতষট্টি অধ্যায়

দান ও উপার্জিত ধন-সম্পত্তির সম্বন্ধে

প্রত্যহ সাধ্যমত দান করা হিন্দুদের অবশ্য কর্তব্য। বর্ষ বা মাস পুনরাবর্তন করা পর্যন্ত ওরা ধন সঞ্চয় করে রাখে না, কেননা তা করলে ধনকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, মানুষ সে ভবিষ্যতে পেঁছবে কি না তা সে জানে না।

ফসল ও গবাদি পশু থেকে যা সে পাবে, তার থেকে সর্বপ্রথমে ভূমি ও গোচারণের জন্য দেয় রাজকর তাকে দিতে হবে। তার উপরে প্রজার সম্পত্তি ও পরিবার রক্ষার দায়িত্ব পালনের পারিশ্রমিকস্বরূপ রাজাকে আরও অধাংশ দিতে হবে। রাজার বন্দরের লোকেরও ঐ একই কর্তব্য, কিন্তু তারা চিরকালই নিজ ধন-সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলবে ও প্রতারণা করবে। পণ্য ব্যবসায়ীদেরও অনুরূপ কর দিতে হবে। কেবল ব্রাহ্মণদেরই এইসব রাজকর থেকে অব্যাহতি আছে।

রাজকর দেওয়ার পর অর্জিত ধন ব্যয় করার নিয়ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকের মতে এক-নবমাংশ দান করার জন্য রেখে দিতে হবে। এদের মতে, উপার্জিত ধনকে ৩ ভাগ করতে হবে; মনকে নিরুদ্বিগ্ন রাখার জন্য এক ভাগ তুলে রাখবে, দ্বিতীয় ভাগ লাভের জন্য ব্যবসায়ে খাটাবে আর তৃতীয় ভাগের এক-তৃতীয়াংশ দান-দক্ষিণায় ব্যয় করবে, আর দুই-তৃতীয়াংশ সংসারে ব্যয় করবে। বাণিজ্যের লভ্যাংশও এই নিয়মে ব্যয়িত হবে।

৪৬৭ আবার অন্যদের মতে, উপার্জিত ধনকে চার ভাগ করতে হবে। তার এক ভাগ খাদ্যসামগ্রী ও সাংসারিক প্রয়োজনার্থে, এক ভাগ সৌজন্য প্রদর্শন ও সত্যরক্ষার জন্য, এক ভাগ দান-দক্ষিণার জন্য এবং তিন বৎসর সাংসারিক ব্যয়ের সমান আর এক ভাগ সঞ্চয়ের জন্য রাখতে হবে। এক-চতুর্থাংশ যদি তিন বৎসরের সংসার খরচের চেয়ে বেশী হয় তাহলে সেই পরিমাণ সঞ্চয় করে উদ্বৃত্ত অংশ দান করবে।

কোনও দ্রব্য ধার দিয়ে সুদ হিসাবে তার অতিরিক্ত পরিমাণ দ্রব্য নেওয়া নিষিদ্ধ। যে পরিমাণ মূলধন এই প্রকার সুদ নিলে বাড়বে ঠিক সেই পরিমাণ পাপ হবে। এরূপ ব্যবসা কেবল শূদ্রের জন্যই অনুমোদিত, তবে তার লাভের পরিমাণও মূলধনের ১৫ গুণের বেশী হতে পারবে না।

আটষট্টি অধ্যায়

খাদ্য ও পানীয়ের বিধি-নিষেধাদি

খ্রীস্টান ও মানী ধর্মাবলম্বীদের মত, হিন্দুদের জন্যও এককালে প্রাণী-হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মাংসের প্রতি মানুষের লোভ প্রবল, সেজন্য তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিধি-নিষেধ সর্বদাই তারা দূরে ফেলে দেয়। এই কারণে, অত্র বর্ণিত বিধানগুলি ব্রাহ্মণের উপরই বিশেষ করে প্রযোজ্য, কেননা এরাই ধর্মের রক্ষক এবং ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে এরা বিশেষভাবে শাস্ত্রে আদিষ্ট হয়েছে। যেমন খ্রীস্টান ধর্মে Metropolitan (مطران), Catholici (جاثليق) ও Patriarch (بطرك) প্রমুখ বিশপদের (اساقفة) ঊর্ধ্বতন ধর্মযাজকদের উপর এইরূপ বিধিনিষেধ আছে, Presbyter (قس) ও Deacon (شماس) যাজকদের এর মত নিম্ন পর্যায়ের উপর সেসব তেমন প্রযোজ্য নয়, অবশ্য এরূপ নিম্ন পদাধিকারী যদি মঠবাসী সন্ন্যাসী না হয়।

বাস্তব অবস্থা এই রকম বলে, শ্বাসরুদ্ধ করে প্রাণীহত্যা করার অনুমতি আছে, কিন্তু সকল প্রকারের পশু নয়, কয়েকটি বিশেষ প্রকারের পশুকে এইভাবে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া আছে। অনুমোদিত পশুগুলির মৃত্যু যদি আকস্মিক হয়, তাহলে তাদের মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। অনুমোদিত পশুগুলি হচ্ছে মেষ, ছাগল, হরিণ, শশক, 'গন্ধা' অর্থাৎ গণ্ডার, মহিষ, মৎস্য, জল ও স্থলচর পক্ষী, যথা চড়াই, ঘুঘু, তিতির, কপোত, ময়ূর ও অন্যান্য এমন প্রাণী যা মানুষের নিকট ঘৃণ্য বা তার পক্ষে অনিষ্টকর নয়।

আর, যেসব পশুর মাংস নিষিদ্ধ তা হচ্ছে গরু, ঘোড়া, অশ্বতর, গাধা, উট, হাতী, গৃহপালিত পক্ষী, কাক, সুক ও 'সারিক'। ডিম্ব মাত্রই নিষিদ্ধ এবং মদ্য কেবল শূদ্রের জন্যই অনুমোদিত। মাংস বিক্রয়ের মত মদ্য বিক্রয় করাও ব্রাহ্মণের জন্য নিষিদ্ধ।

হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকে 'ভারতের' (যুদ্ধের) পূর্বে গোমাংস ভক্ষণের অনুমতি ছিল এবং এমন সব অনুষ্ঠের যজ্ঞ ছিল গোহত্যা যার অন্যতম অংশ ছিল। কিন্তু কর্তব্যপালনে মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্য 'ভারতের' পর থেকে গোহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন

মানুষের বেদাধ্যয়ন সহজ করার জন্য মূল বেদকে যা এককালে এক খণ্ড ছিল,—চার খণ্ডে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

গোহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার এই কৈফিয়ৎ কিন্তু তেমন যুক্তিসহ নয়। কেননা এই নিষেধ দ্বারা মানুষের দায়িত্বভার লাঘব হয় নাই, বরঞ্চ আরও কঠিনতর ও জীবনযাত্রা আরও সংকুচিত করা হয়েছে।

অন্য হিন্দুদের বলতে শুনেছি যে, গোমাংস ভক্ষণ ব্রাহ্মণদের জন্যে ক্ষতি কারক। কারণ তাদের দেশ উষ্ণ, যেখানে দেহের অভ্যন্তরভাগ শীতল থাকে এবং পাকস্থলীর স্বাভাবিক তাপ ক্ষীণ হয়; সে দেশের লোকের পরিপাকশক্তি এত দুর্বল যে আহারের পরে তাম্বুল ও গুবাক চর্বন করে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করতে হয়। তাম্বুলের কটু রসে শারীরিক তাপ বৃদ্ধি করে; চূর্ণ দেহের আর্দ্রতা হরণ করে এবং গুবাক দাঁত ও মাড়ীকে দৃঢ় ও পাকস্থলীকে সংকুচিত করে। এই অবস্থার কারণে অতি গরুপাক ও শীতল বলে ওরা গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমার ধারণায়, নিষেধের মূলে এই দুই কারণের একটি কারণ রয়েছে।…

তবে, অর্থনৈতিক কারণও উপেক্ষণীয় নয়। গরু এমন এক পশু যে নানাভাবে মানুষের সেবা করে ঃ ভ্রমণকালে তার ভার বহন করে, কৃষিকার্যে হালচালনা ও বীজবপনে সহায়তা করে; আর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত বস্তু দিয়ে গৃহস্থের পরিচর্যা করে। তা ছাড়া, তার গোময়, এমনকি শীতকালে তার নিঃশ্বাসও মানুষের উপকারে লাগে। সেজন্য তার মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন সওয়াদ (ইরাক্) অঞ্চলের কৃষিকর্মে ক্ষতি হচ্ছে শুনে হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ্ গোহত্যা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই কথাগুলি হিন্দুদের কোন গ্রন্থে আছে বলে আমাকে বলা হয়েছিল। 'নিষিদ্ধ বা অনুমোদিত যাই হোক না কেন, সমস্ত বস্তুই অভিন্ন ও সমান; প্রভেদ কেবল শক্তি ও দুর্বলতায়। নেকড়ে বাঘের মেষকে ছিন্ন ভিন্ন করার ক্ষমতা আছে সেজন্য মেষ নেকড়ে বাঘের খাদ্য। মেষ তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না, তাই সে তার শিকার হয়।

এইরূপ ভাব অবশ্য আমিও ওদের গ্রন্থাদিতে পেয়েছি; তবে, বুদ্ধিমান লোকের মনে এরূপ উপলব্ধি তখনই হয় যখন তার জ্ঞান এমন স্তরে পৌঁছায়

৪৬৯ যেখানে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল তার চক্ষে সমান হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পেঁছিলে, পরিহার্য সমস্ত বস্তুই তার কাছে সমান হয়ে যায়। তখন সে বস্তু ব্যবহারের অনুমতি বা নিষেধ, দুই-ই তার কাছে সমান; কারণ তাতে তার আর প্রয়োজন বা আসক্তি কিছুই নাই। তবে অজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকার দরুন যে ঐসব বস্তুর প্রয়োজন বোধ করে, তার জন্য কোনটি বা অনুমোদিত কোনটি বা নিষিদ্ধ হয় এবং এই ভাবে দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে একটি প্রাচীর রচিত হয়।

উনসত্তর অধ্যায়

বিবাহ, ঋতুকাল, গর্ভ ও প্রসব সংক্রান্ত রীতিনীতি

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যার মধ্যে বিবাহ প্রথা নাই, কারণ সুস্থ বুদ্ধিতে যে উত্তেজনা নিন্দনীয় বিবাহ তেমন উত্তেজনার প্রাবল্যকে দমন করে এবং যে সব কারণ জৈব আবেগকে উত্তেজিত করে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, বিবাহ সেসব কারণ দূর করে। পশুদের যুগল জীবনযাত্রা, তাদের প্রত্যেকটি নর ও নারীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, অন্যের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে তাদের সযত্নে আত্মরক্ষা, এসব ব্যাপারে একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে বিবাহ একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান এবং উচ্ছৃংখল যৌন সংসর্গ মানুষের মর্যাদাকে পশুর চেয়েও নীচে নামিয়ে দেয়।

প্রত্যেক জাতিরই বিবাহের বিশেষ প্রথা আছে, বিশেষ করে যে সব জাতি ধর্ম ও ঐশী বিধানের দাবী করে। হিন্দুদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ওদের অল্প বয়সে বিবাহ হয়। সেজন্য পিতামাতাই পুত্রের বিবাহ স্থির করে। সে উপলক্ষে ব্রাহ্মণরা পূজার্চনার আয়োজন করে, অন্য সকলের সঙ্গে তারাও দান-দক্ষিণা পায় এবং আনন্দ-উৎসবের উপকরণাদি সজ্জিত করা হয়। ওদের মধ্যে 'মোহর' বলে কিছু নেই। বিবাহকালে পুরুষ নিজ অভিরুচি ও সাধ্যমত স্ত্রীকে যৌতুক (gift) ও বিবাহের পূর্বে উপঢৌকন দেয়। সেগুলি ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার পুরুষের নাই, তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় তা ফিরিয়ে দিতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মৃত্যু ছাড়া আর বিচ্ছেদ হয় না, কারণ ওদের মধ্যে 'তালাক' নাই।

পুরুষ চারিটি পর্যন্ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। চারিটির বেশী
৪৭০ স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ, তবে একটির মৃত্যু হলে সংখ্যা পূরণ করার জন্য আর একটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সে সংখ্যা অতিক্রম করতে পারবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না; তার জন্য দুইটি পথ মাত্র খোলা : হয় আমরণ বিধবা হয়ে থাকা, নয়ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করা। শেষের পথই শ্রেষ্ঠ, কেননা বিধবাকে আজীবন কষ্টের মধ্যে বাস করতে হয়। ওদের আর একটি প্রথা হচ্ছে রাজার স্ত্রীগণকে তাদের

ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে অগ্নিদগ্ধ করা, যাতে তাদের কেউ কলংকনীয় কিছু না করতে পারে। কেবল বৃদ্ধা ও পুত্রবতী স্ত্রীদেরকে ওরা ছেড়ে দেয়, কারণ মাতার সম্ভ্রম ও রক্ষণাবেক্ষণ করা পুত্রের দায়িত্ব।

ওদের বিবাহের একটি নিয়ম এই যে, আত্মীয় অপেক্ষা অনাত্মীয়ের সাথে বিবাহ শ্রেয়। স্বামী-স্ত্রীর রক্ত সম্পর্ক যত দূরতর হবে ততই ভাল। সাক্ষাৎ-ভাবে অধস্তন পুরুষ সম্পর্কিত কোনও নারী, যেমন পৌত্রী বা প্রপৌত্রী, কিম্বা উর্ধ্বতন পুরুষ সম্পর্কিত নারী যেমন মাতা, মাতামহী বা প্রমাতামহীর সাথে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। সগোত্রোৎপন্ন আত্মীয়া, যেমন ভগ্নী, তৎকন্যা, মাতৃ বা পিতৃস্বসা ও তাদের কন্যা বিবাহ করাও নিষিদ্ধ। তবে বর-বধূর গোত্র সম্পর্কে যদি উপর্যুপরি পাঁচপুরুষের দূরত্ব থাকে তাহলে তাদের বিবাহ বারণ নয় বটে, কিন্তু গর্হিত।

কতক হিন্দুর মতে পুরুষের স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা তার বর্ণ অনুযায়ী নির্ধারিত, যেমন ব্রাহ্মণ চারিটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, ক্ষত্রিয় তিনটি, বৈশ্য দুইটি আর শূদ্র একটি।

প্রত্যেকের স্ববর্ণে কিম্বা তন্নিম্ন বর্ণে বিবাহ করাই নিয়ম; উচ্চতর বর্ণের কন্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ। সন্তান মাতার বর্ণভুক্ত হয়, পিতার নয়; যেমন ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্রাহ্মণ হলে তার সন্তান ব্রাহ্মণ হবে, আর স্ত্রী শূদ্র হলে সন্তান শূদ্র হবে। তবে অনুমতি থাকলেও আমাদের একালের ব্রাহ্মণরা বর্ণান্তরে বিবাহ করে না।

৪৭১ ঋতুকালের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য যা দেখা গেছে তা হচ্ছে ষোল দিন, কিন্তু বাস্তবিক প্রথম চারদিনই ঋতুস্রাব হয়। সে সময় স্বামীর পক্ষে স্ত্রী সঙ্গম, এমনকি গৃহে স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়াও নিষিদ্ধ, কারণ স্ত্রী সে সময়ে অশুচি থাকে। চারদিন গত হবার পর স্নান করে স্ত্রী আবার শুচি হয়, তখন স্বামী তাতে উপগত হতে পারে, রক্তস্রাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হলেও। কেননা, সে রক্তকে ঋতুস্রাব বলে মনে করা হয় না; যার থেকে ভ্রূণ জন্মায় সেই পদার্থ বলে তাকে ধরা হয়।

পুত্রলাভের ইচ্ছায় স্ত্রীসঙ্গম করতে হলে ব্রাহ্মণকে হোমাগ্নিতে 'গর্ভাধান' নামক একটি সংস্কার পালন করতে হয়; কিন্তু তাতে স্ত্রীর উপস্থিতি আবশ্যক বলে লজ্জাবশতঃ সে তা করতে চায় না। সেজন্য সে এ অনুষ্ঠানকে স্থগিত রেখে 'সিমন্তোন্নয়ন' নামক গর্ভের চতুর্থ মাসে অনুষ্ঠেয় আর একটি পরবর্তী সংস্কারের সাথে তাকে একত্রে পালন করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর, 'জাতকর্ম'

নামক একটি তৃতীয় অনুষ্ঠান আছে, যা মাতৃস্তন দান করার পূর্বে পালন করতে হয়।

সূতিকাকাল গত না হওয়া পর্যন্ত সন্তানের নামকরণ হয় না। সে উ... ক্ষে অনুষ্ঠিত সংস্কারের নাম 'নামকর্ম'। সূতিকা থাকাকালে প্রসূতি কোনও পাত্র স্পর্শ করে না। সূতিকাগৃহে কিছুই ভোজন করা চলে না এবং ব্রাহ্মণ সেখানে অগ্নি প্রজ্বলন করে না। ব্রাহ্মণের জন্য সূতিকাকাল আট দিন, ক্ষত্রিয়ের জন্য বারদিন, বৈশ্যের পনেরো, আর শূদ্রের তিরিশ দিন। আর নিম্নশ্রেণীর, যারা চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের জন্য কোনও কাল নির্দিষ্ট নাই।

শিশুর মাতৃস্তন পানের দীর্ঘতম কাল হচ্ছে ৩ বৎসর, তবে এতে কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। কেশচ্ছেদন (......) অনুষ্ঠান হয় তৃতীয় বর্ষে (?) আর 'কর্ণবেধ' হয় সপ্তম কিম্বা অষ্টম বর্ষে।

আমাদের দেশের লোকদের ধারণা যে, বেশ্যাবৃত্তিতে হিন্দুরা অবৈধ মনে করে না। যেমন মুসলমানেরা কাবুল জয় করার পর সেখানকার 'ইস্পাহবাদ' (اصبهبذ) ইসলাম গ্রহণ করে শর্ত করেছিল যে তাকে গোমাংস ভক্ষণ ও পুরুষ অভিগমন করতে যেন বাধ্য করা না হয়। হিন্দুদের সম্বন্ধে লোকদের এ ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, হিন্দুরা পরদার গমন বা যৌন ব্যভিচারের তেমন কঠিন শাস্তি দেয় না। প্রকৃত দোষ কিন্তু হিন্দু জাতির
৪৭২ নয়, তাদের রাজাদের। রাজাদের উৎসাহ না থাকলে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত কখনও কোন নারীকে দেবালয়ে নৃত্য-গীত বা অভিনয় করার অনুমতি দিত না। কিন্তু রাজারা এইসব নারীকে তাদের নগরের আকর্ষণ হিসাবে প্রজাদের চিত্তবিনোদনের জন্য মন্দিরে স্থান দেয়। তাদের আসল উদ্দেশ্য অবশ্য রাজ-কোষের অর্থ সংগ্রহ, এইসব বারাঙ্গণা পালন করে অর্থদণ্ড ও কর থেকে যা আয় হবে তা দিয়ে সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ করা। বুয়ায়হিদ সুলতান 'আদুদ্দওলা (Azududdoulah)-ও তাই করেছিলেন। তাঁর আর এক উদ্দেশ্যও ছিল : কামোন্মত্ত সৈন্যদের উৎপীড়ন থেকে গৃহস্থকে রক্ষা করা।

সত্তর অধ্যায়

আদালতের মামলা মোকদ্দমা

বিচারক বাদীর নিকট থেকে অনুরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী সুপরিচিত অক্ষরে লিখিত একটি দরখাস্ত দাবী করে; যাতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সুস্পষ্ট বিবরণ ও প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকে। লিখিত অভিযোগ না থাকলে সাক্ষ্য দ্বারাই মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। সাক্ষীর সংখ্যা অন্ততঃ চার হতে হবে। বেশীও হতে পারে। তবে, কোনও একজন সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা যদি বিচারকের চোখে সুপ্রমাণিত থাকে, তাহলে বিচারক সেই একজনের সাক্ষ্যেই অভিযোগের বিচার করতে পারে। গোপন তদন্ত, প্রকাশ্য লক্ষণ থেকে যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ, অন্য প্রমাণিত ঘটনার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা, কিম্বা ইয়াস্ বিন মু'আবিয়ার মত সত্য নির্ণয়ের জন্য নানাপ্রকার ছলচাতুরি অবলম্বন—এদের বিচারকরা তেমন কিছু করে না। বাদী তার অভিযোগ সপ্রমাণ করতে না পারলে, প্রতিবাদীকে শপথ করে তা অস্বীকার করতে হবে, কিম্বা সে বাদীকে শপথ করাতে পারে এই বলে : 'শপথ করে বল যে তোমার দাবী সত্য, তাহলে আমি তোমার দাবী পূরণ করে দেব।'

দাবীর পরিমাণ ও মূল্য অনুযায়ী শপথ অনেক প্রকারের আছে। বিবাদী বস্তু যদি অল্পমূল্যের হয় এবং প্রতিবাদী শপথ গ্রহণে যদি সম্মত থাকে, তাহলে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সম্মুখে প্রতিবাদী এই বলে শপথ করবে : 'আমি যদি মিথ্যা বলি, তাহলে আমার পুণ্যফল থেকে বিরুদ্ধপক্ষ তার দাবীর আটগুণ পরিমাণ পুণ্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাবে।'

৪৭০ এইরূপ শপথের উপরে নানারূপ পরীক্ষাও আছে; যেমন : 'বিষ' যা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত—পান করতে দেওয়া। পরীক্ষার মধ্যে এটি জঘন্যতম। তবে, সত্যবাদী হলে বিষ পানে শপথ গ্রহণকারীর কোনও ক্ষতিই হবে না।

আরও কঠোর পরীক্ষা হচ্ছে, কোন গভীর খরস্রোতা নদীর তীরে, কিম্বা জলপূর্ণ গভীর কূপের ধারে শপথ গ্রহণকারীকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে সে জলকে এই বলে সম্বোধন করে : 'তুমি দেবগণের কলুষ নাশ কর, গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত কিছুই তুমি জান, আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমাকে বধ

কর। আর সত্য বললে আমাকে ক্ষমা কর।" তারপর পাঁচজন লোক তাকে ধরে জলে নিক্ষেপ করে। সত্যবাদী হলে সে জলে ডুবে মরবে না।

আর একটি পরীক্ষা : বিচারক দুই পক্ষকে নগর বা রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়ে পাঠিয়ে দেয় : সেখানে প্রতিবাদী সেদিন উপবাস করে পরদিন নতুন বস্ত্র পরিধান করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দাঁড়াবে; পুরোহিত দেবমূর্তির উপর জল ঢেলে সে জল তাদের মধ্যে একজনকে পান করতে দেবে। যদি মিথ্যা বলে থাকে সে তৎক্ষণাৎ রক্ত বমন করবে।

আর একটি এই : প্রতিবাদীকে তুলা-যন্ত্রে বসিয়ে ওজন করা হবে; পরে তাকে নামিয়ে নিয়ে তুলাদণ্ডকে সেই অবস্থারই থাকতে দেওয়া হবে। তারপর সে প্রেত, দেবতা ও জ্যোতিষ্কগণকে একে একে তার সত্য কথনের সাক্ষ্য মানবে এবং এসব একটি কাগজে লিখে নিজ মস্তকে আটকে রাখবে। এই অবস্থায় তাকে পুনরায় তুলা-যন্ত্রে বসান হবে। যদি সে সত্য বলে থাকে তাহলে তার ওজন পূর্বাপেক্ষা বেশী হবে।

উচ্চতর আর একটি পরীক্ষা এই : সম পরিমাণ মাখন ও তৈল নিয়ে একটি কটাহে রেখে আগুনে ফোটান হয়; তাপের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তাতে একটি পাতা ফেলা হয়। পাতাটি যদি তৎক্ষণাৎ নরম হয়ে যায় তাহলে ধরে নেওয়া হয় তেল প্রয়োজনমত তপ্ত হয়েছে। ফুটন্ত তেলের তাপ চরমে পৌঁছলে, তাতে একটি স্বর্ণ পাত্র নিক্ষেপ করে প্রতিবাদীকে সেটি হাত দিয়ে তুলে আনতে হয়। সত্যবাদী হলে সে তুলে আনতে পারবে।

আর একটি কঠিনতম পরীক্ষা হচ্ছে এই : একটি লৌহখণ্ডকে দ্রবীভূত
৪৭৪ হবার মত উত্তপ্ত করা হয়, সাঁড়াশি দিয়ে ধরে সেটি প্রতিবাদীর হাতের তালুতে রাখা হয়, বৃক্ষের একটি প্রশস্ত পাতা ও তার তলে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত কয়েকটি ধান্য ছাড়া তার হাতের তালুর উপরে আর কিছু থাকে না। তপ্ত লৌহ খণ্ডটি নিয়ে তাকে সাতপদ হাঁটতে বলা হয়; তারপর সে সেটিকে ভূমিতে ফেলে দিতে পারে।

একাত্তর অধ্যায়

দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তবিধি

এ বিষয়ে হিন্দুদের আইন-কানুন খ্রীস্টানদের মত, সততা ও পাপ বর্জনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন জীব হত্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত থাকা, তোমার বহির্বাস অপহারককে তোমার অন্তর্বাসটিও ছুঁড়ে দেওয়া, গণ্ডে চপেটাঘাতকারীকে অপর গণ্ড উপস্থিত করা, শত্রুর মঙ্গল কামনা ও তার জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আমার জীবনের দিব্য দিয়ে আমি বলব এগুলি অত্যন্ত মহৎ নীতি। কিন্তু জগতের সবাই দার্শনিক নয়, তাদের অধিকাংশই মূর্খ ও নির্বোধ, তরবারি ও চাবুক ব্যতীত তাদিগকে সরল পথে রাখা যায় না। আর বস্তুতঃ পক্ষে, যখন থেকে মহাবল কন্সট্যানটাইন (قنسطنطينوس المظف) খ্রীস্টান হয়েছেন, তখন থেকেই এই দুইটি অস্ত্রের অবিরত প্রয়োগ হয়ে এসেছে। কারণ, এগুলি ব্যতিরেকে রাজ্যশাসন হয় না।

ভারতবর্ষেরও সেই অবস্থা। হিন্দুরা বলে, অতীতে শাসন ও যুদ্ধকার্যের ভার ব্রাহ্মণদের উপর ন্যস্ত ছিল; কিন্তু দেশে বিশৃংখলা দেখা দিল, কেননা ব্রাহ্মণেরা ধর্মগ্রন্থের যুক্তি ও নীতি অনুযায়ী শাসন করত। কিন্তু অসৎ ও দুষ্টমতি লোকদের কারণে তা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এমন কি, ধর্মকার্য পরিচালনাও তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। সেজন্য তাদের প্রভুর নিকট তারা অনুনয় বিনয় করতে থাকলে, ব্রহ্মা তাদের জন্য কেবল তাদের বর্তমান ক্রিয়াকর্মের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিলেন এবং শাসন ও যুদ্ধকার্যের ভার ক্ষত্রিয়দের হাতে দিলেন। সেই থেকে ভিক্ষা ও দান গ্রহণ ব্রাহ্মণের জীবিকা হয়েছে এবং দুষ্কর্মের দণ্ডবিধান হচেছ রাজাদের দ্বারা, পণ্ডিতদের দ্বারা নয়।

হত্যাপরাধের দণ্ডবিধি এই: হত্যাকারী যদি ব্রাহ্মণ হয় ও হত ব্যক্তি অন্য বর্ণের হয় তাহলে উপবাস, পূজার্চনা ও দানের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করতে সে বাধ্য নয়। আর যদি হত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে অপরাধের দণ্ড পরজন্মে হবে। কারণ ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্তের অধিকার নাই। প্রায়শ্চিত্ত পাপ হরণ করে; কিন্তু ব্রাহ্মণের মহাপাতক কিছুতেই মোচন হয় না। আর

সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হচ্ছে ব্রাহ্মণ হত্যা, যার নাম ব্রহ্মহত্যা। তারপর আসে গোহত্যা, মদ্যপান, ব্যভিচার, বিশেষ করে নিজ পিতার স্ত্রী ও গুরু-পত্নীর সাথে। তবে অবশ্য, রাজারা এরূপ অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কে বধ করে না, শুধু ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদিগকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে দেয়।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের নিম্ন বর্ণের কোনও ব্যক্তি যদি বর্ণের কাউকে হত্যা করে, তাহলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তবে দৃষ্টান্তে লোককে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রাজ্যপালও তাকে দণ্ড দেয়।

পরস্বাপহরণের জন্য শাস্তি অপহৃত বস্তুর মূল্যের সমান। সেজন্য, অপরাধীকে কখনও কঠোর কখনও লঘু শাস্তি দিতে হয়। কখনও সংশোধনী অবরোধ ও অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করতে হয়। আর কখনও লোক-লাঞ্ছনা ও উপহাস-ই তার যোগ্য শাস্তি বলে ধরে নিতে হয়। অপহৃত বস্তুটি যদি বহুমূল্য হয়, তাহলে রাজ্যপাল (অপরাধী) ব্রাহ্মণের চক্ষু অন্ধ করে দেয় কিম্বা বাম হাত ও দক্ষিণ পা কেটে দিয়ে তার অঙ্গহানি করে দেয়। (অপরাধী) ক্ষত্রিয়ের কেবল অঙ্গহানি করে, চক্ষু নষ্ট করে না; আর অন্যান্য বর্ণের অপরাধীকে বধ করে।

ভ্রষ্টা (ব্যভিচারিণী) স্ত্রীর শাস্তি হোল, স্বামীগৃহ হতে বহিষ্কার ও নির্বাসন।

আমি প্রায়ই শুনতাম যে, হিন্দু দাসদের মধ্যে যারা মুসলমান দেশ থেকে স্বদেশে ও সমাজে পালিয়ে আসত তাদেরকে উপবাস করে প্রায়শ্চিত্ত করানো হোত এবং নির্দিষ্ট কয়েকদিন ধরে তাদেরকে গোময়, মূত্র ও স্ফুটন না হওয়া পর্যন্ত তপ্ত দুগ্ধে ঢেকে রাখা হোত। তারপর তাদিগকে বাইরে এনে ঐরূপ আরও নোংরা বস্তু খাওয়ান হোত।

এই সংবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমি ব্রাহ্মণদেরকে প্রশ্ন করেছি। তারা সবাই তা অস্বীকার করে, আর বলে যে এরূপ ব্যক্তির কোনও প্রায়শ্চিত্ত-ই নাই এবং তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার অনুমতিও নাই। আর তা হবেই বা কেমন করে, যখন শূদ্রের গৃহে এক-আধদিন ভোজন করলেই ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুত হয়, আর কখনও সে স্বজাতিতে ফিরে যেতে পারে না।

বায়াত্তর অধ্যায়

উত্তরাধিকার

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মূল বিশেষত্ব হচ্ছে কন্যা ব্যতীত সকল স্ত্রীলোকদিকে উত্তরাধিকার থেকে বাদ দেওয়া। মনু স্মৃতির সূত্র অনুসারে কন্যা পুত্রের এক চতুর্থাংশ পায়। অবিবাহিতা থাকলে সে অংশ থেকে বিবাহ পর্যন্ত তার ভরণ পোষণ করা হয় এবং তার থেকে তার বিবাহের যৌতুকাদি ক্রয় করা হয়। তারপরে পৈতৃক সম্পত্তির আয়ে তার আর কোনও স্বত্ব থাকে না।
৪৭৬ মৃতের স্ত্রী যদি চিতারোহণে সহমৃতা না হয়ে থাকে, তার আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব উত্তরাধিকারীর উপর ন্যস্ত। মৃতের ঋণ উত্তরাধিকারীকে শোধ করতে হবে, হয় তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ থেকে, নচেৎ তার নিজের সম্পত্তি থেকে, তা মৃত ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে যাক বা না যাক্। উপরোক্ত (অবিবাহিতা কন্যা ও বিধবা) ভরণ-পোষণের ভার যে-কোন অবস্থাতেই তাকে বহন করতে হবে।

আসল উত্তরাধিকারী হয় পুত্র ও পৌত্ররা। স্বভাবতঃই, উত্তরাধিকারে মৃতের পূর্ব পুরুষ, অর্থাৎ পিতা বা পিতামহ অপেক্ষা উত্তর পুরুষ, যেমন, পুত্র, পৌত্র এদের দাবী বেশী। উত্তর অথবা পূর্ব পুরুষের পর্যায়ের স্বতন্ত্র আত্মীয়দের মধ্যে যে মৃতের যত নিকটতর উত্তরাধিকারে তার দাবী তত বেশী। যেমন, পৌত্র অপেক্ষা পুত্রের, পিতামহ অপেক্ষা পিতার দাবী অগ্রগণ্য। উত্তরাধিকারে ভ্রাতার মত মধ্যমপুরুষ (collateral) আত্মীয়দের দাবী দুর্বল, প্রবলতর দাবীদারের অভাবেই কেবল তারা উত্তরাধিকারী হতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাগিনের অপেক্ষা দৌহিত্র অগ্রগণ্য। আবার উভয়ের তুলনায় ভ্রাতুষ্পুত্র আরও অগ্রগণ্য। পুত্র বা ভ্রাতার পর্যায়ভুক্ত আত্মীয়, একাধিক থাকলে, তারা সকলে সমান অংশ পায়। নপুংষককে পুরুষ গণ্য করা হয়।

মৃতের যদি কোনও উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে তার সম্পত্তি রাজকোষে যাবে, তবে মৃতব্যক্তি ব্রাহ্মণ হলে তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপের অধিকার রাজারও নাই। তা কেবল দান-খয়রাতে ব্যয় হবে।

প্রথম বৎসরে মৃতের প্রতি উত্তরাধিকারীর কর্তব্য হচ্ছে ষোলটি পংক্তি-ভোজন করানো, তাতে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতকে আহার্যের সঙ্গে দক্ষিণাও দিতে হয়। প্রথমটি হবে মৃত্যুর একাদশ থেকে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে, ও পরে প্রতি মাসে একবার করে। ষষ্ঠমাসের ভোজে আহার্য ও দান-দক্ষিণা অপেক্ষাকৃত সাড়ম্বর ও মুক্তহস্ত হতে হবে। তারপরে, বৎসর পূর্ণ হবার পূর্ব দিনে, আর একবার; সেদিনের ভোজ মৃতব্যক্তি ও তার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে। আর সর্বশেষ
৪৭৭ ভোজ হবে বর্ষ পূরাণের দিনে, তখনি মৃতের প্রতি উত্তরাধিকারীর কর্তব্যও শেষ হবে।

উত্তরাধিকারী পুত্র এবং বৈধ ও সৎ কুলজাত হলে, বৎসরকাল ধরে তাকে শোকচিহ্ন ধারণ ও বিলাপ করতে হবে এবং স্ত্রী সংসর্গ থেকে বিরত থাকতে হবে। এও মনে রাখতে হবে যে, প্রথম বৎসরের একটি দিন উত্তরাধিকারের জন্য আহার করা নিষেধ। উপরোক্ত ষোলটি শ্রাদ্ধ ভোজের সঙ্গে দান-দক্ষিণা ছাড়া উত্তরাধিকারীকে নিজ গৃহদ্বারের উপরে প্রাচীরের বহির্গাত্রে আকাশের দিকে উন্মুক্ত একটি তাক নির্মাণ করে তাতে মৃত্যুর পরবর্তী দশ দিন ধরে প্রতিদিন কিছু সুপক্ক অন্ন ও জলপাত্র রেখে দিতে হবে। কারণ এমন সম্ভব যে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি না পেয়ে তখনও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গৃহের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সক্রেটিস্ (? প্লেটো) তাঁর phaedo (فادن) গ্রন্থে কতকটা এই রকম কথাই বলেছেন, যেখানে সমাধির চতুষ্পার্শ্বে আত্মার পরিক্রম করা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবতঃ শরীরের প্রতি আত্মার আসক্তির লেশ তখনও সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় না। তিনি আরও বলেছেন, লোকে বলে, আত্মার অভ্যাস হচ্ছে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ থেকে নিয়ে একটি সুসমঞ্জস বস্তু একত্রিত করা যা ইহজগতে তার বাসস্থল হয় এবং মৃত্যুর দরুন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যা পরবর্তী কালেও তার বাসস্থল হয়।

উপরোক্ত ১০ দিন গত হলে উত্তরাধিকারী মৃতের নামে প্রচুর খাদ্য ও শীতল পানীয় বিতরণ করে। একাদশ দিবসের পরে ওয়ারিস একটি দিরহাম সহ সারা বৎসর ধরে প্রত্যহ একজনের উপযুক্ত অন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠিয়ে দেয় এবং বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম করে না।

তিয়াত্তর অধ্যায়

মৃত ও আত্মঘাতীর(সৎকার) অধিকার

বহু প্রাচীনকালে মৃতদেহকে অনাবৃতভাবে মাঠে উন্মুক্ত আকাশের তলে ফেলে দেওয়া হোত। পীড়িত লোককেও তদ্রূপ প্রান্তরে পর্বতে ফেলে আসা হোত; সে অবস্থায় তাদের মৃত্যু হ'লে তাদের সদ্যবর্ণিত দশা হোত, আর সুস্থ
৪৭৮ হলে স্বগৃহে ফিরে আসত। তারপর একজন বিধানদাতার আবির্ভাব হোল, সে মৃতদেহকে বাতাসে ফেলে রাখবার আদেশ দিল। তখন লোকে ছাদবিশিষ্ট গরাদযুক্ত প্রাচীর দেওয়া ঘর নির্মাণ করল। যার ভিতর দিয়ে মৃতদেহের উপর বাতাস প্রবাহিত হোত, কতকটা জরাথুস্ত্রপন্থীদের সমাধি মিনারে যেমন দেখা যায়।

বহুদিন এই রীতি পালিত হবার পর, নারায়ণ মৃতদেহকে অগ্নিতে সমর্পণ করার নির্দেশ দিলেন। সেই থেকে ওরা শবদাহ করে। যাতে তার কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। সমস্ত ক্লেদ, মালিন্য ও দুর্গন্ধ একসঙ্গে নাশ হয়, যেন তার লেশমাত্র না থাকে।

আমাদের এ কালে স্লাভ (Slav=صقالبة) রা-ও শবদাহ করে; ইউনানী-দের মনে হয় সমাধিস্থ করা ও দাহ করা দুই রকম রীতিই ছিল। Phaedo গ্রন্থে আছে Socrates-কে ক্রিতো (اقريطن) জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে কেমন-ভাবে কবর দেওয়া হবে: উত্তরে Socrates বললেন: "যদি আমার উপর তোমাদের ক্ষমতা থাকে তাহলে যেমন তোমাদের ইচ্ছা তেমন করে কবর দিও। আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে যাব না।" তারপর সমবেত লোকদিগকে তিনি বললেন, "ক্রিতো আমার সম্বন্ধে বিচারকদের কাছে যার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছে, আমার সম্বন্ধে তার বিপরীত কার্যের জন্য তোমরা তার কাছে অঙ্গী-কারাবদ্ধ হও, আমি থাকব, এই কথার দায়িত্ব সে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদের এখন এই কথার জামিন হতে হবে যে, মৃত্যুর পরে আমি থাকব না। আমি চলে যাব, যাতে দাহ করার অথবা কবর দেওয়ার সময় আমার মৃতদেহ দেখে ক্রিতো নিজ দুঃখ সহ্য করতে পারে, আর এই বলে বিলাপ না করে যে সক্রে-টিসকে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে দাহ করছে অথবা কবর দিচ্ছে। "হে ক্রিতো, আমার

মৃতদেহ সমাধিস্থ করা সম্বন্ধে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি যা চাও তাই করো, অবশ্য আইন অনুযায়ী'।

গ্যালেনুস্ তাঁর কৃত 'হিপোক্রেতিস্ সূত্রে'র টীকাতে বলেছেন, "একথা সর্বজনবিদিত যে, এ্যাস্‌কেল্‌পিউসকে একটি অনল স্তম্ভে করে দেবলোকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। দায়োনিসস্ (Dionysos) ও হরকিউলিস (Hercules) প্রভৃতির মত যারাই মানুষের হিত সাধনের চেষ্টা করেছে তাদের সম্বন্ধেও এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়ে থাকে। বলা হয় যে, আল্লাহ তাদের
৪৭৯ পার্থিব ও নশ্বর অংশকে অগ্নি দ্বারা নাশ করে তাদের অমর অংশকে নিজ মধ্যে আকর্ষণ করেন তাদের আত্মাকে ঊর্ধ্বলোকে তুলে দেবার জন্যই 'তাদের এরূপ গতি করেছিলেন।"

উদ্ধৃত কথাগুলিতে দাহ প্রথার ইঙ্গিত আছে, তবে যেন মনে হয়, কেবল মহাপুরুষদের জন্যই এ প্রথা পালিত হতো।

এই রকম হিন্দুরাও বলে যে, শরীরের মধ্যে এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু আছে যার দরুনেই মানুষ মানুষ; দহন ক্রিয়ার ফলে শরীরের মিশ্রিত পদার্থগুলি যখন গলে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এই বিন্দুটি যোগমুক্ত হয়ে যায়। আত্মার এই প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে ওরা মনে করে যে, তার ঊর্ধ্বে আরোহণ কতকটা সূর্য কিরণের সাহায্যে হয়ে থাকে,—সূর্য কিরণের সাথে সংলগ্ন হয়ে তারই সাথে আত্মা উপরে উঠতে থাকে,—আর কতকটা হয় অগ্নিশিখার দ্বারা, যা তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। যেমন, ওদের অনেকে প্রার্থনা করত, ঈশ্বর (আল্লাহ) যেন তার কাছে যাবার পথ তার জন্য সরল রেখার মত করে দেন', কারণ এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ততম দূরত্ব, আর অগ্নি অথবা কিরণ ব্যতীত উপরে ওঠার অন্য কোনও পথ নাই।

জলে নিমজ্জিত লোকের সম্বন্ধে ঘুজ্জ (غز–Ghuzz) তুর্কীদের প্রথাও কতকটা এইরূপ ছিল। মৃতদেহকে শবাধারে স্থাপন করে তারা নদীতে নামিয়ে রাখত এবং তার পায়ে একটি সুতার প্রান্ত বেঁধে অন্য প্রান্ত জলে ভাসিয়ে দিত; পুনরুত্থানের সময় এই সুতা ধরে তার আত্মা উপরে উঠবে।

আত্মার ঊর্ধ্বলোক যাত্রা সম্বন্ধে হিন্দুদের উপরোক্ত বিশ্বাস বাসুদেবের উক্তি থেকে আরও সুদৃঢ় হয়েছে, যেখানে তিনি (পার্থিব) পর্ণশালা থেকে বন্ধন মুক্তির লক্ষণ বর্ণনা করেছেন "উত্তরায়নে শুক্লপক্ষে প্রজ্বলিত দীপ-সমূহে মধ্যবর্তী সময়ে, অর্থাৎ শীত ও বসন্ত কালের সংযোগ ও প্রতিযোগের অন্তর্বর্তীকালে মৃত্যু হবে।"

এইরূপ বিশ্বাসের ইঙ্গিত মানী (مانی)-র উক্তিতেও পাওয়া যায়। 'আমরা সূর্যচন্দ্রকে উপাসনা করি, তাদের মূর্তি স্থাপন করি বলে অন্য ধর্মাবলম্বীরা আমাদিগকে নিন্দা করে। কিন্তু সূর্য-চন্দ্রের প্রকৃত তত্ত্ব তারা জানে না; তারা জানে না যে, এ দুইটি জ্যোতির্ময় বস্তু হলো আমাদের মার্গ, আমাদের নিষ্ক্রমণ দ্বার, যার মধ্য দিয়ে আমরা অস্তিত্বলোকে যাত্রা করি, যেমন, যীশু বলে গেছেন।' এটি অবশ্য মানীর কথা।

লোকে বলে যে বুদ্ধ (البد) মৃতদেহকে প্রবাহমান জলে সমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই জন্য তাঁর ধর্মানুসারী সামানিরা মৃতদেহকে নদীতে নিক্ষেপ করে।

হিন্দুদের মতে, উত্তরাধিকারীর উপর মৃতদেহের যে অধিকার আছে তা হচ্ছে, তাকে স্নান করিয়ে সুগন্ধি লেপন ও বস্ত্রাবৃত করান এবং তারপর সাধ্যমত চন্দন অথবা কাষ্ঠ দিয়ে অগ্নি সৎকার করান। কিছু দগ্ধ অস্থি গঙ্গায় নিয়ে
৪৮০ গিয়ে জলে সমর্পণ করতে হবে যাতে তার উপর দিয়ে গঙ্গার ধারা বয়ে যায়। যেমন সগর পুত্রদের দগ্ধ অস্থির উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তারা নরক থেকে ত্রাণ পেয়ে স্বর্গ লাভ করেছিল। অবশিষ্ট ভস্ম কোন স্রোতস্বতী নদীতে ফেলে দিতে হবে। চিতাভূমিতে ওরা দুরত্ব জ্ঞাপক স্তম্ভের আকারে সাদা একটি স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করে। তিন বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর মৃতদেহ দাহ করা হয় না। শবস্পর্শজনিত অশৌচ দূর করার জন্য সৎকারান্তে শববাহী দাহকারীরা দুই দিন নিজ নিজ বস্ত্র ধৌত করবে এবং স্নান করবে।

যে অগ্নি সৎকার করতে অক্ষম, সে মৃতদেহকে মাঠে অথবা কোনও প্রবাহমান জলে নিক্ষেপ করতে পারে।

তবে জীবন্ত দেহ (আত্মঘাতী)-কে হিন্দুরা সৎকার করতে চায় না, কেবল সহমৃতা, বিধবা অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি, দেহের দুরপনেয় বৈকল্য, বার্ধক্য বা জরার জন্য জীবনের ভার বহনে অসমর্থ আত্মঘাতী ব্যক্তির সৎকারাধিকার ওরা স্বীকার করে। এসব কারণে আত্মহত্যা কিন্তু সম্ভ্রান্ত বা কুলীন লোকেরা করে না। কেবল বৈশ্য ও শূদ্রেরা করে থাকে, তাও কেবল সেই সব নির্দিষ্ট লগ্নে। যাতে দেহ ত্যাগ করলে পরজন্মে ইহ-জন্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অবস্থা অর্জন করা যায়। অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের জন্য বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। সেজন্য এদের মধ্যে স্বেচ্ছায় যারা প্রাণত্যাগ করতে চায় তারা কোনও গ্রহণকালে আত্মহত্যা করে। কিম্বা জলে প্রাণ বিয়োগ হওয়া পর্যন্ত তাকে ডুবিয়ে রাখার জন্য কাউকে নিযুক্ত করে।

যমুনা (جون) ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগ নামে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে যাকে 'বড়' (بر – বট) বলা হয়। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর কাণ্ড থেকে দু-প্রকারের শাখা বের হয়। একটি অন্যান্য বৃক্ষশাখার মত উর্ধ্বে প্রসারিত, আর অন্যটি শিকড়ের মত নিষ্পত্রক হয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। এই শাখাটি মাটিতে প্রবেশ করলে সেটি উপরের শাখার জন্য একটি স্তম্ভের মত হয়ে দাঁড়ায়। বৃক্ষ শাখাগুলির বিপুল আয়তনের জন্য প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা উপরোক্ত এই বৃক্ষের নিকটে গিয়ে তার উপরে উঠে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করে।

বৈয়াকরণিক ইয়াহিয়া (Johannes Grammaticus) লিখেছেন 'প্রাক-খ্রীস্ট ইউনানে একদল লোক ছিল—যাদের আমি শয়তানের উপাসক নাম দিয়েছি—যারা নিজের দেহে তরবারির আঘাত করত, আগুনে ঝাঁপ দিত; কিন্তু তার দরুন কোন যন্ত্রণাবোধ করত না।'

আত্মহত্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের যে মনোভাবের উল্লেখ আমি করেছি, সক্রেটিস্‌ও সেই রকম মনোভাব প্রকাশ করেছেন; 'আত্মহত্যা করা কোনও মানুষেরই উচিত নয়, যতক্ষণ না দেবতারা ঘোর সংকট বা আমার বর্তমান
৪৮১ অবস্থার মত কোন সাংঘাতিক কারণ সৃষ্টি না করেন।'

তিনি আরও বলেছেন; "আমরা মানবরা বন্দীশালায় বাস করি, সেখান থেকে পলায়ন করা বা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা আমাদের অনুচিত, তা করলে দেবতারা আমাদিগকে শাস্তি দেবেন কেননা আমরা সমস্ত মানবজাতি তাঁদের সেবক মাত্র।"

ছুয়াত্তর অধ্যায়

উপবাস ও তার প্রকারভেদ

হিন্দুদের নিকট উপবাস স্বেচ্ছামূলক ও অতিরিক্ত, তার কোনও কিছুই বাধ্যতামূলক নয়। নির্দিষ্ট কালের জন্য আহার থেকে বিরত থাকাই উপবাস। কালের দৈর্ঘ্য ও পালনের নিয়ম সর্বক্ষেত্রে এক নয়।

মধ্যম প্রকারের সাধারণ উপবাস, যাতে সব রকম নিয়ম পালিত হয়, তা হচ্ছে : দিন ধার্য করে, যার অনুগ্রহলাভ তার কাম্য এবং যার জন্য সে উপবাস পালন করছে, ঈশ্বর দেবতা বা যেই হোক, মনে মনে তার নাম স্মরণ করতে থাকবে। তারপর প্রস্তুত হ'য়ে খাদ্য সামগ্রি সংগ্রহ করে, নির্দিষ্ট দিনের পূর্ব-মধ্যাহ্নে আহার করবে। কাঠি (খেলাল) ও দাঁতন দিয়ে দাত মার্জনা করবে এবং পরদিন উপবাসের সংকল্প করবে। সংকল্প মুহূর্ত থেকে আর আহার্য স্পর্শ করবে না। প্রাতঃকালে আর একবার দন্ত ধাবন ও স্নান করবে এবং প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদন করবে। হাতে জল নিয়ে চতুর্দিকে ছিটাবে। তারপরে যার উদ্দেশ্যে উপবাস করছে মুখে তার নামোচ্চারণ করতে থাকবে। এই অবস্থায় পরদিন পর্যন্ত থাকবে। ইচ্ছা করলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপবাস ভঙ্গ করতে পারে, নচেৎ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারে।

এই প্রকার ব্রত পালনকেই 'উপবাস' বলা হয়। কারণ, এক মধ্যাহ্ন থেকে
 আর এক মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অনাহারে থাকার নাম 'একনক্ত'—উপবাস নয়।

আর একপ্রকার উপবাস আছে, তার নাম 'কৃচ্ছ্র'। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অনাহারে থেকে পরদিন সন্ধ্যায় আহার করবে; তৃতীয় দিনে অযাচিত প্রাপ্ত অন্ন ছাড়া আর কিছু আহার করবে না; চতুর্থ দিনে আবার উপবাস করবে।

আর একপ্রকার উপবাসের নাম 'পরাক'। উপর্যুপরি তিনদিন মধ্যাহ্ন ভোজন করবে; পরবর্তী তিন দিন সন্ধ্যাকালে ভোজন করবে। তার পরবর্তী তিন দিন একটানাভাবে নির্জলা উপবাস করে যাবে।

'চন্দ্রায়ণ' নামে আর একরকম উপবাস হচ্ছে : পূর্ণিমার দিন উপবাস করে, পরদিন কেবল একগ্রাস মাত্র আহার করবে। তৃতীয় দিনে তার দ্বিগুণ,

চতুর্থ দিনে চতুর্গুণ ভোজন করে এবং এইভাবে ভোজনের পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে অমাবস্যা পর্যন্ত যাবে। সেই দিন সে উপবাস করবে। পরদিন থেকে আহার্যের পরিমাণ দৈনিক একগ্রাস করে কমিয়ে যাবে, যাতে পূর্ণিমার দিনে তার আহার্য শূন্যে পরিণত হয়।

আর একপ্রকার উপবাসের নাম 'মাসবাস'। তাতে একমাস ধরে প্রত্যেক দিন একটানা অনশন করে যেতে হয়। বিভিন্ন মাসে এই প্রকার উপবাস করলে পরজন্মে কিরূপ পুরস্কার পাওয়া যাবে তার বর্ণনা ওরা এইভাবে করে থাকে :

চৈত্র মাসে প্রতিদিন উপবাস করলে, সে ধন ও সৎপুত্র লাভের আনন্দ পাবে।

বৈশাখ মাস উপবাস করলে গোষ্ঠীপতি ও বিপুল সৈন্যের অধিকারী হবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের উপবাসে সে রমণীর প্রিয় হবে।

আষাঢ় মাস ধরে উপবাস করলে সচ্ছলতা লাভ করবে।

শ্রাবণ মাসের উপবাসে জ্ঞান লাভ হবে।

ভাদ্র মাসের উপবাসে স্বাস্থ্য, সৌর্য সম্পদ ও গবাদি পশু লাভ হবে।

'অশ্বয়ূজ' মাসে উপবাসের পুরস্কার স্বরূপ শত্রুর উপর চিরজয়ী হবে।

৪৮৩ কার্তিক মাসে উপবাস করলে সকলের শ্রদ্ধেয় হবে ও মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

'মার্গশীর্ষের' উপবাসের ফলে মনোহর শস্যশ্যামল দেশে তার পুনর্জন্ম হবে।

পৌষ মাসের উপবাসে উচ্চ মর্যাদা লাভ হবে।

মাঘ মাসে উপবাস করলে গণনাতীত ধন লাভ করবে।

আর, ফাল্গুনের উপবাসে সকলের অনুরাগ ভাজন ও স্নেহাস্পদ হবে।

আর, যে প্রতিমাসে একবারের বেশী ভোজন না করে সারা বৎসর ধরে উপবাস করে, সে দশ হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করে শ্রেষ্ঠ, অভিজাত ও উচ্চ কুলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে।

বিষ্ণুধর্মে আছে : 'যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন : মানুষ কি করলে নিজ সন্তানদিগকে দুঃখ-কষ্ট ও শারীরিক বিকার থেকে রক্ষা করতে পারে ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, ''যদি যে পৌষ মাসের 'দুভে';

অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষের দ্বিতীয় দিনে আরম্ভ করে উপর্যুপরি চারদিন উপবাস করে এবং তার প্রথম দিনে জলে, দ্বিতীয় দিনে তিল তৈলে, তৃতীয় দিনে উশীরে (رج) আর চতুর্থ দিনে মিশ্র সুগন্ধির জলে স্নান করে এবং প্রত্যেক দিন দান ও দেবতাদের স্তব পাঠ করে, আর বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রতিমাসে এইরূপ ক্রিয়া করে যায়, তাহলে পরজন্মে তার সন্তানরা দুঃখ-ক্লেশ, ও দুর্দৈব থেকে নিরাপদ থাকবে, আর তাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, কেননা দিলীপ, দুষ্যন্ত ও যযাতি এইরূপ কর্ম করার ফলে তাদের অভীষ্ট লাভ করেছিল।'

পচাত্তর অধ্যায়

ব্রত ও উপবাস পালনের দিন

পাঠকের মোটামুটি জেনে রাখা উচিত যে, প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টম ও একাদশ দিবস উপবাসের দিন। কেবল অধিমাস (leap month) ছাড়া,
৪৮৪ কারণ অধিমাস অশুভ বলে তাকে গণনায় ধরা হয় না।

একাদশ দিবস বাসুদেবের প্রিয়; মথুরা (মাহুরা-ماهورا) অধিকার করার পর বাসুদেব যখন দেখলেন যে, মথুরাবাসীরা প্রতি মাসে একদিন করে ইন্দ্রের পুজো করত তখন তিনি তাদিগকে সে অনুষ্ঠানটি একাদশ দিবসে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর নামে পুজো করতে বললেন। মথুরাবাসীরা তাই করল। তাতে ইন্দ্র রুষ্ট হয়ে প্রবল বৃষ্টিপাত করে প্লাবন সৃষ্টি করে গো-মহিষাদি সমেত তাদিগকে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। তখন বাসুদেব স্বহস্তে একটি পর্বত তুলে ধরে তাদিগকে রক্ষা করলেন; তাদের চতুর্দিকে জলস্ফীতি হতে থাকল, কিন্তু তাদের উপরে উঠল না; অবশেষে ইন্দ্রের বিগ্রহ অন্তর্হিত হয়ে গেল। মথুরার নাগরিকরা নিকটস্থ একটি পর্বতে এই ঘটনার একটি স্মরণ চিহ্ন স্থাপন করল। সেই জন্য ঐ দিনে শুচিশুদ্ধি হয়ে ওরা উপবাস পালন করে এবং একান্ত কর্তব্য মনে করে রাত্রি জাগরণ করে, যদিও তাতে বাধ্যবাধকতা নাই।

'বিষ্ণুধর্মে' লিখিত আছে: "চন্দ্র যখন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথীতে রোহিণী, অর্থাৎ চতুর্থ ক্ষেত্রে অবস্থান করে, তখন 'জয়ন্তি' নামক উপবাসের দিন। সে দিনে দান করলে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

দেখা যাচ্ছে, উপবাস দিবসের ঐ বর্ণনাটি সকল মাসে প্রযুজ্য হ'তে পারে না, কেবল 'ভাদ্রপদায়' হতে পারে, যে মাসের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রে বাসুদেবের জন্ম হয়েছিল। যেহেতু, অধিমাসের দরুন লৌকিক ও চান্দ্রবৎসরের মধ্যে অগ্র-পশ্চাতের পার্থক্য থাকে, সেহেতু উপরোক্ত চন্দ্রের রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান ও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিবসের যোগাযোগ বহু বৎসরে একবার মাত্র হতে পারে।

উপরোক্ত 'বিষ্ণুধর্মে' আরও বলা হয়েছে : শুক্লপক্ষের একাদশ দিবসে চন্দ্র যখন 'পুনর্বসু' অর্থাৎ সপ্তম নক্ষত্রে অবস্থান করে, তখন 'অত্রাতজা' (اتّرج) নামক ব্রতের সময়। ঐ দিনে পুণ্য কর্ম করলে ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা লাভ হয়, যেমন সগর, কুকুস্থ ও ধুন্ধুমার-এর হয়েছিল। ঐ দিনে কৃত পুণ্য-কর্মের ফলে তারা রাজ্যলাভ করেছিল।' চৈত্র মাসের ষষ্ঠ দিবস সূর্যের নামে ব্রত পালনের জন্য নির্দিষ্ট।

'আষাঢ়ে,' চন্দ্র যখন 'অনুরাধা' নক্ষত্রে অবস্থান করে, তখন বাসুদেবের
৪৮৫ নামে ব্রত পালনের দিন। তার নাম 'দেবাসিনি' (?) অর্থাৎ নিদ্রিত দেবতা, কারণ যে চার মাস কাল বাসুদেব নিদ্রিত থাকেন, ঐটি হচ্ছে তার প্রথম দিন। কারু কারু মতে সে দিনটি মাসের একাদশ দিবস হতে হবে। অবশ্য, এই রকম দিন প্রতি বৎসরে পাওয়া যায় না। বাসুদেবের ভক্তরা ঐদিনে মাছ-মাংস ও মিষ্টান্ন ভোজন করে না। স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকে এবং অহোরাত্রে একবার মাত্র আহার করে, অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করে, কোনও পালংক ব্যবহার করে না। লোকে বলে, এই চার মাস দেবতাদের রাত্রিকাল। গোধূলী বা সায়ংকালের জন্য তার আগে একমাস, আর প্রদোষ-সন্ধ্যার জন্য পরে আর এক মাস তার সঙ্গে যোগ করতে হবে। কিন্তু সূর্য তখন কর্কট রাশির আদিতে থাকে, তখন দেবালোকের মধ্যাহ্নকাল। এই দুই সন্ধ্যার সাথে চন্দ্রের সম্বন্ধ কেমন করে হবে আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন সোমনাথের নামে উপবাসের জন্য নির্দিষ্ট।

'অশ্বয়ুধ' মাসে চন্দ্র যেদিন অশ্বিনী নক্ষত্রে আর সূর্য কন্যা রাশিতে অবস্থান করে সেদিন উপবাস করতে হয়। ঐ মাসের অষ্টম দিবসে 'ভাগবত' ব্রতোপবাসের দিন; চন্দ্রোদয়ের সাথে উপবাস শেষ হয়। ভাদ্রমাসের পঞ্চম দিবসে 'ষট্' পনামে সূর্যের উদ্দেশ্যে একটি ব্রত আছে। তাতে ওরা সূর্যের কিরণমালাকে অর্চনা করে, গবাক্ষ দিয়ে যে সব কিরণ ঘরে প্রবেশ করে, তাতে নানারূপ গন্ধ দ্রব্য ও সুবাসযুক্ত পত্রপুষ্প স্থাপন করে তাকে অভিনন্দিত করে।

এই মাসেই চন্দ্র যেদিন রোহিণী নক্ষত্রে থাকে, সেদিন বাসুদেবের জন্ম তিথির ব্রতোপবাস। কেউ কেউ সে ব্রতের দিন নির্ণয়ের জন্য কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টম দিবসের শর্ত যোগ করে। আমরা কিন্তু আগেই দেখিয়েছি যে, এই রকম বিশেষ দিন প্রতি বৎসরে আসে না, অনেক বৎসর পরে একবার সেরূপ যোগাযোগ হয়।

কার্তিক মাসে, চন্দ্রের শেষ নক্ষত্র 'রেবতি'তে অবস্থান কালে বাসুদেবের
৪৮৬ নিদ্রাভঙ্গের উপবাসের দিন তার নাম 'দেবোত্থিনি' অর্থাৎ দেবতার উত্থান (বেরুথানম্)। কেউ কেউ সে দিনটি শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি হওয়া আবশ্যক মনে করে। সেদিন ওরা গায়ে গোময় মাখে এবং পঞ্চদ্রব্য দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। 'ভীষ্ম পর্বতরাত্রি' নামিত পাঁচ দিনের এইটি প্রথম দিবস। এই পাঁচ দিনে ওরা বাসুদেবের নামে উপবাস পালন করে; দ্বিতীয় দিনে ব্রাহ্মণেরা সে উপবাস ভঙ্গ করে, তার পরে অন্যেরা। পৌষ মাসের ষষ্ঠ দিবসে সূর্যের নামে আর একটি ব্রত আছে আর 'মাঘ' মাসের তৃতীয় দিবসে কেবল স্ত্রীদের পালনীয় একটি ব্রত আছে, পুরুষদের নয়। তাকে 'গোরত্তু' (গৌরী-তৃতীয়া) বলা হয়। এর উপবাস অহোরাত্র ব্যাপী। প্রভাত হলে স্ত্রীলোকেরা তাদের নিকটতম আত্মীয়দিগকে উপঢৌকন দেয়।

ছিয়াত্তর অধ্যায়

পার্বণ ও উৎসবাদি

শুভক্ষণে অন্যত্র গমন করার নাম যাত্রা। সেজন্য পার্বণকে যাত্রা বলা হয়। পার্বণের বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক ও শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

চৈত্র মাসের দ্বিতীয় দিনে কাশ্মীরীদের একটি পর্ব আছে। তার নাম 'অগদোস' (اكدوس)। এটি 'মুত্তাই' (متّى) নামক এক কাশ্মীরী রাজার তুরস্কদের উপর জয়লাভের স্মারক উৎসব। ওদের বিশ্বাস, সে রাজা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। প্রায় ভারতীয় সব রাজা সম্বন্ধেই এইরূপ ধারণা করা ওদের অভ্যাস। তবে, যেমন আমি আগে বলেছি সে রাজার কাল নির্ণয় ওরা এমনভাবে করে যার থেকে ওদের মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। অবশ্য, ইউনানী, রোমক, ব্যাবিলনী বা পারসীকদের মত হিন্দুদেরও সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া যে অসম্ভব, তা নয়, কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক কালের সংবাদ ত আমাদের জানা আছে? এমন হতে পারে, উক্ত রাজা সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি ছিল। আর ওরা ভারতবর্ষ ও হিন্দু জাতি ছাড়া অন্য দেশ বা অন্য জাতির কোনও সংবাদই রাখে না।

চৈত্রমাসের একাদশ তারিখ থেকে 'হিন্দোলি-চৈত্র' বলা হয়। সেদিন বাসুদেবের দেউলে (ديو هر) ওরা সমবেত হয়ে তার বিগ্রহকে দোলায় রেখে শৈশবে যেমন তাকে দোলান হতো সেই রকম দোলা দিতে থাকে। ওরা সমস্ত দিন ধরে নিজ গৃহেও এই রকম দোল দিতে থাকে এবং আমোদ-প্রমোদ করে।

৪৮৭ চৈত্র পূর্ণিমার দিনে 'বহন্দ' (بهند-বসন্ত) নামক নারীদের একটি উৎসব আছে, যাতে তারা অঙ্গ সজ্জা ও বেশভূষা করে পতিদের কাছে উপহার নিতে যায়।

চৈত্র মাসের ২২ তারিখকে বলা হয় 'চৈত্র-চশতি ?' (جيتر چشت=চৈত্র ষষ্ঠী)। দিনটি আনন্দ উৎসবের ও 'ভগবতির' নামে উদ্দিষ্ট; সেদিন স্নান ও দান করা হয়।

বৈশাখ মাসের তৃতীয় দিবস নারীদের উৎসব, তার নাম 'গোরত্' (গৌরী-তৃতীয়া)। অর্থাৎ 'হিমাবন্ত' পর্বতকন্যা, মহাদেবের স্ত্রী গৌরীর নামাঙ্কিত।

সেদিন স্ত্রী লোকেরা স্নান ক'রে অলংকার ও বেশভূষায় সজ্জিত হয় এবং গৌরীর প্রতিমা পূজা করে, প্রদীপ জ্বালে, ধূপ চন্দন দিয়ে তার অর্চনা করে, সমস্ত দিন উপবাস করে এবং ঝুলন খেলে। পরদিন দানান্তে অন্নগ্রহণ করে।

বৈশাখ মাসের দশম দিনে রাজার নিযুক্ত ব্রাহ্মণরা উন্মুক্ত মাঠে চলে গিয়ে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিরাট বিরাট অগ্নি জ্বালে। চারি ভাগে ভাগ করে, ষোলটি পৃথক স্থানে অগ্নি জ্বালানো হয়। প্রতি ভাগে একজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পৌরোহিত্য করে; যাতে বেদের সংখ্যানুযায়ী চারজন পুরোহিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। ষোড়শ দিবসে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

এই (বৈশাখ) মাসেই মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়। যার নাম 'বসন্ত'। সংক্রান্তির দিনটি ওরা গণনা ক'রে নির্ধারণ করে এবং সেদিন আনন্দ-উৎসব করে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম, অর্থাৎ অমাবস্যাও, ওদের উৎসবের দিন। শুভলগ্নের আশায় সেদিন ওরা ভূমীর উৎপন্ন প্রথম শস্যবীজ জলে নিক্ষেপ করে।

এই মাসের পূর্ণিমা স্ত্রীদের উৎসবের দিন, তার নাম 'রূপ-পঞ্চ'।

আষাঢ় মাসের সব দিনগুলি দান-দক্ষিণার জন্য নির্দিষ্ট; সে দানকে 'আহারি' বলা হয়। ঐ মাসে গৃহের তৈজসপত্র নূতন করা হয়।

শ্রাবণ পূর্ণিমার দিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়।

অশ্বযুজ মাসের অষ্টম দিনে, চন্দ্র যখন ঊনবিংশ বা 'মূলা' নক্ষত্রে থাকে, ইক্ষুর রস পান আরম্ভ হয়। মহানবমী নামিত এই উৎ ব বাসুদেবের ভগ্নির
৪৮৮ নামে অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ওরা ইক্ষুর রস ও অন্যান্য শস্যের প্রথম লব্ধ ফল তাঁর 'ভগবতী' নামের বিগ্রহকে নিবেদন করে। তার সমক্ষে প্রচুর দান করে ও বহু ছাগ বলি দেয়। নিবেদন করার মত যার কিছু-ই নাই সে সর্বদা একাদিক্রমে বিগ্রহের নিকট দাঁড়িয়ে থাকে এবং কখনও কখনও অতর্কিতভাবে যাকে সম্মুখে পায় তাকে হত্যা করে।

এই মাসের পঞ্চদশ দিবসে, চন্দ্র যখন তার শেষ নক্ষত্র রেবতীতে অবস্থান করে, তখন (پوهای) 'পুহায়া' নামক পর্ব। সেদিন ওরা নিজেদের মধ্যে মল্ল ক্রীড়া ও পশুদের সঙ্গে খেলা করে। পর্বটি বাসুদেবের নামে পালিত হয়, কারণ, তার মাতুল কংস তাকে মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিল।

ষোড়শ দিবসে আর একটি পর্ব আছে। সেদিন ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা দেওয়া হয়।

ত্রয়োবিংশ দিবসে 'অশোক' নামক পর্ব; তাকে 'আহ্‌ই' (اهوی)-ও বলা হয়। সেদিন চন্দ্র সপ্তম নক্ষত্র পুনর্বসুতে অবস্থান করে। এ দিনটি আমোদ-প্রমোদ ও মল্ল ক্রীড়ার দিন।

ভাদ্রপদায় চন্দ্র যখন দশম নক্ষত্র 'মঘা'তে অবস্থান করে, তখন ওরা পিতৃ-পক্ষ নামক একটি পর্ব পালন করে। পিতৃপক্ষের অর্থ পিতৃগণের অর্ধমাস। কারণ, অমাবস্যার কাছাকাছি সময়ে চন্দ্র এই নক্ষত্রে প্রবেশ করে। এই পক্ষকাল ধরে ওরা পিতৃগণের নামে দান-দক্ষিণা দেয়।

ভাদ্রপদার তৃতীয় দিনে 'হরবালি' (هر بالی) (হরিতালিকাব্রত ?) নামক স্ত্রীলোকের আর একটি পর্ব আছে। ওদের দস্তুর যে পর্বের কয়েক দিন পূর্বে ঝুড়িতে বিভিন্ন প্রকারের বীজ বপন করে এবং অংকুরোদ্‌গম হলে পর্বের দিন সে ঝুড়িগুলি নিয়ে এসে তাতে ফুল ও সুগন্ধি ছড়ায় এবং সারারাত্রি আমোদ-প্রমোদে কাটায়। প্রভাতে বীজগুলিকে পুষ্করিণীতে নিয়ে গিয়ে ধৌত করে এবং স্নানান্তে দান করে।

ভাদ্রপদার ষষ্ঠ দিবসের নাম (گاێهت) 'গায়হৎ' (?)। সেদিন বন্দীশালায় অবরুদ্ধ লোকদিগকে অন্ন বিতরণ করা হয়। এই মাসের অষ্টম দিবসে, চন্দ্রের অষ্টকলা পূর্ণ হলে ধ্রুবগৃহ (? دورب هر) নামক একটি পর্বানুষ্ঠান হয়। সেদিন ওরা স্নান করে সুপুষ্ট শস্যবীজ ভক্ষণ করে, যাতে তাদের সন্তানগণ স্বাস্থ্যবান হয়। স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হলে এবং সন্তান কামনা করলে এই ব্রত পালন করে।

৪৮৯ ভাদ্রপদার একাদশী তিথিকে পার্বতী (?) বলা হয়। এটি আসলে একটি সুতার নাম, যা পুরোহিত ঐ উদ্দেশ্যে আনিত উপাদান থেকে তৈরী করে দেয়। তার একাংশ বাসন্তী রঙে রঞ্জিত করা হয়, অপর অংশে কোন রং মাখান হয় না। সুতাটি ওরা বাসুদেব-মূর্তির দৈর্ঘ্যের সমান করে তৈরী করে। সেটিকে তারপর সে নিজ স্কন্দের উপরে এমন ভাবে রাখে যাতে সেটি পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌঁছায়। এটি অত্যন্ত সম্মানিত পর্ব।

ভাদ্রপদার ষোড়শ দিবস, কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন হচ্ছে 'করারহ' (? کرارہ) নামক সপ্তাহের প্রথম দিন; এই পর্বে শিশুদিগকে বেশভূষায় সজ্জিত করে আপ্যায়ন করা হয় এবং তারা নানা প্রকারের পশুদের সাথে খেলা করে। সপ্তম দিনে পুরুষরাও নিজকে সুসজ্জিত করে পর্বে যোগ দেয়। মাসের শেষ পর্যন্ত ওরা প্রতি সায়াহ্নে শিশুদিগকে বেশভূষা পরায়, ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেয় ও সৎকর্ম করে।

চন্দ্র যখন চতুর্থ নক্ষত্র, 'রোহিণীতে' অবস্থান করে, সে সময়কে ওরা (کونا لهيد ?) "গূণালুহীদ্" বলে। তখন তিন দিনব্যাপী ওরা পর্বানুষ্ঠান করে। ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ করে বাসুদেবের জন্মোৎসব পালন করে।

জীবশর্মা বলেছেন, 'কাশ্মীরবাসীরা এই মাসের ২৬ ও ২৭ তারিখে (کنه) 'গনাহ' নামক একপ্রকার কাষ্ঠ খণ্ডের জন্য একটি পর্বানুষ্ঠান করে, যা উক্ত দুই দিনে বিতস্তার শ্রোতধারা নগরের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে আসে। পর্বটিকে অধিষ্ঠান বলা হয়। লোকে বলে মহাদেব কাষ্ঠখণ্ডগুলি পাঠান। সে পর্বের একটি বিশেষত্ব ওরা বলে যে, যতই ইচ্ছা করুক আর যেমনই চেষ্টা করুক, কেউ সেগুলিকে ধরতে পারে না, সর্বদাই সেগুলি হতে এড়িয়ে দূরে সরে যায়। কিন্তু কাশ্মীরীদের মধ্যে যাদিগকে আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি তারা স্থান ও কাল সম্বন্ধে অন্য কথা বলে। তারা বলে, এ-ব্যাপারটি ঘটে উপরোক্ত নদী (বিতস্তা)র উৎসের বামে অবস্থিত কুদরশহর (کود شهر) নামক পুষ্করিণীতে এবং তার সময় হচ্ছে বৈশাখ মাসের মাঝা-
৪১০ মাঝি। এইটিই বেশী সম্ভব মনে হয়, কেননা বৈশাখ মাস হচ্ছে জলবৃদ্ধির সময়। জুরজান নদীতে ভেসে আসা কাষ্ঠ বিশেষের সাথে এ ব্যাপারটির যেন সাদৃশ্য আছে, যা নদীর উৎসের জলবৃদ্ধির সময়ে দেখা যায়।

জীবশর্মা আরও বলেছেন যে সোয়াট দেশে গিরির পার্শ্ববর্তী পার্বত্যাঞ্চলে একটি উপত্যকা আছে যেখানে ৫০টি নদী একত্রিত হয়েছে। স্থানটিকে 'এজাই' (ترنجاى) বলা হয়। উপরোক্ত দুই দিন ঐ উপত্যকার জল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। সেই জলে মহাদেবের স্নান করাকে ওরা তার কারণ বলে মনে করে।

কার্তিক মাসের প্রথম, অর্থাৎ অমাবস্যার দিন সূর্য যখন তুলা রাশিতে থাকে, সেদিনকে দিপালী বলা হয়। তখন লোকেরা স্নান করে, সুবেশ পরিধান করে, পরস্পরকে পান-সুপারী দেয়, ভিক্ষা দেওয়ার জন্য শকটারোহণে মন্দিরে যায় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমোদ-আহ্লাদ করে। রাত্রে প্রত্যেক বহু সংখ্যক প্রদীপ জ্বালায়। তাতে দশদিক আলোকিত হয়ে যায়। এ উৎসবের ইতিবৃত্ত হচ্ছে: বাসুদেব-পত্নী লক্ষ্মী সারা বৎসরে এই একদিন ধরণীর সপ্তম স্তরে অবরুদ্ধ বিরোচন পুত্র বলি রাজাকে মুক্তি দেয় ও তাকে পৃথিবীতে আসবার অনুমতি দেয়। এ পর্বকে সেজন্য 'বলিরাজ্য' নাম দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বলির আধিপত্য। ওরা মনে করে এই সময়টি কৃতাযুগে মঙ্গলময় সময় ছিল। আমাদের এই দিনটি কৃতাযুগের সেই সুদিনের মত বলে আমরা আনন্দ করছি।'

কার্তিকের পূর্ণিমাতে ওরা লোকজনকে ভোজে নিমন্ত্রণ করে এবং কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিদিন নারীদিগকে বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করে।

'মার্গশীর্ষের' তৃতীয় দিনকে গৃহ-তৃতীয়া (? کوان باتر ییج=গুবান-বাত্রিজ ?) বলা হয়। এ দিনটি স্ত্রীদের পালনীয় 'গৌরী' ব্রতের দিন। ধনী গৃহিণীদের ঘরে স্ত্রীরা সমবেত হয়। রৌপ্য নির্মিত অনেকগুলি গৌরী-প্রতিমা বেদীতে স্থাপন করে ধূপ ধুনা দিয়ে তাকে অর্চিত করে এবং সারারাত্রি ধরে নিজেদের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলা করে। প্রাতে দান করে।

এই মাসের পূর্ণিমাতে স্ত্রীদের আর একটি পর্ব আছে।

পৌষ মাসের প্রায় সব দিন-ই ওরা 'পুহত্তল্' (?پوهول -পৌষালি ?)
৪৯১ নামক একপ্রকার মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করে ভোজন করে।

শুক্লপক্ষের অষ্টম দিনে,—যাকে অষ্টকা বলা হয়—ওরা ব্রাহ্মণদিগকে আমন্ত্রণ করে 'বাস্ত' নামক একপ্রকার সব্জির (আরবীতে যার নাম سرشق)। প্রস্তুত খাদ্য নিবেদন করে এবং তাদের আদর আপ্যায়ন করে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে যাকে 'সাকারতম' (? সংক্রান্তি ?) বলা হয়—ওরা 'সালগম' ভক্ষণ করে।

মাঘ মাসের তৃতীয় দিবসকে 'মহত্রিজ' (মাঘ-তৃতীয়া ?) বলা হয়। এটি স্ত্রীদের গৌরী ব্রতের দিন। বিশিষ্ট কোনও গৃহিণীর ঘরে গৌরী মূর্তির সম্মুখে ওরা সমবেত হয়ে নানাপ্রকার মূল্যবান বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য ও সুস্বাদু খাদ্য তার সম্মুখে স্থাপন করে। এইরূপ প্রত্যেক সমাগমে ওরা ১০৮টি পূর্ণ কলস স্থাপন করে। জল শীতল হলে ওরা সেই জলে রাত্রির চারি প্রহরে চার বার স্নান করে। পরদিন ওরা দান করে এবং নিমন্ত্রিত লোককে ভোজন করায়। এই মাসের প্রতি দিনই স্ত্রীরা শীতল জলে স্নান করে। শেষ দিনে অর্থাৎ ২৯ তারিখে রাত্রি যখন আর মাত্র দেড় ঘণ্টা অবশিষ্ট, তখন নারী-পুরুষ সবাই জলে নেমে সাতবার ডুব দেয়।

মাঘী পূর্ণিমাতে যাকে 'যমহ' (? جاما-যমতর্পণ ?) বলা হয়—উচ্চ স্থানগুলিতে ওরা প্রদীপ জ্বালায়।

২৩ তারিখে যাকে মাংসাষ্টকা (مالسرتک—মাংসাষ্ঠকা শ্রাদ্ধ) আর 'মাহাতন' (? ماهاتن ?) দু-ই বলা হয়—ওরা নিমন্ত্রিত লোকদিগকে মাংস ও বড় আকারের একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ ছোলার ব্যঞ্জন ভোজন করায়।

ফাল্গুন মাসের অষ্টম দিনে—যার নাম 'পুরাষ্ঠকা' ওরা ব্রাহ্মণদের জন্য ময়দা ও ঘৃতের নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে (اودان) 'ওদাদ' অথবা (ڈھولا) 'ধোলা' (দোলা) নামক নারীদের একটি বিশেষ পর্বানুষ্ঠান হয়। 'যমহ' পর্বে যে সব স্থানে
৪৯২ প্রদীপ জালানো হয়, 'ধোলা' পর্বের দিন তার নিম্নতর স্থানে ওরা অগ্নি জালায় এবং তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়। তার পরের রাত্রিতে, অর্থাৎ ষোড়শ দিবস গতে, যাকে 'শিবরাত্রি' বলা হয়, ওরা সারা রাত্রি মহাদেবের পূজা করে রাত্রি জাগরণ করে, শয্যা গ্রহণ করে না এবং তাকে ফুল ও ধূপ ধূনা অর্ঘ্য দেয়।

২৩শে ফাল্গুনে ...যার নাম (پوریئی) 'পুইয়াওন' (?)—ওরা ঘৃত ও শর্করা দিয়ে তণ্ডুল ভক্ষণ করে।

মুলতানের হিন্দুরা 'সাম্বপুর যাত্রা' (? سانب پور ژاتر) নামক একটি উৎসব পালন করে। সূর্যের সম্মানার্থে এ উৎসবের আয়োজন হয় এবং তার পূজা হয়। এর দিন নির্ধারণ এইভাবে হয়: খণ্ড খাদ্যক অনুযায়ী প্রথম 'অহর্গন' নির্ণয় করে, তার থেকে ১৮০৪০ বিয়োগ করে, অবশিষ্টকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করে, ভাগফলকে অগ্রাহ্য করা হয়। ভাগশেষে যদি কোনও সংখ্যা অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে ভাগফল হবে এ উৎসবের তারিখ; আর যদি ভাগশেষে কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা হবে গত বৎসরের পরবর্তী অতীত দিনের সংখ্যা। ৩৬৫ থেকে সে সংখ্যার যত বিয়োগ ফল হবে, পরবর্তী উৎসবের দূরত্ব ততদিন হবে।

সাতাত্তর অধ্যায়

পবিত্র দিবস ও পুণ্য কর্মের শুভাশুভ লগ্ন

দিবসগুলিতে আরোপিত বিভিন্ন গুণানুযায়ী এদের ভক্তি করা হয়। যেমন রবিবার, সূর্যের দিন ও সপ্তাহের আরম্ভ কাল বলে পবিত্র, মুসলমানদের মধ্যে শুক্রবার যেমন পবিত্র।

এই পবিত্র তিথিগুলির মধ্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাও ধরা হয়। কেননা এ দুটি দিন হচ্ছে চন্দ্রালোকের ক্ষয় ও বৃদ্ধির সর্বশেষ সীমা। ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে ওদের এইরূপ বিশ্বাসের কারণে ব্রাহ্মণেরা পুণ্যার্জনের জন্য সর্বদা হোমাগ্নিতে আহুতি দেয়। প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতি দিন চন্দ্রোদয়ে যে অর্ঘ্য ওরা অগ্নিতে নিবেদন করে সেগুলি দেবতাদের প্রাপ্য ভোগ। এই ভোগ ওরা একত্রিত করে পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত প্রতি তিথিতে দেবতাদের মধ্যে আবার বিতরণ করতে থাকে এবং অমাবস্যা পর্যন্ত তার কিছুই আর
৪৯০ অবশিষ্ট থাকে না। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা হচ্ছে পিতৃগণের অহোরাত্রের মধ্যাহ্ন ও দ্বিপ্রহর রাত্রি। কাজেই, এই দুই (পূর্ণিমা ও অমাবস্যা) দিনে যে অনবরত দান করা হয় তা সর্বদা পিতৃগণের উদ্দেশে-ই করা হয়।

আরও চারটি দিবসকে বিশেষ পবিত্র মনে করা হয়। কারণ ওদের ধারণায় বর্তমান চতুর্যুগের চারিটি যুগ ঐ চার দিনে আরম্ভ হয়েছে। দিনগুলি এই :
৩রা বৈশাখ, যাকে (كشهر تيا ?) 'কৈরিতা' বলা হয়, সেদিন থেকে কৃতাযুগ আরম্ভ হয়েছে বলে মনে করা হয়।

৯ই কার্তিক, ত্রেতা যুগের প্রথমদিন।

১৫ই মাঘ, যাতে দ্বাপর যুগ আরম্ভ হয়েছে। আর 'অশ্বযুযের' ১৩ই, যখন কলি যুগ আরম্ভ হয়েছে।

আমার অনুমান যে, এই দিনগুলি এই চারি যুগের স্মারক উৎসব, দান-দক্ষিণা কিম্বা কোনও আচারানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন খৃষ্টানদের বাৎসরিক স্মারক দিবসগুলি। তবে ঐ বিশেষ দিনে যে যুগগুলি সত্যাই আরম্ভ হয়েছিল তা কখনই নয়।

কৃতাযুগ সম্বন্ধে অন্ততঃ কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কারণ সে যুগের এবং সূর্য ও চন্দ্রের অয়নচক্রের আরম্ভ একই দিনে হয়েছে, তার তারিখে কোনও ভগ্নাংশ নাই। কেননা ঐ একই দিনে চতুর্যুগও আরম্ভ হয়েছে। দিনটি হচ্ছে চৈত্র মাসের প্রথম এবং মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন। আর ঐ একই দিনে অন্য যুগগুলিও আরম্ভ হয়। কারণ ব্রহ্মগুপ্তের মতে এক চতুর্যুগে :

৪১৪

১,৫৭৭৯১৬,৪৫০	লৌকিক (সাবন) দিবস
৫১৮৪০,০০০	সৌর দিবস,
১৫৯৩৩,০০০	'অধি' বা 'মলমাস'
১৬০ঃ৯৯৯,০০০	'চান্দ্র দিবস'
আর ২৫০৮২,৫৫০	'উনরাত্র' দিবস আছে।

এই অংকগুলি দিয়েই বিশেষ তারিখ থেকে দিবসের সংখ্যা, কিম্বা দিবসের সংখ্যা থেকে বিশেষ তারিখ বের করা হয়। ব্রহ্মগুপ্তের পদ্ধতিতে যুগের অন্তর্গত এই অংকগুলি দশ দিয়ে বিভাজ্য এবং সে ভাজকও আবার ভগ্নাংশবিহীন পূর্ণ সংখ্যা। কাজেই, যুগের আরম্ভ চতুর্যুগের আরম্ভের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু পলিসের মতে এক চতুর্যুগে :

১৫৭৭৯১৭,৮০০	লৌকিক বা সাবন দিবস
৫১৮৪০,০০০	সৌর মাস
১১৯৩,৩০৬	অধি বা মলমাস
১৬০৩০০০,০১০	চান্দ্র দিন
ও ২৫০৮২,২৮০	'উনরাত্র' দিবস

থাকে। এবং তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী, যুগের এই অংকগুলি চার দিয়ে বিভাজ্য এবং ভাজক পূর্ণ সংখ্যা। এই গণনা মতেও যুগের আরম্ভ, চতুর্যুগের আরম্ভের মত, সর্বদাই প্রথম চৈত্রে ও মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হবে। কেবল বারের পার্থক্য হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে উপরে বর্ণিত চারদিনের যে ব্যাখ্যা ওরা দেয় তা সত্য হতে পারে না। এবং ঐ দিনগুলিকে চারযুগের আরম্ভ দিবস বলে দেখাতে হলে নানারূপ কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

যে সব লগ্ন পুণ্যকর্মের জন্য উপযুক্ত তাকে 'পুণ্যকাল' বলা হয়। 'খণ্ড খাদ্যকের' টীকা গ্রন্থে বলভদ্র বলেছেন: 'যোগী' অর্থাৎ তপস্বী, যার ঈশ্বর-জ্ঞান আছে এবং যে হিত গ্রহণ করে ও অহিতকে পরিহার করে, সে সহস্র বৎসর ধরেও যদি এইরূপ সৎ জীবন যাপন করতে থাকে, তাহলেও পুণ্যকালে যে দান, স্নান-অভিষেক, জপ-তপাদি প্রভৃতি বিধেয় যাবতীয় কর্তব্যকর্ম করে তার সমান পুণ্য অর্জন সে করতে পারবে না'।

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত অধিকাংশ পর্বগুলি নিশ্চয়ই এই জাতীয়, কেননা দান ও ভোজনের জন্যই সেগুলি উদযাপিত হয়। লোকে যদি পুরস্কার প্রত্যাশী না হোত, তাহলে পর্বদিনের আমোদ-আহ্লাদকে তারা ভাল মনে করত না।

তা সত্ত্বেও পুণ্যকালের মধ্যে আবার শুভ-অশুভ দিন আছে। গ্রহাদির, বিশেষতঃ সূর্যের রাশি সংক্রমণ কাল শুভ। সে সময়কে 'সংক্রান্তি' বলা হয়। তার মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা শুভযোগ হচ্ছে বিষুব ও অয়নদ্বয়। তার মধ্যে মহাবিষুব আবার সর্বোত্তম। ষ ও খ অক্ষরের ধ্বনি ও স্থান বিনিময়ের বৈয়াকরণিক রীতি অনুসারে তাকে কখনও 'বিখু' আর কখনও বিষু বলা হয়।

যেহেতু গ্রহের রাশি সংক্রমণে ক্ষণমাত্র সময় লাগে এবং যেহেতু ঐ সময়ের মধ্যে হোমাগ্নিতে 'সানত' (? سانت ?) নামক ঘৃত ও শস্যের অর্ঘ্য দিতে হয়, সেহেতু এই সংক্রমণ কালকে হিন্দুরা কিছুটা প্রসারিত করে নিয়েছে। সূর্য গোলকের পূর্ব প্রান্ত যে মুহূর্তে রাশি স্পর্শ করে সেই মুহূর্তকে ওরা সংক্রমণের আরম্ভ বলে ধরে, সূর্য গোলকের কেন্দ্রভাগ রাশির পশ্চিম প্রান্তে এসে পৌঁছবার মুহূর্তকে—যা জ্যোতিষিক গণনায় নিষ্ক্রমণে মুহূর্ত বলে
৪৯৫ ধরা হয়—রাশি প্রবেশের কেন্দ্রক্ষণ, এবং গোলকের পশ্চিম প্রান্ত যখন পরবর্তী রাশির প্রথম ভাগ স্পর্শ করে সেইক্ষণকে সংক্রমণের অন্তঃ বলে ওরা ধরে। সূর্যের এই অবস্থাপরম্পরা সম্পূর্ণ হতে প্রায় দু' ঘণ্টা সময় লাগে।

সপ্তাহের মধ্যে সূর্যের রাশি প্রবেশের সময় নির্ণয়ের জন্য ওদের নানান পদ্ধতি আছে: তার একটির যে বর্ণনা 'সময়' (? سمى) আমাকে শুনিয়েছিল তা এই: 'শককাল' থেকে ৮৪৭ বিয়োগ কর, অবশিষ্টকে ১৮০ দিয়ে পূরণ কর এবং গুণফলকে ১৪৩ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে দিবস, মিনিট ও সেকেণ্ডের সংখ্যা। এই সংখ্যাকে মূল বলে ধরতে হবে। কোনও বিশেষ বৎসরে সূর্যের এক রাশি থেকে রাশ্যান্তরে প্রবেশ কাল যদি জানতে চাও তাহলে নীচের নির্ঘণ্টে আলোচ্য রাশির সম্মুখস্থিত সংখ্যা ধরে তার সাথে

ঐ 'মূল' সংখ্যার দিবসের সাথে দিবস, মিনিটের সাথে মিনিট, আর সেকেন্ডের সাথে সেকেন্ডকে যোগ দাও। পূর্ণ সংখ্যাগুলি যদি সাত বা তদূর্ধ্ব হয়, তা অগ্রাহ্য করে, অবশিষ্ট সংখ্যা দিয়ে রবিবার থেকে সপ্তাহের দিনগুলি গুণে যেতে থাক। গণনা যে সংখ্যায় শেষ হবে, তা হবে সংক্রান্তির সময়।

৪৯৬

রাশি		মূল সংখ্যায় যা যোগ করতে হবে		
		দিন	ঘড়ি	চষক
	মেষ	৩	১৯	০
	বৃষ	৬	১৭	০
	মিথুন	২	৪৩	০
	কর্কট	৬	২১	০
	সিংহ	২	৪৯	০
	কন্যা	৫	৫৯	০
	তুলা	১	১৪	০
	বৃশ্চিক	৩	৬	৩০
	ধনু	৪	৩৪	৩০
	মকর	৫	৫৪	০
	কুম্ভ	০	৩০	০
	মীন	২	১১	২০

পর পর দুই সৌর বৎসরের আরম্ভ সপ্তাহের একদিন ও দিনাংশের তফাৎ হয়। একই ভগ্নাংশে পরিণত পার্থক্যের এই পরিমাণটি (১৮০) সদ্য বর্ণিত প্রক্রিয়ায় গুণকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতি বৎসরারম্ভের উদ্বৃত্ত সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। আর ভাজকটি (১৪৩) হচ্ছে এই ভগ্নাংশের হর (denominator) সংখ্যা (=[illegible])। সুতরাং এই গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সৌর বৎসরের শেষে যে ভগ্নাংশ থাকে তা হচ্ছে [illegible]; তাহলে সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন, ৩১ ঘণ্টা, ২৮ মিনিট ও ৬ সেকেন্ডে দাঁড়ায়।

দিবসের এই ভগ্নাংশকে পূর্ণ দিবসে পরিণত করতে হলে আরও ২১৬ দিবসাংশের প্রয়োজন। এই গণনা সূত্রটি যে কার, আমি জানি না।

আমরা ব্রহ্মগুপ্তের মতানুসরণ করে, চতুর্যুগের মোট দিবসকে যদি তার সৌর বৎসরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি, তাহলে এক সৌর বৎসরের ৩৬৫ দিন, ৩০°, ২২″, ৩০‴ ও ০″″ দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। তার 'গুণকার' ৪০২৭, আর 'ভাগ হর' ([illegible] = ভাজক) হয় ৩২০০।

পলিশের গণনা বিধি অনুসরণ করলে বৎসরের দৈর্ঘ্য হয় ৩৬৫ দিন, ১৫′ ৩১″ ৩‴ ০″″। সেক্ষেত্রে, 'গুণকার' হবে ১৫০৭, আর 'ভাগহর' হবে ৮০০। আবার আর্যভট্টের মতে, সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন, ১৫′ ৩১″ ১৫‴ দাঁড়াবে। আর তার 'গুণকার' হবে ৭২৫ আর 'ভাগহর' ৫৭২।

পলিশের সূত্রানুযায়ী বলে কথিত সংক্রান্তি মুহূর্ত নির্ণয় করার আর একটি নিয়ম 'সহারী' পুত্র 'উলথ (اولت بن سهاری) বর্ণনা করেছেন : 'শককাল' থেকে ৯১৮ বিয়োগ কর, অবশিষ্টকে ১০০৭, দিয়ে গুণ কর, গুণ-ফলের সঙ্গে ৭৯ যোগ দাও, লব্ধ অংককে ৮০০ দিয়ে ভাগ কর; ভাগফলকে
৪৯৭ আবার ৭ দিয়ে ভাগ করে, যা ভাগশেষ থাকবে, তা হবে 'মূল' সংখ্যা। এই মূল সংখ্যার সঙ্গে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াতে প্রত্যেক রাশির জন্য কত যোগ করতে হবে তা এই নির্দেশে রাশির নামের সম্মুখে দেখান হয়েছে।

রাশি	মূল সংখ্যায় যা যোগ করতে হবে	
	দিন	ঘড়ি
মেষ	১	৩৫
বৃষ	৪	৩৫
মিথুন	০	৩৯
কর্কট	৪	৩৪
সিংহ	১	৬
কন্যা	৪	৬
তুলা	৬	৩১
বৃশ্চিক	১	২৩
ধনু	২	১১
মকর	৪	১০
কুম্ভ	৫	৩৪
মীন	০	২৮

'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকায়' বরাহমিহির বলেছেন যে, ষ'ড়শিতমুখ' সংক্রান্তির মতই পবিত্র ও গণনাতীত পুণ্যার্জনের শুভক্ষণ। এই রাশি মিথুন রাশির ১৮ ডিগ্রিতে, কন্যার ১৪ ডিগ্রিতে, ধনুর ২৬ ডিগ্রিতে, আর মীনের ২৮ ডিগ্রিতে। সূর্যের প্রবেশ মুহূর্তকে 'ষড়শিতমুখ' বলে।

'স্থির' রাশিগুলিতে সূর্যের প্রবেশলগ্নে কৃতকর্মের পুণ্যফল অন্যান্য রাশি প্রবেশ লগ্নে কৃতকর্মের চতুর্গুণ। গ্রহণ ক্ষেত্রে সূর্য বা চন্দ্রের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের মিনিট যেভাবে নির্ণয় করা হয়, উপরোক্ত রাশিগুলিতে সূর্যের প্রবেশ লগ্নের আরম্ভ ও শেষও সেই নিয়মে সূর্যের ব্যাসার্ধ ধরে নির্ণয় করা হয়। এ নিয়মটি ওদের পঞ্জিকায় বহুল প্রচলিত। ওদের সেসব পদ্ধতি আমি আর উদ্ধৃত করব না, কেবল সেইগুলিই বর্ণনা করব যা আমার অদ্ভুত মনে হয়, কিম্বা যা আমাদের মুসলমানদের মধ্যে—যারা কেবল 'সিন্দহিন্দে' (সিদ্ধান্ত) বর্ণিত পদ্ধতির কথাই জানে—কখনও ব্যাখ্যা করা হয়নি বলে জানি।

৪১৮ এসব লগ্নের মধ্যে পুণ্যতম হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কাল। ওদের বিশ্বাস মতে, ঐ সময়ে ধরণীর সমস্ত জল গঙ্গার জলের মত পবিত্র হয়ে যায়। ওরা এই সময়কে এত পবিত্র মনে করে যে, অনেকে এই শুভ লগ্নে দেহত্যাগ করার বাসনায় আত্মহত্যাও করে। অবশ্য, কেবল বৈশ্য ও শূদ্ররাই তা করে থাকে; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের পক্ষে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ, সেজন্য ওরা তা করে না।

'পর্ব' অর্থাৎ গ্রহণ সম্ভাবনার সময়গুলিও পবিত্র, গ্রহণ না হলেও, গ্রহণ লগ্নের মতই সে সময়কে পবিত্র মনে করা হয়। 'যোগের' সময়ও গ্রহণের মত পবিত্র, বিষয়টি আমি এক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি (অধ্যায় ৭৯)।

যদি এমন হয় যে, একই লৌকিক দিনের মধ্যে চন্দ্র কোনও নক্ষত্রের অন্তে অবস্থান ক'রে পরবর্তী নক্ষত্রে প্রবেশ ও অতিক্রম ক'রে তৃতীয় নক্ষত্রে প্রবেশ করে, যার ফলে একই দিনে চন্দ্রের পর পর তিনটি নক্ষত্রে অবস্থান হয়, তাহলে সেদিনকে=ত্র্যহস্পর্শ অথবা 'ত্র্যহক্ষ' (?) বলা হয়। এটি অশুভ দুর্লক্ষণাক্রান্ত দিন, কিন্তু 'পুণ্যকালের মধ্যে গণ্য।

যে লৌকিক দিনে একটি চান্দ্র তিথি সম্পূর্ণ হয় এবং যার আরম্ভ পূর্ববর্তী তিথির শেষ ভাগে ও অন্ত পরবর্তী তিথির প্রথমভাগে পড়ে, তার গুণাগুণও ঐ প্রকার। এরূপ দিনকে 'ত্র্যহগম্ভত' (ترهگنت =ত্র্যহগর্ত) বলে। এটি অশুভ দিন, কিন্তু পুণ্যকর্মের জন্য সুপ্রশস্ত।

যেদিনে 'উনরাত্র' অর্থাৎ ক্ষয়দিবসের অংশগুলি এক সম্পূর্ণ দিবসের সমান হয়, সেই দিনটিও অশুভ, পুণ্যকালের মধ্যে পরিগণিত। ব্রহ্মগুপ্তের মতে এরূপ ঘটনা $৬২\frac{৫০৬৬৩}{৫৫৭৩৯}$ লৌকিক দিনে, $৬২\frac{১৮২}{৫৫৭৩৯}$ সৌর দিনে, আর $৬৩\frac{৫০৬৬৩}{৫৫৭৩৯}$ চান্দ্র দিনে একবার ঘটে। আর, পলিশের মতে $৬২\frac{৬৩০৭৯}{৬৯৬৭০}$ লৌকিক দিনে, $৬৩\frac{৬৩০৭৯}{৬৯৬৭০}$ চান্দ্র দিনে, আর $৬২\frac{২৭৪}{৬৯৬৭১}$ সৌর দিবসের পর এরূপ ঘটে।

এক 'অধি' বা 'মল' মাস সম্পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তটিও অশুভ, কিন্তু পুণ্যকালের মধ্যে তাকে ধরা হয় না। ব্রহ্মগুপ্তের মতে এরূপ একটি মাস $৯৯০\frac{৩৬৬৩}{১০৮২২}$ লৌকিক দিবসে, $৯৭৬\frac{৪৬৪}{৪০১১}$ সৌর দিবসে ও
৪১১ $১০০৬\frac{৪৬৪}{৫০১১}$ চান্দ্র দিবসে সম্পূর্ণ হয়।

যে সব সময় অশুভ মনে করা হয়, যাতে কোনওরূপ পুণ্যের সংস্রব নাই, তার উদাহরণ ভূমিকম্পের সময়। সে সময়ে হিন্দুরা সুলক্ষণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ও সংকট ত্রাণের জন্য গৃহের তৈজসপত্রগুলি মাটিতে ঠুকে ভেঙ্গে ফেলে। 'সংহিতা' গ্রন্থে এইরূপ দুঃসময়ের আরও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—যেমন, ভূমি ধসে পড়া, উল্কাপাত, আকাশের লোহিত বর্ণ ধারণ, বজ্রপাতে ভূমি বিদীর্ণ হওয়া; ধূমকেতুর আবির্ভাব, গ্রামে হিংস্র পশুর প্রবেশ, অসময়ে বৃষ্টিপাত, অকালে বৃক্ষের পত্রোদ্গম, এক ঋতুর বিশেষত্ব অন্য ঋতুতে প্রকাশ ইত্যাদি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ও অসাধারণ ঘটনাবলীর সময়।

মহাদেবের রচনা বলে খ্যাত 'শ্রুধব' গ্রন্থে আছে 'দগ্ধা' অর্থাৎ, অশুভ দিনকে ওরা এই সংজ্ঞায় অভিহিত করে—তিথিগুলি এই :

'চৈত্র ও পৌষের শুক্লা ও কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, জ্যৈষ্ঠ ও ফাল্গুনের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থী, শ্রাবণ ও বৈশাখের শুক্লা ও কৃষ্ণা ষষ্ঠী, আষাঢ় ও অশ্বযুজের শুক্লা ও কৃষ্ণা অষ্টমী, মার্গশীর্ষ ও ভাদ্রের শুক্লা ও কৃষ্ণা দশমী এবং কার্তিকের শুক্লা ও কৃষ্ণা দ্বাদশী।

আটাত্তর অধ্যায়

করণ

৫০০ আমরা 'তিথি' নামক চান্দ্র দিবসের কথা আগে বলেছি এবং এও বলেছি যে, চান্দ্র দিবস লৌকিক দিবস অপেক্ষা হ্রস্বতর, কারণ চান্দ্র মাসে ৩০ তিথি আছে। কিন্তু তাতে 'সাবন দিবস আছে ২৯ই এর সামান্য বেশী।

ওরা এই তিথিকে যেমন অহোরাত্র বলে, তেমনই তার প্রথমার্ধকে দিন ও শেষার্ধকে রাত্রি বলে। প্রত্যেকটি অর্ধ তিথির পৃথক নাম আছে এবং অর্ধ তিথির সমষ্টিকে 'করণ' বলা হয়।

কতকগুলি করণের নাম মাসে একবার আসে, তার পুনরাবর্তন হয় না; যেমন অমাবস্যার চারটি 'করণ' যাকে 'স্থির' বলা হয়, কেননা, সেগুলি মাসে একবারই আসে এবং প্রত্যেক বারই মাসের একই দিবারাত্রিতে পড়ে। অন্য করণগুলি ঘোরাঘুরি করে এবং মাসের মধ্যে আটবার ঘুরে ঘুরে আসে। এরূপ গতির জন্য সেগুলিকে 'সচল' বলা হয়, কারণ এগুলির প্রত্যেকটি একই সঙ্গে রাত্রি ও দিনে পড়তে পারে। এরূপ করণ আছে সাতটি; শেষের সপ্তম করণটি অশুভ, তার দ্বারা শিশুদেরকে ভয় দেখান হয়, তার নাম শ্রবণমাত্রই ভয়ে বালকদের লোমহর্ষণ হয়। অন্য একটি পুস্তিকাতে আমি করণের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। হিন্দুদের জ্যোতিষ ও গণনার এমন কোনও পুস্তক নাই যাতে করণের উল্লেখ নাই। তুমি যদি 'করণগুলি' জানতে চাও তোমাকে প্রথমে চান্দ্র দিবসগুলি নির্ণয় করে নিয়ে, তার কোন্ ভাগে তোমার আলোচ্য সময়টি পড়ে তা বার করতে হবে। তার নিয়ম এই :

চন্দ্রের স্ফুট অবস্থান مقوم القمر =corrected place) থেকে সূর্যের স্ফুট অবস্থান বিয়োগ কর, বিয়োগ ফল হবে তাদের পারস্পরিক দূরত্ব। এই দূরত্ব যদি ছয় রাশির কম হয় তাহলে তোমার আলোচ্য সময়টি শুক্লপক্ষে পড়বে।

তারপর, এই দূরত্ব সংখ্যাকে মিনিটে পরিণত করে তাকে ৭২০ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল থেকে তিথি পাওয়া যাবে, অর্থাৎ পূর্ণ চান্দ্র দিবস। যদি ভাগশেষ থাকে তাকে ৬০ দিয়ে গুণ করে লব্ধ সংখ্যাকে 'ভুক্তান্তর' (بهت المعدل =mean daily motion of planet) দিয়ে ভাগ কর। তার ফলে সেইদিনের অতীত ঘড়ি, দণ্ড-পলাদি পাওয়া যাবে।

এই হচ্ছে ওদের পঞ্জিকাদিতে বর্ণিত বিধি। সূর্য ও চন্দ্রের স্ফুট অবস্থানের দূরত্বকে 'ভুক্ত্যন্তর' দিয়ে ভাগ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু অধিকাংশ দিবসের ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হয় না। সেজন্য এই দূরত্বকে ওরা সূর্য ও চন্দ্রের আহ্নিক
৫০১ গতির পার্থক্য দিয়ে ভাগ করে। চন্দ্রের এই গতি ওরা ১৩ ডিগ্রী আর সূর্যের গতি ১ ডিগ্রী বলে ধরে।

এই গণনার, বিশেষ করে ভারতীয় গণনার একটি সর্বাদৃত রীতি হচ্ছে, সূর্য চন্দ্রের মধ্যক গতি (وسط المسير) দিয়ে গণনা করা। সূর্যের মধ্যক গতি চন্দ্রের মধ্যক গতি থেকে বিয়োগ করে, অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৭৩২ দিয়ে ভাগ করা হয়। এই ৭৩২ হচ্ছে জ্যোতিষ্কদ্বয়ের মধ্যম 'ভুক্তির' পার্থক্য। ভাগফল থেকে তখন দিন ও ঘড়ি পাওয়া যাবে।

'বুহত' (بهت) শব্দটি ভারতীয় ভাষাজাত। আসল শব্দ হচ্ছে 'ভুক্তি' (بهكت)। গ্রহাদির সংস্কৃত গতি (مسير التقوم =corrected motion) বোঝাতে হলে 'ভুক্তিস্ফুট' বলা হয়। আর মধ্যক গতি বোঝাতে হলে 'ভুক্তি মধ্যম' আর যে 'বুহুত্' সমানভাবে ভাগ করে তাকে 'ভুক্ত্যন্তর' বলা হয় অর্থাৎ দুই বুহতের' অন্তরবর্তী দূরত্ব।

মাসের চান্দ্র দিবসগুলির (তিথি) বিশেষ নাম হচেছ; নিম্নের সারণীতে তা আমি দেখাচিছ।

৫০২

শুক্ল পক্ষ				কৃষ্ণ পক্ষ				উভয় পক্ষের প্রযুক্তকরণ	
দিনের ক্রমিক সংখ্যা	নাম	দিনের ক্রমিক সংখ্যা	নাম	দিনের ক্রমিক সংখ্যা	নাম			দিবাভাগ	রাত্রিভাগ
১	অমাবস্যা	০	০	০	০	০	০	চতুষ্পাদ	নাগ
২	বরথ্	০	০	০	০	০	০	কিস্তুঘ্ন	বব
৩	বিয়হ্	১০	নবিন্	১৭	বরথ্	২৪	অতিন্	বালব	কৌলব
৪	ত্রিয়হ্	১১	দহিন্	১৮	বিয়হ্	২৫	নবিন্	তৈতিল	গর
৫	চৌথ	১২	ইয়হী	১৯	ত্রিয়হ্	২৬	দহিন্	বণিজ	বিষ্টি
৬	পঞ্চি	১৩	দুয়াহি	২০	চৌথ	২৭	ইয়াহি	বব	বালব
৭	সত	১৪	ত্রোহি	২১	পঞ্চি	২৮	দুবাহি	কৌলব	তৈতিল
৮	সতিং	১৫	চৌদহি	২২	সত	২৯	ত্রোহি	গর	বণিজ
৯	অতিং	১৬	পূর্ণিমা পঞ্চাহি	২৩	সতিং	০	০	বিষ্টি	বব
০	০	০	০	০	০	৩০	চৌদহি	বিষ্টি	শকুনি

তোমার বর্তমান চান্দ্রদিবস যদি জানা থাকে, তাহলে সারণিতে সন্নিবেশিত দিবসের সংখ্যার পার্শ্বে তার নাম পাবে এবং তার বিপরীত দিকে তোমার বর্তমান করণের নাম লিখিত দেখতে পাবে। চলিত দিবসের গত অংশ অর্ধ দিবসের কম হলে, 'করণটি' হবে দিবাভাগের। আর অর্ধ দিবসের অধিক হলে হবে রাত্রিভাগের।

হিন্দুদের অভ্যাসমত, কতকগুলি করণের অধিপতিও ওরা স্থির করে নিয়েছে এবং জ্যোতিষীক শুভাশুভ নির্ণয়ের মত প্রত্যেক করণে কর্তব্য-অকর্তব্যের নিয়মাবলীও রচনা করে নিয়েছে। এখানে করণের আর একটি সারণি দেবার উদ্দেশ্য, আমার এই বক্তব্যকে সপ্রমাণিত করা এবং একটি অপরিচিত বিষয়কে পুনর্বার উপস্থাপিত করা যাতে পুনরুক্তি ও পুনরুচ্চারণের দরুন বিষয়টির পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়।

'করণ' প্রকরণ

(১) 'স্থির' করণ চতুষ্টয়

৫০০

পক্ষ	নাম	অধিপতি	ফলাফল ও শুভকর্ম।
কৃষ্ণ	সকুন	কালী	ঔষধ-করণ, সর্পবিষনাশক বনৌষধি প্রয়োগ, বশীকরণ, অধ্যয়ন, মন্ত্রণা ও বিগ্রহ সমন্ধে স্তোত্রপাঠ।
	চতুষ্পদ	বৃষরাশি	রাজ্যাভিষেক, পিতৃগণের উদ্দেশ্য দান, কৃষিকর্মে চতুষ্পদ নিয়োগ।
শুক্ল	নাগ	সর্প	বিবাহ, গৃহ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, সর্পদষ্ঠ ব্যক্তির পরীক্ষা, ত্রাস সঞ্চার ও লোক বন্ধন।
	কিস্তুঘ্ন	বায়ু	সমস্ত কার্য নাশক, কেবল বিবাহ সংক্রান্ত কর্মাদি, ছত্র নির্মাণ, কর্ণবেধ ও শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য শুভ।

(২)—'সচল' করণ—

৫০৪

শুক্ল উত্তর পক্ষ ও কৃষ্ণ	বব	শক্র	মধ্যে সংক্রান্তি হলে করণ আসীন (পৃথিবীতে বাস করে) হয়, বৃক্ষের ফলহানি হয়, যাত্রা, জলাশয়-দেবালয় প্রভৃতি দীর্ঘস্থায়ী কর্মারম্ভ, মেদ বর্ধক ঔষধি প্রস্তুত, ব্রাহ্মণের অগ্নিতে অর্ঘ্যপ্রদানের জন্য শুভ।
	বালব	ব্রহ্মা	মধ্যে সংক্রান্তি পড়লে 'করণ' 'পৃথিবী' 'আসীন' হয়। বৃক্ষ ফলের জন্য অমঙ্গল। পরজন্মের কৃত্যাদি ও পুণ্যকার্যের জন্য শুভ।
	কৌলব	মিত্র	মধ্যে সংক্রান্তি পড়লে 'করণ' 'দণ্ডায়মান (স্বর্গে বাস) হয়; বীজরোপণ সুফলপ্রদ ও শস্য রসপুষ্ট হয়; মিত্র গ্রহণের জন্য শুভ।
	তৈতিল	আর্যমন	সংক্রান্তি পড়লে করণ 'ভূমিশায়ী' হয়; দ্রব্যমূল্য নিম্নগামী হবে। প্রসাধন সামগ্রী ও গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য শুভ।
	গর	পর্বত	সংক্রান্তি পড়লে 'ভূমিশায়ী' দ্রব্যমূল্য নিম্নগামী হবে, রোপণ ও গৃহ নির্মাণারম্ভের জন্য শুভ।
৫০৫	বণিজ	শ্রী	সংক্রান্তি পড়লে 'দণ্ডায়মান'; শস্যারোপণ, সুফল হবে ...বাণিজ্যের জন্য শুভ।
	বিষ্টি	মরুৎ	সংক্রান্তি পড়লে ভূমিয়ান' দ্রব্যমূল্যের ক্ষতি হবে। ইক্ষু রস নিষ্কাশন ব্যতীত সকল কার্যের জন্য অশুভ। পাপ 'করণ', যাত্রার জন্য অমঙ্গল।

'করণ' গণনা করার নিয়ম এই: সূর্যের স্ফুট অবস্থানকে চন্দ্রের স্ফুট অবস্থান থেকে বিয়োগ কর, অবশিষ্টকে মিনিটে পরিণত ক'রে তাকে ৩৬০ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে সম্পূর্ণ করণের সংখ্যা। ভাগশেষ যা থাকবে তাকে ৬০ দিয়ে পূরণ ক'রে 'ভুক্ত্যন্তর' দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে বর্তমান করণের অতীত অংশ। এই ভাগফলের প্রত্যেকটি একক সংখ্যা অর্ধঘড়ির সমান।

তারপর তুমি সম্পূর্ণ করণের সংখ্যায় ফিরে এস। সে সংখ্যা যদি দুই
৫০৬ বা তার কম হয় তাহলে বর্তমানে তুমি দ্বিতীয় করণে আছ বলে জানা গেল। তখন সংখ্যাটির সাথে তুমি এক যোগ করবে এবং 'চতুষ্পাদ' থেকে আরম্ভ করে ততগুলি এক এক করে গুণে যাবে। আর সংখ্যাটি যদি ৫৯ হয় তাহলে তোমার বর্তমান করণ হবে 'শকুনি'। আর দুই এর অধিক ও ৫৯-এর অনধিক হলে,

তার সাথে এক যোগ ক'রে, তাকে ৭ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগশেষ যদি দুই-এর অনধিক হয়, তাহলে সচল করণ সকলের আদি, অর্থাৎ 'বব' থেকে আরম্ভ করে সমান সংখ্যায় করণগুলি এক এক করে গুণে যাও। যে করণে সংখ্যাটি শেষ হবে, তা হবে তোমার বর্তমান করণ।

পাঠক, তুমি যদি চাও যে, এতৎসম্পর্কিত একটি কথা এখানে উল্লেখ করি যা হয়ত তুমি বিস্মৃত হয়েছ, তাহলে জেনে রাখ যে Al-Kindi ও তাঁর মত আরও কয়েক জন এই করণ তত্ত্বটি যেন হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি এবং যারা 'করণ' ব্যবহার করে সেই ভারতীয়দের গণনা-বিধিও তাঁরা ভাল রকম বোঝেন নি। তাঁর একবার হিন্দুদের প্রতি, একবার ব্যাবিলনীয়দের প্রতি এর উৎপত্তি আরোপ করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে, লিপিকারের দোষে আসল ব্যাপারটি বিকৃত হয়ে গেছে। তাঁরা করণ গণনার একটি পদ্ধতিও অনুমান করে নিয়েছেন, যা মূল পদ্ধতি অপেক্ষা বেশী সুশৃঙ্খল। তার দরুনে, কিন্তু আসল ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এঁদের পদ্ধতিটি এইঃ অমাবস্যা থেকে তাঁরা অর্ধদিবস করে গুণে যেতে থাকেন; প্রথম দ্বাদশ ঘন্টা সূর্যের অধিগত 'দগ্ধ', অর্থাৎ অশুভ, পরবর্তী অর্ধদিবস শুক্রের, তার পরবর্তী বুধের, এইভাবে গ্রহের ক্রমানুযায়ী অর্ধদিবসগুলি গুণে যেতে থাকেন। গণনার ক্রম যখন পুনরায় সূর্যে এসে উপনীত হয়, তখন তার দ্বাদশ ঘন্টাকে তাঁরা ساعات البست অর্থাৎ 'বিষ্টি' আখ্যায়িত করেন।

হিন্দুরা কিন্তু লৌকিক দিন ধরে 'করণ' গণনা করে না। চান্দ্র দিন ধরে করে এবং অমাবস্যার পরবর্তী 'দগ্ধা' ঘটিকা থেকে গণনা আরম্ভ করে না। অল্‌কিন্দির মতে, অমাবস্যার পর 'বৃহস্পতি' দিয়ে করণ গণনা করে। তাহলে কিন্তু সূর্যের অধিগত (প্রথম দ্বাদশ ঘটিকা) কাল 'দগ্ধা' হবে না। অন্যপক্ষে, হিন্দুদের পদ্ধতি অনুযায়ী, অমাবস্যার পর সূর্য দিয়ে যদি গণনা আরম্ভ করা হয়, তাহলে 'বিষ্টির' ঘটিকাগুলি হবে বুধ গ্রহের। কাজেই এই দুই পদ্ধতিকে একত্রিত করা সম্ভব নয়, পৃথক-ই রাখতে হবে।

যেহেতু 'বিষ্টি' প্রতি মাসে আটবার আসে এবং যেহেতু চক্রবালের দিক্‌ সংখ্যাও আট, সেজন্য, রাশি চিহ্নের প্রতি তৃতীয় ভাগে উদিত নক্ষত্রাদির
৫০৭ কল্পমূর্তি যেমন ফলবিচারী জ্যোতিষীরা লক্ষ্য করেন, তেমনি বিষ্টির ও বিভিন্ন কল্প মূর্তির বর্ণনা পর পৃষ্ঠার সারণিতে পৃথকভাবে আটটি ঘরে সাজিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্টির সংখ্যা	মাসের তিথি	বিষ্টির নাম	উদয় কোণ	বিষ্টির স্বরূপমূর্তি ও তার গুণাগুণ	শুধবের পুস্তকানুযায়ী বিষ্টির নাম
প্রথম	পঞ্চম তিথির রাত্রি ভাগ	সুলিপ شوائی	পূর্ব	ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, কেশ ইক্ষুপত্রের ন্যায়, এক হস্তে অঙ্কুশ, অন্য হস্তে কৃষ্ণনাগ খরস্রোতের ন্যায় বেগবান, লোলজিহবা; যুদ্ধ ও প্রবঞ্চনাত্মক কার্যাদি ব্যতীত অন্য সকল কর্মের জন্য অশুভ।	বাড়বামুখ
২য়	নবমী তিথির রাত্রি ভাগ	যমদূত	ঈশান	হরিৎবর্ণ, হস্তে অসি, বজ্র, বিদ্যুৎ ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ শীতল মেঘের মধ্যে তার অবস্থিতি; বনৌষধি সংগ্রহ, ঔষধ সেবন, বাণিজ্য ও ছাঁচে স্বর্ণ ঢালাই-এর জন্য শুভ।	বলব
৩য়	নবমী তিথির রাত্রি ভাগ	ঘোর	উত্তর	কৃষ্ণ বর্ণ মুখমণ্ডল, স্থূলোষ্ঠ, ঘনভুরু, দীর্ঘকেশ, দীর্ঘদেহ, দিবাভাগে অশ্বারূঢ়, হস্তে অসি, মনুষ্য ভক্ষণে রত; মুখ হতে অগ্নিশিখা নির্গত, বাবারা, এই শব্দ করে। কেবল যুদ্ধ কার্য, অপরাধী বধ, রোগীর চিকিৎসারম্ভ ও সর্প নিষ্ক্রমণের জন্য শুভ।	ঘোর
৪র্থ	ষোড়শ তিথি দিবাভাগ	নাস্থংশ (নষ্টরিনীশ)	বায়ব	পঞ্চানন, দশনেত্র; বিদ্রোহী দমন ও সৈন্য সজ্জার জন্য শুভ। উদয় কোণের দিকে মুখ করা অবিধেয়।	করাল
৫ম	ঊনবিংশতম তিথির রাত্রি ভাগ	দারুণী	পশ্চিম	সধূম অগ্নিশিখার ন্যায়; ত্রিমস্তকাবিশিষ্ট, প্রতি মস্তকে তিনটি বিপরীতমুখী চক্ষু; সজারুগাত্রের ন্যায় কেশ; মনুষ্য মস্তকে আসীন, বজ্রের ন্যায় গর্জন করে ও মনুষ্য ভক্ষণ করে। একহস্তে ছুরিকা, অন্য হস্তে কুঠার।	জ্বালা

বিষ্টির সংখ্যা	মাসের তিথি	বিষ্টির নাম	উদয় কোণ	বিষ্টির রূপমূর্তি ও তার গুণাগুণ	শ্রুধবের পুস্তকানুযায়ী বিষ্টির নাম
৬ষ্ঠ	ত্রয়োবিংশ তিথির দিবাভাগ	করালী	নৈঋত	শ্বেত বর্ণ, ত্রিনেত্র, হস্তিপৃষ্ঠে আসীন; রূপান্তর হয় না। একহস্তে বিশাল প্রস্তর খণ্ড, অপর হস্তে নিক্ষিপ্ত বজ্র। গবাদি পশু বিনষ্ট করে। তার উদয় কোণ থেকে অভিযাত্রী যুদ্ধে জয়ী হবে, বনৌষধি সংগ্রহ, গুপ্তধন উদ্ধার ও আবশ্যকীয় কর্ম সম্পাদনকালে তার উদয়ের কোণাভিমুখী হওয়া একান্ত অকর্তব্য।	—
৭ম	ষড়বিংশতিতম তিথির রাত্রিভাগ	ভয়ামণি بهیاس	দক্ষিণ	স্ফটিকবর্ণ, এক হস্তে ত্রিকোণবিশিষ্ট "পরশ্বাধ", অন্য হস্তে জপমালা; ঊর্ধ্বমুখী, হাহাহা শব্দকারী; ষণ্ডের পৃষ্ঠে আরূঢ়। বিদ্যারম্ভ, সন্ধি সম্পাদন, দান-দক্ষিণা ও স্বস্ত্যয়নের জন্য শুভ।	কালরাত্রি
৮ম	ত্রিংশ তিথির দিবাভাগ	বিকটা	অগ্নি	শুকপক্ষীর ন্যায় হরিৎবর্ণ; কুৎসিত ত্রিনেত্র; একহস্তে অঙ্কুশবিশিষ্ট গদা, অন্য হস্তে তীক্ষ্ণ চক্র, সিংহাসনে আসীন, লোক ত্রাসকারী, সা সা, এইরূপ শব্দকারী। কোনও রূপ কর্মারম্ভের জন্য অশুভ; পরিজন সেবা ও গৃহকর্মের জন্য শুভ।	—

ঊনআশি অধ্যায়

যোগ

৫০৯ যোগ হচ্ছে সেই সব সময় যাকে হিন্দুরা অতিশয় অশুভ মনে করে, যাতে সব রকম কর্ম থেকে বিরত থাকা বিধেয়। এদের যোগ আছে। এখানে আমরা সেগুলি উল্লেখ করব।

৫১০ দুইটি 'যোগ' সম্বন্ধে-ওরা সবাই একমত। সে দু'টি হচ্ছে (১) সূর্য-চন্দ্রের এমন দুইটি বৃত্তে অবস্থান যে একে অপরকে গ্রাস করছে মনে হয়, অর্থাৎ এমন দুইটি পূণ বৃত্তে অবস্থান, প্রতি অয়নান্তে যাদের একই দিকের বিষুব-লম্বদ্বয় (declination) পরস্পরের সমান হয়। এই যোগের নাম 'ব্যাতিপাত'। (২) সূর্য-চন্দ্রের দুই সমান বৃত্তে অবস্থান, অর্থাৎ এমন দুটি বৃত্তে অবস্থান, অয়নান্তে যার বিপরীত দিকের বিষুব লম্বদ্বয় পরস্পরের সমান। এর নাম 'বৈধৃত' যোগ।

প্রথমটির চিহ্ন হচ্ছে যে তাতে সূর্য-চন্দ্রের স্ফুট অবস্থিতি ক্ষেত্রের সমষ্টি, মেষ রাশির ০ ডিগ্রী থেকে ছয় রাশি পরিমাণ দূরত্বের সমান হবে, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, সে সমষ্টি হবে ১২ রাশি পরিমাণ দূরত্বের সমান। কোনও বিশেষ সময়ের সূর্য-চন্দ্রের স্ফুট অবস্থানের সমষ্টিকে যদি যোগ করা যায়, তাহলে লব্ধ অঙ্কে এই চিহ্নদ্বয়ের একটি, অর্থাৎ যোগদ্বয়ের একটিকে পাওয়া যাবে। আর, সমষ্টি সংখ্যা যদি উপরোক্ত চিহ্নের চেয়ে ছোট কিম্বা বড় হয়, সেক্ষেত্রে চিহ্নের সাথে সমষ্টির সমান হওয়ার সময়, সমষ্টির সাথে 'ব্যতিপাত' বা 'বৈধৃতের' প্রভেদ এবং সূর্য-চন্দ্রের ভুক্তান্তরের পরিবর্তে 'ভুক্তি'দ্বয়ের সমষ্টি দিয়ে নির্ণয় করা যাবে, পঞ্জিকাদিতে যেভাবে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় নির্ণয় করা হয়।

মধ্যাহ্ন বা মধ্যরাত্রি থেকে সময়ের দূরত্ব যদি জানা থাকে তাহলে, রাত্রি বা, দিন, যা দিয়ে-ই সূর্য-চন্দ্রের স্ফুট অবস্থান নির্ণয় করা হোক না কেন, সে অবস্থিতির সময়কে 'মধ্যক' বলা হবে, কেননা, চন্দ্র যদি সূর্যের মত-ই অভ্রান্তভাবে ক্রান্তিবৃত্তকে অতিক্রম করে, তাহলে ঐ সময়টি হবে আমাদের নির্ণয়াধীন সময়। কিন্তু চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্ত থেকে কিছুটা ব্যতিক্রান্ত হয়।

সেজন্য, সে সূর্যের বৃত্তে, অথবা দৃষ্টতঃ যে বৃত্ত তার সমান মনে হয়, তাতে ঐ সময়ে থাকে না। এই কারণে সূর্য ও রাহুর অবস্থানকে 'মধ্যম' সময়ানুযায়ী গণনা করা হয়।

এই সময়ানুযায়ী, সূর্য-চন্দ্রের বিষুব-লম্বও গণনা করা হয়। দুই বিষুব-লম্ব যদি সমান হয়, তাহলে ঐটিই হবে আমাদের অভীষ্ট সময়। আর তা না হলে, চন্দ্রের বিষুব-লম্ব লক্ষ্য করা হয়। তবে গণনা করতে গিয়ে চন্দ্রের প্রস্থ রেখাকে তার অবস্থানের বিষুব-লম্বের ডিগ্রির সাথে যদি যোগ করা হয়ে থাকে, তাহলে সে প্রস্থ রেখাকে সূর্যের বিষুব-লম্ব থেকে বাদ দিতে হবে। আর যদি যোগ না করে প্রস্থ রেখাকে তার বিষুব-লবের ডিগ্রি থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সে প্রস্থ রেখাকে সূর্যের বিষুব লম্বে যোগ দিতে হবে। লব্ধ ফলকে বিষুব-লম্বের **Karadajat**-এর সারণি অনুযায়ী চাপে (arc) (ميل) পরিণত করে সে অংশগুলির মাপ মনে করে রাখতে হবে।
৫১১ 'করণ তিলকে' এই সারণিটি ব্যবহৃত হয়েছে।

তারপর 'মধ্যম' সময়ের চন্দ্রকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি সে ক্রান্তি বৃত্তের বাসন্ত হৈমন্ত কোণের মত কোনও অযুগ্ম কোণে থাকে এবং তার বিষুবলম্ব সূর্যের বিষুবলম্ব অপেক্ষা কম হয়, তাহলে এই দুই বিষুবলম্ব সমান হবার সময়টি—যা আমাদের অন্বিষ্ট '—মধ্যম' সময়ের পর, অর্থাৎ ভবিষ্যতে পড়বে। কিন্তু সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের বিষুবলম্ব যদি বেশী হয়, তাহলে সে সময় 'মধ্যম' সময়ের পূর্বে, অর্থাৎ অতীতে পড়বে। আর চন্দ্র যদি ক্রান্তি বৃত্তের যুগ্ম কোণে—অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের কোণে থাকে, তাহলে সদ্য বর্ণিত অবস্থার বিপরীত হবে।

সূর্য চন্দ্র অয়নান্তের বিভিন্ন দিকে থাকলে পলিশ তাদের বিষুব লম্বকে 'ব্যতিপাতে' যোগ করেন, আর একই দিকে থাকলে, 'বৈধৃতে' যোগ করেন। তাছাড়া তারা অয়নান্তের একই দিকে থাকলে, তাদের বিষুব লম্বদ্বয়ের বিয়োগ ফলকে 'ব্যতিপাতে' গণনা করেন, আর বিপরীত দিকে থাকলে, 'বৈধৃতে' গণনা করেন। এটা হোল সর্বপ্রথম স্মর্তব্য সংখ্যা, অর্থাৎ মধ্যম সময়। তারপর তিনি 'মাসাকে' দিবসের এক-চতুর্থাংশের কম ধরে নিয়ে দিবসের মিনিটগুলিকে 'মাসা'তে পরিণত করেন। অতঃপর, সূর্য-চন্দ্র ও রাহুর 'ভুক্তি'র সাহায্যে তিনি তাদের গতি নির্ণয় করেন; এবং তাদের অবস্থানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থানের 'মধ্যম' সময়ানুযায়ী নির্ধারণ করেন। এইটি দ্বিতীয় সংখ্যা, যা স্মরণে রাখতে হবে।

ঐই প্রক্রিয়ায় তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা নির্ণয় করেন এবং তাকে 'মধ্যম' সময়ের সাথে তুলনা করেন। সূর্য ও চন্দ্রের বিষুব লম্বদ্বয়ের পরস্পরের সমান হওয়ায় সময়টি যদি অতীত অথবা ভবিষ্যতে পড়ে, তাহলে স্মরণে রক্ষিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার প্রভেদটি হবে 'ভাজক', কিন্তু একটির (সূর্য অথবা চন্দ্র) ক্ষেত্রে অতীতে আর অপরটির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পড়লে, সংখ্যাদ্বয়ের সমষ্টি হবে ভাজক। তারপর লব্ধ দিবসের মিনিটগুলিকে তিনি হাতে রাখা প্রথম সংখ্যা দিয়ে পূরণ করেন এবং পূরণ ফলকে 'ভাজক' সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেন। ভাগফল হবে 'মধ্যম' সময় থেকে দূরত্বের মিনিট। এই মিনিটগুলি অবশ্য অতীত বা ভবিষ্যতে, যে-কোনও কালের হতে পারে। এইভাবে বিষুবলম্বদ্বয়ের পরস্পরের সমান হবার সময়টি জানা যাবে।

'করণ তিলকের' লেখক কিন্তু বিষুবলম্বের যে 'চাপ' (arc) হাতে রাখা হয়েছিল, তাতে ফিরে গিয়ে গণনা করছেন। চন্দ্রের স্ফুট অবস্থান যদি তিন রাশির কম হয়, তাহলে সেইটিই আমাদের অভিষ্ট; তিন আর ছয় রাশির
৫১২ মধ্যে হলে, তাকে ছয় রাশি থেকে বিয়োগ করে নিতে হবে; ছয় থেকে নয় রাশির মধ্যে হলে, তার সঙ্গে আরও ছয় রাশি যোগ করে নিতে হবে। আর যদি নয় রাশির বেশী হয়, তাহলে ১২ রাশি থেকে তাকে বিয়োগ করে নিতে হবে, তার ফলে চন্দ্রের দ্বিতীয় স্থান পাওয়া যাবে। তাকে চন্দ্রের স্ফুট অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে; দ্বিতীয় স্থানটি যদি প্রথমটির কম হয় তাহলে বোঝা যাবে যে বিষুব-লম্বদ্বয়ের পরস্পরের সমান হওয়ার সময় ভবিষ্যতে আসবে। আর বেশী হলে বোঝা যাবে যে, সে সময় অতীত হয়ে গেছে।

চন্দ্রের এই দুই স্থানের প্রভেদকে তিনি আবার সূর্যের ভুক্তি দিয়ে গুণ করে, লব্ধ ফলকে চন্দ্রের ভুক্তি দিয়ে ভাগ করেন। চন্দ্রের দ্বিতীয় স্থান যদি প্রথম স্থানের চেয়ে বড় হয় তাহলে স্ফুট গণনায় সময়ে সূর্যের অবস্থানের সাথে ঐ ভাগফল যোগ করেন। আর কম হলে, ভাগফলকে সূর্যের অবস্থান থেকে তাকে বিয়োগ করেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বিষুব-লম্বদ্বয়ের পরস্পরের সমান হওয়ার সময়ে সূর্যের অবস্থান নির্ণীত হয়। তার জন্য চন্দ্রের দুই স্থানের পার্থক্যকে চন্দ্রের 'ভুক্তি' দিয়ে ভাগ দেন। ভাগফল থেকে দূরত্বের পরিমাপক হিসাবে দিবসের মিনিট সংখ্যা পাওয়া যাবে। এই মিনিট সংখ্যা দিয়ে তিনি সূর্য-চন্দ্র ও রাহুর এবং বিষুব-লম্বদ্বয়ের স্থান নির্ধারণ করেন। শেষোক্ত বিষুব-লম্বদ্বয় যদি পরস্পরের সমান হয়, তাহলে আমাদের অভিষ্ট

পাওয়া গেল। তা না হলে, সমান হওয়া পর্যন্ত এবং ঠিক সময়টি পাওয়া-যাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে।

তৎপর, পুলিশ সূর্য-চন্দ্রের আয়তন হিসাব করে তার সমষ্টির অর্ধেক বাদ দিয়ে কেবল অর্ধেক দিয়ে গণনা করতে থাকেন। এই অর্ধেককে ৬০ দিয়ে পূরণ করে পূরণ ফলকে 'ভুক্তান্তর' দিয়ে ভাগ করেন। ভাগফল হবে নিম্নপাতের মিনিট সংখ্যা।

যে স্ফুট সময় পাওয়া গেল তাকে তিন স্থানে লিখতে হবে। প্রথম স্থানের সংখ্যা থেকে 'পাতের' (سقّوط) মিনিটগুলি বাদ দিয়ে তৃতীয় স্থানে লিখিত সংখ্যার সাথে যোগ করতে হবে। তাহলে, 'ব্যতিপাত' বা 'বৈধৃত', যা-ই অশিষ্ট হোক না কেন, প্রথম স্থানের সংখ্যাটি হবে তার আরম্ভের, দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যা হবে তার কেন্দ্রস্থ হওয়ার, আর তৃতীয় স্থানের সংখ্যা হবে তার অবসানের সময়।

যে সব যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে এই সকল গণনা-বিধি রচিত হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ আমি 'খয়াল-অল্ কুসূফয়েন' (গ্রহণদ্বয়ের আকৃতি বর্ণনা) নামক আমার এক স্বতন্ত্র পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছি। তাছাড়া 'স্যাভবল' (? سیو ول ?) নামক একজন কাশ্মীরীর জন্য যে 'পঞ্জিকাটি আরবী খণ্ডখাদ্যক' নাম দিয়ে রচনা করেছি, তাতেও যুক্তিগুলির বিশদ বর্ণনা আমি দিয়েছি।

৫১৩ 'ভট্টিল' এই যোগদ্বয়ের (ব্যতিপাত–বৈধৃত) সমস্ত দিবসকেই অশুভ মনে করেন, কিন্তু বরাহমিহির কেবল দিবসের সেই ভাগকেই অশুভ মনে করেন যা গণনায় ধার্য হয়। দিনের এই অশুভ অংশকে বরাহ মিহির বিষাক্ত শরবিদ্ধ হরিণের সাথে উপমিত করেন; ক্ষতস্থানের বাইরে তার ক্রিয়া ছড়ায় না, বিষাক্ত স্থানটি কেটে ফেললে দোষ নাশ হয়।

পরাশর-এর উক্তি হিসাবে পুলিশ যা বলেছেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, চন্দ্রক্ষেত্রে হিন্দুরা অনেকগুলি 'ব্যতিপাত' গণনা করে থাকে, কিন্তু তার সব-গুলি উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা যায়। তাতে প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্য বৃদ্ধি হয় কেবল তার নমুনার সংখ্যা বাড়ে।

'ভট্টিল' ব্রাহ্মণ তাঁর পঞ্জিকায় বলেছেন : 'এখানে আটটি সময় দেওয়া যাচ্ছে, যাদের একটি পরিমাপক আছে। সূর্য-চন্দ্রের স্ফুট অবস্থাদ্বয়ের যুক্ত সংখ্যা যদি সমান হয়, তাহলে সময়গুলি অশুভ হবে।

'প্রথম : "বক্-সূত" (বিষ্কুন্ভ); তার মাপকাঠি ৪ রাশি। দ্বিতীয় : "গণ্ডান্ত" (? অতিগণ্ড ? كندانند) পরিমাপক—৪ রাশি, ১৬⅔ ডিগ্রি। তৃতীয় : "লাড" (? لاث) এটি আসলে 'ব্যতিপাত'। পরিমাপক, ৬ রাশি।

চতুর্থ : "চান্দ্র (? جاس—হর্ষণ ?)। পরিমাপক ৬ রাশি ও ৬⅔ ডিগ্রী।

পঞ্চম : "বরহ" (? বরীয়ান ?) : একে 'বরহ' ব্যতিপাতও বলা হয়। পরিমাপক ৭ রাশি, ১৬⅔ ডিগ্রী।

ষষ্ঠ : "কালদণ্ড" (;كالدند ?) পরিমাশক, ৮ রাশি, ১৫⅔ ডিগ্রী।

সপ্তম : ("ব্যাঘাত") (بيا كشات) পরিমাপক ৯ রাশি ২৫⅔ ডিগ্রী।

অষ্টম : "বৈধৃত," পরিমাপক ১২ রাশি।'

এই যোগগুলি সুবিদিত, কিন্তু তৃতীয় ও অষ্টম যোগ দু'টিকে যেমন একই নিয়মে নির্ধারণ করা যায়, অন্যগুলিকে তেমন করা যায় না। সেজন্য সময়ের 'পাতের' মিনিটে নির্ধারিত তাদের বিশেষ দৈর্ঘ্য নাই, কেবল আনুমানিক দৈর্ঘ্য আছে। যেমন, বরাহ মিহিরের উক্ত মতে, 'ব্যাঘাত' ও 'বকসূতের' (বিষ্কুন্ভ) দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক মুহূর্ত, 'গণ্ডান্ত' ও 'বরহের' (বরীয়ান) দুই মুহূর্ত।

বিষয়টি নিয়ে হিন্দুরা আরও বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখে আলোচনা করেছে, যা আমার মতে নিরর্থক। আমার উপরোল্লিখিত পুস্তিকায় আমি তার বিবরণ দিয়েছি।

৫১৪ 'করণতিলকে' ২৭টি যোগের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি এই নিয়মে নির্ধারণ করতে হয় :

'স্ফুট সূর্যের স্থানকে চন্দ্রের স্ফুট অবস্থানের সাথে যোগ দিতে হবে। সমষ্টিকে মিনিটে পরিণত করে ৮০০ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। ভাগফল হবে সম্পূর্ণ 'যোগের' মোট সংখ্যা। ভাগশেষকে ৬০ দিয়ে গুণ করে সূর্য-চন্দ্রের ভুক্তিদ্বয়ের যোগ সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে। তাহলে ভাগফল হবে দিবসগুলির মোট মিনিট এবং ভগ্নাংশ হবে অসম্পূর্ণ 'যোগের' অতীত ভাগের পরিমাণ।

শ্রীপাল-এর নিকট থেকে 'যোগের' নাম ও গুণাগুণ আমি নকল করে নিয়েছিলাম। এই নির্ঘণ্টে তা সাজিয়ে দেখান হোল।

নির্ঘণ্ট

২৭ 'যোগের' নির্ঘণ্ট						
ক্রমিক সংখ্যা	নাম	শুভাশুভ				
১	বিষ্কুম্ভ بجکر	শুভ	১৭	کنناث (?) গ-ন-না-ত (?) (ব্যতিপাত ?)	অশুভ	
১	প্রীতি	শুভ	১৮	বরীয়ান	অশুভ	
৩	আয়ুষ্মান را ثکم	অশুভ				
৪	সৌভাগ্য	শুভ	১৯	পরিঘ	অশুভ	
৫	শোভন	শুভ				
৬	অতিগণ্ড	অশুভ	২০	শিব	শুভ	
৭	সুকর্মা	শুভ	২১	সিদ্ধ	শুভ	
৮	ধৃতি درث	শুভ	২২	সাধ্য	মধ্যম	
৯	শূল	শুভ				
১০	গণ্ড کند	অশুভ	২৩	শুভ	শুভ	
১১	বৃদ্ধি (¡) برد	শুভ	২৪	শুক্র	শুভ	
১২	ধ্রুব دروٗ	শুভ	২৫	ব্রহ্মা	শুভ	
১৩	ব্যাঘাত بیاگھراث	অশুভ	২৬	ইন্দ্র	শুভ	
১৪	হর্ষণ	শুভ	২৭	বৈধৃতি	অশুভ	
১৫	বজ্র	অশুভ				
১৬	সিদ্ধি (?) অসৃক (?)	শুভ				

আশি অধ্যায়

ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষের মৌল সিদ্ধান্ত ও বিচার-বিধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৫১৫ এদেশের মুসলমানেরা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের সাথে মোটেই পরিচিত নয়। জ্যোতিষ বিষয়ক কোনও ভারতীয় পুস্তক পাঠের সুযোগও তারা পায়নি। তারা মনে করে, ভারতীয় জ্যোতিষ তাদের শাস্ত্রের-ই মত এবং নানারকমের তথ্যকে তারা ভারতীয় বা হিন্দু বলে বর্ণনা করে। অথচ সে সবের লেশমাত্র আমি হিন্দুদের মধ্যে পাইনি। এই পুস্তকের পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আমি যেমন সব বিষয়েরই কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছি, এই অধ্যায়ে তেমনই ভারতীয় জ্যোতিষের মূলসূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব, যাতে হিন্দুদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করা পাঠকের পক্ষে সহজ ও সুগম হয়। সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে, খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে কেবল মূল কথাগুলি বলতেই এ অধ্যায় অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়বে।

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, হিন্দুরা পক্ষীবিশেষের আকৃতি বা মুখের ভাবভঙ্গি, এই রকম সব বাহ্য লক্ষণ থেকে শুভাশুভ নির্ণয় করে; মানব জগতের ব্যাপারে ঊর্ধ্বাকাশের ঘটনাবলীর ইঙ্গিতসূচক নক্ষত্রাদির সেকেণ্ড (?)-সমূহ থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত, তা তারা করে না।

গ্রহের সংখ্যা যে সাত, তাতে আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যে মতানৈক্য নাই। এগুলিকে ওরা 'গ্রহ' বলে। তার কতকগুলি সর্বদাই শুভ। শুভগ্রহের সংখ্যা তিন; বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র। এগুলিকে 'সৌম্য' গ্রহ বলা হয়। আর তিনটি গ্রহ আছে যা সর্বদাই অশুভ; তাদিগকে 'ক্রূর' গ্রহ বলা হয়। সেগুলি হচেছ শনি, মঙ্গল ও সূর্য। রাহু-ও 'ক্রূর' গ্রহের মধ্যে পরিগণিত হয়, যদিও এটি প্রকৃতপক্ষে তারকা নয়। আর একটি গ্রহ আছে যার গতি পরিবর্তনশীল, যে নক্ষত্রের সাথে যুক্ত হয় তার শুভ বা অশুভ প্রকৃতির উপর এরও প্রকৃতি নির্ভর করে। গ্রহটি হচ্ছে 'বুধ'। তবে নিজস্বভাবে এটি শুভ গ্রহ।

গ্রহাদির গুণাগুণ ও প্রকৃতি আমি পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণিতে সন্নিবেশিত করেছি।

গ্রহের নাম	সূর্য	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
ধাতু দ্রব্যাদি	ব্রোঞ্জ	স্ফটিক	স্বর্ণ	ক্ষুদ্র মুক্তা	রৌপ্য, গ্রহ শক্তিশালী হলে স্বর্ণ	মুক্তা	লৌহ
পরিচ্ছদ	স্থূল	নূতন	দগ্ধ	সিক্ত	নূতন ও জীর্ণের মাঝামাঝি	সম্পূর্ণ	দগ্ধ
দেবতা	নেম	অম্বু = জল	অগ্নি	ব্রহ্ম	মহাদেব	ইন্দ্র	—
বর্ণ (জাত্যাধিপতি)	ক্ষত্রিয় ও রাজপুরুষ	বৈশ্য ও রাজপুত্র	ক্ষত্রিয় ও সেনাধ্যক্ষ	শূদ্র ও রাজপুত্র	ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রী	ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রী	—
গ্রহের বেদাধিপতি	০	০	সাম	অর্থব	ঋক্	যযুর	০
গর্ভমাস	৪র্থ, যখন অস্থি সকল দৃঢ় হয়	পঞ্চম, যখন ত্বকের আবির্ভাব হয়	দ্বিতীয় যখন ভ্রূণ গাঢ় হয়	৭ম, যখন শিশুর দেহ সম্পূর্ণ হয় ও স্মৃতি সম্পন্ন হয়	তৃতীয়, যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উদগম হয়	প্রথম যখন শুক্র স্ত্রী রজ মিশ্রিত হয়	ষষ্ঠ যখন কেশোদ্গম হয়
সত্য-রজঃ তম-গুণ	সত্য	সত্য	তমঃ	রজঃ	সত্য	রজঃ	তমঃ
মিত্র গ্রহ	বৃহস্পতি মঙ্গল ও চন্দ্র	সূর্য ও চন্দ্র	বৃহস্পতি সূর্য ও চন্দ্র	সূর্য ও শুক্র	সূর্য, চন্দ্র ও মঙ্গল	শনি ও বুধ	শুক্র ও বুধ
শত্রু গ্রহ	শনি ও শুক্র	শত্রুগ্রহ নাই	বুধ	চন্দ্র	শুক্র ও বুধ	সূর্য ও চন্দ্র	মঙ্গল সূর্য চন্দ্র
বিমিশ্র গ্রহ	বুধ	শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শুক্র	শনি ও শুক্র	শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল	শনি	বৃহস্পতি ও মঙ্গল	শনি
শরীরের যে অঙ্গ তার অধীন	নিঃশ্বাস ও অস্থি	জিহ্বামূল ও রক্ত	মাংস ও মস্তিষ্ক	কণ্ঠ ও ত্বক	বুদ্ধি ও মেদ	বীর্য	নাড়ি, মাংস ও বেদনা
আয়তনক্রম	১	২	৬	৫	৪	২৫ (?)	৭
যড়ায় বর্ষ	১৯	২৫	১৫	১২	১৫	২১	২০
নৈসর্গিক বর্ষ	২০	১	২	৯	১৮	২০	৫০

সারণি—১

৫১৮—৫১৯

গ্রহের নাম	সূর্য	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
শুভাশুভ	অশুভ	শুভ, কিন্তু নিকটস্থ গ্রহের উপর নির্ভরশীল। মাসের প্রথম দশদিন মধ্যম, দ্বিতীয় দশদিন শুভ, তৃতীয় দশদিন অশুভ।	অশুভ	একাকী অবস্থায় শুভ নচেৎ নিকটস্থ থেকে গ্রহানুযায়ী	শুভ	শুভ	শুভ
ভূত	০	০	তেজ	ক্ষিতি	ব্যোম	অপ্	মরুৎ
স্ত্রী পুংসাদি সংজ্ঞা	পুং	স্ত্রী	পুং	নপুংশক	পুং	স্ত্রী	নপুংশক
রাত্রি অথবা দিবা	দিবা	রাত্রি	রাত্রি	রাত্রি ও দিবা	দিবা	দিবা	রাত্রি
দিক	পূর্ব	উত্তর পশ্চিম	দক্ষিণ	উত্তর	উত্তর-পূর্ব	পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী	পশ্চিম
রঙ	শিশকবর্ণ	শ্বেত	ফিকে লাল	সবুজ	স্বর্ণাভ	বহুবর্ণ	কৃষ্ণ
কাল	অয়ন	মুহূর্ত	দিবস	এক ঋতু	মাস	পক্ষ	বৎসর
ঋতু	০	বর্ষা	গ্রীষ্ম	শরৎ	হেমন্ত	বসন্ত	শিশির
স্বাদ	তিক্ত	লবণাক্ত	—	সর্বপ্রকারের স্বাদ	মিষ্ট	—	—

৫২৩ গ্রহের আয়তন ও শক্তির ক্রম দেখিয়ে সারণিতে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য এই যে, কখনও কখনও দুইটি গ্রহের একই লক্ষণ, একই প্রভাব ও ঘটনা বিশেষের সঙ্গে একই প্রকারের সম্পর্ক থাকে। সে অবস্থায় গ্রহদ্বয়ের মধ্যে বৃহত্তর বা প্রবলতর বলে যেটিকে বৃহত্তর সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, গণনায় তাকেই বেশী মূল্য দিতে হবে।

গর্ভের মাস সংক্রান্ত ঘরটির পরিশিষ্ট হিসাবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হিন্দুরা অষ্টম মাসকে গর্ভপাতকারী বুধগ্রহের প্রভাবাধীন বলে মনে করে। ওদের মতে, ভ্রূণ এই মাসে খাদ্যের সূক্ষ্ম সারাংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। এইভাবে সমস্ত মাস খাদ্য গ্রহণ করার পর ভূমিষ্ঠ হলে জাতক জীবিত থাকবে; তার পূর্বে হলে, দেহক্ষয়ের দরুন তার মৃত্যু হবে। নবম মাস হচ্ছে চন্দ্রের, আর দশম মাস সূর্যের প্রভাবাধীন। ওদের মতে, গর্ভকাল দশ মাসের বেশী দীর্ঘ হয় না। তা হলে ওরা মনে করে গর্ভিণীর কোনও বায়ুদোষ হয়েছে। গণনা না করে, কেবল শ্রুত বাক্যে নির্ভর করে ওরা গর্ভস্রাবের সময়ে গ্রহনির্ণয় ও গুণাগুণ বিচার করে এবং সেই মাসাধিপতির গ্রহণানুযায়ী অশৌচ ব্যবস্থার বিধান দেয়। ওদের জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশ্যাধিপতির প্রভাবের মত গ্রহাদির পারস্পরিক মৈত্রী ও শত্রুতার প্রশ্নটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কখনও এমন হয় যে, কোনও বিশেষ সময়ে রাশ্যাধিপতি তার নিজস্ব গুণ হারিয়ে ফেলে। রাশ্যাধিপতি ও তার বর্ষ গণনার নিয়ম বর্ণনা আমরা অনতিবিলম্বে করব।

রাশিচিহ্নের সংখ্যা নিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে আমাদে কোনও মতভেদ নাই। রাশিচিহ্নের মোটসংখ্যা ১২। তেমনই, গ্রহসমূহের মধ্যে রাশির বিন্যাস নিয়েও আমাদের আর ওদের মধ্যে প্রভেদ নাই। প্রত্যেক সম্পূর্ণরাশির নিজস্ব গুণ নীচের সারণিতে শ্রেণীবদ্ধ করে দেখান গেল।

রাশি	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
অধিপতি সকল	মঙ্গল	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	সূর্য	বুধ	শুক্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	শনি	বৃহস্পতি
তাদের { ডিগ্রী	১০	৩	০	০	০	১৫	২০	০	০	২৮	০	২৭
তাদের { উচ্চতা	সূর্য	চন্দ্র	০	বৃহস্পতি	০	বুধ	শনি	০	০	মঙ্গল	০	শুক্র
মূল ত্রিকোণাধিপতি	মঙ্গল	চন্দ্র	০	০	সূর্য	বুধ	শুক্র	০	বৃহস্পতি	০	শনি	০
স্ত্রীপুংসাদি সংজ্ঞা	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
শুভাশুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ
বর্ণ	লালিম	শ্বেত	হরিৎ	পীতাভ	ধূসর	বিচিত্র বর্ণ	কৃষ্ণ	স্বর্ণাভ	—	শ্বেত কৃষ্ণ রেখাময়	উজ্জ্বল লাল	মৃত্তিকা বর্ণ
দিকসমূহ	স্থিরপূর্ব	পূর্ব দক্ষিণ	দক্ষিণ পশ্চিম	পশ্চিম উত্তর	উত্তর পূর্ব	স্থির দক্ষিণ	স্থির পশ্চিম	স্থির উত্তর	দক্ষিণ পূর্ব	পশ্চিম দক্ষিণ	উত্তর পশ্চিম	পূর্ব উত্তর
উদয়ের প্রণালী	ভূমীশয়ান অবস্থায়	ঐ	একপার্শ্বে শয়ান	ভূমী-শয়ান	দণ্ডায়মান	ঐ	ঐ	ঐ	ভূমী-শয়ান	ঐ	দণ্ডায়-মান	ঐ
চর স্থির'না দ্ব্যাত্মক	চর	স্থির	একই সাথে চর ও স্থির	চর	স্থির	একই সাথে চর ও স্থির	চর	স্থির	একই সাথে চর ও স্থির	চর	স্থির	একই সাথে চর ও স্থির
মতবিশেষানুযায়ী নৈশ বা দৈন	নৈশ	নৈশ	নৈশ	নৈশ	দৈন	দৈন	দৈন	দৈন	নৈশ	নৈশ	দৈন	দৈন
শরীরের কোন অঙ্গ ইঙ্গিত করে	মস্তক	মুখ	স্কন্ধ ও হস্ত	বক্ষ	উদর	নিতম্ব	নাভিমূল	পুং ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়	জঙ্ঘা	হাঁটুর	হাঁটুর নিম্ন ভাগ	পদদ্বয়
ঋতু	বসন্ত	গ্রীষ্ম	গ্রীষ্ম	বর্ষা	বর্ষা	শরৎ	শরৎ	হেমন্ত	হেমন্ত	শিশির	শিশির	বসন্ত

রাশি	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
আকৃতি	মেষ	বৃষ	বীণা ও মুদ্গার হস্তে একটি মানুষ	কর্কট	সিংহ	যবশীষ হস্তে একটি কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	মানুষের মত মস্তক ও ঊর্ধ্বভাগ সম্বলিত অশ্ব	অজমুখ বিশিষ্ট একটি জীব তার আকৃতিতে প্রচুর জল	নৌকা	দুইটি মৎস্য
তাদের প্রকৃতি	চতুষ্পদ	চতুষ্পদ	দ্বিপদ মানুষ	উভচর	চতুষ্পদ	দ্বিপদ	দ্বিপদ	উভচর	ঊর্ধ্বভাগ দ্বিপদ ও নিম্নভাগ চতুষ্পদ	প্রথম ভাগ দ্বিপদ ও দ্বিতীয় ভাগ জলীয়	একভাগ দ্বিপদ দ্বিতীয় ভাগ জলীয় মতন্তরে-মানব	জলীয়
প্রকারভেদে তাদের পূর্ণ-দৃষ্টির সময়	রাত্রিতে	রাত্রিতে	দিবা-কালে	সন্ধ্যায়	রাত্রিতে	দিবা-ভাগে	দিবা-ভাগে	সন্ধ্যায়	মনুষ্য ভাগের দিবায় অন্য ভাগের রাত্রিতে	সন্ধ্যায়	মনুষ্য ভাগ দিনে, অন্যভাগ রাত্রিতে	সন্ধ্যায়

৫২৪ গ্রহের উচ্চতা বা উন্নতিকে ওদের ভাষায় 'উচ্চস্থা' আর গ্রহবিশেষের সর্বোচ্চ ডিগ্রীকে 'পরমোচ্চস্থা' বলে। তেমনই, অধস্তা বা নিম্নতাকে 'নীচস্থা' আর গ্রহবিশেষের সর্বনিম্ন ডিগ্রীকে 'পরম নিচস্থা' বলা হয়। 'মূলত্রিকোণ' হচ্ছে গ্রহের বিশেষ বল, যা তার কক্ষদ্বয়ের একটিতে অন্য শুভ গ্রহের সংযোগে অবস্থান কালে তার প্রতি আরোপ করা হয়। আমাদের মধ্যে প্রচলিত রীতি মত, ত্রিকোণগুলিকে, (অর্থাৎ একটি রাশিকে কেন্দ্রে রেখে রাশিচক্রের এক-চতুর্থাংশ) ওরা পঞ্চভূত ও প্রাকৃতিক গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত করে না; ওরা সেগুলিকে সাধারণ দিক চতুষ্টয় দিয়ে চিহ্নিত করে, যেমন সারণিতে বিশদভাবে দেখান হয়েছে।

আবর্তমান রাশিকে ওরা 'চররাশি', অর্থাৎ সচলরাশি, আর অচলরাশিকে 'স্থিররাশি', আর দুই (দ্ব্যাত্মক) প্রকার গুণ বিশিষ্ট রাশিকে 'দিস্বভাব' অর্থাৎ উভয় গুণ একত্রিত রাশি বলে।

রাশির যেমন বিবরণ আমরা উপরের সারণিতে দিয়েছি, নিম্নের সারণিতে তেমনই গৃহ বা ক্ষেত্রাদির (بيوت) গুণাগুণ সন্নিবেশ করে দেখাচ্ছি। এইসব ক্ষেত্রের যে অর্ধেক সংখ্যা ধরণীর ঊর্ধ্বে আছে সেগুলিকে ওরা 'ছত্র', অর্থাৎ ছায়া প্রদানকারী আখ্যা দেয়, আর যে অর্ধেক সংখ্যা ধরণীর নিম্নে আছে তাকে বলে নৌ, অর্থাৎ নৌকা। উপরন্তু, যে গৃহের অর্ধেকভাগ মধ্যাকাশের দিকে উত্থিত, আর অর্ধভাগ পৃথিবীর কীলকে অবনমিত, তাকে ওরা বলে 'ধনু'। এই কীলকগুলিকে ওরা বলে 'কেন্দ্র' এবং তার পার্শ্ববর্তী বিন্দুকে 'পনফর' এবং অধোগামী বিন্দুকে 'অপোক্লিম' (اپوکلم) বলে।

সারণি—৩

গৃহ বা ক্ষেত্র	কোন ভাব থেকে কি বিচার্য	উদয় (বা লগ্ন) রাশিকে মূল ধরে তার 'দৃষ্টি' যোগ	যে প্রকার রাশি চিহ্ন সর্বাধিক বলবান	সর্বাধিক বলবানগ্রহ	অশুভ বর্ণের বিয়োগ পরিমাণ	শুভ বর্ণের বিয়োগ পরিমাণ	দিগন্তের ভাগ	মধ্যাহ্নিক ছায়ানুযায়ী তাদের শ্রেণী ভাগ
উদয় রাশি	মস্তক ও আত্মা	গণনার মূল	দ্বিপদ চিহ্ন সকল	বুধ ও বৃহস্পতি	০	০	নৌ	ঊর্ধ্বে উত্থিত ধনু
২য়	মুখমণ্ডল ও ধন	লগ্নরাশির দৃষ্টি নাই	০	০	০	০	নৌ	

সারণি—৩

৩য়	বাহুদ্বয় ও সহোদর	তার উপরে লগ্ন-রাশির দৃষ্টি আছে, কিন্তু তার দৃষ্টি লগ্ন রাশির উপরে নাই	জলীয় চিহ্নসকল	শুক্র ও চন্দ্র	০	০	নৌ	ঊর্ধ্ব ধনু
৪র্থ	হৃদয়, বন্ধু পিতামাতা ও সুখ	লগ্নরাশির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে	০	০	০	০	নৌ	অবনমিত ধনু
৫ম	উদর, সন্তান ও বুদ্ধি	লগ্নরাশির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে	০	০	০	০	নৌ	
৬ষ্ঠ	দুই পার্শ্ব শত্রু ও আরোহণ যোগ পশ্বাদি	লগ্নরাশির উপরে তার দৃষ্টি, কিন্তু লগ্নরাশির দৃষ্টি তার উপরে নাই	০	০	০	০	নৌ	অবনমি৩ ধনু
৭ম	নাভি মূল ও স্ত্রী	লগ্নরাশির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে	উভচর চিহ্নসকল	শনি	১/৬	১ ১/২	ছত্র	অবনমিত ধনু
৮ম	গমনাগমন ও মৃত্যু	লগ্নরাশির দৃষ্টি তার উপরে, কিন্তু তার দৃষ্টি লগ্নরাশির উপরে নাই	০	০	১/২	১ ১/৩		
৯ম	উরুদ্বয়, পর্যটন ও ঋণ	লগ্নরাশির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে	০	০	১/৪	১/৮		
১০ম	জানুদ্বয় ও কর্ম	লগ্নরাশির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে	চতুষ্পদ চিহ্নসকল	মঙ্গল	১/৩	১/৬	ত্র	উত্থিত ধনু
১১শ	জানুর নিম্ন-ভাগ ও আয়	লগ্নরাশিতে তার দৃষ্টি, কিন্তু লগ্ন-রাশির দৃষ্টি তৎপ্রতি নাই	০	০	১/২	১/৪	ছ	
১২শ	পদদ্বয় ও ব্যয়	লগ্নরাশির সমদৃষ্টি নাই	০	৩	সম্পূর্ণ	১/২		

৫২৭ এই গ্রহ, রাশিচক্র ও ক্ষেত্র হচেছ মূল তত্ত্ব যা ভারতীয় জ্যোতিষ-বিচারের দিগবিন্দু, বিশেষ। যে এ-গুলির গুণাগুণ নির্ণয়ে ও ফলাফল বিচারে সমর্থ, সে-ই 'গণক' ও জ্যোতিষী আখ্যা পায়।

তারপরে আসে রাশির অংশ বিভাগ। প্রথম বিভক্তি হচ্ছে 'নিম্বহর'সমূহের, যাকে 'হোরা' বলা হয়, অর্থাৎ 'ঘড়ি', কেননা রাশির অর্ধভাগ ক্ষিতিজের উপর উদয় হতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল সময় লাগে। প্রত্যেক পুরুষরাশির প্রথমার্ধ সূর্যদৃষ্ট বলে কুলক্ষণযুক্ত, কেননা সূর্য পুরুষ স্বভাব সৃষ্টি করে; আর দ্বিতীয়ার্ধ চন্দ্রদৃষ্ট বলে সুলক্ষণযুক্ত, কেননা চন্দ্র স্ত্রী প্রকৃতির সৃষ্টি করে। স্ত্রী রাশির বেলাতে এই নিয়মে দুই অর্ধভাগের বিপরীত ফল হয়।

তারপরে আসে 'ত্রিকোণ'গুলি, যাকে 'দ্রেককান' বলা হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন দেখি না, কারণ আমরা যাকে 'দ্রিস্থানাত' (دو يخانات) নাম দিয়ে থাকি, এগুলি আসলে তাই-ই।

তারপর 'নুহ্‌বহর' (نهبهر) যার নাম 'নবাংশক' (নবমাংশক)। আমাদের সমাজে প্রচলিত জ্যোতিষের প্রাথমিক পুস্তকগুলি দুই প্রকার 'নুহ্‌বহরের' উল্লেখ করে থাকে, সেজন্য এ বিষয়ে হিন্দুদের প্রকৃত নিয়ম কি, ভারততত্ত্বানু-রাগীদের জ্ঞাতার্থে এখানে তা লিপিবদ্ধ করছি।

'নবাংশক' সম্বন্ধে ওদের নিয়ম হচেছ: যে মিনিটের 'নুহ্‌বহর' জ্ঞাতব্য, তার থেকে রাশিচক্রের প্রারম্ভ পর্যন্ত যে ব্যবধান, তাকে মিনিটে পরিণত করে লব্ধ সংখ্যাকে ২০০ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফলের অংক হবে সেইসব 'নবাংশকের' মোটসংখ্যা যা আলোচ্য রাশির 'ত্রিকোণ' অন্তর্গত 'চররাশি' থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক রাশি ধরে পর পর গুণে যেতে থাকলে প্রত্যেক রাশিতে একটি করে পড়বে। সর্বশেষের নবাংশকটি যে রাশিতে পড়বে সেইটি হবে উদ্দীষ্ট 'নুহবহরে'র অধিপতি।

৫২৮ প্রত্যেক চররাশির প্রথম, প্রত্যেক স্থির রাশির পঞ্চম, আর 'দ্বিস্বভাব' রাশির নবম 'নুহ্‌বহর'কে 'বর্গোত্তম' অর্থাৎ বৃহত্তম ভাগ বলা হয়।

এর পর আছে দ্বাদশতম ভাগ, যার নাম 'দ্বাদশৈষ' (دو ادشايش)। রাশির কোনও বিশেষ স্থানের 'দ্বাদশৈষ' নির্ণয় করার নিয়ম এই: রাশির প্রারম্ভ (0° ডিগ্রী) থেকে উদ্দীষ্ট স্থানের দূরত্বকে মিনিটে পরিণত করে লব্ধ সংখ্যাকে ১৫০ দিয়ে ভাগ দাও। ভাগফল হবে সম্পূর্ণ দ্বাদশতম ভাগের মোট সংখ্যা। এই ভাগগুলিকে আলোচ্য রাশি থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রত্যেকটি রাশিতে একটি করে রেখে ক্রমান্বয়ে গুণে যাও; সর্বশেষের ভাগটি যে

রাশিতে পড়বে সেইরাশির অধিপতি হবে অভীষ্ট স্থানের দ্বাদশতম ভাগের অধিপতি।

তারপরে আছে 'ত্রিশংশ' নামক ডিগ্রী, অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রী, যা আমাদের 'সীমা'র সমার্থবাচক। তার বিন্যাসক্রম হচ্ছে : প্রতি পুরুষ রাশির প্রথম পাঁচটি ডিগ্রী মঙ্গলের, তৎপরবর্তী পাঁচটি শনির, তৎপরবর্তী আটটি ডিগ্রী বৃহস্পতির, তৎপরবর্তী সাতটি বুধের, আর শেষ পাঁচটি শুক্রের। স্ত্রীরাশির ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীত বিন্যাস, অর্থাৎ প্রথম পাঁচটি শুক্রের, পরবর্তী সাতটি ডিগ্রী বুধের, পরবর্তী আটটি বৃহস্পতির তার পরের পাঁচটি শনির, আর সবশেষের পাঁচটি মঙ্গলের।

প্রত্যেক 'জ্যোতিষীক' গণনা এইসব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাশির দৃষ্টি বা প্রকৃতি (حال—nature) সেই বিশেষ লগ্নে ক্ষিতিজের উপর উদিত উদয় বা লগ্নরাশির প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। এই দৃষ্টি (نظر) সম্বন্ধে ওদের নিয়ম হচ্ছে : রাশি তার পার্শ্ববর্তী রাশিদ্বয়ের উপর দৃষ্টিপাত করে না; বরঞ্চ একচতুর্থাংশ বা একতৃতীয়াংশ বা অর্ধেক রাশিচক্রের দুই প্রান্তে যে দুইটি রাশির সূচনা বিন্দু, এমন প্রত্যেক দুইটি রাশি পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে। তাদের পারস্পরিক ব্যবধান $\frac{১}{২}$ রাশিচক্র হলে, রাশিসমূহের প্রকৃত ক্রমানুযায়ী, এই দৃষ্টি গণনা করা হবে; কিন্তু দূরত্ব যদি বৃত্তের $\frac{৫}{১২}$ হয়, তাহলে রাশির বিপরীত ক্রমানুযায়ী দৃষ্টি গণনা করতে হবে।

'দৃষ্টির'ও নানা পর্যায় আছে। রাশির পরবর্তী চতুর্থ অথবা একাদশ রাশিতে 'পাদ' দৃষ্টি, পঞ্চম অথবা নবম রাশিতে দ্বিপাদ দৃষ্টি, ষষ্ঠ বা দশম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি আর সপ্তম রাশিতে পূর্ণ দৃষ্টি হয়। একই রাশিতে অবস্থিত দুই গ্রহের দৃষ্টিকে ওরা দৃষ্টি বলে না।

গ্রহাদির পারস্পরিক মৈত্র ও বৈরভাব পরিবর্তন (গ্রহশুদ্ধি) সম্বন্ধে হিন্দুদের নিয়ম এই :

কোনও গ্রহ তার উদয় (লগ্ন) রাশির (طالع = ascendens) দশম, একাদশ, দ্বাদশ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাশিতে অবস্থান করলে, সে গ্রহের প্রকৃতি শুভতর হয়; বৈরী গ্রহ হলে তার বৈরভাব কথঞ্চিৎ লাঘব হয়, 'সম'
৫২৯ হলে মিত্র হয়, মিত্র হলে অতি মিত্র হয়। আর অন্য রাশিগুলিতে অবস্থান করলে তার প্রকৃতি ক্রূরতর হয়; মিত্র থাকলে সম হয়, 'সম' থাকলে বৈরী হয়, বৈরী থাকলে মহদ্বৈরী হয়। এরূপ অবস্থায় গ্রহের যে প্রকৃতি হয় তা ঐ বিশেষ সময়াপেক্ষিক, তার নিজস্ব প্রকৃতির সঙ্গে গৌণভাবে অবস্থান করে।

এসব বর্ণনা করার পর আমরা গ্রহাদির চতুর্বলের কথা বলব।

গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ বল হচ্ছে তার দৈব বল, (ﻻﺪﯾﻜﮫ) যাকে 'স্থানবল' বলা হয়; নিজ উচ্চস্থায় নিজ 'গৃহে', মিত্র গৃহে, নিজ গৃহের 'নবংশকে', বা তার উচ্চস্থায় নিজস্ব 'মূলত্রিকোণে', অর্থাৎ শুভ গ্রহাদির সমান্তরাল রেখায় নিজ মহাযোগে অবস্থানকালে, গ্রহ 'স্থানবলী' হয়। স্থানবল শুভ রাশিতে থাকা-কালীন চন্দ্র-সূর্যের বৈশিষ্ট্য আর অশুভ রাশিতে থাকাকালীন অন্যান্য গ্রহের বৈশিষ্ট্য। চান্দ্রমাসের প্রথম তৃতীয়াংশে চন্দ্র বিশেষভাবে স্থানবলী, তখন তৎপ্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন অন্যান্য গ্রহকেও সে ঐ বললাভে সাহায্য করে এবং দ্বিপদ হলে, ঐ রাশির স্ফুটগ্রহও এই বল লাভ করে। দ্বিতীয় হচ্ছে 'দৃষ্টি' বল (دسا ﺑﻞ) কিম্বা 'দৃগ্‌বল', অর্থাৎ পাশ্বাভিমুখী বল। কেন্দ্রের দুই পার্শ্বস্থ যে কেন্দ্রে তার বল লাভ হয় সেই কেন্দ্রে অবস্থানকালে গ্রহের 'দৃষ্টিবল' হয়; মতান্তরে, দুই পার্শ্বস্থ গৃহদ্বয়ে অবস্থানকালেও তার এই বল লাভ হয়। দ্বিপদ রাশি হলে দিনমান, আর চতুষ্পদ রাশি হলে রাত্রিতে, আর অন্য প্রকার রাশি হলে উদয় (লগ্ন) রাশির প্রদোষ ও সন্ধ্যায় এই বল লাভ হয়। এই নিয়ম বিশেষ করে জাতক গণনায় প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অন্যান্য গণনায় হিন্দুদের ধারণা, উদয়রাশি চতুষ্পদ হলে দশম রাশিতে, বৃশ্চিক ও কর্কট হলে সপ্তম রাশিতে, কুম্ভ ও বৃশ্চিক হলে চতুর্থ রাশিতে, এই 'দৃষ্টিবল' সঞ্চার হয়।

তৃতীয় বল হচ্ছে বিজয়ীবল, যার নাম 'চেষ্টাবল'। গ্রহ পশ্চাদগামী হলে, প্রচ্ছন্ন থেকে আত্মপ্রকাশ করে দৃশ্যমান অবস্থায় চারি রাশির শেষ পর্যন্ত গমন করলে এবং উত্তরে শুক্র ব্যতীত অন্য কোনও গ্রহের সম্মুখীন হলে চেষ্টাবলের অধিকারী হয়; কেননা, শুক্রের পক্ষে দক্ষিণ যেমন, অন্যান্য গ্রহের
৫৩০ পক্ষে উত্তর তেমন। কর্কটক্রান্ত অভিমুখী সূর্যের অয়নের ঊর্ধ্বার্ধে দুই গ্রহের অবস্থানকালে গ্রহদ্বয়ে 'চেষ্টাবল' সঞ্চারিত হয়। সূর্য ব্যতীত অন্যান্য গ্রহের সমীপবর্তী হলে চন্দ্রের ও কিঞ্চিদধিক এই বল লাভ হয়। তাছাড়া, উদয়রাশিতে এই বল সঞ্চার হয়, যদি তার রাশ্যাধিপতি গ্রহও সেই রাশিতে থাকে; উভয়ে বৃহস্পতি ও বুধের দৃষ্টিরেখায় থাকলে, লগ্নরাশি পাপগ্রহের দৃষ্টিমুক্ত থাকলে এবং রাশ্যাধিপতি ছাড়া অন্য কেহ উদয়রাশিতে না থাকলেও উদয়রাশি চেষ্টাবল লাভ করে, কারণ, উদয়রাশিতে পাপগ্রহ থাকলে, বৃহস্পতি ও বুধের দৃষ্টি দুর্বল করে দেয়, তাদের এই বল প্রভাব নষ্ট হয়।

চতুর্থ বল হচ্ছে 'কালবল' অর্থাৎ তৎকালীক, যা দৈনগ্রহ দিনমানে অর্জন করে, আর নৈশগ্রহ রাত্রিকালে, আর বুধগ্রহ সন্ধ্যায়, মতান্তরে সর্বদা অর্জন

করে, কেননা, বুধ একত্রে দৈন ও নৈশ দুই-ই। শুভগ্রহের শুক্লপক্ষে, আর উদয়রাশির সর্বদাই এই বল থাকে।

বললাভের জন্য গ্রহের যে-সব প্রয়োজনীয় অবস্থার কথা বলা হোল, কোনও কোনও জ্যোতিষী তার সঙ্গে বর্ষ, মাস, দিন ও ঘণ্টার শর্তও যোগ করে থাকে।

উদয়রাশি ও গ্রহাদি সম্পর্কে এই সব বল গণনা করা হয়। একাধিক গ্রহের প্রত্যেকেই যদি একাধিক দৃষ্টিবলের অধিকারী হয়, তাহলে যে গ্রহের সর্বাধিক বল আছে, সে ই প্রবলতম হবে ; দুই গ্রহ সমান বলের অধিকারী হলে, যার আয়তন বেশী সেই গ্রহ প্রবল হয়। এই আয়তনকে প্রথম সারণিতে 'নৈসর্গিক' বল নামে অভিহিত করা হয়েছে। বল ও আয়তনানুযায়ী গ্রহাদির সেই হচ্ছে বিন্যাসক্রম।

আর নক্ষত্রাদি থেকে যে, 'মধ্যম' বর্ষ গণনা করা হয়, তা তিন প্রকারের; তন্মধ্যে দুইটি, 'উচ্চস্থা' থেকে তার ব্যবধান অনুযায়ী গণিত হয়। প্রথম সারণিতে এই দুই প্রকার মধ্যম বর্ষের পরিমাণ আমরা দেখিয়েছি। 'ষড়াব্দ' ও নৈসর্গিকাব্দ 'পরমোচ্চস্থা' ধরে গণনা করা হয়। সূর্যের উপরোক্ত বল যখন চন্দ্র ও উদয়রাশির প্রত্যেকের বলাপেক্ষা বেশী হয়, তখন প্রথমটি গণনা করতে হয়, আর দ্বিতীয়টি গণনা করতে হয় চন্দ্রের বল সূর্য ও উদয়রাশির প্রত্যেকের
৫০১ বলাপেক্ষা বেশী হলে।

তৃতীয় প্রকার মধ্যমবর্ষের নাম 'অংশায়' (انشاج); 'অংশায়', সূর্য-চন্দ্রের বলাপেক্ষা উদয়রাশির বল বেশী হলে গণনা করা হয়। অন্যান্য নক্ষত্র পরমোচ্চস্থায় না থাকলে তার প্রথমবিধ বর্ষ গণনার নিয়ম হোল : পরমোচ্চস্থা থেকে তার দূরত্ব যদি ছয় রাশির বেশী হয় তাহলে ছয় রাশি, আর কম হলে, দ্বাদশতম রাশি পর্যন্ত যত রাশি ব্যবধান তত রাশি দিয়ে সারণিতে উল্লিখিত তার সংখ্যা দিয়ে গুণ দিতে হবে। তাহলে গুণফলের রাশি সংখ্যা থেকে মাস, ডিগ্রী থেকে দিবস, আর মিনিট থেকে দিবসের মিনিট সংখ্যা পাওয়া যাবে। এখন প্রত্যেক ৬০ মিনিটে একদিন, ৩০ দিনে একমাস, ১২ মাসে এক বৎসর ধরে 'ষড়ায়' নির্ণয় করতে হবে।

উদয়রাশির এইরূপ বর্ষ গণনাবিধি এই : মেষ রাশির ০ ডিগ্রী থেকে তার দূরত্বের ডিগ্রী নির্ণয় করতে হবে; প্রত্যেক রাশির এক বৎসর, প্রত্যেক ২½ ডিগ্রীর একমাস, প্রত্যেক পাঁচমিনিটের একদিন, প্রত্যেক ৫ সেকেণ্ডের এক দিবসমিনিট, এই হিসাবে সে দূরত্বকে বর্ষে পরিণত করতে হবে।

গ্রহাদির দ্বিতীয় প্রকারের বর্ষ (নৈসর্গিক) গণনার নিয়ম: সদ্যবর্ণিত নিয়মে নিজ পরমোচ্চস্থা থেকে গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় কর; সারণিতে প্রদর্শিত বর্ষ সংখ্যা দিয়ে এই দূরত্বকে গুণ কর; তারপরে 'ষড়ায়' গণনার নিয়মে গুণে যেতে হবে।

উদয়রাশির নৈসর্গিক বর্ষ গণনার নিয়ম হচ্ছে: মেষ রাশির ০ ডিগ্রী থেকে তার দূরত্ব নির্ণয় কর; এক 'নবাংশকে' এক বর্ষ ধরে, মাস ও দিন ইত্যাদি উপরোক্ত নিয়মে হিসাব কর। 'লব্ধ' সংখ্যাকে ১২ দিয়ে ভাগ কর; ভাগশেষ হবে উদয়রাশির বর্ষ সংখ্যা।

৫০২ গ্রহ ও উদয়রাশির তৃতীয় প্রকারের (অংশায়) বর্ষ একই নিয়মে গণিত হয়, সে নিয়ম উদয়রাশির নৈসর্গিক বর্ষ গণনারই মত। এক নবমাংশককে এক বর্ষ ধরে মেষ রাশির প্রারম্ভ থেকে গ্রহের দূরত্ব নির্ধারণ কর। মোট সংখ্যাকে ১০৮ দিয়ে গুণ কর; তাহলে রাশিগুলি মাস, ডিগ্রীগুলি দিবস আর মিনিটগুলি দিবস (মিনিটে) পরিণত হবে, অবশ্য ক্ষুদ্রতর পরিমাণকে বৃহত্তর পরিমাণে পরিণত করার ফলে। বর্ষসংখ্যাকে ১২ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষ পাওয়া যাবে তা হবে অভীষ্ট বর্ষের অংক।

এইসব বর্ষের সাধারণ নাম 'আয়ুর্দায়'; সমীকরণের (تعديل) পূর্বাবস্থায় তাদের নাম 'মধ্যমায়', আর পরের নাম 'স্ফুটায়'।

উদয়রাশির ত্রিবিধ বর্ষ-ই স্ফুট বর্ষ। ঈথরে ও ক্ষিতিতে তার অবস্থান অনুযায়ী, যে দুইপ্রকার বিয়োগ করা যায়, তার কোনটাই তার সমীকরণে প্রয়োজন হয় না। তবে তৃতীয় প্রকার বর্ষের (অংশায়) সমীকরণে একটি বিশেষ যোগ প্রয়োজন হয়। যা সর্বদা একইভাবে করতে হয়। সেটি এই:

গ্রহ যদি তার বৃহত্তম অংশে, তার গৃহে, গৃহের দ্রেক্কানে, বা 'সুতুঙ্গের' 'দ্রেকানে', নিজ গৃহের নবমাংশকে বা পরমোচ্চস্থার নবমাংশকে, কিম্বা একই সময়ে এই সব অবস্থা বা তার অধিকাংশে অধিষ্ঠান করে, তাহলে তার বর্ষ মধ্যম বর্ষের দ্বিগুণ হবে। কিন্তু গ্রহ যদি মন্দগতি (ر اجعا) = Retrograde motion) বা তার সুতুঙ্গে, কিম্বা উভয়াবস্থাতেই থাকে, তাহলে তার বর্ষ মধ্যম বর্ষের তিনগুণ হবে।

উপরোল্লিখিত প্রথম প্রকারের বিয়োগ দ্বারা সমীকরণ সম্বন্ধে আমার বলা উচিত, যে নীচস্থায় থাকলে গ্রহের প্রথম দুই প্রকার বর্ষ (ষড়ায় ও নৈসর্গিক) গণনা করতে হলে তাকে ½ কমিয়ে নিতে হবে আর তৃতীয় প্রকারের (অংশায়) বর্ষ গণনা করতে অর্ধেক বাদ দিতে হবে। কোনও গ্রহ তার শত্রুগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থান করলে তার বর্ষ সংখ্যার ক্ষতি হয় না।

সূর্য কিরণাচ্ছন্ন হয়ে ঈশ্বরে যে সব গ্রহ অদৃশ্য হয়ে থাকে তাদের ত্রিবিধ বর্ষের-ই অর্ধেক মাত্র নিতে হবে, কেবল শুক্র ও শনি ছাড়া, কেননা সূর্যকিরণে
৫০০ অদৃশ্য হলেও তাদের প্রভাবের কিছুমাত্র হানি হয় না।

আর, দ্বিতীয় প্রকারের বিয়োগ দ্বারা সমীকরণ (ক্ষিতিজের উপরে উদয়ানুযায়ী) সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ্য যে শুভ ও পাপগ্রহ ক্ষিতিজের ঊর্ধ্বে অবস্থানকালে তার থেকে কতটা বিয়োগ করতে হবে তা আমরা সারণিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছি। একই গৃহে দুই বা ততোধিক গ্রহ থাকলে, কেবল বৃহত্তম ও প্রবলতম গ্রহের সঙ্গে ঐ বিযুক্ত সংখ্যা যোগ করতে হবে, অবশিষ্ট বিয়োগফল পরিত্যাজ্য। এই নিয়মে কোনও বিশেষ গ্রহের 'অংশায়ু'তে যদি দুই দিক থেকে দুইটি সংখ্যা যোগ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে কেবল বৃহত্তর সং… টি নিতে হবে; বিয়োগ করতে হলেও এই নিয়ম পালন করতে হবে। তবে যদি যোগ ও বিয়োগ দুই-ই করতে হয়, তাহলে অবশ্য প্রথমে একটি, তারপরে আর একটি করতে হবে, কারণ ঐ ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে।

এইভাবে ত্রিবিধ বর্ষের সামঞ্জস্য হয়, আর তার সমষ্টি হয় আলোচ্য লগ্নে ভূমিষ্ঠ জাতকের পরমায়ু।

এখন আয়ুর বিভিন্নকাল (?نوب ? Periods ?) সম্বন্ধে হিন্দুদের নিয়ম বর্ণনা করা বাকী রয়েছে। মানুষের আয়ু উপরোক্ত তিন প্রকার বর্ষে বিভক্ত, আর জন্ম মুহূর্ত থেকে সৌর ও চান্দ্র বর্ষে বিভক্ত। সূর্য বা চন্দ্র, যার বল সর্বাধিক সেই-ই প্রবলতম হবে। বল সমান হলে যে গ্রহের অধিকাংশ নিজ গৃহে আছে সেই গ্রহ প্রবলতর; যে গ্রহের তদপেক্ষা অল্প অংশ নিজ গৃহে আছে, সে গ্রহের বল দ্বিতীয়, ইত্যাদি। উদয়রাশি, কিম্বা যে গ্রহ বহুপ্রকার বল ও নিজের অধিকাংশ সহ নিজ কেন্দ্রে আছে, সে-ই এই সব বর্ষের সহচর। একাধিক গ্রহ কেন্দ্রস্থ হলে বল ও কেন্দ্রগত অংশের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের প্রভাবের পারম্পর্য নির্ণীত হয়। এদের পরে, কেন্দ্রের নিকটস্থ গ্রহ, তার পরে বক্রীরাশিস্থ গ্রহের প্রভাব। এদের পারম্পরিক ক্রম ও বল কেন্দ্র ও রাশিস্থ অংশের ন্যূনাধিক্য অনুযায়ী নির্ণীত হয়। মানব জীবনের কোন্ ভাগে প্রত্যেক গ্রহের বর্ষ পড়ে, এই প্রক্রিয়ায় তা জানা যাবে।

তবে কেবল একটি গ্রহের বর্ষ দিয়ে আয়ুর স্বতন্ত্রভাগ নির্ণয় করা হয় না; সে গ্রহের উপরে তার সহচর গ্রহ, অর্থাৎ তৎপ্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন অন্যান্য গ্রহের প্রভাব অনুযায়ী আয়ুর স্বতন্ত্র ভাগ গণিত হয়। কারণ, সে সব গ্রহের ভাগ ঐ গ্রহকেও নিতে হয় এবং তাদের বর্ষ-বিভাগে তাকেও অংশ গ্রহণ

হয়। আয়ুর বিশেষ ভাগের অধিপতি গ্রহের সঙ্গে যে গ্রহ একই রাশিতে
৫০৪ অবস্থান করে বর্ষবিভাগের অর্ধেকভাগ তার, তার থেকে যে পঞ্চম ও নবম রাশিতে থাকে, তার ভাগ এক তৃতীয়াংশ, চতুর্থ ও অষ্টম রাশিতে যে থাকে তার ১/৪ আর যে সপ্তম রাশিতে থাকে তার ১/২ ভাগ। একাধিক গ্রহ একই অবস্থায় থাকলে ঐ অবস্থায় সমুচিত ভাগ সকলেই পাবে। আয়ুর্ভাগের অধিপতি গ্রহ অন্য গ্রহাদির দৃষ্টিতে থাকলে যে সহ-বর্ষভোগ হয়, তা গণনার নিয়ম হচ্ছে :

অধিপতি গ্রহের জন্য ভগ্নাংশের লব (كسر=numerator) স্থলে এক, আর হর (مخرج=denominator) স্থলে এক লেখ, (= ১/১), কেননা সে সম্পূর্ণ আয়ুর্ভাগের উপর আধিপত্য করে। তার পরে, প্রত্যেক সহচর গ্রহের (যে অধিপতিগ্রহের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে) জন্য কেবল তার লব (সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ নয়) লও। প্রত্যেক হরকে এবার সমস্ত লব ও তাদের সমষ্টি দিয়ে পূরণ কর, কেবল অধিপতিগ্রহ ও তার ভগ্নাংশ ছাড়া। এর ফলে সমস্ত লব একই 'হরে' পরিণত হবে এবং সমান অংকের হর অগ্রাহ্য করা হবে। এবারে, প্রত্যেক লবকে বর্ষ-সমষ্টি দিয়ে পূরণ করে ভাগফলকে সমস্ত লবের যুক্তাংক দিয়ে ভাগ দিতে হবে। ভাগলব্ধ অংক হবে গ্রহের 'কালমবুক' (? ৪১ قالمبو—কালভাগ ?) বর্ষ।

গ্রহাদির আধিপত্যক্রম স্থির করার পর, তাদের স্বতন্ত্র প্রভাবানুযায়ী দার্শনিকরা তাদের বিন্যাসক্রম স্থির করে। যেমন উপরে ব্যাখ্যাত হয়েছে, কেন্দ্রস্থিত সর্বাপেক্ষা বলবান গ্রহ প্রবলতম, অব্যবহিত স্বল্প বলবান গ্রহ তার পরে, তারপরে কেন্দ্রের নিকটবর্তী গ্রহ আর তারপরে ক্রান্তিবৃত্তের নিম্নমুখী ভাগের অথবা অবরোহ (زوايل—inclined signs) রাশিস্থ গ্রহ।

আমার এই বর্ণনা থেকে ভারতীয়দের পরমায়ু গণনার নিয়মাদি জানা যাবে। জন্মলগ্নে ও লগ্নবিশেষে গ্রহাদির অবস্থান থেকে পাঠক জানতে পারবে গ্রহাদির বর্ষভোগকাল কিভাবে জীবনের বিভিন্ন অংশের উপরে বিভক্ত আছে। এর সঙ্গে আমি ওদের জাতক বিচার সংক্রান্ত আরও এক-আধটি নিয়ম এখানে উল্লেখ করছি যা অন্য জাতিরা ঐ প্রসঙ্গে বিবেচনা করে না। যেমন : জন্মকালে পিতা উপস্থিত ছিল কিনা ওরা গণনা দ্বারা নির্ণয় করতে চায় এবং লগ্নরাশিতে চন্দ্রের দৃষ্টি না থাকলে, কিম্বা চন্দ্রের রাশি শুক্র ও বুধের রাশি দ্বারা বেষ্টিত হলে, কিংবা সপ্তম রাশিতে মঙ্গল থাকলে ওরা সিদ্ধান্ত করে যে পিতা উপস্থিত ছিল না।

ওরা জাতকের পূর্ণ আয়ুপ্রাপ্তি সূর্য-চন্দ্রের অবস্থান থেকে নির্ণয় করতে চেষ্টা করে। একই রাশিতে সূর্য-চন্দ্র পাপগ্রহযুক্ত হয়ে অবস্থান করলে, কিম্বা চন্দ্র ও বৃহস্পতি রাশির দৃষ্টি ত্যাগ করলে, কিম্বা বৃহস্পতি সূর্য-চন্দ্রের যুগ্মদৃষ্টি ত্যাগ করলে জাতক পূর্ণ আয়ু পাবে না।

৫০৫ প্রদীপের অবস্থান্তর দিয়ে ওরা সূর্যের রাশি পরীক্ষা করে। সেটি 'চররাশি' হলে, স্থানান্তর করলে দীপশিখা কম্পিত হবে; স্থির রাশি হলে দীপশিখা নিষ্কম্প থাকবে, আর রাশি যদি 'দ্ব্যাত্মক' (চর-স্থির) হয়, তাহলে দীপশিখা একবার কম্পিত, একবার স্থির হবে।

রাশির ৩০ ডিগ্রীর কোন্ ডিগ্রীতে লগ্নরাশি অবস্থিত তাও ওরা প্রদীপের সাহায্যে নির্ণয় করতে চেষ্টা করে। প্রদীপের সলিতাকে রাশির সমান ধরে। পূর্ণিমা থাকলে প্রদীপ তৈলে পরিপূর্ণ থাকে; অন্য সময়ে চন্দ্রকলার ক্ষতিবৃদ্ধি অনুযায়ী প্রদীপের তৈলে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়।

গৃহনির্মাণ কালে কেন্দ্রস্থিত প্রবলতম গ্রহ থেকে ওরা বাসগৃহের দ্বার নির্দিষ্ট করে, কারণ গৃহদ্বার ঐ গ্রহের, কিম্বা কেন্দ্রে কোনও গ্রহ না থাকলে, লগ্নরাশির মুখের দিকে থাকতে হয়। তাছাড়া গৃহনির্মাণকালে সূর্য চন্দ্রের কোন জ্যোতিষ্ক কেন্দ্রস্থিত তাও ওরা বিবেচনা করে; সূর্য কেন্দ্রস্থিত থাকলে সে গৃহ ধ্বংস হবে; চন্দ্র কেন্দ্রস্থিত থাকলে গৃহের কল্যাণ হবে, মঙ্গল হলে গৃহ অগ্নিদগ্ধ হবে, বুধ হলে গৃহ বক্র হবে, বৃহস্পতি হলে দৃঢ় ও স্থায়ী হবে; আর শনি কেন্দ্রস্থ থাকলে সে গৃহ জীর্ণ হবে। লগ্নের দশম রাশিতে বৃহস্পতি যদি নিজ 'পরমোচ্চস্থায়' থাকে, তাহলে গৃহের দুই কি তিনটি স্তম্ভ বা খুঁটি থাকতে হবে, ধনুরাশিতে যদি বৃহস্পতির লক্ষণ প্রবল হয়, তাহলে তিনটি, আর অন্যান্য দ্বি-স্বভাব রাশিতে তার লক্ষণ প্রবল হলে দুইটি স্তম্ভ বা খুঁটি হতে হবে।

সিংহাসন নির্মাণ ও স্থাপনে তার ফলাফল গণনা করতে ওরা লগ্নরাশি থেকে তৃতীয় রাশি, তার চতুষ্কোণসমূহ ও দ্বাদশতম রাশি পর্যন্ত তার দূরত্ব অনুধাবন করে। ঐ সবের মধ্যে কোনও অশুভ গ্রহ থাকলে হয় সিংহাসনের পা বা তার পার্শ্বসকল সেই অশুভ গ্রহের নির্দিষ্ট ফলানুযায়ী বিনষ্ট হবে, যেমন মঙ্গল হলে দগ্ধ হবে, সূর্য হলে ভগ্ন হবে, শনি হলে জীর্ণতার দরুন নষ্ট হবে।

উদয় ও চন্দ্রের রাশিতে অবস্থিত নক্ষত্রের সংখ্যা দ্বারা গৃহে স্ত্রী সমাগম নির্ণয় করা হয়; রাশিদ্বয়ের আকৃতি অনুযায়ী তাদের গুণ হয়। রাশিদ্বয়ের

যে নক্ষত্রগুলি ক্ষিতিজের উপরে অবস্থান করে, তার থেকে সে গৃহ হতে বহির্গতা স্ত্রীদের, আর যেগুলি ক্ষিতেজের নিম্নে থাকে, তার থেকে সে গৃহে সমাগতা স্ত্রীদের লক্ষণ ও সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

৫০৬ সূর্য-চন্দ্রের মধ্যে প্রবলতর গ্রহের 'দ্রেক্কানাধিপতি ধরে ওরা মানবদেহে আত্মার সঞ্চার নির্ণয় করে। দ্রেক্কানাধিপতি বৃহস্পতি হলে আত্মার আগমন হয় দেবলোক থেকে; শুক্র অথবা চন্দ্র হলে, পিতৃলোক থেকে, মঙ্গল অথবা সূর্য হলে বৃশ্চিক থেকে, আর শনি কিম্বা বুধ হলে, আত্মা আসে ভূগুলোক থেকে।' তেমনই, ওরা দেহত্যাগের পরে আত্মার প্রয়াণ নির্ণয় করে। যখন জন্মরাশি থেকে ষষ্ঠ বা অষ্টম রাশিক্ষেত্রের দ্রেক্কানাধিপতি অপেক্ষা প্রবলতর গ্রহে মৃত্যু হয় তখন উপরোক্ত নিয়মে ওরা আত্মার গতিবিধি বিচার করে। যেমন, জন্মরাশির ষষ্ঠ বা অষ্টমরাশিতে; কিম্বা কোনও দ্রেক্কানে যদি বৃহস্পতি তার সুতুঙ্গে অবস্থান করে, কিম্বা যদি উদয়রাশি মীন হয় আর বৃহস্পতি সেই লগ্নে প্রবলতম গ্রহ হয়, মৃত্যু আর জন্মের রাশিচিহ্ন যদি একই হয়, তাহলে আত্মার মুক্তি হবে, তাকে আর যোনী ভ্রমণ করতে হবে না।

আমি এইসব তথ্যের উল্লেখ করলাম এইজন্য, যাতে ফলিত জ্যোতিষের গণনা রীতিতে আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যে কি পার্থক্য তা জানা যায়।

নভোমন্ডল ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ওদের সিদ্ধান্ত ও পদ্ধতিগুলি শুধু দীর্ঘ-ই নয়, অতি সূক্ষ্মও বটে। তবে ওদের জাতক গণনা সম্বন্ধে যেমন আমি কেবল পরমায়ু নিরূপণ নীতির উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছি, তেমনই প্রাকৃতিক জ্যোতিষ তত্ত্বের মধ্যে যারা এ বিষয়ে পূর্ণজ্ঞানী বলে খ্যাত, কেবল ধূমকেতু সম্বন্ধে তাদের মতামত বর্ণনা করব, যাতে ঐ তুলনায় অন্যান্য বিষয়-গুলির ধারণা করা যেতে পারে।

ড্রাগনের মস্তককে বলা হয় 'রাহু,' তার পুচ্ছের নাম 'কেতু'। তবে পুচ্ছের উল্লেখ ওরা কদাচিৎ করে থাকে, কেবল 'রাহু'ই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। আকাশে যত সপুচ্ছতারকা দেখা দেয়, সকলকে-ই ওরা সাধারণভাবে 'কেতু' বলে।

৫০৭ বরাহমিহির বলেছেন: 'রাহুর' ৩৩টি পুত্র আছে। তাদেরকে 'তামস-কীলক' বলা হয়। এগুলি আসলে বিভিন্ন প্রকারের ধূমকেতু, তাদের পুচ্ছ থাক, আর নাই থাক। তাদের ফলাফল তাদের আকৃতি, বর্ণ, আয়তন ও অবস্থানুযায়ী হয়।

'তন্মধ্যে ক্রূরতম হচ্ছে যেগুলি কাক, কবন্ধ, খড়্গ, অসি, ধনুক ও বানবৎ। তারা সর্বদা সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডলে থাকে, জল আলোড়ন করে, সমস্ত পানীয় জলকে দূষিত করে, বাতাসকে এত প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করে যে তা রক্তবর্ণ ধারণ করে, এত প্রবলভাবে প্রবাহিত করে যে বাত্যাঘাতে বিরাট মহিরুহাদি উৎপাটিত হয়, উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড মানুষের জানু ও পায়ে আঘাত করতে থাকে। তারা সময়ের স্বভাব পরিবর্তন করে দেয় যার দরুন ঋতু বৈপরীত্য ঘটে। এই প্রকার দুর্যোগ ও সর্বনাশা উৎপাত যেমন, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বসা, জলন্ত উত্তাপ, দিগ্‌দাহ, আরণ্য পশুপক্ষীর বিকট রব ইত্যাদি যখন বেশী হয় তখন জানবে যে এসব রাহুপুত্রদের দ্বারা ঘটছে।"

"আর এই সব উৎপাত যদি সূর্য গ্রহণ অথবা ধূমকেতু উদয়ের সাথে হতে থাকে তাহলে গণনায় যা জেনেছ তা এই সবেতে আরোপ কর, রাহুপুত্র ব্যতীত অন্য কারুর থেকে ফলাফল নির্ণয় করতে যেয়ো না।"

তাঁর 'সংহিতা' পুস্তকে বরাহমিহির বলেছেন : "গর্গ, পরাশর, অসীত, দেবল ও অন্যান্য ঋষিদের পুস্তকে ধূমকেতু সম্বন্ধে যা লিখিত আছে, বাহুল্য সত্ত্বেও তার বর্ণনা সম্পূর্ণ না দিয়ে আমি সে সম্পর্কে কিছু বলব না। তাদের উদয়াস্ত সম্পূর্ণরূপে না জানা পর্যন্ত তাদের ফলাফল গণনা সম্ভব নয়, কারণ ধূমকেতুগুলি নানাপ্রকারের। কতকগুলি পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে, চন্দ্রচক্রের নক্ষত্রে উদিত হয়; তাদের নাম 'দিব্য'। কতকগুলি আছে পৃথিবীর থেকে মধ্যম দূরত্বে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী, তাদের নাম 'আন্তরীক্ষ'; কতকগুলি আছে পৃথিবীর নিকটবর্তী যারা ভূপৃষ্ঠের পর্বত গৃহ বৃক্ষাদির উপর আপতিত হয়। কখনও দেখা যায় ভূমিতে একখণ্ড জ্যোতি আপতিত হোল; লোকে ভাবে সেটা অগ্নি। যদি অগ্নি না হয় তাহলে সে 'কেতুরূপ', অর্থাৎ কেতুর আকৃতি সদৃশ। যে সব জীব বাতাসে উড্ডীনাবস্থায় অগ্নি-
৫০৮ স্ফুলিঙ্গ বা পিশাচ ও দৈত্যাদির গৃহের অগ্নি (খদ্যোত) বলে প্রতীয়মান হয়, স্ফুরোজ্জ্যোতিও এই প্রকার অন্যান্য বস্তুসকল কেতু নয়। অতএব, ফলাফল নির্ণয়ের পূর্বে তাদের প্রকৃতি জ্ঞান আবশ্যক; কারণ ফলাফল বিচার তদানুযায়ী হয়। অন্তরীক্ষে দৃষ্ট যে জ্যোতি ধ্বজা, অস্ত্র, গৃহ, বৃক্ষ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতিতে পতিত হয়, এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে দুই অধিপতি থেকে যে জ্যোতি আসে, আর ধরাতে যা দেখা যায় তা যদি এই দুই প্রকারের জ্যোতির একটি বা উপরোক্ত আলেয়া না হয়, তাহলে সে 'ভৌমকেতু'।

বরাহমিহির আরও বলছেন : "কেতুর সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলে ১০১টি কেতু আছে, কেউ বলে এক সহস্র। নারদ

ঋষি বলেছেন, কেতু একটি মাত্র যা বিভিন্নরূপে দেখা যায়, একরূপ ছেড়ে অন্যরূপ পরিগ্রহ করে।”

“তাদের দশাকাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যতদিন কেতু থাকে ততমাস তার প্রভাব থাকে। কেতোদর্য়ে যদি দেড় মাসের অধিক থাকে তাহলে তার থেকে ৪৫ দিন বাদ দিয়ে নাও, অবশিষ্ট দিন হবে তার দশার মাসসংখ্যা। যদি দুই মাসের অধিক কেতু দৃশ্যমান থাকে তাহলে উদয়ের মাসকে সমসংখ্যক বৎসর করে তার দশাকাল নির্ণয় কর। ধূমকেতুর সংখ্যা এক সহস্রের অধিক নয়।”

যা এখানে লিখলাম সহজবোধ্য করার জন্য নিম্নে তাকে সারণিবদ্ধ করে দেখাচ্ছি, যদিও সারণিস্থ সব ঘরগুলি পূরণ করা সম্ভব হয়নি, কারণ আসল পুঁথির স্থানে স্থানে লিপিচ্ছেদ আছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিবিধ কেতু সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করা, সেজন্য এক সহস্র পর্যন্ত কেতু বর্ণনা করতে তিনি চেষ্টা করেছেন।

সারণি—৪

৫০৯—৪১

নাম	বংশ	অন্তর্গত তারকার সংখ্যা	মোট সংখ্যা	বিবরণ	দৃশ্যমান হওয়ার দিক	ফলাফল
—	কিরণপুত্র	২৫	২৫	স্ফটিকের মালায় মুক্ত সদৃশ কিম্বা সুবর্ণরূপ	কেবল পূর্বে ও পশ্চিমে	রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধ
—	হুতাশ পুত্র	২৫	৫০	হরিৎ, অথবা অগ্নি, লাক্ষা বা বন্ধুজীব পুষ্পবৎ লোহিত	পূর্ব-দক্ষিণ অগ্নিকোণে	মহামারী
—	যমসুত	২৫	৭৫	বক্রপুচ্ছ, কৃষ্ণাভ ও রুক্ষ	দক্ষিণ	দুর্ভিক্ষ মহামারী
—	ধরা তনয়	২২	৯৭	বৃত্তাকার, কিরণান্বিত, জল বা তিল তৈলের কান্তি বিশিষ্ট	দক্ষিণ-পূর্বকোণে (ঈশান-কোণ)	সুফলন ও সম্পদ
—	চন্দ্রসুত	৩	১০০	শশীকিরণ সদৃশ, কুন্দ পুষ্প, শ্বেতকুমুদ রজত, উজ্জ্বল লোহ বা স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট	উত্তর	অতি দুর্লক্ষণ, যার দরুন পৃথিবী ওলট পালট হবে

নাম	তাদের বংশ	অন্তর্গত তারকার সংখ্যা	মোট সংখ্যা	বিবরণ	কোন দিক থেকে দৃশ্যমান হয়	ফলাফল
ব্রহ্মদণ্ড	ব্রহ্মসুত	১	১০১	ত্রিশিখা ও ত্রিবর্ণ	অনির্দিষ্ট	পাপ ও ধ্বংস
—	শুক্রতনয়	৮৪	১৮৫	বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ জ্যোতির্ময়	উত্তর ও উত্তর দক্ষিণ	বিপদ ও ত্রাস
কনক	শনিপুত্র	—	—	শৃঙ্গবৎ, কিরণান্বিত	অনির্দিষ্ট	দুর্ভাগ্য ও নিধন
বিকচ	বৃহস্পতি সুত	৬৫	—	পুচ্ছবিহীন, শুভ্র দ্যুতিময়	দক্ষিণ	ধ্বংস ও দুর্ভাগ্য
"তস্কর" (=চোর)	বধুপুত্র	৫১	—	শ্বেত বর্ণ, দীর্ঘ ও বিকির্ণ, চোখ ধাঁধানো দীপ্তিময়	অনির্দিষ্ট	দুর্ভাগ্য
কুম্কুম	মঙ্গলতনয়	৬০	—	ত্রিশিখা, অগ্নিবর্ণ	উত্তর	চরম অমঙ্গল
তমাশ কীলক	রাহুপুত্র	৩৬	—	নানা আকৃতি বিশিষ্ট	চন্দ্র সূর্যের চতুর্দিকে	অগ্নিকাণ্ড
বিশ্বরূপ	অগ্নিপুত্র	১২০	—	অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিময়	—	অমঙ্গল
অরুণি	পবনসুত	৭৭	—	যার মধ্যে তারকা দেখা যায় এমন আকৃতি নাই, কেবল তাদের কিরণ একত্রিত হয়ে পুচ্ছের মত দেখায়; লোহিত কিম্বা সবুজ আভাময়	—	সাধারণ দুর্যোগ
গণক	প্রজাপতি-সুত	২০৪	—	চতুষ্কোণ, দৃশ্যতঃ আট, সংখ্যায় ৩০৪	—	দুর্যোগ ও ধ্বংস
কঙ্ক	সলিলপুত্র	৩২	—	গুল্মের ন্যায় আকীর্ণ, চন্দ্রালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত	—	পুন্দ্রে শঙ্কা ও অমঙ্গল
কবন্ধ	কালসুত	—	—	মানুষের ছিন্নমস্তকের ন্যায়	—	ভয়ানক ক্ষয় ক্ষতি
—	—	৯	—	দৃশ্যতঃ এক, সংখ্যায় নয়; বৃহৎ ও শ্বেতবর্ণ	চতুর্দিকে	মহামারী

৫৫২ গ্রন্থকার ধূমকেতুগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন ঃ—'উর্ধ্ব', যেগুলি নক্ষত্রের নিকটবর্তী; প্রবাহমান, যেগুলি পৃথিবীর নিকটবর্তী, আর মধ্যম, যেগুলি বায়ুমন্ডলে। এই 'উর্ধ্ব' ও 'মধ্যম' শ্রেণীর প্রত্যেকটি কেতুকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমাদের সারণীতে উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরও বলেছেন, 'মধ্যম শ্রেণীর কেতু নৃপতিদের যুদ্ধাস্ত্র, ধ্বজা, ছত্র, ব্যাজনী ও চামরের উপরে আলোকসম্পাত করলে সে নৃপতিদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। গৃহ বৃক্ষ বা পর্বতের উপরে কেতু দৃষ্ট হলে সে রাজ্য নাশ হবে; গৃহের আসবাবপত্রের উপর সে আলো পড়লে গৃহস্থদের মৃত্যু হবে; গৃহের আবর্জনায় পড়লে গৃহপতির মৃত্যু হবে।

"ধূমকেতুর পুচ্ছের সম্মুখে উল্কাপাত হলে স্বাস্থ্য ও সুখ তিরোহিত হবে, বৃষ্টির সুফল নষ্ট হবে এবং 'মহাদেবের' প্রিয় বৃক্ষসমূহ (যার নামোল্লেখে লাভ নাই যেহেতু তাদের নাম ও আকৃতি আমাদের মধ্যে তেমন পরিচিত নয়) এবং চোল, শ্বেতহূন ও চীনরাজ্য উপদ্রুত হবে।"

"ধূমকেতুর পুচ্ছের দিক—সে অবনমিত, আলম্বিত বা বক্র, যাই হোক না কেন—এবং যে নক্ষত্রের প্রান্তদেশ সে স্পর্শ করে তা লক্ষ্য কর এবং সে দেশের যে আশুবিনাশ হবে, ও ময়ূর কর্তৃক 'সর্প' ভক্ষণের ন্যায় অভিযাত্রী বহিসৈন্য সে দেশবাসীদিগকে ভক্ষণ করবে। সেকথা বলে দাও।"

"এসব ধূমকেতু থেকে অবশ্য শুভ লক্ষণাক্রান্ত কেতুগুলি বাদ দেবে।"

"অন্যগুলি সম্পর্কে, তাদের উদয় নক্ষত্র, কিম্বা যে নক্ষত্রে তাদের পুচ্ছ অবস্থিত কিম্বা স্পর্শ করেছে, সে নক্ষত্রকে লক্ষ্য করতে হবে। সে নক্ষত্র যে সব দেশ ইঙ্গিত করে, সে দেশের রাজাদের বিনাশ ও ঐ নক্ষত্রের লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য অনিষ্ট ঘটনাবলী সকলকে বলে দাও।"

'আমরা 'কাবা' সম্বন্ধে যেমন বিশ্বাস করি, ধূমকেতু সম্বন্ধে ইহুদীদেরও সেইরূপ বিশ্বাস।

উল্কা সম্বন্ধে (বরাহমিহিরের) উক্ত পুস্তকে আছে যে তারা পুণ্যবলে উর্ধ্বে উত্থিত প্রাণী, যাদের স্বর্গভোগের কাল শেষ হয়েছে এবং পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করেছে।

পর পৃষ্ঠায় দুটি তালিকাতে এই দুই প্রকারের বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ঈশ্বরে সর্বোচ্চ ধূমকেতুর তালিকা

সংখ্যা	নাম	উদয়ের দিক বা কোণ	বিবরণ	ফলাফল
১	বসা	পশ্চিম	স্থূলাকৃত, বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুটিত হয়, উত্তর দিক থেকে বিস্তৃত হয়	জীবন মৃত্যু, অথচ প্রচুর শস্য ফলন
২	আস্থ	ঐ	প্রথমাপেক্ষা হীন প্রভ	বুভুক্ষা ও মহামারী
৩	শস্ত্র	ঐ	প্রথম কেতুর মত	রাজাদের পারস্পরিক যুদ্ধ
৪	কপালকেতু	পূর্ব	মধ্যাকাশ পর্যন্ত পুচ্ছবিস্তৃত, ধূম্রবর্ণ, প্রতিপদের দিনে দৃশ্যমান হয়	সুবর্ষণ, বুভুক্ষা, রোগ ও মৃত্যু
৫	রৌদ্র	পূর্বাষাঢ়, পূর্বভাদ্রপদ ও রেবতীনক্ষত্রে পূর্ব-দিকে উদয় হয়	তীক্ষ্ণধার কিরণ পরিবেষ্টিত, লোহ-বর্ণ, আকাশের তৃতীয়াংশ ব্যাপী বিস্তার	রাজাদের পারস্পরিক যুদ্ধ
৬	চলকেতু	পশ্চিম	উদয়কালে দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলী পরিমাণ পুচ্ছ বিশিষ্ট; পরে উত্তরাভিমুখী হয়ে তার পুচ্ছে দৈর্ঘ্য সপ্তর্ষী ও মেরু ও অভিজিৎ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠে দক্ষিণ দিকে অদৃশ্য হয়।	প্রয়াগ থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল নষ্ট করে, মধ্যদেশ বিধ্বস্ত করে, অন্যান্য অঞ্চলও দুর্গত হয়, কোথায়ও মহামারী, কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও যুদ্ধ। ১০-১২ মাস পর্যন্ত দৃশ্যমান থাকে
৭	শ্বেতকেতুর	দক্ষিণ	প্রথম রাত্রিতে উদয় হয়। সাতদিন দৃশ্যমান থাকে, পুচ্ছ আকাশের তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তৃত। হরিৎবর্ণ; দক্ষিণ থেকে বামে গতি।	এই দুই ধূমকেতু (শ্বেতকেতু ও ক) একত্রে দৃশ্যমান হলে শ্রী ও সমৃদ্ধি হবে; সাতদিনের অধিককাল দৃশ্যমান থাকলে, মানবকর্মের ও আয়ুর দুই তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হবে, তরবারী কোষমুক্ত হবে, বিপ্লব বৃদ্ধি পাবে, দশ বৎসরকাল উপদ্রব থাকবে।

ঈশ্বরে সর্বোচ্চ ধূমকেতুর তালিকা

৮	ক	পশ্চিম	রাত্রির প্রথমার্ধে উদয়, বিক্ষিপ্ত শস্যবীজের ন্যায় শিখা; সাতদিন দৃশ্যমান থাকে।	,,
৯	রশ্মিকেতু	সপ্তর্ষী	ধূম্রবর্ণ	মানবকর্ম পণ্ড করে, উপদ্রব বৃদ্ধি করে।
১০	ধ্রুবকেতু(?)	আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী যেখানে ইচ্ছা উদয় হয়।	স্থূলদেহ, বিপুলপার্শ্ব ও বিদ্যুৎ প্রভ	শান্তি ও সুখ

আকাশে মধ্যম উচ্চতার ধূমকেতুর তালিকা :—

সংখ্যা	নাম	উদয়ের দিক বা কোণ	বিবরণ	ফলাফল
১	কুমুদ	পশ্চিম	পদ্মের নামাঙ্কিত, তার সমতুল্য এক-রাত্রি কাল দৃশ্যমান থাকি, পুচ্ছ দক্ষিণে প্রসারিত।	দশ বৎসর কাল সুফলন ও শ্রীবৃদ্ধি
২	মনিকেতু	পশ্চিম	রাত্রির এক-চতুর্থাংশ মাত্র দৃশ্যমান থাকে; পুচ্ছ সরল, স্তন দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র	সার্ধ চার মাস কাল হিংস্র পশুর উপদ্রব ও নিরবচ্ছিন্ন সুফলন
৩	জলকেতু	পশ্চিম	বিদ্যুৎ প্রভ: পুচ্ছের পশ্চিম দিক বক্র	নয় মাসকাল সুফলন ও প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি
৪	ভবকেতু	পূর্ব	দক্ষিণ দিকে সিংহের ন্যায় পুচ্ছ বিশিষ্ট	এক রাত্রি মাত্র দৃশ্যমান থাকে; যত মুহূর্ত দৃশ্যমান থাকে তত মাসকাল সুফলন ও সুখ-সমৃদ্ধি থাকবে। বর্ণমলিন হলে মহামারী ও অপমৃত্যুর লক্ষণ।
৫	পদ্মকেতু	দক্ষিণ	শ্বেত কমলের ন্যায় শুভ্র; এক রাত্রি মাত্র থাকে।	সাত বৎসরকাল উর্বরতা সুখ ও আনন্দ
৬	আবর্ত	পশ্চিম	মধ্যরাত্রে উদয় হয়; বিদ্যুৎ দীপ্তির মত প্রভাময়, উজ্জ্বল ধূসরবর্ণ; বাম থেকে দক্ষিণে পুচ্ছ বিস্তৃত।	যত মুহূর্ত দৃশ্যমান থাকে তত মাসকাল সম্পদ ও সচ্ছলতার লক্ষণ।
৭	সমবর্ত	পশ্চিম	ক্ষুরধার পুচ্ছবিশিষ্ট; ধূম্র বা লোহ-বর্ণ; আকাশের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তৃত, সন্ধ্যাকালে দৃশ্যমান হয়।	যে নক্ষত্রে উদয় হয় তাকে অশুভ করে সে নক্ষত্রের সঙ্গে তার ফলাফলও নষ্ট করে; অস্ত্রাদির কোষমুক্তি, রাজাদের প্রাণ হানির লক্ষণ; যত মুহূর্ত দৃশ্যমান থাকে তত বৎসরকাল তার প্রভাব থাকে।

৫৪৭ ধূমকেতু ও তাদের ফলাফল সম্বন্ধে এই হচ্ছে হিন্দুদের সিদ্ধান্ত।

অয়োনীয় পদার্থ বিজ্ঞানীদের মত। ধূমকেতু ও উর্ধ্বজগতের অনুরূপ ব্যাপারের খাঁটি বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছে এমন লোকে হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল, কারণ এসব বিষয়েও ওরা শাস্ত্র বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারে না। যেমন মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে : "বৃষ্টি চার প্রকার, পর্বতও চারপ্রকার; তাদের মূল হচেছ সলীল। চারকোণে স্থিত চারটি হস্তির পৃষ্ঠে পৃথিবী রক্ষিত আছে; হস্তীসকল নিজ শুঁড় দিয়ে জল উত্তোলন করে শস্যবীজের অংকুরোদগমের জন্য; গ্রীষ্মকালে তারা জলবর্ষণ করে, আর শীতকালে তুষার; কুয়াশা বৃষ্টির সেবক; সে উর্ধ্বে উঠে মেঘপুঞ্জকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে।"

এই চারি হস্তী প্রসঙ্গে 'হস্তীর চিকিৎসাপুস্তকে' লেখা আছে : কতকগুলি পুরুষ হস্তী মানুষের চেয়েও ধূর্ত হয়; যুদ্ধাগ্রে সেরূপ হস্তী থাকা সেজন্য কুলক্ষণ মনে করা হয়। সে হস্তীকে বলা হয় 'মনুকনাহ্' (منكنه Manguniha ?) কারও একটি দন্ত থাকে, কারও বা তিন চারটি। এরা হচেছ পৃথিবীকে বহনকারী হস্তীবৃন্দের কুলোদ্ভূত। মানুষ তাদেরকে বাধা দেয় না, ফাঁদে পড়লে বরঞ্চ তাদিকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।'

বায়ুপুরাণে আছে : 'বাতাস ও রৌদ্রকর সমুদ্র থেকে জল উত্তোলন করে সূর্যের কাছে নিয়ে যায়; সূর্য থেকে নিম্নে পতিত হলে জল উত্তপ্ত থাকবে। সেজন্য সূর্য জলকে চন্দ্রের হাতে দেয়, যাতে শীতল অবস্থায় সেখান থেকে ভূমিতে পড়ে ধরাকে সঞ্জীবিত করে।

নভোমণ্ডলের ঘটনাদি সম্বন্ধে ওরা বলে, বজ্র হচেছ 'ঐরাবত', অর্থাৎ ইন্দ্ররাজের বাহনের বৃংহনাদ, যখন মানস সরোবরে জলপান করে উত্তেজিত হয়ে সে পুরুষ রব করতে থাকে। আর রামধনু হচেছ ইন্দ্রের ধনুক, যেমন আমাদের জনসাধারণ তাকে রুস্তমের ধনুক মনে করে।'

এখন পর্যন্ত এই পুস্তকে যে সব বিবরণ দেওয়া হোল আমার বিশ্বাস হিন্দুদের সাথে কথাবার্তা ও তাদের সংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্ব নিয়ে আলাপ-
৫৪৮ আলোচনার জন্য তা যথেষ্ট হবে। অতএব, এখানেই আমার রচনা শেষ করছি, যার কলেবর এমনিতেই ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে। এই রচনাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোনও অসত্য কথা যদি এসে গিয়ে থাকে, আল্লাহ্ যেন আমায় ক্ষমা করেন

এই আমার প্রার্থনা। তাঁর মনোনীত আচরণে অবিচলিত তিনি যেন আমার সহায় হন এবং অসত্যের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে তার থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারি, সে পথ যেন তিনি আমায় দেখান, কেননা তিনিই সমস্ত মঙ্গলের আকর, বান্দাদের প্রতি তিনিই পরম করুণাময়।

الحمد لله رب العالمين و صلواته على النبي محمد و آله اجمعين

নির্ঘণ্ট

(বাংলা)

খ

গ

ঘ

চ

জ

য

র

ল

হ

নির্ঘণ্ট

(ইংরেজী)